রবীন্দ্র রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের (বর্তমান সুলভ ষোড়শ খণ্ড) নিবেদন-এ বলা হইয়াছিল : 'পূর্বপ্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও হইতেছে।'

অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ-করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঊনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড (বর্তমান সপ্তদশ খণ্ড) সংকলিত হইল। এই খণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ পাওয়া যাইবে। বর্তমান খণ্ডে ওই দুই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হইয়াছে; এবং পরিশিষ্ট অংশের রচনাগুলিও যুক্ত হইল।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে সংকলিত হইয়াছে।

১৪০৪

বিষয়সূচী

সংযোজন

প্রবন্ধ

সাহিত্য

শিক্ষা

সমাজ

ইতিহাস

বিজ্ঞান

বিবিধ

গ্রন্থসমালোচনা

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

কবিতা

অভিলাষ

১

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

২

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ওই স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

৩

চলিল মানব দেখো বিমোহিত হয়ে,
পর্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

৪

হিমক্ষেত্র, জনশূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

৫

ওই দেখো ছুটিয়াছে আর-এক দল,
লোকারণ্য পথমাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

৬

ওই দেখো পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

৭

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
'স্বর্ণঅট্টালিকা মাঝে?' তা নয় তা নয়।
'সুবর্ণখনির মাঝে অন্ত কি তোমার?'
তা নয়, যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

৮

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

৯

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটির মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

১০

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বঙ্কুর পথেতে
সন্তোষ নাহিকো পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।

১১

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

১২

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ানো কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এ-সব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

১৩

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

১৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

১৫

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

১৬

দেখো দেখো বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

১৭

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্মসিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

১৮

দূরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

১৯

ওই দেখো আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্পে পরিপূর্ণ শোভন আপণ।

২০

মনোহর কুঞ্জবন সুখের আগার
শিল্প-পারিপাট্যযুক্ত প্রমোদভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজাপূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

২১

ভাবিল মুহূর্ত-তরে ভাবিল কৃষক
সকলই এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ওই বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ওই শোভন প্রদেশ।

২২

মুহূর্তেক পরে তার মুহূর্তেক পরে
লীন হল চিত্রচয় চিত্তপট হতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
'আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?'

২৩

'আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষাচয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্তের তরে
কার্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়।'

২৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্তমাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজদণ্ড ঐশ্বর্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

২৫

ওই দেখো গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির 'পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখো।

২৬

হত্যা করিতেছে দেখো নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ওই দেখো ওই দেখো রক্তমাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

২৭

কিন্তু হায় সুখলেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কি গো কটাক্ষ করিবে?

২৮

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

২৯

কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়
পাপের কী ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কী শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়।

৩০

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশনসম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভালো লাগে আর।

৩১

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

৩২

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

৩৩

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক-কাননে।

৩৪

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলস এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙিল হঠাৎ তাহা ভাঙিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

৩৫

দুর্যোধন-চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

৩৬

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

৩৭

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

৩৮

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

৩৯

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪

হোক ভারতের জয়!

এসো এসো ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে
সরল প্রীতির ভরে
সবে মিলি পরস্পরে
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।

এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে
হৃদয় খুলিয়া সবে
এসো এসো এসো করি প্রিয়সম্ভাষণ।
দূর করো আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর,
দূর করো মলিনতা
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ করো সবে দূর।
ভীরুতা বঙ্গীয়জন-কলঙ্ক-প্রধান—
সে-কলঙ্ক দূর করো,
সাহসিক তেজ ধরো,
স্বকার্যকুশল হও হয়ে একতান।
হল না কিছুই করা যা করিতে এলে—
এই দেখো হিন্দুমেলা,
তবে কেন কর হেলা?
কী হবে কী হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে?
সাগরের স্রোতসম যাইছে সময়।
তুচ্ছ কাজে কেন রও,
স্বদেশহিতৈষী হও—
স্বদেশের জনগণে দাও রে অভয়।
নাহি আর জননীর পূর্বসুতগণ—
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্তজলধিতলে হয়েছে মগন।
নাহি সেই রাম আদি সম্রাট প্রাচীন,
বিক্রম-আদিত্যরাজ,
কালিদাস কবিরাজ,
পরাশর পারাশর পণ্ডিত প্রবীণ।
সকলেই জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়
মিশাইয়া নিজদেহ
অনন্ত ব্রহ্মের গেহ
পশেছে কীর্তিরে শুধু রাখিয়ে ধরায়।
আদরে সে প্রিয় সখী আচ্ছাদি গগনে
সে লোকবিশ্রুত নাম
সে বিশ্ববিজয়ী ধাম
নির্ঘোষে ঘুষিছে সদা অখিল ভুবনে।
যবনের রাজ্যকালে কীর্তির আধার
চিতোর-নগর নাম
অতুলবীরত্বধাম,
কেমন ছিল রে মনে ভাবো একবার।

এইরূপ কত শত নগর প্রাচীন
সুকীর্তি-তপন-করে
ভারত উজ্জ্বল ক'রে
অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।
নাহি সেই ভারতের একতা-বিভব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে
সকলের পদতলে
লুটাইছে আর্যগণ হইয়া নীরব।
গেল, হায়, সব সুখ অভাগী মাতার—
ছিল যত মনোআশা
নিল কাল সর্বনাশা,
প্রসন্ন বদন হল বিষণ্ণ তাঁহার।
কী আর হইবে মাতা খুলিয়া বদন।
দীপ্তভানু অস্ত গেল,
এবে কালরাত্রি এল,
বসনে আবরি মুখ কাঁদো সর্বক্ষণ।
বিশাল অপার সিন্ধু, গভীর নিস্বনে
যেখানে যেখানে যাও
কাঁদিতে কাঁদিতে গাও—
ডুবিল ভারতরবি অনন্ত জীবনে।
সুবিখ্যাত গৌড় যেই বঙ্গের রতন—
তার কীর্তিপ্রতিভায়
খ্যাতাপন্ন এ ধরায়
হয়েছিল একদিন বঙ্গবাসিগণ।
গেল সে বঙ্গের জ্যোতিঃ কিছুকাল পরে—
কোনো চিহ্ন নাহি তার,
পরিয়া হীনতাহার,
ডুবিয়াছে এবে বঙ্গ কলঙ্কসাগরে।
হিন্দুজনভ্রাতৃগণ! করি হে বিনয়—
একতা উৎসাহ ধরো,
জাতীয় উন্নতি করো,
ঘুষুক ভুবনে সবে ভারতের জয়।
জগদীশ! তুমি, নাথ, নিত্য-নিরাময়
করো কৃপা বিতরণ,
অধিবাসিজনগণ,
করুক উন্নতি— হোক্ ভারতের জয়!

বান্ধব
মাঘ ১২৮১

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন-'পরি,
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহারশীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাকো পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত— চাঁদের কিরণ—
রজতধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
'কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ-নিশি।

৬

তখন ও-হাসি লেগেছিল ভালো,
তখন ও-বেশ লেগেছিল ভালো,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মতো।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখির কূজন লাগিত ভালো।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুশি আর লাগে না ভালো।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

১০

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্মভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১২

দেখেছি সে-দিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত-কোলে।

১৩

দেখেছি সে-দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতাভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে-দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ-ভারতভূমি
কী সুখের দিন! কী সুখের দিন!
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য-সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে-সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ-ভারতভূমি,
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সে-দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদজলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

২১

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

২২

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।'

অমৃতবাজার পত্রিকা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[দ্বিতীয় পাঠ]

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে।
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলকরাশি
কবরী কুসুমগন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়নদ্বয়, প্রশান্ত বিষাদময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তা হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ।
তা হলে কি হিমালয়, গর্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।
তা হলে কি শতদলে তোর সরোবরজলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুমরাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস।
তা হলে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করে
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলনা।'

থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন
গলিল তুষারমালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহারবিন্দু নির্ঝরিণীজলে।
কাঁপিল পাদপদল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে।
ঈষৎ আঁধাররাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি
আটক করিল নব অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতিসুন্দরী।—
'কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেলে দে-না অলংকার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরতভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।
দেখ্ আর্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত।
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে, তাড়ায় আঁধারজালে
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর।
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস-সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়া ভারত পাখি, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত।
সে-সব স্মরণ করে কাঁদ্ লো আবার!
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি,
মরুভূমি হয়ে থাক্ সমস্ত প্রদেশ।'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতিসুন্দরী,

ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি-সতী আসন-উপর।
সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি-সতী আরম্ভিল গীত।—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে।
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল যাইত শুকায়ে—
তপনকিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্যমুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো, আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।
তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়, আনন্দে বিহ্বলপ্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।
আর্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।

হরষে প্রফুল্ল মুখে হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।
ঋষিগণ সমস্বরে অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী নদীকূলে, কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী-বারি করি উথলিত।
সেই-এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে?
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্তকালের মতো, সুখসূর্য অস্তগত
ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এই রূপে।
তোর ভাগ্যচক্র শেষে থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি। সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্নভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৭৯৭ আষাঢ় শক। জুন-জুলাই ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[প্রথম পাঠ]

১

বিস্তারিয়া উর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।

প্রদীপ্ত তুষাররাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

২

অদূরেতে দেখা যায়,
উজ্জ্বল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা,
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়।

৩

ফুটেছে কনকপদ্ম অরুণ কিরণে॥
অমল সরসী-'পরে,
কমল, তরঙ্গভরে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।

৪

হেলিয়া নলিনীদলে,
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে,
সরসী-লহরী ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি,
দুলায়ে অলকরাশি,
কবরী-কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।

৫

বিজনে খুলিয়া প্রাণ,
নিখাদে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গান ধীরে ধীরে।
নলিন নয়নদ্বয়,
প্রশান্ত বিষাদময়
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।

৬

'অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে,
তা হলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ?
তা হলে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা-'পরে হত বহমান?

তা হলে কি হিমালয়,
গর্ব্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।

৭

তা হলে কি শতদলে,
তোর সরোবরজলে,
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ?
কাননে কুসুমরাশি,
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস?

৮

তা হলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু করে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ;
প্রজ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের করিত ছলন!'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন।

৯

গলিল তুষারমালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেনিল নীহার-নীর সরসীর জলে।
কাঁপিল পাদপদল;
উথলে গঙ্গার জল,
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটিল ভূতলে।

১০

ঈষৎ আঁধাররাশি,
গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিয়া দিল অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া,
আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।

১১

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান।

'কাঁদ্! কাঁদ্! আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত
হায়! দুঃখ-নিশা তোর,
হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত?

১২

লজ্জাহীনা! কেন আর,
ফেলে দে-না অলংকার,
প্রশান্ত গভীর ওই সাগরের তলে?
পূতধারা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া মরতভূমি
আবদ্ধ হউক পুনঃ ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।

১৩

উচ্চশির হিমালয়,
প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে,
অসহ্য বিষাদভরে,
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।

১৪

দেখ্, আর্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত।

১৫

কেমন স্বাধীন মনে,
গাহিছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে প্রসূননিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে,
তাড়ায় আঁধারজালে,
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর।

১৬

তখন কি মনে পড়ে—
ভারতী-মানস-সরে,
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়ে ভারত-পাখি

গাহিত শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত?

১৭

সে-সব স্মরণ করে, কাঁদ লো আবার।
'আয় রে প্রলয় ঝড়
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার!
স্বর্গমর্ত্য রসাতল হোক একাকার।

১৮

প্রভঞ্জন ভীম-বল!
খুলে দাও, বায়ুদল!
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।

১৯

বলিতে নারিল আর প্রকৃতি-সুন্দরী।
ধ্বনিয়া আকাশভূমি,
গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।

২০

জাহ্নবী উন্মত্তপারা,
নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ডবেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
মানস সরস-'পরে,
পদ্ম কাঁপে থরে থরে
দুলিল প্রকৃতি সতী আসন-উপর।

২১

সুচঞ্চল সমীরণে,
উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত।

২২

'দেখিয়াছি তোর আমি সেই্ এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিল যবে মানবনয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,

বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে,
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ,
হরষ বিষাদ দুখ,
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,
যখন মানবগণ,
করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্যপ্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়,
মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল, যাইত শুকায়ে
তপনকিরণ-তপ্ত মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।

২৩

সেইরূপ রহিল না কেন চিরকাল!
না দেখি মনুষ্যমুখ
না জানিয়া দুঃখসুখ
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো
আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।

তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল!
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ,
তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না?
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।

২৪

অরণ্যেতে নিরিবিলি,
সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়!
আনন্দে বিহ্বলপ্রায়!
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।

২৫

আইল হিন্দুরা শেষে,
তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।
হরিষে প্রফুল্লমুখে,
হাসিলি সরলা! সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।

২৬

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি,
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী-নদীকূলে,
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে,
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত।

২৭

সেই এক অভিনব
মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে
একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে,
একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা,
নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
সেই অমানিশা তোর,
আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মতো,
সুখসূর্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল রবে এই রূপে।

তোর ভাগ্যচক্র শেষে,
থামিল কি হেথা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার
আয় রে প্রলয় ঝড়,
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল,
খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি,
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮২

'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরান সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!— শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনলশিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন! দেখ্ রে তোরা!
[illegible]

জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা দেখ্ রে গগন!
স্বর্গ হতে সব দেখ্ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ্ গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরান অনল-শিখে॥

[নভেম্বর ১৮৭৫]

প্রলাপ ১

১

গিরির উরসে নবীন নির্ঝর,
ছুটে ছুটে অই হতেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগলপারা।

২

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কী করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

৩

কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনীজলে।

৪

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

৫

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্ গুন্ গুন্ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কী বলে।

৬

তপন কিরণ— সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি ভাসি ভাসি স্বর্ণ ফুলরাশি
হাসি হাসি হাসি সলিলে দোলে।

৭

প্রজাপতিগুলি পাখা দুটি তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা
কিরণে পশিতে কুসুমদলে।

৮

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

৯

তুই কে লো বালা। বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান।
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস গান।

১০

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরান,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

১১

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃতধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

১২

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।

১৩

কে লো তুই বালা! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীণা কোলের 'পরে।
জ্যোতির্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢল প্রমোদ-ভরে।

১৪

বিভোর নয়নে বিভোর পরানে—
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে!
হাসি উঠে দিক্! ডাকি উঠে পিক্!
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে!!

১৫

চারি দিক্ চেয়ে কে লো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্?
আঁধার ছুটিয়া জোছনা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্!

১৬

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা।
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী-মালা।

১৭

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুমরাশি
বাম করতলে কপোল চাপি।

১৮

এতকাল তোরে দেখিনু সেবিনু—
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে নয়নে, পরানে পরানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

১৯

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় রহেছে খালি।
তোরে প্রাণ মন করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি।

২০

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

২১

দেখিব উষার পুরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা।

২২

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরন,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

২৩

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

২৪

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া— নাচিয়া— বহিয়া যায়।

২৫

বসিব দুজনে— গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয়ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে-সব কথা।

২৬

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে— মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

২৭

আয় কলপনা আয় লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে বাতাসে আকাশে আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

২৮

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক জগত রহিবে চাহি!

২৯

জলধররাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

৩০

সুর-সুরধুনী আলোকময়ী,
উজলি কনক বালুকারাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

৩১

প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরীলীলা।
সোনার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর-বালিকারা করিবে খেলা।

৩২

আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী।
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৩

কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৪

আয় কল্পনা আয় লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
অগ্রহায়ণ ১২৮২

প্রলাপ ২

ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্!
সুনীল আকাশে রজতধারা!
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরান হয়েছে পাগলপারা!
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি!
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরান আজিকে উঠেছে মাতি!
হাসুক পৃথিবী, হাসুক জগৎ,
হাসুক হাসুক চাঁদিমা তারা!
হৃদয় খুলিয়া করিব রে গান
হৃদয় হয়েছে পাগলপারা!
আধ ফুটো-ফুটো গোলাপ-কলিকা
ঘাড়খানি আহা করিয়া হেঁট
মলয় পবনে লাজুক বালিকা
সউরভ রাশি দিতেছে ভেট।
আয় লো প্রমদা! আয় লো হেথায়
মানস আকাশে চাঁদের ধারা!
গোলাপ তুলিয়া পর্ লো মাথায়
সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা।
হেসে ঢল্ ঢল্ পূর্ণ শতদল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সুরভিরাশি

নয়নে নয়নে, অধরে অধরে
জ্যোছনা উছলি পড়িছে হাসি!
চুল হতে ফুল খুলিয়ে খুলিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়িছে ভূমে!
খসিয়া খসিয়া পড়িছে আঁচল
কোলের উপর কমল থুয়ে!
আয় লো তরুণী! আয় লো হেথায়!
সেতার ওই যে লুটায় ভূমে
বাজা লো ললনে! বাজা একবার
হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান!
অবাক্ হইয়া মুখপানে তোর
চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ!
গলার উপরে সঁপি হাতখানি
বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অস্ফুটে কত কী যে কথা
কহিবি পরানে ঢালিয়া সুখ!
ওই রে আমার সুকুমার ফুল
বাতাসে বাতাসে পড়িছে দুলে
হৃদয়েতে তোরে রাখিব লুকায়ে
নয়নে নয়নে রাখিব তুলে।
আকাশ হইতে খুঁজিবে তপন
তারকা খুঁজিবে আকাশ ছেয়ে!
খুঁজিয়া বেড়াবে দিক্‌বধূগণ
কোথায় লুকাল মোহিনী মেয়ে?
আয় লো ললনে! আয় লো আবার
সেতারে জাগায়ে দে-না লো বালা!
দুলায়ে দুলায়ে ঘাড়টি নামায়ে
কপোলেতে চুল করিবে খেলা।
কী-যে ও মুরতি শিশুর মতন!
আধ ফুটো-ফুটো ফুলের কলি!
নীরব নয়নে কী-যে কথা কয়
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
কী-যে ঘুমঘোরে ছায় প্রাণমন
লাজে ভরা ওই মধুর হাসি!
পাগলিনী বালা গলাটি কেমন
ধরিস্ জড়িয়ে ছুটিয়ে আসি!
ভুলেছি পৃথিবী ভুলেছি জগৎ
ভুলেছি, সকল বিষয় মানে!

হেসেছে পৃথিবী— হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিলি কাহারো পানে!
আয়! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
পৃথিবী ছাড়িয়া যাই লো চলে!
চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে!
চল্ যাই মোরা আরেক জগতে
দুজনে কেবল বেড়াব মাতি
কাননে কাননে, খেলাব দুজনে
বনদেবীকোলে যাপিব রাতি!
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল!
সুরভি-পূরিত কুসুমকলি!
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
সেথায় দুজনে যাইব চলি!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
ফাল্গুন ১২৮২

প্রলাপ ৩

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বল্ কী আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরান উঠেছে জ্বলি!
আর বলিব না এই শেষবার
এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে সই!
পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
হুতাশনময়ী দামিনী বালা!
অবারিত করি মরমের তল
কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!
কতবার তোরে কহেছি ললনে!
দেখায়েছি খুলে হৃদয় প্রাণ!
মরমের ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
সে-সব কথায় দিস্ নি কান!
কতবার সখি বিজনে বিজনে
শুনায়েছি তোরে প্রেমের গান,
প্রেমের আলাপ— প্রেমের প্রলাপ
সে-সব প্রলাপে দিস্ নি কান!

কতবার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতিশোধ তুই দিস্ নিকো তার
শুধু এক ফোঁটা নয়নজলে!
শুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! আমার রেতে
আঁখিজল কত করেছে গোপন
মর্ত্য পৃথিবীর নয়ন হতে!
শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!
সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!
সহেছি সে-সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা!
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়।
তোমারি তরে লো সহেছি সে-সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!
কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।
কিছুই চাহি নি পৃথিবীর কাছে—
প্রেম চেয়েছিলু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!
তোর কাছে বালা এই শেষবার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া;
ভিখারি হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া।
সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি
সেইদিন আমি ভেবেছিলু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি।

তখনো হায় রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরান দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!
আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন
ভিখারি হইয়া যাইব চলি!
পাষাণের পটে ও মুরতিখানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি! তোর ওই মুখখানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়নবারি
যতকাল ওই ছবিখানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।
কী করিব বালা মরণের জলে
ওই ছবিখানি মুছিতে হবে!
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে!
এ ভাঙা হৃদয় কত সবে আর!
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা!
মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরান জুড়াল বালা!
তোরে সখি এত বাসিতাম ভালো
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়তল
সে-সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল?
আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে! আমার তরে
এক ফোঁটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্ কখনো বিষাদভরে!
সেই নেত্রজলে— এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা!
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮৩

দিল্লি দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির-রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য-কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি— কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই-সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?

তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

১৮৭৭

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে, আহা, সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে, আহা, এলোথেলো চুল
এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ-ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রানী—
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিকো বাণী।
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
দেখো তবে মাতা দেখো গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান-পারা,
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতনহারা।
যাহা-কিছু ছিল সকলি গিয়াছে,
সে-দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব,
গভীর আঁধার যে-দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি,
তোমারো কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও-বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো, ভারতী, নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা।

বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
　　দেখিব ভারত জাগিবে কি না।
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
　　কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে,
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
　　উঠিবে, জননি, দেবতালোকে।
তা যদি না হয় তা হলে, ভারতি,
　　তুলিয়া লও গো বিজয়ভেরী,
বাজাও জলদগভীর গরজে
　　অসীম আকাশ ধ্বনিত করি।
গাও গো হুতাশ-পূরিত গান,
　　জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ,
উথলি উঠুক ভারত-জলধি—
　　কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভাহীনা
　　এ ভারতভূমি জাগিবে কি না,
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
　　শরমে হইয়া মরমে-মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
　　তুমিই ভারতী গেয়েছ গান,
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
　　তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি, মাতা, বীণাটি লইয়া
　　মরম বিঁধিয়া গাও গো গান—
হীনবল সেও হইবে সবল,
　　মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

হিমালয়

যেখানে জ্বলিছে সূর্য, 　　উঠিছে সহস্র তারা,
　　প্রজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎযন্ত্র, 　　ঘুরিছে নিয়মচক্রে
　　অসংখ্য উজ্জ্বল গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া।
গম্ভীর অচল তুমি, 　　দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
　　সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, 　　জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
　　চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া।
তোমার বিশাল ক্রোড়ে 　　লভিতে বিশ্রাম-সুখ
　　ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।

পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া।
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহময় শূন্যপানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া।
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে।
ধীরে ধরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছপালা
একে একে ছোটো ছোটো তারাগুলি নিভিবে।
তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, একতানে নির্ঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে।
ক্রমে ক্রমে আসিবেক জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার 'পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু— বায়ু যাবে বহিয়া।
চোখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হয়ে কানে গিয়া পশিবে।
এতকাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদে কেঁদে— ক্লান্ত শিশুটির মতো
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব।
সে ঘুম ভাঙিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব।
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী-পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া।
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে।
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।

তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত-মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

আগমনী

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাতসমীর পরশে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
শোভিল ধবল তুষারজটা।
খুলি গেল ধীরে পুরবদ্বার,
ঝরিল কনককিরণধার,
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
রবির বিমল কিরণছটা।
গিরিগ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
অধীর পাগল-পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া,
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি
ঝরিছে নিঝরধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরিবাসিনী বালা,
অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
মাতিয়া সুখের গানে।
মুখে একটিও নাহিকো বাণী
শবদচকিতা মেনকারানী
তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে,
চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
আসিবে বরষ-পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রানী আসে যায়,

কভু বা প্রাসাদশিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
এখনো উমা মা এল না কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসীগণে
অধীরে হাসিয়া ভূধরভবনে,
'কই উমা কই' বলে 'উমা কই',
তিলেক বেয়াজ সহে না যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
রানীর নয়নতারা,
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
হরষে পাগল-পারা।
ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
দেখিবে নয়ন ভ'রে,
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
বালিকা উমাটি ক'রে।
তেমনি মৃণালবলয়-যুগলে,
তেমনি চিকন-চিকন বাকলে,
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা।
তেমনি করিয়া পরায়ে কেশ
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
'এই নে মা তোর তাপসী বালা'।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ,
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখখানি।
হরষে ভূধর অধীর-পারা
হরষে ছুটিবে তটিনীধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকারানী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম, গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ-গলে।
তারকা-খচিত গগন-মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশী
শোভিবে কেমন অবনীতলে।

ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
দেখো চেয়ে গিরিরানী!
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ,
হাসি-হাসি মুখখানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল চিকুরে অমল মালিকা
পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
উমার চিবুক ধ'রে,
'বলি গো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
আছিলি কেমন করে?
আমরা তো সখি সারাটি বরষ
রহিয়াছি পথ চেয়ে—
কবে আসিবেক আমাদের সেই
মেনকারানীর মেয়ে!
এই নে, স্বজনী, ফুলের ভূষণ
এই নে, মৃণাল-বালা,
হাসিমুখখানি কেমন সাজিবে
পরিলে কুসুম-মালা।'
কেহ বা কহিল, 'এবার স্বজনি,
দিব না তোমায় ছেড়ে
ভিখারি ভবের সরবস ধন
আমরা লইব কেড়ে।
বলো তো, স্বজনী, এ কেমন-ধারা
এয়েছ বরষ-পরে,
কেমনে নিদয়া রহিবে কেবল
তিনটি দিনের তরে।'
কেহ বা কহিল, 'বলো দেখি, সখী,
মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরিভবনে
কত-না করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী
গেলে তপোবন-মাঝে—
নয়নের জলে আমরা সকলে
সাজানু তাপসী-সাজে।
কোমল শরীরে বাকল পরিয়া
এলায়ে নিবিড় কেশ,
লভিবারে পতি মনের মতন
কত-না সহিলে ক্লেশ।

ছেলেবেলাকার সখীদের সব
এখনো তো মনে আছে,
ভয় হয় বড়ো পতির সোহাগে
ভুলিস তাদের পাছে।'
কত কী কহিয়া হরষে বিষাদে
চলিল আলয়-মুখে,
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী,
চুমিয়া উমার অধরখানি,
'আয় মা জননি আয় মা কোলে,
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি, মা গো, না মুছাবি বল্‌
তবে উমা আর, কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
কী হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্‌ দেখি, উমা, পতির ঘরের
সকল কুশল-কথা।'
এত বলি রানী হরষে আদরে
উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
পশিল গিরি-আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটিরে
উঠিল হরষ-ধ্বনি,
কত দিন পরে মেনকা-মহিষী
পেয়েছে নয়নমণি!

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

আকুল আহ্বান

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না।

সময় হল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
কোথায় গেল, রানী আমার রানী!

ও মা, রাত হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
সেই নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
তবু মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা, মায়ের কাছে।
আমি তোরে লুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে করে—
থাক্, মা, সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন মুখে গেলি তাদের কাছে—
তবু তারা নিলে না মা কোলে?
বড়ো বড়ো আঁখি দুখানি
রইলি তাদের মুখের পানে তুলে?
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া।
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়—
এত ডাকি দিবি নে কি সাড়া?

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে।
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা।

কেন চায়— কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষাণ পরান
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর!
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর!
কেঁদে যে-জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস নে কেহ—
এই কি মা জননীর প্রাণ!
এই কি মা জননীর স্নেহ!

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না।
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে।
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল—
কিছু নাই, নাই আর কেহ।
খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজও হাসে,
তার তরে কেহ ব'সে নেই,
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!

হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মা'র ভালোবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও— জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন।
ঢালো এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;

'অবসাদ' কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

মালতীপুঁথি

নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন-প্রাণহীন-জনহীন মরু মরু মরু—
আঁধার— আঁধার সব— নাই জল নাই তৃণ তরু,
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এসো দেবি, এসো, মোরে
রাখো এ মূর্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত।
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য-অনাথ-অজ্ঞান—
উঠাও— উঠাও মোরে— করহ নূতন প্রাণ দান।
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব— যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।
দুর্গম উন্নতিপথে পৃথ্বীতরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুর্বল পথিকে
করো গো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে।

বালক
চৈত্র ১২৯২
রচনা : আমেদাবাদ
৬ জুলাই ১৮৭৮

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি,
বাহিরে ঝড় বাতাস,
জান্‌লা রুধি ঘরে জ্বালায়ে বাতি
বন্ধু মিলি খেলে তাস।

বন্ধু পাঁচ জনে বসিয়া গৃহকোণে
চিত্ত বড়োই উদাস,
কর্ম হাতে নাই, কভু বা উঠে হাই
কভু বা করে হা-হুতাশ।
বিরস ম্লান-মুখো, মেজাজ বড়ো রুখো,
শেষে বা বাধে হাতাহাতি!
আকাশ ঢাকা মেঘে, বাতাস রেগেমেগে
বাহিরে করে মাতামাতি।

অবন বলে ভাই তর্কে কাজ নাই
প্রমারা হোক এক বাজি—
সমর মুদি চোখ বলিল তাই হোক
সত্য কহে আছি রাজি।
বজ্র দিক জুড়ি করিছে হুড়োমুড়ি
হরিশ ভয়ে হত-বুলি,
গগন এক ধারে কিছু না বলি কারে
পলকে ছবি নিল তুলি।

শারদা

ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি,
ও নহে শারদমেঘে লঘু গরজন।
কাহার আসার আশে নীরবে অবনী
আকুল শিশিরজলে ভাসায় নয়ন!
কার কণ্ঠহার হ'তে সোনার ছটায়
চারি দিকে ঝলমল শারদ-কিরণ!
প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে লুটায়
কাহার অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন!
কাহার মঞ্জুল হাসি, সুগন্ধ নিশ্বাস
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।
ওকি রাজহংসরব, ওই কলভাষ?
নহে গো, বাজিছে অঙ্গে কঙ্কণ কিঙ্কিনী।
ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য-কৈলাস,
আসিছেন এ বঙ্গের আনন্দ-রূপিণী।

মালতী পুঁথি

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন

প্রথম সর্গ

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন
দুর্বল হৃদয় লয়ে লভেছি জনম,
আশ্রয় না পেলে কিছু, হৃদয় আমার
অবসন্ন হয়ে পড়ে লতিকার মতো।
স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ না হইলে
কাঁদে ভূমিতলে পড়ে হয়ে ম্রিয়মাণ।
তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো আমারে।
ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে করিলে নিক্ষেপ;
যেখানে সবারি হৃদি যন্ত্রের মতন;
স্নেহ প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয়
কঠোর নিয়মে যেথা হয় নিয়মিত।
কেন আমি হলেম না কৃষক-বালক,
ভায়ে ভায়ে মিলে মিলে করিতাম খেলা,
গ্রামপ্রান্তে প্রান্তরের পর্ণের কুটিরে
পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিলিয়া
স্বাভাবিক হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে,
মুক্ত ওই প্রান্তরের বায়ুর মতন
হৃদয়ের স্বাধীনতা করিতাম ভোগ।
শ্রান্ত হলে খেলা-সুখে সন্ধ্যার সময়ে
কুটিরে ফিরিয়া আসি ভালোবাসি যারে
তার স্নেহময় কোলে রাখিতাম মাথা,
তা হইলে দ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদ
মুহূর্তে মুহূর্তে আর হত না সহিতে।
হৃদয়বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর
গর্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল
কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম
ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তরে।
দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটোখাটো নিভৃত কুটির
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ রাশি রাশি,
কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব
কভু বা দেখিছে চাহি বাৎসল্য-নয়নে
ক্রীড়াশীল কুটিরের শিশুদের দিকে।
কুটিরের বধূগণ উঠিয়া প্রভাতে
আপনার আপনার কাজে আছে রত।

সে ক্ষুদ্র কুটির আর ভাঙাচোরা পথ,
দিগন্তের পদতলে বিশাল প্রান্তর
... যৌবনময় হৃদয়ে যাহার
... তৃণফুল শুকায় নিভৃতে
ছবি দেখে কল্পনার স্বপ্নের মতন
তা হইলে মধুময় কবিতার মতো
কেমন আরামে যেত জীবন কাটিয়া।

এমন হৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে
একজন ছিল মোর প্রেমের প্রতিমা,
অমিয়া, সে বালিকারে কত ভালোবাসি।
দিগন্তের দূর প্রান্তে ঘুমন্ত চন্দ্রমা,
ধবল জলদ জালে, আধো আধো ঢাকা—
বালিকা তেমনি আহা মধুর কোমল।
সেই বালা দয়া করি হৃদয় আমার
রেখেছিল জুড়াইয়া স্নেহের ছায়ায়।
অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমিসম
স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সংগীত, কবিতা,
স্বর্গ, সে তো তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে
সে হৃদয়ে স্নেহছায়ে দিলে গো আশ্রয়
পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গো গলিয়া!
কেহই আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া!
জননী, ভগ্নীর মতো বেসেছিলে ভালো
সে কি আর এ জনমে পারিব ভুলিতে?
বিষণ্ণ কাতর এক বালকের 'পরে
সে যে কী স্নেহের ধারা করেছ বর্ষণ
চিরকাল হৃদয়ে তা রহিবে মুদ্রিত।
ওই স্নেহময় কোলে রাখি শ্রান্ত মাথা
কাতর হইয়া কত করেছি রোদন
কত-না ব্যথিত হয়ে আদরে যতনে
অঞ্চলে সে অশ্রুজল দিয়াছ মুছায়ে।
কবিতা লিখিলে ছুটে ওই কোলে গিয়া
ওই গলা ধরে তাহা শুনাতাম কত
বাল্যহৃদয়ের মোর যত ছিল কথা
তোমার কাছেতে কিছু করি নি গোপন।
ওই স্নেহময় কোল ছিল স্বর্গ মোর

সেইখানে একবার মুখ লুকাইলে
সব শ্রান্তি সব জ্বালা যেত দূর হয়ে।
শ্রান্ত শিশুটির মতো ওই কোলে যবে
নীরবে নিষ্পন্দ হয়ে রহিতাম শুয়ে
অনন্ত স্নেহেতে পূর্ণ আনত নয়নে
কেমন মুখের পানে চাহিয়া রহিতে
তখন কী হর্ষে হৃদি যাইত ফাটিয়া!
কতবার করিয়াছি কত অভিমান,
আদরেতে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদেছি কতই।

এসো আজি সখা

এসো আজি সখা বিজন পুলিনে
বলিব মনের কথা;
মরমের তলে যা-কিছু রয়েছে
লুকানো মরম-ব্যথা।
সুচারু রজনী, মেঘের আঁচল
চাপিয়া অধরে হাসিছে শশি,
বিমল জোছনা সলিলে মজিয়া
আঁধার মুছিয়া ফেলেছে নিশি,
কুসুম কাননে বিনত আননে
মুচকিয়া হাসে গোলাপবালা,
বিষাদে মলিনা, শরমে নিলীনা,
সলিলে দুলিছে কমলিনী বধূ
স্নানরূপে করি সরসী আলা!
আজি, খুলিয়া ফেলিব প্রাণ
আজি, গাইব কত কী গান,
আজি, নীরব নিশীথে, চাঁদের হাসিতে
মিশাব অফুট তান!
দুই হৃদয়ের যত আছে গান
এক সাথে আজি গাইব,
দুই হৃদয়ের যত আছে কথা
দুইজনে আজি কহিব;
কতদিন সখা, এমন নিশীথে
এমন পুলিনে বসি,
মানসের গীত গাহিয়া গাহিয়া
কাটাতে পাই নি নিশি।
স্বপনের মতো সেই ছেলেবেলা
সেইদিন সখা মনে কি হয়?
হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো
প্রকৃতি আছিল কবিতাময়,

কী সুখে কাটিত পূরণিমা রাত
এই নদীতীরে আসি,
[কু]সুমের মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া
গনিয়া তারকারাশি।
যমুনা সুমুখে যাইত বহিয়া
সে যে কী সুখের গাইত গান,
ঘুম ঘুম আঁখি আসিত মুদিয়া
বিভল হইয়া যাইত প্রাণ!
[কত] যে সুখের কল্পনা আহা
আঁকিতাম মনে মনে
[সা]রাটি জীবন কাটাইব যেন

...

তখন কি সখা জানিতাম মনে
পৃথিবী কবির নহে
কল্পনা যার যতই প্রবল
ততই সে দুখ সহে!

এমন পৃথিবী, শোভার আকর
পাখি হেথা করে গান
কাননে কাননে কুসুম ফুটিয়া
পরিমল করে দান!

আকাশে হেথায় উঠে গো তারকা
উঠে সুধাকর, রবি,
বরন বরন জলদ দেখিছে
নদীজলে মুখছবি,
এমন পৃথিবী এও কারাগার
কবির মনের কাছে!
যে দিকে নয়ন ফিরাইতে যায়
সীমায় আটক আছে!
তাই [যে] গো সখা মনে মনে আমি
গড়েছি একটি বন,
সারাদিন সেথা ফুটে আছে ফুল,
গাইছে বিহগগণ।
আপনার ভাবে হইয়া পাগল
রাতদিন সুখে আছি গো সেথা
বিজন কাননে পাখির মতন
বিজনে গাইয়া মনের ব্যথা!
কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে,
ভুলেছি মরমজ্বালা;

দুজনে মিলিয়া সুখের কাননে
গাঁথিব কুসুমমালা!
দুজনে মিলিয়া পূরণিমা রাতে
গাইব সুখের গান
যমুনা পুলিনে করিব দুজনে
সুখ নিশা অবসান,
আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে
লইব তোমার মন
হৃদয়ের খেলা খেলিয়া খেলিয়া
কাটাইব সারাক্ষণ!
এইরূপে সখা কবিতার কোলে
পোহায়ে যাইবে প্রাণ
সুখের স্বপন দেখিয়া দেখিয়া
গাহিয়া সুখের গান।

পার কি বলিতে কেহ

পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে
যখনি শুনি গো ধীর সংগীতের ধ্বনি
যখনি দেখি গো ধীর প্রশান্ত রজনী
কত কী যে কথা আর কত কী যে ভাব
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া আলোড়িয়া উঠে!
দূরাগত রাখালের বাঁশরির মতো
আধভোলা কালিকার স্বপ্নের মতন—
কী যে কথা কী যে ভাব ধরি ধরি করি
তবুও কেমন ধারা পারি না ধরিতে!
কী করি পাই না খুঁজি পাই না ভাবিয়া,
ইচ্ছা করে ভেঙেচুরে প্রাণের ভিতর
যা-কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা।

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু
মূরতি দেবতাসম অপরূপ স্বজনি,
ভেবেছিনু মনে মনে, প্রণয়ের চন্দ্রলোকে
খেলিব দুজনে মিলি দিবস ও রজনী,
আজ সখি একেবারে, ভেঙেছে সে ঘুমঘোর
ভেঙেছে সাধের ভুল মাখানো যা মরমে,
দেবতা ভাবিনু যারে, তার কলঙ্কের কথা
শুনিয়া মলিন মুখ ঢাকিয়াছি শরমে।

তাই ভাবিয়াছি সখি, এই হৃদয়ের পটে
এঁকেছি যে ছবিখানি অতিশয় যতনে,
অশ্রুজলে অশ্রুজলে, মুছিয়া ফেলিব তাহা,
আর না আনিব মনে, এই পোড়া জনমে।—
কিন্তু হা— বৃথা এ আশা, মরমের মরমে যা।
আঁকিয়াছি সযতনে শোণিতের আখরে,
এ জনমে তাহা আর, মুছিবে না, মুছিবে না,
আমরণ রবে তাহা হৃদয়ের ভিতরে!
আমরণ কেঁদে কেঁদে, কাটিয়া যাইবে দিন,
নীরব আগুনে মন পুড়ে হবে ছাই লো!
মনের এ কথাগুলি গোপনে লুকায়ে রেখে
কতদিন বেঁচে রব ভাবিতেছি তাই লো!

আমার এ মনোজ্বালা

আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে
কেন যে এমন করে, ম্রিয়মাণ হয়ে থাকি
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে।
এ যাতনা কেহ যদি বুঝিতে পারিত দেবি,
তবে কি সে আর কভু পারিত গো হাসিতে?
হৃদয় আছয়ে যার সঁপিতে পারে সে প্রাণ
এ জ্বলন্ত যন্ত্রণার এক তিল নাশিতে!
হে সখী হে সখাগণ, আমার মর্মের জ্বালা
কেহই তোমরা যদি না পার গো বুঝিতে,
কী আগুন জ্বলে তার নিভৃত গভীর তলে
কী ঘোর ঝটিকা সনে হয় তারে যুঝিতে।
তবে গো তোমরা মোরে শুধায়ো না শুধায়ো না
কেন যে এমন করে রহিয়াছি বসিয়া
বিরলে আমারে হেথা, একলা থাকিতে দাও,
[আমা]র মনের কথা বুঝিবে কী করিয়া?
[ম্রিয়]মাণ মুখে, এই শূন্যপ্রায় নেত্রে
[ক]লঙ্ক সঁপি গো আমি তোমাদের হরষে;
পূর্ণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায়
ক্ষুদ্র এক অন্ধকার জলদের পরশে।
কিন্তু কী করিব বলো, কী চাও কী দিব আমি
তোমাদের আমোদ গো এক তিল বাড়াতে
হৃদয়ে এমন জ্বালা, কী করে হাসিব বলো
কিছুতে বিষণ্ণভাব পারি না যে তাড়াতে।
বিরক্ত হোয়ো না সখি, অমন বিরক্ত নেত্রে
আমার মুখের পানে রহিয়ো না চাহিয়া,
কী আঘাত লাগে প্রাণে, দেখি ও বিরক্ত মুখ

কেমনে সখি গো তাহা বুঝাইব কহিয়া?
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা, যদি গো শুধাতে কথা
অশ্রুজলে মিশাইতে যদি অশ্রুজল
আদরে স্নেহের স্বরে, একটি কহিতে কথা,
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল
জানিতাম ওগো সখি, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে এ কী নিদারুণ?
চরণে ধরি গো সখি, একটু করিয়ো দয়া
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন!

...

উপহার-গীতি

ছেলেবেলা হতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।
আজো গাঁথিয়াছি মালা, তুলিয়া বনের ফুল
তোমারি চরণে সখি দিব গো পরায়ে—
না-হয় ঘৃণার ভরে, দলিয়ো চরণতলে
হৃদয় যেমন করে দলেছ দুপায়ে।
পৃথিবীর নিন্দাযশে, কটাক্ষ করি না বালা
তুমি যদি সোহাগেতে করহ গ্রহণ
আমার সর্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি
পৃথিবীর তরে আমি করি নি গ্রন্থন।
আমি যে-সকল গান গাই গো মনের সুখে
সপ্তসুরে পূর্ণ করি এ শূন্য আকাশ
পৃথিবীর আর কেহ, শুনুক বা না শুনুক
তুমি যেন শুন বালা, এই অভিলাষ!
তোমার লাগিবে ভালো, তুমি গো বলিবে ভালো,
গলাবে তোমারি মন এ সংগীত 'ধ্বনি
আমার মর্মের কথা, তুমিই বুঝিবে সখি
আর কেহ না বুঝুক খেদ নাহি গণি
একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভালো
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপনসম, সেদিন গেল গো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্মের রোদনধ্বনি
স্পর্শও করে না আজ তোমার অন্তরে।

তবুও— তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্ন হৃদয়ের এই প্রীতি-উপহার।

বাড়িতে ১লা কার্তিক মঙ্গলবার

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?
মর্মভেদী যন্ত্রণায়, ফিরেও যে নাহি চায়
বুক ফেটে গেলেও যে কথা নাহি কয়
প্রাণ দিয়ে সাধিলেও, পায়ে ধরে কাঁদিলেও
এক তিল এক বিন্দু দয়া নাহি হয়
হেরিলে গো অশ্রুরাশি, বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরস্কার তীব্র বিষময়।
এত যদি ছিল মনে, তবে বলো কী কারণে
একদিন তুলেছিল স্বর্গের আলয়
একদিন স্নেহভরে, মাথা রাখি কোল-'পরে
কেন নিয়েছিল হরে পরান হৃদয়
ভগ্নবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার
মনখানা নিয়ে যেন করে ছেলেখেলা—
গিয়াছে যা ভেঙেচুরে, আর কেন তার পরে
মিছামিছি বিঁধে আহা বাণ বিষময়!

ভেবেছি কাহারো সাথে

ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর
কারো কাছে বর্ষিব না অশ্রুবারিধার।
মানুষ পরের দুখে, করে শুধু উপহাস
জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বার
যাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হলে
যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার
তারাই— তারাই যদি এত গো নিষ্ঠুর হল
তবে আমি হতভাগ্য কী করিব আর!
সত্য তুমি হও সাক্ষী, ধর্ম তুমি জেনো ইহা
ঈশ্বর! তুমিই শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
যার তরে কেঁদে মরি, সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।

হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার

হারে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার
যারে যত ভালোবাসি, যার তরে কাঁদে প্রাণ
হৃদয়ে আঘাত দেয় সেই বারে বার—
যারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন
সেই এ হৃদয় করিয়াছে চুরমার
যারেই বেসেছি ভালো, সেই চিরকাল-তরে
পৃথিবীর কাছে দুঃখ পেয়েছে অপার।
হান বিধি হান বজ্র, আমার এ ভগ্নহৃদে
তিলেক বাঁচিতে নাই বাসনা আমার
প্রস্তরে গঠিত এই, হৃদয়বিহীন ধরা
হেথা কত কাল বলো বেঁচে রব আর।

ও কথা বোলো না সখি

ও কথা বোলো না সখি— প্রাণে লাগে ব্যথা—
আমি ভালোবাসি নাকো এ কিরূপ কথা।
কী জানি কী মোর দশা কহিব কেমনে
প্রকাশ করিতে নারি রয়েছে যা মনে—
পৃথিবী আমারে সখি চিনিল না তাই—
পৃথিবী না চিনে মোরে তাহে ক্ষতি নাই—
তুমিও কি বুঝিলে না এ মর্মকাহিনী
তুমিও কি চিনিলে না আমারে স্বজনি?

কী হবে বলো গো সখি

কী হবে বলো গো সখি ভালোবাসি অভাগারে
যদি ভালোবেসে থাক ভুলে যাও একেবারে—
একদিন এ হৃদয়— আছিল কুসুমময়
চরাচর পূর্ণ ছিল সুখের অমৃতধারে
সেদিন গিয়েছে সখি আর কিছু নাই
ভেঙে পুড়ে সব যেন হয়ে গেছে ছাই
হৃদয়-কবরে শুধু মৃত ঘটনার
...[র]য়েছে পড়ে স্মৃতি নাম যার।

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়?
সুখ-আশা থাকে যদি বেসো না আমায়!
এ জীবন, অভাগার— নয়ন সলিলধার
বলো সখি কে সহিতে পারিবে তা হায়!
এ ভগ্ন প্রাণের অতি বিষাদের গান
বলো সখি কে শুনিতে পারে সারা প্রাণ
গেছি ভুলে ভালোবাসা— ছাড়িয়াছি সুখ-আশা
ভালোবেসে কাজ নাই স্বজনি আমায়!

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না
ছেড়েছি ছেড়েছি নাথ তব প্রেম-কামনা—
এক ভিক্ষা মাগি হায়— নিরাশ কোরো না তায়
শেষ ভিক্ষা শেষ আশা— অন্তিম বাসনা—
এ জন্মের তরে সখা— আর তো হবে না দেখা
তুমি সুখে থেকো নাথ কী কহিব আর
একবার বোসো হেথা ভালো করে কও কথা
যে নামে ডাকিতে সখা ডাকো একবার—
ওকি সখা কেঁদোনাকো— দুখিনীর কথা রাখো
আমি গেলে বলো নাথ— কী ক্ষতি তাহার?
যাই সখা যাই তবে— ছাড়ি তোমাদের সবে—
সময় আসিছে কাছে বিদায় বিদায়—

রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

সংযোজন

সন্ধ্যা

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।
আমার ব্যথার তুই ব্যথী,
তুই মোর একমাত্র সাথী,
সন্ধ্যা তুই আমার আলয়,
তোরে আমি বড়ো ভালোবাসি—
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
তোর কোলে ঘুমাইতে আসি,
তোর কাছে ফেলি রে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনোকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুনিতে গুনিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর!
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখপানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!
তাই তোরে ডাকি একবার
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার,
তোর বুকে লুকাইয়া মাথা
তোর কোলে ঘুমাইতে চায়,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।

আঁধার আঁচল দিয়ে তোর
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ,
বল তারে ঘুমাইতে বল
কপালেতে হাতখানি রাখ,
জগতেরে ক'রে দে আড়াল,
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
র'চে দে নিভৃত অন্তঃপুর।
তা হলে সে কাঁদিবে বসিয়া,
কল্পনার খেলেনা গড়িবে,
খেলিয়া আপন মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে
আপনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুমঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধো গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিনশ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে।
ভাঙা ভাঙা গানগুলি মিলিয়া হৃদয়-মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা,
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
আন তোর স্বর্ণ মেঘজাল,
পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে
খেলিবি মেঘের ইন্দ্রজাল।
ওই তোর ভাঙা মেঘগুলি,
হৃদয়ের খেলেনা আমার,
ওইগুলি কোলে করে নিয়ে
সাধ যায় খেলি অনিবার।
ওই তোর জলদের 'পর
বাঁধি আমি কত শত ঘর!
সাধ যায় হোথায় লুটাই,

অস্তগামী রবির মতন,
লুটায়ে লুটায়ে পড়ি শেষে
সাগরের ওই প্রান্তদেশে
তরল কনক নিকেতন!
ছোটো ছোটো ওই তারাগুলি,
ডাকে মোরে আঁখি-পাতা খুলি।
স্নেহময় আঁখিগুলি যেন
আছে শুধু মোর পথ চেয়ে,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি বসি
কহে যেন গান গেয়ে গেয়ে,
'কবে তুমি আসিবে হেথায়
অন্ধকার নিভৃত-নিলয়ে,
জগতের অতি প্রান্তদেশে
প্রদীপটি রেখেছি জ্বালায়ে!
বিজনেতে রয়েছি বসিয়া
কবে তুমি আসিবে হেথায়!'
সন্ধ্যা হলে মোর মুখ চেয়ে
তারাগুলি এই গান গায়!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান গাই

গুরুভার মন লয়ে কত বা বেড়াবি ব'য়ে?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয়-'পরে মিলিবে মুহূর্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই?
'কেহ না, কেহ না!'

সংসারে যে দিকে ফিরে চাই
এমন কি কেহ তোর নাই—
তোর দিন শেষ হলে, স্মৃতিখানি লয়ে কোলে,
শোয়াইয়া বিষাদের কোমল শয়নে,
বিমল শিশির-মাখা প্রেম-ফুলে দিয়ে ঢাকা
চেয়ে রবে আনত নয়নে?
হৃদয়েতে রেখে দিবে তুলে,
প্রতিদিন ঢেকে দিবে ফুলে,

মনোমাঝে প্রবেশিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে
বৃন্ত-ছিন্ন প্রেম-ফুলগুলি
রাখিবেক জিয়াইয়া তুলি?
এমনকি কি কেহ তোর নাই?
'কেহ না, কেহ না।'

প্রাণ তুই খুলে দিলি ভালোবাসা বিলাইলি
কেহ তাহা তুলে না লইল,
ভূমিতলে পড়িয়া রহিল;
ভালোবাসা কেন দিলি তবে
কেহ যদি কুড়ায়ে না লবে?
কেন সখা কেন?
'জানি না, জানি না।'

বিজনে বনের মাঝে ফুল এক আছে ফুটে
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'ফুল, তুই এ আঁধারে পরিমল দিস কারে,
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখন পড়িবি তুই ঝরে,
শুকাইয়া দলগুলি ধূলিতে হইবে ধূলি,
মনে কি করিবে কেহ তোরে!
তবে কেন পরিমল ঢেলে দিস অবিরল
ছোটো মনখানি ভ'রে ভ'রে?
কেন, ফুল, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না!'

সখা, তুমি গান গাও কেন?
কেহ যদি শুনিতে না চায়?
ওই দেখো পথমাঝে যে যাহার নিজ কাজে
আপনার মনে চলে যায়।
কেহ যদি শুনিতে না চায়
কেন তবে, কেন গাও গান,
আকাশে ঢালিয়া দাও প্রাণ?
গান তব ফুরাইবে যবে,
রাগিণী কারো কি মনে রবে?
বাতাসেতে স্বরধার খেলিয়াছে অনিবার,
বাতাসে সমাধি তার হবে।
কাহারো মনেও নাহি রবে,
কেন সখা গান গাও তবে?
কেন, সখা, কেন?
'জানি না, জানি না।'

বিজন তরুর শাখে একাকি পাখিটি ডাকে,
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'পাখি তুই এ আঁধারে গান শুনাইবি কারে?
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখনি ফুরাবে তোর প্রাণ,
যখনি থামিবে তোর গান,
বন ছিল যেমন নীরবে,
তেমনি নীরব পুন হবে।
যেমনি থামিবে গীত, অমনি সে সচকিত
প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাবে,
তোর গান তোরি সাথে যাবে!
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ,
তবে, পাখি, কেন গাস গান?
কেন, পাখি, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না!'

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান শুনাই

এসো সখি, এসো মোর কাছে,
কথা এক শুধাবার আছে!
চেয়ে তব মুখপানে ব'সে এই ঠাঁই—
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই,
বুঝিতে কি পার সখি কেন যে তা গাই?
শুধু কি তা পশে কানে? কথাগুলি তার
কোথা হতে উঠিতেছে ভাবো একবার?
বুঝ না কি হৃদয়ের
কোন্‌খানে শেল ফুটে
তবে প্রতি কথাগুলি
আর্তনাদ করি উঠে!
যখন নয়নে উঠে বিন্দু অশ্রুজল,
তখন কি তাই তুই দেখিস কেবল?
দেখ না কি কী সমুদ্র হৃদয়েতে উথলিছে,
শুধু কণামাত্র তার আঁখিপ্রান্তে বিগলিছে!
যখন একটি শুধু উঠে রে নিশ্বাস,
তখন কি তাই শুধু শুনিবারে পাস?
শুনিস না কী ঝটিকা হৃদয়ে বেড়ায় ছুটে
একটি উচ্ছ্বাস শুধু বাহিরেতে ফুটে।
যে কথাটি বলি আমি শোনো শুধু তাই?
শোনো না কি যত কথা বলা হইল না?
যত কথা বলিবারে চাই?

আমি কি শুনাই গান
ভালো মন্দ করিতে বিচার?
যবে এ নয়ন হতে বহে অশ্রুধার—
শুধু কি রে দেখিবি তখন
সে অশ্রু উজ্জ্বল কি না হীরার মতন?
আমার এ গান তোরে যখন শুনাই
নিন্দা বা প্রশংসা আমি কিছু নাহি চাই—
যে হৃদি দিয়েছি তোরে
তাই তোরে দেখাবারে চাই,
তারি ভাষা বুঝাবারে চাই,
তারি ব্যথা জানাবারে চাই,
আর কিবা চাই?
সেই হৃদি দেখিলি যখন,
তারি ভাষা বুঝিলি যখন,
তারি ব্যথা জানিলি যখন
তখন একটি বিন্দু অশ্রুবারি চাই!
(আর কিবা চাই!)

আয় সখি কাছে মোর আয়,
কথা এক শুধাব তোমায়—
এত গান শুনালেম এত অনুরাগে
কথা তার বুকে কি লো লাগে?
একটি নিশ্বাস কি লো জাগে?
কথা শুধু শুনিয়া কি যাস?
ভালো মন্দ বুঝিস কেবল?
প্রাণের ভিতর হতে
উঠে না একটি অশ্রুজল?

প্রকাশকাল : ১২৮৮

বিষ ও সুধা

অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
দিবসের অন্ধকার সমাধির 'পরে
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
সাবধানে অতি ধীরে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন-পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।

ভগ্ন দেবালয়খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে তার ছায়ি জীর্ণ দেহ
বট অশত্থের গাছ জড়াজড়ি করি
আঁধারিয়া রাখিয়াছে ভগন হৃদয়,
দুয়েকটি বায়ূচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক,
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি!
শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
হে তটিনী, ও কি গান গাইতেছ তুমি!
দিন নাই, রাত্রি নাই, এক তানে শুধু
এক সুরে এক গান গাইছ সতত—
এত মৃদুস্বরে ধীরে, যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় পাছে!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনে মনে হয়
এ হৃদি-গানেরি যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কী এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে।
এসো স্মৃতি, এসো তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে—
সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মিরেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢালো এ হৃদে অতীত-স্বপন!
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!
যাহা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
সমস্ত মালতীময়— মালতী কেবল
শৈশবকালের মোর স্মৃতির প্রতিমা।
দুই ভাই বোনে মোরা আছিনু কেমন!
আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি,
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি।
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব-তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী,
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মতো
শরম-সৌন্দর্যভরে ম্রিয়মাণ-পারা।
আছিল সে প্রভাতের ফুলের মতন,
প্রশান্ত হরষে সদা মাখানো মুখানি;
সে হাসি গাহিত শুধু উষার সংগীত—
সকলি নবীন আর সকলি বিমল।

মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে।
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি।
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া।
এমনি আসিত সন্ধ্যা; শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিলসিক্ত সায়াহ্ন-অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ চরণে
ছোটো ছোটো তারাগুলি দিত ফুটাইয়া,
নন্দনবনের যেন চাঁপা ফুল দিয়ে
ফুলশয্যা সাজাইত সুরবালাদের।
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা;
সন্ধ্যার সংগীতস্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব-কবিতা।
হর্ষময় গর্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন মধুর গর্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটির আছিল আমাদের,
নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি
শান্ত কুটিরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটিরের স্বপন রচনা।
দুই জনে ছিনু মোরা কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে।
যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে।
কত জোছনার রাত্রে মিলি দুই জনে
ভ্রমিতাম যমুনার পুলিনে পুলিনে,
মনে হত এ রজনী পোহাতে চাবে না,
সহসা কোকিল-রব শুনিয়া উষায়,
সহসা যখনি শ্যামা গাহিয়া উঠিত,
চমকিয়া উঠিতাম, কহিতাম মোরা,
'এ কী হল! এরি মধ্যে পোহাল রজনী!'
দেখিতাম পূর্ব দিকে উঠেছে ফুটিয়া
শুকতারা, রজনীর বিদায়ের পথে,

প্রভাতের বায়ু ধীরে উঠিছে জাগিয়া,
আসিছে মলিন হয়ে আঁধারের মুখ।
তখন আলয়ে দোঁহে আসিতাম ফিরি,
আসিতে আসিতে পথে শুনিতাম মোরা
গাইছে বিজনকুঞ্জে বউ-কথা-কও।
ক্রমশ বালককাল হল অবসান,
নীরদের প্রেমদৃষ্টে পড়িল মালতী,
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে;
দেখিতাম মালতীর শান্ত সে হাসিতে
কুটিরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে!

সঙ্গীহারা হয়ে আমি ভ্রমিতাম একা,
নিরাশ্রয় এ-হৃদয় অশান্ত হইয়া
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে।
কোথাও পেত না যেন আরাম বিশ্রাম।
অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
সহসা স্বপন ভাঙি উঠিত চমকি।
সহসা পেত না ভেবে, পেত না খুঁজিয়া
আগে কী ছিল রে যেন এখন তা নাই।
প্রকৃতির কি যেন কী গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার,
সেই ছন্দে কী কথার পড়েছে অভাব—
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া,
হৃদয় সহসা তাই উঠিত চমকি।
জানি না কিসের তরে, কী মনের দুখে
দুয়েকটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি।
শিখর হতে শিখরে, বন হতে বনে,
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি—
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম, কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি!

একদিন নবীন বসন্ত-সমীরণে
বউ-কথা-কও যবে খুলেছে হৃদয়,
বিষাদে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কী ভাব
প্রাণের ভিতরে যবে রয়েছে ঘুমায়ে,
দেখিনু বালিকা এক, নির্ঝরের ধারে
বনফুল তুলিতেছে আঁচল ভরিয়া।

দুপাশে কুন্তলজাল পড়েছে এলায়ে,
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ।
কাছেতে গেলাম তার, কাঁটা বাছি ফেলি
কানন-গোলাপ তারে দিলাম তুলিয়া।
প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী
তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,
কহিতাম বালিকারে কত কী কাহিনী,
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভু,
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া।
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কী।
কভু বা ভ্রূকুটি করি রহিত বসিয়া,
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পলায়ে,
অলীক শরমে কভু হইত অধীর।
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, শরমে, সংকোচে,
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ!
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া।
একদিন সে-বালিকা না আসিত যদি
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেত না কাটিয়া—
দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ-চরণে!
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া,
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী,
প্রভাতে অলসভাবে, বসি তরুতলে,
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়
'দামিনী, তুমি কি মোরে ভালোবাস বালা?'
অলীক-শরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া
ছুটে সে পলায়ে গেল দূর বনান্তরে—
জানি না কী ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
'ভালোবাসি— ভালোবাসি—' কহিয়া অমনি
শরমে-মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে।
এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন খেলা খেলি।
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা,
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে—
কিন্তু জানিতাম কি রে এই ভালোবাসা
দুদিনের ছেলেখেলা, আর কিছু নয়?
কে জানিত প্রভাতের নবীন কিরণে
এমন শতেক ফুল উঠে রে ফুটিয়া
প্রভাতের বায়ু সনে খেলা সাঙ্গ হলে
আপনি শুকায়ে শেষে ঝরে পড়ে যায়—
ওই ফুলে থুয়েছিনু হৃদয়ের আশা,
ওই কুসুমের সাথে খসে পড়ে গেল।

আর কিছুকাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে।
'দামিনী, মনে কি পড়ে সে দিনের কথা?
বলো দেখি কত দিন ওই মুখখানি
দেখি নি তোমার? তাই দেখিতে এয়েছি!
জোছনার রাত্রে যবে বসেছি কাননে,
দুয়েকটি তারা কভু পড়িছে খসিয়া,
হৃতবুদ্ধি দুয়েকটি পথহারা মেঘ
অনন্ত আকাশ-রাজ্যে ভ্রমিছে কেবল,
সে নিস্তব্ধ রজনীতে হৃদয়ে যেমন
একে একে সব কথা উঠে গো জাগিয়া,
তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি
স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো
ওই মুখখানি তব দেখিনু যেমনি
একে একে পুরাতন সব স্মৃতিগুলি
জীবন্ত হইয়া যেন জাগিল হৃদয়ে।
মনে আছে সেই সখি আর-এক দিন
এমনি গম্ভীর সন্ধ্যা, এই নদীতীর,
এইখানে এই হাত ধরিয়া তোমার
কাতরে কহেছি আমি নয়নের জলে,
'বিদায় দাও গো এবে চলিনু বিদেশে,
দেখো সখি এত দিন বাসিয়াছ ভালো,
দুদিন না দেখে যেন যেয়ো না ভুলিয়া!
সংসারের কর্ম হতে অবসর লয়ে
আবার ফিরিয়া যবে আসিব দামিনী,
নব-অতিথির মতো ভেবো না আমারে
সম্ভ্রমের অভিনয় কোরো না বালিকা!'
কিছুই উত্তর তার দিলে না তখন,
শুধু মুখপানে চেয়ে কাতর নয়নে
ভর্ৎসনার অশ্রুজল করিলে বর্ষণ।
যেন এই নিদারুণ সন্দেহের মোর
অশ্রুজল ছাড়া আর নাইকো উত্তর!
আবার কহিনু আমি ওই মুখ চেয়ে,
'কে জানে মনের মধ্যে কী হয়েছে মোর
আশঙ্কা হতেছে যেন হৃদয়ে আমার
ওই স্নেহ-সুধামাখা মুখখানি তোর
এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
নীরব গম্ভীর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
সমস্ত জগৎ যেন দিল প্রতিধ্বনি
'এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
গম্ভীর নিশীথে যথা আধো ঘুমঘোরে

সুদূর শ্মশান হতে মরণের রব
শুনিলে হৃদয় উঠে কাঁপিয়া কেমন,
তেমনি বিজন সেই তটিনীর তীরে
একাকী আঁধারে যেন শুনিনু কী কথা,
সমস্ত হৃদয় যেন উঠিল শিহরি!
আর বার কহিলাম, 'বিদায়—ভুলো না।'
তখন কি জানিতাম এই নদীতীরে
এই সন্ধ্যাকালে আর তোমারি সমুখে
এমনি মনের দুখে হইবে কাঁদিতে?
তখনো আমার এই বাল্যজীবনের
প্রভাত-নীরদ হতে নব-রক্তরাগ
যায় নি মিলায়ে সখি, তখনো হৃদয়
মরীচিকা দেখিতেছিল দূর শূন্যপটে।
নামিনু সংসারক্ষেত্রে যুঝিনু একাকী,
যাহা কিছু চাহিলাম পাইনু সকলি।
তখন ভাবিনু যাই প্রেমের ছায়ায়
এতদিনকার শ্রান্তি যাবে দূর হয়ে।
সন্ধ্যাকালে মরুভূমে পথিক যেমন
নিরখিয়া দেখে যবে সম্মুখে পশ্চাতে
সুদূরে দেখিতে পায় প্রান্ত দিগন্তের
সুবর্ণ জলদজালে মণ্ডিত কেমন,
সে-দিকে তারকাগুলি চুম্বিছে প্রান্তর,
সায়াহ্নবালার সেথা পূর্ণতম শোভা,
কিন্তু পদতলে তার অসীম বালুকা
সারাদিন জ্বলি জ্বলি তপন-কিরণে
ফেলিছে সায়াহ্নকালে জ্বলন্ত নিশ্বাস।
তেমনি এ সংসারের পথিক যাহারা
ভবিষ্যৎ অতীতের দিগন্তের পানে
চাহি দেখে স্বর্গ সেথা হাসিছে কেবল
পদতলে বর্তমান মরুভূমি সম।
স্মৃতি আর আশা ছাড়া সত্যকার সুখ
মানুষের ভাগ্যে সখি ঘটে নাকো বুঝি!
বিদেশ হইতে যবে আইসে ফিরিয়া
অতি হতভাগা যেও সেও ভাবে মনে
যারে যারে ভালোবাসে সকলেই বুঝি
রহিয়াছে তার তরে আকুল-হৃদয়ে!
তেমনি কতই সখি করেছিনু আশা,
মনে মনে ভেবেছিনু কত-না হরষে
দামিনী আমার বুঝি তৃষিতনয়নে
পথপানে চেয়ে আছে আমারি আশায়।
আমি গিয়ে কব তারে হরষে কাঁদিয়া,

'মুছ অশ্রুজল সখি, বহু দিন পরে
এসেছে বিদেশ হতে ললিত তোমার'।
অমনি দামিনী বুঝি আহ্লাদে উথলি
নীরব অশ্রুর জলে কবে কত কথা।
ফিরিয়া আসিনু যবে—এ কী হল জ্বালা!
কিছুতে নয়নজল নারি সামালিতে।
ফেরো ফেরো চাহিয়ো না এ আঁখির পানে,
প্রাণে বাজে অশ্রুজল দেখাতে তোমায়!
জেনো গো রমণি, জেনো, এত দিন পরে
কাঁদিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসি নি,
এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু— এ নহে ভিক্ষার!
কখনো কখনো সখি অন্য মনে যবে
সুবিজন বাতায়নে রয়েছ বসিয়া
সম্মুখে যেতেছে দেখা বিজন প্রান্তর
হেথা হোথা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন কুটির,
হু হু করি বহিতেছে যমুনার বায়ু—
তখন কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
কখন যে জাগি উঠে পার না জানিতে!
দূরতম রাখালের বাঁশিস্বর সম
কভু কভু দুয়েকটি ভাঙা-ভাঙা সুর
অতি মৃদু পশিতেছে শ্রবণবিবরে;
আধো জেগে আধো ঘুমে স্বপ্ন আধো-ভোলা—
তেমনি কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
স্মৃতির নির্ঝর হতে অলক্ষ্যে গোপনে,
পথহারা দুয়েকটি অশ্রুবারিধারা
সহসা পড়ে না ঝরি নেত্রপ্রান্ত হতে,
পড়িছে কি না পড়িছে পার না জানিতে!
একাকী বিজনে কভু অন্যমনে যবে
বসে থাকি, কত কী যে আইসে ভাবনা,
সহসা মুহূর্ত-পরে লভিয়া চেতন
কী কথা ভাবিতেছিনু নাহি পড়ে মনে
অথচ মনের মধ্যে বিষণ্ণ কী ভাব
কেমন আঁধার করি রহে যেন চাপি,
হৃদয়ের সেই ভাবে কখনো কি সখি
সে-দিনের কোনো ছায়া পড়ে না স্মরণে?
ছেলেবেলাকার কোনো বন্ধুর মরণ
স্মরিলে যেমন লাগে হৃদয়ে আঘাত,
তেমনি কি সখি কভু মনে নাহি হয়
সে-সকল দিন কেন গেল গো চলিয়া

যে দিন এ-জন্মে আর আসিবে না ফিরি!
পুরাতন বন্ধু তারা, কত কাল আহা
খেলা করিয়াছি মোরা তাহাদের সাথে,
কত সুখে হাসিয়াছি দুঃখে কাঁদিয়াছি,
সে-সকল সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে
মিশাইয়া গেল তারা আঁধার অতীতে!

চলিনু দামিনী পুনঃ চলিনু বিদেশে—
ভাবিলাম একবার দেখিব মুখানি,
একবার শুনাইব মরমের ব্যথা,
তাই আসিয়াছি সখি, এ জনমে আর
আসিব না দিতে তব শান্তিতে ব্যাঘাত,
এ জন্মের তরে সখি কহো একবার
একটি স্নেহের বাণী অভাগার 'পরে,
ভ্রমিয়া বেড়াব যবে সুদূর বিদেশে
সে-কথার প্রতিধ্বনি বাজিবে হৃদয়ে!'

থামো স্মৃতি—থামো তুমি, থামো এইখানে,
সম্মুখে তোমার ও কি দৃশ্য মর্মভেদী?
মালতী আমার সেই প্রাণের ভগিনী,
শৈশবকালের মোর খেলাবার সাথী
যৌবনকালের মোর আশ্রয়ের ছায়া,
প্রতি দুঃখ প্রতি সুখ প্রতি মনোভাব
যার কাছে না বলিলে বুক যেত ফেটে,
সেই সে মালতী মোর হয়েছে বিধবা!
আপনার দুঃখে মগ্ন স্বার্থপর আমি
ভালো করে পারিনু না করিতে সান্ত্বনা!
নিজের চোখের জলে অন্ধ এ নয়নে
পরের চোখের জল পেনু না দেখিতে!
ছেলেবেলাকার সেই পুরানো কুটিরে
হাসিতে হাসিতে এল মালতী আমার,
সে-হাসির চেয়ে ভালো তীব্র অশ্রুজল!
কে জানিত সে-হাসির অন্তরে অন্তরে
কালরাত্রি অন্ধকার রয়েছে লুকায়ে!
একদিনো বলে নি সে কোনো দুঃখ-কথা,
একদিনো কাঁদে নি সে সমুখে আমার!
জানি জানি মালতী সে স্বর্গের দেবতা!
নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন,
পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে।

ছেলেবেলাকার সেই হাসিটি তাহার
সমস্ত আনন তার রাখিত উজ্জ্বলি,
কত-না করিত যত্ন করিত সান্ত্বনা।
হাসিতে হাসিতে কত করিত আদর!
কিন্তু হা, শ্মশানে যথা চাঁদের জোছনা
শ্মশানের ভীষণতা বাড়ায় দ্বিগুণ—
মালতীর সেই হাসি দেখিয়া তেমনি
নিজের এ হৃদয়ের ভগ্ন-অবশেষ
দ্বিগুণ পড়িত যেন নয়নে আমার!
তাহার আদর পেয়ে ভুলিনু যাতনা,
কিন্তু হায়, দেখি নাই, বিজন-শয্যায়
কত দিন কাঁদিয়াছে মালতী গোপনে!
সে যখন দেখিত, তাহার বাল্যসখা
দিনে দিনে অবসাদে হইছে মলিন,
দিনে দিনে মন তার যেতেছে ভাঙিয়া,
তখন আকুলা বালা রাত্রে একাকিনী
কাঁদিয়া দেবতা কাছে করেছে প্রার্থনা—
বালিকার অশ্রুময় সে প্রার্থনাগুলি
আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া!
দেখি নাই কত রাত্রি একাকিনী গিয়া
যমুনার তীরে বসি কাঁদিত বিরলে!
একাকিনী কেঁদে কেঁদে হইত প্রভাত,
এলোথেলো কেশপাশে পড়িত শিশির,
চাহিয়া রহিত উষা ম্লান মুখপানে!
বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক মুখ ঢাক।
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস তুই পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত।
জরজর কলেবর, আবেশে অসাড়,
শিথিল শিরার গ্রন্থি, অচেতন প্রাণ,
স্খলিত জড়িত বাণী, অবশ নয়ন,
আশা ও নিরাশা-পাকে ঘুরিছে হৃদয়,
ঘুরিছে চোখের 'পরে জগতসংসার।
এই প্রেম, এই বিষ, বজ্র-হুতাশন
কবে রে পৃথিবী হতে যাবে দূর হয়ে।

আয় স্নেহ, আয় তোর স্নিগ্ধসুধা ঢালি
এ জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দে রে নিবাইয়া।
অগ্নিময় বৃশ্চিকের আলিঙ্গন হতে,
সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে!
প্রেম-ধূমকেতু ওই উঠেছে আকাশে,
ঝলসি দিতেছে, হায়, যৌবনের আঁখি,
কোথা তুমি ধ্রুবতারা ওঠো একবার,
ঢালো এ জ্বলন্ত নেত্রে স্নিগ্ধ মৃদু জ্যোতি।
তুমি সুধা, তুমি ছায়া, তুমি জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি স্রোতস্বিনী, তুমি উষার বাতাস,
তুমি হাসি, তুমি আশা, মৃদু অশ্রুজল,
এসো তুমি এ প্রেমেরে দাও নিভাইয়া।
একটি মালতী যার আছে এ সংসারে
সহস্র দামিনী তার ধূলিমুষ্টি নয়!

ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে
যন্ত্রণা বিষাদে আসি হল পরিণত।
নিস্তরঙ্গ সরসীর প্রশান্ত হৃদয়ে
নিশীথের শান্ত বায়ু ভ্রমে গো যখন,
এত শান্ত এত মৃদু পদক্ষেপ তার
একটি চরণচিহ্ন পড়ে না সরসে,
তেমনি প্রশান্ত হৃদে প্রশান্ত বিষাদ
ফেলিতে লাগিল ধীরে মৃদুল নিশ্বাস।
নিরখিয়া নিদারুণ ঝটিকার মাঝে
হাসিময় শান্ত সেই মালতী কুসুমে
ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে।
কিন্তু হায় কে জানিত সেই হাসিময়
সুকুমার ফুলটির মর্মের মাঝারে
মরণের কীট পশি করিতেছে ক্ষয়!
হইল প্রফুল্লতর মুখখানি তার,
হইল প্রশান্ততর হাসিটি তাহার,
দিবা যবে যায় যায়, হাসিময় মেঘে
দূর আঁধারের মুখ করয়ে উজ্জ্বল—
এ হাসি তেমনি হাসি কে জানিত তাহা!
একদা পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধ গভীর
মুখপানে চেয়ে বালা, হাত ধরি মোর
কহিল মৃদুলস্বরে—'যাই তবে ভাই!'
কোথা গেলি—কোথা গেলি মালতী আমার
অভাগা ভ্রাতারে তোর রাখিয়া হেথায়!
দুঃখের কণ্টকময় সংসারের পথে
মালতী, কে লয়ে যাবে হাত ধরি মোর?

সংসারের ধ্রুবতারা ডুবিল আমার।
তেমন পূর্ণিমা রাত্রি দেখি নি কখনো,
পৃথিবী ঘুমাইতেছে শান্ত জোছনায়;
কহিনু পাগল হয়ে— 'রাক্ষসী পৃথিবী
এত রূপ তোরে কভু সাজে না সাজে না!'

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটির।
তাহার মনের ছায়া এখনো যেন রে
সে কুটিরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে!
সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি!

প্রকাশকাল : ১২৮৯

প্রভাতসংগীত

স্নেহ উপহার

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

বাব্‌লা।

আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে,
হাসিখুশি প্রাণখানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস ছুটে, আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে তুই রে উষার আলো!

দেখ্ রে প্রাণে স্নেহের মতো সাদা সাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্ রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেথেছি রে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড়ো সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভালো,
আয় রে তবে আয় রে মেয়ে দেখ্ রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচিমুখটি ঘিরে দেব ললিতরাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আসবি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়েচড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর ভাঙা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোটো দুটি হাত দিয়ে তোর গলাটি মোর ধর জড়িয়ে!

বিজন প্রাণের দ্বারে বসে করবি রে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস, সাড়া দে রে, বুকের কাছে আয় রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাবলা গাছের মতো
বড়ো বড়ো কাঁটার ভয়ে তফাত থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখি,
আমার কাঁটা-ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেই বা লতা এল কাছে, নেই বা পাখি বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাবলা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয় রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেম কত কী যে?
কথাগুলো ঠেকছে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা।

প্রকাশকাল : ১২৯০

শরতে প্রকৃতি

কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি,
কেন গো বিষাদছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে
মুখানি মলিন কেন গো?
এই যে মুহূর্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি এ কি—
মরমে বিলীন যেন গো!
কেন তনুখানি ঢাকা শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো?

ওই দেখো চেয়ে দেখো— একবার চেয়ে দেখো—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়!
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন-গোলাপগুলি
আধো আধো কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি!
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে-হাসির শিশুদুটি লতিকামণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া।
সে-হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধরপ্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।

বলো তুমি কেন তবে
এমন মলিন রবে?
বিষাদ-স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোলো খোলো
মুখখানি তোলো তোলো
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার!
বলো দেখি কারে হেরি এত হাসি তার!
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুমময়
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়!
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কী চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখখানি তোর!
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাস নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর!
নাই তোর ফুলবাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেমগান!
কী দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী!
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান?

এক-কালে ছিল তোর কুসুমিত মধুমাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ;
যৌবন-উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্মতাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল-কলি,
সর্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন।
বসন্তের ছেলেখেলা ভালো নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলংকার!
এখন যে হাসি হাসো আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা-লালসাহীন।

এত যে করিলি পণ
তবুও তো ক্ষণে ক্ষণ
সে দিনের স্মৃতিছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের 'পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরানো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনীশেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা-ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদ্রিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি!
শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস নয়ন দুটি,
রাঙা হয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুমদল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়নজল!

সুদূর আলয় হতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘগুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখপানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত, কী তপে আছিস ভোর!
এত করে সেধে সেধে
এত করে কেঁদে কেঁদে
যোগিনী, কিছুতে তবু ভাঙিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কি রে ফিরিবে না মন তোর?

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

ছবি ও গান

বিরহ

ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনকবরণী,
বকুল গাছের তলে কুসুম রাশির পরে
বসিয়া পড়িল সে রমণী,

আঁখি দিয়ে ঝরঝরে অশ্রুবারি ঝ'রে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙা রাঙা অধর দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো,
করতলে সকরুণ মুখ।
অরুণ আঁখির 'পরে, অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে কার নাম ধরে ডাকে
কেন তার সাড়া নাহি পায়।
বহিছে প্রভাত-বায় আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে কাননে সরসীতীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল।
পা দুখানি ছড়াইয়া পুরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়
গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান
যেন সব-কিছু ভুলে যায়।
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশ-মাঝে
উদাসী হইয়ে চ'লে যায়,
ব'সে ব'সে শুধু গান গায়।

কাল : ১২৯০

সিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

সখিরে— পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি।

সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে
ন আসিও তব্‌ কবহুঁ সজনিলো
হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব— বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন
বক্ষে রাখয়ি মাথ।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

২

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙব কি তুয়া পাশ!
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব
শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!

তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো
নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

কড়ি ও কোমল

শরতের শুকতারা

একাদশী রজনী
পোহায় ধীরে ধীরে—
রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
উষারে ঘিরে ঘিরে।
ক্ষীণ চাঁদ নভের
আড়ালে যেতে চায়,
মাঝখানে দাঁড়ায়ে
কিনারা নাহি পায়।
বড়ো ম্লান হয়েছে
চাঁদের মুখখানি,
আপনাতে আপনি
মিশাবে অনুমানি।
হেরো দেখো কে ওই
এসেছে তার কাছে,
শুকতারা চাঁদের
মুখেতে চেয়ে আছে।
মরি মরি কে তুমি
একটুখানি প্রাণ,
কী না জানি এনেছ
করিতে ওরে দান।
চেয়ে দেখো আকাশে
আর তো কেহ নাই,
তারা যত গিয়েছে
যে যার নিজ ঠাঁই।

সাথীহারা চন্দ্রমা
হেরিছে চারি ধার,
শূন্য আহা নিশির
বাসর-ঘর তার!
শরতের প্রভাতে
বিমল মুখ নিয়ে
তুমি শুধু রয়েছ
শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
ও হয়তো দেখিতে
পেলে না মুখ তোর!
ও হয়তো তারার
খেলার গান গায়,
ও হয়তো বিরাগে
উদাসী হতে চায়!
ও কেবল নিশির
হাসির অবশেষ!
ও কেবল অতীত
সুখের স্মৃতিলেশ!
দ্রুতপদে তাহারা
কোথায় চলে গেছে—
সাথে যেতে পারে নি
পিছনে পড়ে আছে!
কত দিন উঠেছ
নিশির শেষাশেষি,
দেখিয়াছ চাঁদেতে
তারাতে মেশামেশি!
দুই দণ্ড চাহিয়া
আবার চলে যেতে,
মুখখানি লুকাতে
উষার আঁচলেতে।
পুরবের একান্তে
একটু দিয়ে দেখা,
কী ভাবিয়া তখনি
ফিরিতে একা একা।
আজ তুমি দেখেছ
চাঁদের কেহ নাই,
স্নেহময়ি, আপনি
এসেছ তুমি তাই!
দেহখানি মিলায়
মিলায় বুঝি তার!

হাসিটুকু রহে না
রহে না বুঝি আর!
দুই দণ্ড পরে তো
রবে না কিছু হায়!
কোথা তুমি, কোথায়
চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
গরবে আসে দিন,
দুটি ছোটো প্রাণের
লিখন হবে লীন।
সুখশ্রমে মলিন
চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
কাহার রবে মনে!

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেন
করছি কেবল বক্‌বকম।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুয়োরগুলো ভেজানো,

ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
পক্ষীটি সেই ঝুপসি হয়ে
ঝিমচ্ছে রে খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে বিছেনা,
কাহার তরে কেঁদে মরে
সে কথাটা মিছে না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে প'ড়ে
নাম লেখা তায় কার গো।
এমনি তারা রবে কি রে
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই তো,
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।
বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ফুল কে আমায় দিত মেলা,
বিছেনায় কার মুখটি দেখে
সকাল হত সকালবেলা।
জল থেকে তুই আসবি কবে
মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
জোড়াসাঁকোর বাটীতে।

ইস্টিম ওই রে ফুরিয়ে এল
নোঙর তবে ফেলি অদ্য।
অবিদিত নেই তো তোমায়
রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ।
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা,
তাই খানিকটা ফোঁসফোঁসিয়ে
বিদায় হল—
রবিকাকা।

কলিকাতা
প্রকাশকাল : ১২৯৩

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

বসে বসে লিখলেম চিঠি
পুরিয়ে দিলাম চারটি পিঠই,
পেলেম না তার জবাবই
এমনি তোমার নবাবী!

দুটো ছত্র লিখবি পত্র
একলা তোমার 'রব্-কা' যে!
পোড়ারমুখী তাও হবে না
আলিস্যি তোর সব কাজে!
ঝগড়াটে নয় স্বভাব আমার
নইলে দেখতে কারখানা,
গলার চোটে আকাশ ফেটে
হয়ে যেত চারখানা,
বাছা আমার দেখতে পেতে
এই কলমের ধারখানা!

তোমার মতো এমনি মা তো
দেখি নি এ বঙ্গে গো,
মায়া দয়া যা-কিছু সে
যদিন থাকে সঙ্গে গো!
চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল
কেমনতরো ঢঙ এ গো!
তোমার প্রাণ যে পাষাণ-সম
জানি সেটা long ago!

সংসারে যে সবি মায়া
সেটা নেহাত গল্প না!
বাইরেতে এক ভিতরে এক
এ যেন কার খল-পনা!
সত্যি বলে যেটা দেখি
সেটা আমার কল্পনা!
ভেবে একবার দেখো বাছা
ফিলজফি অল্প না!

মস্ত একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
কে রেখেছে সাজিয়ে
যা করি তা কেবল 'থোড়া
জমির বাস্তে কাজিয়ে!'

বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই,
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই,
শূন্যে চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ-বাজি এ!
ফিলজফি মনের মধ্যে
ততই ওঠে গাঁজিয়ে!

দূর হোক গে, এত কথা
কেনই বলি তোমাকে!
ভরা নায়ে পা দিয়েছ,
আছ তুমি দেমাকে!

...

তোমার সঙ্গে আর কথা না,
তুমি এখন লোকটা মস্ত,
কাজ কি বাপু, এইখেনেতেই
রবীন্দ্রনাথ হলেন অস্ত।

জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাক্স
শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর।
দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে
দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!
টাকাকড়িগুলো ট্যাকশালে আছে
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন,
এবার করো বাছা ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে!
দুনিয়া শহর জমিদারি মোর,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,

বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে!
জিনিসটা অতি যৎসামান্য
রাখিস ঘরের কোণে,
বাক্সখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,
কোন্‌খেনে রবি লুকিয়ে,
কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে।
তখন যদি রে এই কাঠখানা
মনে একটুকু তোলে ঢেউ—
একবার যদি মনে পড়ে তোর
'বুজি' বলে বুঝি ছিল কেউ!
এই-যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশটা!
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কী যে এনে দিচ্ছে,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই,
ভুলে যাবার ভারি সুবিধে,
ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
যাহা পাস তারে খুবি দে!
বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
ফিলজফি হোক ছাই!
বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
বালাই নিয়ে মরে যাই!

প্রকাশকাল : ১২৯৩

চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার 'রাজহংস'। গঙ্গা

চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত।

খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে।
নাকে ঢোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে তো জানই বাছা।
আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পুব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যাবসা।
থাক্ গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।
তবে যদি নেহাত কর
খবর নিয়ে টানাটানি।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি।
দুষ্টুমি তার শোন যদি
অবাক হবে সত্যি।
এত বড়ো বড়ো কথা তার
মুখখানি একরত্তি।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্ত লোকটা।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া করবার ঝোঁকটা।

আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্তা বন্দ করি।
প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
সেইটে ভারি সন্দ করি।
সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধেতারা উঠবে।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
আগাগোড়াই মস্কারা।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
তাই এত তার আস্কারা।
চুড়ি-পরা হাত দুখানি
কতই জানে ফন্দি।
কোনোমতে তার সাথে তাই
করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
নামটি বলা হবে না।
কী জানি সে শোনে যদি
প্রাণটি আমার রবে না।
নামের খবর কে রাখে তার
ডাকি তারে যা খুশি।
দুষ্টু বলো, দস্যি বলো,
পোড়ারমুখী, রাক্কুসী।
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরি থাক্ সে।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে!
এক জনেতে নাম রাখবে
অন্নপ্রাশনে।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মতো সবাই
করুক নামকরণ।
বাবা ডাকুন 'চন্দ্রকুমার'
খুড়ো 'রামচরণ'।

ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না তো সিটি।
জানই আমার সকল কাজে
Originality।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সঙস্কৃত নাম।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে
অভিধানের দাম।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!
দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি— তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!
শোনো বাছা, সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে—
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে!
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায়—
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাঁটির পালা,
একটু চিঠি লিখে, শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা।
আমি বাপু ভালোমানুষ
মুখে নেইকো রা।
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্ছি তা।
আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি।
ঘোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষী।
আমি কারো নাম করি নি
তবু ভয়ে মরি।
তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
সেইটো বড়ো ডরি।

কথা একটা উঠলে মনে
ভারি তোরা জ্বালাস।
আমি বাপু আগে থাকতে
বলে হলুম খালাস!

বালক
ফাল্গুন ১২৯২

পত্র

শ্রীমান্‌ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু।
দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)
কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু বলেন 'দাদা আমার'
চামু বলেন 'ভাই',
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু
(দামু আমার চামু!)

রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইকো আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)

নাই বটে গোতম অত্রি
যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন
কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু আহা চামু!)

লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু হায় চামু!)

এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা,
বোস বংশ আর্যবংশ
সেই বংশের এঁরা!
(বোস দামু বোস চামু!)

কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই;
(আর্য দামু চামু!)

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিঁদু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার!)

মনু বলেন 'ম'নু আমি'
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রইল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)

মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা!
(আমার হিঁদু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে গোঁজ' যেথায়
সিকি দুয়ানি।
(থলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠল
হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)
আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে,
তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)
এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো করো, ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)

সঞ্জীবনী
১ চৈত্র ১২৯২

অনুবাদ-কবিতা

ম্যাক্‌বেথ্‌

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্‌)

দৃশ্য : বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিনটি জনে।
২য় ডা — ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।
৩য় ডা — সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা — মিল্‌ব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা — কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা — ম্যাক্বেথ সেথা আস্‌চে আজ।
১ম ডা — কটা বেড়াল। যাচ্ছি ওরে!
২য় ডা — ঐ বুঝি ব্যাং ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা — চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!
সকলে — মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

প্রস্থান।

দৃশ্য : এক প্রান্তর। বজ্র। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা — মারতে ছিলুম শুয়োরগুলি।
৩য় ডা — তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা — দেখ্‌, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে
'ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।'
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—

নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা — আমি দেব বাতাস একটি।
১ম ডা — তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা — একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা — বাকি সব আমারি আছে।

* * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে সবে সারা।
বল্‌ দেখি বোন্, এইটে কি!
২য় ডা — কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা — একটা মাঝির বুড় আঙুল
রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য় ডা — ঐ শোন্ শোন্ বাজ্‌ল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী!

দৃশ্য : গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিনজন ডাকিনী

১ম ডা — কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা — তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা — হার্পি বলে আকাশ তলে
'সময় হোল' 'সময় হোল!'
১ম ডা — আয় রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষমাখা ওই নাড়ি ভূঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ রে ছুঁড়ি।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে

কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গিগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিকটিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য় ডা — মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙ্গর ব্যাঁৎ,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

বিচ্ছেদ

প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্মিময় সিন্ধু-'পরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালোবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি
যত যাই দূর দেশে চলি,
সেইদিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
যেখানে এসেছি তারে ফেলি।
বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা, দ্বীপ, নদী,
অতিশয় মনোহর ঠাঁই,
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
শুধু হৃদয়ের ধন নাই,
বড়ো সাধ হয় প্রাণে, থাকিতাম এইখানে,
হেথা যদি কাটিত জীবন,
রয়েছে যে দূরবাসে, সে যদি থাকিত পাশে
কী যে সুখ হইত তখন।
পূর্বদিক সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে,
দেখিতে সে শেষজ্যোতি, সুষ্ঠুতর হয়ে অতি
এখনো যা জ্বলিতেছে ধীরে,
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার-জাল
অদৃষ্টের সায়াহ্নে যখন,
ফিরে চাই বারে বারে, শেষবার দেখিবারে
সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

বিদায়-চুম্বন

একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে না কো আর।
মর্মভেদী অশ্রু দিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সে তো তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার।
কিন্তু মোর আশা নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।

ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বলো উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে, ভালোবাসা আসে মনে
ভালো বাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম না রে
যদি নাহি দেখিতাম, বিচ্ছেদ না জানিতাম
তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার!
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

Robert Burns

কষ্টের জীবন

মানুষ কাঁদিয়া হাসে,
পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে,
তবুও সে না হয় পতিত,
তরণী ভাঙিয়া গেলে
তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া,
ছাদ যদি পড়ে যায়,
দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।
বন্দী চলে যায় বটে,
তবুও তো রহে কারাগার,
মেঘে ঢাকিলেও সূর্য
কোনোমতে দিন অস্ত হয়,
তেমনি হৃদয় যদি
ভেঙেচুরে হয় চুরমার,
কোনোক্রমে বেঁচে থাকে
তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা,
ক্রমশ যতই ভগ্ন হয়,
ততই সে শত শত,
প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ,
তেমনি হৃদয় হতে,
কিছুই গো যাইবার নয়।
হোক না শীতল স্তব্ধ,
শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন,

হউক-না রক্তহীন,
হীনতেজ তবুও তাহারে,
বিনিদ্র জ্বলন্ত জ্বালা,
ক্রমাগত করিবে দাহন,
শুকায়ে শুকায়ে যাবে,
অন্তর বিষম শোকভারে,
অথচ বাহিরে তার,
চিহ্নমাত্র না পাবে দর্শন।

George Gordon Byron

জীবন উৎসর্গ

এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার,
যূথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মতো
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত!
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালোবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?
জানি না, জানিতে আমি চাহি না, চাহি না,
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালোবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছ আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিংবা তোমারি পশ্চাতে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

ললিত-নলিনী

(কৃষকের প্রেমালাপ।)

ললিত

হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন।
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন।

নলিনী
কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত
বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী,
যত শুনি তত তার, ভালো লাগে গীতধার,
যত দিন যায় তত তোরে ভালোবাসি,
যত দিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী
কোমল গোলাপকলি থাকে যথা গাছে,
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত,
এ হৃদয় ভলোবাসা আলো করি আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারি গো কাছে।

ললিত
মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী
মধু আগমন বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে, হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত,
মিলিলে তোমার সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত
কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন?

নলিনী
শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হসিত,
বিজন সন্ধ্যার ছায়ে, ফুটে সে মলয়বায়ে,
সে অমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত
ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক্ রসাতলে, কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী
ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি,
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।

Robert Burns

বিদায়

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে
নব বন্ধু নব হর্ষ নব সুখ আশে।
সুন্দরী রমণী কত, দেখিবে গো শত শত
ফেলে গেলে যারে তারে পড়িবে কি মনে?
তব প্রেম প্রিয়তম, অদৃষ্টে নাইকো মম
সে-সব দুরাশা সখা করি না স্বপনে
কাতর হৃদয় শুধু এই ভিক্ষা চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।
স্মরিলে এ অভাগীর যাতনার কথা,
যদিও হৃদয়ে লাগে তিলমাত্র ব্যথা,
মরমের আশা এই, থাক্ রুদ্ধ মরমেই
কাজ নাই দুখিনীরে মনে করে আর।
কিন্তু দুঃখ যদি সখা, কখনো গো দেয় দেখা
মরমে জনমে যদি যাতনার ভার,
ও হৃদয় সান্ত্বনার বন্ধু যদি চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।

Mrs. Amelia Opie

সংগীত

কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে
চাঁদের জোছনা এই সমুদ্রবেলায়।
এসো প্রিয়ে এইখানে বসি কিছুকাল;
গীতস্বর মৃদু মৃদু পশুক শ্রবণে।
সুকুমার নিস্তব্ধতা আর নিশীথিনী—
সাজে ভালো মর্ম-ছোঁয়া সুধা-সংগীতেরে।
বইস জেসিকা, দেখো, গগন-প্রাঙ্গণ
জলৎ কাঞ্চন-পাতে খচিত কেমন।
এমন একটি নাই তারকামণ্ডল
দিব্য গীত যে না গায় প্রতি পদক্ষেপে।

অমর আত্মাতে হয় এমনি সংগীত।
কিন্তু ধূলিময় এই মর্ত্য-আবরণ
যতদিন রাখে তারে আচ্ছন্ন করিয়া
ততদিন সে সংগীত পাই না শুনিতে।

William Shakespeare

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে

১

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে,
নিভৃত নিরালা ঠাঁই, লেশমাত্র আলো নাই,
লুকানো এ প্রেমসাধ গোপনে নিবসে,
শুদ্ধ যবে ভালোবাসা নয়নে তোমার,
ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়, উচ্ছ্বসয়ে এ-হৃদয়,
ভয়ে ভয়ে জড়সড় তখনি আবার।

২

শূন্য এই মরমের সমাধি-গহ্বরে,
জ্বলিছে এ প্রেমশিখা চিরকাল-তরে,
কেহ না দেখিতে পায়, থেকেও না থাকা প্রায়,
নিভিবারও নাম নাই নিরাশার ঘোরে।

৩

যা হবার হইয়াছে— কিন্তু প্রাণনাথ!
নিতান্ত হইবে যবে এ শরীরপাত,
আমার সমাধি-স্থানে কোরো নাথ কোরো মনে,
রয়েছে এ কে দুঃখিনী হয়ে ধরাসাৎ।

৪

যতই যাতনা আছে দলুক আমায়,
সহজে সহিতে নাথ সব পারা যায়,
কিন্তু হে তুমি-যে মোরে, ভুলে যাবে একেবারে
সে কথা করিতে মনে হৃদি ফেটে যায়।

৫

রেখো তবে এই মাত্র কথাটি আমার,
এই কথা শেষ কথা, কথা নাহি আর,
(এ দেহ হইলে পাত, যদি তুমি প্রাণনাথ,

প্রকাশো আমার তরে তিলমাত্র শোক,
ধর্মত হবে না দোষী দোষিবে না লোক—
কাতরে বিনয়ে তাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
কখনো চাহি নে আরো কোনো ভিক্ষা আর)
যবে আমি যাব ম'রে, চির এ দুঃখিনী তরে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেলো একবার—
আজন্ম এত যে ভালোবেসেছি তোমায়,
সে প্রেমের প্রতিদান একমাত্র প্রতিদান,
তা বই কিছুই আর দিয়ো না আমায়।

George Gordon Byron

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়

১

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্তি গৌরব যেথায়,
কিন্তু গো একটি কথা, কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়—
সুখ্যাতি অমৃত রবে, উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়।

২

কত যে মমতা-মাখা, আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এ হতে গভীরতর, কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন,
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব-সাথ, আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিয়ো আমায়।

৩

সুচারু সায়াহ্নে যবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তোমার সে মনোহরা, সুদীপ্ত সাঁজের তারা,
সেখানে সখা গো তুমি পাইবে দেখিতে—
মনে কি পড়িবে নাথ, এক দিন আমা সাথ,
বনভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যাতারা, দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে।

৪

নিদাঘের শেষাশেষি, মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়, যেই অভাগিনী হায়
গাঁথিত যতনে তার মালা তোমা তরে।
যে-হস্ত গ্রথিত বলে তোমার নয়নে
হত তা সৌন্দর্য-মাখা, ক্রমেতে শিখিলে সখা
গোলাপে বাসিতে ভালো যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

৫

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে, বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খসে খসে চারি ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
নিদারুণ শীত কালে, সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,
বিমল সংগীত তান, তোমার হৃদয় প্রাণ।
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়-তল, এক বিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হতে পড়ে সে তান শুনিলে,
তখন করিয়ো মনে, এক দিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিয়ো হায় অভাগিনী বলে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

আবার আবার কেন রে আমার

আবার আবার কেন রে আমার
সেই ছেলেবেলা আসে না ফিরে,
হরষে কেমন আবার তা হলে,
সাঁতারিয়ে ভাসি সাগরের জলে,
খেলিয়ে বেড়াই শিখরী শিরে!
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো নাহি লাগে,
ঘোরঘটাময় সমাজধারা,
না, না, আমি রে যাব সেই স্থানে,
ভীষণ ভূধর বিরাজে যেখানে,
তরঙ্গ মাতিছে পাগল পারা!
অয়ি লক্ষ্মী, তুমি লহো লহো ফিরে,

ধন ধান্য তুমি যা দেছ মোরে,
জাঁকালো উপাধি নাহি আমি চাই,
ক্রীতদাসে মম কোনো সুখ নাই,
সেবকের দল যাক-না সোরে!
তুলে দাও মোরে সেই শৈল-'পরে,
গরজি ওঠে যা সাগর-নাদে,
অন্য সাধ নাই, এই মাত্র চাই,
ভ্রমিব সেথায় স্বাধীন হৃদে।
অধিক বয়স হয় নে তো মম,
এখনি বুঝিতে পেরেছি হায়,
এ ধরা নহে তো আমার কারণে,
আর মম সুখ নাহি এ জীবনে,
কবে রে এড়াব এ দেহ দায়।
একদা স্বপনে হেরেছিনু আমি,
সুবিমল এক সুখের স্থান,
কেন রে আমার সে ঘুম ভাঙিল
কেন রে আমার নয়ন মেলিল,
দেখিতে নীরস এ ধরা খান!
এক কালে আমি বেসেছিনু ভালো,
ভালোবাসা-ধন কোথায় এবে,
বাল্যসখা সব কোথায় এখন—
হায় কী বিষাদে ডুবেছে এ মন,
আশারও আলোক গিয়েছে নিবে!
আমোদ-আসরে আমোদ-সাথীরা,
মাতায় ক্ষণেক আমোদ রসে,
কিন্তু এ হৃদয়, আমোদের নয়,
বিরলে কাঁদি যে একেলা বসে।
উঃ কী কঠোর, বিষম কঠোর,
সেই সকলের আমোদ-রব,
শত্রু কিম্বা সখা নহে যারা মনে,
অথচ পদ বা বিভব কারণে,
আমোদ-আসরে মিশেছে সব।
দাও ফিরে মোরে সেই সখাগুলি,
বয়সে হৃদয়ে সমান যারা,
এখনি যে আমি ত্যেজিব তা হলে,
গভীর নিশীথ-আমোদীর দলে,
হৃদয়ের ধার কি ধারে তারা।
সর্বস্ব রতন, প্রিয়তমা ওরে,
তোরেও শুধাই একটি কথা,
বল দেখি কিসে আর মম সুখ,
হেরিয়েও যবে তোর হাসি-মুখ,

কমে না হৃদয়ে একটি ব্যথা।
যাক তবে সব, দুঃখ নাহি তায়,
শোকের সমাজ নাহিকো চাই,
গভীর বিজনে মনের বিরাগে,
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো যাহা লাগে,
সুখে উপভোগ করিব তাই!
মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব,
বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়,
অন্ধকারময় নিবিড় কাননে,
থাকিব তবুও নিশ্চিন্ত মনে,
আমারও হৃদয় আঁধারময়!
কেন রে কেন রে হল না আমার,
কপোতের মতো বায়ুর পাখা,
তা হলে ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ,
গগনের ছাদ ভেদ করি আজ,
থাকিতাম সুখে জলদে ঢাকা!

George Gordon Byron

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৫

বৃদ্ধ কবি

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে
জীবন হতেছে শেষ,
শিথিল কপোল মলিন নয়ন
তুষার-ধবল কেশ!
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া
অযতনে বীণাখানি,
বাজাবার বল নাইকো এ হাতে
জড়িমা জড়িত বাণী!
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা!
হইল বিদায় নিতে;
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই
অমৃত আমার চিতে?
তবু একবার আর-একবার
ত্যজিবার আগে প্রাণ,
মরিতে মরিতে গাহিয়া লইব
সাধের সে-সব গান!
দুলিবে আমার সমাধি-উপরে
তরুগণ শাখা তুলি,

বনদেবতারা গাইবে তখন
মরণের গানগুলি।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

জাগি রহে চাঁদ

বেহাগ

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটি রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটি রজনী!
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কী লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠে গো জাগিয়া
সারাটি রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখি গো স্বপন
সারাটি রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখি গো বদন
সারাটি রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়
তখন কি সখি তোমার হৃদয়।
আমার ঘুমের শয়ন-'পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয়-ভরে।
সারাটি রজনী!

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির

পূরবী

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির
গাহিছে বিহগগণ,
ফুলবন হতে সুরভি হরিয়া
বহিতেছে সমীরণ
সাঁঝের আকাশ মাঝারে এখনো
মৃদুল কিরণ জ্বলে।
নলিনীর সাথে বসিয়া তখন
কত-না হরষে কাটাইনু ক্ষণ,
কে জানিত তবে বালিকা নিদয়
রেখেছিল ঢাকি কপট-হৃদয়
সরল হাসির তলে।

এই তো সেথায় ভ্রমি, গো, যেথায়
থাকিত সে মোর কাছে,
প্রকৃতি জানে না পরিবরতন
সকলি তেমনি আছে!
তেমনি গোলাপ রূপ-হাসি-ময়
জ্বলিছে শিশির-ভরে,
যে হাসি-কিরণে আছিল প্রকৃতি
দ্বিগুণ দ্বিগুণ মধুর আকৃতি,
সে হাসি নাইকো আর!

Irish Song

বলো গো বালা, আমারি তুমি

পিলু

বলো গো বালা, আমারি তুমি
হইবে চিরকাল!
অনিয়া দিব চরণতলে
যা-কিছু আছে সাগরজলে
পৃথিবী-'পরে আকাশতলে
অমূল মণি জাল!
শুনি আশার মোহন-রব
যা-কিছু ভালো লাগিবে তব
আনিয়া দিব, হও গো, যদি
আমারি চিরকাল!
যেথায় মোরা বেড়াব দুটি,
কুসুমগুলি উঠিবে ফুটি,
নদীর জলে শুনিতে পাব
দেবতাদের বাণী।
তারকাগুলি দেখাবে যেন
প্রেমিকদেরি জগতহেন,
মধুর এক স্বপন সম
দেখাবে ধরাখানি!
আকাশ-ভেদী শিখর হতে
পতনশীল নির্ঝর-স্রোতে
নাহিয়া যথা কানন-ভূমি
হরিত-বাসে সাজে,
চির-প্রবাহী সুখের ধারে
দোঁহার হৃদি হাসিবে হারে—
যেই সুখের মূল লুকানো
কলপনার মাঝে!

প্রেম দেবের কুহক জালে
হৃদয়ে যার অমৃত ঢালে,
সেই সে জনে করেন প্রেম
কত না সুখ-দান।
ভবন তাঁর স্বরগ-'পরে,
যেথায় তাঁর চরণ পড়ে
ধরার মাঝে স্বরগ শোভা
ধরে, গো, সেইখান!

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়
রূপের মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি!
শান্ত আশা এ হৃদয়ে আমার
এখন ফুটিতে পারে,
সুবিমলতর দিবস আমার
এখন উঠিতে পারে।
বালক কালের প্রেমের স্বপন—
মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না,
তেমন কিছুই আসিবে না।
সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতি-মরু মোর উজল করিয়া
এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা।
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়,
প্রভাতকালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়।
অলস প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর
সে কিরণ কভু ভাসিবে না,
সে কিরণ কভু ভাসিবে না।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার যাইবি কি তুই,
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
পাদপের ছায়া মাথার 'পরে,
পাখিরা গাইছে মধুর স্বরে
অথবা উড়িছে পাখা বিছায়ে
হরষে সে গিরি-কাননে।
রূপসী আমার প্রেয়সী আমার
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
শিখর উঠেছে আকাশ-'পরি,
ফেনময় স্রোত পড়িছে মরি,
সুরভি-কুঞ্জ ছায়া বিছায়ে
শোভিছে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই।
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে!
ধবল শিখর কুসুমে ভরা
সরসে ঝরিছে নিঝর-ধারা
উছসে উঠিয়া সলিল-কণা
শীতলিছে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে।
সুখ দুখ যাহা দিলেন, বিধি,
কিছুই মানিতে চায় না হৃদি,
তোমারে ও প্রেমে লইয়া পাশে
ভ্রমি যদি গিরি-কাননে।

Robert Burns

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে
দাঁড়াও একটিবার!
একবার আমি দেখিয়া লইব
মধুর হাসি তোমার।
কত দুখ-জ্বালা সহি অকাতরে
ভ্রমি, গো, দূর প্রবাসে
যদি লভি মোর হৃদয়-রতন—
সুশীলারে মোর পাশে!
কালিকে যখন নাচ গান কত
হতেছিল সভা-'পরে,
কিছুই শুনি নি, আছিনু মগন
তোমারি ভাবনা-ভরে
আছিল কত-না বালিকা, রমণী,
রূপসী প্রমোদ-হিয়া,
বিষাদে কহিনু 'তোমরা তো নহ
সুশীলা, আমার প্রিয়া।'
সুশীলে, কেমনে ভাঙ তার মন
হরষে মরিতে পারে যেই জন
তোমারি তোমারি তরে।
সুশীলে, কেমনে ভাঙ হিয়া তার
কিছু যে করে নি, এক দোষ যার
ভালোবাসে শুধু তোরে।
প্রণয়ে প্রণয় না যদি মিশাও
দয়া কোরো মোর প্রতি,
সুশীলার মন নহে তো কখনো
নিরদয় এক রতি।

Robert Burns

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা

'কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী আমারে
দিতেছ কেমন করে?
গাঁথিয়া রেখেছি পরাতে মালিকা
তোমার গলার-'পরে,
কোরো না, ছলনা কোরো না ছলনা,

যেয়ো না ফেলিয়া মোরে!
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?
যে শপথ তুমি বলেছ আমারে
মনে করে দেখো তবে,
মনে করো সেই কুঞ্জ যেথায়
কহিলে আমারি হবে।
কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে,
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'
এত বলি এক কাঁদিছে ললনা
ভাসিছে লোচন-লোরে
'কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'

William Chappel

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া
দূরেতে রাখিয়া এলেম তারে,
রূপ-ফাঁদ হতে পালাইতে তার,
প্রণয়ে ডুবাতে মদিরা-ধারে।
এত দূরে এসে বুঝিনু এখন
এখনো ঘুচে নি প্রণয়-ঘোর,
মাথায় যদিও চড়েছে মদিরা
প্রণয় রয়েছে হৃদয়ে মোর?
যুবতীর শেষে লইনু শরণ
মাগিনু সহায় তার,
অনেক ভাবি সে কহিল তখন
'চপলা নারীর সার।'
আমি কহিলাম 'সে কথা তোমার
কহিতে হবে না মোরে—
দোষ যদি কিছু বলিবারে পারো
শুনি প্রণিধান করে।'
যুবতি কহিল 'তাও কভু হয়?
যদি বলি দোষ আছে—
নামের আমার কুযশ হইবে

কহিনু তোমার কাছে।'
এখন তো আর নাই কোনো আশা
হইয়াছি অসহায়—
চপলা আমার মরমে মরমে
বাণ বিঁধিতেছে, হায়।
দলে মিশি তার ইন্দ্রিয় আমার
বিরোধী হয়েছে মোর,
যুবতী আমার— বলিছে আমারে
রূপের অধীন ঘোর।

Lord Cantalupe

প্রেমতত্ত্ব

নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর-'পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুমধুর প্রণয়-ভরে!
জগতে কেহই নাইকো একেলা,
সকলি বিধির নিয়ম-গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি বা কেননা তোমার সনে?
দেখো, গিরি ওই চুমিছে আকাশে,
ঢেউ-'পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুলবালারে কে বা না দোষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি!
রবি-কর দেখো চুমিছে ধরণী,
শশি-কর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম', ললনা,
এ-সব চুম্বনে কী তবে ফল?

P. B. Shelley

নলিনী

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,

হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী।
ভালো বাসে কি না, তবু
বলিতে চাহে না কভু
নিরদয়া নলিনী।
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিশ্বাস যাচে
চায় সে এমন করে
বিপাকে ফেলিতে মোরে,
হাসে কত, কথা তবু কয় না।
এমন নির্দোষ ধূর্ত
চতুর সরল,
ঘোমটা তুলিয়া চায়
চাহনি চপল
উজ্জল অসিত-তারা-নয়না!
অমনি চকিত এক হাসির ছটায়
ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,
তখনি পলায় আর রয় না!

Alfred Tennyson

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

দিন রাত্রি নাহি মানি

দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয় রে,
চির সুখ-রসে রত আমরা হেথায় রে।
বসন্তে মলয় বায় একটি মিলায়ে যায়,
আরেকটি আসে পুনঃ মধুময় তেমনি,
প্রেমের স্বপন হায়
একটি যেমনি যায়
আরেকটি সুস্বপন জাগি উঠে অমনি।
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে!
তবে তা ইহাই রে।

প্রেমের নিশ্বাস হেথা ফেলিতেছি বালিকা,
সুরভি নিশ্বাস যথা ফেলে ফুল-কলিকা,
তাহাদের আঁখিজল
এমন সে সুবিমল

এমন সে সমুজ্জল মুকুতার পারা রে,
তাদের চুম্বন হাসি
দিবে কত সুধারাশি
যাদের মধুর এত নয়নের ধারা রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে।
তবে তা ইহাই রে।
থাকুক ও-সব সুখ চাই না, গো চাই না,
যে সুখ-ভিখারী আমি তাহা যে গো পাই না।
দুই হৃদি এক ঠাঁই
প্রণয়ে মিলিতে চাই
সুখে দুখে যে প্রেমের নাহি হবে শেষ রে।
প্রেমে উদাসীন হৃদি
শত যুগ যাপে যদি,
তার চেয়ে কত ভালো এ সুখ নিমেষ রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে
তবে তা ইহাই রে।

Thomas Moore

দামিনীর আঁখি কিবা

দামিনীর আঁখি কিবা
ধরে জ্বল' জ্বল' বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে?
চারি দিকে খর ধার
বাণ ছুটিতেছে তার
কার-'পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে?
তার চেয়ে নলিনীর আঁখিপানে চাহিতে
কত ভালো লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে?
সদা তার আঁখি দুটি
নিচু পাতে আছে ফুটি,
সে আঁখি দেখে নি কেহ উঁচু পানে তুলিতে।
যদি বা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে,
সহসা লাগিয়া জ্যোতি
সে-জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে।
ও আমার নলিনী লো, লাজমাখা নলিনী,
অনেকেরি আঁখি-'পরে
সৌন্দর্য বিরাজ করে,

তোর আঁখি-'পরে প্রেম নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর দেহে রয়
বসন কনকময়
সে বসন অপসরী সৃজিয়াছে যতনে,
যে গঠন যেই স্থান
প্রকৃতি করেছে দান
সে-সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে।
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভালো কে পারিবে কহিয়া?
শিথিল অঞ্চল তার
ওই দেখো চারি ধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে,
যেথা যে গঠন আছে
পূর্ণ ভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী লো, সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস
তাই প্রকৃতির বাস,
সেই বাস তোর দেহে নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর মুখ-আগে
সদা রসিকতা জাগে,
চারি ধারে জ্বলিতেছে খরধার বাণ সে,
কিন্তু কে বলিতে পারে
শুধু সে কি ধাঁধিবারে,
নহে তা কি খর ধারে বিঁধিবারি মানসে?
কিন্তু নলিনীর মনে
মাথা রাখি সঙ্গোপনে
ঘুমায়ে রয়েছে কিবা প্রণয়ের দেবতা।
সুকোমল সে শয্যার
অতি বা কঠিন ধার
দলিত গোলাপ তাও আর কিছু নহে তা!
ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।

Thomas Moore

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

অদৃষ্টের হাতে লেখা

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা,
সেই পথ বয়ে সবে হয় অগ্রসর।
কত শত ভাগ্যহীন ঘুরে মরে সারাদিন
প্রেম পাইবার আগে মৃত্যু দেয় দেখা,
এত দূরে আছে তার প্রাণের দোসর।

কখন বা তার চেয়ে ভাগ্য নিরদয়,
প্রণয়ী মিলিল যদি— অতি অসময়!
'হৃদয়টি?' 'দিয়াছি তা।' কাঁদিয়া সে কহে,
'হাতখানি প্রিয়তম?' 'নহে, নহে, নহে!'

Matthew Arnold

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি

এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে!
একটি ভুজঙ্গ-ভুজে আমারে জড়ায়ে আছে;
আরেকটি শ্যাম-বাহু, শতেক মুকুতা ঝুলে,
সোনার মদিরা পাত্র আকাশে রয়েছে তুলে।
অলকের মেঘ মাঝে জ্বলিতেছে মুখখানি,
রূপের মদিরা পিয়া
আবেশে অবশ হিয়া,
পড়েছে মাতাল হয়ে, কখন্ কিছু না জানি।
রাখিয়া বক্ষের পরে অবশ চিবুক মোর,
হাসিতেছি তার পানে, হৃদয়ে আঁধার ঘোর।
বাতায়ন-যবনিকা, বাতাস, সরায়ে ধীরে
বীজন করিছে আসি এ মোর তাপিত শিরে।
সম্মুখেতে দেখা যায়
পীতবর্ণ বালুকায়
অস্তগামী রবিকর অদূর 'নীলের' তীরে।
চেয়ে আছি, দেখিতেছি, নদীর সুদূর পারে,
(কী জানি কিসের দুখ।)
পশ্চিম দিকের মুখ
বিষণ্ণ হইয়া আসে সন্ধ্যার আঁধার ভারে।
প্রদোষ তারার মুখে হাসি আসি উঁকি মারে।
রোমীয় স্বপন এক জাগিছে সম্মুখে মোর,
ঘুরিছে মাথার মাঝে, মাথায় লেগেছে ঘোর।
রোমীয় সমর-অস্ত্র ঝঞ্ঝনিয়া উঠে বাজি,

বিস্ফারিত নাসা চাহে রণ-ধূম পিতে আজি।
কিন্তু হায়! অমনি সে মুখ্ পানে হেসে চায়,
কী জানি কী হয় মতি,
হীন প্রমোদের প্রতি।
বীরের ভ্রূকুটিগুলি তখনি মিলায়ে যায়।
গরবিত, শূন্য হিয়া, জর্জর আবেশ-বাণে,
যে প্রমোদে ঘৃণা করি হেসে চাই তারি পানে।

অনাহূত হর্ষ এক জাগ্রতে স্বপনে আসি,
শৌর্যের সমাধি-পরে ঢালে রবি-কর রাশি!
কতবার ঘৃণি তারে! রমণী সে অবহেলে
পৌরুষ নিতেছে কাড়ি বিলাসের জালে ফেলে!
কিন্তু সে অধর হতে
অমনি অজস্র স্রোতে
ঝরে পড়ে মৃদু হাসি, চুম্বন অমৃত-মাখা
আমারে করিয়া তুলে, ভাঙাঘর ফুলে ঢাকা।
বীরত্বের মুখ খানি একবার মনে আনি,
তার পরে ওই মুখে ফিরাই নয়ন মম,
ওই মুখ! একখানি উজ্জ্বল কলঙ্ক সম!
ওই তার শ্যাম বাহু আমারে ধরেছে হায়!
অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শে বল মোর চলে যায়!
মুখ ফিরাইয়া লই— রমণী যেমনি ধীরি
মৃদু কণ্ঠে মৃদু কহে, অমনি আবার ফিরি।
রোমের আঁধার মেঘ দেখে যেই মুখ-'পরে,
অমনি দু বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরে,
বরষে নয়নবারি আমার বুকের মাঝ,
চুমিয়া সে অশ্রুবারি শুকানো বীজের কাজ।
তার পরে ত্যজি মোরে চরণ পড়িছে টলে,
থর থর কেঁপে বলে— 'যাও, যাও, যাও চলে!'
ঢুলু ঢুলু আঁখিপাতা পুরে অশ্রু-মুকুতায়,
শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়!
জীবনের লক্ষ্য, আশা, ইচ্ছা, হারাইয়া ফেলি,
চেয়ে থাকি তার পানে কাতর নয়ন মেলি।
আবার ফিরাই মুখ, কটাক্ষেতে চেয়ে রই,
কলঙ্কে প্রমোদে মাতি তাহারে টানিয়া লই!
আরেকটি বার রোম, হইব সন্তান তোর
একটি বাসনা এই বন্দী এ হৃদয়ে মোর।
গৌরবে সম্মানে মরি এই এক আছে আশ,
চাহি না করিতে ব্যয় চুম্বনে অন্তিম শ্বাস!
বুঝি হায় সে আশাও পুরিবে না কোনো কালে
রোমীয় মৃত্যুও বুঝি ঘটিবে না এ কপালে!

রোমীয় সমাধি চাই
তাও বুঝি ভাগ্যে নাই,
ওই বুকে মরে যাব, বুঝি মরণের কালে।

Robert Buchanan

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

সুখী প্রাণ

জান না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন-অরণ্য-ভূমি দেখিছে তোমার খেলা
জুড়াইছে তাহার নয়ান।
মেষ-শাবকের মতো তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গভীর ভাবনা কিছু আসে না তোমার কাছে,
দিনরাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নরনারী মাঝে এমনি বিমল হিয়া
আছে কেহ তোমারি সমান।
চাহে না চাহে না তারা ধরণীর আড়ম্বর,
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ।

Robert Buchanan

'আলোচনা' পত্রিকা
ভাদ্র ১২৯১

জীবন মরণ

ওরা যায়, এরা করে বাস;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত-না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া;
একই বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া

"জীবন মরণ"
ভিক্টর হ্যুগোর কবিতার অনুবাদ
রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

মানুষের মাথার উপরে,
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।

যে থাকে সে গেলদের কয়,
'অভাগা, কোথায় গেলি লয়।
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর হেরিবি তরুলতা,
চলেছিস মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।'

যে যায় সে এই বলে যায়,
'তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তায়।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা তা মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।'

Victor Hugo

'আলোচনা' পত্রিকা
কার্তিক ১২৯১

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
সুন্দর চুলের, সুগন্ধি মালার,
তিক্ত বচনের, মিষ্ট অধরের,
বিমুগ্ধ গানের, বিষণ্ণ স্বরের।
সে-সব মিলায়ে গেছে বহুদিন,
সে স্বপ্নপ্রতিমা কোথায় বিলীন।
শুধু সে অনন্ত জ্বলন্ত হুতাশ
ছন্দে বদ্ধ হয়ে করিতেছে বাস।

তুমিও গো যাও, হে অনাথ গান,
সে স্বপ্নছবিরে করগে সন্ধান।
দিলাম পাঠায়ে, করিতে মেলানী,
ছায়া-প্রতিমারে বায়ুময়ী বাণী।

Heinrich Heine

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি
দুখ জ্বালা সব যাই ভুলি।
অধরে অধর পরশিয়া
প্রাণমন উঠে হরষিয়া।
মাথা রাখি যবে ওই বুকে
ডুবে যাই আমি মহা সুখে।
যবে বল তুমি, 'ভালবাসি',
শুনে শুধু আঁখিজলে ভাসি।

Heinrich Heine

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না এ বেদনা;
তবু তো কোনোমতে সয়েছিনু,
কী করে যে সে কথা শুধায়ো না।

Heinrich Heine

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি, সুধায় মাখা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন!
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণসম সুকঠিন।

Heinrich Heine

গানগুলি মোর বিষে ঢালা

গানগুলি মোর বিষে ঢালা
কী হবে আর তাহা বই?
ফুটন্ত এ প্রাণের মাঝে
বিষ ঢেলেছে বিষময়ী!

গানগুলি মোর বিষে ঢালা,
কী হবে আর তাহা বই?

বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি।

Heinrich Heine

তুমি একটি ফুলের মতো মণি

তুমি একটি ফুলের মতো মণি
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর।

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশীষ মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।

Heinrich Heine

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি
রানী, তোর মধুমাখা দিঠি
রানী, তুই মণি তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।
দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটে কী করিয়া?
সাধ যায় তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি এক ভিতে
ছোটোছোটো সেই ঘরটিতে।
ছোটো হাতখানি হাতে করে
অধরেতে রেখে দিই ধরে।
ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল
ছোট সে কোমল করতল।

Heinrich Heine

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয়বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।

আমিও সে দলের মূর্খরাজ
দুবার প্রেমপাশে পড়ি;

তপন শশী তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি— আর মরি।

Heinrich Heine

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা!

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা।
দিবেরাত্রি আহার নিদ্রে ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটি নিলে কেড়ে।

বিশ্বামিত্র তোমার মতো গোরু
দুটি এমন দেখি নি বিশ্বে!
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধু এত তপিস্যে!

Heinrich Heine

সাধনা
বৈশাখ ১২৯৯

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
তেমনি যে তোমা-পানে নাহি চায় গ্রীস্
তাহার হৃদয় মন পাষাণ কুলিশ
ইংরাজেরা ভাঙিয়াছে প্রাচীর তোমার
দেবতাপ্রতিমা লয়ে গেছে [সিন্ধুপার]
এ দেখে কার না হবে হবে ...

[ধূম]কেতু সম তারা কী কুক্ষণে হায়
[ছা]ড়িয়া সে ক্ষুদ্র দ্বীপ আইল হেথায়
[অ]সহায় বক্ষ তব রক্তময় করি
দেবতা প্রতিমাগুলি লয়ে গেল হরি।

George Gordon Byron

মালতী পুঁথি

প্রবন্ধ

সাহিত্য

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোনো সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সংগীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোনো মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোনো অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিংবা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্‌গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড়ো অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে-সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসি বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ-সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড়ো সামান্য ক্ষমতা নহে। শেক্সপিয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয়-সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে; কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry

কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookh-ও Lyric Poetry, Irish Melodies-ও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি। বাংলাদেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাংলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাংলার জলবায়ুর গুণে বাঙালিরা স্বভাবত নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ স্বাধীনতার ভাব বাঙালির হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়তো উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ওই-সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাংলার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙালির প্রথম অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাংলা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জ্বলন্ত অনল। 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজি কালি বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগো, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ও-সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ 'ভারত ভারত' চিৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই শেক্সপিয়র কহিয়াছেন 'Words to the heat of deed too cold breath give'. তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্যসংগীত আছে কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর-একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা-কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোনো কোনো স্থলে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর-একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁর কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন, কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভালো হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভালো করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভালো হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিংবা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংসমধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসরসরোজিনীর 'মধুমক্ষিকা-দংশন' ও 'প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী' ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
কার্তিক ১২৮৩

মেঘনাদবধ কাব্য

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকরা ইঁহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড়ো একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক-একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোনো দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনো দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভালো না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধরো তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাববিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলনসমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্যজড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ওই পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও ওইরূপ বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইঁহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কী একটি ভীষণ চিত্রই পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ করো; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিংকরী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির-দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজিসমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কী করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসংকুল সভায় কি গাম্ভীর্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 'রাবণের সভা তরঙ্গসংকুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর।'[১] বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কী করা যায়, কোনো কোনো পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

১. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দর কাণ্ড।

ভূতলে অতুল সভা— ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি

ইহা কি রাবণের সভা? ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান করিতেই হইবে তাহার অর্থ কী? না-হয় সুন্দরই হইল, ইঁহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এককথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলি, বাঁশরি, স্বরলহরী, গোকুল, বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা-বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভালো, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কী ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কী অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কী আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়, এখন দেখা যাউক রাবণের রোদন কী প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন, কাঁদিতেছেন কিরূপে—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা— তিতিয়া বসনে
ইত্যাদি

রানী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন, এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে—

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কী পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে

এ বিপুল কুল-মান এ কালসমরে?

ইত্যাদি

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া 'সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ' সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।

রাবণ কহিলেন, 'কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ-পরাণ অবোধ'। ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল— 'কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব দুঃখ'— এ কথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাসুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,

একে তো অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার 'মন্দোদরী মনোহর', আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড়ো বড়ো কবিরা এক-একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক-এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের 'মন্দোদরী মনোহর' বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কী? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোনো বর্ণনা করিবেন তখন 'মন্দোদরী মনোহর' রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেননা ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণী কখনো উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া—

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে—

তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ—
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কার সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী;
তুমি হে জগতপিতা, এ কী রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

সুরুচি পাঠকেরা কখনোই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কী একটি মহান গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোনো কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না। সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্‌, কবি কহিলেন—

বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।[১]

"বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন বিকাশপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!

হেনকালে রোদনের 'মৃদু নিনাদ' ও কিঙ্কিণীর 'ঘোর রোল' তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিংকরী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র-মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া 'ঘোর কোলাহলে' কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না তো আর সহ্য হয় না, পাত্র-মিত্র সভাসদ আদিকে এক-একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিংকরী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল। একে তো ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভালো লাগিল,

১ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

রাবণ কহিলেন,

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।

এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভর্ৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে 'ত্যজি সুকনকাসন উঠিল গর্জিয়া'। সুকনকাসন, সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভালো শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্‌ধৃত করিতাম।

যাহা হউক, প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় তো কী বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই তো তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে, 'এ ভব মণ্ডল মায়াময়' আর তিনি উত্তর দিবেন, 'তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!' যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন 'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা' তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন-'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন, 'এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারংবার'। কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর।
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ

অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;
কিংবা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর-নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

ইহার মধ্যে ভয়ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি 'প্রভঞ্জন' 'কলম্বকুল' প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্রসমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্রে চিত্রে কী অভাব কী হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গ-দেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? একজন চিত্রকর একটি কালীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন পুরাণে কালীর কীরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশানভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদমস্তক স্বর্ণালংকারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়োই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোনো দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কী দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান-দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কীরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এ স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[১] মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করার

১. সুন্দরকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়। ২. যুদ্ধকাণ্ড, ২৯ অধ্যায়। ৩. যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায়।

মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্বস্ব-পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজি কবি মিলটন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি,

Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
Tears, such as angels weep, burst forth :—

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[১]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[২]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[১]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[২] এই-সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায় দেহ তার, দেখো সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি তো বেশ হইল, কিন্তু আবার 'কিংবা তরু' দিয়া কমাইবার কী প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ডভাব বুঝাইতে না পারিয়া 'কিংবা তরু' দিয়া আরও উচ্চ করিয়াছেন।

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ংকরী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি

---

১. যুদ্ধকাণ্ড, ৫৭ অধ্যায়। ২. যুদ্ধকাণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন-চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই 'সন্দেশবহ' ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্রবলী রাবণের মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বনমাঝে, প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা তো সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ওইরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জিয়া উঠিলেন—

এ কনক-পুরে,
ধনুর্ধর আছে যত সাজো শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!

পাঠকেরা বলিবেন এইবার তো হইয়াছে; এইবার তো রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন কিন্তু পাঠক হয়তো দেখেন নাই 'তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে' রাবণ স্বভাবত তো এত তেজস্বী নন, তিনি মহারুদ্রতেজ পাইয়াছেন, সেইজন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা শুনিলে বাঁচিবেন কীরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাবগুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

'এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে 'মধুকরী কল্পনা দেবীর' যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কী হইল? এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বাভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড়ো একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন 'রাবণ পুত্রশোকে কাঁদিয়াছে, তবেই তো তাহার বড়ো অপরাধ!' পুত্রশোকে বীরের কীরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শস্বরূপ করিয়াছেন। ইঁহাদের একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যোঝাযুঝি করা আমাদের কর্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর-একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্ আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সম্মুখভাগেই তো তিনি আহত হইয়াছিলেন?'

রস্।— হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।

সিউয়ার্ড।— তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।

ম্যাল্‌কম্।— তাঁহার জন্য আরও অধিক শোক করা উচিত।

সিউয়ার্ড।— না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মতো মরিয়াছেন, ভালোই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভালো করুন।

—ম্যাক্‌বেথ

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড, বীরচূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে তো ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!

তাঁহারা বলিতেন, 'হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!'

রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয়লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তো তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকে তো স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়!

কেহ কেহ বলেন, 'অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?' আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে সকল বিষয়েই তো একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই তো আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্রশোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা

স্বাভাবিক, আর-একজনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি তো বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ-কষ্ট পায় বীর তেমনই পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মতো, বীরের মতো তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াই তো বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন 'ওইপ্রকার মত পূর্বেকার স্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; স্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থিরভাবে দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।' শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে কী করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীরপুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা তো এইরূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! স্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয় সেইরূপ এক-একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই-সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেইপ্রকার বিরোধী গুণ। যাক— এ-সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক।*

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মতো হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্রচিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কীরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদবধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয় সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

—হায় লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইন্দ্রজিৎ কোথায়?' লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ দিয়া যুদ্ধে

* আমরা পূর্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া 'কিংশুক' শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে গোলাপ ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসলা বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

—বহুকালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
বহুবিধ রত্ন-দানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

আর-এক স্থলে— না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখো, রাবণকে বিনাশ করো, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভালো করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমকহারামি করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনোই তাঁহাকে

বহুকালাবধি
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি

পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কানে ভালো শুনায় না। ওই ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদুহাস্য বিষমাখা একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ওইরূপ আর-এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে— জিজ্ঞাসিয়ো, বিজ্ঞ জটাধরে।

এখানে 'বিজ্ঞ জটাধর' কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর-এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,

কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মন কাঁদে গো স্মরিলে
এ-সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রানী মন্দোদরী,
কী আর কহিব তার?

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্তগৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কীরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারও কোনো সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রাদির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কী হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কী বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে পুরা এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র-মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পরবিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শত্রুতাসাধন করাতে কপটতা এবং কখনো ভক্তবৎসলা দেখানো ও কখনো তাহার বিপরীতাচারণ করাতে পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্বোক্তরূপ হীনচরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও বা পুরাণে ওইরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! 'ধিক্ মোরে' কহিলা গম্ভীরে
কুমার, 'হা ধিক্ মোরে!' বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুদলে।

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখন

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;
কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভালো লাগিল।

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
* * *
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্র চাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।

পূর্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেইরূপ রথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মেঘবিদ্যুৎ ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভালো লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই তো তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কী বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মানস সকাশে শোভে কৈলাশ-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধরা যেন!
নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না 'শিখি-পুচ্ছ চূড়া যথা মাধবের শিরে।' মাইকেল ভালো এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপুচ্ছ, পীতধরা, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোনো কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারিধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।

এই-সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাক্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত— শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।

পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্যজনক হইয়া পড়ে কি না!

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহো, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য-কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই 'রঙ্গরসের' কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখো, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কী দোষ রাধার পাইলে?
শ্যাম, ভেবে দেখো মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কি হে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাকো হরি যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মতো, শ্রীচরণ দুটি,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।

হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে?

—হরু ঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে; কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়তো ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতাময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার তো একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন,

ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ইত্যাদি

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের ফটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,

রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন,

ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি, শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; ইত্যাদি

যেন স্ত্রী-পুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে,
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মিল প্রিয়ে, কমললোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্যকান্ত মণি-
সম এ পরান কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘরতন।

উঠি দেখো শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জুকুঞ্জবনে
কুসুম। ইত্যাদি।

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি 'যথা' আসিয়াছে—

যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। ইত্যাদি

বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর-একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন—

জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি—
কী লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাজা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই, এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে, ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন 'বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?' সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু 'জানি আমি কেন তুই' ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনাস্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতিবিরহে রোদন করিতেছেন।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলস্বরে,

বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
'ওই দেখো আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃ কুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?' ইত্যাদি।

পূর্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই-একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কী হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতি-তরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না তো, কালভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তিমিরযামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

চলো, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী কহিল—

কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!
কী কহিলি, বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু 'বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল' ভাবচ্ছটা কই? সকলগুলিতেই 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব' 'নাদে গজ বারী মাঝে' 'কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা' ভিন্ন আর কিছুই নাই।

চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি

...

...হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!

শেষ দুই পঙ্‌ক্তিটি আমাদের বড়ো ভালো লাগিল না; এক তো কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন এ কথা কোনো শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়ত, কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়ত 'নাদেন' শব্দটি আমাদের কানে ভালো লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;— এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে— যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলা মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চলো সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।
দেখিবে যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসি
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে; ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন-না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন-না কেন, তাহাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু শূর্পণখা পিসির মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ারকি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন—

কী কহিলে বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

যখন কবি বলিয়াছেন— 'রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা।' তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য-পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনোমতে ভালো লাগে না!

একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু
স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি 'নৃমুণ্ড মালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী)' রোষে হুংকারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল—

অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ংকরী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃকুল-বধূ
(শশিকলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,— কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ংকরী ভীমা প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলাসমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না। কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ংকরী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃকুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভালো হইত। কিংবা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।

আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর-জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝরেন বিমল সলিলে,
কিংবা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে।

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছিল।

হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা—

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

উত্তরিলা ভীমা-রূপী; বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,

রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহো রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধরো,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি,
কিংবা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভালো লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর-একটি কথা আসিতেছে, মহাকাব্যে যে-সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কী? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মতো যে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কী? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কী একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল।

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল। কোদণ্ড টংকার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝন্ঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কী? না প্রমীলা প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবত মনে হয় কিনা, যে, ইন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর, 'এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।'

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।

এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা

অন্যায় হইয়াছে; প্রতি-নায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায়? পৃথিবী বীরের। সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ো সুকবি-সংগত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড়ো অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

> বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
> কহিয়ো, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
> আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
> ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি,
> কী দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে?
> কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
> রাখে দূরে জিজ্ঞাসিয়ো বিজ্ঞ জটাধরে!

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

> ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
> কহিয়ো এ-সব কথা।

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

> সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত—
> আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
> শক্তীশ্বরী।

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভালো হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

> —কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
> বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
> সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভালো হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভালো হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

> 'পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত', কহিলা পৌলমী
> অনন্ত যৌবনা, 'যাহে বধিলা তারকে
> মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
> তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
> দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ

হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহো কী কারণে?'

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব-অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না—

সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে,
কিন্তু কী কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারে বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর-থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,

পাঠক দেখিলেন তো, ইন্দ্র কোনোমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদেরে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ণ ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কররাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ণ-সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই 'কিংবা' আনেন, সেখানেই আমাদের বড়ো ভয় হয়,

কিংবা দীপাবলী—
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদয়গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পুরিব;
রক্ষঃকুলচূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয়তো বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

দেহো পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদ এবে।

বড়ো বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড়ো সাহসী করে নাই, এক-একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান। তবে মাইকেলের কী অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোনো কার্যেরই নহে। মেঘনাদবধের যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথরূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

চলো মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চলো ত্বরা করি।

'বাছা' কহিলেন—

কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহো দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি।
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি

ধরে, দেবি, ভাবি দেখো বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!

'বাছা'র সহিত 'মাতা'র কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরও কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্বতী গমন করিলেন,

মোহিত মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, 'কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?' হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; 'এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে?'

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোনো ধর্মশাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাবে যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ-নীচ ভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন—

যা লো সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরী, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ইত্যাদি।

অসুরমর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে 'বাছার কোমল দেহে রক্তধারা' দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড়ো সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতে এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী, পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসংগত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের তাহা বুঝিবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, 'যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।*... ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। যখন কৈকয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।... চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।... ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-

---

* উদ্‌ধৃতিগুলি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে।

মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।' সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি-উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম-চরিত-চিত্রের আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সংগত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

—শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? ইত্যাদি।

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালোই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন তো জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায় হেন বাঘিনীরে।

এ রাম যে কী বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা!

প্রমীলা তো লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়। তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

এবে কী করিব, কহো, রক্ষ-কুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখো সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। ...
...এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে!

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

মারি রাবণিরে, দেব দেহো আজ্ঞা দাসে!

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।

ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে;
'স্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরান কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?'

ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল।

উচিত কি তব, কহো হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি?

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতরভাবে কহিলেন,

সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর!

বিভীষণ কহিলেন, কোনো ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষসসৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

'পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে;

...

রাখো গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য-দোষে; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে।...
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখো হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে। স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা বাঁধো হে আজি কৃতজ্ঞতাপাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি!'
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরুস্বভাব রাম বনের

বানরগুলাকে লইয়া এতকাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কীরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কীরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবীমাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.
Patroclus— Ah!— Say, goddess, can I boast
A pleasure now? revenge itself is lost;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain!
'Tis not in fate the alternate now to give;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart;
On these conditions will I breathe; till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed :
"Ah then, I see thee dying, see thee dead!
When Hector falls, thou diest."—"Let Hector die,
And let me fall! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain!
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away;
Since unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
(Others in council famed for nobler skill,
More useful to preserve, than I to kill)
Let me— But oh! ye gracious powers above!
Wrath and revenge from men and gods remove;
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste :
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
Me Agamemnon urged to deadly hate;
'Tis past— I quell it; I resign to fate.
Yes— I will meet the murderer of my friend;
Or (if the gods ordain it) meet my end.

The stroke of fate the bravest cannot shun:
The great Alcides, Jore's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath.
And sunk the victim of all-conquering death.
So shall Achilles fall! Stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread!
Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hair?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me— Hence! my arms, my arms!—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যমপুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

—কী হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর করো ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।

পরে দশরথের নিকটে গেলেন;

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন তো ভালো হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমন-কি, ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই। এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কীরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় 'ভিখারী রাম' 'ভিখারী রাম' করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে না; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে 'আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য করো।' একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে, 'আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা করো।' কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"

"অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"

"বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।" ইত্যাদি।

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার এ-কী দুর্দশা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনোকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ করো।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও— তাহাকে বিনাশ করো। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল—

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। 'এখন বিষাদের সময় নয়' বলিয়া রাম রাবণ-বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ওই মহাবীর অনবরত শরবর্ষণপূর্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহু যত্নেও রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ওই ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন, শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপনপূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখো, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টনপূর্বক এই স্থানে থাকো এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা করো। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ওই সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জনকরত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করো, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইয়ো না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকীবিয়োগ এই-সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার

করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করো। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এই তো রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতনদৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্‌ধৃত করা গেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভালো হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভারতী
পৌষ ১২৮৪

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী। ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই-একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড়ো ভালো হয় নাই। 'সভয়ে' কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুলকমলকে দেখিয়াছেন, 'কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে' দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! '—কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।' যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নয়নে প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তূলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক-ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন-ভীষণ 'মূর্তি' মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষ্বেড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? 'সভয়ে' এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে 'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ' দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধবর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে— তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহো মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!

যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে শয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;— কী আর কহিব?

তখন

জলদপ্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কী হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!'

এ কথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোনো আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোনোমতে সহ্য হয় না, তরবারির উপরে সর্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভালো হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্পবয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎপরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।[1]

'রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন

১. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে উদ্‌ধৃত।

আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।... আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?... বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।... তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না।

...প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনো প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গে কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?— মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন-না, বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের ঊরুদেশ এবং পদাতিক মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে।... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধন দান ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্‌গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার

চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

'তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কীরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয়স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধিশৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনই তো আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরু লোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।'

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্রে কখনো কার্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন্ দুষ্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস। কিন্তু দেখ, এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ, আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য

এই প্রবন্ধে স্যাক্‌সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরস্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্‌সনদের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিডমন, বিউল্ফ্‌মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করিলে পর এক দল শেল্‌ট (celt) তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ওয়েল্‌স ও হাইল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রোমকদের অধিকৃত দেশে

প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইল, দৃঢ় প্রাচীরে নগরসমূহ বেষ্টিত হইল— বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইল— নর্দাম্বর্লন্ডের লৌহ, সমার্সেটের শীষক, কর্নওয়ালের টিন-খনি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে ব্রিটনের শোণিত ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করিল— তাহাদিগকে বিদ্যা শিখাইল— উন্নততর ধর্মে দীক্ষিত করিল— সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ দেখাইয়া দিল— কিন্তু কী করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে হয় তাহা শিখাইল না। সুশাসনে থাকাতে জেতৃজাতির উপর তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিল— কখনো যে বিপদে পড়িতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল, সুতরাং আত্মরক্ষণের ভাব অন্তর্হিত ও পরপ্রত্যাশার ভাব তাহাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সভ্যতা সে জাতির সর্বনাশ করিল। রোমকদের কর-ভারে নিপীড়িত হইয়াও তাহাদের একটি কথা বলিবার জো ছিল না। এক দল জমিদারের দল উত্থিত হইল— ও সেইসঙ্গে কৃষক দলের অধঃপতন হইল— কৃষকেরা জমিদারদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রোমকদিগের অধিকৃত ব্রিটনেরা ভিতরে ভিতরে অসার হইয়া আসিল। রোমক-পুঁথি পড়িতে ও রোমক-ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা মনে করিল ভারি সভ্য হইয়া উঠিয়াছি ও স্বাধীন শেল্ট ও পিক্টদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে মনে মহা ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রায় চারি শতাব্দী ইহাদের এইরূপ মোহময় সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিয়া সহসা একদিন রোমকেরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। গথেরা ইটালি আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং রোমকেরা নিজদেশ রক্ষা করিতে ব্রিটন ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অসভ্যতর শেল্ট, পিক্ট, স্কট প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুগণ চারি দিক হইতে ঝাঁকিয়া পড়িল— তখন সেই অসহায় সভ্য জাতিগণ কাঁপিতে কাঁপিতে জর্মনি হইতে অর্থ দিয়া সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিল। হেঞ্জেস্ট ও হর্সা তাহাদের সাহায্য করিতে সৈন্য লইয়া এবস্‌ফ্লিটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল।

ইহারাই অ্যাঙ্গল্‌স্ (Angles)। ব্রিটনেরা এবং রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাক্‌সন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce Spræc অর্থাৎ English Speech। হলান্ড হইতে ডেনমার্ক পর্যন্ত ওই যে সমুদ্র-সীমা দেখিতেছ, মেঘময়, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন আর্দ্রভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে— বহু শতাব্দী পূর্বে উহা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, সেই আরণ্য ভূভাগ অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের বাসস্থান ছিল। এমন কদর্য স্থান আর নাই। বৃষ্টি ঝটিকা মেঘে সেই দেশের মস্তকের উপর কী যেন অভিশাপের অন্ধকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দিবারাত্রি উন্মত্ত জলধি তীরভূমি আক্রমণ করিতেছে— এই ক্ষুভিত সমুদ্রের মুখে কোনো জাহাজের সহজে নিস্তার নাই। এই সমুদ্রতীরে, তুষার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন-ঝঞ্ঝাঝটিকা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার অরণ্যে ও জলায় শোণিত-পিপাসু সামুদ্রিক দস্যুদল বাস করিত। এই মনুষ্যশিকারীরা জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিত। সেই সময়কার রোমক কবি কহিয়াছেন, 'তাহারা আমাদের শত্রু; সমুদয় শত্রু অপেক্ষা হিংস্র, এবং যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। সমুদ্র তাহাদের যুদ্ধ-শিক্ষালয়, ঝটিকা তাহাদের বন্ধু; এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রেরা পৃথিবী লুণ্ঠন করিবার জন্যই আছে।' তাহারা আপনারাই গাহিত, 'ঝটিকা-বেগ আমাদের দাঁড়ের সহায়তা করে— আকাশের নিশ্বাসস্বরূপ বজ্রের গর্জন আমাদের হানি করিতে পারে না— ঝঞ্ঝা আমাদের ভৃত্য— আমরা যেখানে যাইতে ইচ্ছা করি সে আমাদের সেইখানেই বহন করিয়া লইয়া যায়।' স্ত্রীলোক এবং দাসদের উপর ভূমি কর্ষণ ও পশুপালনের ভার দিয়া ইহারা সমুদ্র ভ্রমণ, যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিতে যাইত। রক্তপাত করাই তাহারা মুক্ত স্বাধীন জাতির কার্য বলিয়া জানিত— স্বাধীনতা ও মুক্ত ভাবের ইহাই তাহাদের আদর্শ ছিল। নরহত্যা ও রক্তপাত তাহাদের ব্যবসায়, ব্যবসায় কেন, তাই তাহাদের আমোদ ছিল। Ragnar Lodbrog নামক গাথক গাহিতেছে—'অসি দিয়া আমরা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলাম;— আমার সুন্দরী পত্নীকে যখন প্রথম আমার পার্শ্বে শয্যায় বসাইলাম তখন আমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, সেই সময়েও কি আমার তেমনি আমোদ হয় নাই?' যখন এজিল (Egil) ডেনমার্কবাসী জার্লের কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেই

কন্যা তাঁহাকে 'তিনি কখনো নেকড়িয়া বাঘদিগকে গরম গরম মনুষ্য মাংস খাইতে দেন নাই ও সমস্ত শরৎকালের মধ্যে মৃতদেহের উপর কাক উড়িতে দেখেন নাই' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। তখন এজিল এই বলিয়া তাহাকে শান্ত করে 'আমি রক্তাক্ত অসি হস্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি, নর-দেহ-লোলুপ কাকেরা আমার অনুসরণ করিয়াছে। দারুণ যুদ্ধ করিয়াছি এবং মনুষ্য আলয়ের উপর দিয়া অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে রক্তের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি।' তখনকার কুমারীদের সহিত এইরূপ কথোপকথন চলিত। ইহাদের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটস্ বলেন যে ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক আপনার আপনার লইয়াই থাকে। এমন বিজনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি আর নাই। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেমন আপনার ভূমিটুকু লইয়া স্বতন্ত্র থাকে তেমনি আবার প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রামের সহিত স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। প্রত্যেক গ্রাম চারি ধারে অরণ্য বা পোড়োভূমির দ্বারা ঘেরা থাকে— সে ভূমি কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে— সেইখানে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইত— এবং সেইখানে সকল-প্রকার উপদেবতার আবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। যখন কোনো নূতন ব্যক্তি সেই অরণ্য বা পোড়োভূমির মধ্যে আসিত তখন তাহাকে শৃঙ্গ বাজাইয়া আসিতে হইত। নিঃশব্দে আসিলে শত্রুজ্ঞান করিয়া যার ইচ্ছা সেই বধ করিতে পারিত। ইহাদের সকলেরই প্রায় একটু একটু ভূমি থাকিত, এবং যাহাদের এইরূপ ভূমি থাকিত তাহাদের নাম কার্ল (churl) (মনুষ্য) ছিল। তাহাদিগকে Freenecked man (মুক্তস্কন্ধ মনুষ্য) কহিত— অর্থাৎ তাহাদের কোনো প্রভুর নিকট স্কন্ধ নত করিতে হইত না। তাহাদের আর-এক নাম ছিল 'শস্ত্রধারী' অর্থাৎ তাহাদেরই অস্ত্রবহন করিবার অধিকার ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে বিচারপ্রণালী ছিল না— প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা সাধন করিত। ক্রমে ন্যায় ও বিচার প্রচলিত হইল। তখনকার অপরিস্ফুট দণ্ডনীতি বলেন— চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ দাও, কিংবা তার উপযুক্ত মূল্য দাও। যাহার যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করিবে, তোমার নিজের সেই অঙ্গ দান করিতে হইবে, কিংবা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এ মূল্য যে দোষী ব্যক্তিই দিবে তাহা নহে, দোষী ব্যক্তির পরিবার আহত ব্যক্তির পরিবারকে দিবে। প্রত্যেক কুটুম্ব তাঁহার অন্য কুটুম্বের রক্ষক, একজনের জন্য সকলে দায়ী, ও একজনের উপর আর কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সকলে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পুরোহিত কেহ ছিল না— প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার পুরোহিত।

নিপীড়িত ব্রিটিশ জাতীয়েরা এই অ্যাঙ্গল্স্ সৈন্যদিগকে অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাঙ্গল্স্রা ব্রিটনে আসিয়া পড়িল। ব্রিটিশদিগের এত টাকা ও খাদ্য দিবার সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং অবশেষে তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল— ধনীগণ সমুদ্রপাড়ে পলায়ন করিল। দরিদ্র অধিবাসীরা পার্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু আহারাভাবে সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িত, অমনি নিষ্ঠুর স্যাক্সনদের তরবারি-ধারে নিপতিত হইত। দরিদ্র কৃষকেরা গির্জায় গিয়া আশ্রয় লইত— কিন্তু গির্জার উপরেই স্যাক্সনদের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ ছিল। গির্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়া আচার্যদিগকে বধ করিয়া একাকার করিত, কৃষক বেচারীরা আগুন হইতে পলাইয়া আসিয়া স্যাক্সনদের তরবারিতে নিহত হইত। ফ্র্যাঙ্ক জাতিরা গল্ অধিকার করিলে ও লম্বর্ডিগণ ইটালি অধিকার করিলে জেতারাই সভ্যতর জিত জাতিদের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ইংলন্ডে ঠিক তাহার বিপরীত হয়— স্যাক্সনেরা একেবারে ব্রিটন জাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া স্যাক্সনেরা ব্রিটনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়। তখন ইংলন্ড তাহাদেরই দেশ হইল। অল্পস্বল্প দুই-একটি ব্রিটন যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা কেহ কেহ স্যাক্সন প্রভুর দাস হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা ওয়েলস্ ও হাইলন্ডের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া গেল। এখনো শেল্টিক ভাষা-প্রসূত একপ্রকার ভাষা ওয়েল্সে

চলিত আছে।[১] ইংরাজি ভাষায় শেল্‌টিক উপাদান খুব অল্পই পাইবে। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল কেল্‌টিক বা শেল্‌টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল।

রোমকেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিয়াছিলেন তখন অধিকৃত জাতিদিগের রাজভাষা লাটিন ছিল। কিন্তু অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় তখনো লাটিনের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ইংলন্ডের কতকগুলি দেশের নাম কেবল রোমীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত দু-একটি অন্য কথাও রোমীয় ধাতু হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যেমন Cheese পনির কথা লাটিন Casens হইতে উৎপন্ন। স্যাক্‌সন munt (পর্বত) কথা বোধ হয় লাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর্বত হইতে নৈসর্গিক পদার্থের নামও যে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জর্মান সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে একটিও পর্বত নাই, সুতরাং সে দেশবাসীরা যে পর্বতের নাম না জানিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই।

জর্মান জাতিরা যখন স্পেন গল্‌ ও ইতালি জয় করিয়াছিল তখনো সে দেশের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু জর্মান জাতিরা ব্রিটন দ্বীপ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এমন আর কোনো দেশ পারে নাই। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে জর্মান সমাজ নির্মিত হইল। ব্রিটিশ আচার-ব্যবহার, ইতালির সভ্যতা, সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল, এবং এই সমতলীকৃত ভূমির উপর আর-একপ্রকার নূতনতর ও উন্নততর সভ্যতার বীজ রোপিত হইল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্‌সনদের রাজার প্রয়োজন হইল। পূর্বে তাহাদের রাজা ছিল না। যখন কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইত তখন একজনকে প্রধান বলিয়া লইয়া যাইত মাত্র। কিন্তু একটা দেশ অধিকার করিয়া রাখিতে হইলে ও ক্রমাগত তদ্দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে রাজা নহিলে চলে না। হেঞ্জেস্টের উত্তরাধিকারীরা কেল্‌টের রাজা হইল। এই-সকল যুদ্ধে স্যাক্‌সন জাতিদের মধ্যে দাস-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকে দাস হইতে হইত, এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত। ঋণ শুধিতে না পারিয়া অনেককে উত্তমর্ণের দাস হইতে বাধ্য হইতে হইত। বিচারে অপরাধী ব্যক্তির পরিবারেরা জরিমানা দিতে না পারিলে সে দোষী ব্যক্তিকে দাসত্ব ভোগ করিতে হইত। এইরূপে স্যাক্‌সনদের মধ্যে একটা দাসজাতি উত্থিত হইল। দাসের পুত্র দাস হইত ইহা হইতেই এই ইংরাজি প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে, আমার গোরুর বাছুর আমারই সম্পত্তি। দাস পলাইয়া গেলে পর ধরিতে পারিলে তাহাকে চাবুক মারিয়া খুন করিত বা স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিত। যখন ব্রিটনদের সহিত যুদ্ধ কতকটা ক্ষান্ত হইল, তখন তাহাদের আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। নর্দাম্বরলন্ডের রাজা ইয়ল্‌ফ্রিথ্‌ অন্যান্য অনেক ইংলিশ রাজ্য জয় করিলেন। কেবল কেন্টের রাজা ইথল্‌বার্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইয়ল্‌ফ্রিথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই দুই রাজ্যের মধ্যে তেমন বিবাদ বাধিতে পারে নাই। এই সময়ে খৃস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে ইংলন্ডে প্রবেশ করিল। প্যারিসের খৃস্টান রাজকন্যা বাক্‌টার সহিত ইথল্‌বার্টের বিবাহ হইল। রাজ্ঞীর সহিত একজন খৃস্টান পুরোহিত কেন্টের রাজধানীতে আসিল। এই বিবাহ-বার্তা শ্রবণে সাহস পাইয়া পোপ গ্রেগরি সেন্ট অগস্টিনকে ইংলন্ডে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেন্টের অধিপতি তাহাদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন ও কহিলেন 'তোমাদের কথাগুলি বেশ, কিন্তু নূতন ও

---

১. যে জাতিরা অ্যাংলো স্যাক্‌সন দলভুক্ত নয়, অথচ অ্যাংলো স্যাক্‌সনদের দেশের সীমায় বাস করিত, তাহাদিগকে স্যাক্‌সনেরা Wealhas বলিত, ইহা হইতে Wales নামের উৎপত্তি। এই কারণবশত ইটালির জর্মান নাম Welschland। ওই কারণেই আরও অনেক দেশকে জর্মনেরা Welsh, walloon, wallachia নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

সন্দেহজনক।' তিনি নিজে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু খৃস্টানদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। প্রচলিত ধর্মের সহিত অনেক যুঝাযুঝির পর খৃস্টান ধর্ম ইংলন্ডে স্থান পাইল।

ইংলন্ড-বিজেতাদের যে সকলেরই এক ভাষা ও এক জাতি ছিল তাহা নহে। এই খৃস্টান ধর্ম প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাষা ও জাতি অনেকটা এক করিয়া দিল। এই ভাষার ঐক্য সাহিত্যের অল্প উন্নতির কারণ নহে। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বে অক্ষরে লিখা প্রচলিত ছিল না। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিলে পর স্যাক্‌সনেরা নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইল ও তাহাদের হৃদয়ের উৎস উন্মুক্ত হইয়া সংগীত-স্রোতে অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য পূর্ণ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচার হওয়াতে স্যাক্‌সনদের মধ্যে রোমীয় সাহিত্য চর্চার আরম্ভ হইল ও বাইবেলের কবিতার উচ্চ আদর্শ স্যাক্‌সনেরা প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধোন্মাদে মত্ত থাকিয়া যে জাতি বিদ্যার দিকে মনোযোগ করিতে পারে নাই, খৃস্টীয় ধর্মের সহিত শান্তি ও ঐক্যে অভিষিক্ত হইয়া সম্মুখে যে ইতালীয় বিদ্যার খনি পাইল তাহাতেই তাহারা মনের সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য তাহারা অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য লাটিন ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী? অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় লিখিত অধিক প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না। অ্যালফ্রেডের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ভাষা Bec ledene (Book language) অর্থাৎ লিখিত ভাষা হইল। প্রাচীনতর পুস্তক যাহা-কিছু পাওয়া যায়, তাহা খৃস্টান ধর্মপ্রচারের পরে অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনতম অ্যাংলো স্যাক্‌সন কাব্যের মধ্যে Lay of Beowulf প্রধান। ইহা কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন খৃস্টান ধর্ম প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহার ধরন, ভাব অন্যান্য অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে, এই গীতি সাধারণ স্যাক্‌সন প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। স্কান্দিনেবীয় পৌরাণিক কবিতার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গল্পটির সারমর্ম এই, ডহাম গ্রেন্ডেল বলিয়া এক রাক্ষস ছিল, সে নিকটস্থ জলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রে গুপ্তভাবে তথাকার রাজবাটির মধ্যে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থিত ঘুমন্ত যোদ্ধাদের বিনষ্ট করিত; কেহ কেহ বলেন এই রাক্ষস জলার অস্বাস্থ্যজনক বাষ্পের রূপক মাত্র। বোউল্‌ফ নৃপতি তথায় গিয়া সেই রাক্ষসকে আহত ও নিহত করেন। তিনি ফেনগ্রীব (Foamy necked) জাহাজে চড়িয়া কিরূপে বিদেশীয় রাজসভায় আইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কীর্তি ইহাতে স্কান্দিনেবীয় সাগার ধরনে লিখিত। বোউল্‌ফ এক মহাবীর পুরুষ। 'তিনি উন্মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঘোরতর তরঙ্গে ও শীতলতম ঝঞ্ঝায় সমুদ্র পর্যটন করিয়াছেন, ও তাঁহার চারি দিকে শীতের তীব্রতা সমুদ্রের ঊর্মির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।' কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুঠারবিদ্ধ করিলেন। নয় জন সিন্ধুদৈত্য (NICOR) বিনাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা হ্রুথগার (Hrothgar)-কে গ্রেন্ডেল (Grendel) দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই আসিলেন। আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রাসাদে শুইয়া আছেন— 'নিশীথের অন্ধকার উত্থিত হইল, ওই গ্রেন্ডেল আসিতেছে, সকলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল'— একজন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে ধরিল, 'তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহাকে দংশন করিল, তাহার শিরা হইতে রক্তপান করিল, ও তাহাকে ক্রমাগত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।' এমন সময়ে বোউল্‌ফ উঠিলেন, দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। 'প্রাসাদ কম্পিত হইল ... উভয়েই উন্মত্ত। গৃহ ধ্বনিত হইল, আশ্চর্য এই যে, যে মদ্যশালা এই সংগ্রামশ্বাপদদিগকে বহন করিয়া ছিল, সে সুন্দর প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই। শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নূতন প্রকারের। যখন নর্থ ডেনমার্কবাসীরা আপনাদের গৃহভিত্তির মধ্যে থাকিয়া শুনিল যে সেই ঈশ্বর-দ্বেষী আপন ভীষণ পরাজয়-সংগীত গাহিতেছে, আঘাত-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে, তখন একপ্রকার ভয়ে

তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ...সেই ঘৃণ্য হতভাগ্যের মৃত্যু-আঘাত পাইতে এখনো বাকি আছে— অবশেষে সে স্কন্ধে ভীষণ আঘাত পাইল— তাহার মাংসপেশীসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল— অস্থির সন্ধিমূল বিভিন্ন হইল। সমরে বোউল্‌ফের জয় হইল।' বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদ গ্রেন্ডেল হ্রদে গিয়া লুকাইল। 'সেই হ্রদের তরঙ্গ তাহার রক্তে ফুটিতে লাগিল। হ্রদের জল তাহার শোণিতের সহিত মিশিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল। রক্ত-বিবর্ণ জলে শোণিতের বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল।' সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু গ্রেন্ডেলের মাতা, তাহার পুত্রের মতো যাহার 'অতি শীতল সলিলের ভীষণ স্থানে বাস নির্দিষ্ট ছিল' সে একদিন রাত্রে আসিয়া আর-একজন যোদ্ধাকে বিনাশ করিল। বোউল্‌ফ্ পুনরায় তাহাকে বধ করিতে চলিলেন। একটি পর্বতের নিকট এক ভীষণ গহ্বর ছিল— সে গহ্বর নেকড়িয়া ব্যাঘ্রদের আবাস স্থান। পর্বতের অন্ধকারে ভূমির নিম্ন দিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষসমূহ শিকড় দিয়া সেই নদী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে সেখানে গেলে দেখা যায় সে স্রোতের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সে অরণ্যে কেহ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে বরং তীরে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাইবে তবুও সে স্রোতে লুকাইতে সাহস পাইবে না। অদ্ভুতাকৃতি পিশাচ (Dragon) ও সর্পসমূহ সেই স্রোতে ভাসিতেছে। বোউল্‌ফ সেই তরঙ্গে ডুব দিলেন; বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই রাক্ষসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া তাহার আবাস স্থানে লইয়া গেল। সেখানে এক বিবর্ণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে সম্মুখাসম্মুখি দাঁড়াইয়া বীর সেই পাতালের বাঘিনী মহাশক্তি নাগিনীকে দেখিলেন। অবশেষে তাহাকে বধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে কথিত আছে : পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলে পর এক ড্র্যাগন (Dragon) আসিয়া 'অগ্নি-তরঙ্গে' মনুষ্য ও গৃহ নষ্ট করিতে লাগিল। বোউল্‌ফ এক লৌহ-চর্ম নির্মাণ করিলেন। এবং তাহাই পরিধান করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে গেলেন। 'নৃপতির এমন উদ্ধত গর্ব ছিল যে, সেই পক্ষবান রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে অধিক সঙ্গী ও সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না।' কিন্তু তথাপি কেমন বিষণ্ণ হইয়া অনিচ্ছার সহিত গেলেন, কেননা এইবার তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে। সেই রাক্ষস অগ্নি উদ্‌গার করিতে লাগিল। তাহার শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। রাজা সেই অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। উইগ্‌লাফ ব্যতীত তাঁহার অন্য সমস্ত সহচর বনে পলায়ন করিল। উইগ্‌লাফ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের উভয়ের খড়্গাঘাতে সেই ড্র্যাগন বিচ্ছিন্ন-শরীর ও বিনষ্ট হইল। কিন্তু রাজার ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল ও জ্বলিতে লাগিল, 'তিনি দেখিলেন তাঁহার বক্ষের মধ্যে বিষ ফুটিতেছে।' তিনি মৃত্যুকালে বলিলেন, 'পঞ্চাশ বৎসর আমি এই-সকল প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। এমন কোনো রাজা ছিল না যে আমাকে ভয় দেখাইতে বা আমার নিকট সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিত। আমার যাহা-কিছু ছিল তাহা ভালোরূপ রক্ষা করিয়াছি, কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অন্যায় শপথ করি নাই। যদিও আমি মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই-সকল কারণে তথাপি আমার আনন্দ হইতেছে। প্রিয় উইগ্‌লাফ! এখনি যাও, ওই শ্বেত-প্রস্তর-শালা (দৈত্যের আবাস) অনুসন্ধান করিয়া দেখো, গুপ্তধন পাইবে। আমার জীবন দিয়া ধনরাশি ক্রয় করিয়াছি, উহা আমার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগিবে। আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রজাদের জন্য এই যে ধন পাইয়াছি ইহার নিমিত্ত দেবতার নিকট ঋণী রহিলাম।' এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার চরিত্রে প্রতিপদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সংকুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতা হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে। ইহাতে চিন্তার কোনো সংস্রব নাই। ইহার কবিতা কতকগুলি ভাঙা ভাঙা কথার সমষ্টিমাত্র— ছন্দও তেমনি ভাঙা ভাঙা, ঠিক যেন হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভালো করিয়া বাহির হইতেছে না। 'সৈন্যদল

যাইতেছে, পাখিরা গাইতেছে, ঝিল্লিরব হইতেছে, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ উঠিতেছে— বর্মের উপর বর্শাঘাতের ধ্বনি হইতেছে। ওই উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের তলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্যসকল দৃষ্টিগোচর হইল।... প্রাঙ্গণে যুদ্ধ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহারা কাষ্ঠের ঢাল হস্তে ধারণ করিল। তাহারা মস্তকের অস্থিভেদ করিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিল। দুর্গের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইল।... অন্ধকারবর্ণ অশুভদর্শন কাকেরা চারি দিকে উইলোপত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।'

অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতায় প্রেমের কথা নাই বলিলেও হয়; কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। 'বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুচরকে আলিঙ্গন করিলেন— দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বৃদ্ধ অধিপতির কপোল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে বীর তাঁহার এত প্রিয় ছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে যে অশ্রুধারা উত্থিত হইল তাহা নিবারণ করিলেন না! হৃদয়ে মর্মের গভীর তন্ত্রীতে তাঁহার প্রিয় বীরের জন্য গোপনে নিশ্বাস ফেলিলেন।'

কোনো দেশান্তরিত ব্যক্তি তাহার প্রভুকে স্বপ্নে দেখিতেছে— যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন করিতেছে, যেন তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতেছে। অবশেষে যখন জাগিয়া উঠিল, যখন দেখিল সে একাকী, যখন দেখিল সম্মুখে জনশূন্য প্রদেশ বিস্তীর্ণ, সামুদ্রিক পক্ষীরা পক্ষবিস্তার করিয়া তরঙ্গে ডুব দিতেছে, বরফ পড়িতেছে, তুষার জমিতেছে, শিলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন সে কহিয়া উঠিল—

'কতদিন আনন্দের সহিত আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, অবশেষে তাহা মিথ্যা হইল, যেন আমাদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। কষ্ট দিবার জন্য মানুষেরা আমাকে এই অরণ্যে এক ওক্ বৃক্ষের তলে এই গহ্বরে বাস করিতে দিয়াছে। এই মৃত্তিকার নিবাস অতি শীতল, আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। গহ্বরসকল অন্ধকার, পর্বতসকল উচ্চ, কণ্টকময় শাখা-প্রশাখার নগর, এ কী নিরানন্দ আলয়!... আমার বন্ধুরা এখন ভূগর্ভে— যাহাদের ভালোবাসিতাম, এখন কবর তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। কবর তাহাদের রক্ষা করিতেছে— আর আমি একাকী ভ্রমিয়া বেড়াইতেছি। এই ওক্ বৃক্ষতলে এই গহ্বরে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।'

অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতার ছন্দ বড়ো অদ্ভুত। ইহার মিল নাই বা অন্য কোনো নিয়ম নাই, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুই-তিনটি এমন কথা থাকিবে যাহার প্রথম অক্ষর এক, যেমন—

Ne wæs her tha giet, nym the heolstirsceado
Wiht geworden ; ac thes wida grund
Stood deop and dim, drihtne fremde.
Idel and unnyt.

অ্যাংলো স্যাক্‌সন খৃস্টান কবিদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম, কিডমন (Cædmon)। অনেক বয়স পর্যন্ত কিডমন কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। একদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় সকলে বীণা লইয়া পর্যায়ক্রমে গান গাইতেছিল, কিডমন যেই দেখিলেন, তাঁহার কাছে বীণা আসিতেছে, অমনি আস্তে আস্তে সভা হইতে উঠিলেন এবং বাড়ি প্রস্থান করিলেন। একদিন রাত্রে এক অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন একজন কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে, 'কিডমন, আমাকে একটা গান শুনাও!' কিডমন কহিলেন, 'আমি যে গাইতে পারি না।' সে কহিল, 'তাহা হউক, তুমি গাহিতে পারিবে।' কিডমন কহিলেন, 'কী গান গাইব।' সে কহিল, 'সৃষ্টির আরম্ভ বিষয়ে।' ঘুম ভাঙিয়া গেলে কিডমন আবেস্ হিলডার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; আবেস্ মনে করিলেন কিডমন দেবপ্রসাদ পাইয়াছেন, তিনি কিডমনকে তাঁহার দেবালয়ের সন্ন্যাসী-দলভুক্ত করিয়া লইলেন। কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিডমনকে বাইবেল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে

পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিডমনের স্বপ্ন-আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির বিষয়ে কিডমন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল।
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দস্থান! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির-নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর-আজ্ঞায়।
মহান ক্ষমতাবলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।
নির্মিলা আকাশ; আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন।
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিল না হরিত,
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত,
পথ ছিল সুদূর-বিস্তৃত, অন্ধকার!
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরে আসিতে
এ মহা আঁধার স্থানে। মুহূর্তে অমনি—
ইচ্ছা পূর্ণ হল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

কিডমন ইজিপ্টের ফ্যারাওর (Pharaoh) যুদ্ধে মৃত্যুবর্ণনা করিতেছেন—

ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল!
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্তনাদ,
পর্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত,
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্গার,
উঠিল মৃত্যু-আঁধার, গর্জিল তরঙ্গ,
পলা'ল ইজিপ্টবাসী ভয়ে কম্পান্বিত!

. . .

সমুদ্র তরঙ্গরাশি মেঘের মতন
ধাইয়া তাদের পানে, পড়িল ঝাঁপিয়া;
গৃহে আর কাহারেও হল না ফিরিতে
যেথা যায় সেখানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল তাহাদের বল,
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া,
করিল সে শত্রুদল দারুণ চীৎকার!
মৃত্যুর নিদানে বায়ু হল ঘনীভূত!

পাঠকেরা যদি মিলটনের শয়তানের সহিত কিডমনের শয়তানের তুলনা করিয়া দেখেন তবে অনেক সাদৃশ্য পাইবেন।

কেন বা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত?
তাঁর মতো আমিও বিধাতা হতে পারি।
তবে শুন— শুন সবে বীর-সঙ্গীগণ
তোমরা সকলে মোর করো সহায়তা,
তা হলে এ যুদ্ধে মোরা লভিব বিজয়।
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ
আমারেই রাজা ব'লে করেছে গ্রহণ।
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে,
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদের লয়ে!

. . .

ইহাদেরি রাজা হয়ে শাসিব এ দেশ,
তবে কী কারণে হব তাঁহারি অধীন?
কখনো— কখনো তাঁর হইব না দাস।

আর-এক স্থলে— উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান—
ঈশ্বর যে সুখ-ভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সংকীর্ণ আবাসের কী ঘোর প্রভেদ।
যদি কিছুক্ষণ তরে পাই গো ক্ষমতা—
এক শীত ঋতু তরে হই মুক্ত যদি
তাহা হলে সঙ্গীগণ ল'য়ে— কিন্তু হায়—
চারি দিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন!
এই ঘোর নরকের দৃঢ়মুষ্টি মাঝে
কী দারুণরূপে আমি হয়েছি আবদ্ধ!
ঊর্ধ্বে, নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখি নি কখনো!

বীরের নৈরাশ্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে শয়তান স্থির করিলেন যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্যের কোনো অপকার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি 'এই শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়াও সুখে ঘুমাইবেন'।

ইতিমধ্যে ডেনিসরা একবার ইংলন্ড আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অ্যালফ্রেড তাহাদিগকে দমন করেন। নবম শতাব্দীতে অ্যালফ্রেডের রাজত্বকালে অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য চরম উন্নত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। অ্যালফ্রেডের এই একমাত্র বাসনা ছিল যে, যাহাতে 'মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সৎকার্যের স্মরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন'। সে বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান যোদ্ধা ছিলেন, ও তখনকার ইংলন্ডের অন্যান্য রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে হয়তো তিনি সমস্ত ইংলন্ড বশে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার অভিলাষ ধাবিত হয় নাই, শান্তিস্থাপনা, সুশাসন ও নিজ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। অ্যালফেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্‌ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে, তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও মহান অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাঁহার উচ্চ আশা ও স্বার্থ পরিতৃপ্ত করিতে কিছুমাত্র মন দেন নাই, প্রজাদের মঙ্গলই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এমন একদিন ছিল যখন বিদেশ হইতে লোকে ইংলন্ডে বিদ্যা শিখিতে আসিত, কিন্তু এখন বিদ্যা শিখিতে গেলে বিদেশীদের নিকট শিখিতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিলেন। অ্যালফ্রেড যদিও অনেক লাটিন

পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁর লাটিন অতি অল্পই জানা ছিল; অতি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন : 'যদি আমার চেয়ে কেহ অধিক লাটিন জান, তবে আমায় কেহ দোষ দিয়ো না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা কহিবে ও কাজ করিবে।' তাঁহার অনুবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লাটিনের অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যালফ্রেডই অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। তখনকার অজ্ঞলোকদের বুঝাইবার জন্য তাঁহার অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক ছত্র ভাঙিতে গিয়া তাঁহাকে দশ ছত্র লিখিতে হইয়াছিল। ইঁহার সময় হইতেই ইংলন্ডের Chronicle অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু সে অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র লিখিত আছে।

আবার ডেনিসরা ইংলন্ড আক্রমণ করে; এবার ইংলন্ড তাহাদের হস্তগত হইল। ডেনিসদের সহিত স্যাক্সনদের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিশেষ কিছুই প্রভেদ ছিল না। কান্যুট প্রজাদের কীরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, অ্যাংলো স্যাক্সন রাজত্বের শেষভাগে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়া আসিয়াছিল। ধর্মাচার্যগণ অলস বিলাসী অজ্ঞ, সাধারণ লোকেরা নীতিভ্রষ্ট ও ধূর্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইংলন্ডে নর্মান সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়া দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। যাহা হউক, ডেনিসরাজ্য শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

খৃস্টীয় ধর্ম প্রবেশ করিলে পর ইংরাজি ভাষায় অনেক রোমীয় কথা প্রবেশ করে। কিন্তু নর্মান অধিকারের সময়েই অধিকাংশ লাটিন-ধাতুজাত কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত হয়। অনেক ডেনিস কথা ইংরাজিতে পাওয়া যায়।

যখন স্যাক্সনেরা তাহাদের আদিম দেশে ছিল তখন তাহাদের স্বভাব কীরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি। যখন ইংলন্ডে আসিয়া তাহারা একটা স্থায়ী বাসস্থান পাইল, তখন তাহাদের বিলাসের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে কীরূপ বিলাস? মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সে বিলাস নহে। যে বিলাসের সহিত সুকুমার বিদ্যার সংস্রব আছে, ইহা সে বিলাস নহে। অ্যাংলো স্যাক্সনদের শিল্প দেখো, নাই বলিলেও হয়; তাহাদের কবিতা দেখো, কেবল রক্তময়। কবিতার যে অংশের সহিত শিল্পের যোগ আছে— ছন্দ, তাহা স্যাক্সন ভাষায় অতি বিশৃঙ্খল। লাটিন সাহিত্যের আদর্শ পাইয়াও তাহাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। স্যাক্সনদের হৃদয়ে সুন্দর-ভাবের আদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়— তাহাদের বিলাস আর কী হইতে পারে? আহার ও পান। সমস্ত দিনরাত্রি পানভোজনেই মত্ত থাকিত। এড্‌গারের সময় ধর্মমন্দিরে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নাচ গান পান ভোজন চলিত। পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্যেরা (আর্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল; সে উপায়টি— দিনরাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মতো অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না— অসভ্য সংগীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়। রক্তপাত ও লুটপাট ছাড়া আর কথা ছিল না। দাস ব্যবসায় যদিও আইনে বারণ ছিল, কিন্তু সে বারণে কোনো কাজ হয় নাই— নর্মান রাজত্ব সময়ে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। গর্ভবতী দাসীদিগের মূল্য অনেক বলিয়া তাহারা স্ত্রী দাসীদিগের প্রতি জঘন্য আচরণ করিত। তবুও খৃস্টধর্ম ইহাদের অনেকটা নরম করিয়া

আনিয়াছিল। স্যাক্‌সনদের বুদ্ধি তখন তীব্র নহে। তাহাদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাহাদের কবিতার উপাখ্যানসমূহের ভালোরূপ ধারাবাহিক যোগ নাই, তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না। স্যাক্‌সনদের মধ্যে বিদ্যা-প্রচার করিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কেহই কৃতকার্য হয় নাই। স্যাক্‌সন ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ হয় তাহা কয়েক শতাব্দী মাত্র থাকে, তাহার পরেই আবার সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। নর্মানরা আসিয়া স্যাক্‌সন খৃস্ট-পুরোহিতদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়। অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য অতি সামান্য। অ্যালফ্রেডের গদ্যগ্রন্থ ও বোউল্‌ফ এবং অন্যান্য দুই-একটি কবিতা লইয়াই তাহাদের সাহিত্যের যথা-সর্বস্ব।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন জাতীয়দিগের প্রধান গুণ। তাহাদের সমস্ত স্বভাব পৌরুষেই গঠিত। সকলেই আপনার আপনার প্রভু। রাজার সহিত প্রজার তেমন প্রভেদ ছিল না— স্যাক্‌সন রাজ্যের শেষাশেষি সেই প্রভেদ জন্মে। জর্মনিতে ভীরুদিগকে পঙ্কে পুঁতিয়া বিনষ্ট করিত। স্যাক্‌সনেরা যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে তাহার জন্য সকলই করিতে পারে। যে তাহার প্রধানকে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তাহার বড়ো অখ্যাতি। যে প্রধানের গৃহে তাহারা মদ্যপান করিয়াছে, যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসের চিহ্ন তরবারি ও বর্ম পাইয়াছে তাহার জন্য প্রাণদান করিতে তাহারা কাতর নহে— এ ভাব তাহাদের কবিতার যেখানে-সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। স্যাক্‌সন জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্য-প্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৫

বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে (Beatrice)। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন-কাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র (Vita Nuova) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা, ইহার কিয়দ্দুর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল— তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রিচেকে দূর-স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

'এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম— সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে— যে পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রিচে) জানিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছুদিন যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাঁহার বিষয়ে এমন লিখিব, যাহা এ পর্যন্ত কোনো মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনো লেখে নাই।' এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'ডিভাইনা কামেডিয়া' (*Divina Commedia*) লিখেন ও বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোনো মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখনো বলে নাই।

দান্তে তাঁহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রিচেকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান-প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ— দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতি দূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রিচেকে দেখিতেন, অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রিচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত! বিয়াত্রিচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রিচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রিচেকে মানুষ হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়, তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম-প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্তও স্থান পায় না। যদিও 'ভিটা নুওভা' কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রিচে, কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রিচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই, বিয়াত্রিচে সর্বদাই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, 'যে ব্যক্তিই বিয়াত্রিচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে, তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।' দান্তে বলেন, 'যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।' দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রিচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের 'ডিভাইনা কামেডিয়া'র নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়াই অমনি সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে— দেবতারা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছে। বিয়াত্রিচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই 'ভিটা নুওভা'র আরম্ভ—

'যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য তাঁহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহান মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।... তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি কটিবন্ধ ও বাল্যবয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলংকার। সত্য বলিতেছি তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায় শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম) কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথাগুলি বলিল ওই দেখো, আমা অপেক্ষা সবলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন;... সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হইল।... দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রিচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রশংসনীয়; তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্থাৎ 'তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে'। বিয়াত্রিচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান; সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রিচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয় : 'উপরি-উক্ত মহান মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-বসনা, সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়জনক মহিলা আর-একবার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া

দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।... এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে, সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নের বিষয় সেই-সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া ও তাঁহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেম-বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সংগীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্ মোরে অর্থ কী ইহার?
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন;
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর;
বাহু-'পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ-আকার!

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; আবার যে গূঢ় কথা সকল-কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল— 'কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ?' আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রিচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কী আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা 'সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িতা, পুণ্যের রাজ্ঞী-স্বরূপার' কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, 'এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন আমার সুখের একমাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা-কিছু দোষ করিয়াছে সমুদায় মার্জনা করিতাম।' এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন,

জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জন স্থান পাইলেন সেইখানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম উচ্ছ্বাস-বেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জন গৃহে গিয়া 'কাতর শিশুর' ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবার কোনো বন্ধুর বিবাহ-সভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নব বধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রিচে। তিনি এমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রিচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— 'যদি এই মহিলা (বিয়াত্রিচে) আমার অবস্থা জানিতেন, তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাঁহার দয়া হইত!'

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এ পর্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাঁহাকে তুমি ভালোবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রেই তুমি যদি অমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালোবাসিবার ফল কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এ পর্যন্ত আমার ভালোবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কারই আমার ইচ্ছার একমাত্র গম্যস্থান ছিল— কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক— প্রেম আমাকে এমন আর-একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোনো কালেই শেষ হইবে না।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কোন্ সুখ?' দান্তে কহিলেন, 'আমার মহিলার প্রশংসা গান।' তাঁহার মহিলার প্রশংসার গান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

রমণি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
ব'লে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাঁহার—
মন খুলে ব'লে তবু জুড়াইবে মন!
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান—
তাহা হতে মহত্তর চরিত তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরান,
চির বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশোগান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আনি—
কিন্তু থাক্— গাব নাকো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কী জানি!
আমার এ ভালোবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভালো তোমাদের কানে!
স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
'দেখো প্রভু, দেখো চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে,
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে!
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ।

তাই দেব অনুনয় শুন গো আমার,
দেবতার মাঝে তারে করো আনয়ন।'
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন, 'ধৈর্য ধরো, আসুক সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা তার ভয়।'

...

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

...

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন!
মুকুতার মতো পাণ্ডু বরন তাহার—
প্রকৃতির পূর্ণতম-শিল্প সেই জন,
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার!
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদিত—
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি তো যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব কোরো না কভু, বলো তাঁহাদের—
'দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহা যশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।'
যদিবা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখো যেন রহিয়ো না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জ্ঞান, মন ভালো নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিয়ো হে গীত তুমি তোমার হৃদয়!
মহিলা আমার বসি আছেন সেখানে [যেখানে,]
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তাঁরে মোর কথা তুমি দিয়ো বুঝাইয়া!

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে হইল, বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইবে। কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে, 'তোমার মৃত্যু হইবে।' কেহ বা কহিতেছে, 'তুমি মরিয়াছ।' তিনি দেখিলেন যেন সূর্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারি দিকে পাখিরা মরিতেছে ও পড়িতেছে— এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে কহিল, 'জান না তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?' তিনি যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুকালীন

প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন।

একদিন তিনি মনে করিলেন, এ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে স'য়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ ব'লে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার!
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরান,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে!
প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ-ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীনভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল— সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল 'যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কী নির্জন হইয়াছে! সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তম ছিল সে জাতি আজ কী বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে!' বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইয়াছে— এই সংবাদ শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সংগীত থামিয়া গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর চলিত ভাষায় লিখা যায় না, গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার আর কী সান্ত্বনা হইতে পারে? তিনি বিয়াত্রিচের মৃত্যু ও জন্মতিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ গণনার অনুসারে স্থির করিলেন— বিয়াত্রিচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃস্টীয় ত্রিমূর্তির (Holy Trinity) কোনো-না-কোনো যোগ আছে।— এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল! তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে নগরের কী দুর্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন— তাঁহার বিশ্বাস হইল, যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য কর্ম।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল— যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া—
নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়

(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশ এ দেহ মোর কবরের পানে,)
তবে তাহা মৃত্যু, কিংবা প্রকাশি এ ব্যথা।
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্মের কথা,
হে রমণি তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক-অশ্রুজল—
তখন যা-কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি বলিব গো তোমাদেরি কাছে।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন— বিয়াত্রিচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই! ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন— ঈশ্বর দেখিলেন— এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সংগীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সংগীত আমার,
যাও সেথা যেইখানে রমণীরা আছে,
আগে তুমি যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে!
এখনো তাদেরি কাছে করো গো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান!

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাঁহার পূর্ব-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য চারি দিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন— একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল! সেদিন চলিয়া গেলেন— কিন্তু আবার তাহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর-একদিন সেইখানে গেলেন— আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন— দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রিচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে 'প্রেমের বর্ণ' নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন, 'আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।' পরক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'চক্ষু! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে মহিলার (বিয়াত্রিচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস, সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ওই রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন?' কিন্তু ওই তিরস্কার বৃথা! আপনাকে ভর্ৎসনা করিলেন কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যেদিকে মন ধাবিত হয়, তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না।— অবশেষে স্থির করিলেন— প্রেম তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই উক্ত মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন— অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এইরূপে নূতন-প্রেম যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে একদিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিত-বসনা বিয়াত্রিচেকে দেখিতে পাইলেন— ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছে চলি, ওগো যাত্রীদল
যেন কোন্ দূর বস্তু করি কল্পনা—
মোদের দহিছে যেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশে নি যেন সে যাতনা!
তোমাদের নিজদেশ এতই কি দূরে?
এ শোকার্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জান না, এ পুরে
কী মহান শোকানল দহিতেছে হিয়া!
তবু যদি একবার দাঁড়াও হেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শোনো মন দিয়া—
তা হলে বিদায়কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর,
সেই বিয়াত্রিচে-হারা অভাগা নগর!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে ইহার পরে আর-একটি মাত্র গীতি আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল, সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রিচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রিচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, ভাবিলেন, তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয় যে, সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া 'ভিটা নুওভা' কাব্য শেষ করিলেন।

বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য 'ডিভাইনা কমিডিয়া' (*Divina Commedia*)। 'ভিটা নুওভা' লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে দান্তের কবিতার বহির্ভূক্ত জীবনের বিষয়ে দুই-এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী; ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, একদল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। 'ভিটা নুওভা' কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোনো বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন— মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই— কেবল বিয়াত্রিচের আরাধনা! যখন তিনি বিয়াত্রিচের প্রতি-হাস্যে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দরিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যাল্‌ডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েলফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে একদলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর শাসনকার্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনো কার্য ছিল না। রাজকার্যে নগরীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসকদলভুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মতো নির্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল— তখন ফ্লোরেন্সবাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্বাসনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যখন বিয়াত্রিচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজ-বিপ্লব ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রিচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি মান যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন—

জীবনের মধ্যপথে দেখিনু সহসা,
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কী ভীষণ অতি দারুণ গহন—
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত!
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক!

জীবনের মধ্য পথে, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন— তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে— সে তাঁহার রাজ্য-শাসন-কার্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অর্ধ অজ্ঞানের মতো হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র, চিতাব্যাঘ্র সুখতৃষা, সিংহ দুরাশা ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এইরূপে এই-সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

হেনকালে সহসা দেখিনু এক জন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—
'জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও-না কেন
দয়া করো মোরে' আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে।

ইনি আর কেহ নহেন— কবি বর্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

মহাছায়া কহিলেন 'মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হয়েছে তব বৃথা অভিভূত—
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া— তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হতে হয় গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়—
প্রথমে কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হল মোর, কহি তোরে তাহা!
পরলোকে থাকে যারা সংশয় আঁধারে—

তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পুণ্যময় মূর্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
দেবতার স্বরে সুর বাঁধি, কহিলেন—
'অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ!—
বন্ধু এক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা বিঘ্ন পেয়ে—
ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি।
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি!
উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে-কোনো উপায়ে,
ফিরাইয়া আনো, তবে লভিব বিরাম!
আসিয়াছি স্বর্গ হতে বিয়াত্রিচে আমি
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ,

বর্জিল সেই বিয়াত্রিচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট-পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জিলের সহিত নরক-দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় স্বর্গে দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে!
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের!
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন— সেখানে দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—

তারকা-অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চীৎকার
করতালি— কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ-ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চার দিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত!

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফর্নো, অর্থাৎ নরক— ক্রমাগত নরকের বর্ণনা; পরে পর্গেটরি— অর্থাৎ যাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি— পরে স্বর্গ। ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনার বিবরণ পাঠকদিগের নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম, পর্গেটরি কাব্যের শেষভাগে বিয়াত্রিচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল।— বর্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য রথে বিয়াত্রিচে আসিতেছেন। সুরবালারা তাঁহার চারি দিকে এমন পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন যে, তাঁহার আকার অতি অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে, দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই— তিনি কহিতেছেন,

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারে নি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র-পুণ্য-জ্যোতি,
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু।
কবি বর্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিংবা শোক-ভারে হলে বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে!
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়,
পুরানো সে অগ্নি পুন উঠিছে জ্বলিয়া।'
হা— বর্জিল কোথা— হয়েছেন অন্তর্ধান!
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জিলের এই সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রিচে কহিলেন যে 'দান্তে, কাঁদিয়ো না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।' সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রিচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন, 'চাহিয়া দেখো, আমি বিয়াত্রিচে।' বিয়াত্রিচের সেই 'অটল মহিমায়' দান্তে 'জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের' ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রিচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্পবয়সে দান্তের হৃদয় ধর্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রিচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালোবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রিচের তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ-বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গ দর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গনরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,

তেমনি আমারো হল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

পিত্রার্কা ও লরা

এ কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে, দান্তের মতো পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত য়ুরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে, সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে, সেইজন্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের কথাই বর্ণনা করিতেছি।

দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভালো করিয়া কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনো যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। পিত্রার্কা কহিয়াছেন, লরা সংগীত ও কবিতার প্রতি উদাসীন। তাঁহার সমক্ষে তাহার মুখশ্রী সর্বদাই দৃঢ় ভাব প্রকাশ করিত। পিত্রার্কা তাঁহার অসংখ্য চিঠির মধ্যে একবার ভিন্ন কখনো লরার নামোল্লেখ করেন নাই, বোধ হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি সাধারণ চিঠিপত্রে লরার নাম ব্যবহার করিতে তিনি কেমন সংকোচ বোধ করিতেন, বোধ হয় মনে করিতেন তাহাতে সে নামের গৌরব হানি হইবে। লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—

যে রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবির্ভূত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন— 'সেই স্ত্রীলোক, যাহাকে দেখিয়া অবধি তোমার তরুণহৃদয় জন-কোলাহল হইতে বিভিন্ন পথে গিয়াছে, তাহাকে চেনো!' যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল, তখন তিনি কহিলেন, 'যতদিন তুমি পৃথিবীর দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। পবিত্র হৃদয়েরা জানেন, মৃত্যু অন্ধকার-কারাগার হইতে মুক্তি। যদি আমার আনন্দের এক-সহস্রাংশও তুমি জানিতে, তবে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখ অনুভব করিতে।' এই বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গের দিকে নেত্র ফিরাইলেন। তিনি নীরব হইলে আমি কহিলাম, 'ঘাতকদিগের দ্বারা প্রযুক্ত যন্ত্রণা ও বার্ধক্যের ভার কি সময়ে সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে না?' তিনি কহিলেন, 'স্বীকার করি, যন্ত্রণা ও সম্মুখস্থ অনন্তকালের আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্বে অনুভব করা যায়, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তবে প্রাণত্যাগ নিশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হয়। আমার

বিকশিত যৌবনের সময় যখন তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসিতে, তখন জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া ছিল, কিন্তু যখন আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম, তখন নির্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন তোমার প্রতি দয়া ভিন্ন অন্য কষ্ট পাই নাই।' আমি বলিয়া উঠিলাম, 'সেই সত্যপ্রিয়তা যাহা তুমি পূর্বে জানিতে এবং সর্বান্তর্যামীর নিকট থাকিয়া এখন যাহা অধিকতর জান, সেই সত্যপ্রিয়তার নামে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলো, আমার প্রতি সেই দয়া কি প্রেমের দ্বারাই উত্তেজিত হয় নাই?' আমার এই কথা শেষ না হইতে হইতেই দেখিলাম, সেই স্বর্গীয় হাস্য, যাহা চিরকাল আমার দুঃখের উপর শান্তি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সেই হাস্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল— তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ও কহিলেন, 'চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম!' মাতা যখন তাহার পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, তখন যেমন তাঁহার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এমন আর কখনো নয়। কতবার আমি মনে মনে করিয়াছি— 'উনি উন্মত্ত অনলে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব উঁহাকে আমার হৃদয়ের কথা কখনো বলিব না। হায়, যখন আমরা ভালোবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি, তখন এ-সব চেষ্টা কী নিষ্ফল কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, কিন্তু তখন হয়তো আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতেছিল। যখন দেখিতাম তুমি বিষাদের ভরে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়তো তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়তো কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তুমি হয়তো তাহা দেখিয়াছ! যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়তো আমি আমার একটি দৃঢ়-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম! এই-সকল কৌশল, এই-সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনো অনুগ্রহ, কখনো দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনো সুখী কখনো বা অসুখী করিয়াছি, যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমাকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম, এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম— এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ উপভোগ করি!' যখন তিনি কহিতে লাগিলেন, আমার নেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল— আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলাম— যদি আমি তাঁহার কথা স্পর্ধাপূর্বক বিশ্বাস করিতে পারি, তবে আমি আপনাকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করি!— আমাকে বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল 'হা— অবিশ্বাসী, সংশয় করিতেছ কেন? যদিও আমার হৃদয়ে যেমন ভালোবাসা ছিল আমার নয়নে তেমন প্রকাশ পাইত কি না, সে কথা আমার রসনা কখনোই ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি— তোমার ভালোবাসায়, বিশেষত তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন-কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন্য জন্মে। তুমি যতই দয়ার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিয়াছ, আমি ততই লজ্জা ও ভয়ে নীরব হইয়া গিয়াছি। তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল— তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম— কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।' তাঁহার অনুরক্ত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার আর কত বিলম্ব আছে? লরা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'যতদূর আমি জানি তাহাতে তুমি আমার বিয়োগ সহিয়া অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিবে।' পিত্রার্কা লরার মৃত্যুর পর ছাব্বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

এইরূপে পিত্রার্কা লরার দৃঢ়তা, তাঁহার প্রতি উদাসীনতার মধ্য হইতেও তাঁহার আপনার ইচ্ছার অনুকূল অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, লরার

তাঁহার প্রতিই এত বিশেষ উদাসীনতার কারণ কী, তিনি তো তাহার বিরক্তিজনক কোনো কাজ করেন নাই। অবশ্যই লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। এই মীমাংসা অনেকে বুঝিতে না পারুন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকটা সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লরা যদি তাঁহাকে ভালো না বাসিত, তবে অন্য লোকের সহিত যেরূপ মুক্তভাবে কথাবার্তা করিত, তাঁহার সহিতও সেইরূপ করিত; এ কথাটার মধ্যে অনেকটা হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা যে ঠিক সত্য, তাহা বলা যায় না, লরা যে তাঁহাকে ভালোবাসিত, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। পিত্রার্কা যেরূপ প্রকাশ্যভাবে কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর আরাধনা করিতেন, তাহাতে লরা তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিবেচনার কাজ করিয়াছিল— পিত্রার্কার সহিত সামান্য কথোপকথনেও তাহার উপর লোকের সন্দিগ্ধচক্ষু পড়িত, সন্দেহ নাই। বিশেষত লরার স্বামী অতিশয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে লরা অতিশয় সুগৃহিণী ছিল বলিয়াই তো স্থির হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই লরা মনে মনে পিত্রার্কাকে ভালোবাসিতেন, তবে আমরা লরার একটি মহান মূর্তি দেখিতে পাই— ভালোবাসিয়াছেন অথচ প্রকাশ করেন নাই— পিত্রার্কার প্রেমে কিছুমাত্র উৎসাহ দেন নাই— বরং তাঁহার প্রেমের স্রোত ফিরাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন— প্রেম তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, বরং বোধ হয় তাঁহাকে কর্তব্যপথে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছিল।

জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য পিত্রার্কা ভোক্লুসের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। এখানকার মোহিনী বিজনতার মধ্যে থাকিয়া, পিত্রার্কার হৃদয় হইতে যে প্রথম কবিতা উৎসারিত হয় তাহা লরার উদ্দেশে প্রেম-গীতি। প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি যেন লরার সত্তা অনুভব করিতেন।

প্রতি উচ্চ-শাখাময় সরল কানন,
প্রতি স্নিগ্ধ ছায়া মোর ভ্রমণের স্থান;
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র-আনন
দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।
সহসা ভাবনা হতে উঠি যবে জাগি,
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়
'কোথায় ভ্রমিছ ওগো, ভ্রমিছ কী লাগি?
কোথা হতে আসিয়াছ, এসেছ কোথায়?'
হৃদে মোর এইসব চঞ্চল-স্বপন
ক্রমে ক্রমে স্থির চিন্তা করে আনয়ন,
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহে গো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি।
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার,
চারি দিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে
এ স্বপ্ন না ভাঙে যদি কী চাহি গো আর?
দেখি যেন (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস?)
বিমল সলিল কিংবা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন!

...

দুর্গম-সংসারে যত করি গো ভ্রমণ,
ঘোরতর মরু মাঝে যতদূর যাই,
কল্পনা ততই তার মুরতি মোহন
দিশে দিশে আঁকে, যেন দেখিবারে পাই।
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙি দেয় যৌবনের সুখস্বপ্ন মোর!

কখনো বা সেই মনোহর শৈলের প্রতি নির্ঝর তটিনী বৃক্ষলতায়, তিনি তাঁহার বিষণ্ন-মর্মের নিরাশা সংগীত গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—

বিমল বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী।
উজ্জ্বল-তরঙ্গে তব, প্রেয়সী আমার—
ভক্ত হৃদয়ের মম একমাত্র দেবী
সৌন্দর্য তাঁহার যত করেছেন দান!
শুন গো পাদপ তুমি, তব দেহ-'পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী,
নত হয়ে পড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে; বক্ষ সুবিমল তার
পরশিয়াছিলে তব সুধা আলিঙ্গনে।
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেইখানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাহার!
শুন গো তোমরা সবে আর-একবার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ-গান!
অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন।
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় করে গো মুদিত,
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে
তখন দেখো গো যেন এই প্রিয়-স্থানে
অভাগার শেষ-চিহ্ন হয় গো নিহিত!
মরণের কঠোরতা হবে কত হ্রাস,
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মতো সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত আত্মা যেথা
এক মুহূর্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাহিকো এমন শান্ত হরিত-কবর
যেথানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

বোধ হয় একদিন সে মোর প্রেয়সী
স্বর্গীয়-সুন্দরী সেই নিষ্ঠুর-দয়ালু—

একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি,
যেইখানে একদিন মুগ্ধ নেত্র মোর
উজ্জ্বল সে নেত্র-'পরে রহিত চাহিয়া!
হয়তো নয়ন তাঁর আপনা আপনি
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে চারি দিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়তো শিহরি তার উঠিবে অন্তর,
হয়তো একটি তার বিষাদ-নিশ্বাস
জাগাইবে মোর 'পরে স্বর্গের করুণা!

...

এখনো সে মনে পড়ে— যবে পুষ্প বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া বিনত
সুরভিকুসুমরাশি করিত বর্ষণ,
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত
বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে।
কভু বা বসনে তাঁর কভু বা কুন্তলে
প্রকৃতি কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া।
চারি দিকে তাঁর, কভু তটিনী-সলিলে—
কভু বা তৃণের 'পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প বন হতে কত পুষ্প রাশি রাশি!
চারি দিকে তরুলতা কহিত মর্মরি
'প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার!'

পূর্বেই বলিয়াছি, পিত্রার্কার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, বা এক-একবার বিশ্বাস হইত যে লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইত। অনুরাগের নেত্র অনুরাগের কাহিনী যেমন পড়িতে পারে, যুক্তিকে তাহার নিকট অনেক সময় পরাস্ত মানিতে হয়। লরার দৃঢ় দৃষ্টির মধ্যে হয়তো পিত্রার্কা গুপ্তপ্রেমের আভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, যুক্তি এখন তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, হয়তো তখনো পারিত না। এক সময়ে পিত্রার্কা যখন দূর-দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন লরাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—

সুকোমল ম্লান ভাব কপোলে তাঁহার
ঢাকিল সে হাসি তাঁর, ক্ষুদ্র মেঘ যথা!
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা!
তখন জানিনু আমি স্বরগ-আলয়ে
কী করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায়;
উজলি উঠিল তাঁর দয়া দিকচয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখে নি গো তায়!

...

সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে,
'কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর-দেশে?'

শীতের পত্রহীন তরুশাখায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গম বিষণ্ণ-সংগীত গাহিতেছিল, কবির হৃদয়ের স্বরে তাহার স্বর মিলিয়া গেল, তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

হা রে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন।
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ-গান গাস
যদি জানিতিস কী যে দহিছে এ প্রাণ
তা হলে এ বক্ষে আসি করিতিস বাস,
এর সাথে মিশাতিস বিষাদের গান!
কিন্তু হা— জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়তো সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখ দুঃখ চিন্তা আশা যা-কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত!

যখন তাঁহার লরার বর্তমানে প্রকৃতির মুখশ্রী আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত, তখন তিনি গাহিতেন—

কী সৌন্দর্য-স্রোত হোথা পড়িছে ঝরিয়া!
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কী আলোক-রাশি!

...

চরণে হরিত-তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া
শত বর্ণময় ফুল উঠিছে বিকাশি!
হর্ষময় ভক্তিভরে সায়াহ্ন-বিমান
সমুদয় দীপ তার করেছে জ্বলিত,
প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হয়েছে শোভিত!

আবার কখনো বা সন্ধ্যাকালে একাকী বিজনে বসিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার গীতি গাহিতেছেন।—

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে
রবি অস্তাচলগামী পড়েছে ঢলিয়া,
বৃদ্ধ যাত্রী কোন্ এক অজ্ঞাত প্রবাসে
শ্রান্ত-পদক্ষেপে একা যেতেছে চলিয়া।
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার,
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভুলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার,
যত ক্লেশ সহিয়াছি সুদূর-ভ্রমণে!
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার,
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে,
দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছারখার!

প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্ন পানে যবে
লয়ে যান সূর্যদেব, অসহায় ভবে
রাখি রাত্রি-কোলে, যার দীর্ঘীকৃত ছায়া
প্রত্যেক গিরিশিখর সমুন্নত-কায়া
উপত্যকা-'পরে দেয় বিস্তারিত করি;
তখন কৃষক হল লয়ে স্কন্ধোপরি,
ধরি কোন্ গ্রাম্যগীত অশিক্ষিত স্বরে,
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু-'পরে!

...

চিরকাল সুখে তারা করুক যাপন!
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ
এক তিল অভাগারে দেয় নি আরাম,
এক মুহূর্তের তরে দেয় নি বিরাম!
যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান!

দগ্ধ হয়ে মর্মভেদী মর্ম-যন্ত্রণায়
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহ-মুখে!
আমি কি হব না মুক্ত এ বিষাদ হতে,
সদাই ভাসিবে আঁখি অশ্রু-জল-স্রোতে!
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কী খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন?
এক দৃষ্টে চাহিনু স্বর্গীয় মুখপানে
সৌন্দর্য অমনি তার বসি গেল প্রাণে
কিছুতে সে মুছিবে না যত দিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ-দেহ না ফেলে বিনাশি!

এই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি যে, পিত্রার্কা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের নিকট হইতে যেমন আদর পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কোনো কবি পান নাই। একদিনেই তিনি প্যারিস ও রোম হইতে লরেল-মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, এবং যে দেশে গিয়াছিলেন সেইখানেই তিনি সমাদৃত হইয়াছিলেন। নৃপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি যে রাজসভায় বাস করিতেন, কখনো তাঁহাকে অধীনভাবে বাস করিতে হয় নাই, তিনি যেন রাজ-পরিবারমধ্যে ভুক্ত হইয়া থাকিতেন। লরার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার সে গর্ব সার্থক হইল। পাঁচশত বৎসরের কালস্রোত পৃথিবীর স্মৃতিপট হইতে লরার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহার নামের সহিতই চিরকাল লরার নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে; পিত্রার্কাকে স্মরণ করিলেই লরাকে মনে পড়িবে, লরাকে স্মরণ করিলেই পিত্রার্কাকে মনে পড়িবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৫

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ

গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্মান-সাহিত্যের অহংকার ও অলংকারস্বরূপ, যিনি 'ফস্ট' নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে য়ুরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর নূতন পরিচয় কী দিব?— কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি—

গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রিচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আর-এক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য করিত; এ প্রেমের উপায় কী? গেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ করেন— যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি-অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারও মুখে সাজিত না।

গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কীরূপে সজ্জিত আছে— পাখির পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কীরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন— এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎপরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটি নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।[১] যতখানি পর্যন্ত ভালোবাসিলে কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে ততখানি পর্যন্ত ভালোবাসিতেন, তাহার উর্ধ্বে আর নহে।

বাল্যকাল হইতেই গেটের সকল শ্রেণীর লোকদের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার ভাব ছিল। এই কারণে তিনি এক-এক সময় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে একবার এইরূপ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি রাত্রিভোজে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতগণ বার বার মদ্য প্রার্থনা করিলে দাসীর পরিবর্তে একটি বালিকা

১. ম্যানফ্রেডের সমালোচনায় গেটে লিখিয়াছেন যে, বাইরন ফ্লোরেন্সে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই প্রেমবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানার উপরে তাহারও মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, বাইরন সেই রাত্রেই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ম্যানফ্রেডে যে রমণীর প্রেতাত্মার কথা বর্ণিত আছে সে পূর্বোক্ত মহিলা। গেটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গল্পটির কোনো মূল্য নাই, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গেটে নিজের সাদৃশ্য মনে করিয়াছিলেন, বাইরনও আপনার জীবনের ঘটনা হইতেই উক্ত নাটক লিখিয়া থাকিবেন।

আসিল। সে মৃদু হাস্যে নমস্কার করিয়া কহিল— 'দাসী অসুস্থ, শুইতে গিয়াছে, আপনাদের কী প্রয়োজন, আমাকে অনুমতি করুন।' এই রমণীকে দেখিয়া গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইল— তিনি তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখিলেন— তাহার বসন, ভূষণ, গঠন, তাহার টুপিটি পর্যন্ত তাঁহার বড়ো ভালো লাগিল। গেটে এই প্রথম প্রেমে পড়িলেন। গেটে তাহার বাড়িতে যাইবার কোনো ছুতা না পাইয়া গির্জায় গিয়া উপাসনার সময় তাহাকেই দেখিতেন। কিন্তু তথাপি উপাসনা ভঙ্গ হইলে পর তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার সঙ্গ লইতে সাহস করিতেন না। এবং অন্য প্রেমিকদের ন্যায় দূর হইতে তাহার নমস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন— পরিতৃপ্ত না হউন সুখী হইতেন। এই রমণীর নাম গ্রেশেন। যে বাড়িতে তাহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই বাড়িতে কোনো উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একবার মিলন ধার্য করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যেন একজন রমণী একজন যুবাকে লিখিতেছে, এইরূপ ভাবের একখানি প্রেমের পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। সে শুনিয়া কহিল— 'সুন্দর হইয়াছে বটে। কিন্তু এমন সুন্দর চিঠি যদি সত্য সত্য লেখা হইত, তবে বেশ হইত।' গেটে কহিলেন, 'বাস্তবিক সে যুবা যদি এই চিঠিখানি পাইয়া থাকে আর যে মহিলাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে সেও তাহাকে এইরূপ ভালোবাসে, তাহা হইলে সে কী সুখীই হইত।' গ্রেশেন কহিল, 'হাঁ কথাটা শুনিতে যেমনই হউক— নিতান্ত অসম্ভব নহে।' গেটে কহিলেন, 'আচ্ছা মনে করো, একজন যে তোমাকে চেনে, মাথায় করিয়া পূজা করে, ভালোবাসে, সে যদি তোমার সম্মুখে এই চিঠিখানি দেয়, তবে তুমি কী কর?' গ্রেশেন ঈষৎ হাসিয়া, একটু ভাবিয়া চিঠিটা লইল ও তাহার নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিল। গেটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সে কহিল— 'না— চুম্বন করিয়ো না— উহা তো সচরাচর হইয়া থাকে, ভালোবাসিতে হয় তো ভালোই বাসো।' প্রেমিকের এরূপ সাহসিকতা আমাদের কাছে কেমন কেমন লাগে বটে— কিন্তু য়ুরোপীয়দের চক্ষে এরূপ দৃশ্য ও তাহাদের কর্ণে এরূপ কথাবার্তা চিরাভ্যস্ত। গেটের জীবনচরিত পড়িবার সময় অবশ্য কতকটা তাঁহাদের দেশীয় আচার-ব্যবহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে গেটে সেই চিঠিটি লইয়া কহিলেন, 'এ চিঠি আমার কাছেই রহিল— সমস্ত গোল চুকিয়া গেল, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ!' গ্রেশেন কহিল, 'আর কেহ না আসিতে আসিতে এই বেলা তুমি চলিয়া যাও।' গেটে কোনোমতে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে স্নেহের সহিত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া এমন দয়ার্দ্রভাবে কহিল যে, গেটের চক্ষে জল আসিল, গেটে কল্পনায় দেখিলেন তাহারও চক্ষে যেন জল আসিয়াছে! অবশেষে তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গেটে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; নানাবিধ ভোজে, নানা প্রমোদ স্থানে তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। গেটে একদিন গ্রেশেনদের বাড়িতে রাত্রি পর্যন্ত আছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল তিনি তাঁহাদের দ্বারের চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কহিলেন— তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া অনর্থক, অনেক গোলমাল না করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করা অসম্ভব। তাহারা সকলে কহিল— 'বেশ তো— এসো, আমরা সকলে মিলিয়া আজ এইখানেই রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিই।' গেটের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। এমন-কি, আমাদের এক-এক বার সন্দেহ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই বা চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! কাফি পান করিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্তে আস্তে তাস খেলা বন্ধ হইল। গল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া আসিল, গৃহের কর্ত্রী তাঁহার চৌকির উপর ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, অভ্যাগতগণ ঢুলিতে লাগিলেন। গেটে এবং গ্রেশেন জানালার এক ধারে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, ক্রমে গ্রেশেনেরও ঘুম আসিল, তাঁহার মস্তকটি সে ধীরে ধীরে গেটের কাঁধে রাখিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। গেটেও অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে এইরূপ নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশেন ইহা তাঁহার পিতার কানে গেল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ওই বিষয়ের

অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এই মনোবেদনায় গেটে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, এমন-কি, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি গ্রেশেন ও তাহার বন্ধুদের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে গ্রেশেনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন— বন্ধুটি ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন— 'সে বিষয়ে তোমার বড়ো একটা ভাবিতে হইবে না— সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।' সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, 'হাঁ আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি বটে, এবং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি— কিন্তু সর্বদাই বালকটির ন্যায় তাঁহার প্রতি আমি ব্যবহার করিতাম— আর আমার তাঁহার প্রতি ভগিনীর মতো ভালোবাসা ছিল।' এইরূপে অতি গম্ভীরা-গৃহিণী-ভাবে গ্রেশেন যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ কথাগুলি আর গেটে শুনিলেন না— গ্রেশেন যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালকটি মনে করিত তাহাই তাঁহার প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ও কথাটা তাঁহার বড়োই খারাপ লাগিল— তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গ্রেশেনের উপর হইতে তাঁহার সমস্ত ভালোবাসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে স্পষ্টই বলিলেন, এখন হইতে সমস্তই চুকিয়া বুকিয়া গেল। গেটে গ্রেশেনের কোনো সম্পর্কে আর রহিলেন না— তাহার নামোল্লেখ পর্যন্ত করিতেন না। এমন-কি, পূর্বে তিনি তাহার মুখশ্রী যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, এখন তাহা বিপরীতভাবে দেখিতে লাগিলেন— এতদিনে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন— তাহার মমতাশূন্য নীরস মুখশ্রী তাঁহার চক্ষে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যন্ত্রণা শীঘ্র নিবৃত্ত হইবার নহে। তিনি কহিলেন— 'যে-সকল বন্ধুদের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার চরিত্র তাহারা সংশোধন করিতে চাহিতেছে তাহাদের দ্বারা কোনো ফল জন্মে না— একজন স্ত্রীলোক যাহার ব্যবহারে সহসা মনে হইতে পারে সে তোমাকে নষ্ট করিতেছে সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষিতভাবে তোমার চরিত্র সংশোধন করে।' তিনি তাঁহার লিখিত উপাখ্যানের এক স্থানে লিখিয়াছেন— 'কুমারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা আপনাকে মহা বিজ্ঞ মনে করে— আর তাহাদিগকে প্রথমে যে বেচারী ভালোবাসা জানায়— তাহাদের নিকট তাহারা মহা দিদিমার চালে চলিতে থাকে।' এ কথাটা সত্য— এবং অনেক অশ্রুজলের মধ্য হইতে তিনি এ সত্যটি উপার্জন করিয়াছিলেন। গেটের প্রেম বহুদিন অলস ও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই— অ্যানসেন নামক আর-একটি সুশ্রী বালিকা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গেটের এইবারকার প্রেম-কাহিনীতে আমরা প্রেমের আর-এক মূর্তি দেখিতে পাইব।

অ্যানসেন অল্পবয়স্ক, সুন্দরী, প্রফুল্ল এবং প্রিয়দর্শন ছিল। গেটে স্বীয় মোহিনী শক্তির বলে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে প্রেমকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তেমনি গেটে সে বালিকার প্রেমের উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন— যে কারণেই হোক তাঁহার মন খারাপ হইলেই তিনি সেই বেচারীর উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতেন— কেন? না সে প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত বলিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার ব্রত ছিল, এই সুমহৎ অপরাধে তিনি তাহার প্রতি ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন! অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ও তাহাকে সর্বদাই অসুখী করিতেন। এই-সকল প্রণয়ের অত্যাচার অ্যানসেন অনেক দিন পর্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, প্রশংসনীয় ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের পর আঘাত পাইয়া অবশেষে তাহার ধৈর্য টুটিয়া গেল। অন্যায় অত্যাচারে তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গেটে তাহাকে সত্য সত্য মনের সহিত ভালোবাসিতেন। অ্যানসেন যখন বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তখন গেটের চৈতন্য জন্মিল। এতদিন অ্যানসেন তাঁহাকে সাধিয়া আসিতেছিল, এখন তাঁহার সাধিবার পালা পড়িল। তিনি তাহার প্রেম পুনর্জীবিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর হয় না, অ্যানসেনের মন আর ফিরিবার নহে, একেবারে তাঁহার উপর হইতে তাহার প্রেম চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে অ্যানসেনের বাসভূমি

লিপ্‌সিক্ হইতে তাঁর জন্মভূমি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন অ্যানসেনের সহিত চিঠি লেখালেখি শুরু করিলেন— লিখিলেন— 'আমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি সার্ধ দুই বৎসর প্রায় তোমাদের পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিল, যে ব্যক্তি অনেক সময় তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত ছিল, সহস্র ঘটনা বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিবে— অন্তত তুমি তাহার অভাব অনুভব করিবে— তুমি না কর আমি অনেক সময় করিয়া থাকি।' দিন কতক গেটে তাহার সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলেন— কিন্তু তাহার মন আর বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার বিবাহবার্তা শুনিয়া কহিলেন—

'আমি তোমার লেখা আর দেখিতে চাহি না— তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে চাহি না— আমি যে স্বপ্নে মগ্ন রহিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমার আর-একটি মাত্র পত্র পাইবে, এ অঙ্গীকার আমি নিশ্চয় পালন করিব এবং এইরূপে আমার ঋণের এক অংশ মাত্র পরিশোধ দিব, অবশিষ্টটুকু আমাকে মার্জনা করিয়ো।' আর-একটি পত্র লিখিয়াছিলেন— তাহাতে কহিয়াছিলেন, 'আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই— আমি সবল সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিয়া অতি সুখশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি— তাহার প্রধান কারণ— এখন আর আমাকে কোনো স্ত্রীলোকে পায় নি!' এইরূপে গেটে তাঁহার হৃদয়-জ্বালা শান্তি করিতে অ্যানসেনের দ্বারে নিরাশ হইয়া কল্পনার দ্বারে আশ্রয় লইলেন— একটা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। এই নাটকের নাম 'প্রেমিকের খেয়াল'। এরিডনকে (গ্রন্থের নায়ককে) তাঁহার প্রণয়িনীর সখী কহিলেন— 'অ্যামীন (নায়িকা) তোমাকে এত ভালোবাসে যে, কোনো স্ত্রীলোক তেমন ভালোবাসে নাই।' নায়িকাকে তাহার সখী কহিল, 'যে পর্যন্ত তাঁহার অসুখের সত্য কোনো কারণ না থাকিবে সে পর্যন্ত তিনি একটা-না-একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবেন; তিনি জানেন যে, তুমি তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভালোবাস না— তুমি তাঁহাকে সন্দেহের কোনো কারণ দাও না বলিয়াই তিনি তোমাকে সন্দেহ করেন, একবার তাঁহাকে দেখাও যে তাঁহাকে না হইলেও তোমার চলে। তাহা হইলে এখনকার একটি চুম্বন অপেক্ষা তখনকার একটি দৃষ্টিতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।' এইখানে গেটের দ্বিতীয় প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া গেল।

এক সময়ে গেটে গোল্ডস্মিথের 'বাইকার' নামক উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, স্ট্রাস্‌বর্গের নিকটে অবিকল প্রিম্‌রোস্ পরিবারের ন্যায় এক পাদ্রী পরিবার বাস করেন। তিনি কৌতূহলবশত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। দেখিলেন— পাদ্রীর কনিষ্ঠা কন্যা ফ্রেড্‌রিকার সহিত সোফিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে পরিবারের মধ্যে গেটে দুই দিন বাস করিলেন— এবং সেখানে তাঁহার অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ফ্রেড্‌রিকার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন— বোধ হয় ফ্রেড্‌রিকাও তাঁহার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিছু দিন পরে আবার সহসা এক সন্ধ্যাকালে তাহাদের সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিভিয়া ও ফ্রেড্‌রিকা দুই বোনে দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। আদরের সহিত তিনি সেখানে আহূত হইলেন। আলোতে আসিবামাত্র অলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল— সে গেটের অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। ফ্রেড্‌রিকা কহিল, 'কই— আমি তো হাসিবার মতো কিছুই দেখিতে পাই নাই'— কিন্তু ফ্রেড্‌রিকা দেখিতে পাইবে কেন?

এই কাহিনী শেষ করিবার পূর্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত আর-একটি উপাখ্যান বলিয়া লই। গেটে ইতিপূর্বে এক ফরাসি শিক্ষকের নিকট নৃত্য শিখিতেন। তাঁহার শিক্ষকের দুই কন্যা ছিল, দুইজনই যুবতী ও রূপবতী— ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটি আর-এক জনের প্রেমাসক্তা। জ্যেষ্ঠা লুশিন্দা তাঁহার প্রেমে পড়িল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠা এমিলিয়ার প্রেমে পড়িলেন। এক সময়ে লুশিন্দা রোগশয্যায় শয়ান ছিল— তাহার ঘরের পার্শ্বে এমিলিয়া ও গেটে বসিয়াছিলেন। এমিলিয়া গেটের নিষ্ফল

প্রেম লইয়া কথোপকথন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া গেটেকে কহিল— 'তোমাতে আমাতে তবে এই পর্যন্ত।' গেটেকে দ্বার পর্যন্ত লইয়া গিয়া এমিলিয়া কহিল, 'আমাদের এই শেষ দেখা। তোমাকে যাহা কখনো দিই নাই ও দিতাম না, আজ তাহা দিলাম,' এই বলিয়া গেটের গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। উন্মত্ত গেটে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন— এমন সময়ে লুশিন্দা তাহার রোগশয্যা হইতে বিশৃঙ্খল-বসনে ছুটিয়া আসিয়া এমিলিয়াকে কহিল, 'তুমি একলা কেবল উঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিবে না।' এমিলিয়া গেটেকে ছাড়িয়া দিল— লুশিন্দা গেটের বক্ষ জড়াইয়া ধরিল— ও তাহার স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লুশিন্দা অনেকক্ষণ নীরবে এই অবস্থায় রহিল— গেটে তো কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুশিন্দা গেটেকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুলনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া চুম্বনে তাঁহাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল; পরিশেষে কহিল— 'এখন আমার অভিশাপ শুন— আমার 'পরে প্রথম যে তোমার ওই অধর চুম্বন করিবে— চিরকাল তাহার দুঃখের পর দুঃখ হউক! যদি সাহস হয় তবে পুনরায় চুম্বন করিয়ো— কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এখন তুমি বিদায় হও— যত শীঘ্র পার, বিদায় হও!' গেটে বিদায় হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না।

এখন আমরা পুনরায় ফ্রেড়রিকার নিকট প্রত্যাবর্তন করি। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মিলনকালে গেটে ফ্রেড়রিকার সহিত গ্রামপথে ভ্রমণ করিতেছেন— দিনগুলি অতি শীঘ্র ও অতি সুখে চলিয়া যাইতেছে— কিন্তু এ পর্যন্ত সেই অভিশাপের ভয়ে গেটে কখনো ফ্রেড়রিকাকে চুম্বন করেন নাই। এইখানে পুনরায় পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বৈদেশিকের জীবন চরিত্র পড়িবার সময় আপনাকে কতকটা তাহাদেরই রীতিনীতি প্রথা সহাইয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাদের কার্য তাহাদেরই আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করা কর্তব্য। এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়— গেটে এই চুম্বনের পরিবর্তে কবিতা উপহার দিতেন— কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গেটে অধিক দিন এরূপ সামলাইয়া চলিতে পারেন নাই। একটি নাচের উৎসবে গেটে ফ্রেড়রিকার সহিত নাচিয়াছিলেন— গেটের নাচ ফ্রেড়রিকার বড়ো ভালো লাগিয়াছিল। নাচ শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নির্জনে গিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, উভয়ই উভয়কে মনের সহিত ভালোবাসেন। দিনে দিনে উভয়ের ভালোবাসা বর্ধিত হইতে লাগিল— অবশেষে গেটের বিদায় লইবার সময় আত্মীয়দের সম্মুখেই ফ্রেড়রিকা তাঁহাকে চুম্বন করিল। গেটে ফ্রেড়রিকার প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন— কিছুই বলা কহা হয় নাই, অথচ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু গেটে জানিতেন তাঁহার বিবাহ করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বিদায় হ'ব হ'ব সময়ে ওই কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন ফ্রেড়রিকাকে দেখিলে তাঁহার মন কেমন অসুস্থ হইত— ফ্রেড়রিকা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই একটু শান্ত হইতেন। বিদায়কালে গেটে অশ্বে আরোহণ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন— ফ্রেড়রিকা তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে বিবাহ করিব না জানিয়াও বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ফ্রেড়রিকা তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা তাঁহার নামে কোনো দোষারোপ তা সে করে নাই। গেটের হৃদয় হইতে প্রেম যেরূপ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল, ফ্রেড়রিকারও সেইরূপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক অবিবাহিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গেটে ফ্রেড়রিকা সম্বন্ধে কহেন—

'গ্রেশেন আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল— অ্যানসেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল— কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক

প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন-কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।'

এখন গেটে শারলোট্ নামক এক রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কেজ্নার নামক যুবার সহিত শারলোটের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রেমে আসক্ত। কেজ্নারের প্রণয়ে অসূয়া বা সন্দেহ কিছুমাত্র ছিল না; যাহাকে সে ভালো মনে করিত তাহারই সহিত শারলোটের আলাপ করাইয়া দিত। এইরূপে গেটের সহিত শারলোটের প্রথম আলাপ হয়। প্রেমিক-যুগলের সহিত গেটের প্রণয়-সম্বন্ধ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। শারলোট্ ব্যতীত তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ওয়েট্স্লারের উর্বর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদি কাজকর্ম হইতে অবসর পাইতেন তবে কেজ্নারও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ ধীরে ধীরে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন মিলিত হইয়া গেল যে, একজনকে নহিলে যেন আর-একজনের চলিত না। যতখানি উপযুক্ত, অলক্ষিতভাবে গেটের তদপেক্ষা প্রেম জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শারলোটের মন কেজ্নার হইতে গেটের প্রতি ধাবিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবাহের সময় হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রেম দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন এইবেলা হইতেই দূরে পলায়ন করা সৎপরামর্শ। দূরে প্রস্থান করিলেন ও এই বিষয় লইয়া তাঁহার বিখ্যাত উপাখ্যান 'যুবা ওরার্থরের যন্ত্রণা' লিখিয়া ফেলিলেন। লেখাও শেষ হইল আর তাঁহার প্রেমও শেষ হইল। এখন তিনি আবার নূতন পথে যাইবার বল পাইলেন।

নূতন পথে যাইতে তাঁহার বড়ো বিলম্ব হয় নাই। লিলি নামক এক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার (আমাদের দেশে যুবতী) সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিল। সে বালিকার অনেকগুলি অনুরাগী বা বিবাহাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাহাদের সকলকেই তাহার প্রেমে বন্দী করিবার দিকে লিলির বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে আপনি গেটের প্রেমে জড়াইয়া পড়িল— এ কথা সে নিজেই গেটের কাছে স্বীকার করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়া উঠিল ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, সুদূর বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেও কষ্ট হইত; উভয়ের উভয়ের উপর এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহারা বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই কর্তৃপক্ষের তাহাতে অমত হইল। অবশেষে একজন রমণী মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষকেই সম্মত করাইল। যতদিন কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই ততদিন গেটে বড়োই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মত হইলে পর তাঁহার মনের নূতন প্রকার পরিবর্তন হইল। তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল। যখন লিলিকে হস্তপ্রাপ্য মনে করিলেন তখন লিলির উপর আর টান থাকিবে কেন? লিলির নিকট হইতে বিদায় না লইয়া তিনি আস্তে আস্তে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট্ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বলেন, তিনি লিলিকে ভুলিতে পারেন কিনা— এবং লিলির উপর বাস্তবিক তাঁহার কতখানি প্রেম আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কথা যখনি তাঁহার মনে আসিয়াছে, তখনি বুঝা গিয়াছে বাস্তবিক তাঁহার প্রেম নাই। যদি তাঁহার প্রেমের তেমন গভীরতা থাকিত তবে কি পরীক্ষার কথা মনেই আসিত? কিছুদিন বিদেশে থাকিয়া আবার তিনি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে লিলির আত্মীয়বর্গ লিলির প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল— কিন্তু লিলি কহিল, সে গেটের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে— এমন-কি, গেটে যদি সম্মত হন, তবে সে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে পারে। কী সর্বনাশ— গেটে তাঁহার বাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোথা এক সাত সমুদ্র পার আমেরিকা— সেইখানে যাইবেন। তাও কি হয়? লিলি গেটের জন্য সমস্ত করিতে পারে, কিন্তু গেটে তাহার জন্য বড়ো একটা ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ত্যাগস্বীকার করা দূরে থাকুক, কোনো ত্যাগস্বীকার করিতে না হইলেও তিনি লিলিকে বিবাহ করেন কিনা সন্দেহ।

আবার গেটে আস্তে আস্তে পলাইবার চেষ্টা দেখিলেন। একবার লিলির ঘরের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন— দেখিলেন যেখানে পূর্বে প্রদীপ জ্বলিত, সেইখানেই জ্বলিতেছে— লিলি পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিতেছে— তাহার প্রথম ছত্র :

'হায়— কী সবলে মোরে করিয়াছে আকর্ষণ।'

এ গানটি কিছুকাল পূর্বে তিনিই লিলিকে উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক— গেটে লিলির সবল আকর্ষণ তো ছিঁড়িলেন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর আর-একজনকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছিলেন, ও ভালোবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাডাম জিমানৌস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন।

গেটের এই প্রেম-কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্তিও দেখিতে পাইবেন।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৫

নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য

টিউটনিক জাতিরা রোমান রাজ্য অধিকার করুক কিন্তু রোমান জাতিদিগের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। বিজিত জাতিদিগের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম সমস্ত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমান রাজ্য শাসন করিত, কিন্তু রোমান শাসন-প্রণালী অনুসারে শাসন করিত। রোমান রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল কিন্তু রোমান স্বভাব রোমান প্রথা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় প্রথার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সেই টিউটনিক জাতি কেবল ইংলন্ডে আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। যে কেল্টিক জাতিকে তাহারা প্রায় ধ্বংস করিয়াছিল তাহারা টিউটন অর্থাৎ স্যাক্সন জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য ছিল সন্দেহ নাই, সভ্য রোমানদের শাসনে থাকিয়া তাহারা ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবার দেখো, নর্ম্যানেরা যখন স্যাক্সন-অধিকৃত ইংলন্ডে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখন তাহারা আর আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না— অল্প দিনেই স্যাক্সনদিগের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু ইহার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত, যখন স্যাক্সনেরা ব্রিটন অধিকার করিতে আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত ছিল মাত্র, তখন তাহারা স্বার্থের জন্য নহে, রক্ত-পিপাসা-শান্তির জন্যই রক্তপাত করিত, ধ্বংসকার্যই তাহাদের দুর্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল। রোমানদিগের অন্তঃক্ষয়কর শাসন-ভারে দুর্বল হতভাগ্য কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। কিন্তু সভ্যতর নর্ম্যান জাতিরা যখন ব্রিটনে পদার্পণ করিল তখন অকারণে রক্তপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল না, তখন তাহারা খৃস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে ও অন্যায় কার্য করিতে হইলেও ন্যায়ের নামে করা তাহাদের প্রথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, স্যাক্সন জাতিরা আপনাদের অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত দলে দলে ব্রিটনে ঝাঁকিয়া পড়িল, কেল্টদিগের উপর আধিপত্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের অধিবাসী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ অবস্থায় দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নর্ম্যানেরা ব্রিটন শাসন করিতে আসিয়াছিল, ব্রিটনের অধিবাসী হওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ব্রিটনের অধিপতি হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, কেল্টদিগের সহিত

স্যাক্সনদিগের ধর্ম আচার ব্যবহার নীতি স্বভাব কোনো বিষয়েই ঐক্য ছিল না, কিন্তু স্যাক্সন ও নর্ম্যানদের মধ্যে অনেক ঐক্যস্থল ছিল। ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ও এখানে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে-সকল অল্প সংখ্যক ইংরাজ বাস করে তাহারা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, আবার নূতন দল এ দেশে আগমন করে, কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক শাসয়িতৃদল এ দেশে চিরকাল বাস করিত, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র দল বিশেষ প্রতিবন্ধক না পাইলে খুব সম্ভবত ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশিয়া যাইত। নর্ম্যানদের সেই অবস্থা হইয়াছিল, নর্ম্যান্ডি হইতে একদল নর্ম্যান ব্রিটিশদিগকে অধীনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটনে গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে ফিরিল না। ব্রিটন-বিজেতা যখন স্বয়ং ব্রিটনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন জেতা ও জিতদিগের মধ্যে মিলন না হওয়াই আশ্চর্য। হিন্দুজাতি যদি নিতান্ত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় না হইত, তাহা হইলে মুসলমান বিজেতাদিগের সহিত হয়তো মিলিয়া যাইত।

দূর পর্যন্ত দেখিতে গেলে যে জাতিই ইংলন্ড জয় করিয়াছে সকলেই টিউটনিক বংশভূত। স্যাক্সন, ডেনিস ও নর্ম্যান সকলেই এক জাতীয় লোক। টিউটনিক জাতিদিগের জাতিগত স্বভাব অনুসারে নর্ম্যান অর্থাৎ Northmanগণ দলে দলে তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া ফিরিত। এই মহা দুর্দান্ত সামুদ্রিক দস্যুগণের তরণী দূর হইতে দেখিলে সমস্ত য়ুরোপ কম্পিত হইত, ভূমধ্যস্থ সাগরে এই নর্ম্যান দস্যুদের জাহাজ দেখিয়া মহাবীর শার্লমেন একদিন অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইহারা অসাধারণ সামুদ্রিক ছিল, ইহাদের রক্তে Blake এবং Nilson সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদেরই নিকট হইতে ইংরাজেরা সুনাবিকতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, প্রবাদ আছে, ইহারা কলম্বসের বহুপূর্বে আটলান্টিক পার হইয়াছে। পূর্বকালে ফিনিসীয়গণ সামুদ্রিক ছিল কিন্তু তাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশ পর্যটন করিত, অর্থ উপার্জিত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু - নর্ম্যানগণ আপনাদের কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল, ধনধান্যশালী ইটালি, ফ্রান্স ও ইংলন্ড প্রভৃতি স্থানে চির-আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য এই যে, যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই তাহাদের জাতিত্ব লোপ পাইয়াছে, এখন আর নর্ম্যান বলিয়া একটি জাতি নাই। যদিও নর্ম্যান জাতি স্যাক্সনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তথাপি ইংরাজ-ইতিহাসে তাহারা ঘোরতর পরিবর্তন বাধাইয়াছিল। নর্ম্যানেরা না মিশিলে ইংরাজেরা এ ইংরাজ হইত কি না সন্দেহস্থল। আমরা ফ্রান্সে নর্ম্যানদের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলন্ড পর্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিব।

ফ্রান্সে এখন ক্লোভিস (Clovis)-বংশোদ্ভব রাজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন ও শার্লমেন-বংশীয় রাজগণের রাজপ্রভাব জীর্ণপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে উত্তর দেশীয় ক্ষুধিত পঙ্গপাল ফ্রান্সের উর্বর ক্ষেত্রে ঝাঁকিয়া পড়িল। প্যারিস তখন ফ্রান্সের রাজধানী ছিল না। নর্ম্যানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্সের দুর্বল অধিপতি, Charles রবর্ট্‌কে (Roborts the Strong) এক বৃহৎ জায়গীর দিয়া সীমান্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। রবর্টের পুত্র ওডোর সময়ে প্যারিস সেই রাজ্যের প্রধান নগরী হয়। ফরাসিরাজ তখন হয়তো সন্দেহ মাত্র করেন নাই যে, তিনি বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গৃহের মধ্যে শত্রু পোষণ করিতেছেন। যখন ফ্রান্স-অধিপতির রাজকীয় উপাধি ভিন্ন অন্য বড়ো একটা কিছু অবশিষ্ট ছিল না, তখন বলীয়ান প্যারিসের জায়গীরপতি তাঁহার সিংহাসনের প্রতি এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নর্ম্যানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তখন ফ্রান্সের বড়ো দুরবস্থা। বলিতে গেলে, তখন বর্তমান ফ্রান্স গঠিত হয় নাই, তখন পুরাতন ফ্রান্স জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ফ্রান্স তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন লোক তোমার শত্রু না হইতে পারে, কিন্তু আপনার লোক ভিন্ন হইয়া গেলে সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ফ্রিমেন সাহেব অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, 'ফ্রান্সের প্রতি বিভিন্ন খণ্ড যদি বিভিন্ন দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো যোগ না থাকিত, তবে সে বিভাগে ভয়ের কারণ থাকিত না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধিরাজ্য-

স্বামীর ইচ্ছা তাঁহার সীমা বাড়াইয়া লন— বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে জাতীয়ভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সকলেই ভয় করিতে থাকে, পাছে তাহাদের মধ্যে আর কেহ শত্রুর সাহায্য লইয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, অতএব তাহা সহজেই মনে হইতে পারে যে, আগে হইতে আমিই যে কেন শত্রু-সাহায্যের সুবিধা ভোগ না করিয়া লই!'

তখন যুরোপের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। চারি দিক হইতে মুমূর্ষু অথবা মৃত রোমীয় প্রভাবের উপর শকুনি ও গৃধিনীদল ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল। তখন দারুণ অরাজকতার কাল। স্যারাসীনগণ সার্ডিনিয়া ও সিসিলি অধিকার করিয়া গ্রীস, ইটালি ও নিকটবর্তী দেশসমূহে উপদ্রব করিতেছিল। দুর্দান্ত সক্ল্যাভোনীয়গণ (Sclavonians) জর্মনির অধিকার হইতে বোহেমিয়া, পোল্যান্ড এবং প্যানোনিয়া (আধুনিক অস্ট্রিয়া) কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাতার জাতীয় দস্যুদল নিদারুণ উপপ্লবে সমস্ত ইটালি, জর্মানি ও দক্ষিণ ফ্রান্স কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা এই উত্তর দেশীয় সামুদ্রিক দস্যুগণ এই নর্থম্যান নরশোণিত-পিপাসুগণ প্রচণ্ড ছিল। উপর্যুপরি ইংলন্ড এবং ফ্রান্স তাহারা বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যখন ইংলন্ড আক্রমণ করিত, তখন ফ্রান্স বিশ্রাম করিত, যখন ফ্রান্স আক্রমণ করিত তখন ইংলন্ড বিশ্রাম করিত। Charles the Bald-এর রাজত্বকালে ইহারা ফ্রান্সের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। তখন চার্লস ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নর্থম্যান দস্যুদল ফ্রান্সে এবং ইংলন্ডে নূতন প্রকার যুদ্ধের প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। নদী বাহিয়া তাহারা যে দ্বীপ পাইত, সেইখানেই দুর্গ নির্মাণ করিত। এই দুর্গসকল তাহাদের লোপত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল, তৎসমুদায় তাহাদের রমণী ও শিশুদিগের নিবাস-ভূমি ছিল ও পরাজয়কালে আশ্রয়স্থান ছিল। দুর্বল ফ্রান্স-অধিপতি অস্ত্রের বলে তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং অর্থ দিয়া তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইত মাত্র। অবশেষে Charles the Simple নর্ম্যান্ডি দেশ দান করিয়া তাহাদের নিকট শান্তি ক্রয় করিলেন। তাহাতে হানি হইল না, নর্ম্যান্ডি ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। নর্ম্যানদের ভাষা ফরাসি হইল, নর্ম্যানদের আচার-ব্যবহার ফরাসি হইল, নর্ম্যান জাতি ফরাসিস্ হইয়া দাঁড়াইল, নর্ম্যানদিগের অধিপতি রলফ (Hrolf) নর্ম্যান্ডির রাজা হইলেন।

ইহার এক শতাব্দী পরে নর্ম্যান্ডির রাজা উইলিয়ম ইংলন্ড আক্রমণ করিলেন। এক শতাব্দী পূর্বে যে জাতি অকারণে ও অন্যায়রূপে ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল আজ তাহারাই পররাষ্ট্র ইংলন্ড আক্রমণ করিতে চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডেনিস দস্যুদলের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অন্যায় কার্যের উপর একটা ন্যায়ের আবরণ না পরাইতে পারিলে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। ন্যায্যরূপে ইংলন্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া উইলিয়ম ইংলন্ডের দ্বারে গিয়া আঘাত দিলেন। ন্যায়কে বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, এমনি একটা ভান করিলেন। ইংলন্ড-জয়ের কাহিনী আজ আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না, সকলেই তাহা জানেন।

শতাব্দী-পূর্বে নর্ম্যানরা যখন ফ্রান্সে দস্যুতা করিত তখন লোকে তাহাদের দস্যু বলিত, শতাব্দী-পরে যখন তাহারা ইংলন্ডে দস্যুতা করিল, তখন লোকে তাহাদের বিজয়ী কহিল। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যে নর্ম্যান জাতির কী পরিবর্তন হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখো, দেখিবে, তাহারা সেই দুর্দান্ত, বিপদ-অন্বেষী দস্যুই রহিয়াছে, কেবল ফরাসি কথা কহিতে ও ফরাসি জাতির আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। যদিও তাহারা ফরাসিদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নর্ম্যান জাতি বলিয়া তাহাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জাতির উপযোগী শিল্পে তাহাদের সুরুচি জন্মিয়াছে; নর্ম্যান অধিকারের পর হইতে শিল্প-সমাগম-শূন্য ইংলন্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই অসভ্য দস্যুদিগের হৃদয়ে

সৌন্দর্য-জ্ঞান উদ্‌বোধিত হইল। নর্ম্যান্ডির সমাজে বিদ্যা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইল। ল্যান্‌ফ্রেঙ্কের (Lanfrenc) প্রতিষ্ঠিত বেকের বিদ্যালয় (School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গণ্য হইল। বিজেতা উইলিয়মের পুত্র হেনরির বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি ছিল, উপাধি ছিল সুপণ্ডিত, Beanclirk অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের ফরাসি ভাষায় অমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, এই হঠাৎ-সভ্য দস্যুরা ফরাসিদের মতোই কবিতা ও গদ্য লিখিতে পারিত। কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তরে অন্তরে সেই টিউটনিক ভাব জাজ্বল্যমান ছিল। সভ্যতার মূল তাহাদের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে নিহিত হইতে পারে নাই। তাহাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যদি পাঠ কর, তবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিজিত ইংলন্ডে তাহারা লোকদের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, ও সেই নিম্নশির ব্যক্তিদের ধূম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা দিত। কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কখনো বা মুণ্ড বাঁধিয়া হতভাগ্যদের ঝুলাইয়া দিত ও তাহাদের পায়ে জ্বলন্ত বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত। মাথায় দড়ি বাঁধিয়া যতক্ষণ না তাহা মস্তিষ্ক ভেদ করিত, ততক্ষণ আকর্ষণ করিত। ভেক ও সরীসৃপসংকুল কারাগারে লোকদের কারাবদ্ধ করিত। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, অগভীর ও তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-পূর্ণ সিন্দুকে জোর করিয়া মানুষ পুরিত এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করিত। অনেক ব্যারনদিগের দুর্গে rachetege নামে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ংকর দ্রব্য থাকিত, সেই যন্ত্রণার যন্ত্র কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত, উহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইত, তাহার চারি দিকে তীক্ষ্ণধার লৌহ, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বসিতে, শুইতে, ঘুমাইতে পারিত না, সর্বক্ষণ তাহাকে লৌহ-ভার বহন করিতে হইত। শত শত লোককে তাহারা অনাহারে যন্ত্রণা দিত। কেবলমাত্র মৃগয়া করিবার সুবিধার জন্য বিজেতা উইলিয়ম সমস্ত হ্যাম্পশিয়র অরণ্য করিয়া দিলেন, প্রতিহিংসা তুলিবার আশয়ে সমস্ত নর্দাম্বরল্যান্ড জনশূন্য করিয়া দিলেন। টাইন ও হাম্বারের মধ্যবর্তী ভূভাগে নয় বৎসর ধরিয়া একটি গ্রাম বা একটি জনপ্রাণী মাত্র ছিল না। নর্ম্যান অত্যাচারে দেশ কতখানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নর্ম্যান অধিকারের পূর্ব ও পরের অধিবাসী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব ইয়র্কে ১৬০৭ গৃহ ছিল, উইলিয়মের রাজত্বকালে ৯৬৭ অবশিষ্ট থাকে, অক্সফোর্ডে ৭২১ গৃহ ছিল, তাহার ২৪৩ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডচেস্টরে ১৭২ গৃহের ৭২ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডর্বিতে ২৪৩ গৃহের ১৪০ ধ্বংস হইয়া যায়, এমন আর কত কহিব? ইংলন্ডের নর্ম্যান রাজগণ, নিজে পাত্র নির্বাচিত করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের দুহিতাদের বলপূর্বক বিবাহ দিয়া দিতেন। মনোমতো বিবাহ করিতে হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কাউন্টেস অফ অ্যালবেমালকে (Countess of Albimarle) একটি কোমরবন্ধ দিবার কথা মনে করাইয়া না দেওয়াতে রাজা জন উইঞ্চেস্টরের বিশপকে ১ টন মদিরা দণ্ড দিতে বাধ্য করান। এমন কত সামান্য সামান্য বিষয়ে দণ্ড দিতে হইত। বিশেষ ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে বা বিশেষ আদালতে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বা বিচারে ন্যায্য ভূমিখণ্ড পাইলে তাহা দখল করিতে, টাকা দিতে হইত। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে প্রত্যর্থী বিচারের বিলম্ব করাইতে, কখনো বা অন্যায় বিচারের সাহায্য করিতে রাজাকে টাকা দিত। সুবিচার ও শীঘ্র বিচার পাইবার জন্য ন্যায্য বিচারাকাঙ্ক্ষী অর্থীকে আবার অর্থ দিতে হইত। স্যাক্সন ক্রনিকল-লেখক বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'ঈশ্বর জানেন, এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণ কী অন্যায়রূপে পীড়িত হইতেছে। প্রথমে তাহাদের ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয়, পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। এ বৎসরে (১১২৪) অতি দুষ্কাল পড়িয়াছে। গুরুভার করে ও অন্যায় ডিক্রিতে সকলেই আপনার আপনার সম্পত্তি খোয়াইতেছে।' 'তাহারা (নর্ম্যানরা) করে করে গ্রামের সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেখিতে পাইবে গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যদি দেখা যায় দুই-তিনটি মাত্র ব্যক্তি অশ্বারোহণে একত্রে চলিতেছে, অমনি গ্রামসুদ্ধ লোক তাহাদিগকে লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোকে প্রকাশ্যভাবে বলিত যে, ক্রাইস্ট ও তাঁহার Saintগণ ঘুমাইয়া

আছেন।' টিউটনিক স্যাক্সন বিজেতাগণ পরাজিত শেল্‌টদিগকে যেরূপ নিষ্পীড়িত করিয়াছিল, এই ফরাসি চাকচিক্য-প্রাপ্ত টিউটনিক জাতিও কি পরাজিত জাতির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিল না? বিজিতদের দেশে বিজেতার এরূপ অত্যাচার এরূপ অসভ্য ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ দেশে, যেখানে চারি দিক হইতে খৃস্টধর্ম-দীক্ষিত সভ্য জাতির নেত্র পড়িয়া আছে, সেখানে তাহাদের কীরূপ ব্যবহার? বালক উইলিয়ম যখন নর্ম্যান্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বালক-হস্ত-স্থিত রাজদণ্ডের দুর্বলতা প্রযুক্ত নর্ম্যান জাতির অন্তর্গত পশুত্ব কীরূপ প্রকাশ পাইয়া উঠিল একবার আলোচনা করিয়া দেখো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের তো কথাই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ যতই অন্যায় হউক-না সচরাচর তাহা বীরত্বের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু গুপ্তহত্যা তখন এমন মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইত যে, লোকের চক্ষে তাহার ভীষণত্ব হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তখন ছুরিকা ও বিষ, রোগ বিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর অনিবার্য আপদের মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কারণে অসন্দিগ্ধ-চিত্ত নিরস্ত্র অতিথিকে ভোজের স্থলে হত্যা করা হইত। বেলেমের (Belesme) অধিস্বামী উইলিয়ম ট্যালভ্যাস তাঁহার স্ত্রীর ধর্মিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্রতা হেতু বিরক্ত হইয়া গোপনে হত্যাকারী রাখিয়া গির্জায় যাইবার পথে তাহাকে বিনাশ করেন; বিনাশ করিবার এমন দারুণ কারণ শুনি নাই, এমন দারুণ সময় দেখি নাই! এই দুর্বৃত্ত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বিবাহ-সভাস্থ এক অসংশয়-চিত্ত অতিথির চক্ষু উৎপাটিত ও নাসা কর্ণ ছেদন করে। এইরূপ নীতির ঘোরতর ব্যভিচার দেখিয়া ধর্মযাজকগণ, নীতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। গুপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায় মনুষ্যহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহাদের সংস্কারের সীমা সংকীর্ণ করিলেন। কতকগুলি বিশেষ গুরুতর পাপকার্যের অনুষ্ঠান নিষেধ করিলেন, কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করার নিয়ম করিলেন, এবং কতকগুলি বিশেষ পুণ্য মাসে বা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে এ চেষ্টা সফল হইল না। যাজকগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্যন্ত সকল প্রকার ভীষণ কার্যের অনুষ্ঠান রহিত করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে ছুরিকা এতক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিত না, নর্ম্যান হৃদয়ে নরকের জাগ্রত উপদেবতা এতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আপনাকে দংশন করিতে থাকিত, সুতরাং ইহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ক্যাম্‌ব্রের বিশপ জেরাড এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূপালদিগের কার্য রক্তপাত করা ও যাজকদিগের কার্য প্রার্থনা করা। এক দল পাপ করিবে, আর-এক দল তাহাদের হইয়া দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! জেরাড অন্যান্য বিশপদিগকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, তাহাদের কার্য প্রার্থনা করা, তাহাদের অনধিকার চর্চা করিবার আবশ্যক কী? তিনি কহিলেন, সংস্কারের নিয়ম প্রচারিত করিলে লোকের মধ্যে কপটতা প্রশ্রয় পাইবে মাত্র। কাটাকাটির মুখ হইতে নর্ম্যানদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত দুরাশা। নিদারুণ কার্য নহিলে তাহারা আমোদ পাইত না। সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই। এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পাচক শূকর না পাওয়াতে একজন স্যারাসীনকে কাটিয়া তাহার তাজা ও কোমল মাংস রন্ধন করিয়াছিল। সে মাংস রাজার বড়োই ভালো লাগিল, তিনি শূকরের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। ভীত-হৃদয় পাচক সভয়ে নরমুণ্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। রিচার্ডের বড়োই আমোদ বোধ হইল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'খাদ্যের এমন সুবিধা থাকিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না।' জেরুজিলাম বিজিত হইলে সত্তর হাজার (৭০,০০০) অধিবাসী হত হয়। দ্বিতীয় হেনরি একবার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বালক ভৃত্যের চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিচার্ড নগর অধিকার করিলে পর স্যারাসীন-রাজ স্যারাসীন বন্দীদের মার্জনা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ

করিলেন। রিচার্ড ত্রিশ জন স্যারাসীন বন্দীর মাথা কাটিয়া প্রত্যেক মাথায় হত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, রন্ধন করিয়া প্রত্যেক দূতের সম্মুখে আহারার্থে রাখিতে অনুমতি দিলেন ও তাঁহার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তাহা অতি উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। ষাট হাজার বন্দী ক্ষেত্রে আনীত হইলে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দীগণ সবে,
দেবতারা স্বর্গ হতে কহিলেন তবে।
'মারো মারো কাহারেও ছেড়ো না, ছেড়ো না,
কাটো মুণ্ড, এক জনে কোরো না মার্জনা।'
শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার,
ঈশে ও পবিত্র ক্রসে কৈলা নমস্কার।

এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার-মানসেই ইহা কীর্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? কীরূপ ঘটনায় তখনকার লোকের হৃদয়ে ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইবে তখনকার কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রিচার্ড কোনো নগর অধিকার করিলে সেখানকার শিশু ও অবলাদের পর্যন্ত হত্যা করিতেন। এই রিচার্ডই তখনকার লোকদের নিকট দেবতার স্বরূপ, কবিদের নিকট আদর্শ বীরের স্বরূপ বিখ্যাত ছিলেন। এমন-কি, এই 'উনবিংশ শতাব্দীর' ইংরাজি ঐতিহাসিকেরাও হয়তো তাঁহাকে তৈমুর বা জঙ্গিস্ খাঁর সহিত গণ্য করিতে সংকোচ বোধ করিবেন। সেনল্যাকের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর যেখানে বাণ-বিদ্ধ হ্যারল্ড ভূপতিত হন, সেইখানে বসিয়া উইলিয়ম মৃত দেহরাশির মধ্যে পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নর্ম্যানেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিতে আইসে, তখন তাহাদের এইরূপ অবস্থা। স্যাক্সনেরা তখন কী করিতেছে? 'স্যাক্সনেরা পরস্পর জেদাজেদি করিয়া সর্বদা মদ্যপানে রত আছে; দিবারাত্রি পান ভোজনেই তাহারা অর্থ ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহাদের বাসস্থান অতি হীন! কিন্তু ফরাসি ও নর্ম্যানগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন যাপন করে, অথচ দিব্য বৃহৎ গৃহে বাস করে, তাহাদের আহার্য উত্তম, বস্ত্র অতিশয় পরিপাটি' অর্থাৎ স্যাক্সনদের এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। যেদিন নর্ম্যানদের সহিত যুদ্ধ হইবে তাহার পূর্বরাত্রে 'তাহারা সমস্ত রাত পান ভোজনে মত্ত আছে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা মহা যুঝাযুঝি লাফালাফি, অট্টহাস্য ও গান-বাজনায় রত হইয়াছে'। তখন স্যাক্সনরা এমন মূর্খ, অনক্ষর অসভ্য ছিল যে, নর্ম্যানেরা মূর্খ স্যাক্সন যাজকদিগকে ধর্মমঠ হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্যাক্সনদের এইরূপ অতি হীন অবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সুসভ্য নর্ম্যানগণ ইংলন্ডে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে ইংলন্ডে শুদ্ধ যে কেবল সুশোভন প্রাসাদ উত্থিত ও বিদ্যাধ্যাপনশীল যাজকগণের সমাগম হইল তাহা নহে, নর্ম্যানদের প্রবল প্রতাপে ডেনমার্ক ও নরোয়েবাসী দস্যুদের হস্ত হইতে ইংলন্ড পরিত্রাণ পাইল। নর্ম্যানদের আগমনে ইংলন্ডের আরও অনেক অলক্ষিত উপকার হইয়াছিল, কিন্তু বিজিত জাতি বিজেতাদের হস্ত হইতে ন্যায় ও সুবিচারের আশা করিতে পারে না, বিশেষত বিজিত জাতি যখন বিজেতাদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন, তখন ন্যায়ের আশা হতভাগ্যদের পক্ষে দুরাশা! সমযোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ন্যায়াচরণ করাই প্রায় পৃথিবীর নিয়ম, নিকৃষ্টতরদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে লোকে অন্যায় মনে করে না; যদি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তবে তাহা অনুগ্রহ মাত্র। পৃথিবীতে ন্যায়ের সীমাও এমন সংকীর্ণ। স্যাক্সনদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। যদি কোনো জেলায় একজন নর্ম্যান হত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের হয় হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিতে নয় প্রত্যেককে অর্থদণ্ড দিতে হইত, কিন্তু একজন স্যাক্সন হত হইলে বড়ো একটা গোলযোগ হইত না। নর্ম্যান ধর্মাচার্যগণ আসিয়া স্যাক্সন-রাজা ও তপস্বীদের

কবরস্থ অস্থিরাশি অমান্যের সহিত উৎখাত করিয়া ফেলিতেন, Ivo Taille-bois-এর নিকট তাঁহার প্রজারা যথানির্দিষ্ট বিনতি দেখাইতে প্রাণপণ করিত। এক হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিত। তাঁহাকে যতখানি মান্য ও কর দিবার কথা, তদপেক্ষা অধিক দিয়াও বেচারীরা নিষ্কৃতি পাইত না। তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, কয়েদ করিতেন, তাহাদের পশুপালের পশ্চাতে কুক্কুর লাগাইয়া দিতেন, তাহাদের বাহনদিগের মেরুদণ্ড ও পা ভাঙিয়া দিতেন। এই তো অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্বিত, সভ্যতাভিমানী, বিজেতা নর্ম্যান জাতি!

আমরা অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে নর্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া আন্দোলন করিলাম। কিন্তু ইহা যেন কেহ অনর্থক মনে না করেন। সাহিত্য মনুষ্য-হৃদয়ের ছায়ামাত্র; যে জাতির সাহিত্য আলোচনা করিবে তাহাদের চরিত্র আলোচনা যদি না কর তবে তাহা দারুণ অঙ্গহীন হইবে। এইখানে বলা কর্তব্য, আমরা যে অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ এমন নয় যে, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য অতি বিপুল, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য-ভাণ্ডার বহুমূল্য উজ্জ্বল মণিময়। কীরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়— ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৫

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজত্বের পতনের কিছু পূর্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ক্রমশই অবনতির গহ্বরে নামিতেছিল। মাহাত্মা অ্যালফ্রেড তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা বিষয়ে যে উদ্যম উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। অকর্মণ্যতা অজ্ঞতা ও আলস্যে সমস্ত জাতিই যেন জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। টিউটনিক জাতির শিরায় শিরায় প্রধাবিত যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার জ্বলন্ত-বহ্নি তাহাও যেন ক্রমশই নির্বাপিত ও শীতল হইয়া আসিতেছিল। স্যাক্সনগণ যখন দিগ্‌বিদিক লুণ্ঠন করিবার মানসে দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত তখন তাহাদের দলপতি ছিল বটে কিন্তু রাজা ছিল না, তখন তাহারা সর্বতোমুখী প্রভুতার অধীনে গ্রীবা নত করিতে পারিত না, কিন্তু যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল তখন দলপতি ও দলস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমশ রাজা-প্রজার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাব ঘুচিয়া গেল ও সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা দলপতি ক্রমে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হইল। দলপতির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইল, এইরূপে অধিবাসীগণ উচ্চ ও নীচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যেখানেই উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বিভাগ আছে, সেইখানেই যে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার আর কী কথা আছে; ডেনিস দস্যুদের অত্যাচারে নিবাসীদের ধন প্রাণ এমন সংকটাপন্ন হইয়াছিল যে অ্যালফ্রেডের সময় হইতে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, সকলকেই একজন Thign-এর অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে; (Thign অর্থে ভৃত্য বুঝায় কিন্তু রাজার ভৃত্য হউক প্রজাদের প্রভু।) আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এইরূপে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। বহিঃশত্রু, ডেনিস দস্যুদের দ্বারা স্যাক্সনেরা যথেষ্ট নিপীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই তাহাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য নয়; তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ক্ষুদ্র ইংলন্ড তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রদেশ-স্বামী অপরাপর প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিতেছিল। এইরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপদ্রুত

শ্রান্ত দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? যাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে যাহা প্রতিধ্বনিত না হয় তাহাকে আর জাতীয় সাহিত্য বলিব কী করিয়া? যে বিদ্যা কেবল ধর্মাচার্যগণের অধিকারের মধ্যেই বদ্ধ ছিল ও যে সাহিত্য আশ্রম-গৃহের ধূলিময় গ্রন্থাধারের অন্ধকারের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল, সে বিদ্যাকে সমগ্র জাতির উন্নতির চিহ্ন ও সে সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। একে তো বিদ্যাচর্চা অতিশয় সংকীর্ণ শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সীমা আরও ক্রমশ সংকীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ধর্মাচার্যদের মধ্যে ক্রমশ বিদ্যানুশীলন রহিত হইল। এইরূপে অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলন্ডে রক্তপাত ও অশান্তি রাজত্ব করিতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থায় যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে আসিল তখন তাহারা সাহিত্যশূন্য নিষ্ফল স্যাক্সন ভাষা ও স্যাক্সনভাষীদের প্রাণপণে ঘৃণা করিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতই ফরাসি তখনকার সাধুভাষা, রাজভাষা ও লিখিবার ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য স্যাক্সনদের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার কলুষিত হইয়া যায় এইজন্য নর্ম্যানেরা তাহাদের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিত। পাঠশালে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলকেই ফরাসি অথবা ল্যাটিন ভাষায় কথা কহিতে হইত। স্যাক্সন ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সে ভাষায় আর পুস্তক লিখা হয় না। তখন তো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং অতি অল্প লোকেরই পুস্তক প্রাপ্তি ও পাঠের সুবিধা ছিল, সাধারণ লোকদিগের পাঠ করিবার অবসর, সুবিধা ও ক্ষমতা ছিল না; যাহাদের পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা সংগতিপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ফরাসি বা ল্যাটিন ছাড়িয়া গ্রাম্য স্যাক্সন পুস্তক পড়িতে স্বভাবতই সংকোচ ও অরুচি অনুভব করিত। আমাদের দেশে যখন নূতন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দুইছত্র ইংরাজি লিখিতে পারিলে যেমন বিদ্যাশিক্ষা সফল হইল মনে করিতেন, নর্ম্যান অধিকারে স্যাক্সন যুবাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় স্যাক্সন ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা হেয় কার্যের মধ্যে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। স্যাক্সন ভাষায় পুস্তক লিখিতে গেলে পাছে কেহ মনে করে, তবে বুঝি লেখক ফরাসি জানে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কী আছে বলো। কোনো কোনো কবি কয়েক ছত্র ফরাসি ও কয়েক ছত্র স্যাক্সন লিখিতেন, কেননা, এরূপ করিলে ফরাসি ভাষায় অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌঁছাইতে পারে না, তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Len puet fere et defere,
Ceo fait-il trop sovent :
It nis nouther wel ne faire;
Therefore England is Shent.
Nostre prince de Englatere
Par le consail de sa gent
At Westministr after the feire
Made a gret parlement.

কেহ কেহ বা ল্যাটিন, ফরাসি ও চলিত ভাষা এই তিন মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন—

When mon may mest do
Tunc ville suum manifestat
In donis also si vult tibi
prœmia proestat.
Ingrato benefac, post

Hœc á peyne te verra;
Pur bon vin tibi lac non dat
Nec rem tibi rindra.

দুই-তিনটি বিভিন্ন ভাষার এরূপ ঘোরতর মিশ্রণের ফল হয় এই যে, উহাদের কোনোটা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, সকলগুলাই বিকৃত হইয়া যায়। ফরাসির মধ্যে স্যাক্সন ভাব ও কথা, স্যাক্সনের মধ্যে ফরাসি ভাব ও কথা প্রবেশ করিয়া ফরাসি ও স্যাক্সন উভয়ই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। ইংলন্ডে তাহাই হইয়াছিল। নর্ম্যান আমীর-ওমরাওগণ স্যাক্সনমিশ্রিত ফরাসি কহিতে লাগিল ও সাধারণ অধিবাসীগণ ফরাসিমিশ্রিত স্যাক্সন কহিতে লাগিল। নর্ম্যানেরা যে এত চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ থাকে, সে চেষ্টা সফল হইল না। যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহের কোনো বাধা ছিল না, তখন স্যাক্সন ও ফ্রেঞ্চ দুই ভাষার মিশ্রণ নিবারণের কোনো উপায় ছিল না। এইরূপে যখন দুই ভাষা মিশিয়াছিল বা মিশিতেছিল, তখনকার সাহিত্য Semi-Saxon অর্থাৎ অর্ধ-স্যাক্সন সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের বাল্যাবস্থা— সংগ্রহ, অনুকরণ ও অনুবাদের অবস্থা। ফরাসি সাহিত্যই তাহার আদর্শ। এ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে Chivalry-র বিষয় সংক্ষেপে অনুশীলন করা আবশ্যক।

'য়ুরোপীয় ক্ষাত্র ধর্ম' বলিলে Chivalry-র একপ্রকার বাংলা অনুবাদ করা হয়, কেবল আমাদের ক্ষাত্রধর্মে মহিলা-পূজা ছিল না, Chivalry-তে তাহা ছিল। যদি 'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়' হয়, তবে Chivalrous অর্থেও তাহাই বুঝায়। মধ্যযুগে য়ুরোপে যখন বলের নামই ন্যায়, ধর্ম, শক্তি ছিল, তখন সেই নির্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করাই Chivalry-র উদ্দেশ্য ছিল! যদিও ইহাই তাহার উদ্দেশ্য তথাপি ফলে Chivalry সেই উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া ছিল— প্রকৃতপক্ষে, যশের ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিজয় সাধন করিয়া বেড়ানোই Chivalry-র কার্য হইয়াছিল। আপনার বলের উপর বিশ্বাস থাকিলে সেই বল পরীক্ষা ও অনুশীলন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণের বাসনা হয়, এই নিমিত্ত মধ্যযুগের নাইটগণ (Knight) বিপদ অন্বেষণ ও দুঃসাহসিকতা অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেন। সমাজের আদিম অবস্থায় রক্তপিপাসা শান্তির নিমিত্তই লোকে রক্তপাত করিত, কিন্তু য়ুরোপের সমাজ যখন অধিকতর উন্নত হইল তখন যশ-ইচ্ছার নিমিত্ত রক্তপাত প্রচলিত হইল। সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে কখনো যশের ইচ্ছা জন্মিতে পারে না। সমাজে বিখ্যাত হইবার ইচ্ছাই সমাজের প্রতি অনেক পরিমাণে মমতা জন্মিবার চিহ্ন। Chivalry-র আর-এক ভাগ মহিলা-পূজা। এই মহিলা-পূজা এমন অপরিমিত সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা সমূহ গর্হিত ও হাস্যজনক। ঈশ্বর ও মহিলা -পূজা এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বুর্বোঁর ডিউক Louis II তাঁহার নাইটদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'From them (ladies) after God comes all the honour that men can acquire.' অ্যারাগনের অধিপতি James II নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহিলার সঙ্গে থাকিলে হত্যা ভিন্ন যে-কোনো দোষে কেহ দোষী হউক-না কেন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। নর্ম্যানরা এই Chivalry ভাব ইংলন্ডে আনয়ন করিল। Chivalrous কবিতা ও সংগীত Semi-Saxon সাহিত্য পূর্ণ করিল। ইহার পূর্বে অ্যংলো-স্যাক্সন সাহিত্যে রক্তপাত ও যুদ্ধের বর্ণনা অনেক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে Chivalry ভাব কিছুমাত্র ছিল না। এখন বীরত্বের গৌরব কীর্তন, বিজয়-সংগীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলগুলিই প্রায় অনুবাদ, ও তাহাদের মধ্যে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র নাই। অতি পরিষ্কারভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া-তাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।

লেখক অতিশয় বিরক্তিজনক অনর্গল বক্তার মতো বকিয়া বকিয়া, গল্প টানিয়া বুনিয়া, কথা বিনাইয়া পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত নহেন। যত প্রকার অলীক অস্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক কথা লেখকের কল্পনায় আসিতে পারে সকলই তিনি তাঁহার গল্পে গাঁথিয়া দিতে চাহেন। *Romance of Alexander* নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে দুই-একটা নমুনা দিতেছি—

মকর নামেতে প্রাণী আশ্চর্য আকার
বলবান প্রাণী বটে, বড়ো জাঁক তার—
কুমীরের 'পরে যদি পড়ে তার চোখ,
তবে আর রক্ষে নেই, দেখে কেবা রোখ?
দুজনে লড়াই বাধে বড়ো ঘোরতর
প্রহারে দোঁহারে দোঁহে করে জর জর
মকর সেয়ানা বড়ো দোঁহার মাঝারে,
চুপি চুপি অমনি সে জলে ডুব মারে;
মুখে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুমীরের পেটে
যেমন বিঁধিয়ে দেয়, মরে পেট ফেটে॥

একটি ypotame-এর বর্ণনা শুনুন—

জলহস্তী বড়োই আশ্চর্য জানোয়ার,
হাতিও তেমন নহে কী কহিব আর!
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ, জানি,
লেজ তার বাঁকা আর খাটো শুঁড়খানি!
পিচের মতন তার রঙ বড়ো কালো
যত কিছু ফল খেতে বড়ো বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে!

এই তো কবিতার শ্রী। এরূপ ধৈর্যনাশক শ্লোকসমূহ উদ্‌ধৃত করিতে আমরা ভয় করিতেছি, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল। কেবল তখনকার Romance নামক গ্রন্থসকলের ভাব বুঝাইবার জন্য *Geste of kyng Horn* নামক গ্রন্থের মর্ম পাঠকদের কহিতেছি। রাজা 'মারে' যুদ্ধে বিধর্মী স্যারাসীনদের দ্বারা হত হইলে পর তাঁহার পুত্র, গ্রন্থের নায়ক, হর্ন একটি ক্ষুদ্র নৌকায় কতকগুলি সঙ্গীর সহিত রাজা এমারের (Aylmer) দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজসভায় তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজা এমারের একমাত্র কন্যা রিমেন্‌হিল্‌ড্ (Rimenhild) তাঁহার প্রেমে পড়িল। রাজকন্যা, হর্নকে একটি মায়াময় অঙ্গুরী উপহার দেন। সেই অঙ্গুরী লইয়া তিনি স্যারাসীনদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, ও অঙ্গুরী প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় এমারের সভায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাজা এমার হর্নের সহিত তাঁহার কন্যার প্রেম বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া হর্নকে নির্বাসিত করিয়া দেন। হর্ন তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রাজকন্যা যেন সাত বৎসর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন—ইতিমধ্যে তিনি যদি না ফিরিয়া আসেন, তবে রাজকুমারী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে রাজা মোডি রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বিবাহ করিবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রাজকুমার হর্ন ঘটনাচক্রের আবর্তনে অনেক বিপদ-আপদ সহিয়া রাজা মোডির মুষ্টি হইতে রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতৃভূমি সুদীন Suddine শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার কপট বন্ধু ফাইক্‌নিল্‌ড (Fykenild) সুযোগ পাইয়া রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বলপূর্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা

করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হর্ন ফাইক্‌নিল্‌ডের দুর্গে বীণাবাদকের বেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইলেন। গল্প কিছু মন্দ নহে কিন্তু লেখক এমন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ও এমন সাদাসিধাভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাকে কবিতা বলিতে পারি না।

সেমি-স্যাক্সন ভাষায় অনেক প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু এমন ভাববিহীন অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ কবিতা অনুবাদ করিলে পাঠকদের কিছু লাভ নাই, কেবল অনুবাদকের যন্ত্রণাভোগ। একটি অনুবাদ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

কথা মোর রাখো দেখি, একবার দেও সখি
প্রেমের আশ্বাস।
চাহি নাকো আর কারে, যতদিন এ সংসারে
করিতেছি বাস।
নিশ্চয় জানিয়ো প্রিয়ে, এখনি জুড়াবে হিয়ে
তুমি মোরে ভালো বাস' যদি,
ওই অধরের শুধু— একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ঔষধি।

দুই-একটা স্বভাব-বর্ণনা অনুবাদ-সমেত উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি—

Mury hit is in sonne risying.
The rose openith and unspring;
Weyes fairith, the clay's clyng;
The maidenes flowrith, the foulis syng,
Damosele makith mournyng
Whan hire leof makith pertyng.

অনুবাদ

অতিশয় সুখকর সূর্য যবে ওঠে
গোলাপ ফুলের কুঁড়ি বাগানেতে ফোটে;
রাস্তা হয় পরিষ্কার কাদা যায় এঁটে;
পাখি গান গায়, ফুল ফোটে মাঠে মাঠে;
প্রণয়ীদিগের সাথে হইয়া বিচ্ছেদ
বিরহিণী রমণীরা করে কত খেদ।

আর-একটি—

Averil is meory, and lengith the day,
Ladies loven solas, and play;
Swaynes, justes; knyghtis, turnay;
Syngith the nyghtyngale, gredeth thes fay;
The hote sunne clyngeth the clay,
As ye will y-sun may.

অনুবাদ

এপ্রেল সুখের মাস, বেড়ে যায় বেলা;
মহিলারা ভালোবাসে আদর ও খেলা;

চাষারা খেলায় জুস্ট্‌, টুর্নি নাইটেরা;
বুল্‌বুল্‌ গান করে, চেঁচায় কাকেরা;
কাদা সব এঁটে যায় খর রৌদ্র বলে
দেখিতেই পাও তাহা, জান তো সকলে।

Chivalry-র সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্যানেরা রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, য়ুরোপ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। কপট যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, উৎসব আমোদ নর্ম্যান ব্যারনদিগের দুর্গে দুর্গে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে স্কট্‌লন্ড-অধিপতি শত সংখ্যক অশ্বারোহী নাইট সঙ্গে করিয়া লন্ডনে আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে অশ্ব হইতে নামিয়া বহুমূল্য আভরণ-সমেত অশ্বগুলি অর্থীদিগকে দান করিয়া গেল। আর্চবিশপ এ. বেকেট যখন ফ্রান্সে যান, তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র বসন -ভূষিত এক দল ভৃত্য, দুইশত নাইট, বহু সংখ্যক ব্যারন ও আমীর-ওমরাও ছিল, আড়াইশত বালক তাঁহার সম্মুখে জাতীয় সংগীত গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, তদ্‌ভিন্ন গাড়ি ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক-একটি বানর ও মানুষ, অনুচর, সহচর, পুরোহিত, বন্ধুবান্ধবের আর অন্ত নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই ধুমধাম। হাঙ্গারির অধিপতি তাঁহার বিরহবিধুরা দুহিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন—

গাড়ি করে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়,
সে গাড়িটি মুড়ে দেব লাল মকমলে;
পদ্ম আঁকা সাটিন ও জরির চাঁদোয়া
ঝলমল করিবেক মাথার উপরে;
পরিবি সোনার হার, সুনীল বসন;
সাথে সাথে যাবে তোর স্পেনের ঘোটক,
মকমল দিয়ে তার পিঠ দিব ঢেকে;
গান বাদ্য হবে কত বিবিধ আমোদ।
নানা মদ্য আনাইব নানা দেশ হতে।[1]
পোড়া হরিণের মাস করিবি আহার,
যত ভালো মুর্গী পাই এনে দেব তোরে।
পাইবি কুকুর কত হরিণ হরিণী,
খেলা করিবি রে বাছা তাহাদের সাথে।
হরিণেরা এমনি মানিবে তোর পোষ,
ডাকিলেই আসিবেক মুঠির কাছেতে।

---

১. এখানে এত প্রকার মদ্যের নাম লিখিত আছে যে, তাহা বাংলা পয়ারের মধ্যে দিলে ভালো শুনায় না— নিম্নে মূল উদ্‌ধৃত করিলাম— ইহার বানান আধুনিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে :

Ye shall have Rumney and malespine
Both hippocras and varnage wine:
Montrese and wine of Greek,
Both Algrade and dispice eke,
Antioch and Bastarde,
Pyment also and garnarde,
Wine of Greek and Muscadel,
Both clare, pyment and Rochelle.
The reed your stomach to defy
And pots of osey sit you by.

শিকারের শিঙ্গাধ্বনি করিলে শ্রবণ
মন হতে রোগ তোর যাবে দূর হয়ে।
অবশেষে বাড়ি ফিরে আসিবি যখন
নাচ গান কত হবে নাই তার ঠিক,
ছোট ছোট ছেলে মিলে কোকিলের স্বরে
গান শুনাইবে তোরে সে বড়ো মধুর।
অবশেষে আসিবেক সন্ধ্যার ভোজন;
যাইবি হরিত কুঞ্জে তাঁবুটির নীচে,
চুনি হীরে কাজ করা বিচিত্র বসন,
মাটির উপরে পাতা, বসিবি সেথায়;
একশো নাইট মিলি বাজাবে বাজন।
সরোবরে দেখিবি মাছেরা খেলিতেছে,
মন তোর তুষ্ট হবে দেখিলে সে খেলা।
রয়েছে একটি সাঁকো সরসীর 'পরে,
আধেক পাথর তার আধেক কাঠের।
নৌকা এক আসিবেক চব্বিশটি দাঁড়
বাজিবে বাজনা কত ভিতরে তাহার,
চড়ি সে নৌকার 'পরে যাবি হেথা হোথা,
জ্বলিবে সাঁকোর 'পরে চল্লিশটি বাতি,
গৃহে তোর ফিরে যাবি চড়ি সে নৌকায়।
বিছানাটি হবে তোর হীরা মণি গাঁথা,
সে কোমল বিছানায় শুইবি যখন
সোনার প্রদীপাধারে জ্বলিবেক আলো।
তবু যদি ঘুম তোর নাহি হয় বাছা
গায়কেরা গাবে গান সারারাত জেগে।

অসভ্য, মদ্যপানরত, কোলাহলপর, অপরিষ্কার, শিল্পজ্ঞানশূন্য স্যাক্সনদের সাহিত্যে এরূপ কবিতা নাই ও থাকিতে পারে না। স্যাক্সনদের আমোদের সহিত নর্ম্যানদের আমোদের অনেক প্রভেদ। নর্ম্যানদের আমোদের মধ্যে বিলাসের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট। ব্রিটন-অধিপতি ভটিজরন যখন স্যাক্সন দলপতি হেঞ্জিস্টের শিবিরে নিমন্ত্রিত হইয়া হেঞ্জিস্টের পরম রূপবতী কন্যা রোয়নকে দেখিলেন, একজন নর্ম্যান কবি তখনকার বর্ণনা করিতেছে—

হেঞ্জিস্ট করিল চেষ্টা প্রাণপণ করি
রাজা ও নাইটগণ সুখী হয় যাতে।
আমোদে উন্মত্ত হইল সকলে,
গৃহমধ্যে প্রবেশিলা রোয়েন সুন্দরী;
করে মদিরার পাত্র, সুচারুবসনা;
জানু পাতি বসিল সে রাজার সমুখে,
মদিরা করিল পান, চুম্বিলা রাজারে;
কেমন সুন্দর বপু, গৌর কান্তি তার,
কেমন সুন্দর ভূষা, নয়নরঞ্জন!
দেখিয়া উন্মত্ত হইল নৃপতির মন,

মদ্যপানে ভ্রংশ-বুদ্ধি, মাগিলা ভূপতি,
বিধর্মী সে রমণীরে বিবাহের তরে।

স্যাক্সনদের কঠোর লেখনী হইতে এরূপ মৃদু বিলাসময়ী কবিতা বাহির হইতে পারিত না।

কুমারী মেরীই মধ্যযুগের দেবতা ছিলেন। মহিলা-পূজার উৎকর্ষ তাঁহাতে গিয়াই পৌঁছিয়াছিল। প্রথমত তিনি খৃস্টের জননী ছিলেন, দ্বিতীয়ত সাধারণ মহিলাদের তিনিই পূর্ণ প্রতিমাস্বরূপ ছিলেন। তখনকার লোকের রমণী-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্তব উত্থিত হইত। একটি মেরীর স্তব উদ্‌ধৃত করিতেছি—

দেবী, তব হোক জয়, স্বর্গীয় আনন্দময়,
স্বর্গের মধুর পুষ্প তুমি!
মৃদুতার তুমি জন্ম-ভূমি!
দেবী, তব হোক জয়, উজ্জ্বল সৌন্দর্যময়!
সব মম আশা তোমা-'পরি,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী!
নক্ষত্রের রানী তুমি উজ্জ্বল বরন,
দেখাও গো পথ মোরে দাও গো কিরণ,
দেবি, এই বসুন্ধরা মিথ্যা কপটতা ভরা
তুমিই আমারে হেথা করো গো চালন!

রমণী-ভক্তির চর্চা করিয়া করিয়া সে ভাব লোকের মনে সত্য সত্যই এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, এরূপ স্তব হৃদয় হইতে না বাহির হইয়া থাকিতে পারে না।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের উপদেশ অংশ হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-একটা উদ্‌ধৃত করিতেছি। মৃতদেহের প্রতি দেহমুক্ত আত্মার উক্তি—

একদা শীতের রাত্রে আছিনু নিদ্রিত;
দেখিনু আশ্চর্য দৃশ্য; ভূমির উপরে
গর্বিত ধনীর এক দেহ আছে পড়ি।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার আসিল বাহিরে
ফিরিয়া দেখিল চাহি মৃত দেহ পানে।
কহিল সে, 'ধিক্ রক্ত মাংস কলুষিত!
হতভাগ্য দেহ, কেন এমন অসাড়,
আগে যে বড়োই ছিলি উন্মত্ত, অধীর!
অশ্বে চড়ি হেথা হোথা বেড়াতিস ছুটি;
ছিলি সুগঠন, যশ ছিল দেশব্যাপী!
কোথা গেল গর্ব তোর স্বর্গভেদী স্বর?
কেন পড়ি ভূমিতলে, বস্ত্র আচ্ছাদিত?
কোথা তোর দুর্গ, তোর গৃহ সুসজ্জিত?'
ইত্যাদি—

ইত্যাদি— পুরানো কথা লইয়া অনেক বকাবকি করা হইয়াছে। আন্‌ক্রেন রিউল নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে কতকটা উপদেশ-দায়ক বিভীষিকা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা সেমি-স্যাক্সন গদ্য রচনা ও তখনকার লোকের অজ্ঞান কু-সংস্কারের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন—

অলস ব্যক্তিরা ডেভিলের (devil) বুকে তাহার প্রিয় শিশুটির ন্যায় ঘুমাইতে থাকে এবং ডেভিল তাহার কানে মুখ দিয়া কথা কয় ও তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে। যাহারা কোনো সৎকর্মে ব্যাপৃত না থাকে তাহাদের এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ডেভিল ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে,

এবং অলস ব্যক্তি অতিশয় ভালোবাসার সহিত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অলস ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা ডেভিলের বক্ষশায়ী bosom sleeper। ডুম্‌স্‌ডে দিবসে দেবদূতের ভেরীধ্বনিতে তাহারা সহসা চমকিত ও নরকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

লোভী ব্যক্তি ডেভিলের ছাই-কুড়ুনে Ash-gatherer। সে ছাইয়ের উপর ক্রমাগত শুইয়া থাকে, ছাই রাশীকৃত করিতে মহা ব্যস্ত থাকে, ছাই রাশ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে থাকে ও ছাই উড়িয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে, ছাইয়েতে খোঁচা মারে ও তাহার উপরে জমা-খরচের আঁক পাড়িতে থাকে। এই মূর্খের ইহাতেই আমোদ, ডেভিল তাহার এই-সমস্ত খেলা দেখিতে থাকে এবং হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সোনা রুপা ও অন্যান্য পার্থিব ধনসম্পত্তি ছাই আর ধুলার রাশি মাত্র, যে ব্যক্তি তাহাতে ফুঁ দিতে যায় সেই অন্ধ হইয়া যায়, এই ছাইভস্মের জন্য তাহাদের মনে শান্তি থাকে না, ইহাদেরই জন্য তাহারা গর্বিত হইয়া পড়ে, যাহা-কিছু সে রাশীকৃত ও সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনাতীত যাহা-কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা ছাই ভিন্ন আর কিছুই নয়, নরকে গিয়া সে সমুদয় তাহার কাছে সাপ ও ব্যাঙ হইয়া দাঁড়ায়। ঈশায়া বলেন, যে ব্যক্তি প্রার্থীদিগকে খাদ্য বস্ত্র না দেয় তাহার কাপড়-চোপড় পোকার দ্বারা নির্মিত হইবে।

লোভী পেটুক ডেভিলের খাদ্য জোগাইয়া থাকে এইজন্য তিনি সর্বদাই রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ান। তাঁহার মন খাবার থালায়, তাঁহার সমুদয় চিন্তা টেবিলের চাদরে, তাঁহার প্রাণ হাঁড়িতে, তাঁহার আত্মা ঘড়ায় পড়িয়া থাকে। এক হাতে থালা, এক হাতে বাটি লইয়া কাদা-মাখা কালি-মাখা অবস্থায় সে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। সে কত কী এলোমেলো বকিতে থাকে, মাতালের মতো টলমল করিতে থাকে, আপনার ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, ও এই-সকল দেখিয়া ডেভিলের এমন হাসি পায় যে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। ঈশ্বর ঈশায়ার মুখ দিয়া এরূপ লোকদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, 'আমার ভৃত্যেরা আহার করিতে পাইবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না।' তোমরা ডেভিলের খাদ্যস্বরূপ হইবে। 'যে ব্যক্তি যত বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাকে তত যন্ত্রণা দেও।' 'গলানো তাঁবা তাহার গলায় ঢালিয়া দেও।' ইত্যাদি।

নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের ভাব ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতেছিল। যখন নর্ম্যানগণ প্রথম ইংলন্ড অধিকার করিল, যখন স্যাক্সন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অধঃকৃত হইল ও নবাগত বিজয়ীগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিল, যখন স্যাক্সন ধর্মাচার্যগণ ধর্ম-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইল ও নর্ম্যান পুরোহিতগণ বেদী অধিকার করিল, তখন স্যাক্সন সাহিত্যও ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল ও ফরাসি সাহিত্য তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দুই-একজন লেখক প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, নিম্নশ্রেণী লোকদের পাঠের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিয়াই তাহাদের আশা তৃপ্ত থাকিত, তাহাদেরও আদর্শ ফরাসি; ফরাসি পুস্তক হইতে অনুবাদ করাই তাহাদের একমাত্র গতি। কবি লেয়ামন Layamon একটি ল্যাটিন কাব্যের ফরাসি অনুবাদ হইতে এক কাব্য-সংকলন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বিকৃত ও তাহার ছন্দ রচনায় কোথাও প্রাচীন প্রথানুযায়ী যমক-পদ্ধতি, কোথাও বা ফরাসি-আদর্শ-অনুযায়ী মিলের নিয়ম। লেয়ামনের ভাষা বিকৃত স্যাক্সন বটে কিন্তু তাহাতে ফরাসি প্রবেশ করে নাই, অনভ্যাস ও অপ্রচলিত থাকা প্রযুক্ত তখন স্যাক্সন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখনো ফরাসি এমন চলিত হইয়া যায় নাই যে, স্যাক্সনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। নর্ম্যানদের যখন নূতন প্রভুত্ব, তখন স্যাক্সন সাহিত্যের এই দশা। যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে কিছুদিন বাস করিল, যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল, যখন স্যাক্সন ভাষার সংস্পর্শে নর্ম্যান ফরাসি বিকৃত হইয়া গেল ও সাধারণ অনক্ষর নর্ম্যানগণ বিশুদ্ধ ফরাসি অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, শুদ্ধ তাহাই নহে, হয়তো স্যাক্সনদের সহবাসে স্যাক্সনই তাহাদের ভাষা হইল, তখন স্যাক্সন ও ফরাসি মিশিয়া একটা ভাষা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাষায় যে কিছু

পুস্তক রচিত হইত, তাহার ভাব ফরাসি, তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসি, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহা ফরাসি পুস্তকের অনুবাদ ও অনুকরণ! অবশেষে যখন স্যাক্সন ও নর্ম্যান জাতিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বা অনেক পরিমাণে মিশিয়া গেল, যখন জেতা ও জিত জাতির মধ্যে বিভিন্নতা রহিল না, তখন দেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সকলের ভাষাই অনেক পরিমাণে সমান হইল, তখনকার সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হইল; তখন শ্রেণীবিশেষের জন্যই গ্রন্থ রচিত হইত না। তখন জাতির চক্ষুর সম্মুখ হইতে ফরাসি আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল, লেখকেরা নিজের বুদ্ধি হইতে ও নিজের হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে লিখিতে লাগিল। এমন-কি, একদল লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন আদর্শে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি ল্যাংল্যান্ড (Langland) 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' *(Piers Ploughman)* নামে এক কাব্য লিখিলেন, তাহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কবি প্রাচীন স্যাক্সন-প্রণালী অনুযায়ী যমক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইলে লোকের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি টান পড়ে। 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ও একদল লেখক উত্থিত হইল, তাহারা 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখকের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসি অনুকরণে কাব্যরচনার মিল ও ছন্দের নিয়ম তখনকার সাহিত্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে বিজাতীয়ত্ব দূর হইয়া গিয়া তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন অবস্থায় পিছু হঠিয়া অসভ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন রীতির অনুসরণ করিতে যাওয়া অনর্থক। ল্যাংল্যান্ডের অনুবর্তী একদল উত্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, প্রচলিত রীতি যদিও বিদেশীয় আদর্শ হইতে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি তাহারই জয় হইল। ল্যাংল্যান্ডের কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-এক শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Hire robe was ful riche,
Of rud searlit engrenyned,
With ribanes of rud gold
And of riche stones

ইহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কেবল robe, riche, rud, ribanes প্রভৃতি কথায় R অক্ষরের যমক আছে মাত্র।

য়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইংলন্ড দ্বীপের একটা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। যখন রোমে পোপের আসন অধিকারের জন্য বিবাদ বিদ্বেষ চলিতেছিল, যখন পোপেরা অধর্মাচরণে রত ছিল, তখন ইংলন্ড অমিশ্রভাবে থাকিয়া দূর হইতে অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিতে পারিত, পোপের নর-দেবত্ব ভাব তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। রোমীয় চর্চের চরণে তাহাদের রাশি রাশি মুদ্রা ঢালিতে হইত, তাহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। ধর্মাচার্যগণের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকায় তাহারা অধর্মাচরণে দারুণ রত ছিল, এই-সকল কারণে তখনকার চর্চের প্রতি ইংরাজদের অভক্তি জন্মিয়াছিল এবং সাধারণ লোকের মুখপাত্র হইয়া ল্যাংল্যান্ড তাঁহার 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যে তখনকার চর্চ, ধর্মাচার্য ও তখনকার নানা প্রকার কুনীতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উইক্লিফ্‌ ইহার পরে যে ধর্ম-সংস্কার করেন, রোমীয় চর্চের শৃঙ্খল হইতে ইংলন্ডকে মুক্ত করেন, এইপ্রকার কবিতা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এইপ্রকার কবিতা যখন লিখিত হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, ল্যাংল্যান্ড তাহাই কেবল লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই এই কাব্য তখন এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যই সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্নস্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার (Gower) ও চসারের (Chaucer) কাল। তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি

সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্মিত হইতেছিল, এতক্ষণে তাহা একপ্রকার সমাপ্ত হইল।

সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিরা সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চা করিয়া বড়ো আমোদ পাইবেন না। অনুবাদ অনুকরণ ভাবহীন কথার স্রোতেই এই সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ। তবে ভাষা-তত্ত্ব-প্রিয় ব্যক্তি ইহা চর্চা করিলে তাঁহাদের পরিশ্রমের অনেক পুরস্কার পাইবেন। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ সাহিত্য নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে বুঝিবার বড়ো গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত। নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভাষা ও সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে কত প্রকার ঘাত-সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইল। ১০৬৬ খৃস্টাব্দে নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে প্রবেশ করে, তখন হইতে যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায় ও ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে চসার জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদি তাহার শেষ ধরা যায় তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬

চ্যাটার্টন— বালক-কবি

'And we at sober eve would round thee throng,
Hanging, enraptured, on thy stately song;
And greet with smiles the young-eyed Poesy,
All deftly mashed, as near Antiquity.' --Coleridge

কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিতেছেন ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর করিতেছে না, তখন তাঁহার কী কষ্ট! যখন তিনি মনে করিতেছেন পৃথিবীর নিকট হইতে যশ ও আদর তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার ন্যায্য অধিকার, তখন তিনি যদি ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু কী উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন? আপনাকে বিনাশ করিয়া। তিনি বলেন, পৃথিবী যখন তাঁহাকে অনাদর করিল, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহে, তিনি আপনাকে বিনষ্ট করেন ও মনে করেন পৃথিবী একদিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবে। বালক কবি চ্যাটার্টন যখন যশ ও অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া লন্ডনে গেলেন ও যখন নিরাশ হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি কেন তাঁহার লেখা ছাপাইয়া অর্থ উপার্জন করেন না, তখন কবি কহিলেন, পুরানো বস্ত্র কিনিবার জন্য ও গৃহ সাজাইবার জন্য তিনি কোনো কবিতা লেখেন নাই; পৃথিবী যদি ভালোরূপ ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে পৃথিবী তাঁহার কবিতার একটি ছত্রও দেখিতে পাইবে না! আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন পৃথিবী ভালো ব্যবহার করিল না, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও আপনার প্রাণও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; পৃথিবী আজ অনুতাপ করিতেছে। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে যে পৃথিবী তাঁহার মৃত্যুর পর একটি অশ্রুজলও ফেলে নাই; ১৮৪০ খৃস্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া পূর্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।

চ্যাটার্টন তাঁহার শৈশবকাল অবধি এমন সংসর্গে ছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভা কিরূপে স্ফূর্তি পাইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অনুকূল অবস্থায় অনেকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে অনুকূল না হইলে অসময়ে শৈশবে প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে ব্রিস্টল নগরে চ্যাটার্টনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার ধর্ম মা Mrs Edkins ও তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী তাঁহার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা কেহই চ্যাটার্টনকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা চ্যাটার্টনকে পাগল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। প্রায় বালক মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত অথচ কেহ তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইত না; একবার তাঁহার এইরূপ চিন্তিত বিষণ্ণ অবস্থায় Mrs Edkins বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'তোর বাপ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তোকে সিধা করিতেন!' শুনিয়া বালক চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'আহা যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।' বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। কখনো কখনো অনেকক্ষণ কী কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোলে একটি একটি করিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক যথার্থ কারণ বলিতে চাহিত না। আবার এক-এক সময় কতক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কলম লইয়া অনর্গল লিখিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কী লিখিত সে বিষয়ে কাহারও কখনো কৌতূহল হয় নাই। এ-সকল যে অসাধারণ অস্ফূর্ত প্রতিভা-উদ্ভুত, তাহা তাঁহার মাতা কিরূপে বুঝিবেন বলো? স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে একটা গর্দভ মনে করিত, তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইত। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মন ছিল না— কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে এমন তাঁহার পড়িতে মন বসিয়া গেল যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও ঘুমাইতে যাইবার সময়ে বহি বন্ধ করিতেন। যখন তিনি পাঠের গৃহে বসিয়া পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কিছুতেই আহার করিতে আসিতেন না, অবশেষে Mrs Edkins তাঁহার বাল্য-প্রিয়তমা Miss Sukey Will-এর নাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতেন।

যখন এমন কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না যে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, তাঁহার সহিত সমানুভব করিবে, তখন ব্রিস্টলের এক অতি প্রাচীন গির্জা ও সেই গির্জার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন কালের লোকদের পাষাণ-মূর্তি সকলই তাঁহার সঙ্গী ছিল। শুনা যায়, প্রায় তিনি সেই গির্জায় যাইতেন ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুহৃদ্‌দিগকে কবিতা শুনাইতেন। শৈশবে কী বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিবেন? স্কুলের হেডমাস্টার তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহার নামে ঠাট্টা করিয়া একটা কবিতা লিখিলেন, দুষ্টামি করিয়া পাড়ার একটা দোকানদারের নামে কবিতা লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। লোকে বলে এগারো বৎসরের সময় তিনি কবিতা লিখিতে শুরু করেন, কিন্তু তাহারও পূর্বে দশ বৎসরের সময় তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি যিশুখৃস্টের পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে। আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে, এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার একটা নমুনা পাঠকদের হয়তো দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল করিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম—

উপর হইতে দেখো আসিছেন মেঘে,
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে;
আলোকের রাজ্য দিয়া আনিবারে তাঁরে
দ্বিধা হয়ে গেল দেখো শূন্য একেবারে
বদন ঢাকিয়া তার ফেলিল তপন

যিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্র তারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী!
স্বর্গের আদেশ— শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জল স্থল ভেদি তার উচ্ছ্বাসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগণ
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।

ব্রিস্টলের রেডক্লিফ্ গির্জায় (St Mary Redcliffe Church) একটি ঘর ছিল, সেখানে কতকগুলি কাঠের সিন্দুকে অনেকদিনকার পুরানো নানা প্রকার কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ থাকিত। সে-সকল পুরানো অক্ষরের পুরানো ভাষার কাগজপত্রের বড়ো যত্ন ছিল না। চ্যাটার্টনের পিতা যখন গির্জার কর্মচারী ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে সেই-সকল সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেন্ট লইয়া তাঁহার রান্নাঘরের জিনিসপত্র স্রাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহকর্মে নিয়োগ করিতেন। যাহা-কিছু প্রাচীন তাহারই উপর চ্যাটার্টনের অসাধারণ ভক্তি ছিল। চ্যাটার্টন সেই-সকল কাগজপত্র তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন ও সেই-সকল অক্ষর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে প্রাচীন ইংরাজি ভাষা তাঁহার দখল হয় ও তখন হইতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার পাঠগৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কতকগুলা রঙ ও কয়লার গুঁড়া লইয়া স্তূপাকার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে চ্যাটার্টন কী করিতেন তাহা তাঁহার মাতা ভাবিয়া পাইতেন না। কিরূপ করিলে পার্চমেন্ট প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। এই সময়ে চ্যাটার্টন প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিতেন ও অতি যত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন ও যখন প্রকাশ করিতেন, কহিতেন রাউলি (Rowley) নামক একজন ব্রিস্টলের অতি প্রাচীন কবি এই-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই-সকল পুস্তক পাইয়াছেন। কেহ অবিশ্বাস করিত না, কে করিবে বলো? কে জানিবে যে, একজন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া এই-সকল কবিতা লিখিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যেই বা এমন কে ছিল যে সেই-সকল প্রাচীন ইংরাজি ভালো করিয়া বুঝিবে? তাঁহার মাতা, তাঁহার ভগিনী, একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কতকগুলি মূর্খ বালক ও তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে দুই-এক সোপান মাত্র উন্নত দুই-একটি অল্প বেতনের শিক্ষক প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যের অতি অল্পই ধার ধারিত।

Town and Country Magazine নামক এক পত্রিকায় চ্যাটার্টন রাউলির ছদ্মনাম ধারণ করিয়া 'Elinoure and Juga' (এলিনোর ও জুগা) নামকএকটি গাথা প্রকাশ করিলেন। রুড়বোর্ন নদীতীরে বসিয়া এলিনোর ও জুগা তাহাদের যুদ্ধ-নিহত প্রণয়ীর জন্য শোক করিতেছে। জুগা কহিতেছে—

আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময় তীরে, বিষাদ যথায়
রয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সায়াহ্নের হিমে
এইখানে বসি বসি ভিজিব দুজনে!

বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের 'পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিংবা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবে না কাঁপি!
সারা দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারা রাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব যত দুখের কাহিনী।

যদিও চ্যাটার্টনের অহংকার অতি অল্পই প্রশ্রয় পাইয়াছিল ও তাঁহার যশ-লালসা তৃপ্ত হয় নাই তথাপি তাঁহার অহংকার ও যশের ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার মাতার এক কুম্ভকার বন্ধু চ্যাটার্টনকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিবার মানস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে পাত্রের উপর কী চিত্র আঁকিবে। চ্যাটার্টন কহিলেন, 'একটি দেবতা (angel) আঁকো, তাহার মুখে একটি শৃঙ্গা দেও, যেন সমস্ত পৃথিবীময় সে আমার যশঃকীর্তন করিতেছে।' তাঁহার এমন প্রশংসা-তৃষ্ণা ছিল যে, যতদিন তিনি ব্রিস্টলে ছিলেন, তিনি এমন একটি সামান্য কবিতা লিখেন নাই যাহা তাঁহার সহপাঠীদের শোনান নাই; অনেক সময়ে সে বেচারীরা বিরক্ত হইয়া উঠিত। সন্দিগ্ধ লোকের কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন্ প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্মনামে প্রকাশ করিলেন? রাউলি-রচিত কবিতাগুলি চ্যাটার্টনের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার এই একটি প্রধান কারণ। মানুষের চরিত্রে এত প্রকার বিরোধী ভাব মিশ্রিত আছে যে, ওরূপ একদিক মাত্র দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাঁহার সহস্র অহংকার থাক্, তথাপি কত কারণবশত যে তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চলিত ভাষায় লিখিত ছোটোখাটো কবিতাগুলিতে তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিতেন ও তাহা লইয়া যথেষ্ট গর্ব অনুভব করিতেন, আর তাঁহার প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি যদিও খুব গর্বের সহিত সকলকে শুনাইতেন, তথাপি তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না, ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে যে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয় তাহা নহে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচীন ভাষার কবিতাগুলিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ ভক্তির সহিত লোকে অতি পুরাকালের গ্রন্থসমূহকে পূজা করে, তাঁহার নিজ-রচিত কবিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি যে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল, তাহা নহে; কল্পনার মোহিনী-মায়ায় মানুষ নিজহস্তগঠিত প্রতিমাকে দেবতার মতো পূজা করে ও সেই কল্পনার ইন্দ্রজালে চ্যাটার্টন সাধারণ লোকের অনধিগম্য পবিত্র মৃত ভাষায় যে কবিতা লিখিতেন তাহা এক প্রকার সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। যেন সেগুলি তাঁহার নিজের সাধ্যায়ত্ত কবিতা নহে, যেন প্রাচীন যুগের কোনো মৃত কবির আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেই কবিতা বলাইয়াছেন মাত্র। সামান্য

সামান্য বিষয়মূলক— রাজনীতি বা বিদ্রূপসূচক কবিতা লইয়া তিনি খবরের কাগজে ছাপাইতেন, নাম দিতেন, সকলকে শুনাইতেন— অর্থাৎ সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ো সংকোচ অনুভব করিতেন না, কিন্তু 'রাউলি কবিতা' এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা অতি গোপনে লিখিতেন, গোপন রাখিতেন, যদি কখনো বাহিরে প্রকাশ করিতেন তবে সে প্রাচীনকালের ও অতি প্রাচীন লেখকের বলিয়া। দুই-একবার, তিনি নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে সন্দিগ্ধ উপহাসের হাসি দেখিয়া তখনি আবার ঢাকিয়া লইতেন। তাঁহার 'রাউলি কবিতা' লইয়া ওরূপ সন্দেহ, উপহাস তিনি সহিতে পারেন না, লোকের ওই কবিতাগুলি ভালো লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি প্রাচীন ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন হয়তো বালকস্বভাববশত অনেককে ফাঁকি দিবেন ও মজা করিবেন মনে করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, অথবা হয়তো মনে করিয়াছিলেন যদি তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন তাহা হইলে কেহ বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া একটা মিথ্যা নামের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন, ততই কল্পনা-চিত্রিত প্রাচীন পুরোহিত কবি রাউলি তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন সত্যই রাউলি একজন কবি ছিলেন, রাউলিকে যেন দেখিতে পাইতেন, রাউলির কথা যেন শুনিতে পাইতেন। আর প্রথমে যে কারণবশতই এই-সকল কবিতা তাঁহার লুকাইয়া ও ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হোক-না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের চক্ষেও সেই-সকল কবিতার উপর একটা রহস্যের আবরণ পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের কাছেও সে-সকল কবিতা যেন কী একটি গোপনীয়, পবিত্র, প্রাচীন পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা নূতন কথা নহে যে, অনেকে কোনো একটি বিষয়ে অন্যকে প্রতারণা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে আপনাকেও প্রতারণা করে। তাহা ছাড়া তাঁহার চতুর্দিকে এমন সব সঙ্গী ছিল, যাহারা প্রতারিত হইতে চায়। একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভালো কবিতা শুনিলে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে-সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরই ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরই মতো কাপড় পরে— বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান, তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয়তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে, যদি বা কেহ সে-সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড়ো হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বল, এ-সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; কাগজে পত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে— শত প্রকার সংস্করণে শত প্রকার টীকা ও ভাষ্য বাহির হইতে থাকিবে, এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি-বালক কী করিবে? সে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া কতকগুলি বিজ্ঞতাভিমানী বৃদ্ধের নিকট হইতে দুই-চারিটি ওজর করা ছাঁটাছোঁটা মুরুব্বিয়ানা আদর-বাক্য শুনিতে চাহিবে, না, যে নামেই হউক-না কেন, নিজের রচিত কবিতার অজস্র অবারিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিবে? যে যশোলালসার দোহাই দিয়া তুমি 'রাউলি-কবিতা'গুলি বালকের লেখা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে চাহ, সেই যশোলালসাই যে তাহাকে আত্মনাম গোপন করিতে প্রবৃত্তি দিবে, তাহার কী ভাবিলে বলো? লোকে যখন 'রাউলি-কবিতা' বিষয়ে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চাহিত, তখন কবি তাহাদের প্রতারণা করিতেন। ব্যারেট নামক একজন লেখক ব্রিস্টলের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন ক্যাট্‌কট নামক তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, চ্যাটার্টন নামক এক বালক অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেকগুলি ব্রিস্টলের প্রাচীন কবিতা ও বিবরণ পাইয়াছে; ব্যারেট চ্যাটার্টনের নিকট হইতে তাঁহার ইতিহাসের

উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের ভাণ্ডার অজস্র, তুমি যে বিষয় জানিতে চাও, সেই বিষয়েই সে একটা-না-একটা প্রাচীন ভাষায় লিখিত প্রমাণ আনিতে পারে— ঐতিহাসিকের তাঁহাকে সন্দেহ করিবার বড়ো একটা কারণ ছিল না। চ্যাটার্টন তাঁহাকে অনর্গল প্রমাণ রচনা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার ইতিহাস লেখাও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি গর্বের সহিত লিখিলেন— 'এই নগরের (ব্রিস্টল) পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উপযোগী প্রাচীন পুস্তকাদি আমি যেরূপে পাইয়াছি, এমন আর কাহারও ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।' তাহা সত্য বটে! ব্যারেট একবার 'রাউলি-রচিত' 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা আনিবার জন্য চ্যাটার্টনকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, চ্যাটার্টন সমস্তটা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই; অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি স্বীকার করিলেন যে, সে কবিতাটি তাঁহার নিজের লেখা। সহস্র প্রমাণ পাইলেও ব্যারেট তখন বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইতিহাসের অমন সুন্দর উপকরণগুলি এক কথায় হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি প্রতারিত হইতে চাহিলেন, চ্যাটার্টন তাঁহাকে প্রতারণা করিলেন। চ্যাটার্টন তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিলেন।

ভারতী
আষাঢ়, ১২৮৬

বাঙালি কবি নয়

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদের ভারি ভালো লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ওইরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাশান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন-কি, নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব কবি বলিয়া একটা কোনো পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কী, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা তো সকলেই বলে, উহার উল্‌টাটা যদি কোনো প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ো ভালো লাগে।" ভালো তো লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বৈ দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলানো যায়; "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ?" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কী হইতে পারে? ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকে পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত অঙ্গকে পা বলিয়া থাকে, তুমি যদি আজ বল যে, পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্তকে পা বলা যায় তাহা হইলে কথাটা কেমন শোনায় বলো দেখি? পুণ্ডরীকাক্ষ নিয়োগী তাহার এক ছেলের নাম ধর্মদাস, আর-এক ছেলের নাম জন্মেজয়, ও তৃতীয় ছেলের নাম শ্যামসুন্দর রাখিয়াছে, তুমি যদি তর্ক করিতে চাও যে, পুণ্ডরীকাক্ষের তিন ছেলেরই নাম জন্মেজয় নিয়োগী, তাহা হইলে লোকে বলে যে, বৃদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার তিন ছেলের যদি তিন স্বতন্ত্র নাম রাখিয়া থাকে, তুমি

বাপু কে যে, তাহাদের তিন জনকেই জন্মেজয় বলিতে চাও? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভ দৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সংগত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কী করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কী, একই অর্থ বুঝে। যখন গদ্যপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতা-চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রামবাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফাস্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাস্ট ক্লাসে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কী? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া! তবে, ভালো কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা, যথা, হরপ্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি। ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরও তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়। তবে কেন অন্ধকারে বসিয়া আমরা বলি না যে, আমরা আলোকের মধ্যে বসিয়া আছি? সর্বত্রই তো ঈথর আছে ও ঈথরের মধ্যে তো আলোক প্রকাশের গুণ আছে, এমন-কি হয়তো আমাদের অপেক্ষা উন্নততর চক্ষুষ্মান জীব সেই অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। কেন বলি না শুনিবে? অতি সহজ উত্তর। বলি না বলিয়া। অর্থাৎ লোকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য বস্তু-প্রকাশক শক্তি বিশেষের নাম আলোক রাখিয়াছে। চক্ষে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে আলোক বলিবে না, তা তুমি যাহাই বল আর যাহাই কর। ইহার উপর আর তর্ক আছে? তোমার মতে তো বিশ্বশুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর-এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ-সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলংকারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো শোনায়?

* এ প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই আর খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই ও ক্ষমতা থাকিলে আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণত কবি ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বলপূর্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল, তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মতো করে না। অনুভব তো সকলেই করিয়া থাকে; পশুরাও তো সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া, তফাত করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কী-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা তো সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণ চন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণ-চন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীর পুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সংলগ্ন নহে, কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কী ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম, তাহার সৌন্দর্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ-সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর-এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কী বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ। কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে, একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভালো ভালো কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর "Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

> "হবি কি আমার প্রিয়া, রবি মোর সাথে?
> অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্বত, গুহাতে
> যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
> দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখি গায় গান,
তটিনী শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গোরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমতো;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষ শিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই-সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের 'পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই-সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে জোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। কিয়দ্দূর পর্যন্ত একটা ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পরে আর-একটি ভাব গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও উভয়ের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, উভয়েই ভাবিতেছে, এ এখানে কেন? পরস্পরের মধ্যে গলাগলি ভাব নাই। অরণ্য, পর্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতায় আঙিয়া নির্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণখচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে যে কেহ কখনো কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেই বলিয়া উঠিবেন, আমি হইলে এরূপ লিখিতাম না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন। কবিতা রচনায় তাঁহারা হয়তো অমন একটা জাজ্বল্যমান দোষ করেন না, কিন্তু ওই শ্রেণীর দোষ সচরাচর করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাস্তবিক কবি, অন্তরে অন্তরে কবি, তাঁহারা এরূপ দোষ করেন না; কিসের সহিত কিসের ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্মরূপে দেখিতে পান।

কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোনো মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না। ইহাতে কেহ না মনে করেন, আমি কবিকঙ্কণকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে; এই মাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব, অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালোবাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। তাহাদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসংগত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল বালকেরা কবি, অর্থাৎ বালকদের হৃদয়ে বয়স্কদের অপেক্ষা কবিতা আছে, তবে নিতান্ত বালকের মতো কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভালো কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বলো দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভালো কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই? যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারও মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or to its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে যে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যেরূপ উদর পূর্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে তো সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি

---

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক-একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোনো অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোনো মনান্তর নাই।

যখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্মবনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য কী? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন-কি, আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে? তাঁহার মস্তকের চারি দিকে ইন্দ্রধনুর মণ্ডল স্থাপন করো, তাঁহার করে তারকার বলয়, গলে তারকার হার বসাইয়া দেও দেখিয়া কে না আশ্চর্য হইবে?

কোনো পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখো দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলো? আমরা তো প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বলো দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে— তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে? প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার জো নাই। আমি কবি, যে, ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করি, তাহার তাৎপর্য কী? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুত সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্‌খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ-সকল সত্য যদি কবি না দেখেন তো কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে, দশজন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা তো নহে। এক সূর্যকিরণে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখো দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্যটুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাব বিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বলো দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়, কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনও প্রমাণ হউক যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে বলো দেখি?

কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বলেন যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙালি মনুষ্য, অতএব বাঙালি কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি, বাঙালি অশিক্ষিত, অতএব বাঙালি বিশেষরূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য। তাহা ব্যতীত, তাঁহাদের প্রমাণ করিবার পদ্ধতিই বা কী রূপ? কবিত্ব কিছু একটা অদৃশ্য গুণ নহে, তাহা Algebraর x নহে যে, অমন অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি, বাঙালি কবি কি না জানিতে চাও, তবে দেখো, বাঙালি কবিতা লিখিয়াছে কি না ও সে কবিতা অন্য অন্য জাতির কবিতার তুলনায় এত

ভালো কি না যে, বাঙালি জাতিকে বিশেষরূপে কবি জাতি বলা যাইতে পারে। তুমি জান যে, অতিরিক্ত মোটা মানুষেরা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে। দৃশ্যমান ব্যক্তি-বিশেষ মোটা কি না, জানিতে হইলে, তুমি কি প্রথমে দেখিবে সে ব্যক্তি সহজে নড়িতে চড়িতে পারে কি না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে কি না, ও তাহা হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে সে ব্যক্তি মোটা? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তো আমি বলি, তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, তাহার প্রকাশমান শরীরের আয়তন দেখিয়া তাহাকে মোটা স্থির করা।

বাংলা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়টি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কয়টি বাংলা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্বল-পদ শিশুর মতো গৃহের প্রাঙ্গণ পার হইলেই টলিয়া পড়ে না? যে কল্পনা সূক্ষ্ম দ্রব্যেও যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি অতি বিশাল দ্রব্যকেও মুষ্টির মধ্যে রাখে। যে কল্পনা বসন্ত বায়ুর অতি মৃদু স্পর্শে অচেতনের মতো এলাইয়া পড়ে, এবং শত ঝটিকার বলে হিমালয়ের মতো অটল শিখরকেও বিচলিত করিয়া তোলে। যে কল্পনা, যখন মৃদু তখন, জ্যোৎস্নার মতো, যখন প্রচণ্ড তখন ধূমকেতুর ন্যায়। কোনো বাংলা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ? নানাপ্রকার বিরোধী মনোবৃত্তির ঘোরতর সংগ্রাম বর্ণিত দেখিয়াছ? এমন মহান ঘটনা জীবন্তের মতো দেখিয়াছ যাহাতে তোমার নেত্র বিস্ফারিত ও সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে? কোনো বাংলা কাব্য পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয়ে এমন ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, অথবা পুষ্প-বাস-স্নিগ্ধ এমন মৃদু বায়ু সেবন করিয়াছ যাহাতে তোমার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়া গিয়াছে, নেত্র মুদিয়া আসিয়াছে ও হৃদয়কে জীবন্ত জ্যোৎস্নার মতো অশরীরী ও অতি প্রশান্ত আনন্দে মগ্ন মনে করিয়াছ?

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যই নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোনোদিন বা খাইতে পায় কোনোদিন বা খাইতে পায় না। যেদিন খাইতে পায়, সেদিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই-তিন আলু-ওল পোড়া খায়। "ছোটো গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" "ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।" এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজসভায় ও একটি ছোটোখাটো জমিদারি কাছারিতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে "হানিফ গোপ" ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার।

"ফোঁটা কাটা মহা দম্ভ, ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।"

ধনপতি নামে এক সদাগর আছে; সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্বলা বলিয়া তাহাদের এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে, ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীদের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণের দেবদেবীরাও নিতান্ত মানুষ, কেবলমাত্র মানুষ নহে, কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙালি। হরগৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হরগৌরীর কলহ পড়িয়া দেখো দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসি, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারও ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারও মনে কখনো মহানভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এ গ্রন্থটি বাঙালি পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতার ইহা অতি উপাদেয়

হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যত লোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণচণ্ডী পড়িয়াছে? বাঙালি জাতি কতখানি কবি, ইহা হইতেও কি তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না? এই-সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গরমণীদের মতো অন্তঃপুরবদ্ধ। কখনো বা খুব প্রখরা, মুখরা, গাল ভরা পান খায়; হাতনাড়া ঘন ডাক, সতীনের "কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে" কখনো বা স্বামী আসিবে বলিয়া

"পরে দিব্য পাট শাড়ি, কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

কখনো বা স্বামী প্রবাসে, সতীনের নিগ্রহে ভালো করিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়। কত অল্প আয়তন স্থানে কল্পনাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙালি ইন্দ্র, বাঙালি ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালিরা এ কাব্য লইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কী, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে

"মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।"

কোথায় চাষার— "ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তালপাতার ছাউনি" আছে, যেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়দত্ত হাটে আসিয়াছে—

"পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।"

তাহা সমস্ত তিনি ভালো করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনায় বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার, ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে। যে কল্পনা রাম, সীতা, অর্জুন সৃষ্টি করে, তাহার পক্ষে কি কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত ও লহনা, খুল্লনাই যথেষ্ট? পর্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে, জ্যোৎস্নায়, পুষ্পবনে যাহার লীলা, হাট, বাজার, জমিদারির কাছারিতে তাহাকে কি তেমন শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙালি জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না। যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গসাহিত্যে এমন কবিতা কোথায়?

আধুনিক বাঙালি কবিতা লইয়া তেমন বিস্তারিত আলোচনা করা বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরও অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্‌বুদগুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে-সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে-সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কী করিয়া বলি বাঙালি কবি? হইতে পারে বাংলায় দুই-একটা ভালো কবিতা আছে, দুই-একটি

মিষ্ট গান আছে, কিন্তু সেইগুলি লইয়াই কি বাঙালি জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে, বাঙালি কবি?

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৭

বাঙালি কবি নয় কেন?

"বাঙালি কবি নয় কেন?" এ প্রশ্ন লইয়া গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়তো ঈষৎ হাস্যরসের উদ্রেক হয়। তাঁহারা বলিবেন, প্রথম প্রশ্ন হউক, "বাঙালি কী" পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, "বাঙালি কী নয়"! যদি জিজ্ঞাসাই করিতে হইল, তবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায় "বাঙালি দার্শনিক নয় কেন", "বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয় কেন", "বাঙালি শিল্পী নয় কেন", "বাঙালি বণিক নয় কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালি জাতির মতো এমন একটা অভাবাত্মক গুণসমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় যে বাঙালিতে অমুক বিশেষ গুণের অভাব দেখা যায় কেন, তাহা হইলে শ্রোতারা সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিবেন বাঙালিতে কী গুণের ভাব দেখিতে পাইতেছ? এরূপ ঘটনায় আমাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটি কথা কহিবার আছে? "বাঙালি কী" ইহা অপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি আর কিছু হইতে পারে? ও বাঙালি কী নয় ইহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন কি আর আছে?

তবে আজ, বাঙালি কবি নয় কেন, এ প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বসিবার তাৎপর্য কী? তাহার তাৎপর্য এই যে, আজকাল শত সহস্র বঙ্গীয় বালক আধ পয়সা মূলধন লইয়া (বিদেশী মহাজনদিগের নিকট হইতে ধার করা) দিন রাত প্রাণপণপূর্বক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিত্ব চাষ করিতেছেন; আজ যখন দেখিলেন বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র তাঁহাদের যত্নে কাঁটা গাছ ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশ জন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "আহা, জমি কী উর্বরা!" বঙ্গবাসীগণ স্বপ্নেও স্বজাতিকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহংকার করিয়া বেড়ান না, অতএব সে বিষয়ে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহারা রাশীকৃত অসার কবিত্বের খড় তাঁহাদের কাক-পুচ্ছে গুঁজিয়া দিন রাত্রি প্রাণপণে পেখম তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন, এমন-কি, ভালো ভালো কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম নাড়িয়া আসেন; অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ময়ূর বলিয়া তাঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দশ জন লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে, যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, "আমাদের পশ্চাতে যাঁহাদের দেখিতেছ, তাঁহারা কাক নন, তাঁহারা ময়ূর!" আজকাল তো এইরূপ দেখিতেছি। বহু দিন হইতে ভাবিতেছি, বাঙালি কেন আপনাকে কবি বলিয়া এত অহংকার করে, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলে, "দেখিতেছ না, আজকাল বাংলার সকলেই কবিতা লেখে!" সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা বর্ণমালা কাগজে গাঁথিতেছে, তাহা দেখিয়াই যদি বাঙালি জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি আখ্যা দেও, হে চাষা, ক্ষেত্রে অগণ্য কাঁটা গাছ দেখিয়া ফসল ভ্রমে যদি তোমার মনে বড়ো আনন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার সে ভ্রম ভাঙা আবশ্যক।

যদি এমন একটা কথা উঠে যে, ইংরাজ কবি কেন, তবে তাহা লইয়া দুই দণ্ড আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে কি আশ্চর্য বোধ হয় না যে, যে ইংরাজেরা এমন কাজের লোক, বাণিজ্যবৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, সময়কে যাহারা কান ধরিয়া খাটাইয়া লয়, একটি মিনিটকেও ফাঁকি দিতে দেয় না, জীবিকার জন্য যাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, বাহ্য সুখসম্পদই

যাহাদের উপাস্য দেবতা, যাহারা রাজ্যতন্ত্রীয় মহাসাগরে দিনরাত মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুচ্ছ আস্ফালনে সেই সমুদ্রকে অবিরত ফেনিত প্রতিফেনিত করিতেছে, তাহারা এমন কবি হইল কিরূপে? ইংলন্ড দেশে, অমন একটা ঘোরতর কাজের ভিড়ের মধ্যে, হাটবাজারের দর-দামের মধ্যে, বড়ো রাস্তার ঠিক পাশেই— যেখানে আমদানি ও রপ্তানির বোঝাই করা গাড়ি দিনরাত আনাগোনা করিতেছে— সেখানে কী করিয়া কবিতার মতো অমন একটি সুকুমার পদার্থ নিজের সাধের নিকেতন বাঁধিল? আর আমরা যে, এই বঙ্গদেশে সূর্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত ঝিমন্ত স্বপ্নন্ত জীবন বহন করিতেছি, শত সহস্র অভাব আছে অথচ একটি অভাব অনুভব করি না, বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তুষ্ট, অথচ ভালো করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, আমরা কেন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলাম না? অনেক কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নাই। উত্তেজনা নাই বলিতে বুঝায়, আমরা কিছুই তেমন গভীর রূপে, তেমন চূড়ান্ত রূপে অনুভব করিতে পারি না। ঘটনা ঘটে, আমাদের হৃদয়ের পদ্মপত্রের উপর পড়িয়া তাহা মুহূর্তকাল টলমল করে, আবার পিছলিয়া পড়িয়া যায়। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, যাহা আমাদের হৃদয়ের অতি মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক। সন্তুষ্ট প্রকৃতির অর্থ আর কিছুই নহে। তাহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভাবকতা তেমন তীব্র নহে, আমরা সুখ ও দুঃখ তেমন প্রাণপণে অনুভব করিতে পারি না। সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট তেমন ভীতিজনক দন্ত বিকাশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্ট নামে একটা বল্‌গা-রজ্জুহীন ছুটন্ত অন্ধ অশ্বের উপর চড়িয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম? আমাদের ঘৃণা নাই, আমাদের ক্রোধ নাই, অন্তর্দাহী জ্বলন্ত আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় চিরস্থায়ী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নাই। একটা অন্যায় ব্যবহার শুনিলে ঘৃণায় আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে না। একটা অন্যায়াচরণ পাইলে আমরা ক্রোধে আত্মহারা হই না, ও যতক্ষণ না তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ফুটিতে থাকে না। আমাদের ক্ষীণ দুর্বল শরীরে অত উত্তেজনা সহিবেই বা কেন? আমাদের এই অল্প পরিসর বক্ষের মধ্যে, আমাদের এই জীর্ণ-জর্জর হাড় কখানির ভিতরে অত ঘৃণা, অত ক্রোধ যদি জ্বলিতে থাকে, সুখে ও দুঃখে যদি অত তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তবে আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে! আমাদের মতো এমন একটি ভগ্নপ্রবণ এঞ্জিনে অত অগ্নি, অত বাষ্প সহিবে কেন? মুহূর্তে ফাটিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্তিমান। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হই, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাই। সে লজ্জা আবার আত্মগ্লানি নহে, আত্মগ্লানির দাহকতা আছে; দোষ করিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হওয়া তো পৌরুষিকতা। আমাদের লজ্জা, দশ জনের চোখের সুমুখে পড়িয়া জড়োসড়ো হইয়া যাওয়া, পরের নিন্দা-সূচক ঘৃণার দৃষ্টিপাতে মরোমরো হইয়া পড়া, একটা ঘোমটা থাকিলেই আর এ-সকল লজ্জা থাকিত না। যে-সকল মনোবৃত্তিতে উত্তেজিত করে ও একটা-কোনো কার্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই, কিন্তু যে-সকল মনোবৃত্তিতে আমাদের সংকুচিত করে ও সকল কার্য হইতে বিরত করে তাহা আমাদের আছে। আমাদের দেশে রাগারাগি হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যায় না। বলবান জাতিদের মতো বিশেষ রাগ হইলেই অমনি ঘুষি আগেই লাফাইয়া উঠে না, রাগ হওয়া ও হাতাহাতি হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান গালাগালিতেই কাটিয়া যায় এবং আমাদের দুর্বল-শরীর ক্রোধ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেবল রাগ নহে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই এত দুর্বল যে তাহারা তাহাদের ক্ষীণ হস্তে ধাক্কা মারিয়া আমাদের কোনো একটা কাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যদি বা দেয় তো সে কাজ সমাপ্ত হইতে-না-হইতে সে নিজে পলায়ন করে; যদি বা লিখিতে বস তবে বড়োজোর কর্তা ও কর্ম পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু ক্রিয়া কোনো কালে লেখা হয় না; যেমন, যদি লিখিতে চাও যে,

"বঙ্গনন্দন বাবু দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন" তবে বড়োজোর "বঙ্গনন্দন বাবু" ও 'দেশলাই" পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু "প্রস্তুত করিতেছেন" পর্যন্ত আর লেখা হয় না। বলাই বাহুল্য যে, যাহার মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত দুর্বল, সে কখনো কবি হইতে পারে না। যে বিশেষরূপে অনুভব করে না সে বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বাঙালির হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই, তাহা যদি থাকিত তবে কার্যের এত দরিদ্রদশা কেন থাকিবে? অতএব বাঙালি জাতি যদি না ভাবে তো সে প্রকাশ করিবে কীরূপে? কবি হইবে কীরূপে?

আমরা যে এত অনুভব কম করি কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ আমাদের কল্পনার দৃষ্টি অতি সামান্য। যে ব্যক্তির কল্পনা অধিক, সে ব্যক্তির অনুভাবকতাও তেমনি তীক্ষ্ণ। কল্পনা আমাদের হৃদয়ে দর্পণের ন্যায় বর্তমান। যাহার কল্পনা মার্জিত ও মসৃণ তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্ব অতি সমগ্র ও সম্পূর্ণ হয়; প্রতিবিম্বও সত্য পদার্থের মতো প্রতিভাত হয়, কিন্তু মলিন কল্পনায় প্রতিবিম্ব অতি অস্পষ্ট হয়, ভালো করিয়া দেখা যায় না। একটা ঘটনা যদি হৃদয়ে ভালো করিয়া প্রতিবিম্বিতই না হইল, যদি তাহা ভালো করিয়া দেখিতেই না পাইলাম, তবে তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ হইবে কেন? একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কীরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সম্মুখে আতা গাছটি রহিয়াছে, এক পাশে গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে, ছোটো মেয়েটি দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে, সে তাহাকে দেখিয়া কী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা কী বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বাড়িতে কিরূপ একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, সমস্ত সে দেখিতে পায়; কে তাহাকে কী প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কী উত্তর দিবে তাহা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে। কল্পনা যদি এমন জাজ্বল্যমান না হয়, তবে সে কখনো স্পষ্ট সুখ অনুভব করিতে পারে না। যখন একজন ভাবী দারিদ্র্য-দুঃখ ভাবিয়া আত্মহত্যা করে, তখন সে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের দশা বর্তমানের মতো অতি স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া দেখে, নহিলে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

যে ব্যক্তির অনুভাবকতা অধিক সে ব্যক্তি কাজ করে, সে কখনো নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। সুখ তাহাকে এত আনন্দ দেয় যে, সুখের জন্য সে প্রাণপণ করে, দুঃখ তাহাকে এত কষ্ট দেয় যে, দুঃখের হাত এড়াইতে সে বিধিমতে চেষ্টা করে। বাঙালিরা কাজ করিতে চাহে না, কেননা তাহারা জানে যে, কোনোরূপে দিনপাত হইয়া যাইবে। কষ্ট হউক দুঃখ হউক কোনো রূপে দিনপাত হইলেই সন্তুষ্ট। যাহাদের অনুভাবকতা অধিক, তাহাদের কি এরূপ ভাব? এমন হয় বটে, যে, অনেক সময় আমরা অনুভব করি কিন্তু শরীরের দৌর্বল্যবশত সে অনুভাবকতা আমাদের কাজে নিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় ক্রমেই আমাদের অনুভাবকতা কমিয়া যায়। অনবরত যদি দুঃখের কারণ ঘটে, অথচ তাহার প্রতিকার করিতে না পারি; চুপচাপ বসিয়া দুঃখ সহিতেই হয়, জানি যে, কোনো চারা নাই, তাহা হইলে মন হইতে দুঃখবোধ কমিয়া যায় ও অদৃষ্টবাদ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মে। যেমন করিয়াই হউক অনুভাবকতার হ্রাস হয়ই!

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, কাজের সহিত কল্পনার মুখ-দেখাদেখি নাই। কল্পনা যদি এখানে থাকে তো কাজ ওখান দিয়া চলিয়া যায়। সচরাচর লোকে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, কাজের লোক ও কল্পনাপ্রধান লোক। কাজের লোক যদি উত্তর মেরুতে থাকে তো কল্পনাপ্রধান লোক দক্ষিণ মেরুতে থাকিবে। কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে? তুমি একটি ছবি আঁকিতে চাও, আগে কল্পনায় সে ছবি না উঠিলে কীরূপে তাহা আঁকিবে? মাটির উপর তোমাকে একটি

বাড়ি গড়িতে হইবে কিন্তু তাহার আগে শূন্যের উপর সে বাড়ি না গড়িলে চলে কি? যদি কাজের বাড়ি গড়িবার পূর্বে কল্পনার বাড়ি গড়া নিতান্তই আবশ্যক, তবে কল্পনার বাড়ি যত পরিষ্কার ও ভালো করিয়া গড় কাজের বাড়িও তত ভালো হইবে সন্দেহ নাই। কল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি যদি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয় তবে মাটির উপর গড়িতে তাহা পাঁচবার করিয়া ভাঙিতে হইবে।*

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা কাজের বাধাজনক নহে বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধিসাধক। তবে কেন কল্পনার নামে অনর্থক এরূপ একটা বদনাম হইল? বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, যাহারা নিত্যনিয়মিত ধরাবাঁধা কাজ করে, যে কাজে একটা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি থাকিবার আবশ্যক করে না, কালও যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহা করিতেছি, আর কালও তাহাই করিতে হইবে, তাহাদের কল্পনা খোরাক না পাইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এবং যাহাদের কল্পনা অধিক, তাহারা এরূপ কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাহারা এমন কাজ করিতে চায় যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিবার আছে, ভাবিবার আছে। একজন কাল্পনিক পুত্রকে যখন তাহার পিতা কহেন "ইহার কিছু হইবে না" তখন তাঁহার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ হতভাগ্যের পুত্র কেরানি হইতে পারিবে না বা হিসাব রাখিবার সরকার হইতে পারিবে না। কিন্তু একটা মহান কাজ মাত্রেই কল্পনার আবশ্যক করে তাহা বলাই বাহুল্য। নিউটন বা নেপলিয়নের কল্পনা কি সাধারণ ছিল? ইংলন্ডের লোকেরা কাজের লোক! এ কথা সত্য বটে কাজের লোক বলিতে বুঝায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশই চিঠি কাপি করা হিসাব রাখা প্রভৃতি ধরাবাঁধা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? যে দেশে যন্ত্রের বাহুল্য সে দেশে যন্ত্রীর বাহুল্য। একজন বা দুই জন বা কতকগুলি লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাজের সৃজন ও স্থাপন করে ও তাহাতেই দশ জনে মিলিয়া খাটে। অন্ধকারে যদি কেবল দেখিতে পাও যে, দুইটি হাত ভারি কাজে ব্যস্ত আছে, তৎক্ষণাৎ জানিবে কাছাকাছি একটা মস্তক আছে। যে শরীরের মাথা নাই, সে শরীরের হাতে কোনো কাজ থাকে না। ইংলন্ডে অত্যন্ত কাজের ভিড় পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংলন্ডের মাথা আছে। যখন তুমি দেখ যে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না ভাবিয়া যন্ত্রের মতো কাজ করে, পা চলিতেছে কিন্তু পায়ের ভিতরে মস্তিষ্ক নাই, পা ভাবিয়া চিন্তিয়া চলে না, অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গই সেইরূপ, যখন তুমি মনে কর না যে সে শরীরটায় মস্তিষ্ক নাই। একজন ব্যক্তির কল্পনা আছে বলিয়া দশ জন অকাল্পনিক লোক কাজ পায়। ইংলন্ডে যে এত কাজ দেখিতেছি তাহার অর্থ ইংলন্ডে অনেক কাল্পনিক লোক আছে। একজন দরিদ্র ইংরাজ যে তাহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে গিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে তাহার

---

* অনেকে ভুল বুঝিতে আশ্চর্যরূপে পটু। তাঁহাদের ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহাদের যদি বলা যায় যে, কামানের গোলা লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "বিলক্ষণ। এই সেদিন দেখিলাম সাতকড়ি সার্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, কিন্তু বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি কামান ছিল না!" এত ক্রোধ যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মারিতে উদ্যত। তাঁহাদের বলা গেল যে, কবি হইতে গেলে শিক্ষার আবশ্যক, তাঁহারা বলিলেন "কই, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তো কবি হয় না।" তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন যে, যখন তাঁহাদের বলা হয় যে, "আগুনের উপর না চড়াইলে পায়স প্রস্তুত হয় না" তখন তাঁহারা মনে না করিয়া বসেন যে, আগুনের উপর জল চড়াইলেও পায়স প্রস্তুত হয়। বক্তার এই বলা অভিপ্রায় যে, আগুনের উপর দুধ ও চাল চড়াইলেই তবে পায়স হয়। বক্তা জানিতেন যে, যাহাকে বলা হইতেছে সে জানে কী কী পদার্থে পায়স প্রস্তুত হয়, কেবল জানে না যে, আগুনের উপর চড়ানো পায়স প্রস্তুত করণের একটা অঙ্গ। যাহার কবিত্ব আছে শিক্ষায় সেই কবি হয়। বর্তমান লেখক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির কল্পনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাঁহারা অস্বীকার করেন যে, কবির প্রকাশক্ষমতা ও শিক্ষার আবশ্যক, এইজন্য কল্পনার বিষয়ে কিছুই বাহুল্য উল্লেখ করা হয় নি। যাহা হউক, উপরি-উক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কি এমন একটি বাহুল্য কথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা থাকিলেই যে, ভালো বাড়ি গড়া হয় তাহা নহে; দুই সমশ্রেণীর কারিগরের মধ্যে যাহার কল্পনা অধিক সেই অপরের অপেক্ষা ভালো বাড়ি গড়িবে!

কারণ তাহার কল্পনা আছে। এই কল্পনায় ইংরাজদের কোথায় না লইয়া গিয়াছে বলো দেখি। কোথায় আফ্রিকার রৌদ্রতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়, আর কোথায় উত্তর মেরুর তুষারময় জনশূন্য মরু প্রদেশ, কোথায় তাহারা না গিয়াছে? যাহা অনুপস্থিত, যাহা অনধিগম্য, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা কষ্টসাধ্য, অকাল্পনিক লোকেরা তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিবে না। যাহা উপস্থিত নাই অকাল্পনিক লোকদের কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই। বর্তমানে যাহার মূল নিতান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইতেছে, এমন কিছু তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এমন-কি, অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য অকাল্পনিক লোকেরা একটা কিছু সৃষ্টিছাড়া আশা করে না। সুতরাং কাল্পনিক লোকেরা যেমন অনেক বিষয়ে ঠকে, এক-একটা সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে নিজের ও পরের সর্বনাশ করে, অকাল্পনিকদের তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই। এইজন্যও বোধ করি কাল্পনিকদের একটা নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে সে ব্যক্তির ওই বাহিরের কূপটার মধ্যে পড়িয়া মরিবার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে ব্যক্তির ওই ফুলবাগানে বেড়াইবার বা বিদেশে গিয়া টাকা রোজগার করিবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। একজন কাল্পনিক ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকিলে সে অনেক হানিজনক কাজ করে, কিন্তু সে তাহার বুদ্ধির দোষ না কল্পনার দোষ? এক কথায় পৃথিবীতে যত বড়ো বড়ো কাজ হইয়াছে সকলই কল্পনার প্রসাদে। তবে কেন আজ, কাজ অমন মুখ ভার করিয়া কল্পনার প্রতি মহা অভিমান করিয়া বসিয়া আছে?

যে দেশে শেক্‌সপিয়র জন্মিয়াছে সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব, ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতা সৃজন করা নয়। যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সে দেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়; সকলই হয়, বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙালি দার্শনিক নয়, বাঙালি কবিও নয়।

লোকেরা যে মনে করে যে, অকেজো লোকেরা অত্যন্ত কাল্পনিক হয় তাহার একটি কারণ এই হইবে যে, যাহাদের হাতে কাজ নাই তাহারা কল্পনা না করিয়া আর কী করিবে? নানা লঘু অস্থায়ী ভাবনাখণ্ডের ছায়া মনের উপর পড়াকেই যদি কল্পনা বল, তবে তাহারা কাল্পনিক বটে। কিন্তু সেরূপ কল্পনার ফল কী বলো? সেরূপ কল্পনায় লোককে কবি করিতে পারে না। মনে করো এক ব্যক্তি যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ সে নখ দিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে আঁচড় কাটিতে থাকে, ইহাতে তাহার অতি ঈষৎ পদচালনা হয়; চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার মাটিতে আঁচড় কাটিবার অবসর থাকে না কিন্তু তাহাই বলিয়া কি বলা যাইতে পারে যে, বসিয়া থাকিলেই তাহার যথার্থ পদচালনা হয়? কাজ করিতে যে কল্পনার আবশ্যক করে তাহাই পদচালনা, বসিয়া থাকিলে যে কল্পনা আপনা হইতে আসে তাহা মাটিতে আঁচড় কাটা। যদি কিছুতে সে পদের বলবৃদ্ধি করে, তবে সে চলাতেই। একটি কবিতা লিখিতে হইলে কল্পনাকে একটি নিয়মিত পথে চালন করিতে হয়, তখন তাহার একটি ক্রম থাকে, একটি পরিমাণ থাকে, শুদ্ধ তাহাই নহে, সে সময়ে কল্পনা অলস-কল্পনা অপেক্ষা অনেকটা গভীর ও বিশেষ শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক করে। যাহার সর্বদা কবিতা লেখা অভ্যাস আছে, সে যখন কবিতা নাও লিখিতেছে, তখনও মাঝে মাঝে হয়তো সেই ক্রমানুযায়িক, পরিমিত, বিশেষ শ্রেণীর কল্পনা মনে মনে চালনা করিতে থাকে। সেরূপ চালনাতেও মনোনিবেশ আবশ্যক করে, পরিশ্রম বোধ হয়। অলস ব্যক্তি, ও যে কখনো কবিতা লেখে না, সে কখনো অবসর কাল এরূপ শ্রমসাধ্য কল্পনায় অতিবাহন করে না। স্বপ্ন ও সত্য ঘটনায় যত তফাত অলস ও কাজের কল্পনায় তাহা অপেক্ষা অল্প তফাত নয়। অতএব কাজের লোকের কল্পনা অলস লোকের কল্পনা অপেক্ষা অধিক জাগ্রত। যে জাতির মধ্যে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব, বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হয়, দর্শনের আলোচনা চলে, সে জাতির মধ্যে কল্পনার অত্যন্ত চর্চা হয় ও সবশুদ্ধ ধরিয়া কল্পনার ভাণ্ডার অত্যন্ত বাড়িতে থাকে; সুতরাং সে দেশে অলস দেশ অপেক্ষা কবি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। বাঙালি কাজও করে না, বাঙালি কল্পনাও করে না।

স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীবভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙালিকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প। হাতে একটা দ্রব্য পড়িলে তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে ইচ্ছাই হয় না। কোনো স্থান দিয়া যখন যাই তখন দুই দিকে চাই না, মাটির দিকেই নেত্র। সত্য জানিবার জন্য কৌতূহল নাই। আমি জানি, ইংলন্ডে সামান্য শ্রমজীবীদিগের জন্য নানা সভা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সমস্ত দিনের শ্রমের পর ৬ পেন্স খরচ করিয়া কত গরিব লোক শুনিতে আসে। একজন হয়তো ইজিপ্টের প্রাচীন দেবদেবীদের বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। একজন নিরক্ষর শ্রমজীবীর যে, সে বিষয় শুনিতে কৌতূহল হইবে ইহা আমাদের কাছে বড়োই আশ্চর্য বোধ হয়। সামান্য কৌতুকের বিষয় হইলে ছোটো বড়ো সকল লোকে একেবারে ঝাঁকিয়া পড়ে। য়ুরোপে যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সেইখানেই ইংরাজদের হোটেল নিশ্চয়ই আছে, এবং অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজদেরই আধিক্য। এটনার গর্ভের মধ্যে একজন ইংরাজই প্রথম অবতরণ করেন, এবং ইটালিয়নরা বলিয়াছিল এ ব্যক্তি হয় ইংরাজ নয় শয়তান হইবে। আমাদের সাধারণত কৌতূহলের অভাব। সেইজন্য আমরা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহার সমস্তটা আমাদের চক্ষে পড়ে না। সুতরাং সে দ্রব্যটা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেই পারি না। ইংরাজেরা একটা ভালো দ্রব্যের প্রতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত উপভোগ করে। সুইজর্লন্ডের দৃশ্য রমণীয় বলিয়া তাহারা অবসর পাইলেই সেখানে যায়। সেখানে আবার একটা বিশেষ পর্বত-শিখর হইতে সূর্যোদয় অতি সুন্দর দেখায়; সেই সূর্যোদয় দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি অর্ধরাত্রে উঠিয়া হয়তো সেখানে যাত্রা করে, ঠিক পাঁচটার সময় সেখানে গিয়া পৌঁছায়, সূর্যোদয়টুকু দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসে। তাহারা সেই উদয়োন্মুখ সূর্যের চতুর্দিকস্থ প্রতি মেঘ খণ্ড আলোচনা করে। আমাদের দেশে কত দিন রমণীয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। কিন্তু কয়জন একবার চাহিয়া দেখে? এমন সকল উদাসীন, বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত লোকদের জন্য কেন এমন সুন্দর দেশ সৃষ্ট হইয়াছিল? কয়জন বাঙালি কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়জন ঘাটগিরি দেখিয়াছেন, ইলোরার গুহা দেখিয়াছেন? একটু কৌতূহল থাকিলে দেখিবার শত সহস্র অবসর ও উপায় পাইতেন। বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না। একটি সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হউক-না-কেন, আমরা তাহা মাড়াইয়া যাই; কখনো একবার নত হইয়া দেখি? আর আমার পার্শ্বস্থ আমার ইংরাজ সহচরটি কেন তাড়াতাড়ি সেটি তুলিয়া লইয়া শুকাইয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দেয়? বাহ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বোধ করি আমাদের কুলক্রমাগত গুণ। সংসার অনিত্য, সংসার স্বপ্ন। একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহাতে অত মনোনিবেশ করিয়া কী দেখিতেছ? উহা তো দুদণ্ডেই শুকাইয়া পড়িবে। সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া। জীবনের কূট সমস্যা সকল মীমাংসা করো। কিন্তু ইহা কি বুঝিবে না, ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী! সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চা, যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কী হইতে পারে? এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যে ভালো কবি অর্থাৎ যাহার মনে সৌন্দর্যজ্ঞান বিশেষ রূপে আছে, সে কি কখনো এমন সুন্দর জগতের বাহ্য মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের বাংলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, একজন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর-এক জনও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে কী ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন চোখে দেখি না। দেখিবার ইচ্ছাই নাই, দেখিবার ক্ষমতাই নাই। আমরা কেবল জানি যে, কানন অর্থে একটি ভূমিখণ্ড, যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভালো এবং কবিতায় সে-সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভালো শুনাইবে; তাহা তুমিও

জান, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কাননের মুখে এমন সকল ভাব বিকাশ পায়, যাহা ভাগ্যক্রমে তুমিই দেখিতে পাও, আমি দেখিতে পাই না, তুমিই জানিতে পার, আমি জানিতে পারি না, সে-সকল ভাব আমাদের চক্ষে পড়ে না। এইজন্যই বাংলা কাব্যে নিম্নলিখিত রূপে কানন বর্ণিত হয়—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয় সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝর ঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিত সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
সুরয অরধ, অরধ শশি শোভা।
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ। বীরবর সিংহের বর্ণনা করিতে গিয়া যদি তুমি বল যে, তাহার এক জোড়া হাত, এক জোড়া চোখ ও এক জোড়া কান আছে, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত বীরবর সিংহের চিত্র আমাদের মনে যেরূপ উদিত হয়, উপরি-উদ্‌ধৃত বর্ণনায় কাননের চিত্র আমাদের হৃদয়ে তেমনি উঠিবার কথা। বীরবর সিংহের ওরূপ হাস্যজনক বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা একেবারে কল্পনাই করেন নাই। বাহ্য আকার বর্ণনা ছাড়া আর-এক প্রকারে বীরবরের বর্ণনা করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে, বীরবরের দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহার জ্যোতির্ময় নেত্রের দৃষ্টিপাত মর্মভেদী, ও তাহার উন্নত ললাট ভাবনার ভরে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝায়, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। Shelley-র কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহার বাংলা অনুবাদ অসম্ভব।

'It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of paradise,

. . .

The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain

Till you might faint with that delicious pain.
And every motion, odour, beam, and tone,
With that deep music is in unison
Which is a soul within the soul :

. . .

The winged storms, chanting their thunder psalm
To other lands, leave azure chasms of calm
Over this isle, or weep themselves in dew,
From which its fields and woods ever renew
Their green and golden immortality.
And from the sea their rise, and from the sky
There fall, clear exhalations, soft and bright,
Veil after veil, each hiding some delight;
Which sun or moon or zephyr draw aside.
Till the isle's beauty like a naked bride
Glowing at once with love and loveliness,
Blushes and trembles at its own excess.

. . .

But the Chief marvel of the wilderness
Is a lone dwelling, built by whom or how
None of the rustic island people know.

. . .

And, day and night aloof from the high towers
And terraces, the earth and ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods' rocks, all that we
Read in their smiles, and call reality.'

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এজন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে। Shelley এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, ওই দ্বীপটি তিনি মনে মনে বিশেষ রূপে উপভোগ করিয়াছেন, বড়ো ভালো লাগিয়াছে তাই এত উচ্ছ্বাস। কেবলমাত্র কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়া যান নাই, প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের মনোভাব দীপ্তি পাইতেছে। যে দ্রব্য আমাদের ভালো লাগে, যে দ্রব্য আমরা প্রাণের সহিত উপভোগ করি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নানা বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিতে চাই; তাহার নানা প্রকার নামকরণ করি। আমরা আমাদের ভালোবাসার লোককে, "নয়ন-অমৃত রাশি," "জীবন-জুড়ানো ধন," "হৃদি-ফুল হার" এবং এক নিশ্বাসে এমন শত প্রকার সম্বোধন করি কেন? সে যে, কতখানি আমাদের আনন্দদায়ক তাহা ঠিকটি প্রকাশ করিতে আমরা কথা হাতড়াইয়া বেড়াই, এটা একবার, ওটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের কল্পনার ভাণ্ডারে তাহার সহিত ওজন করিবার উপযুক্ত বাটখারা খুঁজিয়া পাই না। মনের আগ্রহে ছটাক হইতে মণ পর্যন্ত যাহা-কিছু হাতে পাইতেছি সমস্তই তুলাদণ্ডে চড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই সমান ওজন হইতেছে না। মনে হয়, আমাদের ভাষার ডানা এমন লৌহময়, যে, আমার ভালোবাসা যে উচ্চে

অবস্থিত সে পর্যন্ত সে উড়িতে পারে না, বার বার করিয়া চেষ্টা করে ও বার বার করিয়া পড়িয়া যায়। একটি Nightingale-এর গানের বিষয়ে Shelley কী লিখিতেছেন পাঠ করো। কেবলমাত্র যদি বলা যায় যে, কোকিল অতি মিষ্ট গান করিতেছে, তাহার এক কবিতা, আর নিম্নলিখিত বর্ণনার এক স্বতন্ত্র কবিতা।

A woodman whose rough heart was out of tune
Hated to hear, under the stars or moon,
One nightingale in an interfluous wood
Satiate the hungry dark with melody
And as a vale watered by a flood,
Or as the moonlight fills the open sky
Struggling with darkness— as a tube-rose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flowers from which they rose—
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail
Was interfused upon the silentness.
The folded roses and the violets pale
Heard her within their slumbers ; the abyss.
Of heaven with all its planets ; the dull ear
Of the night-cradled earth ; the loneliness
Of the circumfluous waters. Every sphere,
And every flower and beam and cloud and wave,
And every wind of the mute atmosphere,
And every beast stretched in its rugged cave
And every bird lulled on its mossy bough,
And every silver moth fresh from the grave
Which is its cradle . . .
. . . and every form
That worshipped in the temple of night.
Was awed into delight, and by the charm
Girt as with an interminable zone,
Whilst that sweet bird, whose music was a storm
Of sound, shook forth the dull oblivion
Out of their dreams. Harmony became love
In every soul but one.''

মনে হয় না কি যে, গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ে যতদূর সম্ভব তত দূর পর্যন্ত উপভোগ করিতেছেন? এই মুহূর্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই-একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ

করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। মন্দগমনা, বিষণ্ণ সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভালো লাগে, সে কখনো এরূপ নির্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না। তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। সন্ধ্যা তাহার মনের ভিতরে বসিয়া কথা কহে।

"আইল গোধূলি সৌর রঙ্গ ভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা,
ধূসর বরণা; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র— রজতের চাপ!
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশি
অর্ধ সৌর রাজ্য বিরহেতে কৃশ,
নিরাশা মলিন।"

যখন তুমি বল, আমি অমুক স্থানে একটি মানুষকে দেখিলাম, তখন জানিলাম, তুমি খুব অল্পই দেখিয়াছ; যখন বল যে, হরিহরকে দেখিয়াছ, তখন জানিলাম, যে, হাঁ, একটু ভালো করিয়া দেখিয়াছ; আর যখন বল যে, হরিহরকে দেখিলাম তাহার চোখে ও অধরে ক্রোধ, ও সমস্ত মুখে একটি গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ পাইতেছে, তখন বুঝিলাম যে, একটি মানুষকে যতদূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছ। আমরা কবিতায় যেরূপ স্বভাব বর্ণনা করি, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা সেই মানুষটিকে মাত্র দেখিয়াছি, হরিহরকে দেখি নাই। যদি বা হরিহরকে দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ সেই মানুষটির নাক কান চোখ মুখ বিশেষরূপে দেখিয়া থাকি, তথাপি তাহার নাক কান চোখ মুখের মধ্যে আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন আমরা একটি মানুষের ঠোঁটে, চোখে ও সমস্ত মুখে একটা কিছু বিশেষ ভাব দেখিতে পাই তখন আমরা কেবলমাত্র সেই মানুষকে জীবন্ত বলিয়া দেখি না; তখন তাহার ঠোঁট ও চোখকে আমরা জীবন্ত করিয়া দেখি। তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও চোখের একটি হৃদয়, একটি প্রাণ দেখিতে পাই। এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাওয়া দেখিতে পাওয়ার চূড়ান্ত ফল। বাংলা কবিতার স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতির এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাই না।

"সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হোয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।"

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে একরূপ চক্ষুর আবশ্যক, আর—

"Then the pied wind flowers and the tulip tall,
And narcissi, the fairest among them all,
Who gaze on their eyes in the stream's recess
Till they die of their own dear loveliness
And the rose, like a nymph to the bath addressed.
Which unveiled the depth of her glowing breast,
Till, fold after fold, to the fainting air
The soul of her beauty and love lay bare."

ইহা দেখিতে স্বতন্ত্র চক্ষুর আবশ্যক করে। একটি narcissus ফুল, যে স্রোতের পার্শ্বে ফুটিয়া দিন রাত্রি জলের মধ্যে নিজের মুখখানি, নিজের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া মরিয়া যায়,

তাহার সে একটি মিষ্ট ভাব, অথবা একটি বিকাশোন্মুখ গোলাপের পাপড়িগুলি যখন একটি একটি করিয়া খুলিতে থাকে অবশেষে তাহার অতুল রূপ একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই লাজুক সৌন্দর্য কয়জন লোক দেখিতে পায়? কিন্তু--

"মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল;
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।"

এ ঘটনাগুলি দেখিতে কতটুকুই বা কল্পনার আবশ্যক করে? ইহা হয়তো সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহাকে আমরা বিশেষ ভালোবাসি, যাহাকে আমরা বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করি, যাহাকে আমরা মুহূর্তকাল আমাদের চক্ষের আড়াল হইতে দিই না, তাহার নাক চোখ আমরা দেখিতে পাই না, অর্থাৎ দেখি না। তাহাকে যখন দেখি তখন তাহার মুখের ভাবটি মাত্র দেখি, আর কিছুই নয়। এইজনাই সে মুখকে আমরা পদ্ম বলি বা চন্দ্র বলি। যখন আমরা মুখপদ্ম কথা ব্যবহার করি তখন তাহার অর্থ এমন নহে, যে, মুখ বিশেষে পদ্মের মতো পাপড়ি আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, পদ্মেরও যে ভাব সে মুখেরও সেই ভাব। আমার প্রেয়সীর মুখের গঠন বাস্তবিক ভালো কি মন্দ, তাহার নাক ঈষৎ চেপ্টা হওয়াতে ও তাহার ভুরু ঈষৎ বাঁকা হওয়াতে তাহাকে কতখানি খারাপ দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ একজন অচেনা ব্যক্তি মুহূর্তকাল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে আমার প্রেয়সীর গঠন বাস্তবিক কতখানি ভালো দেখিতে। তাহার কারণ, আমি তাহার মুখের ভাবটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। যে কবি প্রকৃতিকে যত অধিক ভালোবাসেন সেই কবি প্রকৃতির নাক মুখ চোখ তত অল্প দেখিতে পান। যে কবি গোলাপকে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন ও বিশেষরূপে ভালোবাসেন, তিনি সেই গোলাপটিকে একটি আকারবিশিষ্ট ভাব মনে করেন, তাহাকে পাপড়ি ও বৃন্তের সমষ্টি মনে করেন না। এইজন্যই একটি লাজুক বালিকার সহিত একটি গোলাপের আকারগত সম্পূর্ণ বিভেদ থাকিলেও তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এইজন্য শেলী একটি nightingale-এর কণ্ঠস্বরের সহিত স্রোতের বন্যা, জ্যোৎস্নাধারা ও রজনীগন্ধার পরিমলের তুলনা করিয়াছেন। কোথায় পাখির গান, আর কোথায় বন্যা, জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধ? জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতি সূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাংলা কবিতার মধ্যে তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাব আমরা ভালো করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালোই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডার-চর্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মতো অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙালির ভালো লাগে।

"দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখি নি কখনো।
বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু শরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে

নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?
সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকশিত বদন কমল,
(রূপের কমল মরি কাম সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!
শোভিতেছে অন্য করে বাক্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি— কাব্য পুণ্যের আকর।
বিনোদ বদনচন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ,
অতুল বিনোদতম, ত্রিদিব মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।
বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কী কৌশলে সর্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ— সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।"

এমনতর একটা স্থূল নধর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙালি হৃদয়ের অসাড়, অপূর্ণ স্নায়ুবিশিষ্ট, কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শই অনুভব হয় না। আর নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িয়া দেখো—

Wherefore those dim looks of thine
Shadowy, dreaming Adeline.
Whence that aery bloom of thine
Like a lily which the sun
Looks thro' in his sad decline
And a rose-bush leans upon,
Thou that faintly smilest still,
As a Naiad in a well,
Looking at the set of day.

. . .

Wherefore those faint smile of thine
Spiritual Adeline ?
Who talketh with thee, Adeline ?
For sure thou art not all alone.
Do beating-hearts of salient springs
Keep measure with thine own ?
Hast thou heard the butterflies
What they say betwixt their wings ?
Or in stillest evenings
With what voice the violet woos
To his heart the silver dews ?

Or when little airs arise
How the merry bluebell rings
To the moss underneath ?
Hast thou look'd upon the breath
Of the lilies at sunrise ?"

এমন জ্যোৎস্নাশরীরী প্রতিমাকে কি বাঙালিরা প্রাণের সহিত ভালোবাসিতে পারেন? না। কেননা, শুনিয়াছি নাকি যে, বাঙালি কবিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় "কেন ভালোবাস" তখন তিনি উত্তর দেন—

"দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
দেখিয়াছ কহো তবে, কেন ভালোবাসি?"

"আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" দেখিলে, "কেশের আঁধারে সেইরূপ কহিনুর" দেখিলে তবে যাঁহাদের প্রেমের উদ্রেক হয়, তাঁহারা অমন একটি ভাবটিকে কিরূপে ভালোবাসিবেন? আর এদিকে চাহিয়া দেখো—

"একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।
বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরন,
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়া ফুটায় অফুট দলে;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া পরেছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলে রে তাহায় সে নীলমণি;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।
চারি দিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে
কোলেতে লইতে বাড়ানু কোল;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।
তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা;
জননীর হৃদিকমল-উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।
হরিণীর শিশু হরষিত মনে,

জননীর পানে যেমন চায়;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।
শ্যামল বরন, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরি বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ
মরি গো তখন কেমন সাজে!
মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়
করতল তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে!"

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরি, ঢাল মদ— এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙালিদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাংলা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, "আর বাঁচি না, আর সহে না, আর পারি না" ভাবের ছট্‌ফটানি, ইহাই তো বাংলা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙালির কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙালির কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙালি কবি বলিয়া বড়ো গর্ব করে।

আর-একটি কথা বলিয়া শেষ করি। যেখানে নানাপ্রকার কাজকর্ম হইতে থাকে, সেইখানেই মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশেষরূপে বিকশিত হইতে থাকে। সেইখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতি মানুষের মনোবৃত্তিগুলি ফুটিতে থাকে। সেখানে মানুষের অত্যাকাঙক্ষা উত্তেজিত হয়, (বাংলা ভাষায় ambition-এর একটা ভালো ও চলিত কথাই নাই) ও অবস্থার চক্রে পড়িয়া তাহার সমস্ত আশা নির্মূল হয়। সেখানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন স্রোত একত্র হইয়া মিশে, তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, আশা নিরাশা, আগ্রহ, উদ্যম, স্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠে। এই অনবরত সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। আর আমাদের এই স্তব্ধ অন্ধকার ডোবার মধ্যে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল পচিয়া পচিয়া উঠিতেছে, উপরে পানা পড়িয়াছে, গুপ্ত নিন্দা ও কানাকানির একটা বাষ্প উঠিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার একটা স্বাধীন আদানপ্রদান নাই, ঢাকাঢাকি, লুকোচুরি, কানাকানির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া সূর্যের কিরণ ও বায়ুর অভাবে ভালোবাসা নির্মল থাকিতে পারে না, দূষিত হইয়া উঠে। আমাদের ভালোবাসা কখনো সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে না; খিড়কির সংকীর্ণ ও নত দরজা দিয়া আনাগোনা করিয়া করিয়া তাহার পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কাহারো মুখের পানে স্পষ্ট অসংকোচে চাহিতে পারে না, নিজের পায়ের শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে। এমনতর সংকুচিত কুব্জ ভালোবাসার হৃদয় কখনো তেমন প্রশস্ত হইতে পারে না। মনে করো, "পিরীতি" কথার অর্থ বস্তুত ভালো, কিন্তু বাঙালিদের হাতে পড়িয়া দুই দিনে এমন মাটি হইয়া গিয়াছে যে, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। বাংলা প্রচলিত প্রণয়ের গানের মধ্যে এমন গান খুব অল্পই পাইবে, যাহাতে কলঙ্ক নাই, লোক-

লাজ নাই ও নব যৌবন নাই, যাহাতে প্রেম আছে, কেবলমাত্র প্রেম আছে, প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি-জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এই তো চারি দিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কীরূপে বর্ণিত হইবে? সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্তত তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৭

'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'
(প্রত্যুত্তর)

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক সুরচিত প্রস্তাবে সুনিপুণ লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আংশিক সত্য আছে— কিন্তু কথা এই, সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে, অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিসকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। সত্যকে সর্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোনা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না— ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোনো উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক-একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এইজন্যই কিছু দিন ধরিয়া, আমরা হস্তীকে, কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই— আমি জানাইতে চাই— একপেশে লেখার উপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারি দিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোনো দিকই ভালো করিয়া দেখাইতে পারে না— তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড়ো করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোটো করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোটো। একজন যদি কোনো ছবিতে সব গাছগুলি সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না— অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড়ো করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই,

তবে তাহাতে কোনো উদ্দেশ্যই ভালো করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভালো ছবি পাওয়া যায়, না এক অংশের ভালো ছবি পাওয়া যায়। এইজন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড়ো করিয়া আঁকো; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া— ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাটো করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক প্রবন্ধের লেখক এক দিক হইতে ছবি আঁকিয়া তাঁহার নিকটের দিকটাকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন;— আবার বিপরীত দিকটাও দেখানো আবশ্যক।

কবিতায় কৃত্রিমতা দোষার্হ, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন লেখক এই সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সহিত আমাদের মতান্তর উপস্থিত হয়। যখন তিনি বলেন, দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইলে কবিতা কৃত্রিম হয় ও আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে, সুতরাং কৃত্রিম হইতেছে, তখনই তাঁহার সহিত আমরা সায় দিতে পারি না।

"দেশকালপাত্র" কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কুলা— উহার উপর দিয়া অনেক ছাই ফেলা গিয়াছে। কোনো বিষয়ে কোনো পরিবর্তন দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের তাহা খারাপ লাগিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। যখন কোনো যুক্তিই নাই, তখনো দেশকালপাত্র মাটি কামড়াইয়া আছে।

যাঁহারা দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া কোনো পরিবর্তনের সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হয়তো নিজের যুক্তিতে নিজে মারা পড়েন। দেশকালপাত্রের কিছু হাত-পা নাই— তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোনো উপায় নাই। টলেমি দেশকালপাত্রের নাম করিয়া ঋতু পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীকে অনায়াসেই ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু গ্যালিলিও বলিবেন যে আমরা এত ক্ষুদ্র ও পৃথিবী এত বৃহৎ, যে, পৃথিবী যে চলিতেছে, পৃথিবী যে একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই ইহা আমরা জানিতেই পারি না; বাস্তবিকই যদি পৃথিবী না চলিত, তবে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটিবেই বা কেন? তেমনি সমাজ-সংস্কার-বিরোধীরা কোনো একটি পরিবর্তন দেখিয়া যখন অন্য কোনো যুক্তির অভাবে কেবলমাত্র দেশকালপাত্রের উল্লেখ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের বিরোধীপক্ষীয়েরা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, দেশকালপাত্রের যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? তাহাই যদি না হইবে, তবে কি এ পরিবর্তন মূলেই ঘটিতে পারিত?

লেখক বলিতেছেন— আমাদের আধুনিক কবিরা দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়া কবিতা লেখেন। কী তাহার প্রমাণ? না আমাদের প্রাচীন কবিরা যেভাবে কবিতা লিখিতেন, এখনকার কবিরা সেভাবে কবিতা লেখেন না, কথাটা যদি সত্য হয় তবে তাহা হইতে কি ইহাই প্রমাণ হইতেছে না যে, বাস্তবিকই দেশকালপাত্রের পরিবর্তন হইয়াছে; নহিলে, কখনোই লেখার এরূপ পরিবর্তন ঘটিতেই পারিত না। অতএব লেখক যদি বলেন, যে, প্রাচীন কবিরা যেরূপ লিখিতেন, আমাদেরও সেইরূপ লেখা উচিত— তাহা হইলে আর-এক কথায় এই বলা হয় যে, দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়াই কবিতা লেখা উচিত।

ইংরাজি পড়িয়াই হউক, আর যেমন করিয়াই হউক, আমাদের মনের যে পরিবর্তন হইয়াছে সে নিশ্চয়ই। একবার লেখক বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি— তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা-বিন্যাস, তাহার ভাব-ভঙ্গি, তাহার রচনা প্রণালী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার বাংলা হইতে কত তফাত। তাঁহার প্রবন্ধটির অস্থিমজ্জায় ইংরাজি শিক্ষার ফল প্রকাশ পাইতেছে কি না, একবার মনোযোগ দিয়া দেখুন দেখি! অতএব, এই উপলক্ষে আমি কি বলিতে পারি যে, লেখক কষ্ট করিয়া মেহন্নত করিয়া একটি ইংরাজি আদর্শ অবিরাম চক্ষের সম্মুখে খাড়া রাখিয়া উল্লিখিত

প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন— তাহা তাঁহার হৃদয়ের সহজ বিকাশ, তাঁহার ভাষার সহজ অভিব্যক্তি নহে?

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক, তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে!
চাহি নে কাহারো মমতার হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়াহাসিময় মিছে মমতায়
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর!"
ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত কবিতার ভাব আমাদের প্রাচীন বাংলা কবিতায় কখনো দেখা যায় না। এবং ওই শ্রেণীর কবিতা ইংরাজিতে দেখা যায়। শুদ্ধ এই কারণেই কি আমি বলিতে পারি যে, কবি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া উক্ত কবিতা লেখেন নাই, ইংরাজরা ওই প্রকারের কবিতা লেখেন বলিয়া তিনিও কোমর বাঁধিয়া লিখিয়াছেন? আমি বলিব যে—"না, তিনি অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন।" তাহার পরে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রাচীন কবিরাই বা কেন এরূপ ভাব অনুভব করিতে পারিতেন না, এখনকার কবিরাই বা কেন করেন। সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, এবং ইতিহাস দেখিয়া তাহার বিচার হইতে পারে। ইহা যদি সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাচীন কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করিতেন, এখনকার কবিরা তাহা করেন না (কারণ, করিলে নিশ্চয়ই তাহা লেখায় প্রকাশ পাইত,) এবং এখনকার কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করেন, প্রাচীন কবিরা তাহা করিতেন না; তাহা হইলে কেমন করিয়া কবিদিগকে পরামর্শ দিব যে, যাহা তোমরা অনুভব কর না, তাহাই তোমাদিগকে লিখিতেই হইবে! বাস্তবিকই যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলা দেশের বদ্ধ, স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সমাজের কোনো পাড় ভাঙিতেছে, কোনো পাড় গড়িতেছে, সমাজের কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারি দিকে মূল প্রসারিত করিতেছে, যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্, তখনো যে আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব, আমাদের কবিতার মধ্যে এই দুর্দান্ত পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষিত হইবে না— ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক! লেখক যে একটি কল্পনার জেলখানা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতে চাহেন, দিশি ইঁট দিয়া তাহার প্রাচীর নির্মিত হইবে বলিয়াই যে কবিরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে রাজি হইবেন, এমন তো বোধ হয় না।

আধুনিক কবিরা তাঁহাদের কবিতায় সমাজ-বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করেন বলিয়া লেখক একস্থলে দুঃখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "সমাজ-উচ্ছেদকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব? একটি অবিকৃত বঙ্গমহিলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করো, দেখিতে পাইবে যে, সে হৃদয় ভালোবাসায় পরিপ্লুত, সে হৃদয় ভাদ্রমাসের পদ্মানদীর মতো প্রেমে ভরপুর, প্রেমে উন্মত্ত, প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্রকৃত পদ্মার মতো সে প্রেমে কোনো কূলই সহসা ভাঙিয়া পড়ে না।... কিন্তু এই বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয় আধুনিক লেখকদের হাতে কতদূর পর্যন্ত না কলঙ্কিত হইয়াছে!" সে কী কথা! আমি তো বলি, বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয়-চিত্রের কলঙ্ক আধুনিক কবিদের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা যে প্রেমের প্রবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন্ কূল অবশিষ্ট ছিল? "সমাজ-উচ্ছেদকারী শাসন-বিরহিত" প্রেম আর কাহাকে বলে? বিদ্যা এবং সুন্দরের যে প্রেম তাহাতে কলঙ্কের বাকি কী আছে! সচরাচর প্রচলিত আমাদের দেশীয় প্রেমের গানে "অবিকৃত বঙ্গ মহিলার" মনোবিকার কীরূপ মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? এখনকার কবিতায় ও উপন্যাসে যদিও বা সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই

কিন্তু রুচি-বিরুদ্ধ বীভৎসভাব কয়টা দেখি? লেখক কি বলিবেন যে, প্রেমের সেই কানাকানি, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, সেই শাশুড়ি-ননদী-ভীতিময় পিরীতি, সেই মলয়, কোকিল, ভ্রমরের বিভীষিকাপূর্ণ বিরহ, সেই সুমেরু-মেদিনীসংকুল ভৌগোলিক শরীর বর্ণনা, তাহাই আমাদের দেশজ সহজ হৃদয়ের ভাব, অতএব তাহাই কবিতায় প্রবর্তিত হউক— আর আজকালকার এই প্রকাশ্য, মুক্ত, নির্ভীক, অলংকারবাহুল্য-বিরহিত কালাপাহাড়ী ভাব, ইহা বিদেশীয়, ইহা আমাদের কবিতা হইতে দূর হউক! সমাজের যথার্থ হানি কিসে হয়; গোপনে গোপনে সমাজের শিরায় শিরায় বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, না প্রকাশ্যভাবে সমাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া?

প্রকৃত কথা এই যে, সমাজকে সমাজ বলিয়াই খাতির করা, এবং দেশকালপাত্রের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলা কবিরা পারিয়া উঠেন না। প্রবহমান সমাজের উপর যে-সকল ফেনা, যে-সকল তৃণখণ্ড ভাসে তাহা তো আজ আছে কাল নাই, কবিরা সেই ভাসমান খড়-কুটায় বাঁধিয়া তাঁহাদের কবিতাকে সমাজের স্রোতে ভাসান দিতে চান না। সেই স্রোতের বাহিরেই তাঁহারা ধ্রুব আশ্রয়ভূমি দেখিতে পান। সামাজিক নীতি ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতিরা সমাজের কাছে ঠিকা কাজে নিযুক্ত আছে— যতদিন তাহাদের আবশ্যক, ততদিন তাহারা মাহিয়ানা পায়, আবশ্যক ফুরাইলেই তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়— সমাজের সকল অবস্থায় তাহারা কাজ করিতে পারে না। সমাজের এই ঠিকা চাকরদের চাকরি করা কবিদের পোষায় না। এক কথায় বলিতে গেলে কবিদিগকে অনেক সময়ে অসামাজিক হইতেই হইবে। কারণ, সমাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই— সমাজ যাহাকে ভালো বলে, তাহা মন্দের ভালো, তাহা বাস্তবিক ভালো নহে— আবার সমাজ স্বয়ং মন্দ বলিয়া অনেক ভালোও সমাজের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। কবিরা যথার্থ ভালোকে ভালো বলেন, ও যথার্থ মন্দকে মন্দ বলিতে চাহেন, তাহাতে ফল হয় এই যে— যাহাতে মন্দকে আমাদের চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ মন্দ আমাদের কাজে না লাগিতে পারে ক্রমে এমন অবস্থা হয়, আর ভালোর উপযোগী হইতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে পারি। নহিলে, ক্ষণিক ভালোকে ভালো বলিয়া জানিলে, ও ক্ষণিক মন্দকে মন্দ বলিয়া জানিলে তাহারাই চিরস্থায়ী ভালোমন্দরূপে পরিণত হয়— এবং ভালোই হউক, মন্দই হউক, পরিবর্তনের নাম মাত্র শুনিলেই আমরা ডরাইয়া উঠি। সমাজকে দাসভাবে অনুসরণ করিয়া না চলিলে কবিদের এই একটি মহৎ উপকার হয়— যখন সমাজের উপর দিয়া সহস্র বৎসরের পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, যখন এক সমাজ ভাঙিয়া আর-এক সমাজ গঠিত হইয়াছে, যখন চারি দিকে সকলই ভাঙিতেছে গড়িতেছে— তখনও তাঁহাদের কবিতা দীপস্তম্ভের ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। নতুবা সমাজের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৯

কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট

বুদ্ধিগম্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়। হয় বুঝিয়াছি বলিয়া ভান করে, না-হয় বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায় কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা বুঝিতে না পারিলে কবির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গভীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। সকলে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। সকলে সকল

ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও তারতম্য আছে।

মুশকিল এই যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশি বলিবার জো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, নহিলে সে বিফল; সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার তো তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্তী পথিক আসিয়া হয়তো বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মতো ফুটিয়া হয়তো ঝরিয়া যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বড়ো অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্যদ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম, তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি শুনিয়া যদি না কাঁদ তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয়, আর কোনো উপায় নাই। কপালকুণ্ডলার শেষ পর্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা কর 'তার পরে?' তবে দামোদরবাবুর নিকটে তোমাকে জিম্মা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলই তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে সে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন : হাসি-মিশা বাঁশি বায়। হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথা কে বলিতে পারে? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাসিটুকুর অপূর্ব আস্বাদ যে পাইয়াছে সেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে; কিন্তু বাছুর আসিয়া তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি, তাহার বৃন্ত, তাহার আশপাশের গোটা-পাঁচ-ছয়-পাতা-সুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া-চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দমনে হাম্বারব করিতে থাকে— তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে?

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া, কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিখিয়াছেন : স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ! সে তাহার কী-জানি-কী যে যাহার প্রিয়জন! যদি কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়া দেখ, তবে ইহা ধুঁয়া নয় তো কী, ছায়া নয় তো কী! ইহা কেবল অস্পষ্টতা, কুয়াশা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে তো দেখিবে ভাবের অস্পষ্টতা নাই। তুমি যদি বলিতে 'প্রিয়জন অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী' তবে ভাষা স্পষ্ট হইত সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে ছায়া অথবা ধুঁয়া অথবা কাব্যি বলিবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্ট হইত না। ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিহ্বলতা জন্মে। ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শসুখে-আকুল রাম বলিয়াছেন : সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। কী জানি ইহা সুখ না দুঃখ! এমন ছায়ার মতো, ধুঁয়ার মতো কথা কহিবার তাৎপর্য কী? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কথা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন-সম্পাদকের সহিত এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এ স্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহি না। যদি কেবল

রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যখন তাহার ঘূর্ণগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে, তখন অরগুলিকে ধুঁয়ার মতো করিয়া দিতে হইবে— ইহার অন্য উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাৎ আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না, আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। নহিলে স্পষ্ট কথায় সুখকে সুখ বলাই ভালো তাহার আর সন্দহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন—

আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে, অর্থের দোষ। 'আধ চরণ' অর্থ কী? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কী উপায়ে! একে তো আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ! এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, উপরি-উদ্‌ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। 'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকা-সমেত উদ্‌ধৃত করি। 'বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য-দুঃখ-বর্ণনা— যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

এই দুইটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, না-হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরও কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং তার ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গি করিয়া কথা কহেন তিনি না-হয় ইহাকে কাব্যু বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।

প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনই— দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন। 'আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান' ইহা স্পষ্ট বটে, কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির—

সখি, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

স্পষ্টও বটে কাব্যও বটে। ইহা কেবল বর্ণনা বা কথার কথা মাত্র নহে, কেবল একটুকু পরিষ্কার

উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিণীর নিশ্বাস নিশ্বসিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে—

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা

ইহা শুনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, স্পষ্ট কথা বলিয়া যে তাহা নহে, কাব্য বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট? এমন কি অনেকে নাই যাঁহারা বলিবেন, 'আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কী?' ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়তো অনেক সমালোচকের 'কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব' করিবে এবং 'শিরায় শিরায় রীণ রীণ' করিতে থাকিবে! ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়ফড় ছটফট বিষ ছুরি এবং দড়ি-কলসি না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়তো ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া এবং 'কাব্যি' বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জ্বলন্ত' চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।

যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ বা কেবলই ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়, কেহ বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।

পুনর্বার বলিতেছি, বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন, প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোনো প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

ভারতী ও বালক
চৈত্র ১২৯৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে, বিষয়টা কী? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক্, না থাকে তো নাই থাক্, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্যটুকু টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাহার মর্মটুকু সহজে ধরা দেয় না। মানুষের সর্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ— সেই প্রাণটুকু নাশ করিবার জন্য নানা দেশে নানা অস্ত্র আছে, কিন্তু

দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই।

আমাদের বঙ্গভাষায় সাহিত্যসমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।

মনে করো তুমি যদি অত্যন্ত বুদ্ধির প্রভাবে বলিয়া বস 'এই তরঙ্গভঙ্গময়, এই চূর্ণ-বিচূর্ণ সূর্যালোকে খচিত, অবিশ্রাম প্রবহমান জাহ্নবীর জলটুকু মারিয়া কেবল ইহার বিষয়টুকু বাহির করিব' এবং এই উদ্দেশে প্রবল অধ্যবসায়-সহকারে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চুলির উপরে উত্থাপন কর তবে পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ বিপুল বাষ্প ও প্রচুর পঙ্ক লাভ করিবে— কিন্তু কোথায় তরঙ্গ! কোথায় সূর্যালোক! কোথায় কলধ্বনি! কোথায় জাহ্নবীর প্রবাহ!

উদ্দেশ্য হাতড়াইতে গিয়া কিছু-না-কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়িমাছ বাহির হইয়া পড়ে। ধীবরের পক্ষে সে কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু আমার বলিবার তাৎপর্য এই যে, চিংড়িমাছ না থাকিলেও গঙ্গার মূলগত কোনো প্রভেদ হয় না। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নাই, গঙ্গার ছায়ালোকবিচিত্র তরঙ্গমালা নাই, গঙ্গার প্রশান্ত প্রবল উদারতা নাই, এমন যদি হয় তবে গঙ্গাই নাই। কিন্তু প্রবাহ আয়ত্ত করা যায় না, ছিপ ফেলিয়া ছায়ালোক ধরা যায় না, গঙ্গার প্রশান্ত ভাব কেবল অনুভব করা যায়— কিন্তু কোনো উপায়ে ডাঙায় তোলা যায় না। উপরি-উক্ত চিংড়িমাছ গঙ্গার মধ্যে সহজে অনুভব করা যায় না, কিন্তু সহজেই ধরা যায়। অতএব বিষয়ী সমালোচকের পক্ষে মৎস্য-নাম-ধারী উক্ত কীটবিশেষ সকল হিসাবেই সুবিধাজনক।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম— কোনো-একটা বিশেষ তত্ত্ব নির্ণয় বা কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ-অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর-কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।

ঐতিহাসিক রচনাকে কখন সাহিত্য বলিব? যখন জানিব যে তাহার ঐতিহাসিক অংশটুকু অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলেও তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ যখন জানিব ইতিহাস উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য নহে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অন্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

যদি কোনো উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কী! যাঁহারা সকলের চেয়ে হিসাব ভালো বুঝেন তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্তি-সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, যদি অজ্ঞানবশত কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহার মুখে দুটো সন্দেশ পুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না।

সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার

ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব— মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হইলে আমরা কত বাজে কথাই বলিয়া থাকি। তাহাতে করিয়া হৃদয়ের কেমন বিকাশ হয়। কত হাস্য, কত আলাপ, কত আনন্দ! পরস্পরের নয়নের হর্ষজ্যোতির সহিত মিশিয়া সূর্যালোক কত মধুর বলিয়া মনে হয়! বিষয়ী লোকের পরামর্শমতো কেবলই যদি কাজের কথা বলি, সকল কথার মধ্যেই যদি কীটের মতো উদ্দেশ্য ও অর্থ লুকাইয়া থাকে, তবে কোথায় হাস্যকৌতুক, কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ! তবে চারি দিকে দেখিতে পাইব শুষ্ক দেহ, লম্ব মুখ, শীর্ণ গণ্ড, উচ্চ হনু, হাস্যহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু— মানবের উপছায়াসকল পরস্পরের কথার উপরে পড়িয়া খুদিয়া খুদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থই বাহির করিতেছে, অথবা পরস্পরের পলিতকেশ মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য-কঠিন কথার লোষ্ট্র বর্ষণ করিতেছে।

অনেক সাহিত্য এইরূপ হৃদয়মিলন-উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি। সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। না বলিলে নয় বলিয়াই বলা ও না হইলে নয় বলিয়াই হওয়া।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

সাহিত্য ও সভ্যতা

বোধ করি সকলেই দেখিয়েছেন, বিলাতি কাগজে আজকাল সাহিত্যরসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। আগাগোড়া কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি। মুক্ত বাণিজ্য, জামার দোকান, সুদানের যুদ্ধ, রবিবারে জাদুঘর খোলা থাকা উচিত, ঘুষ দেওয়া সম্বন্ধে নূতন আইন, ডাবলিন দুর্গ ইত্যাদি। ভালো কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই-একটা ভালো প্রবন্ধ শুনিতে পাই বিস্তর টাকা দিয়া কিনিতে হয়। তাহাতে সাহিত্যের আদর প্রমাণ হয়, না সাহিত্যের দুর্মূল্যতা প্রমাণ হয় কে জানে! স্পেক্‌টেটর র‍্যাম্ব্‌লার প্রভৃতি কাগজের সহিত এখনকার কাগজের তুলনা করিয়া দেখো, তখন কী প্রবল সাহিত্যের নেশাই ছিল! জেফ্রি, ডিকুইন্সি, হ্যাজ্‌লিট, সাদি, লে হান্ট, ল্যাম্বের আমলেও পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের নির্ঝরিণী কী অবাধে প্রবাহিত হইত! কিন্তু আধুনিক ইংরাজি পত্রে সাহিত্যপ্রবাহ রুদ্ধ দেখিতেছি কেন? মনে হইতেছে আগেকার চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু চাষ কমিতেছে! ইহার কারণ কী?

আমার বোধ হয়, ইংলণ্ডে কাজের ভিড় কিছু বেশি বাড়িয়াছে। রাজ্য ও সমাজতন্ত্র উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে। এত বর্তমান অভাব-নিরাকরণ এত উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে, প্রতিদিনের কথা প্রতিদিন এত জমা হইতেছে যে, যাহা নিত্য, যাহা মানবের চিরদিনের কথা, যে-সকল অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার এক যুগ অন্য যুগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়, মানবাত্মার যে-সকল গভীর বেদনা এবং গভীর আশার কাহিনী, সে আর উত্থাপিত হইবার অবসর পায় না। চিরনবীন চিরপ্রবীণ প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য লইয়া পূর্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারি দিকে সেই শ্যামল তরুপল্লব, কালের চুপিচুপি রহস্যকথার মতো অরণ্যের সেই মর্মরধ্বনি, নদীর সেই চিরপ্রবাহময় অথচ চির-অবসরপূর্ণ কলগীতি; প্রকৃতির অবিরামনিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই; কিন্তু যাহার

আপিসের তাড়া পড়িয়াছে, কেরানিগিরির সহস্র খুচরা দায় যাহার শাম্‌লার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া কিচিকিচি করিয়া মরিতেছে, সে বলে— 'দূর করো তোমার প্রকৃতির মহত্ত্ব, তোমার সমুদ্র ও আকাশ, তোমার মানবহৃদয়, তোমার মানবহৃদয়ের সহস্রবাহী সুখ দুঃখ ঘৃণা ও প্রীতি, তোমার মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও গভীর রহস্যপিপাসা, এখন হিসাব ছাড়া আর-কোনো কথা হইতে পারে না।' আমার বোধ হয় কল-কারখানার কোলাহলে ইংরেজেরা বিশ্বের অনন্ত সংগীতধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না; উপস্থিত মুহূর্তগুলো পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া অনন্তকালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

আমরা আর-একটি প্রবন্ধে[1] লিখিয়াছি— সৃষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। এই অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র অপার অবসরসমুদ্রের মধ্যে সহস্র কুমুদ কহ্লার পদ্মের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্যের শেষও নাই, অথচ তাড়াও নাই। বসন্তের একটি শুভ প্রভাতের জন্য শুভ্র চামেলি সৃষ্টির কোন্ অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া আছে, বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ আর্দ্র সন্ধ্যার জন্য একটি শুভ্র জুঁই সমস্ত বৎসর তাহার পূর্বজন্ম যাপন করিতেছে। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্যালোক, অনেকখানি শ্যামল ভূমির আবশ্যক। কার্যালয়ে শান-বাঁধানো মেজে খুঁড়িয়া যেমন মাধবীলতা উঠে না, তেমনি সাহিত্যও উঠে না।

উত্তরোত্তর ব্যাপমান বিস্তৃত রাজ্যভার, জটিল কর্তব্যশৃঙ্খল, অবিশ্রাম দলাদলি ও রাজনৈতিক কূটতর্ক, বাণিজ্যের জুয়াখেলা, জীবিকাসংগ্রাম, রাশীকৃত সম্পদ ও অগাধ দারিদ্র্যের একত্র অবস্থানে সামাজিক সমস্যা— এই-সকল লইয়া ইংরাজ মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত। তাহার মধ্যে স্থানও নাই, সময়ও নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কোনো কথা থাকে তো সংক্ষেপে সারো, আরও সংক্ষেপে করো। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের সার-সংকলন করিয়া পিলের মতো গুলি পাকাইয়া গলার মধ্যে চালান করিয়া দাও। কিন্তু সাহিত্যের সার-সংকলন করা যায় না। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের সার-সংকলন করা যাইতে পারে। মালতীলতাকে হামান্‌দিস্তায় ঘুঁটিয়া তাল পাকাইলে সেই তালটাকে মালতীলতার সার-সংকলন বলা যাইতে পারে না। মালতীলতার হিল্লোল, তাহার বাহুর বন্ধন, তাহার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার ভঙ্গিমা, তাহার পূর্ণযৌবনভার, হামান্‌দিস্তার মধ্যে ঘুঁটিয়া তোলা ইংরাজেরও অসাধ্য।

ইহা প্রায় দেখা যায়, অতিরিক্ত কার্যভার যাহার স্কন্ধে সে কিছু নেশার বশ হয়। যো সো করিয়া একটু অবসর পাইলে উৎকট আমোদ নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন উৎকট কাজ তেমনি উৎকট অবসর কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভালো সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না, তেমনি উন্নত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে, কিন্তু উগ্র মাদকতা থাকে না। এইজন্য নিরতিশয় ব্যস্ত লোকের কাছে সাহিত্যের আদর নাই। নেশা চাই। ইংলন্ডে দেখো খবরের নেশা। সে নেশা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। খবরের জন্য কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি, যে খবর দুই ঘণ্টা পরে পাইলে কাহারও কোনো ক্ষতি হয় না সেই খবর দুই ঘণ্টা আগে জোগাইবার জন্য ইংলন্ড ধনপ্রাণ অকাতরে বিসর্জন দিতেছে। সমস্ত পৃথিবী ঝাঁটাইয়া প্রতিদিনের খবরের টুকরা ইংলন্ড দ্বারের নিকট স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। সেই টুকরাগুলো চা দিয়া ভিজাইয়া বিস্কুটের সঙ্গে মিলাইয়া ইংলন্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিন প্রভাতে এবং প্রদোষে পরমানন্দে পার করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কারণ, যে-সকল খবর সকলেই জানে অধিকাংশ সাহিত্য তাহাই লইয়া।

উপস্থিত বিষয় উপস্থিত ঘটনার মধ্যে যেমন নেশা, স্থায়ী বিষয়ের মধ্যে তেমন নেশা নাই। গোলদিঘির ধারে মারামারি বা চক্রবর্তী-পরিবারের গৃহবিচ্ছেদ যত তুমুল বলিয়া বোধ হয়,

১. পূর্ববর্তী প্রবন্ধে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এমন মনে হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহাশয় যখন কালো আলপাকার চাপকান পরিয়া ছাতা হাতে, ক্যাপ মাথায়, চাঁদার খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান তখন লোকে মনে করে পৃথিবীর আর-সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া আছে। যখন কোনো আর্য আর-কোনো আর্যকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য গলা জাহির করেন ও দল পাকাইয়া তোলেন তখন নস্যরেণু তাম্রকূটধূম এবং আর্য-অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এবং তাঁহার দলবল ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরেও বৃহৎ বিশ্বসংসার ছিল এবং এখনো আছে। ইংলন্ডে না জানি আরও কী কাণ্ড! সেখানে বিশ্বব্যাপী কারখানা এবং দেশব্যাপী দলাদলি লইয়া না জানি কী মত্ততা! সেখানে যদি বর্তমানই দানবাকার ধারণ করিয়া নিত্যকে গ্রাস করে তাহাতে আর আশ্চর্য কী!

বর্তমানের সহিত অনুরাগভরে সংলগ্ন হইয়া থাকা যে মানুষের স্বভাব এবং কর্তব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া বর্তমানের আতিশয্যে মানবের সমস্তটা চাপা পড়িয়া যাওয়া কিছু নয়। গাছের কিয়দংশ মাটির নীচে থাকা আবশ্যক বলিয়া যে সমস্ত গাছটাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক। যে মাটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাটি খুঁড়িয়াও মানবকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার মনুষ্যত্বসাধন হইবে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি সে ধূলি-চাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায়, তবে তাহার কী দশা!

যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম-শৃঙ্খল যতই আঁট হয়— হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানবহৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ। অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লন্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু এই লন্ডন-রূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে! মানব তো কোনো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।

দূর হইতে ইংলন্ডের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়তো আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমাদের এই রৌদ্রতাপিত নিদ্রাতুর নিস্তব্ধ গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া কেমন করিয়া ধারণা করিব সেই সুরাসুরের রণরঙ্গভূমি য়ুরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা, উদ্যম, সহস্রমুখী বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম মথ্যমান ক্ষুব্ধ জীবন-মহাসমুদ্রের আঘাত ও প্রতিঘাত— তরঙ্গ ও প্রতিতরঙ্গ— ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত সহস্র হস্তে পৃথিবী বেষ্টন করিবার বিপুল আকাঙ্ক্ষা—! দুই-একটা লক্ষণ মাত্র দেখিয়া, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়া, বাহিরের লোকের মনে সহসা যে কথা উদয় হয় আমি সেই কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এই সুযোগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

আলস্য ও সাহিত্য

অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের সহস্র কার্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য। সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়, যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য, যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর। যে পরিমাণে জড়ত্ব, সাহিত্য সেই পরিমাণে খর্ব ও সুষমারহিত, সেই পরিমাণে তাহা কল্পনার উদার দৃষ্টি ও হৃদয়ের স্বাধীন গতির প্রতিরোধক। অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মতো আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

দেখো, আমাদের সমাজে কার্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বাঙালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। কিন্তু বাঙালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়। সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই কাজের দিকে, আশমান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে; ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙালির মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যদি এ কথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙালিকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে— বাঙালির মনোবৃত্তি-সকল দুর্বল।

কল্পনা যাহাদের প্রবল, বিশ্বাস তাহাদের প্রবল; বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙালি জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূত-প্রেত, হাঁচি-টিকটিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞানবহির্ভূত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সকলের প্রতি একপ্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিসযানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর-কোথাও যে কোনো গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড়ো ভাব ও বড়ো কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কী? স্পেনদেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল, কিন্তু যদি কোনো সুযোগে, বিধির কোনো বিপাকে, বঙ্গদেশে কোনো কলম্বস জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও দাওয়ার আর্য দলপতি এবং আফিসের হেড্ কেরানিগণ কী কাণ্ডটাই করিত। দুই-চারিজন অনুগ্রহপূর্বক সরলভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর, অর্থাৎ যাহারা সর্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে, তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুই-চারি প্যাঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সংকীর্ণ নিগূঢ় মতলব আবিষ্কার করিত এবং আপন আফিস ও দরদালানের স্থানসংকীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

বাঙালিরা কাজের লোক নহে, কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ, তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে,

'কাজ কী বাপু!' ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না; সমস্তই কোলের কাছে জমা করিয়া রাখে এবং যত-সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড়ো কাজ, মহৎ লক্ষ্য, সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই, জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা, রুগ্‌ণ ও রোগের আকর হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখো, আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড়ো মনে করিতেছি। চতুর্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহংকার সঞ্চয় করিতেছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচর্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি ক্ষীণকায় দীনপ্রাণ অজ্ঞান-অধীনতায়-অভিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র, আর্য ও সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের স্ফীতপুচ্ছ ঊর্ধ্বগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি। পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অত্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্ত মানবসমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিত স্পর্শ লাভ করিয়াও তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গিসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহাতে আমাদের কল্পনার জড়ত্ব প্রমাণ করিতেছে। আপনাকে বড়ো বলিয়া ঠাহরাইতে অধিক কল্পনার আবশ্যক করে না, কিন্তু যথার্থ বড়োকে বড়ো বলিয়া সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে উন্নত কল্পনার আবশ্যক।

অলস কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আলস্যের সাহিত্যও তদনুসারে বিকৃত আকার ধারণ করে। ছিন্নবল্গ রথভ্রষ্ট অশ্বের ন্যায় অসংযত কল্পনা পথ হইতে বিপথে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে দক্ষিণও যেমন বামও তেমনি; কেন যে এ দিকে না গিয়া ও দিকে যাই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে আকার-আয়তনের মাত্রা পরিমাণ থাকে না। বলা নাই কহা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী গৃধিনী শুকচঞ্চু কদলী হস্তিশুণ্ড প্রভৃতির বিষম সংযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করে। হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারাইয়া কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়, যথা—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা।

. . .

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা।
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে
ছলে হাঁচিলাম 'জীব' বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল।

—বিদ্যাসুন্দর

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চার মধ্যে শৈশবকল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসংগত সংযমও নাই। শাসনমাত্রবিরহিত আদর ও আলস্যে পালিত হইলে মনুষ্য যেমন পুত্তলির মতো হইয়া উঠে, শৈশব হারায়, অথচ কোনো কালে বয়োলাভ করে না এবং এইরূপে একপ্রকার কিম্ভূত বিকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিয়ন্ত্রিত আলস্যের মধ্যে পুষ্ট হইলে সাহিত্যও সেইরূপ অদ্ভুত বামনমূর্তি ধারণ করে।

চিরকালই, সকল বিষয়েই, আলস্যের সহিত দারিদ্র্যের যোগ। সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অলস কল্পনা আর-সমস্ত ছাড়িয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্যসম্পদে তাহার অধিকার থাকে না; পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আবর্জনাকণিকার মধ্যে সে আপনার জীবিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের মহাদেবের তুলনা করো। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিতবাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্‌বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাসকলুষিত অলস বঙ্গ সমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।

ক্ষুদ্র কল্পনা হয় আপনাকে সহস্র মলিন ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত লিপ্ত করিয়া রাখে, নয় সমস্ত আকার-আয়তন পরিহার করিয়া বাষ্পরূপে মেঘরাজ্য নির্মাণ করিতে থাকে। তাহার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটা আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়, কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোনো অভিব্যক্তি বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে ঘন বলিয়া মনে হয় তাহা বাষ্প, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহা মরীচিকা। কেহ কেহ বলিতেছেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ কল্পনাকুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহাও আমাদের ক্ষীণ ও অলস কল্পনার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে যখন আমি লিখিয়াছিলাম যে, অবসরের মধ্যেই সাহিত্যের বিকাশ তখন আমি এরূপ মনে করি নাই যে অবসর ও আলস্য একই। কারণ, আলস্য কার্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্যের জন্মভূমি।

কতকগুলি কাজ আছে যাহা সমস্ত অবসর হরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। সেইরূপ কাজের বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষতি করে। যাহা নিতান্তই আপনার ছোটো কাজ, যাহার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দাপিয়া বেড়াইতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝনি খিটিমিটি খুঁটিনাটি দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, তাহাই কল্পনার ব্যাঘাতজনক। বৃহৎ কাজ আপনি আপনার অবসর সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকে। খুচরা কাজের অপেক্ষা তাহাতে কাজ বেশি এবং বিরামও বেশি। বৃহৎ কাজে মানবহৃদয় আপন সঞ্চরণের স্থান পায়। সে আপন কাজের মহত্ত্বে মহৎ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। মহৎ কাজের মধ্যে বৃহৎ সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই আপন বলে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে কাজ করায় এবং সেই সৌন্দর্যই আপন সুধাহিল্লোলে হৃদয়ের শ্রান্তি দূর করে। মানুষ কখনো ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কাজ করে, কখনো ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া কাজ করে। কতকগুলি কাজে তাহার জীবনের প্রসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, কতকগুলি কাজে তাহার জীবনকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখে। কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কর্তা, আপনাকে দেবসন্তান বলিয়া অনুভব করে, আবার কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কঠিন নিয়মে অবিশ্রাম পরিচালিত এই বৃহৎ যন্ত্রজগতের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করে। মানুষের মধ্যে মানবও আছে যন্ত্রও আছে, উভয়েই একসঙ্গে কাজ করিতে থাকে, কাজের গতিকে কেহ কখনো প্রবল হইয়া উঠে। যখন যন্ত্রই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন আনন্দ থাকে না, সাহিত্য চলিয়া যায় অথবা সাহিত্য যন্ত্রজাত জীবনহীন পরিপাটি পণ্যদ্রব্যের আকার ধারণ করে।

বাংলা দেশে এক দল লোক কোনো কাজ করে না, আর-এক দল লোক খুচরা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির

আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। বসন্তের প্রভাতে যেমন বিহঙ্গেরা গান গাহে তেমনি বৃহৎ জীবনের আনন্দে সাহিত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই জীবন কোথায়? 'বঙ্গদর্শন' যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাংলার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাংলা একবার নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালির প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল— সেই সময় বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বার্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীণ লোকেরা কহিতে লাগিল, 'এ কী মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য দেখিয়াই ভুলিল, এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধূলিধূসর হইতেছে!' আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার সৌন্দর্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্তে অহংকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল! এখন বলিতেছি, আমরা মস্ত লোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই! পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা! মনু অভ্রান্ত! কথাগুলো আওড়াইতেছি, অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা-দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। এ উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস বাড়ে না, কিন্তু অহংকার বাড়ে, বুদ্ধিকৌশলে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকেই দেবতার দেবতা বলিয়া মনে হয়। দিন-কতকের জন্য অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয়, কিন্তু ভক্তির সজীবতা থাকে না। যাহা আছে তাহাই ভালো, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই, আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে, এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গনপূর্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্বসুখ ভোগ করিতে থাকি। এরূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! এখন সকলে মিলিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।

এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহংকার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধ ধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে। দ্বাররোধপূর্বক অন্ধকারে ইহসংসারের মধ্যে আপনাকেই একাকী বিরাজমান মনে করিয়া একপ্রকার নিশ্চেষ্ট পরিতোষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু একবার যখন বাহির হইয়া সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইব, এই বৃহৎ বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের মধ্যে আপন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিব, আপন নাভিপদ্মের উপর হইতে স্তিমিত দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া মুক্ত আকাশের মধ্যে বিকশিত আন্দোলিত জ্যোতির্মগ্ন সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, তখনই আমরা আমাদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব— তখন জানিতে পারিব, সহস্র মানবের জন্য আমার জীবন এবং আমার জন্য সহস্র মানবের জীবন। তখন সংকীর্ণ সুখ ও অন্ধ গর্ব উপভোগ করিবার জন্য কতকগুলা ঘর-গড়া তুচ্ছ মিথ্যারাশি ও ক্ষুদ্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে তাহা সমস্ত মানবের সাহিত্য হইবে এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যাকৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।

ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৪

কবিতার উপাদান রহস্য
(mystery)

ধরিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের অপেক্ষা সন্তান-বাৎসল্য পৃথিবীতে অধিক বৈ কম নহে। কিন্তু কবিতায় তাহার নিতান্ত অল্পতা কেন দেখা যায়? মানব-হৃদয়ের এমন একটা প্রবল প্রবৃত্তি কবিতায় আপনাকে ব্যক্ত করে নাই কেন? তাহার কারণ আমার বোধহয় রহস্য সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল; স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মধ্যে সেই রহস্য আছে, কিন্তু সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে সেই রহস্য নাই। খাদ্যের প্রতি ক্ষুধার আকর্ষণের রহস্য নাই, তেমনি সন্তানের প্রতি জননীর আসক্তির মধ্যে রহস্য নাই। অবশ্য রহস্য আছে, কিন্তু লোকের সহজেই মনে হয় আপনার পেটের ছেলেকে ভালোবাসিবে না তো কী! কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ সে এক অপূর্ব রহস্যময়। কাহাকে দেখিয়া কাহার প্রাণে যে কী সংগীত বাজিয়া উঠে, তাহার রহস্যের কেহ অন্ত পায় না। সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা রহস্যময় তাহার নিয়ম কেহ জানে না। ধর্মের মধ্যে দুই জায়গায় কবিতা আছে। এক, ঈশ্বরকে অতি মহান কল্পনা করিয়া; মেঘের মধ্যে, বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে, অগ্নি, বিদ্যুৎ সূর্যের রুদ্র তেজের মধ্যে তাঁহার ভীষণ রহস্যের আভাস উপলব্ধি করিয়া। আর-এক, তাঁহাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আপন হৃদয়ের প্রেমের মধ্যে সুন্দর বলিয়া জানিয়া। Old Testament-এ এবং বেদে অনেক গাথা আছে যাহা ঈশ্বরের সেই রুদ্র রহস্য উদ্দেশ করিয়া গীত। এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য রহস্যের বৈষ্ণব কবিদের গান উঠিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে লালনপালন পোষণ করিতেছেন, সংসার বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন— এ ভাব হইতে কবিতা উঠে নাই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২০/১১/১৮৮৮

সৌন্দর্য

৫৩-সংখ্যক প্রস্তাবে বড়দাদা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার রীতিমতো উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা যাহা বলিবার আছে বলি।

"নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না" এ কথাটা অতি অল্প জায়গায় খাটে। অধিকাংশ স্থলেই যে মাতাইবে তাহাকে মাতিলে চলিবে না। "মাতা" বলিতে বুঝায় প্রবৃত্তির তরঙ্গে বুদ্ধির হাল ছাড়িয়া দেওয়া। নিজের উপরে নিজের প্রভুত্ব চলিয়া যাওয়া। বাগ্মী, যিনি বক্তৃতা করিয়া দেশ মাতাইতে চান, তাঁহার এমনি ঠিক থাকা আবশ্যক যে, 'মাতা' না মাতা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়। বাষ্পকে অধিকারায়ত্ত করিয়া যেমন কল চলে তেমনি নিজের মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দখলে রাখিয়া তবে দশজনের মনোবৃত্তি নিজের অভিপ্রায়মতো উদ্রেক করা যাইতে পারে। তবে এই কথা বলা যায় বটে যাহার হৃদয় নাই সে [অন্যের] হৃদয় বিচলিত করিতে পারে না— কিন্তু প্রবৃত্তির প্রাবল্যবশত নিজের উপর যাহার অধিকার নাই সে আপনি যতই চঞ্চল হৌক অন্যকে ... অতএব "নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না" এ কথা [ঠিক] নহে।

সে যাহাই হৌক, নিজের মনের ভাব অন্যের মনে উদ্রেক করিতে হইলে প্রথমেই নিজের মনের ভাব থাকা আবশ্যক এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সৌন্দর্য তো মনের ভাব নহে— সুতরাং এক হৃদয়বৃত্তি অন্য হৃদয়ে যে সমবেদনার নিয়মে সঞ্চারিত হয় সে নিয়ম এখানে খাটে না।

আমার তো মনে হয় সৌন্দর্য স্বভাবতই অপ্রমত্ত কারণ পৃথিবীতে সৌন্দর্যই পরিপূর্ণতার আদর্শ। পরিপূর্ণতার সহিত মত্ততা শোভা পায় না। সৌন্দর্যের আপনার মধ্যে আপনার একটি

সামঞ্জস্য আছে— সে নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ— সে আর সকল হইতে আপনাকে সংহৃত করিয়া রাখে। এইজন্যই আর সকলে এমন প্রবলবেগে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে দৈন্য নাই, এইজন্যই, আমাদের ভিক্ষুক হৃদয় তাহার দ্বারে অতিথি হইয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে এই ঐশ্বর্য এই পরিপূর্ণতা আছে বলিয়া সৌন্দর্যেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মহত্ত্ব, সীমার মধ্যে অসীমতা প্রকাশ পায়। পূর্ণতাকে আপন আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। এই-সকল কারণেই পৃথিবী সৌন্দর্য [পূর্ণতা] অনুভব করিবার এক প্রধান উপায়।

যে রমণী আত্মসৌন্দর্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন, অর্থাৎ সৌন্দর্যের হাত হইতে নিজের হাতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং হাবভাব ও টীকাভাষ্য দ্বারা সৌন্দর্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে সে সৌন্দর্যের স্থায়ী এবং গভীর প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলে— কারণ তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সুতরাং দৈন্যের চিহ্ন দেখা যায়। তাহাতে উপস্থিতমতো মনে করিয়া সুখ জন্মে যে এমন সৌন্দর্য আমার দ্বারে আসিয়া হাজির হইয়াছে আমার প্রশংসার অপেক্ষা রাখিতেছে। কিন্তু এই আত্মাভিমানের সুখ স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ অবহেলার ভাব যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে অহংকারের ভাব সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। রাজা যদি একদিন রাজার ভাবে আমার গৃহে পদার্পণ করেন তবে আমার যথাসর্বস্ব অতিথিসৎকারে ব্যয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি— কিন্তু যদি অভাব জানাইয়া স্থায়ী অতিথিরূপে আমার গৃহে জমি জুড়িয়া বসেন তবে তাঁহার বরাদ্দ ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। মানুষ যে "তেলা মাথায় তেল ঢালে" তাহার কারণ এই যে ক্ষমতা এবং সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরের ভাব দেখিতে পাইয়া অভিভূত হয় স্বতই তাহার নিকটে আপনাকে বিসর্জন দিতে প্রবৃত্তি হয়— নতুবা আমার জন্য একটা লোক কাঁদে না কেন, আর নেপোলিয়নের জন্য হাজার লোক মরে কেন? এই সীমাবদ্ধ মর্ত্যভূমিতে থাকিয়াও অসীমের প্রতি আমাদের এমনি স্বাভাবিক আকর্ষণ। ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টার চিহ্ন অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু তবু আছে কারণ, তাহা ক্রিয়াসাপেক্ষ— কিন্তু সৌন্দর্য নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাহাতে চেষ্টার নামগন্ধ নাই। এইজন্য সৌন্দর্য অধিক পরিপূর্ণ; এইজন্য তাহা ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এইজন্য বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণকে মথুরাপতিভাবে দেখিয়া সুখ পায় না, তাঁহাকে বৃন্দাবনবিহারীভাবে দেখিতে চায়। কারণ স্বাধীন আত্মার উপরে ক্ষমতা অপেক্ষা সৌন্দর্যের প্রভাব অধিক। পাঠকের মন অনেক সময় Paradise Lost -এর শয়তানের স্বপক্ষতা অবলম্বন করে; তাহার কারণ শুদ্ধ ক্ষমতার উপরে স্বভাবতই মানবাত্মার বিদ্রোহভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে সৌন্দর্যস্বরূপভাবে দেখিলে তবেই শয়তানের বিদ্রোহকে যথার্থ শয়তানী বলিয়া মনে হয়।

উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহা নিশ্চয় সৌন্দর্য মাতে না বলিয়াই মাতাইতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৯/১২/১৮৮৮

Dialogue/ Literature

Dramatis Personae

R. Tagore

P. Chaudhuri

L. Palit

P. Ch. একটা কোনো বিষয় আলোচনা করা যাক।

L. P. তার দরকার কী? Vast World-এ একটা-না-একটা subject পাওয়া যায়ই।

R. T. সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গির উপর।

L. P. বুঝিয়ে বলো।

P. C. সাহিত্যের বিষয়টা কী?— Guide book আর Book of travels-এ ঢের তফাত।

R. T. ওইতেই তো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল— দুটোরই বিষয় এক, খালি manner তফাত।

L. P. দুটোর বিষয় আবার মতে তফাত, কেননা different points of view থেকে deal করা হচ্ছে— যেমন Physics আর Chemistry.

P. C. Guide books-এ খালি fact পাওয়া যায়— Book of travels-এ personal element আছে— আর তাইতেই literature হয়। impersonal information-এ science হতে পারে। literature হয় না।

R. T. তা হলে দেখতে হবে কিসে personality প্রকাশ হয়।

L. P. সেটা কি method-এর question নয়?

P. C. Method তো আর খালি style নয়।

L. P. Rhetorical point of view থেকে।

R. T. Mere facts সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে emotions express করতে হলেই ভাষাকেও নিজের মনের মতোন করে গড়ে তুলতে হয় যাতে নিজের ভাব নিজে ভালো রকম ব্যক্ত করে উঠতে পারে।

P. C. Put করবার তফাত তত নয়—যত দেখবার তফাত। একজন যত points দেখছে আর-এক জনা তত হয়তো দেখছে না— feelings-এর question তত নয়— knowledge-এরও question হতে পারে।

R. T. তা হলে তুমি বলছ যে কতকগুলো points literature-এর পক্ষে বেশি উপযোগী।

P. C. না, তা ঠিক নয়। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা ইত্যাদি আমাদের অনেক faculties আছ—Science & Art আলাদা department নিয়ে deal করে; কিন্তু literature সমস্ত faculties-এর সামঞ্জস্য দেয়। নিদেন তাই literature-এর চেষ্টা— সব সময়ে perfect success হয় না।

L. P. আগে দেখা উচিত Literature-এর end কী? তা হলেই আমরা বুঝতে পারব তার subject এবং তার method কিরকম হওয়া উচিত।

P. C. Matthew Arnold বলেন Literature-এর উদ্দেশ্য humanize করা। মানুষের যতগুলি ভালো প্রবৃত্তি আছে তার প্রত্যেকটার Perfect development-এর সহায়তা করা। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি সাধন করা। আমি বলি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে enjoyment মুখ্য ও instruction গৌণ হওয়া।

L. P. খুব ঠিক। তা হলে দাঁড়াল এই যে আমাদের emotional nature-এ সব চেয়ে বেশি appeal করবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে ethical মানে emotional। এই sense-এ যে ethics emotion-এর through দিয়ে literature-এ act করে। Reason-এর through নয়।

P. C. এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্য দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথম— চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়— feel করবার বিষয়। literature-এ আমাদের জীবন্ত সত্যর সঙ্গে পরিচিত করে। সত্যকে তাহার সমগ্রভাবে আমাদের আয়ত্তগত করে। দৃষ্টান্ত— প্রকৃতিকে আমরা Physical Science-এর মতে Matter এবং Force-এর একটা সমষ্টি বলে মনে

করতে পারি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্যর সঙ্গে একটা palpable concrete thing বলে অনুভব করা সেটা যে মানসিক শক্তির দ্বারা হয় literature তারই expression।

L. P. প্রমথ কিছু mystic। এই mystic nature-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে analysis-এর দরকার। সত্য হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা কিরকমে সম্ভব হয় বুঝতে পারছি নে। Nature-এর beauty-কে কী হিসাবে সত্য বলা যেতে পারে তাও জানি নে unless সত্য শব্দটার আরেকটা নূতন মানে দেওয়া যায়। Beauty আমাদের feelings affect করে আর সেই sense-এ purely emotional। একে যদি truth বলে তবে আমি যা আগে বলেছিলুম তার সঙ্গে কোনো তফাতই থাকে না। একই জিনিসের দুই quality থাকতে পারে। গাছ নদী পাহাড় পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা nature বলি তার একটা side unemotional তাই সেই sideটা আমরা purely scientifically enquire into করতে পারি। যে sideটা আমাদের emotion excite করে তার সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত নেই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত এমন কোনো কথা নেই। সৌন্দর্য relative। মানুষের মন এবং nature-এর সঙ্গে একটা relation। সে relationটা universal নয় তাই ordinary scientific truth-এর category থেকে বার করে নিই।

P. C. আমার কথার মানে— literary subject beautiful, moral, এবং আমাদের intellect-এর grasp-এর মধ্যে। এর একটা কোনোটাকে বাদ দিলে literature অসম্পূর্ণ হয়।

L. P. Literature-এর aim হচ্ছে beauty। তবে যা আমাদের moral nature rovolt করে তা আমাদের Sense of the Beautifulও shock করে। কতকগুলো intellectual truthও আছে যা ব্যতিক্রম করলে একই effect হয়। আমাদের sympathy হচ্ছে Highest moral quality। তাকে excite করতে হলে truthful হওয়া দরকার কেননা impossible কিংবা non-existent creature-দের সঙ্গে sympathy-র কোনো আবশ্যক নেই। Living Human being এর সঙ্গে sympathy-র দরকার। এইটুকু truth বজায় রেখে আর বাকি truth আমরা ignore করতে পারি। emotion তা হলে হল end এবং moral ও intellectual হল means।

P. C. এ যদি লোকেনের কথা হয় তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে লোকেনের sympathy-র বদলে আমি love বসাতে চাই। আর meansটা aesthetical ও বটে।

প্রমথ প্রস্থান।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
Oct. 1. 89 [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

সাহিত্য

যেটুকু সাহিত্যের মর্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণপদার্থের মতো— কী কী না থাকিলে তাহা টেঁকে না তাহা জানি, কিন্তু সে যে কী তাহা জানি না। জীবন হইতেই জীবন সংক্রামিত হয়, অগ্নি হইতেই অগ্নি জ্বালাইতে হয়— তেমনি লেখকের অন্তরাত্মা হইতে কলমের মুখে যখন প্রাণ স্ফুরিয়া পড়ে তখনই জীবন্ত সাহিত্যের জন্ম হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে "জীবন" "প্রাণ" প্রভৃতি কথাগুলো হয়তো mystic। কিন্তু পরিষ্কার কথা বলিবার কোনো উপায় নাই। সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবন আছে, এবং সে জীবন লেখকের মানবজীবনের নিগূঢ় কেন্দ্র হইতে

চুঁইয়া পড়ে, ভাষার মধ্যে স্থায়ী হয় ও ভাষাকে স্থায়ী করিয়া তুলে— এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে একপ্রকার আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হইবে।

Shakespeare তাঁহার নাটকের পাত্রগুলিকে আপনার প্রাণের মধ্য হইতে জন্ম দিয়াছেন— বুদ্ধি হইতেও নয়, ধর্মনীতি হইতেও নয়, এমন-কি, feelings হইতে নয়— সমস্ত মানববৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত জীবনকোষের মধ্য হইতে। সাহিত্যের মধ্যে সৃজনের ভাব আছে, নির্মাণের ভাব নাই। সৃজনের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রাণময় আত্মবিস্মৃত নিয়ম আছে, নির্মাণ আপনা হইতেই তাহার হাতধরা। সৃজনশক্তি এক হিসাবে নির্মাণশক্তি অপেক্ষা অচেতন, আবার আর-এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা সচেতন। কারণ, নির্মাণকালে প্রতিমুহূর্তে সচেতন আত্মকর্তৃত্ব জড় উপাদানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়। সৃজনে তাহা নয়। কিন্তু সৃজনকালে সেই জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলে। যেন নিজের নাড়ির সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই তাহার মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়। বাষ্পীয় কলে দেখা যায় এক ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আর-এক চাকার যোগ করিয়া বিভিন্ন দিকে গতি সঞ্চার করা [হয়।] তেমনি এই বৃহৎ সংসারচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আমার জীবনচক্র ঘুরিতেছে, তাহারি কে[ন্দ্রের মধ্য] দিয়া সংসারের গতির সহিত সাহিত্যের যোগ সাধন করা হয়, এই উপায়ে সাহিত্য বৃহৎ জীবনের অনন্তগতি প্রাপ্ত হয়। কেহ-বা হাতে করিয়া ঠেলিতেছে, কেহ-বা ঘোড়া জুড়িয়া ছুটাইতেছে, কেহ-বা জীবনের চক্রের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে, শেষোক্ত উপায়েই সাহিত্য স্থায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই-সকল তুলনা উপমাকে কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হয়, পাকা কথা বলিয়া বোধ হয় না। পাকা কথা মানে, যে কথা সকলেই যাচাই করিয়া লইতে পারে। পূর্বেই একরকম বলা গিয়াছে এ-সকল কথা তেমন সন্তোষজনকরূপে পাকা করিয়া লওয়া অসম্ভব।

আমি নিজে বার বার দেখিয়াছি, এবং এ কথা বোধ হয় কাহাকেও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, যে, যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন এক প্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর-একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার Real এবং Ideal-কে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারই এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়। আমার জীবনের যাহা সারবিন্দু তাহা সমস্ত মানবজীবনের ধন, তাহা কেবলমাত্র আমার একটা অজ্ঞেয় অপরিচিত অসম্পূর্ণ অংশ নহে। সুতরাং সেই জীবনশক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন সমস্ত মানবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২।১০।৮৯

[১৭ আশ্বিন ১২৯৬]

বাংলায় লেখা

বাংলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়। প্রকৃত নূতন কথা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়— কেবল যখন ব্যক্তিবিশেষ সেই কথাটা নূতন করিয়া [ভা]বিয়া বলে তখনই তাহা নূতন হইয়া উঠে। বাংলায় কোনো চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশত অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিতভাবে অন্যের

নির্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে— ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষায় স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।— আমি দেখিয়াছি একটা সামান্য কথাও বাংলায় লিখিয়া মনে হয় নূতন কথা লিখি[লাম— কারণ] ভাবা-কথাও সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্ত হৃদয় মন বুদ্ধি চেষ্টা জাগাইয়া রাখিতে হয়— প্রত্যেক কথাটিকে নিজে ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাদের গরিব বাংলা ভাষায় বিস্তর অসুবিধা, সমস্তই নিজের হাতে করিয়া-কর্মিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেইটেই একটা সুবিধা।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

৬।১০।৮৯

[২১ আশ্বিন ১২৯৬]

অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত

বিদেশী ভাষা নূতন শিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন সেই ভাষার সাহিত্য পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করা যায়, তখন দুই কারণে সেই সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। ১ম— তখন আমরা পরপুরুষ বলিয়া ভাষার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। প্রত্যেক কথার অন্দর মহলে যে লাজুক ভাব-সকল বাস করে, যাহারা সেই কথার শ্রী, সৌন্দর্য, হৃদয়দেবতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, কেবল তাহার বহির্দেশবাসী অর্থটুকুমাত্র আফিসের সাজে দেখা দেয়। ২য়— প্রত্যেক কথাটাকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়— অনভিজ্ঞ আনাড়ির কাছে তাহারা সকলেই স্বস্বপ্রধান হইয়া নিজমূর্তি ধারণ করে, তাহারা সকলেই বড়ো হইয়া সমগ্র পদটিকে (sentence-কে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পুলিসের কন্‌স্টেবল যেমন আইন-অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়ের নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত, আইন বজায় রাখা যাহাদের কাজ সুযোগক্রমে তাহারাই যেমন আইনের উপরে টেক্কা দিয়া দাঁড়ায় এও সেইরূপ। একটি কথার সহিত আর-একটি কথা যে একটি সুন্দর [ঐক্য] শৃঙ্খলার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া রাখে সেই ঐক্যশৃঙ্খলার উপরে সাহিত্যের সৌন্দর্য ও প্রাণ নির্ভর করে। অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ঐক্যবন্ধন হইতে কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে অর্থ বোধ হয় কিন্তু সৌন্দর্যবোধ পলায়ন করে।

বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে এ কথা আরও খাটে। অভ্যস্ত শ্রেণীয় সংগীতে, সুরবিন্যাসের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সেইটি সহজে ও শীঘ্র ধরিতে পারি। বিগত সুর স্মৃতিতে থাকে ও আগামী সুর পূর্ব হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি— স্বতন্ত্র সুরগুলির অপেক্ষা তাহাদের ঐক্যমাধুর্যের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারি, অর্থাৎ প্রকৃত সংগীতটুকু শুনিতে পাই। অনভ্যস্ত সংগীতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সুর উপদ্রব করিয়া মনকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, কিছুর উপরে আশ্রয় লইতে দেয় না। সর্বদাই যেন শূন্যে শূন্যে বিরাজ করিতে হয়। তবু লিখিত ভাষার একটা সুবিধা আছে এই যে যখন ইচ্ছা বার বার ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু সুর উড়িয়া চলে, ধরা দেয় না। ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে, আমরা মনে মনে সেই অর্থ যোজনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বতন্ত্র সুরের কোনো অর্থ নাই, তাহার সমস্ত অর্থ তাহার ঐক্যের মধ্যেই বিরাজ করে। এইজন্য বিদেশী সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সংগীত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়কে উদ্‌বেজিত করে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে হয়, কার্যকারণশৃঙ্খলের প্রত্যেক অংশকে মনে মনে অনুসরণ

করিতে হয়— মনকে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌন্দর্যের নিকট মন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়া উপভোগ করে। মনের চেষ্টা শান্ত করিতে না পারিলে সেই সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত সাহিত্যে বিশেষত অপরিচিত সংগীতে সেই চেষ্টা অবিশ্রাম জাগ্রত থাকে। প্রত্যেক অনভ্যস্ত শব্দ ও স্বরবিন্যাসে মুহূর্তে মুহূর্তে মনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

৬।১০।৮৯

সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব

সৃষ্টিকার্যের মধ্যে সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য রহস্যময়। কারণ, জগৎরক্ষায় তাহার একান্ত উপযোগিতা দেখা যায় না।

সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।

তাহা আবশ্যকের অতিরিক্ত দান, তাহা ঈশ্বরের প্রেম।

যাহা কেবলমাত্র আবশ্যক— যাহা নহিলে নয় বলিয়া চাই, তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য স্মরণ করাইয়া দেয়। এইজন্য তাহার প্রতি আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আপনার মর্যাদা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করিতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দূরছাই প্রয়োগ করি। বুদ্ধি-চর্চার আনন্দকে আমরা উচ্চতর আসন দিই। তাহার একটা কারণ, উদরচর্চা অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা অধিকতর পরিমাণে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিদ্যালোচনা না করিলে তুমি মূর্খ হইবে কিন্তু মারা পড়িবে না।

সংসারে যদি কেবল নির্জল আবশ্যকটুকুমাত্র থাকিত তবে আমরা জগদীশ্বরের দ্বারে ভিক্ষুকরূপে থাকিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্তই কেবল দায়ে ফেলিয়া রাখা হইত।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেম থাকিলে ভিক্ষা আর ভিক্ষাই থাকে না, যেমন জননীর নিকট হইতে অভাব মোচন।

সৌন্দর্য সেই প্রেমের লক্ষণ, আমাদের মন ভুলাইবার চেষ্টা। যদি সংসারের কাজ লওয়াই উদ্দেশ্য হয় তবে আমাদের মনোহরণের চেষ্টা বাহুল্য। জগতের বড়ো বড়ো দানব-শক্তির মাঝখানে ক্ষুদ্র প্রাণীদের নিকট হইতে অনায়াসে কান ধরিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিত। জগতের সৌন্দর্য বাপুবাছা বলিয়া আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে কেন?

ওইখানেই যন্ত্রনিয়মের উপরে প্রেমের নিয়ম দেখা দিতেছে। খাদ্যের সহিত রস, শব্দের সহিত সংগীত, দৃশ্যের সহিত আকার ও বর্ণসুষমা, ইহাতেই প্রেমের হাত দেখা যায়।

আমরা টিকিয়া থাকিব প্রকৃতির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু আনন্দে থাকিব ইহা বাড়ার ভাগ— বিশেষত তাহার জন্য আয়োজন তো কম করিতে হয় নাই! গ্রহতারা তো বেশ চলিতেছে, গাছপালা তো বেশ স্বাদহীন আহার করিয়া অন্ধ ও বধির ভাবে বংশবৃদ্ধি করিতেছে! কিন্তু যেখানেই চেতনার সঞ্চার করা হইয়াছে সেইখানেই কেবলমাত্র শক্তি নহে, তদতিরিক্ত প্রেম অনুভব করানো হইতেছে। শক্তিকে মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

শক্তির মধ্যে কার্যকারণশৃঙ্খলা দেখা যায়— এইজন্য তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্ত। কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে ইচ্ছা দেখা যায়, এইজন্য বিজ্ঞান সেখানে প্রতিহত। এইজন্য সৌন্দর্য অতীব আশ্চর্য রহস্যময়।

এইজন্য সৌন্দর্য অনাবশ্যক হইয়াও আমাদের আত্মার মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করে। যেন ওইখানে অনন্তের সহিত আমাদের নাড়ির টান উপলব্ধি করা যায়।

সৌন্দর্য সৃষ্টির সর্বকনিষ্ঠ, দুর্বল, সুকুমার। কিন্তু তাহাকে সকল বলের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কঠিন গ্রানিটের ভিত্তির উপরে কোমল ধরণীর শ্যামল লাবণ্য। প্রবল গুঁড়ি ও ডালপালার উপরে সুন্দর পুষ্পপল্লব। কঠোর অস্থি-মাংসপেশীর উপরে সুকুমার দেহসৌন্দর্যের বিস্তার। উৎকট পুরুষবলের উপরে অবলা রমণী পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত।

স্বাধীনতাও সৃষ্টির সর্বশেষ সন্তান। মানবই আপন অন্তরে স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছে। স্বাধীন আত্মার নিকটে এই দুর্বল সৌন্দর্যের বল সর্বাপেক্ষা অধিক। বলের প্রতিকূলে আমরা বল প্রয়োগ করি। সৌন্দর্যের কাছে আমরা আত্মবিসর্জন করি। সে আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, আমরা তাহার হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই।

সৌন্দর্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ফুল এক বসন্তে অনাদৃত হইয়া দ্বিতীয় বসন্তে ফোটে। বহির্জগতে কত ফুল ঝরিয়া একটি ফল হয়— ফুল হইতে আমাদের অন্তর্জগতেও যে ফল জন্মে তাহাও এইরূপ বহুবিফলতার সন্তান।

কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের ঝড় অপেক্ষা করে না। সে যখন প্রবাহিত হয় তখনি অরণ্যপর্বত কাঁপিয়া উঠে— তরুলতা ভূমিশায়ী হয়। তাহার ফল সদ্য সদ্য।

ধীরে ধীরে আমাদের পাষাণ হৃদয় গলাইয়া দিতেছে, পাশব বলের প্রতি আমাদের লজ্জা জন্মাইয়া দিতেছে— অথচ একটি কথাও কহিতেছে না, সে কে? সে এই অসীম ধৈর্যবান সৌন্দর্য।

সে কাড়িয়া লয় না, আনন্দ দান করিয়া যায়, লোকের প্রাণ আপনি বশ হয়। মানব সভ্যতার উচ্চতম শিক্ষাই এই— প্রেমের দ্বারা দুর্বলভাবে পশুবলের উপর জয়লাভ করো। সৌন্দর্য ছাড়া জগতের আর কোথাও তো এ কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আর সকলেই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, প্রেম স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, সহিয়া যায়।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন— এই নিয়ম যদি আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে প্রতীতি হয় বলের অপেক্ষা সৌন্দর্যের টিকিবার শক্তি অধিক। কারণ, সৌন্দর্য কাহাকেও আঘাত করে না, সুতরাং জগতের আঘাত ইচ্ছা উদ্রেক করে না।

সৌন্দর্য ক্ষেত্রেই আমরা ঈশ্বরের সমকক্ষ। ক্ষমতায় তিনি কোথায় আমি কোথায়! যেখানে সৌন্দর্য সেখানে আমরা দেখিতে পাই ঈশ্বরও আমাদিগকে চাহিতেছেন।

বহির্জগতে সৌন্দর্য, অন্তর্জগতে প্রেম। ভয়ে, অভাববোধে কাজ চলে, আদান-প্রতিদানের নিয়মে কাজ চলে, প্রেম বাহুল্যমাত্র। এমন-কি, উহাতে কাজের ক্ষতিও হয়। প্রেম অনেক সময় আপন স্বাধীনতাগর্বে আমাদের কাজ বিগড়াইয়া দেয়— তবু প্রকৃতি উহাকে ধ্বংস করিতে পারে না, শাসন করিয়া নির্জীব করিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ডবলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া বসে। এমন-কি, প্রকৃতির ন্যায্য শাসনও অনেক সময়ে তাহার অসহ্য বোধ হয়। সে যেন বলে, আমি দেবকুমার, পরিপূর্ণ অক্ষয় স্বাধীনতাই আমার পিতৃভবন— সেইখানকার জন্যই সর্বদা আমার প্রাণ কাঁদিতেছে— এই মর্ত্য প্রকৃতির শাসন আমি মানিব না। জগৎ কে, সমাজ কে, লোকাচার কে! আমি যদি বলি, যাও— আমি তোমাদিগকে মানিতে চাহি না, তবে বড়ো জোর, আমাকে প্রাণে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু আমার সেই প্রবল স্বাধীন ইচ্ছাকে তো বাঁধিতে পারে না! সেই প্রেমের, সেই স্বাধীনতার মধ্যে একটি মরণাতীত দৈবভাব জাজ্জ্বল্যরূপে অনুভব করিতে পারি বলিয়াই তাহার খাতিরে অনেক সময়ে প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করি, নহিলে প্রাণটা বড়ো সামান্য জিনিস নহে!

রচনা : [১৫] অক্টোবর ১৮৮৯
ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৯

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা

[শেষাংশ]

যাহা অসম্ভব তাহা প্রত্যাশা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বহু যুগের চিন্তাস্তরের উপর ইংরাজি সাহিত্য নির্মিত, বঙ্গসাহিত্য যতই শির উত্তোলন করুক একেবারেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব তুলনা করিবার সময় ইংরাজি সাহিত্য হইতে তাহার সেই উচ্চ সুবিধাটুকু হরণ করিয়া লইয়া দেখিতে হয়।

আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে যাহা-কিছু শিক্ষা পাইতেছি তাহার একেবারে আরম্ভ হইতে বাংলা ভাষায় নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজিতে সেগুলা হয়তো অত্যন্ত গোড়াকার কথা, এবং সমালোচকের চক্ষে তাহা যৎসামান্য ও নূতন [নহে] কিন্তু বাংলায় তাহা নূতন আবিষ্কৃত। নূতন আবিষ্কারের মধ্যে যে তেজ ও উজ্জ্বলতা থাকে উক্ত সামান্য কথাগুলিও বাংলায় সেই মহিমা লাভ করে। পুরাতন কথা নূতন হৃদয়ের মধ্যে সদ্য পুনর্জন্ম লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বর্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অধিকাংশ লেখক নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ পুরাতন পরিচিত ভাবগুলি লইয়া বিচিত্র আকারে বিন্যাস করিতেছেন মাত্র। বঙ্গ ভাষায় সৃষ্টি করিতে হইতেছে, সুতরাং অন্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র কথাটিও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত মহৎ। আমাদের হৃদয়ে বিবিধ কর্মকাণ্ডের সংঘর্ষজনিত প্রবল আবেগ নাই বটে তথাপি যেটুকু উত্তাপ আছে তাহাই অনুরাগভরে সঞ্চারিত করিয়া Fossil সত্যগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতেছি। যাঁহাদের লেখনীমুখে বঙ্গভাষায় সেই অর্ধজড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবনহারা সত্যগুলি নববসন্ততাপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সেই সৃজনের আনন্দে পুঁথিপড়া সমালোচকের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাংলা ভাষায় 'জ্যেঠামি' নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। যে ছেলে বুড়োদের মতো পাকা কথা কহে তাহাকে আমরা জ্যাঠা বলি। অর্থাৎ যাহার অভিজ্ঞতা নাই অথচ অভিজ্ঞতার বচনগুলি আছে সেই জ্যাঠা। বঙ্গদেশে আমাদের কোনো সাহিত্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। ইংরাজি সাহিত্য আমরা বই পড়িয়া জানি এবং বঙ্গসাহিত্য এখনো নূতন উর্বরা দ্বীপের ন্যায় অজ্ঞাত সমুদ্রগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। আমরা কোনো জীবনচঞ্চল সাহিত্যের সৃজনকার্যের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া উঠি নাই। সুতরাং সাহিত্যের সেই অমোঘ নাড়িজ্ঞানটুকু আমরা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা সাবধানে ভয়ে ভয়ে তুলনা করিয়া পুঁথি মিলাইয়া বিচার করি। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ নির্জীব বিচারপ্রণালী একেবারেই অসংগত। প্রতিক্ষণেই তাহার মধ্যে এত বিচিত্র আকার ও আলোকছায়ার সমাবেশ হইতেছে যে অলক্ষিতে বহুকালসঞ্চিত আন্তরিক সজাগ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা তাহার বিচার করিতে পারি।

চিত্রবিদ্যাই বল কবিত্বই বল এক হিসাবে প্রকৃতির সমালোচনা। চিত্রশিল্পী প্রকৃতির সহস্র আকারসংযোগের মধ্যে চিত্রপটের জন্য একটি বিশেষ অংশ নির্বাচন করিয়া লয়, কবি অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ একটি দৃশ্য কল্পনার আলোকে আলোকিত করিয়া লয়; এই নির্বাচনের উপরেই তাহাদের অমরত্ব নির্ভর করে। এই নির্বাচনেই কবি ও শিল্পীর সমালোচনশক্তি প্রকাশ পায়। বহুকাল হইতে অলক্ষিতে নিজের জীবনের মর্মমধ্যে প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহারা এই অভ্রান্ত সমালোচনপটুত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে বাস না করিয়া প্রকৃতির সতত আবর্তিত পরিবর্তিত জীবন্ত শক্তির মধ্যে মানুষ না হইয়া কেবল অলংকারশাস্ত্র ও সমালোচনার গ্রন্থ পাঠ করিতেন তবে তাঁহারা কি আন্তরিক

নিপুণতা লাভ করিতেন? তেমনি জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণশক্তি যেখানে বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে সেইখানে সংলগ্নভাবে থাকিলে তবেই যথার্থ অন্তরের মধ্যে সেই অভ্রান্ত সাহিত্য-অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আর পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিতে হয় না, তখন আর তর্জমা করিয়া পরখ করিতে হয় না, তখন নূতন সৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য দেখিলে অগাধ সমুদ্রে পড়িতে হয় না, তখন কল্পনারাজ্যের নূতন পুরাতন সকলেরই সহিত চক্ষের নিমেষে কী এক মন্ত্রের [বলে] পরিচয় হইয়া যায়।

২৪।৩।৯০ (আজ সু [রেনরা] সোলাপুর যাচ্ছে)—
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
[১২ চৈত্র ১২৯৬]

[কাব্য]

কাব্যের আসল জিনিস কোন্‌টা তাহা লইয়া সর্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় কোনো মীমাংসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি সংগীত ও কবিতা নামক প্রবন্ধে বাল্যকালে লিখিয়াছিলাম, এই খাতায় সংক্ষেপে তাহারই পুনরুক্তি করিতে বসিলাম।

... এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি যাহা শুনিতে অত্যন্ত বাষ্পময় কাল্পনিক মনে হইতে পারে কিন্তু যাহা আমি একান্ত প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।— জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই অসীমতা আছে; যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করি এবং ভালোবাসি, তাহার মধ্যেই সেই অসীমতা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারি। অতএব কোনো সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেহ শেষ কথা বলিতে পারে না। কোনো ফুলের সম্বন্ধে পৃথিবীর আদি কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার সৌন্দর্যের শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী কবি যদি আরও কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা সেই ক্ষুদ্র ফুলের পক্ষে অধিক হয় না। বিষয়টা একই এবং পুরাতন কিন্তু আদিকাল হইতে এখনো পর্যন্ত মানুষ তাহার নূতনত্ব শেষ করিতে পারে নাই! আমি একটি তুচ্ছ ফুল সম্বন্ধে যতটা কথা বলিতে পারি, কোনো কবি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বলিলেও যদি কথাটা অকৃত্রিম সুন্দররূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইবে, বটে, বটে, ফুল সম্বন্ধে এতটা কথা বলা যাইতে পারে বটে! আমি যে এতদিন স্বীকার করি নাই, তাহাতে ফুলের খর্বতা নাই আমারই খর্বতা। ফুল আপনার মধ্যে অসীমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা অনুভব করে।

অতএব এখানে বিষয় লইয়া কথা নহে, প্রকাশ লইয়া কথা। জুঁইফুল সুন্দর এ কথা বড়ো কবিও জানে ছোটো কবিও জানে, অকবিও জানে— কিন্তু যে যত ভালো করিয়া প্রকাশ করে জুঁইফুলকে সে তত অধিক করিয়া আমার হাতে আনিয়া দেয়।

কেবল তাহাই নয়। কারণ, যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলে জুঁইফুল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কবির কবিতা পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আর-কোনো কবির রচনা পড়া অনাবশ্যক ও বিরক্তিজনক হইত।

কিন্তু ফুলের মধ্যে অসীমতা আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় তাহার অগাধ গভীরতা এবং ভালো মন্দ সহস্র কবির কবিতায় তাহার অপার বিস্তৃতি অনুভব করি। দেখিতে পাই, কালের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং মানবের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তথাপি সর্বকালে সর্বকবির মধ্যে এই ফুলের সমাদর। এইজন্য এক কবির পরে আর-এক কবি যখন একই পুরাতন কথা বলে তখন ফুলের অসীমতার প্রতি আমরা আরও একটু নূতন করিয়া অগ্রসর হই।

ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে— তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য; আমাদের সমগ্র মানবত্ব তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইবার উপায় পায় না; এইজন্য ফুলে আমাদের আংশিক আনন্দ। কোনো কোনো কবির কবিতায় এই ফুলকে কেবলমাত্র জড়সৌন্দর্যভাবে না দেখিয়া ইহার মধ্যে আমাদের অনুরূপ মনোভাব এবং আত্মা কল্পনা করিয়া লইয়া আমাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সংগতি প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তাহারা সৌন্দর্যকে নির্জীবভাবে দেখিতে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য বিষয়ের একটা অতিরিক্ত পদার্থ— তাহা তাহার আবশ্যকীয় নহে। এইজন্য মনে হয় সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্যে বিকশিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য— সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাহাই হউক, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি সম্ভবে না। এইজন্য কেবলমাত্র ফুলের কবিতা সাহিত্যে সর্বোচ্চ সমাদর পাইতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাহাকে ততই উচ্চশ্রেণীয় কবিতা বলিয়া সম্মান করি। সাধারণত স্বভাবত যে জিনিসে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাহাকে এমনভাবে দাঁড় করাইতে পারেন যাহাতে তাহার মধ্যে আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে সে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করিয়া কবি Wordsworth এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন চৈতন্য লাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি তো কিছু বুঝিতে পারি না। গাছপালা ফুল পাখি প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিসে মানুষ খুশি হইয়া যাইবে ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিরহব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহার কারণ পাওয়া যায় না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম— প্রকৃতির যে-সকল সৌন্দর্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে মানবের পক্ষে তাহা আংশিক। জ্যোৎস্না কেবল দেখিতে পাই, পাখির গান কেবল শুনিতে পাই, ফুল আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হয়। উপভোগের আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিতৃপ্তির পথ দেখায় না। তখন মানবের মন স্বভাবতই মানবের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, মানব ভিন্ন আর কোথাও একাধারে মানবের দেহ মন আত্মার চরম আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির স্থান নাই। এইজন্যই বসন্তে জ্যোৎস্নারাত্রে বাঁশির গানে বিরহ।

এইজন্য প্রেমের গানে চিরনূতনত্ব। প্রেম সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করে। এককালে তাহার দেহ মন আত্মায় পরিপূর্ণ টান পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের— এবং সাধারণত প্রেমের কবিতাতেই মানুষকে অধিক মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমার মতে সবসুদ্ধ এই দাঁড়াইতেছে নূতন আনন্দ আবিষ্কার করিয়া ও পুরাতন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া কবিতা আমাদের নিকট মর্যাদা লাভ করে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে।

১২।১।৯১
বির্জিতলাও
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

একটি পত্র

সহৃদয়েষু— অল্পদিন হইল, আমি কোনো কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোনো কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমতো সমালোচনা বলা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, আমার সেই লেখাটুকুকে সমালোচনা না বলিয়া আর কোনো উপযুক্ত নাম দিলে যদি তাহার ভাব গ্রহণের অধিকতর সুবিধা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি, সমালোচক অনেক সময়ে নিজের নামকরণের সহিত নিজে বিবাদ করিয়া লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। পুত্রমাত্রকেই পদ্মলোচন নাম দেওয়া যায় না— যদি মোহবশত অপাত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যদি সেই নামধারী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি চক্ষুর আয়তির অপেক্ষা নাসার দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর রাগ করা সংগত হয় না।

সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বুঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয়, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি— কীরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহসপূর্বক বলিতে পারি না— যিনি বিশেষ কৌশলপূর্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝেন, তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়, ভূমিকা এবং উপসংহার ফাঁদিয়া আগাগোড়া মিল করিয়া বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লেখা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হওয়াতে পৃথিবীতে অনেক বাজে কথা এবং মিথ্যা কথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর মানুষের একটি বর্বর অনুরক্তি আছে— এইজন্য প্রায় সকল জিনিসেরই গজে মাপিয়া মূল্য স্থির হয়। এই কারণেই সকল কথা বড়ো করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু সত্য রবারের মতো স্থিতিস্থাপক পদার্থ নয়। বরঞ্চ তাহাকে বাড়াইতে গেলেই কমাইতে হয়। খাঁটিকে খাঁটি করিতে হইলে তাহাকে যেমনটি তেমনই রাখিতে হয়, ওজন বাড়াইবার জন্য তাহাতে যতই জল মিশানো যায়, ততই তাহার দর কমিয়া আইসে।

একটি কাব্যগ্রন্থ যখন ভালো লাগে, তখন তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা বলা কতই শক্ত! ঠিক মনের কথা, তাহা লিখিলে রীতিমতো প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ হয় না। এইজন্য বসিয়া বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, পরিচ্ছেদের উপর পরিচ্ছেদ স্তূপাকার করিয়া, তত্ত্বের উপর তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া, নিজের মানসিক পরিশ্রমের একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া, সেটাকে খুব একটা উন্নত সত্য বলিয়া মনে হয়। বেশি পরিশ্রমের ধনকে বেশি গৌরবের বলিয়া মনে হয়। মাঝের হইতে যেটি ঠিক সত্য, যেটি আসল কথা, সেটি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

ঠিক সত্য মানে কী? কাব্যসম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ-সাতশো প্রমাণ তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি, ততটুকু সত্য। অবশ্য শিক্ষা এবং প্রকৃতিগুণে কোনো কোনো সহৃদয় বিশেষরূপে কাব্যরসজ্ঞ, এবং তাঁহাদের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত সাহিত্যপ্রিয় লোকদের নিকট চিরকাল সমাদৃত হয়। অপর পক্ষে কোনো কোনো হৃদয়ে কাব্যের জ্যোতি রীতিমতো প্রতিফলিত হইবার মতো স্বচ্ছতা নাই, কিন্তু যেমনই হউক, কাব্যসম্বন্ধে নিজের নিজের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না।

কোনো কোনো ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া, নিজের ভালোমন্দ-লাগাকে খাতির না করিয়া, বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূল পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, একজন অশিক্ষিত লোকের যাহা ভালো লাগে, শিক্ষিত লোকের তাহা ভালো লাগে না, এবং অশিক্ষিত লোকের যেখানে অধিকার নাই, শিক্ষিত লোকের সেখানে বিহারস্থল। অর্থাৎ বুনো আমগাছ মাটি এবং বাতাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু বহুকাল চাষের গুণে সেই গাছের এমন একটা পরিবর্তন হয় যে, মিষ্ট রস উৎপাদন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

কিন্তু দুই গাছই একই পদ্ধতি অনুসারে ফল ফলায়। উভয়েই নিজের ভিতর হইতে কাজ করে।

কাব্য-সমালোচনা-সম্বন্ধেও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিজের হৃদয় দ্বারা রস গ্রহণ করে, তবে অবস্থা-গতিকে হৃদয়ের পার্থক্য জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানের মীমাংসার স্থল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসার স্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর-কোথাও হইতে পারে না।

এইজন্য কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর-একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির মধ্যে পড়িয়া আর-এক রূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে, ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশকালপাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়। তখন তাহা হইতে কেবল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সম্ভব।

আরও একটি কথা আছে। বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কোনো তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোনো আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোনো কালে মিথ্যা হইবার জো নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে পারি, যাহাতে আমার ভালোমন্দ-লাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু আমি যদি একটা ভ্রান্তমত অধিকাংশ সাময়িক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি, তথাপি সেটা স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্য মতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্তমান কালের স্বদেশবৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হউক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্তনকালে তাহার কোনো মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে কতখানি ভালো লাগে, আমি যদি ভালো করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, আমি যদি সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কী সুন্দর, তবে সে কথা কোনো কালে অমূলক হইয়া যাইবে না।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দিয়া কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব-হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবল ইহাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্তে ভাব প্রকাশ করা।

সাহিত্য
কার্তিক ১২৯৯

বাংলা লেখক

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা অতি যৎসামান্য। এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক 'কোটিকে গুটিক' মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া, কোনো সুযুক্তি করিয়া আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করেন। নির্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর কাহারও কোনো অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেলকি খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই— যে যার আপন আপন সুবিধার সুখশয্যায় শয়ান, লেখকদিগের কার্য, স্ব স্ব দলের বৈতালিক বৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তবগানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া নেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং জাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্য সাধন করে, যাহাকে কোনো যুক্তি, কোনো শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে, এবং দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ময় ধ্রুব নির্দেশ প্রদর্শন করে— সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র, কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে, তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক, নিশ্চল জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে, কোনো কিছুতে কাহারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই; এরূপ স্থলে লেখকদের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশি মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোনো যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমতো নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন, বাঙালির নিকটে বাংলা লেখার, এমন-কি, লেখামাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই, যেজন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেইজন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে, প্রবল বাগ্মিতায়, সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই

বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এইজন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ, সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে, সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহু-দর্শন থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা, অযত্নে রোখের মাথায় কথা বলিলেও তা— এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়, সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে, বহু যত্ন, বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে; গুণ এবং দোষ, নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে; যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতিপদে ক্ষীণ হইতেছে অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে— যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দনগীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মতো আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেকসময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানত কর্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোনো ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয়, তখন, অলক্ষিতে আমাদের, অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয়; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয়, ততক্ষণ তাহার নির্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়— ততক্ষণ এ পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতিসূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শাণিতই হইতে থাকে, এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোনো মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমতো আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমা নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য, সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মতো নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায়তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্পগঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদাহরণস্বরূপ কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথবাবু তাহার "কড়াক্রান্তি" প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিত শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন, সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোনো দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য তর্ক-চাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন ইচ্ছা রচনা করুক, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিতভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি— তুমিও যেমন, উহাতে কাহার কী যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না! আমাদের সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কখনো অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

একদিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না, অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন, স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ, আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিংবা কঠিন কর্তব্যপালন তাহার নাম নাই— কেবল আহা উহু, কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়, অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মোচন করিয়া তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙালির আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্তব্য নহে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিত ভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয় বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদগদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসংগত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভালো জিনিসগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি, যে তাহাতে ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে— এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস, মনুসংহিতা এবং হিন্দুসমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত

থাকিতেন তাহা হইলে জোড়করে বলিতেন, 'তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড়ো করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। বাপু রে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্বক, একটু সংযতভাবে কথা বলো। পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই ভালোও থাকে মন্দও থাকে— তোমরা যতই কূটতর্ক কর-না, অসম্পূর্ণতা হো হা দ্বারা ঢাকা পড়ে না। যাহার যথেষ্ট ভালো আছে, তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না, সে ভালো মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পস্বল্প ভালো, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্ট ধরিয়া ওকালতি করো। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না— তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশি। কিন্তু ওই কলঙ্কের জন্য বাজে কৈফিয়ত দিতে গেলেই কিংবা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।'

সাধনা

মাঘ ১২৯৯

'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি

কিয়ৎকাল পূর্বে ''হিং টিং ছট্'' নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কোনো লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহমোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎপ্রসঙ্গে এইস্থলে জানাইতেছি যে, চন্দ্রনাথবাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।

সাধনা

চৈত্র ১২৯৯

রবীন্দ্রবাবুর পত্র

সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

পুরী
৬ই ফাল্গুন

মান্যবরেষু,

চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল একদিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার, পক্ষ

হইতে যে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই-তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই।

আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিকপত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়— দুই-একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্যুপরি অনেকগুলি বাদ-প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধনা করিতেছিলাম, তবে তাহা আপনার ভ্রম— ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধে এমন দুই-একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসংগত হয় নাই।

"হিং টিং ছট্" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোনোপ্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার, স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু'— এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি— আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে-অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনোই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কোনো কাজ করিতে পারে এ কথা দেশকালপাত্রবিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

আপনি লিখিয়াছেন 'মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই তো রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কী? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।' মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মতো শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালোরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোনো কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচারদ্বারা

পৃথিবীর কোনো উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এ কার্য যদি বারংবার করার আবশ্যক হয় তবে বারংবারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারংবার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার পুনর্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোনো গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

পুঃ— অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। —শ্রীরঃ

সাহিত্য
বৈশাখ ১৩০০

সাহিত্যের গৌরব

মৌরস য়োকাই হঙ্গেরি দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হইবার পর পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের আপামরসাধারণ কীরূপ মহোৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই উৎসব-বিবরণ পাঠ করিলে তাহার সহিত আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশের তুলনা স্বতই মনে উদয় হয়।

ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যুর পর সমস্ত ফ্রান্স কীরূপ শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ হয়, কারণ, ফ্রান্স য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়। বীরপ্রসবিনী হঙ্গেরির সহিতও নির্জীব বঙ্গদেশের তুলনা হইতে পারে না, তথাপি অপেক্ষাকৃত অসংকোচে তাহার নামোল্লেখ করিতে পারি।

আমরা যে বহু চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মহাত্মাগণকে সম্মান এবং প্রীতি উপহার দিতে পারি না, আর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যে রাজায়-প্রজায় মিলিয়া সামান্যবংশজাত একজন সাহিত্যব্যবসায়ীকে এমন অপর্যাপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল ইহার কারণ কী?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে লেখক এবং পাঠক এক প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। সেখানে সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া একজাতি। তাহারা এর উদ্দেশ্যে এক জাতীয় উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরলপথ নির্দেশ করিতেছে, সে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে।

আমাদের দেশে পথিক নাই সুতরাং পথ খনন করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারে না। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়, বঙ্গসাহিত্য কোথায়, বাঙালি জাতি কোথায়! যাহারা বাংলা লেখে তাহারাই বা কয়জন, যাহারা বাংলা পড়ে তাহাদেরই বা সংখ্যা কত!

বঙ্গসাহিত্য যে জাতীয়-হৃদয় অধিকার করিবার আশা করিতে পারে সে হৃদয় কোন্খানে! পূর্বকালে যখন আমাদের দেশে সাধারণজাতি নামক কোনো পদার্থ ছিল না তখন অন্তত রাজসভা ছিল। সেই সভা তখন সর্বসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। সেই সভার মন হরণ করিতে পারিলে, সেই

সভার মধ্যে গৌরবের স্থান পাইলে সাহিত্য আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত। এখন সে সভাও নাই।

বঙ্গসাহিত্যের কোনো গৌরব নাই। কিন্তু সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশত তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকজনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে কিন্তু একত্রসংহত সর্বসাধারণের নিকট তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্রসংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই।

যে দেশে আছে যেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না, কারণ, যেখানে অনুভবশক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্বসাধারণে ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

য়ুরোপে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় আমরা বাঙালিরা তাহা নহি। অর্থাৎ, আমাদের একসঙ্গে আঘাত লাগিলে সর্ব অঙ্গে বেদনা বোধ হয় না। আমাদের সকলের মধ্যে বেদনাবহ বার্তাবহ আদেশবহ কোনো সাধারণ স্নায়ুতন্ত্র নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে সাধারণ সুখ-দুঃখ বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, এবং সাধারণ সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

এইজন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্তরের সহিত অনুভব করে না সে অভাব পূরণ করিয়া তাদের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে কর্তব্যবোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন কিন্তু সে চেষ্টা কোনো বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোনো আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যকপূরণজনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে-পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শৌখিন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ সেই সাহিত্যশৌখিন লোকগুলি প্রাচীনকালের রাজাদিগের ন্যায় সর্বত্রপরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।

হঙ্গেরিতে যে উৎসবের উল্লেখ করা যাইতেছে সে উৎসবের ক্ষেত্র সমস্ত জাতির হৃদয়রাজ্যে। হঙ্গেরীয় জাতি একহৃদয় হইয়া অনেক সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছে, সকলে মিলিয়া রক্তপাত করিয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছে, স্বদেশের কল্যাণতরণী যখন বিপ্লবের ক্ষুব্ধ সমুদ্রমধ্যে নিমগ্নপ্রায় তখন সমস্ত দেশের লোক এক ধ্রুবতারার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সেই দোদুল্যমান তরীকে উপকূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে; সেখানকার দেশীয় লেখক দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়াছে; বিপদের সময় আশা দিয়াছে, লজ্জার দিনে ধিক্‌কার এবং গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি করিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং সে দেশে রাজারানী হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই লেখকের নিকট পরমোৎসাহে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে ইহাতে আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই।

এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন-কি, ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে,

প্রজা সংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপে জর্মনি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষাশালা নাই এবং সেই-সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরিভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনসাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে স্বয়ং তরবারিহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন হঙ্গেরি দেশের মধ্যে সর্বত্র একটা জীবনস্রোত একটা কর্মপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত জাতির আত্মা সচেতনভাবে কাজ করিতেছে। সেখানে সৃজন করিবার শক্তিও সবল, গ্রহণ করিবার শক্তিও সজাগ। আমাদের দেশে কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো কার্য নাই, কোনো জীবনের গতি নাই, তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি শখ আছে মাত্র, আপাতত সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়।

'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' নামক য়োকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের সহিত লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। এই আশ্চর্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন লেখকের সহিত তাঁহার স্বদেশের কী যোগ। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল হইয়া উঠিতেছে লেখক সেইখানে কল্পনার জাল বিস্তারপূর্বক সজীব চরিত্রসকল আহরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালোমন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুতবেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ!

আমরা নিক্তি হস্তে লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর অপেক্ষা এক মাষা এক রতি পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কি না, আয়েষার ভালোবাসা ভ্রমরের ভালোবাসার অপেক্ষা এক চুল পরিমাণ উদারতর কি না, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয়ের মধ্যে কাহার চরিত্রে ভরি পরিমাণে মহত্ত্ব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি না, কোন্‌টা যথার্থ, কে মানুষের মতো, কে সজীব, কোন্ চরিত্রের মধ্যে হৃদয়স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।

তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে সুদূরব্যাপী কর্মস্রোত না থাকাতে সজীব মানব-চরিত্রের প্রবল সংস্পর্শ কাহাকে বলে তাহা আমরা ভালো করিয়া জানি না। মানুষ যে কেবল মানুষরূপেই কত বিচিত্র, কত বলিষ্ঠ, কত কৌতুকাবহ, কত হৃদয়াকর্ষক, যেখানে কোনো একটা কাজ চলিতেছে সেখানে সে যে কত কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেছে তাহা আমরা সম্যক্ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি না, সেইজন্য মনুষ্য কেবলমাত্র মনুষ্য বলিয়াই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আমাদের এই মন্দগতি ক্ষীণপ্রাণ কৃশহৃদয় দেশে মানুষ জিনিসটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহার স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্‌ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জীব তুলাদণ্ডে প্রাণহীন বাটখারা দ্বারা তাহাদের গুরুলঘুত্ব পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই হঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবশুদ্ধ কেমন সম্ভব কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনোটিই নৈতিক গুণ নহে, সকলগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী। 'বেসি' নামক এই গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখো, শাস্ত্রমতে সে যে বড়ো পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর ন্যায় সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী, কিছু না

হউক তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহ-নির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাণের পরিবর্তে তৃণে পরিপূর্ণ মিউজিয়ামের সিংহী যদি সহসা জীবনপ্রাপ্ত হয় তবে রক্ষকমহলে যেরূপ একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, 'বেসি'র ন্যায় নায়িকা সহসা বঙ্গ সাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেইরূপ একটা বিভ্রাট বাধিয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার এবং নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হইয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

য়ুরোপে হঙ্গেরির সহিত পোল্যান্ডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেখানে আধুনিক পোল-সাহিত্যের নেতা ছিলেন ক্রাস্‌জিউস্কি।— ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার রচনারম্ভের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব পরম সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি দান করে, কার্পাথীয় গিরিমালার একটি শিখরকে তাঁহার নামে অভিহিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন এবং দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার পাউন্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করে।

এ সম্মান শূন্য সম্মান নহে। সমস্ত জীবন দিয়া ইহা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছে। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাস রচয়িতা। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন পঠদ্দশাতেই তিনি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সহপাঠীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে দুই বৎসর কারাবাস যাপন করিয়া পুনর্বার তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্বক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কারাগারে অবস্থানকালে তিনি পোলীয়ভাষার প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পুনর্বার বিদ্রোহ অপরাধে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পল্লীগ্রামে পলায়নপূর্বক বহুকাল সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। এবং অবশেষে পোল্যান্ড ত্যাগ করিয়া ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি জর্মনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যুকালে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। সেখানেও বিস্মার্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে মৃত্যুর অনতিপূর্বে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন পর্বততুল্য কঠিন প্রতিভার দ্বারা আলোড়নপূর্বক কীরূপ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রমন্থন করিয়া এই পোলীয় মনস্বী অমরতাসুধা লাভ করিয়াছিলেন। পোল্যান্ডে একটি বৃহৎ জাতীয়-হৃদয় ছিল বলিয়া সেখানে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্যবীর এত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে সাহিত্য এমন প্রভূত বলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই লেখক-রচিত 'ইহুদী' নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হঙ্গেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা যেমন স্বদেশে সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।

আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন বিষণ্ণ সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানবহৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ

হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্তব্যের কঠিন খাদ্যখণ্ডে কোনোমতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখিতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে। বাহিরের প্রাণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রাণ দেয় না।

কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে সেই বিরাট ক্ষমতা শিশু আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনো সেই জাতি নাই যে উল্লাস প্রকাশ করিবে। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি। যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছে, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০১

মেয়েলি ব্রত

সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই-সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোনো সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও

ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোনোপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল-হৃদয়-পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ী ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই-সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ-আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই-সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনোপ্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গ দেশের জনসাধারণ-প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমারবাবু সেগুলি গ্রন্থ-আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্সিয়াং
৭ কার্তিক ১৩০৩

সাহিত্যের সৌন্দর্য

আদিত্য। সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না রচনার উপরে? লক্ষ্যের উপরে না লক্ষণের উপরে?

নগেন্দ্র। তুমি তো এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পার মানুষ বাম পায়ের উপর বেশি নির্ভর করে না ডান পায়ের উপর?

আদিত্য। মানুষ দুই পায়েরই উপর সমান নির্ভর করে এ যেমন স্পষ্ট অনুভবগোচর, সাহিত্য তার বিষয় এবং রচনাপ্রণালীর উপর সমান নির্ভর করে সেটা তেমন নিশ্চয় বোধগম্য নয় এবং এই কারণেই সাহিত্যে আজকাল কেহ-বা নীতিকে প্রাধান্য দেন, কেহ-বা সৌন্দর্যকে, কেহ-বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-প্রচারকে। সেইজন্যই আলোচনা উত্থাপন করা গেল।

মন্মথ। বেশ কথা। তা হইলে একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আলোচনা শুরু করা যাক। ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য যে 'গাইড'-বই রচনা করা হয় এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে বোধ করি কারও মতভেদ নাই।

আদিত্য। ভালো, মতভেদ নাই— গাইড-বই সাহিত্য নহে। কিন্তু ওই কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্তের বিষয় এক, কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ।

নগেন্দ্র। আমার মতে দুয়ের বিষয়েরই প্রভেদ। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি যেমন একই বস্তুকে ভিন্ন দিক দিয়া দেখে এবং সেইজন্য উভয়ের বিষয়কে স্বতন্ত্র বলা যায়, তেমনি গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দেশ-বিশেষকে ভিন্ন তরফ হইতে আলোচনা করে।

মন্মথ। গাইড-বইয়ে কেবলমাত্র তথ্যসংগ্রহ থাকে, ভ্রমণবৃত্তান্তে ভ্রমণকারী লেখকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান এবং তাহাতেই সাহিত্যের বিকাশ। ব্যক্তিত্ববর্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে, সাহিত্যে নহে।

আদিত্য। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, কিসে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। কেবলমাত্র তথ্য নিতান্ত সাদা ভাষায় বলা যায়, কিন্তু তাহার সহিত হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে গেলেই ভাষা নানাপ্রকার আকার-ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যানার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলা যায় না?

মন্মথ। কেবল রচনার ভঙ্গি নহে, দেখিবার সামগ্রীটাও বিচার্য। এমন-কি, কেবলমাত্র হৃদয়ের ভাবও নহে, কে কোন্ জিনিসটাকে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে তাহার উপরেও তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশ নির্ভর করে। কেমন করিয়া দেখিতেছে এবং কী দেখিতেছে এই দুটা লইয়াই সাহিত্য। কেমন করিয়া দেখিতেছে সেটা হইল হৃদয়ের এলাকা এবং কী দেখিতেছে সেটা হইল জ্ঞানের।

আদিত্য। তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্যের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ দেখিবার বিষয় আছে? অর্থাৎ, কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপে সাহিত্যের এবং কতকগুলি তাহার বহির্ভূত?

মন্মথ। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই— জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি আমাদের অনেকগুলি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে, বিজ্ঞান দর্শন এবং কলাবিদ্যা প্রভৃতিরা সেগুলোকে স্বতন্ত্ররূপে চরিতার্থ করে। বিজ্ঞানে কেবল জিজ্ঞাসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় কেবল সৌন্দর্যবৃত্তির পরিতৃপ্তি, কিন্তু সাহিত্যে সমস্ত বৃত্তির একত্র সামঞ্জস্য। অন্তত সাহিত্যের সেই চরম চেষ্টা, সেই পরম গতি।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর-একটু খোলসা করিয়া বলো, শুনা যাক।

মন্মথ। ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড় বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বিকাশ করা। জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি মানুষের যতগুলি উচ্চ প্রবৃত্তি আছে তাহার প্রত্যেকটার পরিপূর্ণ পরিণতির সহায়তা করা। আমার মতে শিক্ষাবিধানকে গৌণ করিয়া আনন্দ-উদ্রেককে মুখ্য করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে।

নগেন্দ্র। বেশ কথা। তাহা হইলে শেষে দাঁড়ায় এই যে, হৃদয়ের প্রতিই সাহিত্যের প্রধান অধিকার, মুখ্য প্রভাব। এ স্থলে নীতিবোধকেও আমি হৃদয়বৃত্তির মধ্যে ধরিতেছি। কারণ, সাহিত্যে হৃদয়পথ দিয়াই ধর্মবোধের উদ্দীপন করে, তর্কপথ দিয়া নহে।

মন্মথ। এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্যকে দুই খণ্ড করিয়া দেখা যায়। প্রথম, চিন্তার বিষয়রূপে; দ্বিতীয়, অনুভবের বিষয়রূপে। কিন্তু সাহিত্য সত্যকে আমাদের কাছে জীবন্ত অখণ্ড সমগ্রভাবে উপনীত করে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসারে আমরা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র বস্তু এবং ক্রিয়ার সমষ্টিরূপে মনে করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত বস্তু এবং ক্রিয়া এবং সৌন্দর্য -সহযোগে একটি অখণ্ড সত্তারূপে অনুভব করাইতে পারে যে-একটি একীভূত মানসিক শক্তি, সাহিত্যে সেই শক্তিরই বিকাশ।

নগেন্দ্র। সত্য হৃদয়ের দ্বারা কিরূপে অনুভব করা যায় বুঝিলাম না। প্রকৃতির সৌন্দর্যকেই বা কী হিসাবে সত্য বলা যায় ধারণা হইল না। সৌন্দর্য বিশেষরূপে আমাদের হৃদবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, এই কারণে তাহা বিশুদ্ধরূপে হৃদয়-সম্পর্কীয়। ইহাকে যদি সত্য নাম দিতে চাও তবে ভাষার জটিলতা বাড়িয়া উঠিবে। নদী-অরণ্য-পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার একটা বিভাগ হৃদয়-সম্পর্ক-বর্জিত, এইজন্য সেই বিভাগটাকে আমরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু তাহার যে দিকটা আমাদের হৃদয়ভাবকে উত্তেজিত করে সে দিকে সত্য-মিথ্যা উচিত-অনুচিত নাই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত বা উচিত নয় এমনও কোনো কথা নাই। সৌন্দর্য মানুষের মন এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যগত একটা সম্বন্ধ মাত্র। সে সম্বন্ধ সর্বত্র এবং সর্বকালে সমান নহে, সেইজন্যই সাধারণত তাহাকে বৈজ্ঞানিক কোঠা হইতে দূরে রাখা হয়।

মন্মথ। অনেক কথা আসিয়া পড়িল। আমার মোট কথাটা এই, সাহিত্যের বিষয় সুন্দর,

নৈতিক এবং যুক্তিসংগত। ইহার কোনো গুণটা বাদ পড়িলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ হয়।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের লক্ষ্য হইতেছে সৌন্দর্য। তবে যাহা আমাদের ধর্মবোধকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা আমাদের সৌন্দর্যবোধকেও আঘাত করে; কতকগুলি যুক্তির নিয়ম আছে তাহাকেও অতিক্রম করিলে সৌন্দর্য পরাভূত হয়। সেইজন্যই বলি, হৃদয়বৃত্তিই সাহিত্যের গম্যস্থান, নীতি ও বুদ্ধি তাহার সহায়মাত্র। অতএব, বিষয়গত সত্য এবং বিষয়গত নীতি অপেক্ষা বিষয়গত সৌন্দর্যই তাহার মুখ্য উপাদান; এবং সেই সৌন্দর্যকে সুন্দর ভাষা সুন্দর আকার-দানই তাহাতে প্রাণসঞ্চার।

আদিত্য। পুঁথির গহনা এবং হীরার গহনা গঠনসৌন্দর্যে সমান হইতে পারে কিন্তু ভালো গহনার উপকরণে পুঁথি দেখিলে আমাদের চিত্তে একটা ক্ষোভ জন্মিতে পারে; তাহাতে করিয়া সৌন্দর্যের পূর্ণফল নষ্ট করে। কবি বলিয়াছেন— 'বীর বিনা আহা রমণীরতন আর কারে শোভা পায় রে', তেমনি পাঠক-হৃদয় সাহিত্য ও সৌন্দর্যের সহিত বীর্যের সম্মিলন প্রত্যাশা করে। যথেষ্ট মূল্যবান গৌরববান বিষয়ের সহিত সৌন্দর্যের সমাবেশ না দেখিলে সেই অসংগতিতে পীড়া এবং ক্রমে অবজ্ঞা উৎপাদন করিতে পারে।

মন্মথ। ইহার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা এই যে, গঠনের মূল্য অপেক্ষা হীরার মূল্য নির্ণয় করা সহজ, সেইজন্য অধিকাংশ লোক অলংকারের অলংকারত্ব উপেক্ষা করিয়া হীরার ওজনেই ব্যস্ত হয় এবং যে রসজ্ঞ ব্যক্তি মূল্যলাভ অপেক্ষা আনন্দলাভকেই গুরুতর বলিয়া গণ্য করেন, নিক্তির মানদণ্ড-দ্বারা তাঁহাকে অপমান করিয়া থাকে। এই-সকল বৈষয়িক সাংসারিক পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াই এক-এক সময় রসজ্ঞের দল সাহিত্যের বিষয়গৌরবকে অত্যন্ত অবহেলাপূর্বক নিরালম্ব কলাসৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যুক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

সংগীত

সংগীত ও ভাব

অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফূর্তি বিকাশ পাইতেছে। সেই স্ফূর্তি, সেই উদ্যম, সে কাজে প্রয়োগ করিতে চায়— সে কাজ করিতে চায়। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে চলিতে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আরে, সর্বনাশ হইল! তুই উঠিস নে, তুই উঠিস নে! কে জানে কোথায় পড়িয়া যাইবি। তোর উঠিয়া কাজ নাই, তুই ঘুমা!' কিন্তু শিশুদেরও যে প্রকৃতি, নূতন সমাজেরও সেই প্রকৃতি। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন সে নব উদ্যমে খেলা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। পড়িবে না তো কী। প্রকৃতি যদি শিশুদের হৃদয়ে পড়িবার ভয় দিতেন, তবে তাহারা ইহজন্মে চলিতে শিখিত না। নব-উত্থান-শীল সমাজের হৃদয়েও পড়িবার ভয় নাই। যাহারা খুব ভালো করিয়া চলিতে শিখিয়াছে এমন-সকল বড়ো বড়ো বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজেরাই পড়িবার ভয় করুক; তাহাদের শক্ত হাড় দৈবাৎ একবার ভাঙিলে আর ঝট্ করিয়া জোড়া লাগিবে না। আমাদের শিশু সমাজ দশবার করিয়া পড়ুক তাহাতে বিশেষ হানি হইবে না; বরঞ্চ ভালো বৈ মন্দ হইবে না। তাই বলি, সমাজ একটা নূতন কাজে অগ্রসর হইবামাত্র অমনি দশজনে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া না আসে যেন! আসিলেও বিশেষ কোনো ফল হইবে না। রক্ষণশীল মা বলিতেছেন, তাঁহার ছেলেটি চিরকাল তাঁহার স্তন্যপান করিয়া তাঁহার ঘরে থাকুক। উন্নতিপ্রিয় পিতা বলিতেছেন যে, তাঁহার ছেলেটির উপার্জন করিয়া খাইবার বয়স হইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে বাহির হইতে রোজগার করিয়া আনুক। ছেলেটিরও তাহাই ইচ্ছা। আর তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এখন তাহাকে অস্বাস্থ্যকর স্নেহের জালে বদ্ধ করিয়া রাখা সুযুক্তিসংগত নহে।

আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি, সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু দিন দিন সংগীত-শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সংগীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না।

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই; বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই; অথচ তাহার স্বরের উচ্চনীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সমস্বরে একটি কথার পর আর-একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়তো ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থগুলিকে সম্যক্‌রূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায় কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্যসেবক চালকলাজীবী আলংকারিক সমালোচকেরা তাহাকে কী চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলংকারের পুঁথিখানা খুলিয়া বসেন— যত্নণত্ব

তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস সন্ধি মিলাইয়া যদি নিখুঁত বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে, তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবা-সূচক ঘাড় নড়ে। আমি সেদিন এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি চিঠি পাইয়াছিলাম; স্বাক্ষরিত নাম কিছুতেই পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ সে চিঠির উত্তর দিতে হইবে। কী করি, সে যেরূপে তাহার নামটি লিখিয়াছিল অতি ধীরে ধীরে আমি অবিকল সেইরূপ নকল করিয়া দিলাম। যদি নামটি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই নামটি লিখিতাম অথচ নিজের হস্তাক্ষরে লিখিতাম। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন আমি সাহেব হইতে চাই, অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কী করি? না, অ্যান্ড্রু-নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া অবিকল তাহার মতো কোর্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে যত্নপূর্বক আমার কোর্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি, ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে আমার নাকের ঠিক সেইখানে কালি দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ওই একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সংগীতশাস্ত্র নাকি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা নাকি আয়ত্ত করিতে পারি না, এইজন্য রাগরাগিণী বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্ট্‌বাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমী' তৈরি করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাংলার আকাশে উঠিয়াছে; আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন— প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। যেমন টাকা নানাপ্রকার সুখ পাইবার উপায় মাত্র, কিন্তু অনেকে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া টাকা পাইতে চান। রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়— সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে 'আমার আহ্লাদ হইতেছে' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়। তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে

দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না। আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন— আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমনি কী ঘুষ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন ও ভাব বেচারিকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', আর একজন বলেন 'নীরসতরুরুহ পুরতো ভাতি'।

কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো। কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না, এমন-কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন— পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর-একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।

কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই— ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই—

রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা-কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে-একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কী স্বাভাবিক? না, যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না, অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য, অঙ্গভঙ্গির কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভূক্ত যাহা-কিছু তাহা নৃত্যের বহির্ভূক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সংগীত কৌশলপ্রকাশের স্থান নহে, ভাবপ্রকাশের স্থান; যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত; যাহা-কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম। একপ্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়; সে রূপ কবিতা কৌশলপ্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র— সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী-আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব প্রকাশ করা, সংগীতে আলাপও সেইরূপ। কিন্তু pantomime-এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব

প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক ; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুর-বিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এইখানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়তো খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। মনে করুন, একজন হাঃ বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব— হ'-এ আকার ও বিসর্গ, হাঃ। কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বাচৌড়া কবিত্বসূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনো রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিশ্বাসের মতো। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'!

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না!

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা

(হর্বার্ট্ স্পেন্সরের মত)

'সংগীত ও ভাব'-নামক প্রবন্ধ রচনার পর হর্বার্ট স্পেন্সরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম 'The Origin and Function of Music'-নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।

স্পেন্সর সংগীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে যে, তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশিতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছটফট করে। রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ, শরীরের মাংসপেশিসমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মস্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কী যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশি দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে-সকল মাংসপেশি শরীরের অন্যান্য পেশিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি তখন অধরের সমীপবর্তী মাংসপেশি সংকুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায় বিশেষ বিশেষ মনোভাব- উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশি ও কণ্ঠের শব্দনিঃসারক মাংসপেশিতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ -অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশিসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য-বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষা উঁচু বা নিচু স্বরে কথা কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশির বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে, বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন শান্তভাবে কথাবার্তা কহিয়া থাকি, তখন আমাদের কথার স্বর অনেকটা

একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচুনিচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচুনিচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নিচু হইতে খুব উঁচু পর্যন্ত উঠানামা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারও প্রতি রাগ করিয়া বলি, 'এ তোমার কী রকম স্বভাব?' 'এ' শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও 'স্বভাব' শব্দটায় কতটা নিচুসুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়, স্বরে সুরের আভাস থাকে; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্‌সর বলিতেছেন— আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর-পোষণ, মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখসাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গলসাধন হয়, যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয়— ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদমাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল-প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। 'ধরন' বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচুনিচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা-কিছু কথায় বলে, হৃদয় 'ধরন' দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরন তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরনের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরনে তাহার উল্টা বুঝায়। 'বড়োই বাধিত করলে!' কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কীরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই একসঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরন পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান

করা যায়। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে, ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়নশাস্ত্র বস্তুনির্মাণবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তুনির্মাণবিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে, তেমনি সংগীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সংগীতের এই কার্য।

অনেকে হয়তো সহসা মনে করিবেন এ কার্য তো অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্যজাতির সুখবর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গি আমাদের হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব-সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবনসঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে, সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র যে বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে যে, যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সর্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বপরায়ণ ভাব-সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাব-সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে— তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্য দেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-সকলও তাহাতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট। একজন অভদ্র যাহা বলে একজন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে, অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা একজন ভদ্রের অনুভাবের চর্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার ঠিক সুরগুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠস্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ সংগীত যাঁহারা চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী আছে?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয় তাহার কারণ বোধ করি অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই-সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুরসমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভালো সংগীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই তো গেল স্পেন্‌সরের মত।

স্পেন্‌সরের মতকে আর-এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন রুগ্‌ণ, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিত ভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে— যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাব-সকল অসংকোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। মনুষ্যসমাজের তিনটি অবস্থা আছে। সমাজের বাল্য অবস্থায় মানুষ হৃদয় আচ্ছাদন করিয়া রাখে না, তাহারা দোষকে দোষ বলিয়া জানে না; যখন দোষ গুণ বিচার করিতে শিখে অথচ বহুকালক্রমাগত অসংযত স্বভাবের উপর একেবারে জয়লাভ করিতে পারে না, তখন সে আপনার হৃদয়কে নিতান্ত অনাবৃত রাখিতে লজ্জা বোধ করে; যখনি সমাজ অনাবৃত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল তখন বুঝা গেল সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; অবশেষে যখন এই গোপন চিকিৎসার ফল এতদূর ফলিল যে ঢাকিয়া রাখিবার আর-কিছু রহিল না, তখন পুনর্বার প্রকাশ করিবার কাল আইসে। আধুনিক সভ্যতার গোপন রাখিবার ভাব উত্তীর্ণ হইয়া যখন ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রকাশ করিবার কাল আসিবে, তখন প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইবার কথা। অনুভাব-প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতিই সংগীত। একজন মানুষের জীবনে তিনটি করিয়া যুগ আছে। প্রথম— বাল্যকালে সে যাহা-তাহা বকিয়া থাকে, তাহার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। দ্বিতীয়— তাহার শিক্ষার কাল, এই কাল তাহার চুপ করিয়া থাকিবার কাল। প্রবাদ আছে, চুপ না করিয়া থাকিলে কথা কহিতে শিখা যায় না। এখন চুপে চুপে তাহার চরিত্র, তাহার জ্ঞান গঠিত হইতেছে, এখনো গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয়— কথা কহিবার কাল। চুপ করিয়া সে যাহা শিখিয়াছে, এখন সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ভাব পরিণত হইয়াছে, ভাষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজেরও সেই তিন অবস্থা আছে। প্রথমে সে যাহা-তাহা বকে, ঈষৎ জ্ঞান হইলেই যাহা-তাহা বকিতে লজ্জা বোধ হয়। সেই সময়টা চুপচাপ করিয়া থাকে। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাহার সে লজ্জা দূর হয়, তখন তাহার ভাষা পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়। অনুভাব সম্বন্ধে বর্তমান সভ্যতার সেই লজ্জার অবস্থা, চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা। এখন যাহা কথা বলে ছেলেবেলা অপেক্ষা অনেক ভালো বলে বটে, কিন্তু ঢাকিয়া বলে— যাহা মনে আসে তাহাই বলে না। কণ্ঠস্বরে যেন ইতস্ততের ভাব, সংকোচের ভাব থাকে, সুতরাং পরিস্ফুটতার ভাব থাকে না। সুতরাং এখনকার অনুভাবের ভাষা ছেলেবেলাকার ভাষার অপেক্ষা অনেক ভালো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভালো নহে। এমন অবস্থা আসিবে, যখন অনুভাবের ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখনকার ভাষা, বোধ করি, এখনকার সংগীত। এখন যেমন জ্ঞান প্রকাশের স্বাধীনতা হইয়াছে— freedom of thought যাহা পূর্বে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া ঠেকিত, যাহা সমাজ দমন করিয়া রাখিত, এখন তাহা সভ্যদেশে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত

হইয়াছে এবং জ্ঞান প্রকাশের ভাষাও বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিশ্চয় এমন কাল আসিবে, যখন অনুভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইবে— পরস্পরের মধ্যে অনুভাবের আদানপ্রদানের বিশেষরূপ চর্চা হইবে ও সেইসঙ্গে আবেগের ভাষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে— তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে-ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড়প্রতিমা আমাদের দেবদেবীমূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে-কোনো গায়ক-কুম্ভকার সংগীত গড়িয়াছে, প্রায় সেই একই ছাঁচে গড়িয়াছে। এইটুকু মাত্র তাহার বাহাদুরি যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ-মূর্তির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র তফাত হয় নাই— এমনি তাহার হাত দোরস্ত! মনসা শীতলা ওলাবিবি ও সত্যপীর প্রভৃতির ন্যায় দুই-চারিটা মাত্র প্রাদেশিক ও যাবনিক মূর্তি নূতন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও প্রাণশূন্য মাটির প্রতিমা। সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজবৃক্ষের শাখায় শুদ্ধ মাত্র অলংকারস্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখিতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর-কিছু উপকার করে না, কেবল শোভাবর্ধন করে।

শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক— অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়— যথাযথ রেখাবিন্যাস-দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি-সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্রশিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

শিল্প

[মন্দিরপথবর্তিনী]

''ম্হাত্রে'' উপাধিকারী একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র ''মন্দিরপথবর্তিনী' (To the Temple) নামক একটি রমণীমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখের ও পার্শ্বের দুইখানি ফোটোগ্রাফ ভারতীয় শিল্পকলার গুণজ্ঞপ্রবর সার্ জর্জ্জ বার্ড্‌বুড়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রটিকে য়ুরোপে শিক্ষাদানের সুযোগ করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তদুত্তরে উক্ত ভারতবন্ধু ইংরাজমহোদয় এই মূর্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহাতে প্রকাশ করেন, এই মূর্তিখানি গ্রীক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এবং বর্তমান য়ুরোপীয় শিল্পে ইহার উপমা মেলা দুষ্কর। তাঁহার মতে যে শিল্পী য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখিয়া নিজের প্রতিভা হইতে এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্‌ভাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বে তাহাকে বিলাতে শিক্ষাদান না করাই শ্রেয়, কারণ য়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রী, বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।

এইখানে বলা আবশ্যক, বার্ড্‌বুড় সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মূর্তিটি প্রস্তরমূর্তি নহে, তাহা প্যারিস-প্লাস্টারের রচনা মাত্র। দ্বিতীয়ত, ম্হাত্রে বোম্বাই আর্টস্কুলে য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই দুই ভ্রম উপলক্ষ করিয়া চিজ্‌হলম্ নামধারী কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান 'পায়োনিয়র' পত্রে বার্ড্‌বুড় সাহেবের প্রতি কুটিল বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন— এবং ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও তাহাকে খর্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কেন, অনারব্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভারতবর্ষীয় কাহারও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে আমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ড্‌বুড় সাহেব -কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতশিল্প' পত্রিকায় পূর্বোক্ত দুটি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। তাহা বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। রমণীর উত্তান বাম বাহুতে একটি থালা ও অধোলম্বিত দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র ঊরুদেশে সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণজানু সুন্দর ভঙ্গিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া সুকুমার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরণীতল স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার দেবীতুল্য গঠনলাবণ্য নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কুটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত। তরুণ মুখখানি আমাদের ভারতবর্ষেরই মুখ; সরল, স্নিগ্ধ, শান্ত এবং ঈষৎ সকরুণ। সবসুদ্ধ চিত্রখানি বিশুদ্ধ, সংযত এবং সম্পূর্ণ।

এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙক্ষা প্রতিক্ষণে চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটি আদর্শকে মূর্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।

দেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি অনেক দেখা যায় কিন্তু তাহা প্রাকৃত চিত্র। অর্থাৎ যাহারা প্রতিদিন ঘরে বাহিরে সঞ্চরণ করে, খায় পরে, আসে যায়, জন্মায় মরে তাহাদেরই প্রতিকৃতি। যে নারী আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের সাহিত্য সংগীতে নিত্যকাল জাগ্রত, বংশানুক্রমে চিরপ্রবহমান ভারতীয় নারীগণের মধ্যে স্থির হইয়া অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি বৈদিককালে সরস্বতীতীরে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে নবীনা ছিলেন এবং যিনি অদ্য লৌহশৃঙ্খলিত গঙ্গাকূলে

নবরাজধানীর ড্রয়িংরুম সোফাপর্যঙ্কেও তরুণী, সেই ভাবরূপিণী ভারত-নারী, যিনি সর্বকালে ভারতব্যাপিনী হইয়াও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন— তাঁহাকে প্রত্যক্ষগম্য করা আমাদের চিত্তের কামনা, আমাদের শিল্পের সাধনা। যে শিল্পী কল্পনামন্ত্রে সেই দেহের অতীতকে মূর্তির দ্বারা ধরিতে পারেন তিনি ধন্য।

ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির ছবিখানি দেখিলে মনে হয়, যে শুদ্ধশুচি ভক্তিমতী হিন্দুনারী চিরদিন মন্দিরের পথে গিয়াছে এবং চিরদিন মন্দিরের পথে যাইবে, এ সেই নামহীন জন্মহীন মৃত্যুহীন রমণী— ইহার সম্মুখে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য তীর্থদেবালয়, ইহার পশ্চাতে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য গৃহপ্রাঙ্গণ।

এই ছবির মধ্যে গ্রীসীয় শিল্পকলার একটা ছায়া যে পড়ে নাই, তাহা নহে। কিন্তু দেশীয় শিল্পীর প্রতিভাকে তাহা লঙ্ঘন করে নাই। বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক অনুকরণ বলে না। ইহাকে বরঞ্চ স্বীয়করণ নাম দেওয়া যায়। এইরূপ পরেরকে নিজের, বিদেশেরকে স্বদেশের, পুরাতনকে নূতন করিয়া লওয়াই প্রতিভার লক্ষণ।

ইংরাজি আর্টস্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই ছাত্রটির শিল্পবোধ উদ্‌বোধিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের বা ক্ষোভের কোনো কথা নাই। এবং তাহা হইতে এ কথাও মনে করা অকারণ যে, তবে তাহার রচনা মূলত য়ুরোপীয়।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাহাকে বলে শেক্‌স্‌পিরীয় যুগ তাহা তৎকালীন ইতালীয় ভাব-আন্দোলনের সংঘাত হইতে উদ্ভূত। তখন দেশীবিদেশীর সংস্রবে ইংরাজি সাহিত্যে খুব একটা আবর্ত জন্মিয়াছিল— তাহার মধ্যে অসংগত, অপরিণত, অপরিমিত, অনাসৃষ্টি অনেক জিনিস ছিল— তাহা শোভন সুসম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে অল্প সময় লয় নাই। কিন্তু সেই আঘাতে ইংলন্ডের মন জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং সাহিত্যকলার অনেকগুলি বাহ্য আকার প্রকার, ছন্দ এবং অলংকার ইংরাজ আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। তাহাতে ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই, বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমাদের মনকেও সুগভীর নিশ্চেষ্টতা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি নূতন এবং প্রবল ভাবপ্রবাহের সংঘাত আবশ্যক হইয়াছিল। পশ্চিমের বেগবান ও প্রাণবান সাহিত্য ও শিল্পকলা সেই আঘাত করিতেছে। আপাতত তাহার সকল ফল শুভ এবং শোভন হইতে পারে না। এবং প্রথমে বাহ্য অনুকরণই স্বভাবত প্রবল হইয়া উঠে— কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, অসংগতির মধ্যে সংগতি আনিবে— এবং সেই বিদেশী বন্যায় আনীত পলিমাটির ভিতর দিয়া দ্বিগুণ তেজে আপনারই শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত, পুষ্পগুলিকে বিকশিত, ফলগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিবে।

ইহা না হইয়া যায় না। আমাদের চতুর্দিকের বিপুল ভারতবর্ষ, আমাদের বহুকালের সুদূর ভারতবর্ষ, আমাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভারতবর্ষকে নিরস্ত করিবার জো নাই। নূতন শিক্ষা ঝড়ের মতো বহিয়া যায়, বজ্রের মতো পতিত হয়, বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়ে, আমাদের ভারতবর্ষ ধরণীর মতো তাহা গ্রহণ করে— কতকটা সফল হয়, কতকটা বিফল হয়, কতকটা কুফলও হয়, কিন্তু সমস্ত ফলাফলের মধ্যে ভারতবর্ষ থাকিয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা ইংরাজি হইতে অনেক বাহ্য আকার প্রকার লাভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে যেগুলি, অন্তরের ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাই থাকিয়া যাইবে। উপন্যাস লিখিবার ধারা আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে পাইয়াছি, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকের হস্তে সে উপন্যাস সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস হইয়াছে। সূর্যমুখী বাঙালি, ভ্রমর বাঙালি, কপালকুণ্ডলা ঘরের সংস্রব ছাড়িয়া, মনের মধ্যে পালিতা হইয়াও কোনো ছদ্মবেশধারিণী ইংরাজি রোমান্সের নায়িকা নহে, সে বাঙালি বনবালিকা।

আসল কথা, প্রতিভা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায়। নূতন-চাষ-করা আধহাত গভীর জমির মধ্যে

শিকড় ঠেলিয়া, একটি বর্ষার ধারা এবং একটি শরতের রৌদ্র লইয়া অর্ধবৎসরের মধ্যে সে আপন জন্মমৃত্যু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারে না। অনেক নিম্নে এবং অনেক দূরে তাহাকে অনেক শিকড় নামাইতে হয় তবেই সে আপনার উপযোগী রস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে। সেই সুদূর এবং গভীর বন্ধন স্বভাবতই স্বদেশ ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না। যতই শিক্ষা লাভ করি বিদেশের সহিত আমাদের উপরিতলের সম্বন্ধ— তাহার সর্বত্র আমাদের গতি নাই, আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু যুগ-যুগান্তর ও দূর-দূরান্তরের নিগূঢ় ও স্বাভাবিক সম্বন্ধবন্ধন ব্যতীত বৃহৎ প্রতিভা কখনো আপনাকে দাঁড় করাইতে আপনাকে চিরজীবী রাখিতে পারে না। এইজন্য প্রতিভা স্বতই আপন স্বদেশের মর্মের মধ্যে মূল বিস্তার করিয়া সার্বলৌকিক আকাশের মধ্যে শিরোত্তোলন করিয়া থাকে।

কেবল সাহিত্যের প্রতিভা কেন, মহত্ত্বমাত্রেরই এই লক্ষণ। বাহ্য অনুকরণ, বিদেশীয় ধরনধারণের তুচ্ছ আড়ম্বর, এমন-কি, বিজাতীয় বিলাসবিভ্রমের সুখস্বচ্ছন্দতায় বৃহৎ হৃদয় কখনোই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

বিলাতি সমাজে বিলাতি ইতিহাসে যাহা গভীর, যাহা ব্যাপক, যাহা নিত্য— নকল বিলাতে তাহা যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হউক তাহা শুষ্ক সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাহাতে উদার হৃদয়ের সমস্ত খাদ্য ও সমস্ত নির্ভর নাই। এইজন্য আমাদের যে-সকল বাঙালি অকস্মাৎ আপাদমস্তক সাহেবিয়ানায় কণ্টকিত হইয়া চতুর্দিককে জর্জরিত করিয়া তোলেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, সাহেবের বারান্দায় বিলাতি টবে মেমসাহেবের বারিসিঞ্চনে তাঁহারা একটি একটি সৌখিন চারা পল্লবিত হইয়া দড়িবাঁধা অবস্থায় শূন্যে ঝুলিতেছেন— দেশের মাটির সহিত যোগ নাই, অরণ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং সেই বিচ্ছেদসূত্রেই তাঁহাদের অহংকার এবং দোদুল্যমান অবস্থা।

কিন্তু অল্প খোরাকে যাহার চলে না, বহুমূল্য বিচিত্র চিনের টব অপেক্ষা দরিদ্র দেশের মাটি তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অতএব শিক্ষার দ্বারা দ্বিগুণ বল ও নূতন ক্ষমতা লাভ করিলেও যথার্থ প্রতিভা স্বতই আপন প্রাণের দায়ে আপন নাড়ির টানে স্বদেশ হইতেই আপন অমৃতরস সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ম্মাত্রে যদি যথার্থ প্রতিভাশালী হন, তবে তাঁহার জন্য ভাবনার কারণ নাই— তিনি তাঁহার রচনায়, তাঁহার প্রতিভাবিকাশে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় থাকিতে বাধ্য— তাঁহার আর অন্য গতি নাই। যদি তাঁহার প্রতিভা না থাকে তবে অসংখ্য ক্ষুদ্র অনুকারীদলের মধ্যে ক্ষমতা-বিকারের আর-একটি দৃষ্টান্ত বাড়িলে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ দেখি না।

কিন্তু শিক্ষা এবং রীতিমতো শিক্ষা আবশ্যক। উপকরণের উপর সম্পূর্ণ দখল না থাকিলেই অনুকরণের নিরাপদ গণ্ডির বাহিরে পদার্পণ করিতে বিপদ ঘটে। অল্প সাঁতার জানিলে ঘাটের আশ্রয় ছাড়িতে পারা যায় না, তটের কাছাকাছি ঘুরিতে ফিরিতে হয়। সকল বিদ্যারই যে একটি বাহ্য অংশ আছে তাহাকে একান্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই তাহাকে স্বাধীন ব্যবহারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশের অনুকূল করা যায়। ভাস্কর্যবিদ্যার বাহ্য নিয়ম কৌশল এবং কারিগরিটুকু যখন ম্মাত্রের অধিকারগত এবং অনায়াসগম্য হইবে, তখন তাঁহার স্বদেশীয় প্রতিভা স্বাধীন সঞ্চরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার রচনায় যখন-তখন পরকীয় আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়িবে এবং তিনি অনুকরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু ম্মাত্রে দরিদ্র ছাত্র। য়ুরোপের শ্বেতভুজা শিল্প-সরস্বতী তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের পরপার হইতে আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, বালক সে আহ্বান আপন অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তাহার পাথেয় নাই। যদি কোনো গুণজ্ঞ বিদেশী তাহার য়ুরোপীয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে— এবং স্বদেশী বিদেশী কেহই যদি প্রস্তুত না হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

রুক্মিণীকান্ত নাগ নামক একটি বাঙালি ছাত্র কিছুদিন ইটালিতে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে অনাহারে দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত আশা অকালে অবসান হয়। আমাদের এই শিল্পদরিদ্র দেশের পক্ষে এ মৃত্যু যেমন লজ্জাজনক তেমনি শোকাবহ।

অনেকে হয়তো জানেন না, শশিভূষণ হেশ নামক কলিকাতা আর্ট-স্কুলের একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ছাত্র য়ুরোপে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাহার সমস্ত খরচ জোগাইতেছেন। সেজন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ম্হাত্রেও য়ুরোপে শিল্পশিক্ষালাভের অধিকারী— অসামান্য ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এক্ষণে দেশের লোক যদি আপন কর্তব্য পালন করে তবে বালকের উন্মুখী প্রতিভা পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়া দেশের লোককে ধন্য, ভারতবন্ধু বার্ড্‌বুডের উৎসাহবাক্যকে সার্থক এবং চিজ্‌হল্‌ম্‌ প্রমুখ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণের বিদ্বেষবিষাক্ত অবজ্ঞাকে অনন্তকালের নিকট ধিক্‌কৃত করিয়া রাখিবে।

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

মন্দিরাভিমুখে

ম্হাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাস্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে (To the Temple)। এই ব্যাপারটুকু লইয়া ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গেছে।

স্যর জর্জ বার্ড্‌বুড় সাহেবের নিকট এই মূর্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ পাঠানো হয়। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া তিনি তাঁহার 'জর্নাল অফ ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড ইন্ডস্ট্রিজ' নামক শিল্পবিষয়ক পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মূর্তিটিকে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তি-সকলের সহিত তুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

হয়তো সহৃদয় বার্ড্‌বুড় সাহেব তাঁহার ভারতবৎসলতা ও ভারতীয় শিল্পকলার ভাবী উন্নতি কল্পনার আবেগদ্বারা নীত হইয়া এই মূর্তি সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিয়াছিলেন, সে কথা বিচার করা আমাদের সাধ্য নহে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন। ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে মূর্তিটি খড়ি দিয়া গঠিত। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন ইহা পাথরের মূর্তি। অবশ্য উপকরণের পার্থক্যে শিল্পদ্রব্যের গৌরবের তারতম্য ঘটে এবং সেইজন্য খড়ির মূর্তির সহিত প্রাচীন পাথরের মূর্তির তুলনা করা হয়তো সংগত হয় নাই।

এই ছিদ্রটি অবলম্বন করিয়া কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখক 'পায়োনিয়র' কাগজে বার্ড্‌বুডের সমালোচনার বিরুদ্ধে এক সুতীব্র বিদ্রূপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র -রচিত খড়ির মূর্তি লইয়া ইংরাজি সাময়িকপত্রের রঙ্গভূমিতে দুই ইংরাজ যোদ্ধার মধ্যে একটি ছোটোখাটো রকম রক্তপাত হইয়া গেছে।

আমরা যে এ স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচারে অবতীর্ণ হইব এমন ভরসা রাখি না। আমরা একে আনাড়ি, তাহাতে পক্ষপাতী— আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় নবীন শিল্পীর রচনাকে কিছু বেশি করিয়াই মনে করি তবে আশা করি ভারতের নিমকে পালিত তীব্রতম ভারতবিদ্বেষীও তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবেন না।

অপরপক্ষে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতো দীনহীন সম্প্রদায় আপাতত অল্পেই সন্তুষ্ট হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোক আছে—

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সংপূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদি গুরুলঘুতয়ার্থেষু, ধনিনাম্
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সংকোচয়তি চ॥

অর্থাৎ, দীন ব্যক্তি এইটুকু ইচ্ছা করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, তাহার যবের সঞ্চয়টুকু কিছু বাড়ুক, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন তখন তিনি ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখেন। অতএব অর্থ সম্বন্ধে গুরুলঘুতার কোনো একান্ততা নাই; ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো বড়ো করিয়া তোলে কখনো বা ছোটো করিয়া আনে।

আমাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের কোনো তরুণ প্রতিভান্বিত শিল্পী -রচিত মূর্তি প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তির সমকক্ষ না হইলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। যখন আমাদের তেমন দিন আসিবে, যখন ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখিবার মতো অবস্থা আমাদের হইবে, তখন আমাদের ভালোমন্দ তুলনীয় বাটখারাও ওজনে বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। অতএব য়ুরোপের কাছে যে জিনিস ছোটো আমাদের কাছে সে জিনিস যথেষ্ট বড়ো— কারণ ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো ছোটো করে, কখনো বড়ো করিয়া তোলে।

মাদ্রাজবাসী চিত্রশিল্পী রবিবর্মার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহা যে পরিমাণ আনন্দ আমাদিগকে দান করিয়াছিল, ভাবী সমালোচকের অপক্ষপাত বিচারে তাহার সে পরিমাণ উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা বুভুক্ষিতের রিক্তস্থালীর উপর যবের মুষ্টি বর্ষণ করিয়াছিল— আপাতত সেই যবমুষ্টি ভবিষ্যতের পূর্ণোদর ব্যক্তির স্বর্ণমুষ্টির চেয়ে বেশি।

রবিবর্মার ছবিতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কী সমস্ত অসম্পূর্ণতা আছে, সে-সকল বিচার আমরা যখন উপযুক্ত হইব, তখন করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের যে আনন্দ তাহা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যসম্ভোগের আনন্দ নহে, তাহা আশার আনন্দ। আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষের নিদ্রিত অন্তঃকরণের এক প্রান্তে সৌন্দর্যরচনার একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা যতই অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ হউক-না-কেন, তাহা অত্যন্ত বিরাট আকারে আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই যে-সকল যুগের ইতিহাসপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেছে, যে সময়ে এক অপূর্ব শিল্পচেষ্টা ভারতের নির্জন গিরিগুহায় এবং দেবালয়ের পাষাণপুঞ্জমধ্যে আপনাকে অমরসুন্দর-আকারে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছিল, সেই মূর্তিগড়া, মন্দিরগড়া, সেই ভাবুকস্পর্শে-পাথরকে-প্রাণ-দেওয়া যুগ ভবিষ্যতের দিগন্তপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি-বা আমাদের সূর্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবত সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোনো-এক সূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনো ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনোই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলন্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গোরুর মতো দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং

তাঁহাদের দুগ্ধ জোগাইবার জন্য আছে, কিড্‌ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই এ কথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরি করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইঁহারাই জগতে সভ্যতার শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্‌সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পুনর্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড়ো বড়ো জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মতো দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকারমধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমতো জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ম্লাত্রে-রচিত মূর্তিখানি দেখিয়া একজন বিদেশী গুণজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক যখন উদারভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন তখন শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতই মূঢ় হই, আশার পুলকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের একটা মহৎ সুযোগ এই যে তাহার ভাষা সর্বজনবিদিত। অবশ্য তাহার সূক্ষ্ম গুণপনা যথার্থভাবে বুঝিতে বিস্তর শিক্ষা এবং চর্চার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে শুদ্ধমাত্র প্রত্যক্ষ করিতে বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করিতে হয় না। এইজন্য ইহা বিনা-পরিচয়েই সমস্ত জগৎসভার মধ্যে আসিয়া খাড়া হইতে পারে। অদ্য আমাদের মধ্যে যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করের অভ্যুদয় হয় তবে কল্যই তিনি বিশ্বলোকে প্রকাশলাভ করিবেন।

অতএব ভারতবর্ষ যদি শিল্পকলায় আপন প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে তবে জগৎ-প্রাসাদের একটা সিংহদ্বার তাহার নিকট দ্রুত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

এ কথা অত্যন্ত প্রচলিত যে, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজ্যতে।' যে বিদ্যার এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা আছে তাহা বিদ্বানকে পূজার যোগ্য করে। আমাদের দেশের পট-আঁকা যে চিত্রবিদ্যা তাহা প্রাদেশিক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য কেবলমাত্র সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন আমাদের চিত্রবিদ্যাকে আমরা সর্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিব, তখন সর্বজনসভায় স্থানলাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বে প্রসারিত হইবে।

ইহার উদাহরণ বাংলা সাহিত্য। অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাঁচালি এবং কবির গানে এ সাহিত্য প্রাদেশিক ছিল। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী লেখকগণ এই সাহিত্যকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। এখন এ সাহিত্য বাঙালির মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। এখন এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালি জ্ঞানের স্বাধীনতা, কল্পনার উদারতা এবং হৃদয়ের বিস্তার অনুভব করিতেছে। এই সাহিত্যে বাঙালির হৃদয়ে বিশ্বহিতৈষা, দেশানুরাগ এবং একটি গভীর বিপুল ও অধীর আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এখন এ

সাহিত্যের মধ্যে ভালো ও মন্দ, সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের যে আদর্শ আসিয়াছে তাহা প্রাদেশিক নহে তাহা সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষা কেবল ভারতবর্ষের একটি অংশের ভাষা। এ ভাষা যদি ভারতের ভাষা হইত এবং বঙ্গসাহিত্য যদি ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোকের হৃদয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিত, তবে ইহার মধ্যে যে কিছু অনিবার্য সংকোচ ও সংকীর্ণতা আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এ সাহিত্য কী বিপুল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং জগতের মধ্যে কী বিপুল বল প্রয়োগ করিতে পারিত। এখনো যে বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব, প্রবল স্বাতন্ত্র্য ও গভীর পারমার্থিকতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ, অল্প লোকের সম্মুখে ইহা বিদ্যমান। এবং সেই অল্প লোক যদিও য়ুরোপীয় ভাবুকতার ব্যাপক আদর্শ বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছেন তথাপি তাহা যথার্থ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদের সাহিত্যকে ক্ষুদ্রভাবে দেখেন, তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্‌ভ্রান্ত খেয়াল ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার সহিত বিচার করেন। সাহিত্য বাহিরের আকাশ হইতে যথেষ্ট আলোক ও বৃষ্টি পাইতেছে কিন্তু সমাজের মৃত্তিকা হইতে প্রচুর আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

সেজন্য আমরা নৈরাশ্য অনুভব করি না। কারণ, সাহিত্য গাছেরই মতো বৎসরে বৎসরে কালে কালে আপনারই পুরাতন চ্যুত পল্লবের দ্বারা আপনার তলস্থ ভূমিকে উর্বরা করিয়া তুলিবে।

কিন্তু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ খাদ্য নহে তথাপি তাহাদের একটা সুবিধা এই আছে যে, যেদিন তাহারা আপনার প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনই তাহারা বিশ্বলোকের। সেদিন হইতে আর তাহাদিগকে ব্যক্তিগত অহমিকা ও সম্প্রদায়গত মূঢ়তার মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। সমস্ত জগতের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহারা আপনাকে দেশকালের অতীত করিয়া তুলিতে পারে।

অদ্য মহারাষ্ট্রদেশে কোনো নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা বাঙালিরা জানি না এবং জানিতে গেলেও যথেষ্ট শিক্ষা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ম্হাত্রে-নামক একটি মারাঠি ছাত্র যে খড়ির মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহার প্রতিমূর্তি আমরা প্রদীপের পত্রে বাঙালির সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, বুঝিতে ও উপভোগ করিতে কাহারও কোনো বাধা নাই। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে মারাঠিরা আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া এখনো জানেন না, কিন্তু ম্হাত্রে যদি আপনার প্রতিভাকে সবলা করিয়া তুলিতে পারেন তবে অবিলম্বেই তিনি আমাদের ম্হাত্রে হইবেন।

আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, কিন্তু তাহাকে সমালোচনা বলে না। এইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ মূর্তি আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ কল্পনা করা যে কী অসামান্য ক্ষমতার কর্ম তাহা আমাদের মতো ভিন্ন-ব্যবসায়ীর ধারণার অগোচর। তাহার পরে সেই কল্পনাকে আকার দান করা— কোনো ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দিবার জো নাই, অঙ্গুলির নখাগ্রও নয়, গ্রীবাদেশের চূর্ণ কুন্তলও নয়— কাপড়ের প্রত্যেক ভাঁজটি, প্রত্যেক অঙ্গুলির ভঙ্গিটি স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে ও প্রত্যক্ষ করিয়া গড়িতে হইবে। মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই। তাহার পরে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বসনভূষণ ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির বিন্যাস পর্যন্ত সবটা মিলাইয়া মানবদেহের একটি অপরূপ সংগীত একটি সৌন্দর্যসামঞ্জস্য কল্পনার মধ্যে এবং সেখান হইতে জড় উপকরণপিণ্ডে জাগ্রত করিয়া তোলা প্রতিভার ইন্দ্রজাল। বামপদের সহিত দক্ষিণ পদ, পদন্যাসের সহিত দেহন্যাস, বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্ত, সমস্ত দেহলতার সহিত মস্তকের ভঙ্গি এইগুলি অতি সুকুমার নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া তোলাই দেহসৌন্দর্যের ছন্দোবন্ধ। এই

ছন্দোরচনার যে নিগূঢ় রহস্য তাহা প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করই জানেন এবং ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসনভূষণ বেশবিন্যাস এবং উদ্যতলঘুসুন্দর ভঙ্গিটির মধ্য হইতে সেই বিচিত্র অথচ সরল সংগীতটি নীরবে উর্ধ্বদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন করিয়া একটি শুভ্র বিকচ রজনীগন্ধা আপন উদ্যত বৃন্তটির উপর ঈষৎ-হেলিত সরল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনিশীথের নক্ষত্রলোকমধ্যে পরিপূর্ণতার একটি রাগিণী প্রেরণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম সমালোচনা করিতে গেলে কতকটা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, তাহাতে কোনো পাঠকের কিছুমাত্র লাভ হইবে কিনা সন্দেহ।

মূর্তিটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার পত্রে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার বয়স বাইশ মাত্র। তিনি জাতিতে সোমবংশী ক্ষত্রিয়। ম্হাত্রে দেশীভাষা শিক্ষার পর ইংরাজি অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছবি আঁকা শিখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা বোধ করাতে অন্য-সকল পড়া ছাড়িয়া ম্হাত্রে বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সকল পরীক্ষাতেই ভালোরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বারংবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে মধ্যে মধ্যে মূর্তি প্রদর্শন করাইয়া ম্হাত্রে অনেকগুলি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। 'মন্দিরাভিমুখে' নামক মূর্তি রচনা করিয়া ম্হাত্রে বরোদার মহারাজার নিকট হইতে ২০০্ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন; এই মূর্তিটি বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয় ১২০০্ টাকায় ক্রয় করিয়া চিত্রশালায় রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ মূর্তির কীরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহা আমাদের পক্ষে বলা অসাধ্য, কিন্তু ম্হাত্রে ইহাকে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সম্ভবত ইহা যৎকিঞ্চিৎই হইবে।

তরুণ শিল্পী আমাদের দেশে ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার আদর নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ আক্ষেপ করিবার বিষয় অনেক আছে অতএব এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে কোনোপ্রকার সান্ত্বনা দিতে পারি না। যখন আমাদের দেশে গুণী বাড়িবে এবং ধনীও বাড়িতে থাকিবে তখন ধনের দ্বারা গুণের আদর পরিমিত হইতে পারিবে। আপাতত আধপেটা খাইয়া আধা-উৎসাহ পাইয়া এমন-কি, গুণহীন অযোগ্যব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষ-কুশাগ্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে সকল অবস্থাই অনুকূল, সেখানে বড়ো হইয়া বিশেষ গৌরব নাই। আধুনিক য়ুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রলেখক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের সেই প্রতিকূলতাও বশীভূত শত্রুর ন্যায় প্রতিভাকে বহুতর বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছে।

দুই-একজন পার্সি ভদ্রলোক কাজ দিয়া ম্হাত্রেকে সাহায্য করিতেছেন। ম্হাত্রে আশা করেন বঙ্গভূমিও এরূপ সাহায্যদানে কৃপণতা করিবেন না।

প্রদীপ

পৌষ ১৩০৫

ধর্ম/দর্শন

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্মের বিরোধী। এইজন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সংকুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুলবুলের লড়াইয়ে যেমন পাখিতে পাখিতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয়পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধকরি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয়পক্ষীয়মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনো স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁও-কষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিতভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণ মাত্র স্থানের বেশি অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন-চারি হাত জমির বেশি তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন-চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সংকীর্ণতা -জনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞব্যক্তি যদি বলেন— এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কী! কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লও-না কেন?— তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মতো কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগণ্ডূষ জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাত কী? আমি যেন বলপূর্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম— কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটা তো আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই— আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' আমরা দুর্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়ো না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর

সমস্তই পথ— অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়ো না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্যস্ফূর্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে— অলংকারশাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা। ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলংকারশাস্ত্রসর্বস্ব পদ্য রচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সংকীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না— মনুষ্যপ্রকৃতিরই এই ধর্ম।

যেখানে চক্ষুর কোনো বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারি দিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কী করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণকাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম— তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না। কিন্তু আমি না কি স্বাধীনভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেইজন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সংকোচ বিসর্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস— ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য-স্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিণত হউক। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখশান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস করো অসীমে বিচরণ করো, পরিবর্তনশীল বিকারশীল আচ্ছন্নকারী

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিয়ো না। সূর্যকিরণের অধিকাংশই সৌরজগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভালো! মুক্ত সূর্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্রবিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্তন করিয়া লই— দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোটো দেখি মনে তাহাকে বড়ো করিয়া লই— চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি-বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্বতোভাবে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড়ো দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড়ো আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না— তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি-বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না— কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্বে কিংবা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ভাবে সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে করুন, আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে— কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।— সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এইজন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য— এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মতো বিশ্রাম স্থল, শিশুর মতো আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিশ্রাম লাভ করি— সেখানে সকল চেষ্টার অবসান— সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবলমাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তোলা

অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়া আবার তর্ক করিব কী! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত, অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা, অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এইজন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষাচিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসীমতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধুলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে— আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ করো, আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে ভক্ষণ করো, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ করো। কিন্তু ভাব প্রধান (suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইশারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা পণ্ডি হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্যস্বভাববশত সহজেই বলিতে পারে 'আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি' তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোনো আবশ্যক নাই— কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

'চরণচ্ছায়ায় আছি' বলিতে গেলেই অমনি যে রক্তমাংসের একজোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোনো কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মতো টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু

তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোনো মহা পণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোনো বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, একজোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন। কিন্তু কবি যদি কেবল ইশারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশি ঝোঁক দিতেন, যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গির সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক জোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মতো একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না— কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মতো মুখ ও পদ্মের মতো করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোনো তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্তি কল্পনা করেন না, কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর-একটি কথা। কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলংকারশূন্য। অলংকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে— মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া নায়ক লান্‌সলট্ কুমারী গিনেবিবকে মহারাজের সহধর্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন— কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না— এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই ও জ্ঞানের পরিবর্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি— অবশেষে ভ্রম ভাঙিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এইজন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সংগত বলিয়া কোনোমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য হই, সুচতুর ব্যাখার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখি এবং তাহার চাকচিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্‌কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা তো ধর্মের সহিত চালাকি করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্যেরা অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র।

কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়— ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক, যদি কোনো ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোনোমতেই গৃহকার্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি, তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচজনকে বলে গৃহকার্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। একজন বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না— তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমতো পুতুল দুটিকে সত্যকার কর্তা-গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে-সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই-সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার এই-সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তিসাধন, আর-একটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য ভালোরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুতুল লইয়া খেলা করো। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা করো। যতটা পার তাই ভালো, কারণ ইহা জীবনের কর্তব্য কার্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোনো ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিষ্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোনো পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এইজন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই?

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কী করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু

আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কী করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই। সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর-কোনো সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যান্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যান্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেইটুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক— তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙালি, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য— তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র ইত্যাদি— এক কথায়, তিনি যে কত কী তাহার ঠিকানা নাই— কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা কাহাকে বলে তাহাও সে ভালো করিয়া জানে না)— শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে, ইহাতে ক্ষতি কী! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে, না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যেরূপ সত্য ইহাও সেইরূপ সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি— এইজন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি— ন্যায় দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস, অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কী করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি 'ভূমৈব সুখং' ভূমাই সুখস্বরূপ, কোনো সীমা কোনো ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই— তা হইলে অনর্থক পর্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯২

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা

(উদ্‌বোধন)

গতরাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারি দিক নিস্তব্ধ হইল। বিশ্বচরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু

বিশ্বজননী শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেষ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীবশরীরের যে-কোনো অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর-সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন— যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত— দিবারাত্রিই তাঁহার কার্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন— তাঁহার এই সংস্কারকার্য কেমন গোপনে, বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখসৌন্দর্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহাশিল্পী সেই মহারহস্যের আবরণ ক্রমশ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানবশিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীশাবকের শরীর গঠন করেন— তিনি বীজকোষে থাকিয়া বৃক্ষলতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন— তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন করো— যখন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না— যখন সেই স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল— প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল— সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহাপ্রাণের বিরাম নাই— জগতের মৃত্যু নাই।— তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র— তাহা প্রাণের লীন অবস্থা— তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জাগৃহ মাত্র। ইহলোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্বার নবসাজে সজ্জিত হইয়া জীবনরঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব-উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ওই দেখো পূর্ব দিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্রভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুমরাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নববর্ষের উৎসবে আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি— এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৮১০ শক। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি
(Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এককালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল, অথচ ধর্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎসৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর-একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখিন হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপপুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভালো হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না। অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গলকার্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২২। ১১। ৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, চন্দ্রনাথবাবু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় 'সাধনা'য় চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথবাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, 'পূর্ব প্রবন্ধে এ কথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক'— দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোনো ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয়মাত্র চন্দ্রনাথবাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা

যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চন্দ্রনাথবাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে। অতএব, চন্দ্রনাথবাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথবাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা আকারে যদিও বৃহৎ কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি-একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ 'তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধহয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ'। তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ 'আত্মসম্প্রসারণ'। স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন, লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, 'পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাঘাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস।' 'বিশ্বের সৌন্দর্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।' 'প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।'

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথবাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার প্রবলতা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। একভাবে হ্রাস হইয়া আর-একভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সর্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড়ো বড়ো অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড়ো 'বিরাট' অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনো প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম

হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণতির পর্যায় আছে। কিন্তু 'হাঁ'-কে বড়ো করিয়া 'না' করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। 'সৃষ্টিকৌশলের' মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কী করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন— তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথবাবু কী বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন। সে যাহাই হৌক, সৌন্দর্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কী করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সেজন্য চন্দ্রনাথবাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্বোধ ছাত্র-বালকের মতো নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোনো কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কীরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথবাবু বঙ্কিমবাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন— নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিত বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোনো জাতিবিশেষের একমাত্র কর্তব্য-কর্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে 'বিরাটভাব' চর্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথবাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতই তিনি

অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন।

সাধনা
আষাঢ় ১২৯৯

নব্য লয়তত্ত্ব

'সাহিত্যে' চন্দ্রনাথবাবু 'লয়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হওয়াতে সাধনা পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনাকালে আমরা ভিন্ন মত ব্যক্ত করি। তাহা লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা 'সাহিত্য'-পাঠকদিগের অগোচর নাই। বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথবাবুর যে-একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহার মতের সহিত যখন আমাদের বিরোধ তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। তিনি নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত কোনো মতভেদ হইবে না, এমন কথা কী করিয়া বলিব! বিশেষত, ইতিহাসে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, 'চিনি হতে চাই নে রে, ভাই, চিনি খেতে ভালোবাসি!' অর্থাৎ, 'বিরাট হিন্দু'র 'বিরাট লয়' তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় নহে, এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য অহংব্রহ্মবাদীর প্রতি কীরূপ বিরক্ত ছিলেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া ভারতে দ্বৈতবাদী হিন্দুর সংখ্যা বিরল নহে। পূর্বোক্ত হিন্দু মহাপুরুষদিগের সহিত যখন চন্দ্রনাথবাবুর মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন ভরসা করি আমার ন্যায় লোকের পক্ষেও তাঁহার সহিত মতবিরোধ প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেটাকে আমি তাঁহার স্বরচিত লয়তত্ত্ব বলিয়াছি, ইহাতেই তিনি কিছু অধিক রাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। অতএব ও কথাটা ব্যবহার না করিলেই ভালো করিতাম, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের আসল কথাটাই বলা হইত না। শাস্ত্রে যে একটা লয়তত্ত্ব আছে, বিশেষরূপে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করা বাহুল্য— কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।

এমনতরো স্বতোবিরোধী কথা শাস্ত্রে থাকিবেই বা কী করিয়া? লয় অর্থে আত্মসম্প্রসারণ, নির্গুণ অর্থে সগুণ, এ-সব কথা নূতন ধরনের। প্রথমত, আত্মসম্প্রসারণ বলিতে কাহার প্রসারণ বুঝায়, সেটা ঠিক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম তো আছেনই; আমি যদি আপনাকে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবে না— তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি থাকিবেন। আর আমি? আমি তখন থাকিব না। কারণ, আমি যদি থাকি তো আমাতে ব্রহ্মেতে ভেদ থাকে; আর আমি যদি না থাকি, তবে সম্প্রসারণ হইল কাহার? ব্রহ্মেরও নহে, আমারও নহে।

প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদীগণ আত্মপ্রসারণ নহে, আত্মসংহরণ করিতে উপদেশ দেন। 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' বলিয়া, সমস্ত উপাধি হইতেই তাঁহারা আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে যে আমি ভাবিতেছে তাহাকেও বিলুপ্ত করিয়া দেন; জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় -ভেদ দূর করিয়া দেন—

'নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, কর্মের দ্বারা কখনোই এই লয়সাধন হয় না, কারণ কর্ম এবং অবিদ্যা

অবিরোধী। কর্ম হইতে কর্ম, অনুরাগ হইতে অনুরাগেই লইয়া যায়। এইজন্য শংকরাচার্য বলেন—

'অবিরোধিতয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ।'

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সে লয় প্রাপ্তির পক্ষে কর্মসোপান 'একান্ত আবশ্যক।' তাহার কারণ, চন্দ্রনাথবাবু ব্রহ্মকে মুখে বলেন নির্গুণ, ভাবে বলেন সগুণ; মুখে বলেন লয়, কিন্তু তাহার অর্থ করেন সম্প্রসারণ।

আবার বলেন, লয়তত্ত্ববাদীরা 'যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বলো দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন।' অর্থাৎ চন্দ্রনাথবাবুর মতে জগৎটা প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, শুক্তিকাকে যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মোহমুদ্‌গরের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলেরই নিকট সুপরিচিত—

অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রা
ব্রহ্মাপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ,
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

তাহা ছাড়া, 'তুলনায় মিথ্যা' বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। মিথ্যা মাত্রেই তুলনায় মিথ্যা। মিথ্যার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, তবে তো সে সত্যই হইত।

অতঃপর সগুণ নির্গুণ লইয়া তর্ক।

লয়তত্ত্ববাদীরা ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্য, মুক্ত ও নির্মল বলিয়া থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন— 'ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং।' অর্থাৎ অনুরাগ ছাড়িয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের অনুরূপ হওয়া যায়।

এদিকে আবার অন্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে ভক্তবৎসল বলেন। সে ঈশ্বর উদাসীন নহেন, কারণ তিনি পাপীর প্রতি ভীষণ ও পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন। তিনি দৈত্যকে দলন করেন ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি নানা অবতার রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কেবল যদি তিনি চিদানন্দময় হন, কেবল যদি তাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ হয়, তাঁহার যদি আর কোনো গুণ, আর কোনো স্বরূপ না থাকে এবং তাঁহার নিকট তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থান না পায় (যথা— জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে। চিদানন্দৈকরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥), তবে ঈশ্বর রুদ্র, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু জগৎকে ঈশ্বরের 'সৃষ্টিকৌশল' 'ভগবানের লীলা' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, যদি ইহা তাঁহার লীলাই না হইবে, যদি তাঁহার সৃষ্টিই না হইবে, যদি নিতান্ত মায়া এবং অসৎ হইবে, তবে ইহাকে পণ্ডিতেরা কেন এত ভয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা যদি ভগবানের লীলা হয়, সৃষ্টি হয়, তবেই বা ইহাকে ভয় করিতে হইবে কেন; তাঁহার লীলা কি দানবের লীলা? তাঁহার সৃষ্টি কি শয়তানের সৃষ্টি? জগৎ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে ইচ্ছা কি মঙ্গল ইচ্ছা নহে?

অতএব, যদি বল জগৎ তাঁহার ইচ্ছা নহে জগৎ সত্য নহে, তবেই বুঝিতে পারি মিথ্যা জগৎকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধনা কর্তব্য, কিন্তু যদি বল জগৎ তাঁহার লীলা অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তবে সে ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

যাঁহারা প্রথমোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা জগৎ হইতে জগৎবাসীদের মন ফিরাইবার জন্য ক্রমাগত বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। জগতের যে অংশ হীন তাহারই প্রতি তাঁহারা ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এমন-কি, সৌন্দর্যকে কদর্য বীভৎসভাবে আঁকিতেও চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে প্রেম কপটতামাত্র; যে পর্যন্ত ধনোপার্জনে শক্তি থাকে, পরিজনগণ সেই

পর্যন্তই অনুরাগ দেখায়, জরাজর্জর হইলে কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না। মানবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আছে, সে প্রেমের ছবি তাঁহারা গোপন করিয়া যান। তাঁহারা বলেন—

'অয়মবিচারিতচারুতয়া
সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।'

অর্থাৎ, যে-সকল চারুতা দ্বারা সংসারকে রমণীয় বোধ হয়, সে-সকল চারুতা বিচারের চক্ষে তিরোহিত হইয়া যায়।

এই-সকল লয়তত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্য দিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই, জগৎ হইতে জগৎবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, জগতের প্রতি বারংবার এত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মানবের অকৃত্রিম প্রেমের মধ্যে, বিশ্বজগতের চিরনূতন চারুতার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রেম এবং ঐশ্বর্য নির্দেশ করা তাঁহাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধ। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁহাদের জগৎ মায়া।

কিন্তু বৈষ্ণবেরা জগতের সৌন্দর্যকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে ভীত হন নাই এবং তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে সুন্দর বলেন, ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার বংশীধ্বনি, তাঁহার প্রেমসংগীত, আমাদের প্রতি তাঁহার আহ্বান। ভক্ত এবং ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্র না থাকেন, তবে এ সৌন্দর্য কিসের সৌন্দর্য, কাহার কাছে সৌন্দর্য! চন্দ্রনাথবাবু যে 'বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্যের' কথা বলিয়াছেন, লয়তত্ত্বে সে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? কারণ, ভেদজ্ঞানমাত্রেই মায়া— ভেদজ্ঞান ব্যতীত সৌন্দর্যের কোনো অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, যেহেতু সৌন্দর্য অনুভবসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে যতক্ষণ সুন্দর বলিব, ততক্ষণ ভক্তকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্বীকার করা বৈ আর গতি নাই। এইজন্য চন্দ্রনাথবাবু ব্যতীত কোনো লয়তত্ত্ববাদী ব্রহ্মকে সুন্দর বলেন না। তাঁহারা বলেন—

অনণ্বস্থূলহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথবাবু যাহাকে 'বিরাট লয়' বলেন, তাহা লয় নহে আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃতপক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে এবং বহু সাধনার পর চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কারণ, আত্ম হইতে পর এবং পর হইতে পরমাত্মার প্রতি আত্মার প্রসারণ— এবং জগৎ হইতে জগদীশ্বরের অসীম সৌন্দর্যের উপলব্ধি, বোধ করি, জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতেরই লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন, বোধ করি, খৃস্টানধর্মেরও উপদেশ। ঈশ্বরচরিত্রকে আদর্শ করিয়া আপন ক্ষুদ্রতা পরিহার করা খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রধান অনুশাসন এবং সকল উন্নত ধর্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু যদি ইহাকে লয়তত্ত্ব নাম দেন তবে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করিব, বলিব— লয়কে লয় অর্থে ব্যবহার না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিলে কোনো ফল নাই, বরঞ্চ বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা; অতএব যখন তিনি 'আত্মসম্প্রসারণ'-নামক একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত শব্দে তাঁহার মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হইতেছে, তখন ওই শব্দটাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে 'সাধনা'র সমালোচক এবং 'সাহিত্যে'র পাঠকগণকে কোনোরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।

সাহিত্য
ভাদ্র ১২৯৯

[সুখ না দুঃখ]
উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে— তিনি মনে মনে দুঃখকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার তো কোনো গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না— জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশি হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব-নিকাশ হয় না।

ধর্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে-ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোনোমতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোনো মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট অনেক দৈন্য আছে যাহার কোনো মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত সংকীর্ণ শ্রীহীন করিয়া দেয়— দুর্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে— আমরা তাহার কোনো কারণ, কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিসকে তাহার চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একত্র করিলে পর্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্তমান। আমরা আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভারে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্মন অধ্যাপক ডাক্তর পৌল্‌ ডয়সেন্‌ সাহেবের মত 'সাধনা'র পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রাচীন দর্শনের কেবল ঐতিহাসিক গৌরব আছে মাত্র। যথার্থ সাংখ্যমতাবলম্বী অল্পই দেখা যায়; ন্যায় শুদ্ধমাত্র ব্যাকরণ এবং অঙ্কশাস্ত্রের মতো বুদ্ধির চর্চা এবং কৌশল প্রকাশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখনো প্রত্যেক চিন্তাপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় মন জীবন্তভাবে অধিকার করিয়া আছে। যদিচ রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভ -কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত হইয়াছে তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিকদের মধ্যে বারো-আনা অংশই শংকরাচার্যের অনুগামী।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দরিদ্র ভারতবর্ষের বিপুল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহাই একটি মহৎ সান্ত্বনার কারণ। কারণ অনিত্য বিষয়ের অপেক্ষা নিত্য বিষয়ের গৌরব অধিক; এবং পৃথিবীতে নিত্য সত্য অন্বেষণ-চেষ্টায় মানবের প্রতিভা যত কিছু অমূল্যতম পদার্থ সঞ্চয় করিয়াছে শংকরাচার্যের বেদান্তভাষ্য তাহার অন্যতম; উহা প্লেটো এবং কান্টের রচনার সহিত তুলনীয়।

শংকর উপনিষদকে ধ্রুব প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য উপনিষদের নানা বিরুদ্ধ মতের সমন্বয়সাধনপূর্বক তাহা হইতে একটি আদ্যোপান্ত সুসংগত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার হয় নাই। উপনিষদের স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে রঞ্জিত করা হইয়াছে আবার তিনি অনির্বচনীয় ও মনের অগম্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন— কোথাও বা ব্রহ্ম কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করা যায় আবার কোথাও বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মায়া ইহাও কথিত হইয়াছে। কোথাও বা আত্মার সংসারভ্রমণের বিচিত্র কল্পনা দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা উক্ত হইয়াছে আত্মা কেবল একমাত্র।

শংকর এই-সকল বিরুদ্ধ বচনের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে পথ কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি উপনিষদের সমস্ত উক্তি হইতে দুইটি শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন— একটি কেবল নিগূঢ় দার্শনিক, ইংরাজিতে যাহাকে esoteric কহে, শংকর যাহাকে কখনো বা সগুণা বিদ্যা কখনো বা পারমার্থিকা অবস্থা কহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যাহা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণাগম্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব, শংকর ইহাকে সগুণা বিদ্যা, ব্যবহারিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহা সর্বসাধারণের জন্য, যাহারা রূপ চাহে স্বরূপ সত্য চাহে না, পূজা করে ধ্যান করে না!

অধ্যাপক মহাশয় এই দুইটি, এক্সোটেরিক্‌ এবং এসোটেরিক্‌— ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিদ্যাকে চারি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।

প্রথম।	ব্রহ্মতত্ত্ব	Theology
দ্বিতীয়।	জগত্তত্ত্ব	Cosmology
তৃতীয়।	অধ্যাত্মতত্ত্ব	Psychology
চতুর্থ।	পরকালতত্ত্ব	Eschatology

১। ব্রহ্মতত্ত্ব

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি সর্বব্যাপী আকাশ, তিনি সূর্যমধ্যস্থ দেবতা, তিনি চক্ষুরন্তর্গত পুরুষ; দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ; তিনি জগদাত্মারূপে মহতোমহীয়ান এবং জীবাত্মা-রূপে অণোরণীয়ান্‌; তিনি বিশেষরূপে ঈশ্বর, মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারবিধাতা।

শংকর এই-সমস্ত বর্ণনাকে তাঁহার সগুণা বিদ্যার মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা নহে,

ভক্তির দ্বারা নিত্য-সত্যের নিকটবর্তী হইবার জন্য এই-সকল বিদ্যা উপযোগী, এবং ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ফল আছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন যে, লক্ষ করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে বর্ণন সেও সগুণা বিদ্যার অন্তর্গত, সেও সাধারণের জন্য, তাহাতে পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায় না; বস্তুত যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় গুণ (personality) বলিতে কী বুঝায়, তাহার সীমা কতই সংকীর্ণ, তাহা অহংকারের সহিত কত নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট, তখন ব্রহ্মের প্রতি গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে খর্ব করিতে কে ইচ্ছা করিবে?

এই সগুণা বিদ্যার সহিত পরমাত্মার নির্গুণা বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রভেদ। ব্রহ্ম মনুষ্যের বাক্যমনের অতীত ইহাই তাহার মূল সূত্র।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

পুনশ্চ—

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ -ধৃত— নেতি নেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে যত প্রকার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিতে যে-কোনো বাক্য প্রয়োগ কর, তাহার উত্তর, ইহা নহে, ইহা নহে। সেইজন্য রাজা বাষ্কলি যখন বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না— শান্তোহয়মাত্মা, পরমাত্মা শান্ত। আমরাও এক্ষণে কান্টের শিক্ষামতো জানিয়াছি যে, আমাদের মনের প্রকৃতিই এমন যে কিছুতেই আমরা দেশকাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে জানিতে পারি না। অথচ তিনি আমাদের অপ্রাপ্য নহেন তিনি আমাদের হইতে দূরে নাই, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমগ্রত আমাদের আত্মারূপেই রহিয়াছেন। এবং আমরা যখন বহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎসংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে ব্রহ্মে আসিয়া উপনীত হই— জ্ঞানের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা, আপনার মধ্যে আপনার সংহরণের দ্বারা।[১] জ্ঞানে এবং অনুভবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে পরন্তু অনুভবে উভয়ে সম্মিলিত ইয়া যায়। অনুভবের দ্বারা আমি ব্রহ্ম এই ধারণা লাভ করার অবস্থাকে শংকর 'সম্রাধন' কহিয়াছেন।

২। জগত্তত্ত্ব

জগত্তত্ত্বেরও দুই বিভাগ আছে, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিদ্যায় জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-কর্তৃক তাহার সৃষ্টিকাহিনী বিচিত্র কল্পনা-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু অনন্তকাল অনর্থক যাপন করিয়া সহসা কালের একটি বিশেষ অংশে অবস্তু কারণের দ্বারা বস্তু-জগতের সৃষ্টি কেবল যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে তাহা বেদান্তের একটি প্রধান মতের বিপরীত, যে মতে আমাদিগকে 'সংসারস্য অনাদিত্বম্' জন্ম-মৃত্যুর অনাদি স্বভাব শিক্ষা দিয়া থাকে। শংকরাচার্য সুন্দর কৌশলে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি কেবল একবার হয় নাই, অনন্তকাল যাবৎ ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে এবং লয় পাইতেছে। কোনো সৃষ্টিকেই আমরা আদি সৃষ্টি বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার নিজের গৌরব প্রচারের জন্য? এরূপ অহংকার

---

১. এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, ইংরাজি knowledge শব্দ জ্ঞান অর্থে এখানে অনুবাদ করিলাম।—অনুবাদক

তাঁহাতে আরোপ করা সংগত নহে। তাঁহার নিজের খেলার জন্য? কিন্তু অনন্তকাল তো তিনি এই খেলনকব্যতীত যাপন করিয়াছেন। জীবনের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত? কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্বে তাহার প্রতি প্রীতি কীরূপে সম্ভব হইবে, এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন করার মধ্যে প্রীতির লক্ষণ কি দেখা যায়?— ব্যবহারিক বেদান্ত পুনঃপুনঃ-জগৎসৃষ্টির একটি ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা (moral necessity) দেখাইয়া এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শংকর কহেন— মনুষ্য উদ্ভিদের ন্যায়। অল্পে অল্পে বর্ধিত হইয়া অবশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। শস্যের চারা যেমন মরিবার পূর্বে বীজ রাখিয়া যায় এবং সেই বীজ আপন গুণানুসারে নূতন চারা উৎপন্ন করে, তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকালে আপন কর্ম রাখিয়া যায়, সেই কর্ম পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া দণ্ডপুরস্কার বহন করে। কোনো জন্ম প্রথম নহে কারণ তাহা পূর্ববর্তী কর্মের ফল, এবং শেষ নহে কারণ তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে। অতএব সংসার অনাদি অনন্ত এবং প্রলয়ের পরে জগতের পুনঃসৃজন ধর্মনিয়মানুসারে আবশ্যক।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শাস্ত্রোল্লিখিত এই সংসার যদিচ পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্যের কাল্পনিক ছবি। কারণ, সত্যকে স্বরূপভাবে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। এই পুনঃপুনঃ-জন্মমৃত্যুবাদকে কাল্পনিক কেন বলিতেছেন? না, যাহা যথার্থত দেশকালের অতীত সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে দেশকালের ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হইতেছে। নির্গুণ বিদ্যা হইতে সগুণ বিদ্যা যত দূরে, সত্য হইতে এই সংসার তত দূরে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে অনন্ত সত্য আছে বটে কিন্তু তাহা সত্যের রূপকমাত্র, যেহেতু রূপক ব্যতীত মনুষ্যবুদ্ধিতে সত্যের ধারণা হইতেই পারে না। ব্যবহারিক বেদান্ত এই রূপক লইয়া এবং পারমার্থিক বেদান্ত রূপগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত।

পারমার্থিক বিদ্যা কহিতেছেন, যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মায়ামাত্র, নিকটে আসিলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ যে মায়ামাত্র তাহা তর্কের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা জানা যায়। নিজের আত্মগুহায় প্রবেশ করিয়া যখন দেশকালাতীত নির্বিকার শুদ্ধসত্যের অনুভব হয় তখন তদ্‌ব্যতীত আর সমস্তই স্বপ্নরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণ এই পথে গিয়াছিলেন এবং গ্রীসীয় তত্ত্বজ্ঞানী প্লেটো, তিনিও এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ ছায়ামাত্র এবং সত্য ইহার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। প্লেটো এবং বৈদান্তিক উভয়ের মতের আশ্চর্য ঐক্য আছে কিন্তু উভয়েই কেবল আত্মপ্রত্যয়দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন আপন মত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইস্থানে জর্মন পণ্ডিত কান্ট আসিয়া গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। কান্ট বৈদান্তিক ও প্লাটোনিক আত্মপ্রত্যয়ের পথ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানবমনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কান্ট দেখাইয়াছেন যে, বাহ্য জগতের তিন মূল পদার্থ দেশ, কাল এবং কার্যকারণসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যসত্তার অনাদি অনন্ত ভিত্তিভূমি নহে, তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁচ মাত্র। তাহা বাহিরে নাই আমাদের মনে আছে ইহা কান্ট এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শোপেনহৌয়ার পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এই যে জগৎকে দেশে ব্যাপ্ত, কালে প্রবাহিত এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতেছি তাঁহাদের মতে ইহা কেবল আমার মনের কার্য মাত্র। শংকর কহেন, জগৎ মায়া; প্লেটো কহেন জগৎ ছায়া; কান্ট কহেন, জগৎ আমাদের মনের প্রতীতি মাত্র সত্য পদার্থ নহে। পৃথিবীর তিন বিভিন্ন প্রদেশে এই এক মত দেখা দিয়াছে কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেবল কান্ট-দর্শনের মধ্যেই আছে।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ব

সকলই মায়া, কেবল আমার আত্মা মায়া হইতে পারে না। শংকরাচার্য দেখাইয়াছেন আপনাকে অস্বীকার করিতে গেলেও স্বীকার না করিয়া থাকিবার জো নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী। তাঁহার পরবর্তী রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভের মত শংকর পূর্বে হইতেই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না কারণ ব্রহ্ম অংশরহিত (অংশ বলিতে হয় কালের পর্যায়, নয় দেশের সংস্থান বুঝায়)। জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ আমরা অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। জীব ব্রহ্মের বিকার হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নির্বিকার (কান্টের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত)। সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশও নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রও নহে, ব্রহ্মের বিকারও নহে— পরন্তু সম্পূর্ণতা স্বয়ং পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তে বেদান্তবাদী শংকর, প্লেটো-দর্শনবাদী প্লোটিনোস্ এবং কান্ট-দর্শনবাদী শোপেনহৌয়ার ঐক্য লাভ করিয়াছেন। শংকর অপর দুই দার্শনিক হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কহেন আমার আত্মাই যদি স্বয়ং ব্রহ্ম হইল তবে সুতরাং সর্বব্যাপকতা, নিত্যতা এবং সর্বশক্তিমত্তাও আমার আছে। (অর্থাৎ, আমি দেশকাল এবং কার্যকারণবন্ধনের অতীত।) শংকর কহেন, যেমন, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গোপন থাকে তেমনি এ-সকল শক্তিও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, মুক্তির পরে তাহার প্রকাশ হয়।

কেনই বা প্রচ্ছন্ন থাকে?

শংকর কহেন উপাধি-সকল তাহার কারণ।

উপাধি কী কী? না, মন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং তাহার পঞ্চ শাখা, এবং সূক্ষ্ম শরীর। ইহারাই জন্মে জন্মে আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে।

উপাধিত্রয় কোথা হইতে আসিল? মায়া হইতে। আবার মায়ার উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। কিন্তু এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কী? ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ইহার সদুত্তর দেন নাই। কান্ট কহিতেছেন, তুমি অবিদ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? অবিদ্যার কারণ থাকিতেই পারে না। যেহেতু এই সংসারের মধ্যেই কার্যকারণসূত্রের অবসান— সংসারের বাহিরে কার্যকারণের শাসন নাই— অতএব অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, এই দুঃখ পাপ অজ্ঞান হইতে আমাদের মুক্তিপথ আছে।[১]

৪। পরকালতত্ত্ব

এক্ষণে, সংসার হইতে যে মুক্তির পথ আছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক।

বেদের প্রাচীন শ্লোকে প্রথমে স্বর্গ এবং পরে নরকের কথা আছে কিন্তু সংসারবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ কোথাও দেখা যায় না।

বেদান্তে স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জন্ম উভয় মতই মিশ্রিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে পুণ্যকারীগণ পিতৃযান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ চন্দ্রলোকে গমন করেন সেখানে আপন সৎকর্মের ফল নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর ব্রহ্মালোকে গমন করেন, পৃথিবীতে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা যে-ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন তিনি সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যদিচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না তথাপি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত পাপকারীদের জন্য নরক যন্ত্রণা এবং তদবসানে বারংবার নীচজন্মভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

---

১. শংকরাচার্য কহিতেছেন— অজ্ঞানং কেন ভবতীতিচেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ং। অজ্ঞান কাহা হইতে হয়? কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়। —অনুবাদক

কিন্তু এই জগৎ এবং সংসার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সত্য যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে।

পারমার্থিক বেদান্তমতে এই জগৎ এবং সংসার কিছুই সত্য নহে, সত্য কেবল ব্রহ্ম যিনি আমাদের আত্মারূপে উপলব্ধ হন। 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের দ্বারায় যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে, এই জ্ঞানই মোক্ষ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।

যখন শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সর্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায় তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

নিঃসন্দেহ কোনো লোক কর্ম ব্যতীত প্রাণ.ধারণ করিতে পারে না, জীবন্মুক্তও নহে। কিন্তু তিনি জানেন যে, সকল কর্মই মায়াময় এইজন্য কর্মে তাঁহার আসক্তি থাকে না এবং সেই আসক্তিহীন কর্ম মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কারণ হইতে পারে না।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, লোকে বেদান্তকে ধর্মনীতিঅংশে অঙ্গহীন বলিয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিকও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কর্ম অপেক্ষা ধ্যানের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম ধর্মনীতিজ্ঞান বেদান্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসা বাইবেলের মতে সর্বোচ্চ ধর্মনীতি— এবং কথাটিও সত্য বটে। কিন্তু যখন আমি সমস্ত সুখ-দুঃখ নিজের মধ্যেই অনুভব করি প্রতিবেশীর মধ্যে করি না তখন প্রতিবেশীকে কেনই বা নিজের মতো ভালোবাসিব? বাইবেলে ইহার কোনো উত্তর নাই, কিন্তু বেদের একটি কথায় ইহার উত্তর আছে— তত্ত্বমসি— তুমিও সে। বেদ বলেন তুমি ভ্রমক্রমে আপনাকে প্রতিবেশী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জান, কিন্তু তোমরা এক। ভগবদ্‌গীতা বলিতেছেন— যিনি আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন তিনি ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং, আপনার দ্বারা আপনাকে হিংসা করেন না। ইহাই সমস্ত ধর্মনীতির সার কথা এবং ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠাস্থল। তিনি আপনাকেই সর্ব বলিয়া জানেন এইজন্য কিছু প্রার্থনা করেন না; তিনি আপনাতেই সমস্ত উপলব্ধি করেন এইজন্য কাহারও ক্ষতি করেন না, তিনি মায়া দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগতে বাস করেন অথচ মুগ্ধ হন না। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে আর সংসার থাকে না; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। তিনি ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। তিনি নদীর ন্যায় ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই যে মিলন ইহা অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুর মিলনের ন্যায় নহে; এ যেন অনন্ত সমুদ্র তুষারবন্ধন মোচন করিয়া আপন সেই সর্বব্যাপী নিত্য এবং সর্বক্ষমস্বরূপে প্রত্যাগমন করিল, যথার্থত যে স্বরূপ তাহার চিরকাল আছে এবং কোনো কালেই দূর হয় নাই।

অনুবাদকের প্রশ্ন

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্বিকার ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানব যুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার

করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই-একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শংকর কহেন, স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শংকরাচার্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্মণা। কর্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কী করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমান কী জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কী নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ম্। কাহার দ্বারাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইবার পূর্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক্ অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্নরূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্যূন তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়— শুক্তি এবং মুক্তা এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কীরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না।

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার আত্মবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature.

বস্তুত ইহার অর্থ এই যে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে স্বরূপের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়— বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্বে বলা হইতেছিল জীবন্মুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কী দশা হয়— তিনি নদীর মতো সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে তো যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে! সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলেও মূলরহস্যের আবর্তমধ্যে বুদ্ধিতরণী হইয়া গেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোনো অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকেও কৈফিয়তের দায়িক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, অধ্যাত্মরাজ্যের মূল প্রদেশে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের কোনো এক আশ্চর্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি অঙ্ক এবং যুক্তিশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এককে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন্ কহেন, পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্মফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোনো অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে 'মরল্' বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শংকরাচার্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, কর্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের শরীর গ্রহণের কারণ হইয়াছে এবং সেই অনির্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃপুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোনো নিয়ম বলা যাক ধর্মনিয়ম বলিবার কোনো হেতু দেখি না। প্রথমত, অজ্ঞান বলিতে কী বুঝায় আমরা জানি না এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্বচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়ত, তাহা হইতে কর্ম হইল বলিতে যে কী বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ-সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা— বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোনো জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখভোগেরও কোনো কারণ নির্ণয় করিতেছেন না। যেহেতু, কর্ম নামক কোনো অনির্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম এবং সৃষ্টি কার্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষও বীজের কারণ এইভাবে কোনো কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এ স্থলে কর্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স্ বলিতেও তাহা বুঝায়— অর্থাৎ এমন একটা কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি— আমাদের হওয়াটা অনাদি। এবং হওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ— সুতরাং কেন দুঃখভোগ করিতেছি তাহারও কোনো কেনত্ব নাই। অতএব এ স্থলে 'মরল্' অথবা অন্য কোনো 'নেসেসিটি' দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারও মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলই, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করার মতো।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলামাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ জীবরূপ দূর হইয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এ স্থলে সমস্ত জগতের বিলয় ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোনো অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনগ্রন্থে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, কান্টের অকাট্যযুক্তি অনুসারে দেশকাল ও কার্যকারণত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম, বাহিরের ধর্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ— সেই দেশকাল কারণাতীত সত্তাকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেনহৌয়ারের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্তমতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনবচ্ছিন্ন 'উইল' পদার্থের নেতি-আত্মক নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব— তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, অস্তিত্ব নাই।

এই বিশুদ্ধ, দুঃখবিহীন, কামনাবিহীন, নেতিত্বের আনন্দমধ্যে একটা মোহ একটা পাপের সূচনা দেখা দিল— (কোনো বিশেষকালে নহে, আজও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-আত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করি—

Now there was formed— not at any time, but before all eternity, today and for ever, like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, in the pure, painless, and will-less bliss of denial a morbid propensity, a sinful bent : the affirmation of the Will to life. In it and with it is given the myriad host of all the sins and woes of which this immeasurable world is the revealer.

মানব-বুদ্ধি চিরকাল প্রশ্ন করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন?

শংকরাচার্য এবং ডয়সেন্ উত্তর দিতেছেন— এক অনাদি অনির্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্বচনীয় ছায়া পড়িল তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার সরল অর্থ এই, সৃষ্টিই বা কী আর সৃষ্টির কারণই বা কী আর দুঃখ পাপই বা কেন তাহা কিছুই জানি না। এবং বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তিই বা কীরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই তুমিও নাই— তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্বে 'সাধনা'য় অনুবাদ করিয়া দেখানো হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারে না, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কী করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে, তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন— তখন সে বলে যখন আমিই নাই, তখন আমি কোনো কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোনো কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনই এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কী বল? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানি না, আমি কেবল এইটুকু জানি, আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়— এমন-কি, আমার সেই-সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই— সেই আমার সর্বসফলতা যিনিই হৌন, যেখানেই থাকুন, তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০১

রামমোহন রায়

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা-শ্রবণ-কালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনো রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন

হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল— তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গ সমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাংলাদেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলাভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয় রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও-বা কণ্টকিত কোথাও-বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি— যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ— তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত-প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন-লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন,

যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যে আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু উর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত-আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃশব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর-সমস্ত শুনা কথা— শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না— রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়, কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার,

সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন— সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি, এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় ভ্রান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ইহা নহে, ইহা নহে— আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না।' বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যালোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে— কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি— তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে— আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে উর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না— সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছিল— সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে— মিথ্যা! মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো— যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে— কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতরদায়িত্বপূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না— তবে ধর্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ বর্জন কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কী আলোক কী স্বাস্থ্য কী মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে,

'সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।' অর্থাৎ যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র-দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানব-সমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্পসাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই— সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপনি আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত; তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না; তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক-দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন-রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন— সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়— রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত

করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব, হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব, না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব— প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যে কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি, এক-এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু, সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন— আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে— অনেকে যাঁহারা মনে করেন 'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু, আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না— আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া, এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন-পূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য-পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে— তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব; ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শান্তি বৈ পরিতৃপ্তি নাই— তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্য-পানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্, পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমং অনুগ্রহ করো ইতি। ওঁ তৎসৎ।'

ভারতী
কার্তিক ১৩০৩

শিক্ষা

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা

আজকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দ নীতিশিক্ষা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি, বক্তৃতা আর চটি বইয়ের এত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, এই কয়টি উপাদানের মাহাত্ম্যে নীতির উৎকর্ষসাধন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে আজকালকার বালকগণ এক-একটি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে অভিব্যক্ত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে; আর যদি এই সুফল ফলিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় তো সে কেবল ছাত্রচরিত্রে নীতির অভাবের আধিক্যবশত, চটি বইগুলার ব্যর্থতাবশত নয়।

ছাত্রদের নীতি লইয়া যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে মনে হইতে পারে যে, হঠাৎ বুঝি এ দেশের যুবাদের মধ্যে দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, আমরা সকলে মিলিয়া 'জন্ দি ব্যাপ্‌টিস্ট' না সাজিলে আর চলে না। লেফ্‌টেনন্ট গবর্নর সার্কুলার জারি করিতেছেন, নন্-পোলিটিকাল স্বদেশহিতৈষীরা কমিটি করিতেছেন, কোনো কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল 'মোরালিটি'তে পরীক্ষা প্রচলিত করাইবার চেষ্টায় আছেন, আর অনেকেই নিজের নিজের সাধ্যমতো 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক্' প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

ব্যাপারটা দেখিয়া একটু হুজুকের মতন মনে হয়। শুদ্ধমাত্র 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক' পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় এ কথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এ প্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। এরকম বিশ্বাসে পর্বত নড়ানো যায়, দুর্নীতি তো সামান্য কথা। 'চুরি করা মহাপাপ,' 'কদাচ মিথ্যা কথা বলিয়ো না' এইপ্রকার বাঁধি বোল দ্বারা যদি মানুষের মনকে অন্যায় কার্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত তাহা হইলে তো ভাবনাই ছিল না। এ-সব কথা মান্ধাতার এবং তৎপূর্বকাল হইতেই প্রচলিত; ইহার জন্য নূতন করিয়া টেক্স্‌ট্ বুক ছাপাইবার প্রয়োজন নাই।

দুই-একটি টেক্স্‌ট্‌বুক দেখিয়া মনে হয় যেন বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য নীতি শব্দটা একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদের চরিত্র কি এই বিষয়ে এতই খারাপ যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই এত বেশি আলোচনা করা দরকার? রাজসাহী কলেজের কোনো একজন প্রোফেসর 'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি তো ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সংকোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।

একটিমাত্র বিষয় অনেক দিক হইতে অনেক রকমে নাড়াচাড়া করিয়া প্রোফেসর মহাশয় দেখাইবার মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সকলেই দূষণীয় জ্ঞান করে। তিনি কি মনে করেন যে, যাহারা সমাজের ও আত্মীয়স্বজনের মত উপেক্ষা করিয়া গোপনে দূষণীয় কার্যে রত থাকে তাহারা চটি বইটি পড়িবামাত্র চরিত্রসংশোধনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে? আর যাহাদের এ-সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নিকট এ-সকল বিষয় আলোচনা করা কি সংগত কিংবা প্রয়োজনীয়? এই বইখানি আবার রাজসাহী কলেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।

আমার কোনো এক তীক্ষ্ণ-জিহ্ব বন্ধু তাঁহার এক বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আজকাল নীতিশিক্ষার অর্থ দুইটি মাত্র : ১. রাজকর্মচারীদিগকে সেলাম করা এবং ২. সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া। প্রথমটি কলেজে কিংবা স্কুলে শিখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, স্কুল ছাড়িয়া একবার উমেদারী ধরিলেই শিক্ষাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া কোনো কোনো সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু

নিদানপক্ষে সে বর্ণনাগুলা তবু তো কবিতা বটে। এ-সব প্রসঙ্গ কাব্য হইতে ছাঁটিয়া দিয়া মর‍্যাল টেক্সট্‌বুক-এ নীরস শুষ্কভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বালকদের পাঠ্যপুস্তকে এরকম পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাছে তো অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়।

নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধি বোল দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি' বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই। নীতিগ্রন্থে শুধু বলিয়া দেয় যে, এটা পাপ, ওটা পুণ্য; ইহা পাপ-পুণ্যের একটা ক্যাটালগস্বরূপ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ইহা চলনসইরকম জানিবার নিমিত্ত ক্যাটালগের আবশ্যক করে না। অজ্ঞাত পাপ পৃথিবীতে অল্পই আছে। গুরুতর অন্যায় কার্যগুলা সকলেই অন্যায় বলিয়া জানে, এমন-কি, ব্যবসায়ী চোরেরাও চুরি করাটাকে নৈতিক কার্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কতকগুলি কার্য, জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, করিলেই পাপ। যেখানে শাস্ত্রে লেখা আছে যে, দক্ষিণমুখী হইয়া বসিতে হইবে, সে স্থলে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে হিন্দুমতে পাপ হইতে পারে এবং এ কথাটা সকলেও নাও জানিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার পাপ-পুণ্য আপাতত আলোচ্য নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থে যে-সব অন্যায় কার্য উল্লেখ করা যায়, কিংবা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনোটাকে বোধ হয় কাহারও ভ্রমবশত ন্যায় কার্য বলিয়া ভাবিবার সম্ভাবনা নাই।

নীতিশিক্ষার প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে নীতি কী প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে, বুনিয়াদটা কী রকম, মালমসলা কী রকম এবং কী প্রকারে গাঁথিলে দেয়ালটা সোজা হইয়া থাকিবে ও পড়িয়া যাইবে না, এই-সব কথা ভাবিয়া লওয়াই ভালো। চরিত্রের দোষ দূর করিবার চেষ্টার পূর্বে দোষের কারণটা অনুসন্ধান করা যুক্তিসংগত। রোগের হেতু না জানিয়া চিকিৎসা করিতে বসিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা।

মানবহৃদয়ে সুখস্পৃহাই একমাত্র চালক-শক্তি। ইচ্ছা করিয়া কেহ কখনো দুঃখ সহ্য করে না। কথাটা শুনিবামাত্রই অনেকে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে উঠিবেন, কিন্তু একটু বুঝাইয়া বলি। কর্তব্যপালনের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কর্তব্যপালনেই আমার যে আন্তরিক সুখ হয়, সেই সুখ ওই কষ্ট অপেক্ষা বলবান বলিয়া, কিংবা পরকালে অধিক পরিমাণে সুখ পাইবার অথবা ততোধিক দুঃখ এড়াইবার আশায় আমরা কর্তব্যের অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া থাকি। এ স্থলে আমি ফিলজফির নিগূঢ় তর্ক তুলিতে চাহি না; কিন্তু সকলেই বোধ হয় নিদানপক্ষে এ কথাটা স্বীকার করিবেন যে, লোকে সুখের প্রলোভনেই অন্যায় পথ অবলম্বন করে, এবং কর্তব্যের প্রতি আন্তরিক টানই এই প্রলোভন অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়।

মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম। কিন্তু এ স্থলে ধর্মের তর্ক তুলিতে চাহি না ও তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের তো এ পথ বন্ধ। শিক্ষকদের উপর নীতিশিক্ষা দিবারই হুকুম জারি হইয়াছে, ধর্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার উপর বাড়িতেও যে বড়ো একটা ধর্মশিক্ষা হয় তা নয়। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য 'আগ্‌নাস্তিক,' আর বাকির মধ্যে বেশি ভাগ্‌ নামে হিন্দু, কাজে কী তা বলা কঠিন। অতএব, ধর্ম অবলম্বন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষার আর-এক সহজ উপায় আইন-অনুযায়ী দণ্ডের কিংবা সামাজিক নিন্দার ভয় দেখানো। বুদ্ধিমানের নিকট এইপ্রকার নীতিশিক্ষার একমাত্র অর্থ ধরা পড়িয়ো না। আমাদের সমাজের আবার এমন অবস্থা যে, নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা করো, প্রবঞ্চনা করো, মিথ্যা কথা বলো, মাতাল হও, কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদে জীবন যাপন করো, সমাজ এ-সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া লইয়া তোমাকে সাদরে

নিমন্ত্রণ করিবে, এবং যদি উত্তম কুলীন হও ও সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে তো তোমাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে এই একটিমাত্র আপত্তি কোনো কোনো স্থানে হইয়াছিল যে, জেলের মধ্যে পান-আহারের বন্দোবস্তে জাতিভেদটা নিখুঁত বজায় থাকে কি না সন্দেহ! এইপ্রকার সমাজের নিন্দার মূল্য লইয়া বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যস্বভাব, বিশেষত বাল-স্বভাব অনুকরণশীল ও প্রশংসাপ্রিয়। অল্পবয়সে অন্যের, বিশেষত গুরুজনের ও প্রিয়জনের দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা যে-সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, বস্তুত সেই-সব সংস্কার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হয়। কিন্তু ছেলেরা বাড়িতে যে-সব দৃষ্টান্ত দেখে, তাহা হইতে নৈতিক উন্নতিসাধনের কোনোই আশা নাই। ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থে পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো, সকলেই মুসলমান বাবুর্চির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এ প্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কখনো নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইতেছেন না। সেই স্থানে আবার যদি সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া থাকে তো সেই বালক দেখিবে যে, তাহার অখাদ্য-ভোজী বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো সকলেই এই ধর্মসভার সভ্য; এবং ধর্মসভার নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নিয়মও দেখিবে যে, যাঁহারা 'প্রকাশ্য' খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনোরূপ অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন। (কোনো সরলমতি পাঠক কি শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এইরূপ ধর্মসভার ও এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব আমার কল্পনাজাত নহে?) বালকটি নিতান্ত নির্বোধ হইলেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব— যাহা করিতে হয় লুকাইয়া করো; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিয়ো, আমরা জানিয়া-শুনিয়াও চোখ-কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্য কথা বলিয়ো না, তাহা হইলেই তোমার সর্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কখনো সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?

দৃষ্টান্ত চুলায় যাক, উপদেশ দ্বারাও যে, বাড়িতে কোনোরূপ নীতিশিক্ষা হয় তাও নয়। বাড়িতে যতগুলি পিতৃতুল্য গুরুজন আছেন (এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত) তাঁহাদের সহিত ছেলেদের গৃহস্থের সহিত চোরের সম্পর্ক। ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহারা চেষ্টাও করেন না পৌঁছানও না। ছেলেরা বোঝে যে, এই-সব পিতৃতুল্য গুরুজন কেবল কারণে অকারণে ধমকাইবার নিমিত্ত ও 'যা, যা, পড়্‌গে যা' বলিয়া তাড়া দিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ভালোবাসা, স্ফূর্তি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ সে স্থানে ফুটিবার নহে। গুরুজনের প্রশংসাটা নিতান্ত বিরল বলিয়া ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে বটে, কিন্তু অমিশ্র প্রশংসা গুরুজনের নিকট পাওয়াই দুষ্কর। তাঁহারা আবার ছেলেদের নিকট হইতে এত তফাত যে, তাঁহাদের ভর্ৎসনা বা নিন্দা ছেলেদের মনে লেশমাত্র অঙ্কিত হইতে পারে না, তা ছাড়া তাঁহারা তো চিরকালই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন, এই তো তাঁহাদের কাজ। বকুনিটা খাবার সময় ছেলেদের মনে একটু অসোয়াস্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু সেটা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া নয়, বকুনি খাইতেছে বলিয়া, আর প্রহারের আশঙ্কায়।

বাড়ির ভিতরে মা পুত্রকে পিতৃশাসন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজে মিথ্যা বলিতেছেন ও মিথ্যা শিখাইতেছেন। ছেলেরা বাড়ির ভিতর যায় খাইবার জন্য ও আদর পাইবার জন্য। বাড়ির ভিতরটা নীতি কিংবা অন্য কোনো প্রকার শিক্ষার স্থান নহে। অশিক্ষিতা মাতারা, বালিকা বয়সেই মাতৃত্বভার স্কন্ধে লইয়া কীই বা শিক্ষা দিবেন! তাঁহারা কেবল ভালোবাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কাছে অন্ধ ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না।

নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা, ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ তো এই-সব গুণের সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে। এবং এমন করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, আমরা যেমন অপরিষ্কার কিংবা বীভৎস কোনো পদার্থ স্পর্শ করার কল্পনা করিতেও সংকোচ ও ঘৃণা অনুভব করি, তেমনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ কল্পনা করিতেও ঘৃণা অনুভব করিব ও অন্যায় কার্য করিতে সংকোচ বোধ করিব। আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাইবার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রকার শিক্ষা দু-চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটোখাটো খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম। নীতিবচনের বাঁধি বোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মর‍্যাল টেক্সট্‌বুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনোই সংস্রব নাই।

আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়োই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও তো তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ তো লোকে স্বভাবত সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা এ রকম যে, বাড়ি অত্যন্ত নিরানন্দ, এবং সব সময়ে শান্তির আলয়ও নয়; কাজেই ক্রীড়া কৌতুক ও বিশ্রামের জন্য লোকের বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। পেট্রিয়টরা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইংলন্ডের ন্যায় আমাদের 'হোম লাইফ্' থাকিলে ভালোই হইত।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক

ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এমন-কি, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে একেবারে ষোলো আনা ক্ষুধা মিটাইয়া আহার করাও ভালো নহে, দুই-এক আনা হাতে রাখাও কর্তব্য। মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে এ কথাও নূতন নহে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশের ছেলেদের আহারের পরিমাণ যেমনই হৌক, ইংরাজি শিক্ষার দায়ে পড়িয়া পড়াশুনাটা যে নিরতিশয় গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ডাক্তর ডেলি সাহেব কিছুকাল বাঙালি ছাত্রদের শিক্ষকতা করিয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বলপূর্বক শিক্ষা গলাধঃকরণের হাস্যজনক, অথচ সুগভীর শোচনীয় ফল প্রমাণিত হইতেছে। অনেক বাঙালি ডেলি সাহেবের উক্তপত্র হইতে শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা না করিয়া অযথা রোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিমান, দুর্বলহৃদয় বাঙালিচরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। হিতৈষীদের নিকট হইতেও তিলমাত্র আঘাত আমরা সহ্য

করিতে পারি না।

অন্তত এন্ট্রেন্স ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ছাত্রবৃত্তি দিয়া যাহারা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় তাহারা ভালো ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রথমত, তাঁহাদের কথার সত্যতাসম্বন্ধে উপযুক্তরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়ত, ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল না হইবারই কথা। এগারো-বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগকে যে পরিমাণে বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, এমন বোধ হয় আর কোথাও নাই। নিম্নে আমরা দেশীয় ভাষা-ভিত্তিমূলক এন্ট্রেন্স স্কুলের সহিত সেন্ট জেভিয়ার কলেজাধীন এন্ট্রেন্স স্কুলের শ্রেণীপর্যায় অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাশাপাশি বিন্যাস করিলাম। প্রথমোক্ত স্কুলে এন্ট্রেন্স পর্যন্ত নয় শ্রেণী, দ্বিতীয় স্কুলে ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস বাদ দিলে আট শ্রেণী। অতএব সেন্ট জেভিয়রের ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসকে আমরা প্রথমোক্তস্কুলের নবম শ্রেণীর সহিত তুলনা করিলাম। যদি ষোলোবৎসর বয়সকে এন্ট্রেন্স দিবার উপযুক্ত বয়স বলিয়া ধরা যায় তবে সাত বৎসর বয়সের সময় স্কুলের পাঠ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

বাংলা স্কুল

নবম শ্রেণী

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক।
২। Modern spelling book ; Word lessons.
বাংলা। ৩। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ে -কৃত বর্ণপরিচয়।
৪। শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।
৫। শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ।
গণিত। ৬। পাটিগণিত।
৭। ধারাপাত।
ভূগোল। ৮। মৌখিক।

সেন্ট জেভিয়র স্কুল

ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's Infant Reader.
২। Longman's Second Primer.
গণিত। ৩। একশত পর্যন্ত গণনা। যোগ, বিয়োগ এবং গুণ।

৮ম শ্রেণী

(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের সেকেন্ড বুক।
২। Modern spelling book.
৩। গঙ্গাধরবাবুর Grammar and Composition.
বাংলা। ৪। চন্দ্রনাথবাবুর নূতন পাঠ।
৫। চিরঞ্জীব শর্মার বাল্যসখা।
৬। তারিণীবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

গণিত। ৭। পাটিগণিত।
৮। শুভঙ্করী।
৯। মানসাঙ্ক।
ইতিহাস। ১০। রাজকৃষ্ণবাবুর বাংলার ইতিহাস।
ভূগোল। ১১। শশীবাবুর ভূগোল পরিচয়।
বিজ্ঞান। ১২। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।

ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড
(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Reader. No. 1
২। Arithmetical Primer. No. 1

৭ম শ্রেণী
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Royal Reader. No. 2
২। Child's Grammar and Composition.
বাংলা। ৩। সাহিত্যপ্রসঙ্গ।
৪। পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ।
৫। বাংলা ব্যাকরণ।
গণিত। ৬। পাটিগণিত।
৭। শুভঙ্করী।
৮। মানসাঙ্ক।
৯। সরল পরিমিতি।
১০। ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি।
ইতিহাস। ১১। বাংলার ইতিহাস।
১২। ভূগোল-পরিচয়।
১৩। বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
বিজ্ঞান। ১৪। কৃষি সোপান।
১৫। স্বাস্থ্যের উপায়।
১৬। ভারতচন্দ্র-কৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা।

সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Reader. No. 2.
২। Arithmetical Primer. No. 1.
ইতিহাস। ৩। বাইবেল ইতিহাস।

৬ষ্ঠ শ্রেণী
(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Royal Readers. No. 3
২। McLeod's Grammar
৩। Stapley's Exercises
বাংলা। ৪। সীতা।

	৫। কবিগাথা।
	৬। সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ।
গণিত।	৭। পাটিগণিত।
	৮। শুভঙ্করী।
	৯। সরল পরিমিতি।
	১০। জ্যামিতি।
ইতিহাস।	১১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
	১২। শশীবাবুর ভূগোল প্রকাশ।
	১৩। যোগেশবাবুর প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান।	১৪। সরল পদার্থ বিজ্ঞান।
	১৫। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।
	১৬। রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা।

থার্ড স্ট্যান্ডার্ড

(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১। Longman's New Readers. No. 3
	২। Arithmetical Primer. No. 2
ইতিহাস।	৩। বাইবেল ইতিহাস।
	৪। Stories from English History No. 1.
ভূগোল।	৫। Geographical Primer No. 2

পঞ্চম শ্রেণী

(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১। Lethbridge's Easy selection.
	২। McLeod's Child's Grammar.
	৩। Stapley's Exercises.
বাংলা।	৪। প্রবন্ধকুসুম।
	৫। সদ্ভাবশতক।
	৬। সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।
	৭। রচনা সোপান।
গণিত।	৮। পাটিগণিত।
	৯। শুভঙ্করী।
	১০। জ্যামিতি।
	১১। পরিমিতি।
ইতিহাস।	১২। ইংলন্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
	১৩। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
ভূগোল।	১৪। ভূগোল প্রকাশ।
	১৫। ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।
	১৬। প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান।	১৭। সরল প্রাকৃতদর্শন।
	১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা।
	১৯। স্বাস্থ্যের উপায়।

ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড
(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১। Longman's New Readers. No. 4.
	২। Dictionary for conjugation.
	৩। Arithmetic for beginners.
ইতিহাস।	৪। বাইব্‌ল্‌ ইতিহাস।
	৫। Stories from English History. No. 2
ভূগোল।	৬। First Geography

এইখানেই বাংলা পড়া শেষ হইল, অতএব আর উর্ধ্বে যাইবার আবশ্যক নাই। ইংরাজি স্কুলে ইংরাজিই মাতৃভাষা, সেখানে অন্যভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই সেইজন্য তুলনাস্থলে বাংলা স্কুলের পাঠ্য তালিকা হইতে ইংরাজি বহিগুলা বাদ দেওয়া কর্তব্য। তাহা দিয়াও পাঠকেরা দেখিবেন, বাঙালি শিশুর স্কন্ধে কীরূপ বিপরীত বোঝা চাপানো হইয়াছে। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের এমনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত যে, তিনজনের রচিত তিনখানা স্বাস্থ্য-বিষয়ক গ্রন্থ ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইয়া তবে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ওই তিনখানি পুস্তকই যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে সেই পরিমাণে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বাংলা স্কুলগ্রন্থকারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আর কেহ যেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর-একখানা বহি তৈরি করিয়া না বসেন, বরঞ্চ ছাত্রগণের পিতামাতাগণ বর্ষে বর্ষে তাঁহাদের অরচিত গ্রন্থের সম্ভাবিত মূল্য ধরিয়া দিতে পারেন; তাহা হইলেও ডাক্তার খরচটা লাভ থাকে।

যাঁহারা সাধারণ মফস্বল স্কুলপাঠীদিগের নিরতিশয় দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ রাশীকৃত অনাবশ্যক গ্রন্থভারে ছাত্রদিগকে নিপীড়িত করা কীরূপ হৃদয়হীন বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতা। কত ছাত্রকে অর্ধাশনে থাকিয়া পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে নির্বাসনে অনশনে কঠোর পরিশ্রমে বিদেশী খনি হইতে জ্ঞান সংগ্রহে যাহারা বাধ্য তাহাদের ভার যত লঘু, পথ যত সুগম করিয়া দেওয়া যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অল্পবয়সে শিক্ষার জাঁতায় বাঙালির ছেলের শরীর মন সম্পূর্ণ জীর্ণ নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এক হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্যহীন অকালপক্ব প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগ অবতীর্ণ হইতেছে। দেশের রোগ, বিদেশের শিক্ষা, ঘরের দারিদ্র্য এবং পরের দাসত্ব এই সব-কটায় মিলিয়া আমাদের স্বল্পায়ু জীবনটাকে শোষণ করিতেছে। ইহার উপরে যদি আবার পাঠ্য নির্বাচন সমিতির স্বদেশীয় সভ্যগণও বাঙালির দুরদৃষ্টক্রমে নির্বিচারে বাঙালির ছেলের স্কন্ধে হেয়ার-প্রেস-বিনির্গত সকল প্রকার শুষ্ক বিদ্যার বোঝা চাপাইতে থাকেন তবে আমাদের দেশের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

অনেক ছাত্রবৃত্তিস্কুলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে; তাহাতে ছেলেদের বিদ্যা প্রায় পূর্ববৎ থাকে এবং পদার্থও শরীরে বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। যখন দেখা যায় তিন বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের উনবিংশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে এবং যখন কল্পনা করি অন্তত অষ্টাদশ সহস্র হতভাগ্য বালককে এই গ্রন্থের পাষাণ সোপানের উপর জল হইতে উত্তোলিত মীনশাবকের ন্যায় আছাড় খাইতে ও খাবি খাইতে হইয়াছে, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে-সকল ভীষণ প্রান্তরে প্রাচীনকাল হইতে দস্যুসম্প্রদায় নিরুপায় পান্থদিগের প্রাণসংহার করিয়া আসিয়াছে, সেই অস্থিসংকুল সুবিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তর দেখিলে হৃদয় যেরূপ ব্যাকুল হয়, এই পদার্থবিদ্যার উনবিংশ সংস্করণ দেখিলেও মনের মধ্যে সেইরূপ করুণামিশ্রিত ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে।

মফস্বলের দরিদ্রস্কুলে কীরূপ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সেখানে বিজ্ঞান সহজে

হৃদয়ংগম করাইবার কীরূপ উপকরণ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় যাঁহারা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের পদার্থবিদ্যা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা বিনাপরাধেই শিশুপালবধের জন্য প্রস্তুত। বিশ্বজগতে অনেকগুলি দুর্বোধ বিষয় আছে। যথা, নারিকেলের মতো এমন উপাদেয় ফল শাখাসংস্থানহীন বৃক্ষশিরে পঞ্চাশ হস্ত ঊর্ধ্বে ঝুলাইবার কী উদ্দেশ্য ছিল; হীরকের মতো এমন উজ্জ্বল রত্ন খনিগর্ভে দুর্গম অন্ধকারের মধ্যেই বা নিহিত থাকে কী অভিপ্রায়ে; ধান্য গোধূম যবের জন্য এত শ্রম সহকারে চাষের প্রয়োজন হয় কেন আর কাঁটা গাছগুলা বিনা চেষ্টায় অজস্র উৎপন্ন হইয়া কী উপকার সাধন করে; হিমালয়ের নির্জন শীতপ্রদেশে এত প্রচুর বরফ কী কাজে লাগে অথচ কলিকাতায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ বরফের জোগান বন্ধ হইয়া যায় কেন; যখন চোর পালায় তখন হঠাৎ বুদ্ধি বাড়িয়া উঠিয়া ফল কী; গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরদিনে পরিহাসের উত্তর জোগায় কেন;

এবং ছাত্রবৃত্তিস্কুলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের রচিত পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত হইবার কারণ কী?

উপরি-উক্ত কয়টা বিষয়ই দুর্বোধ, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা ও বিষয়বিন্যাস এই-সকল কয়েকটি প্রহেলিকা হইতেই দুর্বোধতর।

এই গ্রন্থখানি শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে যে কতদূর নিষ্ঠুর তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কয়েকপৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ছাত্রদের অনেকের মা-বাপ আছে কি না জানি না, কিন্তু শিক্ষাবিভাগ যে তাহাদের মা-বাপ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিলাতে সুকুমারমতি বালকদিগকে সহজে বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার বিচিত্র উপায় আছে; তথাপি ইংরাজি ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য হক্স্‌লিসাহেবের সম্পাদকতায় যে বৈজ্ঞানিক প্রথম পাঠগুলি রচিত হইয়াছে তাহা কীরূপ আশ্চর্য সরল!— তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যারণ্যের জটিলতা ও ভাষার দুর্গমতা লেশমাত্র নাই। কারণ, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। মুখ্যরূপে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে-সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহাতে ভাষার কৌশল ও কাঠিন্য আবশ্যক হইতে পারে— কিন্তু যে বিজ্ঞান আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে সহজেই অত্যন্ত দুরূহ তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়। এবং মাঝে হইতে না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া তাহারা ভাষাও শেখে না বিজ্ঞানও শেখে না, কেবল মনকে ক্লান্ত, সময়কে নষ্ট ও শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অপরাপর শিক্ষার ব্যাঘাত করে মাত্র।

আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশেই এন্ট্রেন্স স্কুলে বাংলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি। এই প্রণালীতে, ছাত্রগণ যে সময় ও শক্তি হাতে পাইবে তাহা ইংরাজি শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভাষা অনেক ভালো করিয়া শিখিবে সন্দেহ নাই এবং সেইসঙ্গে বিষয়গুলিও সহজে ও সম্পূর্ণতররূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহাদের শরীরও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবে এবং মনোবৃত্তির চর্চাও অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

সাধনা
ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০২

মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা

গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারই ইংরাজি অনুবাদ সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বাংলা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দুছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে অথচ বাংলার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক; ইহা লইয়া সৈয়দসাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন। বিষয়টি আলোচ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং বক্তামহাশয়ের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ, এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুলসমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভালো বাংলা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।

স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয় সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ-দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

অতএব সৈয়দসাহেব বাঙালি মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে-কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙালি হিন্দু বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই কথাই বলি— অর্থাৎ বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত।

ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার-বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশী এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসলমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙালি মুসলমানের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো'। ঝি আপনার বলিয়া তাহাকে দু ঘা মারিলে সয়, বউয়ের গায়ে হাত তোলা সকল সময় নিরাপদ নহে। সৈয়দসাহেব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাংলা পাঠ্যপুস্তককে তর্জন করিয়াছেন, বোধকরি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল। মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের বিকৃত বিবরণ বাংলা বই কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? অস্ত্র হস্তে ধর্মপ্রচার মুসলমানশাস্ত্রের অনুশাসন, এ কথা যদি সত্য না হয় তবে সে অসত্য আমরা শিশুকাল হইতে শিখিলাম কাহার কাছে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনীতি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক যাহাই লিখিতেছে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রগণ কি তাহাই নির্বিচারে

কণ্ঠস্থ করিতেছে না? এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক কি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র নহে?

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। য়ুরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত— সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তূলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীন-গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজ সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই-একজন হিন্দু লেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পার্সি উর্দুভাষায় আবদ্ধ, অতএব মুসলমান লেখকগণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সৈয়দসাহেব বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

ভারতী
কার্তিক ১৩০৭

সমাজ

বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ধনের আবশ্যক। যত দিন মনুষ্য আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তত দিন তাহারা জ্ঞান অর্জনে যত্নশীল থাকে না। উর্বর দেশেই সভ্যতার প্রথম অঙ্কুর নিঃসৃত হয়। ভারতবর্ষ, ইটালি ও গ্রীস দেশের উর্বর ক্ষেত্রেই আর্যেরা আসিয়া জীবিকা ও সভ্যতা সহজে উপার্জন করেন। অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসু নেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশ উন্মুক্ত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কোনো কার্য ছিল না, জ্ঞানানুশীলনের উপযোগী বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত তপোবনে তাঁহাদের বাস ছিল; তাঁহারাই তো ভারতবর্ষে কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের উন্নতি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের পূর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অবসর আবশ্যক করে, অবসর পাইবার জন্য ধন আবশ্যক, ও ধন উপার্জনের জন্য উর্বর ভূমির আবশ্যক।

উর্বর ভূমিই যদি সভ্যতার প্রথম কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশ সে বিষয়ে সৌভাগ্যশালী, এই আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, বঙ্গদেশ এককালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্মিত হইলে সে কী সর্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! য়ুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিমদেশীয় তৎপর ভাব, য়ুরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কী পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। য়ুরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, য়ুরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য, য়ুরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলংকার-প্রাচুর্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কী উন্নতি হইবে। য়ুরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কী উন্নতি হইবে! য়ুরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কী উন্নতি হইবে! এই-সকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। মনে হয়, ওই সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত অধীনতার অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রুমোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে-সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই-সকল ঘটনা লিখিত হইবে, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি সত্য, কিন্তু পাঠকেরা ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিবেন না। প্রকাণ্ড সমুদ্রের কোন্ এক প্রান্তে কতকগুলি বালুকণা জমিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র যে একটি তুষারাবৃত অনুর্বর দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পূর্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল, তরুকোটর বাসস্থান ছিল, নর-রক্তলোলুপ ড্রুইডগণ পুরোহিত ছিল, আজ তাহাদেরই পুত্রপৌত্রগণ কোথা হইতে তাড়িয়া ফুঁড়িয়া অসভ্যদের

সভ্য করিবেন বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাও যদি সম্ভব হইল, পতিত ইটালি ও গ্রীসও যদি পুনরায় জাগিয়া উঠিল, তবে যে নূতন জাতি আজ নব উদ্যমে জ্বলিয়া উঠিতেছে, নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে, সে যে সভ্যতার চরম শিখরে না উঠিয়া বিশ্রাম করিবে না, তাহাতে অসম্ভব কী আছে? সভ্যতা পৃথিবীতে স্তরে স্তরে নির্মিত হইতে থাকে, একেবারে প্রচুর পরিমাণে সভ্যতা কখনো পৃথিবীতে জন্মিতে পারে না। ক্রমই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস ও ইটালিতে এক স্তর সভ্যতা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ওই-সকল দেশ হইতে দেবী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এক স্তর সভ্যতা সেখানে এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি এখন ফ্রান্স জর্মনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেও পদচিহ্ন রাখিয়া আবার আমেরিকা, রুসিয়া, জাপান মাড়াইয়া পুনরায় সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে উদিত হইবেন, তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইরূপে পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং স্তরে স্তরে পৃথিবীতে পূর্ণ সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের একদিন আমরা কল্পনাচক্ষে দেখিতেছি, যেদিন আমাদের দীপ্যমান সভ্যতার সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডের সভ্যতা নিবিয়া যাইবে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার নহে। অনন্ত কাল-সমুদ্রে কত ঘটনা-তরঙ্গ উঠিবে ও পড়িবে, আর আমাদের এই বঙ্গদেশ, এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চিরকালই যে অধীনতার অন্ধকারে নির্জীবভাবে ঝিমাইবে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আমরা য়ুরোপের সঞ্চিত সভ্যতা অল্পায়াসে অর্জন করিয়া লইতেছি, নিউটন যতখানি মাথা ঘুরাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের নিউটনের এক-পঞ্চদশ অংশও ভাবিতে হয় না। য়ুরোপ যখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত সভ্যতা অর্জন করিয়া লইয়া আমরা আবার নব উদ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিব। যে জাতি নব উদ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারাই ক্রমে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে। কী অল্প কালের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় গদ্য এই সেদিন তো নির্মিত হইয়াছে; যত দিন ভাষার উন্নতি না হয়, তত দিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষার উন্নতি। যাঁহারা প্রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা তাঁহারা আজিও বর্তমান আছেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্য উন্নত হইয়াছে। এত দ্রুত ও এত অল্প কালের মধ্যে বোধ হয় কোনো ভাষারই উন্নতি হয় নাই। এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না। বাঙালিদের এই অর্ধশতাব্দীর উন্নতি, ইহার মধ্যে তাহাদের উদ্যম কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অধীনতার অনুৎসাহের মধ্যে এতদূর আশা করা যায় না। স্কটলন্ডে গিয়া তাহারা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, লন্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য উপাধি আহরণ করিতেছে, অঙ্কবিদ্যা শিখিতেছে, জর্মনিতে নিজের মত প্রচার করিতেছে, রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, সাহস-পূর্বক কত সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সফল হউক বা না হউক, গবর্নমেন্টের কুনিয়মের বিরুদ্ধে সাহসপূর্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছে, আমেরিকায় শিক্ষা পাইবার জন্য কত যুবক উদ্যত হইয়াছেন এবং আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, তাহারা পোত-নির্মাণবিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যা এবং ইংরাজেরা যদি যুদ্ধ শিক্ষা না দেন, তবে ফ্রান্সে গিয়া, জর্মনিতে গিয়া যুদ্ধ শিখিয়া আসিবে, ইহা নিশ্চয়ই। গবর্নমেন্টের অধীনে কার্য জুটিতেছে না, সুতরাং জীবিকার অভাবে বিদেশে গিয়া অর্থের নিমিত্তেও বিদ্যা শিখিবে, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এখনি আমাদের দেশীয় লোকের বাণিজ্যের দিকে মন পড়িয়াছে, অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অধীনতার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে এত দূর উন্নতি কোন্ জাতি করিয়াছে জানি না।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা পূর্বে বলিলাম সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অর্থের আবশ্যক করে, তবে এখন কেন বলিতেছি যে, অর্থাভাবও বাঙালিদের জ্ঞান উপার্জনের প্রধান

প্রবর্তক? স্বাধীন সভ্যতার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই অর্থ আবশ্যক, আমাদের যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মস্তিষ্ক হইতে এই সভ্যতা গঠিত করিতে হইত, তবে নিশ্চয়ই অবসর নহিলে পারিতাম না, অপরে আমাদের জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছে, ইহার জন্য অধিক অর্থ আবশ্যক করে না, আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিব না, নূতন যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিতে পারিব না, সুতরাং আমরা একটি জাতীয় মহত্ত্ব উপার্জন করিতে পারিব না। পৃথিবীতে এখন সভ্যতা গঠিত হইতেছে, এই গঠন-কার্যে আমরা কোনো সাহায্য করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, তবে গঠিত হইলে জাতিসাধারণের সহিত তাহা আমরা ভোগ করিতে পারিব। আমাদের গঠন-শক্তি নানা বাহ্য কারণ হইতে ব্যাঘাত পাইতেছে। প্রথম দারিদ্র্য, দ্বিতীয় জলবায়ু।

আমাদের দেশ উর্বর সত্য, কিন্তু অনেক কারণে দারিদ্র্য প্রশ্রয় পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মধ্যে সমানরূপে ধন বিভক্ত হইলেই দেশ ধনী হয়। দেশীয় কৃষকেরা যাহা উৎপন্ন করে তাহার সমস্ত লাভ মহাজন প্রভৃতিরাই ভোগ করে, তাহাদের কেবল জীবিকা-নির্বাহোপযোগী কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদধিক সঞ্চয় করিবার কোনো উপায় নাই, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেকে ধন এবং তদপেক্ষা বহুমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ধন উপার্জন করিবার কোনো উপায় দেখিতেছেন না। দেশের মৃত্তিকা ক্রমশ অনুর্বর হইয়া যাইতেছে, এক স্থানে ক্রমাগত একই শস্য জন্মিলে মৃত্তিকার তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এখনকার খাদ্য-সামগ্রী ক্রমশ বিস্বাদ হইয়া যাইতেছে; তাহার কারণ, মৃত্তিকা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। এই দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোকে এক বিন্দু অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? যদিই বা ক্রমে আমরা ধনী হই, তাহা হইলেও কি আমাদের দেশ জ্ঞান উপার্জন বিষয়ে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ আছে। আমাদের জলবায়ু এমন অতেজস্কর যে, নিবাসীদের মন একেবারে উৎসাহশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোনো একটি কার্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগা এ দেশে কাহারো সাধ্য নহে। যদি বা কোনো কৃত্রিম উপায়ে একবার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা যায়, তথাপি অধিক দিন তাহা স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে শিথিল হইয়া যায়। দেশের আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের এত বিঘ্নজনক যে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। খর্বাকার রুগ্‌ণ শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে অভাবে শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে; পুরুষের মতো, বীরের মতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই-চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কী করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ-সকল কি আমাদের দেশের দৃষ্টি অভাবে চশমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম অভাবে রুগ্‌ণ-দেহ, জলবায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বিএ এমে-র কর্ম? বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া না গেলে আমাদের নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই তবে আমাদের রক্ষা, নহিলে কতকগুলি অপচ্যজ্ঞান গিলিয়া গিলিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক, বিলাতি প্রভুদের বুট জুতার আঘাত সহিয়া সহিয়া হীন-প্রকৃতি, দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া করিয়া রুগ্‌ণ দেহ ও সাহেবি সভ্যতার সহিত নানাবিধ অভাব আমদানি হওয়াতে দরিদ্র হইয়া মরিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান অর্জনের যে-সকল বাধা জন্মিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার কি কোনো উপায় নাই? আমাদের কতখানি উন্নতির আশা আছে দুই-একটি কারণে তাহা যে নষ্ট হইবে ইহা তো সহ্য হয় না। প্রথম বিঘ্ন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য কি কখনো চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে? ইহা অসম্ভব যে একটি সমগ্র জাতি একেবারে না খাইয়া মরিবে, অথবা অভাবের উৎপীড়ন সহিয়াও

স্থির হইয়া থাকিবে। ইংলন্ড দেশটি কিছু উর্বর নহে তবে তাহারা ধনী হইল কী করিয়া? ভাবিয়া দেখিতে গেলে অভাবই তাহাদের ধনী করিয়াছে। নিজের দেশে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা দেশ-বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। যেখানে অভাব সেখানেই একটি-না-একটি উপায় আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন বাণিজ্য-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশ যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গবর্নমেন্ট যদি বিঘ্ন না দেন, তবে বাঙালিরা নিশ্চয়ই বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহাদের অনেক বাধা পড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষিত ও স্বভাব-চতুর বাঙালিরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। অর্থ উপার্জিত হইলে জ্ঞান উপার্জনের অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু ইংরাজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলন্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলন্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিলাসের শীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া এখন সেখানে কেহ যুদ্ধ প্রভৃতি গোলযোগে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না। ক্রমেই তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশে অর্থ অধিক উপার্জিত হইলে বিলাস-বৃদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। উত্থান-পতন-শীল কালের তরঙ্গে কত কী গঠিত হইবে ও কত কী বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পথে কী কী ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখা অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কর্ম। কিন্তু এখনকার মতো আমাদের অর্থ নহিলে চলিতেছে না, এবং শীঘ্রই যে অর্থ উপার্জিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এক হিসাবে আমাদের অভাব অত্যন্ত উপকারী। অভাব না থাকিলে দেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, এবং একটি প্রদেশের ক্ষুদ্র সীমায় জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাণিজ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশ হইতে জ্ঞানও আহৃত হয়। এইরূপে নানা দেশের ধন লইয়া দেশ ধনশালী হয় এবং নানা জাতির জ্ঞান লইয়া জাতিও জ্ঞানশালী হয়। এইজন্য বলিতেছি যে, দারিদ্র্য প্রবল ও গবর্নমেন্ট অনুদার হইয়া আমাদের দেশের মূলে অনিষ্ট হইতেছে না, বরং তাহা দূরবর্তী মঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে।

এক্ষণে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নানা বাহ্য কারণে ও জলবায়ুর প্রভাবে বাঙালিদের এরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, বরং তাহারা না খাইয়া মরিবে, তথাপি পরিশ্রম করিয়া তাহা নিরাকরণ করিবে না, তবে অভাবে তাহাদের কী উপকার হইবে? কিন্তু বিদ্যা যতই প্রচার হইবে, ততই সে-সকল বাধা দূর হইবে। কর্তব্য-জ্ঞানে মনের এমন বল জন্মে যে, বাহিরের অনেক বাধা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাণিজ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।

আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় বাধা জলবায়ু। ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশের জলবায়ু কিছু এত মন্দ নহে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনো উপায় নাই। আমাদের দেশে পরিশ্রম করিলেই বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের শ্রমশীল কৃষকেরা তো দুর্বল নহে। আমাদের মনে উদ্যম জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেবল দুর্বল শরীর তাহার বাধা দিতেছে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকদের ন্যায় যদি বল লাভ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর আমাদের মনকে সাহায্য করিবে। কর্তব্য জ্ঞান ও শিক্ষা -বলে বলীয়ান হইয়া শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অরুচি অন্তর্হিত হইবে। মন বৃদ্ধ হইয়া গেলেই শরীর বৃদ্ধ হয়, আমাদের দেশে অল্প-বয়সেই মহা বিজ্ঞ রকমের চাল-চুল প্রকাশ পাইতে থাকে। যতদিন নাচিয়া হাসিয়া, ক্রীড়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন মনে বার্ধক্যের মরিচা পড়িতে পারে না। যাহা হউক,

আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে— ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

ইংরাজদিগের আদব-কায়দা

ইংরাজদিগের এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব-কায়দা ঘেঁষিতেও পারে না। য়ুরোপে সকলই যেমন যন্ত্রে নির্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও য়ুরোপীয়েরা এমন যন্ত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে-সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই তো আদব-কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্, যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইনকানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে তো এত নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই, তবুও তো মনিয়র উইলিয়াম্‌স কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোটোলোকেরাও এমন ভদ্র শান্ত প্রভুভক্ত, যে য়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলন্ডে প্রণামের স্থলে শেক্-হ্যান্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান-মর্যাদায় যিনি বড়ো তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ-পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন— তাহা অপেক্ষা অভ্যস্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো পুরুষ কোনো অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোনো পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু কোনো অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোনো মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পরদিন কোনো প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্রলোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবর্ষীয়দের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভালো আদব-কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিকমাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণরূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভালো। যাহার সহিত শেক্-হ্যান্ড করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে শেক্-হ্যান্ড করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোনো পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিয়ো না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়ো। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে।

ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোনো পদাতিক-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া মহিলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে, ঘাড় উঁচু করিয়া কথা কহিবার কষ্ট যেন মহিলাকে না দেওয়া হয়। কোনো মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার সময় তাঁহার হস্তে পুস্তক প্রভৃতি যাহা-কিছু থাকিবে তাহা তুমি বহন করিবে। যদি চুরট খাইতে খাইতে পথে আইস, তবে কোনো মহিলার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়ো। শেক্‌-হ্যান্ড করিতে হইলে যাহাকে শেক্‌-হ্যান্ড করিবে, তাহার খুব কাছে না আসিলে হাত বাড়াইয়ো না, দূর হইতে হাত বাহির করিয়া আসিলে বড়ো ভালো দেখায় না। মহিলারা আসিলে ভদ্রলোকদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু পুরুষেরা আসিলে মহিলাদিগকে উঠিতে হয় না। অগ্নিকুণ্ডের (Fire place) কাছাকাছি যাইবার জন্য তুমি এক চৌকি ছাড়িয়া আর-এক চৌকিতে যাইতে পার না। গৃহের কর্ত্রী তোমাকে যদি কাহারো সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তবে তুমি তাহার প্রতি গ্রীবা নত করিবে, তবে যদি সে ব্যক্তি কর্ত্রীর বিশেষ আত্মীয় বা পুরাতন বন্ধু হয় ও কর্ত্রী যদি তাহার সহিত তোমার বিশেষ আলাপ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শেক্‌-হ্যান্ড করিতে পার। মহিলারা পুরুষের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু হাত নাড়েন না, মহিলার হস্ত লইয়া নাড়িয়া দেওয়া পুরুষের কর্তব্য কর্ম। যুবতীরা অবিবাহিত পুরুষের প্রতি কেবলমাত্র গ্রীবা নত করিবেন। যখন কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, যতক্ষণ থাকা প্রয়োজন ততক্ষণ থাকিয়াছ, এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তখনই তুমি উঠিয়া যাইয়ো না; যখন অভ্যাগতগণ চৌকিতে আসিয়া বসিল, তখন গৃহের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া এবং নবাগতদিগকে অতি নম্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবে। হয়তো কর্ত্রী তোমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিন্তু একবার যখন উঠিয়াছ, তখন আবার বসিতে গেলে বড়ো ভালো দেখাইবে না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যদি ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন হয় তবে 'অন্য কাজ আছে এইজন্য ঘড়ি দেখিতেছ' এই বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ও অনুমতি লইয়া তুমি ঘড়ি দেখিবে। কোনো মহিলা বিদায় লইতে উঠিলে পুরুষেরও উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং যদি তাঁহার নিজের বাড়ি হয় তবে গাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। অভ্যাগত আইলে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলে মহিলারা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, যদি তিনি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেক্‌-হ্যান্ড করেন ও সে না বসিলে না বসেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণ বিদায় লইবার সময় উঠিলে মহিলাকেও উঠিতে হইবে ও যতক্ষণ না তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া যান ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘরের সীমা পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। নিজে যে চৌকিতে বসিয়া থাক, নিজে না বসিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য সে চৌকি কাহাকেও বসিবার জন্য দিয়ো না, তবে যদি অন্য চৌকি না থাকে সে এক আলাদা কথা। এই তো গেল প্রণাম নমস্কার প্রভৃতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি নীতি। এক্ষণে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম-অনিয়মের বিষয় লিখি।

সকল সময়েই দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করাই ভদ্রতার নিয়ম। যদি তোমার হাতে সর্বদা কাজ থাকে, তবে চাকরদিগকে বলিয়া রাখিয়ো তাহারা আগন্তুকদিগকে বলিবে যে, প্রভু অমুক দিন বা অমুক সময় ব্যতীত কখনো ঘরে থাকেন না। যদি দৈবক্রমে ভৃত্য কাহাকেও ঘরের মধ্যে আনিয়া থাকে তবে যত অসুবিধাই হোক-না কেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কোনো মহিলা আগন্তুকদিগকে অপেক্ষা করাইয়া রাখিবেন না। ছাতা এবং 'ওভার-কোট্‌' 'হলে' রাখিয়া দেখা করিতে যাইতে হইবে।

'মর্নিং-কল' অর্থাৎ দিনের বেলায় দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিকাল ৩টা হইতে ৫টার মধ্যেই উচিত। কারণ আহারাদি ও সাজগোজ করিবার সময় দেখা করিতে গেলে বড়ো অসুবিধা হয়।

দেখা করিতে যাইবার সময় টুপি খুলিয়া টেবিল বা অন্য কোনো দ্রব্যের উপর রাখা উচিত

নহে, টুপি হাতে করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা যদি রাখিতেই হয় তবে ভূমির উপর রাখা উচিত। 'মর্নিং কল' করিতে যাইবার সময় শখের কুকুর সঙ্গে লইয়া ঘরে যাইয়ো না, কারণ তাহারা চেঁচামেচি করিতে পারে, অথবা কোনো লেডির গাউনের উপর বা মকমলের কৌচের উপর শুইতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ না করিতে পারে। অথবা গৃহের কর্ত্রীর সাধের বিড়ালটি হয়তো অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইতে পারে। যদি কোনো মহিলা কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যান, তবে তিনি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া না যান। কারণ, যাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান সে বেচারীর হয়তো বুক ধড়াস ধড়াস করিতে থাকে, পাছে তাঁহার 'আলবাম' ছিঁড়িয়া ফেলে বা তাঁহার সাধের প্রস্তর-মূর্তিটি অঙ্গহীন করিয়া ফেলে। তোমার যদি গাড়ি না থাকে তবে বাদলার দিনে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়ো না, কারণ তুমি যদি ভিজা কোটে ও কাদা-মাখা জুতায় কাহারও ঘরের কার্পেটের উপর বিচরণ কর তবে গৃহের কর্ত্রীর বড়োই মন খারাপ হইয়া যাইবে। লোকাকীর্ণ ঘরে গেলে প্রথমে গিয়াই গৃহের কর্ত্রীকে সম্ভ্রম জানানো আবশ্যক, পরে অন্য কাজ। কোনো মহিলা কাজকর্ম ছাড়া আর কোনো কারণে ভদ্র লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন না। বন্ধুত্বের সাক্ষাতে বড়ো অধিক কালব্যয় করিয়ো না, বড়ো জোর আধ ঘণ্টা কথাবার্তা কহিবে। আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, তুমি এতটুকু থাকিবে যাহাতে বন্ধুগণ তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে বলিয়া কষ্ট পান, কিন্তু দেরি করিতেছ বলিয়া মনে মনে তোমার বিদায় প্রার্থনা না করেন। কাহারও সামাজিক সাক্ষাৎ (অর্থাৎ যে সাক্ষাৎ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতেই হয়, বন্ধুত্ব অথবা অন্য প্রকারের সাক্ষাৎ নহে) ফিরিয়া দিবার সময় ঘরের মধ্যে না গিয়া একটা কার্ড রাখিয়া গেলেও হয়। কিন্তু অমনি বাড়ির লোকেরা কেমন আছেন, সে সংবাদটা লইয়ো। আবার যে মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করিতে গিয়াছ তাঁহার সঙ্গে যদি তাঁহার ভগিনী বা কন্যাগণ থাকেন, তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কার্ড দিতে হইবে। অথবা যদি বাড়িতে অন্য অভ্যাগত উপস্থিত থাকেন, তবে কাহাকে কার্ড পাঠাইতেছ, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য তোমার নামের উপর তাঁহার নাম লিখিয়ো। কাহারও শোকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যে সাক্ষাৎকারের নিয়ম আছে, তাহা শোকের ঘটনা ঘটিবার পরে সপ্তাহের মধ্যে পালন করা উচিত। তোমার যদি বিশেষ আত্মীয় বন্ধু না হন তবে কার্ড পাঠাইয়া দিয়ো। কাহারও আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড না পাঠাইয়া নিজে যাইয়ো। যে বন্ধু বা আলাপীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, বা যাহাদের নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়াছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা করিয়ো। দেশে আগমন ও বিদায় -বার্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোনো কারণে চাকরের হস্তে কার্ড পাঠানো বড়োই অসম্ভ্রম প্রদর্শনের চিহ্ন।

কার্ডের উপর নাম ধাম সমস্ত লিখা থাকিবে। সাক্ষাৎ করিবার কার্ড খুব সাদাসিদা হওয়া উচিত, চকচকে কার্ডের 'ফ্যাশান' এখন আর নাই। নিজের নামের সহিত খেতাব প্রভৃতি যেন না থাকে, সাদাসিদা 'ইটালিক' অক্ষরে নাম লিখা থাকিবে, 'রোমান' বা অন্য প্রকার ঘোর-ফের অক্ষরে যেন নাম লেখা না হয়। 'কন্টিনেন্টে' অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নামের পূর্বে 'মশিও' বা 'মিস্টর' বা 'মিস' প্রভৃতি লেখে না, ইংলন্ডেও কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করেন। নিজের হাতের লেখার অনুরূপ অক্ষরে নাম লিখিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে বড়ো বড়ো প্রতিভাসম্পন্ন লোক, যাঁহাদের হাতের অক্ষর দেখিতে লোকের কৌতূহল জন্মে, তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন; জন্ স্টুয়ার্ট মিল বা কার্লাইলের হাতের অক্ষরের কার্ড শোভা পায়, অন্য লোকের নহে। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কার্ডের চারি দিকে কালো ঘের থাকিবে। অবিবাহিতা কুমারী যাঁহারা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র কার্ডের প্রয়োজন নাই। কার্ডে তাঁহাদের মাতার নামের নিম্নে নিজের নাম লিখা থাকিবে। যেমন

Mrs Charles Gilbert
Miss Charles Gilbert

কোনো কোনো বিবাহিত সস্ত্রীক দেখা করিতে আইলে উভয় নামের একটি কার্ড ব্যবহার করেন; যেমন Mr. & Mrs. Stewart Austin। পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা অনেক সময়ে কার্ড পাঠাইয়া সেই সংবাদ দেন; সেই কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম, বয়স, জন্মস্থান, বাসস্থান ও কবরস্থান লিখিত থাকে। বিদায় লইবার কার্ডের এক কোণে P.P.C. (pour prendre congé) অথবা P.D.A. (pour dire adieu) এই অক্ষর তিনটি খোদিত থাকে।

বিদেশ হইতে নবাগত ব্যক্তি যদি তোমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র (Letter of introduction) তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পরদিন গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ো। দেখা করিয়া তাহার পরেই তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবে। যদি তেমন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহাকে লইয়া সংগীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা-কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইয়ো। যাহাকে কাহারও নিকট পরিচিত করিবার নিমিত্ত পরিচয়-পত্র লিখিবে, তাহার চরিত্রের বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রের বিষয় কিছু না বলিলেও বুঝায় যে, যাহাকে তুমি তোমার বন্ধুর সহিত পরিচিত করিতে চাও, তাহাকে অবশ্য তোমার বন্ধুর পরিচয়ের যোগ্য মনে করিতেছ। শুদ্ধ এই লিখিলেই যথেষ্ট যে— 'অমুক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইলেন, ভরসা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

নিন্দা-তত্ত্ব

নিন্দা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে। লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বলো দেখি যে, সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পর যত দিন দোষ করতে ক্ষান্ত না হবে, তত দিন দোষারোপের মুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দুক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ তুমি রাশীকৃত করে পরীক্ষা করে দেখো, দেখবে, যে খনিতে জন্মেছে তার গায়ে তার মাটি লেগে থাকবেই থাকবে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।

যদি বল যে, মিথ্যা দোষারোপ করাকেই নিন্দা বলে, তা হলে নিন্দার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! মিথ্যা নিন্দা নিন্দার একটা অংশ মাত্র। কে না জানে, এমন অনেক সময় আসে, যখন পর-নিন্দা শোনবার কষ্ট আমাদের নীরবে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হয়, কেননা আমাদের কোনো কথা বলবার থাকে না, নিন্দুক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে বলছে 'সত্য কথা বলছি, তার আর কী!' কিন্তু সে সহস্র সত্য কথা বলুক-না কেন, তবুও নিন্দুক বলে তার উপর কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু কেন? সত্যি কথা বলছে, তবু কেন তাকে নিন্দুক বল? তার একটা কারণ আছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমরা উদ্দেশ্য বুঝে নিন্দার নিন্দা করি। সকলেই স্বীকার করেন পরের প্রশংসা করা মাত্রকেই খোশামোদ বলে না। যখন কারও সদ্গুণ দেখে আমাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় থেকে প্রশংসা বেরোয় তখন, অবিশ্যি তাকে কেউ খোশামোদ বলে না। কিন্তু যখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা কর, সে প্রশংসা সত্য হলেও তাকে খোশামোদ বলে। নিন্দার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলি খাটে। তুমি একজনের কুকার্য দেখে ঘৃণায় অভিভূত হয়ে যদি বজ্রকণ্ঠে তার বিরুদ্ধে তোমার স্বর উত্থাপন কর, তা হলে নিন্দিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তোমাকে নিন্দুক বলবে না। কিন্তু যখন দেখছি নিন্দা করতে আমোদ পাচ্ছ বলে তুমি

নিন্দা করছ, কাল যদি পৃথিবীতে সমস্ত কুকার্য রহিত হয় তা হলে তোমার জীবনের সুখের একটা উপাদান বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমিও হয়তো অকাতরে তাদের সঙ্গে সহমরণে যাবার আয়োজন করতে পারো, তখন তুমি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সত্যবাদী হও-না-কেন, নিন্দুক বলে আমি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা রহিত করি। যখন তুমি সত্য কথা বলবার জন্য নিন্দা কর না, কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল, তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে। অতএব নিন্দার যদি একটা বাঁধাবাঁধি ব্যাখ্যা স্থির করতে যাও, তা হলে বলা যেতে পারে যে, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে পরের নামে সত্য বা মিথ্যা দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

পরের নামে দোষারোপ করতে ও পরের নিন্দা শুনতে সাধারণত লোকের কেন অত ভালো লাগে? এক-এক সময়ে ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। মানুষের মনে সৌন্দর্যপ্রিয়তা সর্বদাই জেগে রয়েছে। বীভৎস-আবর্জনা-রাশি দেখতে তো আমাদের আমোদ বোধ হয় না, তবে পরের নিন্দে শুনতে কেন অত তৃপ্তি? অনেক দূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে এর মূল দেখতে গেলে আত্মশ্লাঘায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়। নিন্দে শুনলে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনে হয় যে, আমি হলে এ কাজটা করতেম না, কিংবা আমি যে দোষ করে থাকি, অমুক লোকেরও তা আছে, অমুক লোকের চেয়ে আমি ভালো কিংবা আমি একলাই কেবল দোষী নই, এই দুটো কথা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে এক প্রকার গর্ব-মিশ্রিত তৃপ্তি জন্মিয়ে দেয়। সকল মানুষের মনেই সৌন্দর্যপ্রিয়তার ভাব রয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও চর্চায় যে তার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। তুমি হয়তো চর্মচক্ষে একটা কুশ্রী জিনিস দেখতে পার না, কিন্তু তোমার হয়তো সৌন্দর্যপ্রিয়তা এত দূর প্রস্ফুটিত হয় নি, যে কুগুণ বা কুনীতির মতো একটা নিরাকার পদার্থের অসৌন্দর্য বা কুশ্রীত্ব তোমার মনে তেমন আঘাত দেয়। সুশিক্ষার গুণে সৌন্দর্যপ্রিয়তা যখন তোমার মনে যথেষ্ট বিকসিত হবে, তখন একটা কদাচরণের কথা শুনলে ঘৃণায় তোমার গা শিউরে উঠবে কিংবা লজ্জা ও সংকোচে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই কথা শুনে তোমার আমোদ বোধ হবে না, বা সেই কথা নিয়ে অবকাশের সময় বৈঠকখানায় বসে দশ জনের কাছে দশটা রসিকতা ও হাস্য-পরিহাস করতে রুচি হবে না। কিন্তু সৌন্দর্যের ভাব কজন লোকের মনে এমন প্রস্ফুটিত?

নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে আমাদের কেমন একটা টান আছে। একটা নিন্দা শুনলে আমরা প্রায় তার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে, আসল কথা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে চাই নে। বোধ হয় আমাদের মনে মনে এক প্রকার সূক্ষ্ম ভয় থাকে, পাছে তার ভালো প্রমাণ না থাকে। নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে সাধারণের এত অনুরাগ যে, চণ্ডীমণ্ডপের বিচারালয়ে নিন্দিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দুকের সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়। তুমি রাধামাধবের নামে আমার কাছে একটা দোষোত্থাপন করলে, আমি কোনো প্রমাণ না জিজ্ঞাসা করেও তা বিশ্বাস করলেম, তার পরে রাধামাধব যদি বলতে আসে যে, আমি কোনো দোষ করি নি, তা হলে আমি হয়তো প্রমাণ না পেলে তা ঝট্ করে বিশ্বাস করি নে। নিন্দিত ব্যক্তির অত্যন্ত সংকটের অবস্থা। আমরা সহজেই মনে করি, যে দোষী ব্যক্তি তো স্বভাবতই আপনার দোষ ক্ষালন করতে চেষ্টা পাবেই। সুতরাং আমরা তার কথায় কান দিই নে। অনেক সময়ে 'দোষ করি নি' ছাড়া আমাদের আর কিছু বক্তব্য থাকে না, আমরা অনেক সময়ে বিশেষ কতকগুলি গোপনীয় কারণে নির্দোষিতার প্রমাণ থাকতেও তা আমরা প্রমাণ করতে পারি নে। এ রকম অবস্থায় দায়ে পড়ে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে পড়েন। আমরা যে নিন্দা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি তার আর-একটা প্রমাণ এই যে, মনে করো হরিহর রামধনের নামে তোমার কাছে একটা নিন্দা করেছে, তুমি সেটা বিশ্বাস করেছ ও সেই অবধি পরম আমোদে আছ, এবং দু-দশ জন বন্ধুর কাছে গল্প করেছ; আমি যদি আজ এসে তোমাকে বলি যে, হরিহর লোকটা অত্যন্ত নিন্দুক, তার কথা বিশ্বাস করবার যোগ্য নয়, তা হলে

তুমি কোনোমতে তা বিশ্বাস কর না, তুমি বলো, 'না, না, তা কি হয়? লোকটা কি একেবারে খাঁটি মিথ্যে কথা বলতে পারে?' কী আশ্চর্য! হরিহরের মুখে তুমি যখন রামধনের নিন্দের কথা শুনেছিলে, তখন তো তুমি প্রশংসনীয় উদারতার সঙ্গে বল নি যে, 'না, না, তা কি হয়! সে লোকটা কি এমন কাজ করতে পারে?' একটা নিন্দা তুমি অতি সহজে গলাধঃকরণ করলে, কিন্তু আর-একটা সেই শ্রেণীর নিন্দেই কেন তোমার গলায় হঠাৎ বাধল? এর কারণ অবশ্য সকলেই বুঝতে পারছেন। তিনি পরম আনন্দে একটি সুস্বাদ নিন্দা উপভোগ করছিলেন, আর তুমি কি না আর-একটি নীরস নিন্দা তাঁর হাতে দিয়ে সেটি তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিতে চাও? যে নিন্দুকের মুখ থেকে তিনি অমৃত পান করেন, তাকে তুমি আর যা খুশি বলে নিন্দে করো, কিন্তু মিথ্যেবাদী বলে খবরদার নিন্দে কোরো না, তা হলে তুমিই মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

বিশ্বাস-পরায়ণতা মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। যাঁরা পরনিন্দা শুনলে অতি সহজেই তা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হয়তো তুমি বিশ্বাস-পরায়ণ বলবে। আমি তো ঠিক তার উল্টো বলি। যেমন তুমি যখন বল, আমি চার দিক অন্ধকার দেখছি, তখন তার অর্থ বোঝায়, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, অর্থাৎ অন্ধকার দেখা, কিছু না-দেখার ভাষান্তর মাত্র, তেমনি নিন্দা-বিশ্বাসিতা. অবিশ্বাসিতার অন্য একটি নাম। তুমি দেখতে পাবে, সন্দিগ্ধ ও কুটিল হৃদয়েরাই নিন্দা নিয়ে লেনা-দেনা করে থাকেন। তুমি যথার্থ সরল ও অসন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছে কারও নিন্দা উত্থাপন করো, তিনি বলে উঠবেন, 'না, না, এমনও কি মানুষে করতে পারে।' মানুষের চরিত্রের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, তিনি, কেহ যে খারাপ কাজ করেছে, তা শীঘ্র বিশ্বাস করতে পারেন না। মনে করো, তোমার এক পরিচিত ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁকে তুমি প্রত্যহ দুই সন্ধে দেবপূজা করতে দেখ, আমি তোমাকে একদিন কানে কানে ফুসফুস করে বললেম যে, চক্রবর্তীমশায় বৃহস্পতিবারে গোমাংস খেয়েছেন, অমনি তুমি তা বিশ্বাস করলে; তুমি কতদূর সন্দিগ্ধহৃদয় বলো দেখি! তুমি প্রত্যহ নিজের চক্ষে তাঁর ধার্মিকতার প্রমাণ পাচ্ছ, আরেকদিন একটা কানে কানে কথা শুনেই সে-সমস্ত তুমি অবিশ্বাস করলে? চণ্ডীমণ্ডপে গুটিপাঁচেক বৃদ্ধ গৃহস্বামী বসে ধূম-সেবন করছেন, চাণক্যের শ্লোক পাঠ করে ও বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি চণ্ডীমণ্ডপের তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন ও নস্যগন্ধী পর-চর্চা শুনে সংসারের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ পক্কতা প্রাপ্ত হয়েছে; রামশংকর খুড়ো তাঁদের এসে বললেন যে, মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো বউ সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করেছে, তাঁরা অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত করে মহা বিজ্ঞভাবে বললেন যে, 'কিছু আশ্চর্য নয়, কারণ, "বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"।' তাই তো বলি, নিন্দা বিশ্বাস করা সন্দিগ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ। তবে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা দূর অপেক্ষা আশু, অনুপস্থিত অপেক্ষা উপস্থিত, ও নিজের চোখের দেখা অপেক্ষা পরের মুখের কথা অধিক বিশ্বাস করেন। এখন তুমি তাঁকে একটি খবর দেও, তা বিশ্বাস করতে তাঁর যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, দু ঘণ্টা পরে আর-এক জন ঠিক তার বিপরীত খবর দিলে, তা বিশ্বাস করতে তাঁর তার চেয়ে কিছু অধিক হবে না। এমন লোকের শিশু-প্রকৃতির একটা ঘোরতর ভ্রমের ফল। এ দলের সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নেই। নিন্দা অবিশ্বাস করবার ঝোঁক অনেকটা শিক্ষা ও অভ্যাস -সাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস ও বিবেচনা আবশ্যক। যে নিন্দা শুনলে তোমার মনে কষ্ট হয়, তা তুমি না বিশ্বাস করতেও পার, কিংবা যে নিন্দায় তোমার কষ্ট বা সুখ কিছুই না জন্মায়, তা তুমি বিশেষ প্রমাণ না পেলে অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু স্বার্থজড়িত কতকগুলি বিশেষ কারণে যে নিন্দা শুনলে তোমার আমোদ জন্মাবার সম্ভাবনা, তা বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস না করা শিক্ষিত মনের লক্ষণ। আর-এক অবস্থায় আমরা নিন্দা অতি সহজে বিশ্বাস করি। আমরা একজন লোককে খারাপ বলে জানি, তার নামে একটা নিন্দা শুনবামাত্রেই আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি এটা কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা তার আর প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে কিন্তু শিক্ষিতমনা ব্যক্তিরা তখন বলেন যে, 'সমস্ত সম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না।' একটা জিনিস

সম্ভব হতে পারে কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। এক ব্যক্তি এসে যখন আমাদের কাছে একটা প্রিয়-নিন্দা উত্থাপন ক'রে বলে যে, 'এইরকম তো সকলে বলছে।' তখন আমরা আর কিছু বিচার করি নে, মনে করি 'সকলে বলছে', এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই হতে পারে না! কিন্তু, এই 'সকলে বলছে' কথাটি অত্যন্ত শূন্যগর্ভ। একজন তোমাকে এসে বললেন, সকলে বলছে অমুকে অমুক কাজ করেছে। সেখেনে 'সকলে' অর্থে তিনি যে ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, তুমি তাঁর ধুয়ো ধরে আমাকে বললে যে, সকলে অমুক কথা বলছে। আমি অকাতরে বিশ্বাস করি যে, যখন "সকলে বলছে" তখন অবিশ্যি সত্যি! আমাকে একজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি যে বলছ 'সকলে বলছে,' আচ্ছা, কে কে বলছে বলো দেখি?' আমি ভেবে ভেবে একজনের বেশি নাম করতে পারি নে, অবশেষে অপ্রস্তুত হয়ে আমি তোমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি— 'ওহে, কে কে বলছে বলো দেখি?' তুমিও তথৈবচ। মূল অন্বেষণ করতে যতদূর পর্যন্ত যাও-না কেন, দেখবে তোমার চেয়ে এ বিষয়ে কারও জ্ঞান অধিক নয়। 'সকলে বলছে' কথাটা একটা সংক্রামক পীড়া। প্রথমত একজনের মুখ থেকে কথাটা বেরোয়, তার পরে দিবসান্তে সকলেরই মুখে শুনতে পাবে 'সকলে বলছে।' সকালবেলায় যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক ছিল, সন্ধেবেলায় সেটা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি একটা বিশেষ নিয়ম করেছি যে, 'সকলে বলছে' কথাটি যখনি শুনব, তখনি জিজ্ঞাসা করব 'কে কে বলছে?'

শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন একটা নিন্দা শোনেন তখন অনেক রকম বিচার করেন। আমরা তিন রকম ব্যক্তির কাছে নিন্দা শুনি : ১. বিখ্যাত নিন্দুক অর্থাৎ যাদের আমরা নিন্দুক বলে জানি। ২. যাদের বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। ৩. যাদের আমরা সত্যবাদী বলে জানি। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে যখন শিক্ষিতমনা ব্যক্তি কোনো নিন্দা শোনেন তখন তা অবিশ্বাস করতে তাঁর বড়ো পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনেন তখন তাঁর একটা ভাবনা আসে; হয়তো মনে করেন যে, 'এ লোকটার কথা অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে?' কিন্তু এ ভাবনা কোনো কাজের নয়, কেননা তখন আমাদের দুটো বিরোধী কর্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর-এক জনের সচ্চরিত্রে অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে? এ রকম অবস্থায় তিনি বিশ্বাসও করেন না অবিশ্বাসও করেন না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইয়েরই অধিকার -বহির্ভূত একটি দাঁড়াবার স্থান আছে। তিনি তখন সে নিন্দুককে বলেন যে, 'তোমার কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণ না পাব ততক্ষণ তা বিশ্বাস করব না।' কিন্তু তৃতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখে যখন তিনি নিন্দা শোনেন তখন তিনি যে-সকল যুক্তি অবলম্বন করেন সে বিষয় পরে বলছি।

যাকে তিনি নিন্দুক বলে জানেন তার মুখ থেকে কোনো নিন্দা শুনলে তিনি এই-সকল বিবেচনা করেন যে, 'প্রথমত এ ব্যক্তির কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে, কিংবা নিন্দার অভ্যাস থাকা বশত নিন্দা করছে। দ্বিতীয়ত, একটা সত্য কথার কিয়দংশ বাদ দিলে তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়, তুমি আমাকে এসে বললে যে, অমুক মদ খেয়েছে, কিন্তু তুমি হয়তো বাদ দিলে যে, তাকে ডাক্তারেরা মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল; তুমি সত্য কথা বললে বটে কিন্তু এ মিথ্যার রূপান্তর মাত্র, অতএব একটা কথার সমগ্র না শুনলে সে বিষয়ে বিচার করা যায় না। যাঁকে তিনি সত্যবাদী বলে জানেন তাঁর কাছ থেকে যখন তিনি কোনো নিন্দা শোনেন, তখন তিনি প্রথমত মনে করেন, 'ইনি হয়তো একটা গুজব শুনে তাই বিশ্বাস করছেন। বিশ্বাস করবার কী কারণ জানি না, কিন্তু হয়তো সে কারণগুলি ভ্রমাত্মক।' দ্বিতীয়ত, 'ইনি হয়তো কতকগুলি কার্য দেখে একটা নিজের অনুমান করে নিয়েছেন, সে কার্যগুলি সমস্ত সত্য হতে পারে কিন্তু সে অনুমানটা হয়তো সমস্তই অমূলক।' তৃতীয়ত, 'তিনি হয়তো তাঁর নিজের কতকগুলি বিশেষ সংস্কারবশত একটা কাজ এমন খারাপ চক্ষে দেখছেন যে, তার তিল-প্রমাণ দোষ স্বভাবতই তাঁর সুমুখে তাল-প্রমাণ আকার ধারণ করছে।' চতুর্থত, অনেক সময় অনেক জিনিস যা আমাদের কল্পনায় সত্য বলে প্রতিভাত

হয়, তা আসলে সত্য নয়। মনে করো, একজন হিন্দু একদিন রবিবারে গির্জে দেখতে গিয়েছেন, সেইদিনকার বক্তৃতায় পাদ্রি সাহেব দৈবক্রমে Heathen-দের বিরুদ্ধে দুই-এক কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই হিন্দু কল্পনা করলেন যে, পাদ্রি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেই ওই বক্তৃতাটি করেন। এই কল্পনায় তাঁকে এমন অভিভূত করে তুললে যে, তাঁর মনে হল, যেন, বক্তা একবার তাঁর দিকে বিশেষ করে চেয়ে দেখলেন ও সেই সময়েই Heathen কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন। সেই হিন্দুটি সত্যবাদী হতে পারেন, পাদ্রি যে সেদিন হীদেনদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়ে আমি তিল মাত্র সন্দেহ করি নে, কিন্তু তিনি যে তাঁর দিকে চেয়ে হীদেন কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রয়ে গেল। এইরকম কত শত বিচার করবার জিনিস রয়েছে। আমার কাছে একবার একজন আমার এক পরিচিত ব্যক্তির নামে নিন্দা করেন, আমি তা বিশ্বাস না করাতে তিনি বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির এক বাড়ির লোকের কাছে শুনেছেন। আমি তাঁকে বললেম, 'তাতে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। বাড়ির লোক বলেছে বলে বিশ্বাস করবার একটা প্রধান প্রমাণ দেখাচ্ছ এই যে, বাড়ির লোক কখনো তার আত্মীয়ের নামে নিন্দা করে না। আচ্ছা ভালো। কিন্তু যখন দেখছ, এক-একটা "বাড়ির লোক" তার "বাড়ির লোকের" নামে নিন্দা করছে, তখন তার বাড়ির লোকত্ব পরলোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে! খুব সম্ভব, নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে তার কোনো কারণে মনান্তর হয়েছে, তা যদি হয়ে থাকে তবে তার নামে অলীক অপবাদ রটাতে আটক কী? বাড়ির লোক যখন তার আত্মীয়ের নিন্দা করে, তখন তাকে আমি সর্বাপেক্ষা কম বিশ্বাস করি।' অনেক লোক আছেন, তাঁরা পরের অনিষ্ট করব বলে নিন্দে করেন না। তাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা পরের মনে কষ্ট দিতে চান না। তাঁরা যখন নিন্দা করেন তখন তার ফল বিবেচনা করে দেখেন না। তাঁরা কৃষ্ণকান্তবাবুর নামে একটা নিন্দা শুনেছেন, তাই জহরীলালের কাছে গল্প করে বললেন, 'ওহে, শোনা গেল, কৃষ্ণকান্তবাবু অমুক কাজ করেছেন।' জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই, সুতরাং হঠাৎ তাঁদের মনে ঠেকতে পারে না যে, এ নিন্দায় কোনো দোষ আছে। দৈবক্রমে দূরত তার একটা কুফল ঘটতে পারে, তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না। তা ছাড়া অনাবশ্যক কারও নিন্দা করব না, এমনও একটা নিয়ম তাঁরা বাঁধেন নি। যখন দশ জন বন্ধু দশ রকম কথা কচ্ছ, তখন জিব অত্যন্ত পিচ্ছল হয়ে ওঠে, মনের কপাট আলগা হয়ে যায়, তখন বিশেষ একটা হানি না দেখলে একটা মজার কথা সামলে রাখা তাঁদের পক্ষে দায় হয়ে ওঠে। তখন তাঁদের মনে করা উচিত যে, তাঁরা রোষে একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন কি না? তখন তাঁরা কেন মনকে বোঝান না যে, 'আমরা কেই-বা? আমাদের এক মুহূর্তের একটা কাজ একটা মানুষ কতক্ষণই বা মনে রাখতে পারবে বলো? আমরা আমাদের নিজের মনে সর্বদাই এমন জাগ্রত রয়েছি যে অন্য একটা অপরিচিত বা অল্পপরিচিত মানুষ আমাদের বিষয় কত কম ভাবে, তা আমরা ঠিক মনে করতে পারি নে!' তখন তাঁরা কেন ভাবেন না যে 'একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দোষ জানলেই বা তাতে কী ক্ষতি?'

খবর দেবার বাতিক অনেক লোকের আছে। একটা নতুন খবর দিতে পারলে একজন যত গর্ব অনুভব করেন, একজন লেখক তাঁর মনের মতো রচনা শেষ করে ততটা অনুভব করেন না। খবর দেবার অতৃপ্ত পিপাসা তাঁদের একটা রোগ। এঁদের অনুগ্রহেই নিন্দার বাজারে যথেষ্ট মালের আমদানি হয়। একজনের ঘরের খবর ফাঁকি দিয়ে জানতে পারলে লোকের ভারি আমোদ হয়। তুমি পর্দার আড়ালে খেমটা নাচছ, তুমি মনে করছ আমি দেখতে পাচ্ছি নে, অথচ আমি দেখে নিচ্ছি তাতে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। একটা কাজ যতই দুর্জ্ঞেয় ও গোপনীয়, তার প্রকাশ বক্তার ও শ্রোতার মনে ততই আমোদ হয়। একজন লোক একটা করতে গেল, কিন্তু আর-একটা হয়ে পড়ল; সে মনে করছে এ কাজটা গোপন রইল, অথচ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের ভারি একটা মজা মনে হয়। হাস্যরসের বিষয়ে এমার্সন বলেছেন যে, 'সমুদয়

কৌতুক ও প্রহসনের মূল ও সার হচ্ছে, উদ্দেশ্যের অসম্পূর্ণতা— যা সিদ্ধ হবার কথা ছিল তার অসিদ্ধি; বিশেষত এক ব্যক্তি যখন সিদ্ধ হবার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে আশা প্রকাশ করছে তখন তার নিরাশ হওয়া। বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' গুপ্ত নিন্দা শুনতে আমাদের এইজন্যেই ভালো লাগে। একে তো নিন্দা, তাতে আবার গুপ্ত! এইজন্যেই যারা লোকের পরিবার সংক্রান্ত কোনো খবর দিতে পারে, তারা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ ও পূর্বজন্মের অনেক পুণ্যের অধিকারী মনে করে।

অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ। অনেক সময়ে তারা নিজে বুঝতে পারে না যে, তারা বাড়িয়ে বলছে। আমি জানি, গোবিন্দবাবুর বাড়িয়ে বলা একটা বদ্ধমূল রোগ। তাঁতে আমাতে দুজনে মিলে যা দেখেছি, তাও আমার সাক্ষাতেই আর-এক জনের কাছে এমন বাড়িয়ে বলেন যে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। তিনি যাকে পণ্ডিত বলে প্রশংসা করতে চান, তাকে বলেন তার মতো পণ্ডিত ভারতবর্ষে নেই, এই রকম করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি নিদেন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশ জনকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের যশ অর্পণ করেছেন। তাঁর প্রধান রোগ হচ্ছে (অনেক ঐতিহাসিকের এই রোগটি আছে।), যে একটা সত্য ঘটনা বলা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সেই কথাটি বলে শ্রোতার মনে তাঁর অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যদি তিনি অসংলগ্ন দুই-একটা কথা দৈবাৎ শুনতে পান, তা হলে নিজের ট্যাঁক থেকে দু-চারটে কথা যোগ করে সেটা সংলগ্ন করে দেন, কেননা জানেন, নইলে শ্রোতাদের মনে কোনো ফল হবে না। যদি তিনি জানতে পারেন, একটা ঘটনা একটু মুচড়ে, ইতস্তত একটু ছেঁটে-ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে অধিকতর ফল হবে, তা হলে সে পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে তিনি কিছুমাত্র অসম্মত নন। সর্বদাই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে হাঁ করিয়ে রাখা, তাঁর জীবনের প্রধান চেষ্টা। 'ভয়ানক' 'অসাধারণ' 'আশ্চর্য', এই-সকল বিশেষণে তাঁর তহবিল পূর্ণ রয়েছে। এঁরা যে-সকল নিন্দা ও মিথ্যে কথা বলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ জনকে তাক করে দেওয়া। এঁদের দল সংখ্যায় কম নয়।

এইরূপ যেমন নানা শ্রেণীর নিন্দুক আছে, নিন্দা করবার প্রথাও তেমনি শত সহস্র। এক দল নিন্দুক আছে, নিন্দা করাই যে তাদের উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আর-এক দল আছে, নিন্দা করা যেন তাদের বাসনা নয় এই রকম প্রকাশ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দলই অধিকতর ফল-জনক। তাঁদের নিন্দা করবার পদ্ধতি নানাবিধ। তাঁদের নিন্দের দু-চারটে নমুনা দিই।

অনেক সময়ে নীরবে নিন্দা করা যায়। পাঁচ জনে একজনের খুব প্রশংসা করছে, তুমি সেখানে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবে চুপ করে বসে আছ, কিংবা তোমার ঠোঁটের এক কোণে এমন এক রত্তি হাসি উঁকি মারছে, যে খানিকক্ষণ তোমার এইরকম ভাবগতিক দেখে তাদের মুখের কথা মুখে মরে আসে, তারা মনে করে তুমি না জানি তার নামে কী একটা গুপ্ত সংবাদ জান, তোমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে তুমি বল যে, 'নাঃ, কিছু না।' এমন স্বরে বল যে, তার অর্থ এই হয়ে দাঁড়ায় যে, 'সে অনেক কথা!' আর-এক রকম নিন্দে আছে, তাকে বাজে নিন্দে বা উপরি নিন্দে বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে, পাঁচ কথা বলতে বলতে এক কথা বলা। রামধনবাবুর কাল রাত্রে অত্যন্ত কাশি হয়েছিল, এই গল্পটি বলবার সময় একটু সুবিধে, অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোনো কথা নয় এমনি ভাবে হরকুমার যে মদ খায় সেই কথাটা সংক্ষেপে বলে যান। গানের পক্ষে যেমন তান, গল্পের পক্ষে এরকম নিন্দাও তাই। যেমন গানের সুর ও তাল বজায় রেখে দুই-একটা বাজে তান দিলে হানি নেই, গানের সুর বিগড়ে বা তাল মাটি করে একটা অসংলগ্ন তান দিলে শ্রোতাদের কানে ভালো শোনায় না, তেমনি গল্পের তাল বজায় রেখে ঠিক জায়গায় একটা উপরি কথা তুললে শ্রোতাদের মন্দ লাগে না; এরকম স্থলে বক্তার নিন্দুক বলে বদনাম রটে না; মনে হয় পাঁচ কথা বলতে এক কথা দৈবাৎ বেরিয়ে পড়ল। বেকন-এ আছে, যে, এক-একজন বাজে কথায় চিঠি পুরিয়ে কাজের কথা পুনশ্চ

নিবেদনের মধ্যে লেখেন। অনেক নিন্দুকও তাই করেন, সমস্ত কথার মধ্যে যে নিন্দাটা তাঁর বিশেষ বলা উদ্দেশ্য সেইটেকে তিনি এমন অপ্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মনে হয় যেন, সেটা বলবার জন্যে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা পড়ে নি। আবার অনেকে ভান করেন যেন, দৈবাৎ তিনি এক কথা বলে ফেললেন, আধখানা বলেই জিব কামড়ান, তার পরে পীড়াপীড়ির পর অতি আস্তে আস্তে সব বের করে ফেলেন। লোকে বলবে তিনি ইচ্ছে করে পারতপক্ষে কারো নিন্দে করেন নি। কেউ বা, যেন তিনি মনে করছেন যে তুমি তো জানোই, এমনিভাবে তোমার কাছে একটা কথা বলে ফেলেন; তার পরে যখন শোনেন যে, তুমি জানতে না, তখন ঘোরতর অনুতাপ আফসোস করতে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে নিন্দে করবার সময় এইরকম ভাব দেখান যে, যেন 'সকলেই এ কথা জানে, তুমি জান না, এ ভারি আশ্চর্য!' এ-সকল নিন্দে নিন্দের নামে সংসারে গণ্য হয় না। সংসারে আর-এক প্রকারের নিন্দা আছে, তাকে আত্ম-নিন্দা বলতে গেলে সকল সময়ে বিনয় বোঝায় না। অধিকাংশ আত্ম-নিন্দা গর্ব থেকে উত্থিত হয়। তুমি সমস্ত সমাজকে উপেক্ষা করে বলতে থাকো যে, আমি পৃথিবীর নিন্দা গ্রাহ্য করি নে! আমি অমুক অমুক পাপাচরণ করেছি, এখন সমাজ! তুমি আমার কী করতে পারো করো। সমাজের উপর মহা খাপা! কেন? না সমাজের শক্তি আছে বলে। পাপাচরণ করলে সমাজ বলপূর্বক শাসন করেন বলে। সমাজের দুই-একটি আদুরে ছেলে ছাড়া আর কেউ বিপথে গেলে সমাজ তাকে স্নেহের স্বরে উপদেশ দেন না, তাকে কান ধরে সিধা পথে আনেন। আদরের ও স্নেহের দানা দেখিয়ে তিনি ছিন্ন-রজ্জু ঘোড়াকে আস্তাবলে ফেরাতে চেষ্টা করেন না, তাঁর নিয়ম হচ্ছে চাবুকের ভয় দেখানো। কিন্তু এক-একটা মানুষ আছে, যাদের মন্দ কাজ না করতে অনুরোধ করো, শুনবে, কিন্তু আদেশ করো, অমনি তার বিরুদ্ধে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আত্ম-নিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক। বায়রন তার একটি বিখ্যাত আদর্শ। পর-নিন্দুকদের মতো আত্ম-নিন্দুকদের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আত্মনিন্দা যখন গর্ব থেকে উত্থিত হচ্ছে, তখনও তা অনেক পীড়াপীড়িতে দায়ে পড়ে স্বীকার করা হয়, তখন যে তার অনেক কথা বাড়ানো থাকা সম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। এইরকম সমাজের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা দুর্দান্ত বলিষ্ঠ-হৃদয় লোক। কিন্তু একটা দেখা যায়, এক ব্যক্তির সমাজ-বিদ্রোহিতা যতই বলবান হোক-না কেন, তবু এতটুকু আত্মশ্লাঘা ও নিন্দা-ভীরুতা তার মনে অবশিষ্ট থাকবে যে, কতকগুলি ছোটোখাটো দোষ সে সমাজের কাছে কোনো মতেই প্রকাশ করতে রাজি হবে না। একজন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারবে যে, সে ডাকাতি করেছে, কিন্তু চুরি করেছে স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে, তার হৃদয়ের-বীভৎসতম স্থান পর্যন্ত লোকের চক্ষে অনাবৃত করে দিতে পারে, এমন কোনো পাপ পৃথিবীতে নেই যা সে প্রকাশ্যভাবে আপনার স্কন্ধে না নিতে পারে, তবে সে নরকের এক খণ্ড। পাপ যে করে সে বিকৃত-চরিত্র, কিন্তু যে প্রকাশ্যভাবে পাপ করে সে সে-বিশেষণের অনধিগম্য। আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাংলা এক মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে 'ভিখারী' বলে আত্ম-পরিচয় বসিয়েছেন। যেমন 'ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!' বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী করবার অভিলাষে এইরকম করে থাকবেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বলতে পারি নে। 'আমি দরিদ্র' এ কথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি এ কথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য দোষের নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবার রুচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বলে বিনয় প্রকাশ করে না।

আত্ম-নিন্দার ছলে অনেক সময়ে আমরা আত্ম-প্রশংসা করি। একজন নানা প্রকার ভূমিকা করে বললেন যে, 'দেখুন মহাশয়, আমার একটা ভারি দোষ আছে, আমি তা কোনো মতেই ছাড়াতে পারি নে, আমার যা মনে আসে আমি তা স্পষ্ট না বলে থাকতে পারি নে, আমি যা বলি তা মুখের সামনে বলি।' একে বিনীতভাবে অহংকার করা বলে।

আমরা আর-এক সময়ে আত্ম-নিন্দা করি। আমরা যখন মনে মনে জানি আমাদের একটা গুণ আছে, আমরা তখন কখনো কখনো আমাদের সেই গুণ নেই বলে বাইরে প্রকাশ করি; তার তাৎপর্য এই যে শ্রোতা আমার কথার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করুক, সেইটে আমাদের শোনবার ইচ্ছে। আমরা এক-একজনকে দেখেছি, তাঁরা বন্ধুমণ্ডলীতে 'লোকটা তো বড়ো খোলাখালা।' এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্য আপনার কতকগুলি ছোটোখাটো দোষের কথা হাসতে হাসতে উল্লেখ করেন, তাঁর নিন্দার মূল্যে প্রশংসা ক্রয় করতে চান।

এইরকম যত আত্ম-নিন্দা দেখা যায় প্রায় দেখবে যে, বিনয়ের জমি থেকে তার চারা ওঠে নি। গর্বই তার মূল। পরনিন্দার মূলেও গর্ব, আত্ম-নিন্দার মূলেও গর্ব। পরনিন্দাও যেমন দোষ, আত্ম-নিন্দাও তেমনি। পরহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে নীতিশাস্ত্রে যেমন কম তফাত লেখে, পরনিন্দা ও আত্ম-নিন্দার মধ্যেও তাই।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৬

পারিবারিক দাসত্ব

সম্প্রতি স্বাধীনতা-নামক একটি শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-কৃষীগণ 'স্বাধীনতা' নামক ওইরূপ একটি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ওই শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে পত্রে পুঁথিতে সভাস্থলে মহা আড়ম্বরপূর্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং কবিবর, মহাকবি ও সুপ্রসিদ্ধ কবি-নামক যত বড়ো বড়ো সাহিত্য-ঢাকীগণ ওই বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি নাকি বড়ো মিঠা বাজিতেছে এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন এবং নাচা ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা শব্দ 'তাধিন্‌তা' শব্দের অপভ্রংশ নহে, ওই শব্দটি লইয়া যে কেবলমাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ওই হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবলমাত্র পূজা করিলে কোনো প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ংগম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভালোরূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ংগম করাও বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণত আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব-সাধারণ্যে চলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাঁহারা দেশ-

হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে যে, 'আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্রবৃক্ষ হইতে পারিতাম,' তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝানো যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড়ো কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসংগত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদপত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছা-তন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই-চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা-কিছু নির্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড়ো ভালো দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়! তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্তব্য। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজকাল যে-সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্তব্য কাজ সমাধাস্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু এ কথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের— আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ওই শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড়ো আমোদেই আছি!

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্যফলে আজকাল দেশে যে-সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্‌গদ আর্যশোণিতবান তেজিয়ান দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চিৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তা হয়তো অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোনো কর্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা 'হাঁরে'

করিয়া উঠিলেই ছেলেপিলেগুলার মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড়ো বড়ো পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না? আর, যদি কোনো গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যথা হয় বলো দেখি? গুরুজন মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরুজনের পান হইতে একতিল চুন খসাইয়াছে, অমনি দশ দিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্বতোভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কীরূপ বিচার বলো দেখি? যে দুর্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসি ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না। যেন ওই দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক-একটি দুর্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ওই যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণহৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোনো শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়তো স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরু ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহসপূর্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের প্রতিপদেই মার্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবলমাত্র মার্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে-সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখি না? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে বড়ো হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যেখানে বাঙালি সেইখানেই পদাঘাত, সেইখানেই গালাগালি, সেইখানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণ-শরীর সুন্দর বনবাসীদের শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা

পদে পদে শিখিয়াছে যে, গুরুজনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, 'যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!' ভালো করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভালো। দাদা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'কী করছিস, শুতে যা।' যে ছেলে বলে, 'কেন দাদা, এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি।' তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে, 'যে আজ্ঞে দাদা মহাশয়' তাহার তুল্য ছেলে হয় না।

ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহাদের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারও অনুরক্ত হয়, কাহারও হয় না, আবার কাহারও প্রতি তাহাদের স্বতই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভর্ৎসনা করিয়া বলা হয় 'গুরুজন বলছেন শুনছিস নে!' তখন তাহারা এই বুঝে যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহাদের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোনো মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ওই আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর্ এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চোখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচানো, এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় সহৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভালো, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরও ভালো; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা তো পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মতো কয় জন ভক্ত দেখা যায়! অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন। হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয় জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখো দেখি, হাফেজ কীভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কী ভাব থাকা ভালো? না, অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভালো, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরও ভালো। সেই পুত্রই যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্তব্যের সহিত প্রিয়কার্যের যতখানি প্রভেদ, ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তিভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে, একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সংকুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবনকালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার

সুখ-দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ-দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণত কী দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি তো বলি মাকে যে ছেলে শুদ্ধ কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কী? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভালো কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্যসাধনা করেন। এইজন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্মগত ভালোবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে করো, একজন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ওই এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর-একজনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কী শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাতত বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতি কাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভালো। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড়ো শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ। এমন-কি, স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইঁহার কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্তব্য কার্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য। অনুরাগে স্বার্থ বিসর্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়ো সহজ নহে, আমার মত এই যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সেগুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সমান ভাব, সখ্যতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত (ভক্তির ভাব সর্বত্র নহে), এই তো স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোনো কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সংকোচের ভাব

নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোনো প্রকার ত্রুটি মার্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কীরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, জান যে, তিনি কখনো কুপরামর্শ দিবেন না, জান যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে-আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণ-নাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও একজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন। আদেশ দেন না; শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয়-সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সেরূপ পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব। দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক-চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গসমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যেখানে ভয় সেইখানে কাজ, যেখানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। একজন নবাগত ইংরাজ তাঁহার বাঙালি বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি স্টেশনের একজন ভদ্র (!) বাঙালি কর্মচারীকে কহিলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়ো অসুবিধা হইতেছে'; কর্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙালি বন্ধু কহিলেন, 'আপনি বড়ো ভালো কাজ করিলেন না, এমন করিয়া বলিলে বাঙালিদের দেশে কখনো আলো পাওয়া যায় না; যদি আপনি তেরিয়া হইয়া বলিতেন, এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কী— তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।' আমি সেই বাঙালিটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কী, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরও সহস্র ঘটনা হয়তো আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙালি রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাঁকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙালি স্টেশন-কর্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ঈঙ্গবঙ্গেরা বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙালিদের বাঙালিরা মানে না। তাহারা বলের দাস। একজন ভৃত্য তাহার কর্তব্যকাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়তো কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাতত একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারও কথা আমরা বড়ো একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্টগোল করিবার তো আমি তেমন আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোনো সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি

কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অষ্ট-পৃষ্ঠ বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচজনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভালো। বোধ করি তাঁহারা চাকর-বাকর ছেলেপিলেগুলাকে মারিয়া ধরিয়া গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীরবৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুরলঙ, জঙ্গিস খাঁ-গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় জুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড়ো আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোটো ভাই, ইনি বড়ো, উনি ছোটো ইত্যাদি কত যে সাত-পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দূষণীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন-কি, উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোনো গুরুজন বাড়ির বধূর হাসির সুর শুনিতে পান, সেদিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে, দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশুনা কথাবার্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার জো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধাবাঁধি, যত শাসন, যত আইন-কানুন, আর বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে-সকল উন্নত পরিবারে এই-সকল কৃত্রিম বন্ধনসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবারভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই-সকল বন্ধনমুক্ত পরিবারে যে-কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। লেখক ইংলন্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, 'এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর-একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে "Thank you" ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক।' ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন. 'চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ-সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানি যত কম হয় ততই ভালো; মনে করো ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে বলে উঠলেন, "Thank you বাবা!" এরূপ কাষ্ঠ-সভ্যতা কাষ্ঠ-হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে।' জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তিবিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তোলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার-ব্যবহার কাষ্ঠ-সভ্যতাপ্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যে বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করে না, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত

হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কী? আমার যে ভাবটি নাই, আর-এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠ-সভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি তো বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে, যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতই Please বলায়। সে ভাবটি কী? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজে নিজের কার্য করিতে চায় ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক-না কেন, Thank you কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতিবারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ওইরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ওই ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসংকোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কী অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে করো আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত ও ইংলন্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কী বলিতাম? আর আজকালই বা কী বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক। আজকাল আমরা বলি, 'দেখো দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এমন-কি, আমাদের দেখাদেখি দেখো আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে!' আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, 'যে দেশে কাষ্ঠ-সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়। সুবিধাই কি সর্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কিনা অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কী জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহজ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!' জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!

ভারতী
চৈত্র ১২৮৭

জুতা-ব্যবস্থা

(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত)

গবর্নমেন্ট একটি নিয়মজারি করিয়াছেন যে, 'যে হেতুক বাঙালিদের শরীর অত্যন্ত বে-জুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্নমেন্টের অধীনে যে যে বাঙালি কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে!'

শহরের বড়ো দালানে বাঙালিদের একটি সভা বসিয়াছে। একজন বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ ও বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, ইংরাজ জাতির পূর্বপুরুষেরা যে গায়ে রঙ মাখিত ও রথের চাকায় কুঠার বাঁধিত তাহারই উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলেন যে, এই জুতা-মারার নিয়ম অত্যন্ত কু-নিয়ম হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার। (ঊনবিংশ শতাব্দীটা বোধ করি বাঙালিদের পৈতৃক সম্পত্তি হইবে; ও শব্দটা লইয়া তাঁহাদের এত নাড়াচাড়া, এত গর্ব।) তিনি বলিলেন, 'আমাদের যতদূর দুর্দশা হইবার তাহা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্নমেন্ট আমাদের দরিদ্র করিবার জন্য সহস্রবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মনে করো, বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইবে, ইস্ট্যাম্প চাই, তাহার জন্য রাজা প্রতিজনের কাছে দুই পয়সা করিয়া লন। মনে করো, ইংরাজ বণিকেরা আমাদের বাজারে সস্তা পণ্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্বজাতীয়েরা ঢাকাই বস্ত্র কিনে না, দেশীয় পণ্য চাহে না, আমাদের দেশের লোকের কি কম সহ্য করিতে হইতেছে, আর ইংরাজেরা কি কম ধূর্ত! এমন-কি, মনে করো গবর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের দেশে ডাকাতি ও নরহত্যা একেবারে রদ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া আমাদের বাঙালি জাতির পুরাতন বীরভাব একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, (উপর্যুপরি করতালি) সমস্তই সহ্য হয়, সমস্তই সহ্য করিয়াছি, উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে হিমালয় ও বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবদেশ এক প্রাণ হইয়া উত্থান করে নাই, কিন্তু জুতা মারা নিয়ম যখন প্রচলিত হইল, তখন দেখিতেছি আর সহ্য হয় না, তখন দেখিতেছি আর রক্ষা নাই, সকলকে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতে হইল, জাগিতে হইল, গবর্নমেন্টের নিকটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইতেই হইল! (উৎসাহের সহিত হাততালি) কেন সহ্য হয় না যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তবে সমস্ত সভ্যদেশের, য়ুরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখো, ঊনবিংশ শতাব্দীর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখো। দেখিবে, কোনো সভ্যদেশের গবর্নমেন্টে এরূপ জুতা-মারার নিয়ম ছিল না, এবং য়ুরোপের কোনো দেশে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। ইংলন্ডে যদি এ নিয়ম থাকিত, ফ্রান্সে যদি এ নিয়ম থাকিত, তবে এ সভায় আজ এ নিয়মকে আমরা আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতাম, তবে এই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের মুখে কী আনন্দই স্ফূর্তি পাইত, তবে আমরা এই সভ্য-দেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিতে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম!' (মুষলধারে করতালি বর্ষণ)। বক্তার উৎসাহ-অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন উত্তেজিত, উদ্দীপিত, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সমবেত সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙালির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের এমন ঐক্য হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ দরখাস্তে প্রায় সাড়ে চার শত নাম সই হইয়া গিয়াছিল।

লাটসাহেব রুখিয়া দরখাস্তের উত্তরে কহিলেন, 'তোমরা কিছু বোঝ না, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের ভালোর জন্যই করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা লইয়া বাগাড়ম্বর করাতে তোমাদের রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি।'

নিয়ম প্রচলিত হইল। প্রতি গবর্নমেন্ট-কার্যশালায় একজন করিয়া ইংরাজ জুতা-প্রহর্তা নিযুক্ত হইল। উচ্চপদের কর্মচারীদের এক শত ঘা করিয়া বরাদ্দ হইল। পদের উচ্চ-নীচতা অনুসারে জুতা-প্রহার-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইল। বিশেষ সম্মান-সূচক পদের জন্য বুট জুতা ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ পদের জন্য নাগরা জুতা নির্দিষ্ট হইল।

যখন নিয়ম ভালোরূপে জারি হইল, তখন বাঙালি কর্মচারীরা কহিল, 'যাহার নিমক খাইতেছি, তাহার জুতা খাইব, ইহাতে আর দোষ কী? ইহা লইয়া এত রাগই বা কেন, এত হাঙ্গামাই বা কেন? আমাদের দেশে তো প্রাচীনকাল হইতেই প্রবচন চলিয়া আসিতেছে, পেটে খাইলে পিঠে সয়। আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের যদি পেটে খাইলে পিঠে সইত তবে আমরা এমনই কী চতুর্ভুজ হইয়াছি, যে আজ আমাদের সহিবে না? স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ। জুতা খাইতে খাইতে মরাও ভালো, সে আমাদের স্বজাতি-প্রচলিত ধর্ম।' যুক্তিগুলি এমনই প্রবল বলিয়া বোধ হইল যে, যে যাহার কাজে অবিচলিত হইয়া রহিল। আমরা এমনই যুক্তির বশ! (একটা

কথা এইখানে মনে হইতেছে। শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে যুক্তির অপভ্রংশে জুতি শব্দের উৎপত্তি কি অসম্ভব? বাঙালিদের পক্ষে জুতির অপেক্ষা যুক্তি অতি অল্পই আছে, অতএব বাংলা ভাষায় যুক্তি শব্দ জুতি শব্দে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে।)

কিছু দিন যায়। দশ ঘা জুতা যে খায়, সে একশো ঘা-ওয়ালাকে দেখিলে জোড় হাত করে, বুটজুতা যে খায় নাগরা-সেবকের সহিত সে কথাই কহে না। কন্যাকর্তারা বরকে জিজ্ঞাসা করে, কয় ঘা করিয়া তাহার জুতা বরাদ্দ। এমন শুনা গিয়াছে, যে দশ ঘা খায় সে ভাঁড়াইয়া বিশ ঘা বলিয়াছে ও এইরূপ অন্যায় প্রতারণা অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ধিক্, ধিক্, মনুষ্যেরা স্বার্থে অন্ধ হইয়া অধর্মাচরণে কিছুমাত্র সংকুচিত হয় না। একজন অপদার্থ অনেক উমেদারি করিয়াও গবর্নমেন্টে কাজ পায় নাই। সে ব্যক্তি একজন চাকর রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বিশ ঘা করিয়া জুতা খাইত। নরাধম তাহার পিঠের দাগ দেখাইয়া দশ জায়গা জাঁক করিয়া বেড়াইত, এবং এই উপায়ে তাহার নিরীহ শ্বশুরের চক্ষে ধুলা দিয়া একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ করে। কিন্তু শুনিতেছি সে স্ত্রীরত্নটি তাহার পিঠের দাগ বাড়াইতেছে বৈ কমাইতেছে না। আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?' আজকালকার বি-এ এম-এ'রা নাকি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, এইজন্য পূর্বোক্ত রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাকে তাঁহারা অসভ্যতা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তিন ঘায়ের অধিক বরাদ্দ নাই। একদিন আমারই সাক্ষাতে ট্রেনে আমার একজন এম-এ বন্ধুকে একজন প্রাচীন অসভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, বুট না নাগরা?' আমার বন্ধুটি চটিয়া লাল হইয়া সেখানেই তাহাকে বুট জুতার মহা সম্মান দিবার উপক্রম করিয়াছিল। আহা, আমার হতভাগ্য বন্ধু বেচারির ভাগ্যে বুটও ছিল না, নাগরাও ছিল না। এরূপ স্থলে উত্তর দিতে হইলে তাহাকে কী নতশির হইতেই হইত! আজকাল শহরে পাকড়াশী পরিবারদের অত্যন্ত সম্মান। তাঁহারা গর্ব করেন, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বুট জুতা খাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারের কাহাকেও পঞ্চাশ ঘা'র কম জুতা খাইতে হয় নাই। এমন-কি, বাড়ির কর্তা দামোদর পাকড়াশী যত জুতা খাইয়াছেন, কোনো বাঙালি এত জুতা খাইতে পায় নাই। কিন্তু লাহিড়িরা লেপ্টেনেন্ট-গবর্নরের সহিত যেরূপ ভাব করিয়া লইয়াছে, দিবানিশি যেরূপ খোশামোদ আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা পাকড়াশীদের ছাড়াইয়া উঠিবে বোধ হয়। বুড়া দামোদর জাঁক করিয়া বলে, 'এই পিঠে মন্টিথের বাড়ির তিরিশটা বুট ক্ষয়ে গেছে।' একবার ভজহরি লাহিড়ি দামোদরের ভাইঝির সহিত নিজের বংশধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল, দামোদর নাক সিটকাইয়া বলিয়াছিল, 'তোরা তো ঠন্‌ঠোনে।' সেই অবধি উভয় পরিবারে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। সেদিন পূজার সময় লাহিড়িরা পাকড়াশীদের বাড়িতে সওগাতের সহিত তিন জোড়া নাগরা জুতা পাঠাইয়াছিল; পাকড়াশীদের এত অপমান বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা নালিশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; নালিশ করিলে কথাটা পাছে রাষ্ট্র হইয়া যায় এইজন্য থামিয়া গেল। আজকাল সাহেবদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত 'নেটিব'গণ কার্ডে নামের নীচে কয় ঘা জুতা খান, তাহা লিখিয়া দেন, সাহেবের কাছে গিয়া জোড়-হস্তে বলেন, 'পুরুষানুক্রমে আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাইয়া আসিতেছি; আমাদের প্রতি গবর্নমেন্টের বড়োই অনুগ্রহ।' সাহেব তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করেন। গবর্নমেন্টের কর্মচারীরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান না; তাঁহারা বলেন, 'আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাই, আমরা কি জুতা-হারামি করিতে পারি!'

সেদিন একটা মস্ত মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বেণীমাধব শিকদার গবর্নমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহে আড়াইশো ঘা করিয়া জুতা খায়। জুতাবর্দারের সহিত মনান্তর হওয়াতে একদিন সে তাহাকে সাত ঘা কম মারিয়াছিল। ডিস্ট্রিক্ট জজের কোর্টে মকদ্দমা উঠিল। জুতাবর্দার নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিল যে, মারিতে মারিতে তাহার পুরাতন বুট ছিঁড়িয়া যায় কাজেই সে মার বন্ধ

করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জজ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। হাইকোর্টে আপিল হইল। উভয়পক্ষে বিস্তর ব্যারিস্টার নিযুক্ত হইল। তিন মাস মকদ্দমার পর জজেরা সাব্যস্ত করিলেন সত্যই জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অতএব ইহাতে আসামীর কোনো দোষ নাই। বেণীমাধব প্রিবি কৌন্সিলে আপিল করিলেন। সেখানে বিচারক রায় দিলেন, 'হাঁ, সত্য সত্যই বেণীমাধবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যখন বারো বৎসর ধরিয়া নিয়মিত আড়াই শত জুতা খাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে একদিন দুই শত তেতাল্লিশ জুতা মারা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আর জুতা ছেঁড়ার ওজর কোনো কাজেরই নহে।' বেণীমাধব বুক ফুলাইয়া বলিল, 'হাঁ হাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি!' সাধারণ লোকেরা বলিল, 'না হইবে কেন! কত বড়ো লোক? উঁহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' এই উপলক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টে একটা আর্টিকেল লিখিত হয়; তাহাতে অনেক উদাহরণসমেত উল্লেখ থাকে যে, 'ইংরাজ জুতা-বর্দারেরা আমাদের বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত নেটিব কর্মচারীদিগের মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। যাহার যত বরাদ্দ তাহাকে তাহার কম দিতে শুনা যায়। অতএব আমাদের মতে বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত হউক। কিন্তু এক কথায় তাঁহার সে-সমস্ত যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়—'যদি বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত করা যায় তবে তাহাদের জুতাইবে কে?' আজকাল বঙ্গদেশে একমাত্র আশীর্বাদ প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'পুত্র-পৌত্রানুক্রমে গবর্নমেন্টের জুতা ভোগ করিতে থাকো, আমার মাথায় যত চুল আছে তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।' সেই আশীর্বচনের সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।[১]

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

চীনে মরণের ব্যবসায়[২]

একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল; এমনতরো নিদারুণ ঠগী-বৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি আহিফেন খাইব না।' ইংরাজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিস সে কোনো মতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর-এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ-সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। যে জাতি আফ্রিকার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া

---

১. 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says, 'Kick them first and then speak to them.'—*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে যে, বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।—সং

২. *The Indo-British Opium Trade* by Theodore Christlieb DD. Ph.D. Translated from the German by David B. Croom, M.A.

শত শত অসহায়ের আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন, সেই জাতি আজ চীনকে কামানের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিতেছেন, 'আমার পয়সার আবশ্যক হইয়াছে তুই বিষ খা।' আসিয়ার একটি বৃহত্তম, প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষঃস্থলে বসিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংসে বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু করিয়া লাভ করিতেছেন। এক পক্ষে কতই বা লাভ, আর-এক পক্ষে কী ভয়ানক ক্ষতি!

চীনে যেরূপ এই বাণিজ্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণা সঞ্চার হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার সকল পাঠ করিলেও এত খারাপ লাগে না, তাহাতে মনে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা ভীষণ ভাবের উদ্রেক হয় মাত্র, কিন্তু এই চীনের অহিফেন বাণিজ্যের মধ্যে এমন একটা নীচ হীন প্রবৃত্তির ভাব আছে, দস্যুবৃত্তির অপেক্ষা চৌর্যবৃত্তির ভাব এত অধিক আছে যে, তাহার ইতিহাস পড়িলে আমাদের ঘৃণা হয়।

১৭৮০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মেকাও-সমীপবর্তী লার্ক উপসাগরে দুইটি ছোটো অহিফেনের জাহাজ পাঠাইয়া দেন। তখনো চীনে অহিফেন নেশার দ্রব্য স্বরূপে প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে কেবল ঔষধ স্বরূপে ২০০ সিন্দুক অহিফেন চীনে আমদানি হইত। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে যে ২৮০০ সিন্দুক অহিফেন চীনে আসিয়াছিল, দেশে তাহার খরিদ্দার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র ব্রত হইল কিসে এই পাপ চীনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজেরা যখন আবশ্যক বিবেচনা করেন, তখন চাতুরী ও ধূর্ততার খেলা চমৎকার খেলিতে পারেন। চীনে সেই খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা এতদূর সফল হইয়া আসিল যে, ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে অহিফেনের আমদানি একেবারে বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন প্রচার করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইংরাজ বণিকেরা বেআইনী গোপন ব্যবসায় (smuggling) চালাইতে লাগিলেন। ন্যায্য বা অন্যায্য যে উপায়েই হউক, প্রকাশ্যভাবেই হউক আর চৌরের ন্যায় অতি গোপনভাবেই হউক, চীনকে অহিফেন সেবন করাইতে কোম্পানি একবারে দৃঢ়-সংকল্প।

গোলযোগ দেখিয়া অহিফেনের জাহাজ লার্ক উপসাগর হইতে হ্বাম্পোয়াতে সরানো হইল। চীন গবর্নমেন্ট যাহাতে হ্বাম্পোয়াতে কোনো জাহাজে অহিফেন লইয়া না আসে, তাহার জামিন হংকং-এর সমস্ত বণিকদের নিকট হইতে লইলেন। এই আইন হইল যে, যদি কোনো জাহাজে অহিফেন থাকে, তবে সে জাহাজ তৎক্ষণাৎ মাল না নামাইয়া বন্দর হইতে চলিয়া যাইবেক এবং জামিনদাতাদের শাস্তি হইবে। এই আইন মাঝে মাঝে প্রায় পুনঃপ্রচারিত হইত, তথাপি তাহার বিশেষ ফল হইল না। অবশেষে ১৮২১ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনের শাসনকর্তা বেআইনি গোপন ব্যবসায় সকল নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইংরাজ, পর্টুগিজ ও মার্কিনদিগকে, এই অতি হীন বাণিজ্য-প্রণালী ও চীন রাজকর্মচারীদিগকে নীতিভ্রষ্ট করা রূপ অতি ঘৃণিত কার্য পরিত্যাগ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হ্বাম্পোয়া হইতে তাঁহাদের জাহাজ সরাইয়া লিন্-টিন দ্বীপে লইয়া গেলেন। চীনের সমস্ত উপকূল পর্যটন করিবার জন্য জাহাজ প্রেরিত হইল। সেই-সকল জাহাজ হইতে কিছু দূরে অন্যান্য অহিফেন সমেত জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই জাহাজসমূহ হইতে অহিফেন লইয়া লুকাইয়া চুরাইয়া বেআইনি বাণিজ্য চলিতে লাগিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগে লোকদের মধ্যে এই নেশা প্রচলিত করাইবার জন্য চীন রাজকর্মচারীদের ইংরাজেরা প্রায় মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে লাগিল। ক্রিস্‌ট্‌লিয়েব্ বলিতেছেন যে, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্নমেন্ট চীনবাসীদের নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে ও উপরিস্থ ব্যক্তিদিগের অবাধ্য হইতে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, এমন আর কেহ দেয় নাই।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে অহিফেন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নূতন শাসন প্রচারিত হইল। কিন্তু তথাপি গোপন ব্যবসায় এতদূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল যে, সমস্ত চীন দেশে অহিফেন লইয়া একটা

আন্দোলন উপস্থিত হইল। চীনের দেশ-হিতৈষীরা ইংরাজদের সহিত সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া সম্রাট ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিধিস্বরূপ লিন্‌কে ক্যান্টনে প্রেরণ করিলেন। লিন্ বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত অহিফেন ধ্বংস করিয়া দিলেন, ইংরাজদের সহিত বাণিজ্য রহিত করিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কর্মচারীকে চীন হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল।

যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল। পাঁচটি বন্দর ইংরাজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হইল, হংকং ইংরাজেরা লাভ করিলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে চীনের নিকট হইতে আদায় করিলেন। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দিলেন যে, 'বেআইনী সমস্ত পণ্যদ্রব্য চীন গবর্নমেন্ট কাড়িয়া লইতে পারিবেন।' এই অবসরে ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে গণ্য না হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরাজ প্রতিনিধি সার্ পটিঞ্জরকে চীন কর্তৃপক্ষীয়েরা অহিফেন বাণিজ্য একেবারে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, জাহাজে অহিফেন দেখিলে কাড়িয়া লইয়ো, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করিতে পারিব না।' তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, অহিফেন-বাণিজ্যতরীসকল যুদ্ধ-সজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত দুর্বল চীন তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। এইরূপে প্রকাশ্যভাবে, অসহায় চীনের চোখের সামনে বেআইনী ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

বিদেশীয়েরা উপর্যুপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, 'লোহিত-কেশ' বিদেশীদের একেবারে বিনাশ করিতে তাহারা কল্পনা করিল। রাজকর্মচারী ইয়েঃ 'অ্যারো' নামক একটি ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করাতে পুনর্বার চীনদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। এবারে ফ্রান্স ইংলন্ডের সহিত যোগ দিলেন।

হতভাগ্য পরাজিত চীনকে সাতটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইল। অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না। কেবল অহিফেনের উপর মাশুল নির্দিষ্ট হইল। যাহাতে মাশুল গুরুতর হয় চীনেরা তাহার জন্য বারংবার নিবেদন করে, কিন্তু ইংরাজরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এইবারের সন্ধির পর হইতে অহিফেনের বাণিজ্য এমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল যে, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে চীনে ৯০০০০ বাক্স অহিফেন আমদানি হইয়াছে।

এখন চীনে কোটি কোটি লোক অহিফেন সেবন করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন বাড়িতে কেহ আসিলে আমরা তামাক দিই, চীনে সেইরূপ ধনী লোকেরা ও শ্রীসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা প্রায় সাক্ষাৎকারীদের ও খরিদ্দারদের চণ্ডুর হুঁকা দিয়া থাকে। রাস্তায় রাস্তায় চণ্ডুর দোকান খুলিয়াছে। স্যানিহিয়েন নগরে অহিফেন-ধূম সেবনের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, অধিবাসীরা নেশায় ভোর হইয়া দিনের বেলায় কোনো কাজ করিতে পারে না, মশাল জ্বালাইয়া রাত্রে কাজ করে। এক নিংপো নগরে কেবল দরিদ্র লোকদিগের জন্য ২৭০০ চণ্ডুর দোকান আছে। দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে অহিফেন সেবনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। প্রথম কারণ, লোকেরা অকর্মিষ্ঠ, দ্বিতীয় কারণ, এত অধিক জমি অহিফেনের চাষে নিয়োজিত যে, যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদনের স্থান নাই। এমন হইয়াছে দুর্ভিক্ষের সময় লোকের হাতে টাকা আছে, অথচ তাহারা টাকা খুঁজিয়া পায় না। তখন তাহারা বুঝিয়াছে যে, অহিফেনে পেট ভরে না। চীনবাসীরা ক্রমশই অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যখন এক হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার মধ্য হইতে দুইশত অহিফেনসেবী অকর্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী দলের মধ্যে সকলেই অহিফেন-বিদ্বেষী ছিল, অহিফেনসেবী রাজসৈনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্যুপরি পরাজিত হয়। চীনেরা বলে যে, সহজে চীনদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে ধূর্ত ইংরাজেরা অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে।

অহিফেনের জন্য প্রতি বৎসর চীনদেশ হইতে এত টাকা বাহির হইয়া যায় যে, ক্রমশই সে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে চীন ৮ কোটি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৮১ পাউন্ড অহিফেন কিনিয়াছে। কী ভয়ানক ব্যয়! অহিফেনসেবীদের নীতি এমনি বিগড়িয়া যায় যে, তাহারা নিজের সন্তান বিক্রয় করে ও নিজের স্ত্রীকে ভাড়া দেয়, চুরি-ডাকাতির তো কথাই নাই।[১] এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। যেন, ইংরাজদিগের নিকট ধর্মের অনুরোধ নাই, কর্তব্যজ্ঞানের অনুরোধ নাই, সহৃদয়তার অনুরোধ নাই, কেবল একমাত্র পয়সার অনুরোধ বলবান। এই তো তাঁহাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃস্টীয় সভ্যতা!

পাদ্রিদিগের ধর্মোপদেশ শুনিলে চীনবাসীদের গা জ্বলিয়া যায়। জ্বলিবার কথাই তো বটে! একবার একজন আমেরিকান পাদ্রি কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সেখানে একদল লোক জুটিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। তাহারা তাঁহাকে বলে, 'তোমরা আমাদের সম্রাটকে হত্যা করিলে, আমাদের রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ করিলে, আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে, আর আজ আমাদের ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ!!' একজন ইংরাজ ফাট্‌সান নগরে চণ্ডুর দোকান দেখিতে গিয়াছিলেন, একজন চণ্ডুপায়ী তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে তাহার দৈনিক উপার্জনের দশ ভাগের আট ভাগ চণ্ডুপান করিয়া ব্যয় করে। সে অবশেষে ইংরাজটিকে বলে, 'তুমি তো ইংলন্ড হইতে আসিতেছ? তাহা হইলে অবশ্য তুমি আমাদের মৃত্যুর নিদান বিষ লইয়া কারবার করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রানীটি না জানি কীরূপ দুষ্ট স্ত্রীলোক! আমরা তোমাদের ভালো ভালো চা ও রেশম পাঠাই, আর তিনি কি না তাহার পরিবর্তে আমাদের বধ করিবার জন্য বিষ পাঠাইয়া দেন?' ইংরাজদের সম্বন্ধে চীনেরা এইরূপ বলে।

এই এক অহিফেন ব্যবসায় সম্বন্ধে বিদেশীয়দের প্রতি চীনের এতদূর অবিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা স্বদেশে রেলোয়ে প্রভৃতি নির্মাণ করিতে চাহে না, পাছে অহিফেন দেশের অভ্যন্তরদেশে অধিক করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। পাছে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশীদের আমদানি হয়! এমন-কি, লৌহ ও কয়লার খনি ব্যতীত দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো খনি চীন গবর্নমেন্ট স্পর্শ করেন না, পাছে খনিতে বিদেশীয় কর্মচারী রাখিতে হয় ও পাছে বিদেশীয় বাণিজ্য আরও বাড়িয়া উঠে। অহিফেনে চীনের রাজস্বলাভ বড়ো অল্প হয় না, তথাপি চীন জোড় হস্তে বলে, 'তোর ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, তোর কুকুর ডাকিয়া ল'!' পটিঞ্জর যখন অহিফেনকে নিষিদ্ধ পণ্য-শ্রেণী-বহির্ভূত করিতে সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করেন, তখন সম্রাট টাও কাং এই কথা বলিয়াছিলেন, 'সত্য বটে, এ বিষের সঞ্চরণ আমি কোনো মতে রোধ করিতে পারিব না, কারণ অর্থলোলুপ, নীতিভ্রষ্ট লোকেরা লোভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির বশ হইয়া আমার মনের ইচ্ছা বিপর্যস্ত করিয়া দিবে। তথাপি আমি বলিতেছি— আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই হইবে না।'

ইংরাজ জাতির প্রতি চীনের এইরূপ দারুণ অবিশ্বাস থাকাতে ইংরাজদের কম লোকসান হইতেছে না। চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। ইংরাজি পণ্য চীনে অল্প আমদানি হয়, এবং তাহা দেশের অভ্যন্তর ভাগে চালান করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। অল্প দিন হইল লন্ডন ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে গবর্নমেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

এই অহিফেন বাণিজ্যে ভারতবর্ষেরই বা কী উপকার অপকার হইতেছে দেখা যাক।

---

১. একজন চীনবাসী অহিফেন-ধূমপায়ী বলিয়াছেন যে, 'দক্ষিণ পর্বতের সমস্ত বাঁশে (বাঁশের কলম) অহিফেনের দোষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; উত্তর সমুদ্রের সমস্ত জলেও ইহার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না।'

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অধিকাংশ এই অহিফেন বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ক্ষতিবৃদ্ধিশীল বাণিজ্যের উপর ভারতবর্ষের রাজস্ব অত অধিক পরিমাণে নির্ভর করাকে সকলেই ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। ১৮৭১/৭২ খৃস্টাব্দে এই বাণিজ্য হইতে সাড়ে সাত কোটি পাউন্ডেরও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা ৬ কোটি ৩ লক্ষ পাউন্ডে নামিয়া আসে। এরূপ রাজস্বের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। ভারতবর্ষীয় অহিফেন নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার দাম কমিবার কথা। তাহা ভিন্ন চীনে ক্রমশই অহিফেন চাষ বাড়িতেছে। চীনে স্থানে স্থানে অহিফেন-সেবন-নিবারক সভা বসিয়াছে। ক্যান্টনবাসী আমীর-ওমরাহগণ প্রায় সহস্র প্রসিদ্ধ পল্লীতে প্রতি গৃহস্থকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, 'তোমরা সাবধান থাকিয়ো যাহাতে বাড়ির ছেলেপিলেরা অহিফেন অভ্যাস না করিতে পায়।' যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। তিনটি বড়ো বড়ো নগরের অধিবাসী বড়োলোকেরা সমস্ত অহিফেনের দোকান বন্ধ করাইতে পারিয়াছেন। এইরূপে চীনে অহিফেনের চাষ এত বাড়িতে পারে, ও অহিফেন সেবন এত কমিতে পারে যে, সহসা ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব ওই বাণিজ্যের উপর রাজস্বের জন্য অত নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় দেখা উচিত। এতদ্ভিন্ন অহিফেন চাষে ভারতবর্ষের স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে। অহিফেন চাষ করিতে বিশেষ উর্বরা জমির আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষে দেড় কোটি একর (Acre) উর্বরতম জমি অহিফেনের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্বে সে-সকল জমিতে শস্য ও ইক্ষু চাষ হইত। এক বাংলা দেশে আধ কোটি একরেরও অধিক জমি অহিফেন চাষের জন্য নিযুক্ত। ১৮৭৭/৭৮-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক কোটি লোক মরে। আধ কোটি একক উর্বর ভূমিতে এক কোটি লোকের খাদ্য জোগাইতে পারে। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ডাক্তার উইল্‌সন পার্লিয়ামেন্টে কহিয়াছেন যে, মালোয়াতে অহিফেনের চাষে অন্যান্য চাষের এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, নিকটবর্তী রাজপুতানা দেশে ১২ লক্ষ লোক না খাইয়া মরে। রাজপুতানায় ১২ লক্ষ লোক মরিল তাহাতে তেমন ক্ষতি বিবেচনা করি না, সে তো ক্ষণস্থায়ী ক্ষতি। এই অহিফেনে রাজপুতানার চিরস্থায়ী সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সমস্ত রাজপুতানা আজ অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। অত বড়ো বীর জাতি আজ অকর্মণ্য, অলস, নির্জীব, নিরুদ্যম হইয়া ঝিমাইতেছে। আধুনিক রাজপুতানা নিদ্রার রাজ্য ও প্রাচীন রাজপুতানা স্বপ্নের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত বড়ো জাতি অসার হইয়া যাইতেছে। কী দুঃখ! আসামে যেরূপে অহিফেন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আসামের অতিশয় হানি হইতেছে। বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ক ক্রস্ সাহেব বলেন, 'অহিফেন সেবন রূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর রাজ্য জনশূন্য ও বন্য জন্তুর বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মতো অমন ভালো একটি জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতিভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।' অহিফেন বাণিজ্য আমাদের ভারতবর্ষের তো এই-সকল উপকার করিয়াছে!

চীনের রাজা যদি বলিতে পারেন যে, 'আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি কিছুতেই হইবে না।' তবে খৃস্টীয় ধর্মাভিমানী ইংরাজেরা কি বলিতে পারেন না যে, 'একটি প্রকাণ্ড জাতির পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমরা লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমাদের না হয় যেন।' কিন্তু আমরা খৃস্টান জাতিকে তো চিনি! এই খৃস্টান জাতিই তো প্রাচীন আমেরিকানদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন! এই খৃস্টান ইংরাজদের লোভ-দৃষ্টিতে কোনো দুর্বল 'হীদেন' দেশ পড়িলে তাঁহারা কীরূপ খৃস্টান উপায়ে তাহা আদায় করেন তাহাও তো আমরা জানি। এই খৃস্টান ইংরাজগণ বর্মায় কীরূপ খৃস্টান নীতি অবলম্বনপূর্বক অহিফেন প্রচলিত করেন তাহাও তো আমরা জানি। ইংরাজদের মুষ্টিতে আসিবার পূর্বে আরাকানে অহিফেনসেবীদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সরল-হৃদয় লোক ছিল। অবশেষে কী হইল? ইংরাজ বণিকগণ অহিফেনের দোকান খুলিলেন। যত প্রকার

উপায়ে এই নেশা দেশে প্রচলিত হইতে পারে তাহা অবলম্বন করিলেন। অল্পবয়স্ক লোকদের দোকানে ডাকিয়া আনিয়া অহিফেন দেওয়া হইত। প্রথমে তাহার মূল্য লওয়া হইত না, অবশেষে এই উপায়ে অহিফেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল, বণিকদের পকেট পূরিতে লাগিল, গবর্নমেন্টের রাজস্ব বাড়িতে লাগিল। তাহার ফল কী হইল? আরাকানের সুস্থ বলিষ্ঠ জাতি অহিফেনের অন্ধ অনুরক্ত হইল, দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল। তাহাদের শরীর ও নীতির ধ্বংস সাধিত হইল। এই তো খৃস্টান জাতি! যাহাদের বল নাই, যাহাদের সহায় নাই, তাহাদের সহিত ইংরাজ খৃস্টানরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জগতে বিদিত। তাহাদের তাঁহারা লাথি মারিতে চান। খৃস্টানশাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার এক গালে চড় মারিলে আর-এক গাল ফিরাইয়া দিবে! খৃস্টান ইংরাজগণ যখন রাজস্বের লোভ দেখাইয়া চীনের সম্রাটকে চীন হত্যা করিতে পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন, তখন অখৃস্টান চীনের সম্রাট যে মহদ্‌বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজদের খৃস্টানী গালে চড় মারা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় তাহার কোনো ফল হইল না।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

নিমন্ত্রণ-সভা

দশ জনে একত্রে মিলিত হইবার অনুষ্ঠান আমাদের নাই। আমাদের সামাজিক ভাব এতই অল্প যে, সম্মিলনের মূল্য আমরা বুঝি না। অনেক লোক একত্র হইলে সেই একত্র হওয়ার জন্যই যে আমোদ, শুদ্ধ পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয়, কথাবার্তা কহিবার যে সুখ, তাহা আমরা ভালো করিয়া উপভোগ করিতেই পারি না। আমরা আলাপ-পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাস করিতে নিমন্ত্রণ-সভায় যাই না, আহার করিতে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। নিরাহার নিমন্ত্রণ আমাদের কানে অত্যন্ত হাস্যজনক, ঘৃণাজনক বলিয়া ঠেকে। নিমন্ত্রণের আর-এক অর্থই— পরের বাড়িতে গিয়া আহার করা। 'নিমন্ত্রণ' বলিলেই আহার করা ভিন্ন আর কোনো ভাব আমাদের মনে আসে না। ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কতকগুলা গোল, চৌকোণা, চেপ্টা, লম্বা, চৌড়া, তরল, কঠিন পদার্থ উদরের মধ্যে বোঝাই করাকেই কি আমরা শ্রেষ্ঠতম সুখ মনে করি না? একে তো আমরা শুদ্ধ কেবল সম্মিলনের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করি না, বিবাহ উপলক্ষে, পূজা উপলক্ষে ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে করিয়া থাকি, তাহাতে আবার নিমন্ত্রণ করি কী উদ্দেশ্যে? না, শুদ্ধ কেবল আহারের উদ্দেশ্য। সাধারণত আমরা ভাবিয়া পাই না যে, শুদ্ধ কেবল বিশ-ত্রিশ জন লোক মিলিয়া, ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কথাবার্তা কহিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া গেল, এ পাগলা গারদ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে? মনে করো, নিজের বাড়ি হইতে পরের বাড়ি যাইতে হইলে আমাদের কি কম হাঙ্গামা করিতে হয়? ধুতির কোঁচাটা চাদরের কাজ করিতেছিল, সেটাকে তাহার যথা-কাজে নিয়োগ করিয়া আবার একটা চাদর বাহির করিতে হয়, জুতা পরিতে হয়, জামা পরিতে হয়, তাহা ছাড়া আবার যাতায়াতের হাঙ্গামা আছে। এত পরিশ্রম বাঙালি করিতে রাজি আছে, যদি কিঞ্চিৎ আহার পায়। নহিলে বাড়িতে তাঁহার এমনি কী শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার তাকিয়া ত্যাগ করিয়া, হাই-তোলা কাজ কামাই করিয়া, পরের বাড়িতে বাজে কথা কহিতে যাইবেন? যাহা হউক, দশটা বাঙালিকে একত্রে জড়ো করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখানো, বাঙালিদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ওই উপায়ে একত্রিত করা যায়।

একে তো আহারের সময়ে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন নিষেধ, তাহাতে নিষেধ সত্ত্বেও যদি বা কথোপকথন চলে, তবে সে লুচিগত, সন্দেশগত, রসগোল্লাগত কথোপকথনে সুরুচিবান

ব্যক্তিদের বড়োই বিরক্তি বোধ হয়। আহারের সময়ে আহারটাই নিমন্ত্রিতবর্গের মনে সর্বাপেক্ষা জাগরূক থাকে, সে সময় যে কথোপকথন নির্মিত হইতে থাকে, তাহার ভিত্তি উদর, তাহার ইষ্টক সন্দেশ, তাহার কড়িকাঠ পানতোয়া ও তাহার ছাদ লুচির রাশি। নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে যাওয়া, আহারটি করা ও পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসা নিমন্ত্রিতের কর্তব্য কাজ।

আমাদের নিমন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক ভাব এত অল্প যে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা প্রতিনিধি পাঠাই। আমরা জানি যে, আহার করানোই আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য, আমি আহার না করি, আমার হইয়া আর-এক জন করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমার ভাইপোকে বা ভাগ্নেকে বা উভয়কে পাঠাইয়া দিলাম, তাহারা সাটিনের কাপড় পরিয়া এক পেট খাইয়া আসিল। পরস্পরকে আমোদ দেওয়া যদি আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার পরিবর্তে অর্ধস্ফুট-বাণী ঝি সহায় একটি ভাগ্নেকে সভাস্থলে পাঠানো কী হাস্যজনক বোধ হইত! নিমন্ত্রণ সারিয়া চলিয়া যাইবার সময় গৃহকর্তা বিনীতভাবে বলেন, 'মহাশয়কে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল।' মনে মনে ভাবি কথাটা মিথ্যা নহে, সাড়ে দশটার সময় আমার অহার করা অভ্যাস, সাড়ে চারিটার সময় আহার জুটিল। আহার ব্যতীত আর কোনো আমোদের যদি বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও এ কষ্ট বরদাস্ত হইত। কিন্তু আমরা মনে করি, আহারই শ্রেষ্ঠতম আমোদ এবং আহার ব্যতীত ভদ্রজনোচিত আমোদ আর কিছুই নাই।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। যদি নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকে তো বলি যে, আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল; প্রশংসা করিবার হইলে বলি যে, আহারের আয়োজন অতিশয় পরিপাটি হইয়াছিল। কাহারও কাছে নিমন্ত্রণের রিপোর্ট দিতে হইলে কোন্ খাদ্যটা ভালো ও কোন্ খাদ্যটা মন্দ তাহারই সমালোচনা বিস্তারিতরূপে করি। নিমন্ত্রণ-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন গল্প কোনো বাঙালি কখনো করে নাই যে—'হরিশবাবু আজ নিমন্ত্রণ-সভায় যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গিরিশবাবু এই কথা বলেন ও যোগেশবাবু এই কথা বলেন। সুরেশবাবু যাহা বলেন, এমনি চমৎকার করিয়া বলেন যে, সকলেরই মনে আঘাত লাগে।' নিমন্ত্রণ-সভায় লুচি, সন্দেশ ও মিঠায়েরই একাধিপত্য। সেখানে গিরিশবাবু, যোগেশবাবু ও সুরেশবাবুগণ আমার আমোদ সাধনের পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যকীয় পদার্থ নহেন। নাট্যশালায় সমাগত ক্রীত-টিকিট দর্শকবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, প্রাপ্ত-পত্র নিমন্ত্রিতবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে ততটুকু উপযোগী।

নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? যাঁহাদের মধ্যে প্রত্যহ পরস্পরের দেখাশুনা হয় না, তাঁহাদের মিলন করাইয়া দেওয়া, যাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের একত্র করিয়া দেওয়া। সামাজিক মানুষের পরস্পরকে আমোদ দিবার ও পরস্পরের নিকট আমোদ পাইবার যে একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহাই চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া। প্রত্যহ যাহা খাইতে পাই, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক খাইতে দেওয়া নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য নহে— অথবা নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে পদধূলি দিয়া ও তাঁহার খরচে এক উদর আহার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে কৃতকৃতার্থ করাও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কার্য নহে।

নিমন্ত্রণকারীর কর্তব্য যে, যে-লোকদের নিমন্ত্রণ করিলে পরস্পরের আমোদ বর্ধন হইবে তাঁহাদের একত্র করা। এখন যেমন আমাদের দেশের নিমন্ত্রণকারী যশ পাইতে ইচ্ছা করিলে সন্দেশ টিপিয়া দেখেন তাহাতে ছানার পরিমাণ অধিক আছে কি না— উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমোদ দিবার ও আমোদ পাইবার গুণ কাহার কীরূপ আছে। কে ভালো গল্প করিতে জানে ও কে মনোযোগ দিয়া শুনিতে জানে। কে ভালো রসিকতা করিতে জানে ও কে ভালো হাসিতে জানে। কে কথা কহিবার কৌশল জানে ও কে চুপ করিয়া থাকিবার কৌশল জানে। তিন জন উকিল যদি থাকেন তবে তাঁহাদের পৃথক পৃথক রাখা উচিত, নহিলে তাঁহারা মোকদ্দমা মামলার কথা পাড়িয়া আদালত-

ছাড়া লোকদিগকে দেশ-ছাড়া করিবার বন্দোবস্ত করেন। তিন জন গ্রন্থকার যদি সভাস্থলে থাকেন তবে তাঁহাদের পাশাপাশি একত্র রাখা যুক্তিসংগত কি না বিবেচনাস্থল, তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। আর, তিন জন যদি রসিকতাভিমানী ব্যক্তি থাকেন, তবে যে উপায়ে হউক তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি রাখা আবশ্যক, তাঁহারা বিজ্ঞানের এই সহজ সত্যটি প্রায়ই বিস্মৃত হন যে, দুইটি পদার্থ একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায় নিমন্ত্রণকারীর এই একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত, যাহাতে নিমন্ত্রিতদিগের সর্বাঙ্গীণ আমোদ হয়। নিমন্ত্রিতদিগেরও কর্তব্য কাজ আছে, তাঁহারা যে মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিমন্ত্রকের কর্তব্য লুচি-সন্দেশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ও তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য সেগুলি জঠরে রপ্তানি করিয়া দেওয়া, তাহা যথার্থ নহে। উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণে তাঁহারাই লুচি, তাঁহারাই সন্দেশ। পরস্পরের মানসিক ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারাই খাদ্য ও পানীয়। মহারাজা সামাজিকতার নিকটে তাঁহার অধীনস্থ আমরা সকলেই এই কর্তব্য-সূত্রে বদ্ধ আছি যে, দশ জন একত্রে আহূত হইলেই পরস্পরকে সুখী রাখিবার জন্য আমরা যথাশক্তি প্রয়োগ করিব। নিমন্ত্রিতবর্গের সকলেরই একমাত্র কর্তব্য, যথাসাধ্য অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা করা। যাহারা সভাস্থলে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজেই কথা কহিতে চাহে, পরের কথা শুনিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজের রসিকতা ব্যতীত আর কোনো কারণে হাসিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক। এক-এক জন যেন মনের মধ্যে কেবল বিছুটির চাষ করিয়াছে, অন্যকে জ্বালাইতে না পারিলে তাহাদের রসিকতা হয় না, তাহারা অসামাজিক— উন্নততর নিমন্ত্রণ-সভার মানসিক আহার্যের পাতে এরূপ অসামাজিক লুচি-সন্দেশগুলি না থাকে যেন, ইঁহাদের কাহারও বা ঘি খারাপ, কাহারও বা ছানা কম, কাহারও বা রসের অভাব।

আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ-সভায় পরস্পরকে আমোদ দিবার ভাব নাই। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর সামাজিকতার ভাব নাই। একটা আমোদের উপকরণ আছে (যেমন নাচ বা আহার) আর আমরা সকলে মিলিয়া তাহা উপভোগ করিতেছি তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকৃষ্টতর সামাজিকতা। বক্তৃতাস্থল, রঙ্গভূমি, নাট্যশালা প্রভৃতিই সেইরূপ অতি ক্ষীণ সামাজিকতার স্থল, নিমন্ত্রণ-সভা নহে। সত্য কথা বলিতে কি আহারই যে আমাদের নিমন্ত্রণস্থলে প্রধান আমোদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা কারণ আছে। আমাদের সামাজিকতার ভাব এতই অল্প যে, পরস্পরকে কী করিয়া আমোদ দিতে হয় তাহা আমরা জানি না। আমোদ দিবার শিক্ষাই আমাদের নাই, আর সে শিক্ষাতেও আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ দিই না। যে ব্যক্তি আমাদের হাসায়, তাহার কথায় আমরা হাসি বটে, কিন্তু তাহাকে কেমন একটু নীচু-নজরে দেখি, তাহার পদ পাইতে আমরা ইচ্ছা করি না। তাহারও আবার কারণ আছে। আমাদের দেশে সচরাচর যাহারা হাসায় তাহারা এমন অশিক্ষিত-রুচি যে, তাহাদের রসিকতা হয় অশ্লীল নয় ব্যক্তিগত, নয় অর্থশূন্য অঙ্গ ভঙ্গিময় ভাঁড়ামি হইয়া পড়ে। এমন-কি, আমাদের ভাষায় wit বা humour-এর কথা নাই। রসিকতা বলিলে যে ভাবটা আমাদের মনে আসে, সেটা কেমন নির্দোষ, নিরীহ, নিরামিষ নহে। আমাকে যদি কেহ 'রসিক' বলে তবে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায়। আমাদের ভাষায় রসিকতার সঙ্গে কেমন একটা কলুষিত ভাবের সংযোগ আছে। ইংলন্ডের সমাজে কথোপকথন-কুশল ব্যক্তিদের যেরূপ অসাধারণ মান, আমাদের দেশে তাহা কিছুই নাই, বরং তাহার উল্টা। ইংলন্ডে কথোপকথন একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তাহার নানা পদ্ধতি আছে, নানা নিয়ম আছে। আমাদের দেশে অধিক কথাবার্তাকে লোকে বড়ো ভালো বলে না। আমাদের দেশে 'স্বর্ণময় নীরবতার' মূল্য জনসাধারণ এত অধিক বুঝিয়াছে যে, আমাদের সামাজিক এক্‌সচেঞ্জে কথাবার্তার রুপার বড়োই হানি হইতেছে। Metallic question-এর বিষয়ে আমি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের সমাজে রুপার দর না বাড়িলে বড়োই অসুবিধা হইতেছে। আমাদের দেশের সভায় পরিচয় হয়, আলাপ হয় না। 'মহাশয়ের নাম?

মহাশয়ের ঠাকুরের নাম?' ইত্যাদি প্রশ্নে 'মহাশয়ে'র চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় লওয়া হয়, কিন্তু আলাপ হয় না। চুপচাপ করিয়া, সংযত হইয়া বসিয়া থাকাকেই আমরা বিশেষ প্রশংসা করি। নিতান্ত বক্তৃতা স্থলে, প্রকাশ্য সভায় এইরূপ ভাব ভালো। কিন্তু নিমন্ত্রণ-সভাতেও যদি চুপচাপ বসিয়া থাকা নিয়ম হয়, তবে নিতান্তই আমাদের ব্যাঘাত হয়, এমন-কি, শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিস্তৃত কথোপকথনের প্রথা না থাকিলে ভাবের আদান-প্রদান চলিবে কীরূপে? নানা প্রকার ভাব সাধারণ সমাজময় ছড়াইয়া পড়িবে কী উপায়ে? আমোদ দিবার আর-এক উপায় গীত-বাদ্য। আজকাল সংগীত অনেকটা প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বে যে ভদ্রলোক সংগীত শিখিত, তাহার মা-বাপেরা তাহাকে খরচের খাতায় লিখিতেন। এখনও যাঁহারা গান-বাজনা শিখেন, তাঁহারা নিজের শখ চরিতার্থ করিতে শিখেন মাত্র। আমাদের সমাজে ভালোরূপে মেশামেশি করিবার জন্য গান শিখিবার যে কিছুমাত্র আবশ্যক আছে তাহা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের নিমন্ত্রণ-সভায় হাসানো দূষ্য। অধিক হাসা বা কথা কহা নিয়ম-বিরুদ্ধ, (কথা কহিবার বিষয়ও অধিক নাই,) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে গান-বাজনা করা অপ্রচলিত, তবে আর বাকি রহিল কী? আহার। অতএব নিমন্ত্রণে যাও আর আহার করো। মনোরঞ্জনীবিদ্যা শিখি না, শিখিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, এমন-কি, অনেক স্থলে শিখা দূষ্য মনে করি। সাধারণত আমাদের কেমন ধারণা আছে যে, পরকে আমোদ দেওয়া পেশাদারের কাজ; আমোদ দেওয়ার কাজটাই যেন নীচু। ইহা অপেক্ষা অসামাজিকতার ভাব আর কী আছে! এমন-কি, গাহিতে বলিলেই নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ গায় তবে সে যেন অন্যান্য লোকের চোখে হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়। পরকে আমোদ দেওয়া কর্তব্যকাজ, তাহার জন্য ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকা উচিত এ ভাব যে কেন হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে বুঝিতে পারি না। আমার ভালো গলা থাক্ বা না থাক্ আমি ভালো গাহিতে পারি না পারি, তোমার মনোবিনোদনে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এ ভাব সামাজিক জাতিদিগের নিকট প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকাতে একটা হানি হইয়াছে। সদাসর্বদা নিমন্ত্রণ করা লোকের পোষায় না। একটা উপলক্ষ না হইলে কেহ প্রায় নিমন্ত্রণ করে না। ইহাতে আমাদের দেশে সম্মিলনের অবসর কম পড়িয়াছে। রোগী দেখিতেও যদি কোনো কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া যায়, তাহা হইলেও খাওয়াইতে হইবে। আপাতত মনে হয়, ইহাতে সামাজিক ভাবের আরও বহুল চর্চা হয়, কিন্তু তাহা নহে। ইহার ফল হয় এই যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া হয় না। সদাসর্বদা যাতায়াত করিলে লোকে নিন্দা করে, এবং কুটুম্বও বড়ো আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করে না! অতএব নিমন্ত্রণের আরেক অর্থ যদি আহার না হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ অনেক বাড়ে, নিমন্ত্রণের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটা যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চা আরও বহুলতররূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক। তাহা হইলে প্রকৃত রসিকতা কাহাকে বলে সে শিক্ষা আমাদের লাভ হইবে, প্রসঙ্গ কীরূপে আলোচনা করিতে হয়, সে অভ্যাস আমাদের হইবে, আহার ব্যতীত যে ভদ্রজনোচিত আমোদ যথেষ্ট আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চেঁচিয়ে বলা

আজকাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চেঁচিয়ে দান করে, চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়, এমন-কি, গোল থামাইতে গোল করে। সেকরা গাড়ি যত না চলে, ততোধিক শব্দ করে; তাহার চাকা ঝন ঝন করে, তাহার জানলা ঝর ঝর করে, তাহার গাড়োয়ান গাল পাড়িতে থাকে, তাহার চাবুকের শব্দে অস্থির হইতে হয়। বঙ্গসমাজও আজকাল সেই চালে চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক ইঞ্চি হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। সমাজটা যে চলিতেছে ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার জো নাই; মাইল মাপিলে ইহার গতিবেগ যে অধিক মনে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঝাঁকানি মাপিলে ইহার গতি-প্রভাবের বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না। ঝাঁকানির চোটে আরোহীদের মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে, আর শব্দ এত অধিক যে, একটা কথা কাহারও কর্ণ-গোচর করিতে গেলে গলার শির ছিঁড়িয়া যায়।

কাজেই বঙ্গসমাজে চেঁচানোটাই চলিত হইয়াছে। পক্ষীজাতির মধ্যে কাকের সমাজ, পশুজাতির মধ্যে শৃগালের সমাজ, আর মনুষ্য জাতির মধ্যে বাঙালির সমাজ যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, ইহা শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইবে।

শুনা গেছে, পূর্বে লোকে গরীবকে লাখ টাকা দান করিয়াছে, অথচ টাকার শব্দ হয় নাই, কিন্তু এখন চার গণ্ডা পয়সা দান করিলে তাহার ঝম্‌ঝমানিতে কানে তালা লাগে। এই তো গেল দানের কথা। আবার, দান না করিয়া এত কোলাহল করা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। ভিক্ষুক আসিল, দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহাকে এক কথায় হাঁকাইয়া দিলাম, এই প্রাচীন প্রথা। কিন্তু এখন লোকে ভিক্ষুক তাড়াইতে গেলে, পোলিটিকল ইকনমির বড়ো বড়ো কথা আওড়াইতে থাকে, বলে, দান না করাই যথার্থ দয়া, দান করাই নিষ্ঠুরতা, ইহাতে সমাজের অপকার করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ভিক্ষাবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখা হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্তই মানি। কিন্তু তোমার মুখে এ-সব কথা কেন? তুমি এক পয়সা উপার্জন কর না, ঘরের পয়সা ঘরে জমাইয়া রাখ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কেবল অকেজো কতকগুলা বিলাস দ্রব্য কিনিয়া পয়সা ধ্বংস কর, ভিক্ষা দিবার সময়েই তোমার মুখে পোলিটিকল ইকনমি কেন? পোলিটিকল ইকনমিটাকে কেবল ঢাকের কাজেই ব্যবহার করা হয়, আর কোনো কাজে লাগে না।

দেশহিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মতো যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে— কিন্তু যখন চোঙ্ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশ-ছাড়া হইতে হয়। আজকাল রাস্তায় ঘাটে দেশহিতৈষিতা-গ্যাসের গন্ধে ভূত পালাইতেছে, অথচ আবশ্যকের সময় অন্ধকার। গ্যাসটা কেবল নাকের মধ্য দিয়াই খরচ হইয়া যায়, বাকি কিছু থাকে না। আত্ম-পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি শূল বেদনার মতো বিরাজমান, যে ব্যক্তি মাকে ভাত দেয় না, ভাইয়ের সঙ্গে লাঠালাঠি করে, পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম পর্যন্তও জানে না— আজকাল সে ব্যক্তিও ভারতবর্ষকে মা বলে, বিশ কোটি লোককে ভাই বলে— শ্রোতারা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। পূর্বে আর-এক রূপ ছিল— তখনকার ভালো লোকেরা বাপ-পিতামহদের ভক্তি করিত— আত্ম-পরিবারের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন ছিল, পাড়া-প্রতিবেশীর উৎসবে আমোদে কায়মনোবাক্যে যোগ দিত, বিপদে-আপদে প্রাণপণে সাহায্য করিত। কিন্তু বাপকে ভক্তি করিলে, ভাইকে ভালোবাসিলে, বন্ধু-বান্ধবদিগকে সাহায্য করিলে, তেমন একটা হট্টগোল উপস্থিত হয় না— পৃথিবীর বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু সমস্ত চুপেচাপে সম্পন্ন হয়। কাজেই এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নীগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে— ও তারাবাজির মতো উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ

করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না আর ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক কাজে দেখে।

আমি বেশ দেখিতেছি, আমার কথা অনেকে ভুল বুঝিবেন। আমি এমন বলি না যে, হৃদয়কে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অথবা একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাই ভালো। যদি সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে পারি, বিশ কোটি লোককে ভাই বলিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কী ভালো হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইল কই? যাহা আমাদের খাঁটি ছিল, তাহা যে গেল; তাহার স্থানে রহিল কী? বীজের গাছগুলা উপড়াইয়া ফেলিলাম, তাহার পরিবর্তে গোটাকতক গোড়া-কাটা বৃক্ষ পুঁতিয়া আগায় জল ঢালিতেছি। বিদেশী বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করার চেয়ে যে আমাদের দিশি ধনুকে তীর ছোঁড়াও ভালো। কিন্তু আমাদের শব্দপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, শব্দের প্রতিই মনোযোগ।

কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। দেখো-না, বাংলা খবরের কাগজগুলি কেবল শব্দের প্রভাবেই পাঠকদের কান দখল করিয়া বসিয়া আছে। কী যে বলিতেছে তাহা বড়ো একটা ভাবিয়া দেখে না, কেবল গলা খাটো না হইলেই হইল। একটা কথা উঠিলে হয়, অমনি বাংলা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়তো বোঝাই হয় নাই, ভালো করিয়া শোনাই হয় নাই, হয়তো সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই— কিন্তু আবশ্যক কী? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধ করি, ততই হো হা করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়। জ্ঞানের অপেক্ষা বোধ করি অজ্ঞতার আওয়াজটা অধিক। ইহা তো সচরাচর দেখা যায়, আমাদের বাংলা সংবাদপত্র দেশের অবস্থা কিছুই জানে না, এমন-কি, দেশের নামগুলা উচ্চারণ পর্যন্ত করিতে পারে না, অথচ গবর্নমেন্টকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দেয়; আইন জানে না, উভয় পক্ষ দেখে না অথচ বিচারককে বিচার করিতে শিখায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তর বিবেচনা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা অনেক দিনে স্থির হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া, অথচ নিজে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসে। গলা ভারী করিয়া কথা কয়, অথচ কথাগুলা ছেলেমানুষের মতো, বলিবার ভঙ্গি এবং বলিবার বিষয়ের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, শুনিলে হাসি পায়। কথায় কথায় ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কেহ বা লিখিলেন, 'অমুক গাঁয়ের নিকট পদ্মায় সহসা এক ঝড় উঠিয়া তিনখানা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, অমুক সালে আর-একবার এইরূপ সহসা ঝড় উঠিয়া অমুক স্থানে আর-দুইখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, আশ্চর্য তথাপি আমাদের গবর্নমেন্টের চৈতন্য হইল না।' কেহ বা বলিলেন—'অমুক গাঁয়ে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় এক ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হয় ও জমিদারবাবুদের এক আস্তাবল পড়িয়া যায়, গবর্নমেন্টের পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল।' কেহ বা লিখিলেন—'বাঙালিরা দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের শাসনকর্তারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না!' হয়তো ইহা হইতে প্রমাণ করিলেন যে, ইংরাজদের স্বার্থই এই যে, আমাদের ডাল ভাত খাওয়াইয়া রোগা করিয়া রাখা। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হইল— বলা হইল যে, যে দেশে এককালে শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা যে ডাল ভাত খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছেন ইহা কেবল বিদেশীয় শাসনের ফল! পাঠ করিয়া উক্ত জগৎবিখ্যাত কাগজের ১৩৭ জন অনারারি পাঠকের সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মাঝে একবার সহসা দেখা গেল, কোনো কোনো বাংলা কাগজ তারস্বরে ইংরাজি *Statesman* পত্রকে গাল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন— রুচি-বিরুদ্ধ কঠোর ও অভদ্রভাবে উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্টেটস্‌ম্যানের অপরাধের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে তাহাই

দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ। অমনি বাংলা খবরের কাগজের ঢাকে কাঠি পড়িল। এরূপ আচরণ অতিশয় হাস্যজনক। যে ব্যক্তি অপ্রিয় সত্য শুনিতে পারে না, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই নহে, সে ব্যক্তি বালক, দুর্বল, লঘুচিত্ত! তুমি কি চাও, আদুরে ছেলেটির মতো কেবল তোমার স্তুতিগান করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া নাচাইয়া বেড়ানোই *Statesman* পত্রের কাজ? তোমার একটা দোষ দেখাইয়া দিলেই অমনি তুমি হাত-পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিবে? যাহার হিতৈষিতার সহস্র প্রমাণ পাইয়াছ, সে যদিই বা হিত কামনা করিয়া একটা কঠোর কথা বলে অমনি তাহা বরদাস্ত করিতে পার না, এমনি তুমি নন্দদুলাল হইয়াছ?— পূর্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তার কুটিল অর্থ বাহির করিতে থাক, এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ? এইরূপ প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় চিৎকার করিবার ভাব প্রতিনিয়ত বাংলা সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে। ইহাতে ফল এই হইতেছে, সাধারণের মধ্যে ছেলেমানুষের মতো এক প্রকার খুঁৎখুঁতে কাঁদুনে ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অনবরত আত্ম-প্রশংসা করিয়া নিজের দোষের জন্যে পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের কর্তব্যভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া কেবল গলার আওয়াজেরই উন্নতি করিতেছি ও চক্ষু বুজিয়া মনে করিতেছি যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমরা ব্যতীত আর বিশ্বসুদ্ধ সকলেই দায়ী।

গোটাকতক ইংরাজি শব্দ আসিয়া আমাদের অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। Independent Spirit নামক একটা শব্দ আমাদের সমাজে বিস্তর অপকার করিতেছে— বাঙালির ছেলেপিলে খবরের কাগজপত্র সকলে মিলিয়া এই Independent Spirit-এর চর্চায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটার প্রভাবে প্রতিমুহূর্তে বাংলাদেশ হইতে সহজ ভদ্রভাব চলিয়া যাইতেছে ও এক প্রকার অভদ্র উদগ্র পরুষ ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খবরের কাগজের লেখাগুলার মধ্যে আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গি দেখা যায়। ভালো মুখে মোলায়েম করিয়া কথা কহিলে যেন Spirit-এর অভাব দেখানো হয়— সেইজন্য সর্বদাই কেমন তেরিয়াভাবে কথা কহিবার ফেসিয়ান উঠিয়াছে— অনর্থক অনাবশ্যক গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা করা খবরের কাগজে চলিত হইয়াছে। যেখানে উপদেশ দেওয়া উচিত সেখানে গালাগালি দেওয়া হয়— যেখানে কোনো প্রকার খুঁত ধরা রুচি-বিরুদ্ধ, সেখানে জোর করিয়া খুঁত ধরা হয়। এইরূপ সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের পক্ষে যে কীরূপ কুশিক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অন্ধকার দেখিতে হয়! আজকালকার ছেলেদের সর্বাঙ্গ দিয়া এমনি Independent Spirit ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে, তাহাদের ছুঁইতে ভয় করে। তাহারা সর্বদাই যেন মারিতে উদ্যত। চব্বিশ ঘণ্টা যেন তাহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া কোমর বাঁধিয়াই আছে। কিসে যে সহসা তাহাদের অপমান বোধ হয়, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক-এক জন ইংরাজ যেমন দিশি-জুতা দেখিলে অপমান বোধ করে— তেমনি দিশি লৌকিক আচরণ ইহাদের পিঠে দিশি জুতার ন্যায় বাজিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোনো অনভিজ্ঞ প্রাচীন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের ঠাকুরের নাম কী?' অমনি ইহারা ফোঁস করিয়া উঠে। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন, জগৎ সংসার ইহাদিগকে অপমান করিবার জন্য অবিরত উদ্যোগী রহিয়াছে, তাই জন্যে ইহারা আগে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার জন্য ধাবমান হয়। শুঁয়াপোকার ন্যায় দিনরাত্রি কণ্টকিত হইয়া থাকাকেই ইহারা Independent Spirit কহে। গল্পে শুনা যায়, এমন এক-এক জন অতি-বুদ্ধিমান আছেন, যাঁহারা নাকে-কানে তুলা দিয়া মশারির মধ্যে বসিয়া থাকেন, পাছে তাঁহাদের বুদ্ধি কোনো সুযোগে বাহির হইয়া যায়; ইঁহারাও তেমনি সজারুর মতো সর্বদাই চারি দিকে কাঁটা উঁচাইয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে থাকেন, পাছে ইঁহাদের কেহ অপমান করে। এদিকে আবার ইঁহারা ভীরুর অগ্রগণ্য; দুর্বলের কাছে, ভৃত্যের কাছে, স্ত্রীর কাছে ইঁহারা Independent Spirit নামক বৃহৎ লাঙ্গুলটা এমনি আস্ফালন করিতে থাকেন যে, কাছাকাছির মধ্যে লোক তিষ্ঠিতে পারে না, আর, একটা শ্বেত মূর্তি দেখিলেই সে লাঙ্গুলটা গুটাইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার ঠিকানা

পাওয়া যায় না। যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্বদাই ভদ্র— সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙের মতো অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্বল, হয় সে লাঙুল গুটাইয়া কুঁকড়ি মারিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মতো ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। আমরাও কেবল দূর হইতে অভদ্রভাবে ঘেউ ঘেউ করিতেছি। শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণের সঙ্গে যখন কোনো কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারই একটা বল থাকে— যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয়। বঙ্গ সমাজে যে আজকাল বিশেষ চেঁচামেচি পড়িয়া গিয়াছে ইহাও তাহার একটি কারণ। বক্তা যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সে এক অতি কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়। যিনি বাংলা দেশের কিছুই জানেন না, তিনি কথায় কথায় বলেন, 'কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধুনদী হইতে ব্রহ্মপুত্র;' ফুঁ দিয়া দিয়া কথাগুলাকে যত বড়ো করা সম্ভব তাহা করা হয়; যেখানে বাংলা দেশ বলিলেই যথেষ্ট হয় সেখানে তিনি এশিয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন না; যেখানে সামান্য জমা-খরচের কথা হইতেছে, সেখানে ভাস্করাচার্য ও লীলাবতীর উল্লেখ না করিলে তাহার মনঃপূত হয় না; একজন ফিরিঙ্গি বালকের সহিত দেশীয় বালককে ঝগড়া করিতে দেখিলে তাঁহার ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুনকে পর্যন্ত মনে পড়ে। যথার্থ প্রাণের সঙ্গে বলিলে কথাগুলা খাটো খাটো হয় ও কিছুই অতিরিক্ত হইতে পারে না।

আজকালকার সাহিত্য দেখো-না কেন, এইরূপ চিৎকারে প্রতিধ্বনিত। পরিপূর্ণতার মধ্য হইতে যে একটা গম্ভীর আওয়াজ বাহির হয়, সে আওয়াজ ইহাতে পাওয়া যায় না। যাহা-কিছু বলিতে হইবে তাহাই অধিক করিয়া বলা, যে-কোনো অনুভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকেই একেবারে নিংড়াইয়া তিক্ত করিয়া তোলা। যদি আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি আরম্ভ হইল, বাজ বাঁশি, বাজ কাঁশি, বাজ ঢাক, বাজ ঢোল, বাজ ঢেঁকি, বাজ কুলো— ইহাকে তো আনন্দ বলে না, ইহা এক প্রকার প্রাণপণ মত্ততার ভান, এক প্রকার বিকার রোগ; যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি ছুরি ছোরা, দড়ি কলসী, বিষ আগুন, হাঁসফাঁস, ধড়ফড়, ছটফট— সে এক বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। এখনকার কবিরা যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী অনুভাবগুলিকে বিকৃতাকার করিয়া তুলিয়া হাটের মধ্যে দিগবাজি খেলাইতে ভালোবাসেন। কোনো কোনো কবিসমাজের নাসিকাকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের ক্ষতগ্রস্ত ভাবকে হয়তো কোনো কুলবধূর নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিতান্ত বেআব্রু কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইহাকেই চেঁচাইয়া কবিতা লেখা বলে। আমাদের প্রাচ্য-হৃদয়ে একটি আব্রুর ভাব আছে। আমরা কেবল দর্শকদের নেত্রসুখের জন্য হৃদয়কে উলঙ্গ করিয়া হাটে-ঘাটে প্রদর্শনের জন্য রাখিতে পারি না। আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে আমাদের প্রাচ্য ভাবকে গলা টিপিয়া না মারিয়া ফেলিতাম, তবে উপরোক্ত শ্রেণীর কবিতা পড়িয়া ঘৃণায় আমাদের গা শিহরিয়া উঠিত। সহজ সুস্থ অকপট হৃদয় হইতে এক প্রকার পরিষ্কার অনর্গল অনতিমাত্র ভাব ও ভাষা বাহির হয়, তাহাতে অতিরিক্ত ও বিকৃত কিছু থাকে না— টানা-হেঁচড়া করিতে গেলেই আমাদের ভাব ও ভাষা স্থিতিস্থাপক পদার্থের মতো অতিশয় দীর্ঘ হইতে থাকে ও বিকৃতাকার ধারণ করে।

যখন বাংলা দেশে নূতন ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হইল, তখন নূতন শিক্ষিত যুবারা জোর করিয়া মদ খাইতেন, গোমাংস খাইতেন। চেঁচাইয়া সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। এখনও সেই শ্রেণীর একদল লোক আছেন। তাঁহাদের অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, তাঁহারা যে হৃদয়ের বিশ্বাসের বেগে চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্ধভাবে চেঁচাইয়া কাজ করেন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের দুর্দশায় তাঁহাদের যে কষ্টবোধ হয় তাহা নহে, তাঁহারা যে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব

করিয়া কোনো কাজ করেন তাহা নহে, তাঁহারা কেবল চেঁচাইয়া বলিতে চান আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইঁহাদের দ্বারা হানি এই হয় যে, ইঁহারা নিজ কার্যের সীমা-পরিসীমা কিছুই দেখিতে পান না— কোথা গিয়া পড়েন ঠিকানা থাকে না। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি বিশ্বাস একটি সংস্কার ধ্রুবতারার মতো জ্বলিতে থাকে, তাঁহারা সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকেন; তাঁহারা জানেন কোন্‌খানে তাঁহাদের গম্যস্থান, কোন্‌ দিকে গেলে তাঁহারা কিনারা পাইবেন। কেবল দৈবাৎ কখনো স্রোতের বেগে ভাসিয়া বিপথে যান।

আমাদের সমাজে আজকাল যে এইরূপ অস্বাভাবিক চিৎকার-প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছু নহে, আমরা হঠাৎ সভ্য হইয়াছি। আমরা বিদেশ হইতে কতকগুলা অচেনা ভাব পাইয়াছি, তাহাদের ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অথচ কর্তব্যবোধে তাহাদের অনুগমন করিতে গিয়া এক প্রকার বলপূর্বক চেঁচাইয়া কাজ করিতে হয়। আমরা নিজেই এখন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্‌ কাজগুলা আমরা বিশ্বাসের প্রভাবে করিতেছি, আর কোন্‌গুলা কেবলমাত্র অন্ধভাবে করিতেছি। কোন্‌খানে আমরা নিজে দাঁড় টানিয়া যাইতেছি, আর কোন্‌খানে আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বড়ো বড়ো বিদেশী কথার মুখোশ পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না? আমাদের যেরূপ দেখাইতেছে আমরা সত্যই কি তাহাই হইয়াছি? যদি হইতাম তাহা হইলে কি এত চেঁচাইতে হইত? আর যদি না হইতেই পারিলাম, তবে কি মাংসখণ্ডের ছায়া দেখিয়া মুখের মাংসখণ্ডটি ফেলিয়া ভালো কাজ করিতেছি? শেষকালে কি অধ্রুবও যাইবে ধ্রুবও যাইবে?

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৯

জিহ্বা আস্ফালন

আমাদের সমাজে একদল পালোয়ান লোক আছেন, তাঁহারা লড়াই ছাড়া আর কোনো কথা মুখে আনেন না। তাঁহাদের অস্ত্রের মধ্যে একখানি ভোঁতা জিহ্বা ও একটি ইস্টিল পেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ অনার্যদের প্রতি অবিরত শব্দভেদী বাণ বর্ষণ করিতেছেন ও পরমানন্দে মনে করিতেছেন তাহারা যে-যাহার বাসায় গিয়া মরিতেছে। তাঁহাদের মুখগহ্বর হইতে ঘড়িঘড়ি এক-একটা বড়ো বড়ো হাওয়ার গোলা বাহির হইতেছে ও তাঁহাদের কল্পিত শত্রুপক্ষের আসমান-দুর্গের উপর এমনি বেগে গিয়া আঘাত করিতেছে ও তাহা হইতে এমনি মস্ত আওয়াজ বাহির হইতেছে যে, বীরত্বের গর্বে তাঁহাদের অল্প পরিসর একটুখানি বুক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। সুতরাং এই-সকল মিলিটেরি ব্যক্তিদিগের নিজের গলার শব্দে নিজের কানে এমনি তালা ধরিয়াছে যে, এখন, কী সৌন্দর্যের মোহন বংশিধ্বনি, কী বিশ্বপ্রেমের উদার আহ্বানস্বর, কী বিকাশমান অনন্ত জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস, কী পরদুঃখকাতরের করুণ সংগীত, কিছুই তাঁহাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করিবার রাস্তা পায় না। যে-কেহ ভাঙা গলায় কামানের আওয়াজের নকল করিতে না চায়, যে-কেহ শিশুদিগের মতো জুজুর অভিনয় করিয়া চতুর্দিকস্থ বয়স্ক-লোকদিগকে নিতান্ত শঙ্কিত করিতেছে কল্পনা করিয়া আনন্দে হাত পা না ছোঁড়ে, তাহারা তাঁহাদিগের নিকট খাতিরেই আসে না। তাঁহারা চান, ভারতবর্ষের যে যেখানে আছে, সকলেই কেবল লড়াইয়ের গান গায়, লড়াইয়ের কবিতা লেখে, মুখের কথায়, যতগুলা রাজা ও যতগুলা উজীর মারা সম্ভব সবগুলাকে মারিয়া ফেলে। যেন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ছত্রে বারুদের গন্ধ থাকে, যাহাতে শুদ্ধমাত্র বঙ্গসাহিত্য পড়িয়া ভবিষ্যতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বাঙালিজাতির মতো এত বড়ো পালোয়ান জাতি আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহারা সর্বদা সশঙ্কিত, পাছে বঙ্গসমাজ খারাপ

হইয়া যায়; ইঁহারা বঙ্গসমাজের কানে তুলা দিয়া রাখিতে চান পাছে সে গান শুনিয়া ফেলে ও তাহার প্রাণ কোমল হইয়া যায়, পাছে সে উপন্যাস পড়ে ও তাহার চিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, পাছে সে নাট্যাভিনয় শোনে ও তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়। দিনরাত্রি কেবল বঙ্গসমাজকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কানের কাছে তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাও, যেখানে যে আছ ঢাকঢোল গলায় বাঁধো, ঢুলিতে দেখিলেই পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা মারো এবং 'উঠ উঠ', 'জাগো জাগো' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলো।

কিন্তু এই বীরপুরুষেরা বড়ো মনের আনন্দে আছেন। একখানা ছাতা ঘাড়ে করিয়া এই-সকল সরু সরু ব্যক্তিরা কেবলই চার দিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল একটা গোলমাল চলিতেছে, মনে মনে অত্যন্ত স্ফূর্তি যে ভারি একটা কাজ করিতেছি। আর যত প্রকার কাজ আছে তাহা নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখেন, যাহারা অন্যান্য কাজে মগ্ন রহিয়াছে তাহাদিগকে কৃপাপাত্র জ্ঞান করেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে করেন, আর সকলে কী ছেলেখেলাই করিতেছে! কাজ যা একমাত্র তিনিই করিতেছেন, কেননা তিনি যে কী করিতেছেন নিজেই তাহা পরিষ্কাররূপে জানেন না, কেবল এক প্রকার অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, খুব একটা কী কাজ করিয়া বেড়াইতেছি। সত্য বটে, এক প্রকার ব্যস্ত কোমরবাঁধা মুষ্টিবদ্ধ উদগ্রভাব সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন যে এ ভাব তাহা তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কী যেন একটা ঘোরতর কারখানা বাধিয়াছে, কী যেন একটা সর্বনাশের উদ্যোগ হইতেছে, কেবল তিনি জাগ্রত সতর্ক আছেন বলিয়াই কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। শ্রাবণের রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণের সময় ব্যাঙের দল নিতান্ত ব্যস্তভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জগতের কানের কাছে অনবরত মকমক্ করিতে থাকে, তাহারাও বোধ করি মনে করে, ভাগ্যে তাহারা ছিল ও প্রাণপণে সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিয়াছে, জগতে তাই আজ প্রলয় হইতে পারিল না। আমাদের বীরপুরুষেরাও মনে করেন, আজি এই দুর্যোগের রাত্রে ভারতবর্ষের ভার বিশেষরূপে তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, এইজন্য উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হুটপাট করিয়া বেড়াইতেছেন ও মনে করিতেছেন জগতের অত্যন্ত উপকার হইতেছে। কাজেই ইহাদের বুক ক্রমেই ফুলিতে থাকে ও প্রাণ ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে থাকে, বঙ্গসমাজ বা বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন। ইঁহারা চান বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুক আর কিছু নয়। ক্ষমতাভেদেও ও অবস্থাভেদে যে প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ও এইরূপে সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারি দিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কতকগুলি সংকীর্ণদৃষ্টি সমালোচক কবিদিগকে কবিত্ব শিখাইয়া আসিতেছেন ও অবিরত বীররস ফরমাস করিতেছেন এবং অবশিষ্ট আটটি রসের মধ্যে কোনো একটি রসের ছিটাফোঁটা দেখিবামাত্র ননীর পুতুলি বঙ্গসমাজের স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন! তাহার কতকটা ফল ফলিয়াছে, বীররসটা ফ্যাশান হইয়া পড়িয়াছে। গদ্য লেখক ও পদ্য লেখকগণ পালোয়ান সমালোচকদিগের চিৎকার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের মুখে বীররসের টুকরা ফেলিয়া দিতেছেন। সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো; বাংলায় ইংরাজিতে গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষরে, অমিত্রাক্ষরে, হাটে ঘাটে, নাট্যশালায়, সভায়, ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো। সকলেই যে অকপট হৃদয়ে বলিতেছে বা কেহই যে বুঝিয়া বলিতেছে তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, 'আজ উনবিংশ শতাব্দী', উনবিংশ শতাব্দীটা যেন বঙ্গসমাজের বাবা স্বয়ং রোজগার করিয়া আনিয়াছে! 'উনবিংশ শতাব্দী' নামক একটা অনুবাদিত শব্দ বাঙালির মুখে শুনিলে অত্যন্ত হাসি পায়। যে বাঙালি দুই দিন বিলাতে থাকিয়া বিলাতকে home বলেন তিনিও ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক কথা বলেন না! উনবিংশ শতাব্দী আমাদের কে? আঠারোটি শতাব্দী যাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে মানুষ করিয়া আসিয়াছে, নিজের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করাইয়াছে, তাহারাই উনবিংশ শতাব্দী লইয়া গর্ব

করিতেছে। আর আমরা আজ দুদিন ইংরাজের সহিত আলাপ করিয়া এমনিভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়াছি যেন ঊনবিংশ শতাব্দীটা আমাদেরই। যেন ঊনবিংশ শতাব্দীটা অত্যন্ত সস্তা দামে বাংলা দেশে নিলাম হইয়া গিয়াছে, আর বঙ্গীয় বীরপুরুষ নামক জয়েন্ট স্টক্ কোম্পানি তাহা সমস্তটা কিনিয়া লইয়াছেন। ভাববিশেষ যখন সমাজে ফ্যাশান হইয়া যায় তখন এইরূপই ঘটে। তখন তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলা কথা মুখে মুখে চলিত হইয়া যায়, সে কথাগুলার যেন একটা অর্থ আছে এইরূপ ভ্রম হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাহার অর্থ ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কৃত্রিমতা মাত্রেই মন্দ, তথাপি মতের কৃত্রিমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভাবের কৃত্রিমতা একেবারে অসহ্য। আজকাল যেখানে যাহার তাহার মুখে 'ভারত মাতা' সম্বন্ধীয় গোটাকতক হৃদয়সম্পর্কশূন্য বাঁধি বোল শুনিতে পাওয়া যায়; তাহারা এমনিভাবে কথাগুলো ব্যবহার করে যেন সব কথার মানে তাহারা জানে, যেন তাহা তাহাদের প্রাণের ভাষা! কিন্তু ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, যে-সকল সমালোচক দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়া এত বড়ো একটি মহৎ ভাবকে ফ্যাশানের ঘৃণিত হীনত্বে পরিণত করিয়াছেন, হৃদয়জাত ভাবকে সস্তা করিবার জন্য কলে ফেলিয়া গড়িতে পরামর্শ দিয়াছেন, অবশেষে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে হাতে দোকানের কেনাবেচা দ্রব্যের মতো, রাংতা-মাখানো শব্দ-উৎপাদক চকচকে ভেঁপুর মতো করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী। যে ভাব ও যে কথার অর্থ ভুলিয়া যাই, যাহারা আর হৃদয় হইতে উঠে না, কেবল মুখে মুখে বিরাজ করে, তাহারা মরিয়া যায় ও জীবন অভাবে ক্রমশই পচিয়া উঠিতে থাকে। দেশহিতৈষিতার বুলিগুলিরও সেই দশা ধরিবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, 'বঙ্গসাহিত্যে ও ছাইভস্মগুলা কেন?' আমি বলিতেছি, 'কী করা যায়! একদল মহা বীর আছেন, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে অগ্নিকাণ্ড করিতে চান। সময় অসময় আবশ্যক অনাবশ্যক কিছু না মানিয়া দিনরাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে চান, কাজেই বিস্তর ছাই ভস্ম জমিয়াছে।'

এইখানে একটা গল্প বলি। একটা পাড়ায় পাঁচ-সাতজন মাতাল বাস করিত। তাহারা একত্রে মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিত। পাড়ার লোকেরা একদিন তাহাদিগকে ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার দিল। সেই প্রহারের স্মৃতিতে পাঁচ-সাত দিন তাহাদের মদ খাওয়া স্থগিত রহিল, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল আজ মদ খাইয়া আর কোনো প্রকার গোল করিব না। উত্তমরূপে দরজা বন্ধ করিয়া তাহারা নিঃশব্দে মদ্যপান আরম্ভ করিল। সকলেরই যখন মাথায় কিছু কিছু মদ চড়িয়াছে, তখন সহসা একজনের সাবধানের কথা মনে পড়িল ও সে গম্ভীর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' অমনি আর-একজন উচ্চতর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' তাহা শুনিয়া আবার আর-একজন আরও উচ্চস্বরে কহিল, 'চুপ্', এমনি করিয়া সকলে মিলিয়া চিৎকারস্বরে 'চুপ্ চুপ্' করিতে আরম্ভ করিল— সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল 'চুপ্'। অবশেষে ঘরের দুয়ার খুলিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিল, পাঁচ-সাতজন মাতাল মিলিয়া রাস্তায় 'চুপ্ চুপ্' চিৎকার করিতে করিতে চলিল, 'চুপ্ চুপ্' শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমাদের উঠ জাগো শব্দটিও কি ঠিক এইরূপ হয় নাই? সকলেই সকলকে বলিতেছে, উঠ, সকলেই সকলকে বলিতেছে, জাগো, কে যে উঠে নাই ও কে যে ঘুমাইতেছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত ভালোরূপ মীমাংসাই হইল না।

ইহাতে একটা হানি এই দেখিতেছি, সকলেই মনে করিতেছে, কাজ করিলাম। গোলমাল করিতেছি, হাততালি দিতেছি, চেঁচাইতেছি, কী যেন একটা হইতেছে। দেশের জন্য প্রাণপণ করিতেছি মনে করিলে নিজের মহত্ত্বে নিজের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অতি নিষ্কণ্টকে সেই অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি। মাথা-মুণ্ডহীন একটা গোলেমালেই সমস্ত চুকিয়া যাইতেছে, আর কাজ করিবার আবশ্যক হইতেছে না।

একদল লোক আছেন, তাঁহারা কেবল উত্তেজিত ও উদ্দীপ্তই করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায় বা লেখায় কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, 'এখনও চৈতন্য

হইতেছে না, এখনও ঘুমাইতেছ? এই বেলা আলস্য পরিহার করো, গাত্রোত্থান করো। আমাদের পূর্বপুরুষদের একবার স্মরণ করো— ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম বশিষ্ঠ ইত্যাদি।' কী করিতে হইবে বলেন না, কোন্ পথে যাইতে হইবে বলেন না, পথের পরিণাম কোথায় বলেন না, কেবল উত্তেজিতই করিতেছেন। বন্দুকের বারুদে আগুন দিতেছেন, অথচ কোনো লক্ষ্যই নাই, ইহাতে ভালো ফল যে কী হইতে পারে জানি না, বরঞ্চ আপনা-আপনির মধ্যেই দু-চারজন জখম হওয়া সম্ভব! কোনো একটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না কেবল তপ্তরক্তের প্রভাবে ইতস্তত ধড়ফড় করিতেছি! কতকগুলা অসম্ভব কল্পনা গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে প্রাণ দিবার চেষ্টা করিতেছি, স্বদেশের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছে, মনে করিতেছি বুঝি তাহা বলপূর্বক দুই হাতে করিয়া উপড়াইয়া ফেলিলেই দেশের পক্ষে ভালো, কিন্তু জানি না যে তাহা হইলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া সাংঘাতিক পরিণাম উপস্থিত করিবে। বীরত্ব ফলাইবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, অথচ সামর্থ্য নাই, কাজেই দৈবাৎ যদি সুবিধামতে পথে অসহায় ফিরিঙ্গি-বালক দেখিতে পান অমনি তিন-চার জনে মিলিয়া তাহাকে ছাতিপেটা করিয়া আপনাদিগকে মস্ত বীরপুরুষ মনে করেন, মনে করেন একটা কর্তব্য কাজ সমাধা হইল। যথার্থ কর্তব্য কাজ চুলায় যায়, আর কতকগুলা সহজসাধ্য মিথ্যা-কর্তব্য তাড়াতাড়ি সাধন করিয়া তপ্তরক্ত শীতল করিতে হয়, নহিলে মানুষ বাঁচিবে কী করিয়া? তাই বলিতেছি, কতকগুলা অর্থহীন অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট উদ্দীপনাবাক্য বলিয়া মিথ্যা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইয়ো না। কারণ, এইরূপ করিলে দুর্বলেরা অভদ্র হইয়া উঠে, অভদ্রতাকে বীরত্ব মনে করে, স্ত্রীর কাছে গর্ব করে ও কার্যকালে কী করিবে ভাবিয়া পায় না। গুরুজনকে মানে না, পূজ্যলোককে অপমান করে ও একপ্রকার খেঁকিবৃত্তি অবলম্বন করে। সম্প্রতি নরিস্ সাহেব ও জুরিস্‌ডিক্‌শন বিল প্রভৃতি লইয়া কোনো কোনো বাংলা কাগজ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। তিরস্কার করিবার সময়, এমন-কি, গালাগালি দিবার সময়েও ভদ্রলোক ভদ্রলোকই থাকে, কিন্তু বানরের মতো মুখ-ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া রুচিহীন অভদ্রের মতো অতিবড়ো শত্রুকেও অপমান করিতে চেষ্টা করিলে নিজেকেই অপমান করা হয়, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের যত না মানহানি হয় ততোধিক আত্মগৌরবের লাঘব করা হয়। এরূপ ব্যবহারকে যাঁহারা নির্ভীকতা ও বীরত্ব মনে করেন তাঁহারা ভীরু, হীন, কারণ প্রকৃত বীরত্ব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে।

পুনশ্চ বলিতেছি, যাঁহারা বক্তৃতা দেন ও উদ্দীপক গদ্য পদ্য লেখেন তাঁহারা যেন একটা উদ্দেশ্য দেখাইয়া দেন, একটা কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেন। আমাদের সমাজের পদে পদে এতশত প্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধি বোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না। দীপ্তরক্ত যুবকেরা যাহাতে কতকগুলা কুহেলিকাময় পর্বতাকার উদ্দেশ্য লইয়াই নাচিয়া না বেড়ান, ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে যে-সকল মহৎ বীরত্বের কারণ প্রচ্ছন্ন আছে সেগুলিকে যেন হেয় জ্ঞান না করেন। গড়ের মাঠে, বা কেল্লার মধ্যেই কেবল বীরত্বের রঙ্গভূমি নাই, হয়তো গৃহের মধ্যে, অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত রণস্থল রহিয়াছে! এত সামাজিক শত্রু চারি দিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে! দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে agitation করিতে হয় না, ইহাতে ঢাকঢোল বাজে না, হট্টগোল হয় না। Agitation করা অনেকের একটা নেশার মতো হইয়াছে, মদ্যপানের মতো ইহাতে আমোদ পান— সকলেই উদ্দেশ্য বুঝিয়া কর্তব্য বুঝিয়া agitate করেন না।

সুযোগ্য বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বঙ্গবাসীদিগকে moderation, অর্থাৎ মিতব্যবহার অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অধিকাংশ বঙ্গযুবক মনে করেন পেট্রিয়ট হইতে হইলে হঠাৎ অত্যন্ত উন্মাদ হইয়া উঠিতে হইবে, হাত-পা ছুঁড়িতে হইবে, ছটোপাটি করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে। তাঁহারা মনে করেন, সফরীপুচ্ছের ন্যায় অবিরত ফর্‌ফরায়মান তাঁহাদের অতি লঘু, অতি ছিব্‌লা

ওই জিহ্বাটার জুরিস্‌ডিক্‌শন সর্বত্রই আছে। একটি স্থির উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া, আত্মসংযমন করিয়া, না ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনাইয়া, বালকের মতো কতকগুলা নিতান্ত অসার কথা না বলিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যাও, গম্যস্থানে গিয়া পৌঁছিবে, যে-সকল পাষাণ স্তূপ পথে পড়িয়া আছে, অবিশ্রাম স্থির প্রবাহ-বেগে তাহারা ক্রমেই ভাঙিয়া যাইবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা আত্মসংযম করিতে শিখিব, যতদিন পর্যন্ত অপরিণত বুদ্ধির ন্যায় আমাদের ভাবে ভাষায় ব্যবহারে একপ্রকার ছেলেমানুষী আতিশয্য প্রকাশ করিব, ততদিন পর্যন্ত বুঝিতে হইবে যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। যখন আমরা নিজের স্বত্ব বুঝিব ও ধীর গম্ভীর দৃঢ়স্বরে যুক্তিসহকারে সেই স্বত্ব দাওয়া করিতে পারিব, তখন আমাদের কথা শুনিতেই হইবে। আর, নিতান্ত বালকের মতো না বুঝিয়া না শুনিয়া কেবল অনবরত আবদার করিলে, ঘ্যানঘ্যান করিলে, চিৎকার করিলে, কে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে? তাই বলিতেছি, আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ করো, ভাবিতে আরম্ভ করো ও বলিতে শেখো, তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো করিয়া বলিলে কী না হয়! আতিশয্যের দিকে যাইয়ো না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসন প্রণালী।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

আমাদের কাছে এক প্রশ্ন আসিয়াছে, জাতীয়তার লক্ষণ কী? কী কী গুণ থাকিলে কতকগুলি লোক একজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। এক দেশে যাহারা থাকে তাহারাই কি এক জাতীয়? কিন্তু তাহা হইলে যে আর-একটা কথা ওঠে। এক দেশ কাহাকে বলে? যে পরিমিত ভূমির অধিকাংশ অধিবাসী এক জাতীয় তাহাই তো এক দেশ। অতএব, গোড়ায় জাতি নির্দেশ না হইলে দেশ নির্দেশ হইবে কী করিয়া? তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে মুসলমানেরাও আমাদের সহিত এক জাতীয় হইয়া পড়ে। তবে কি ধর্মের ঐক্যে জাতির ঐক্য স্থির হয়? তাহাই বা কী করিয়া বলিব? কারণ তাহা হইলে খৃস্টান হইলেই আমি ইংরাজ হইয়া যাই। তাহা হইলে ফরাসি ও জর্মানেরাও ধর্মের ঐক্যে ইংরাজদের সহিত একজাতি বলিয়া গণ্য হয়। যদি বল যাহারা এক রাজতন্ত্রের অন্তর্ভূত তাহারা এক জাতি, তবে তাহার বিরুদ্ধেও বক্তব্য আছে; কারণ তাহা হইলে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশীয়েরাও আমাদের সহিত এক জাতি। কেহ কেহ বলিবেন যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের ঐক্য আছে, তাহারা এক জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে, কারণ আমাদের দেশীয় মহারাষ্ট্রী, বাঙালি, পঞ্জাবি প্রভৃতিদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য আছে; তাহা ছাড়া অনেক বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির আচার-ব্যবহারের অনেক ঐক্য আছে। কেহ কেহ বলিবেন, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ এক সূত্রে বদ্ধ ছিল, ও সেই অবধি পুরুষানুক্রমে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছে তাহাদের এক জাতি বলা যায়। কিন্তু এ নিয়ম তো সর্বত্র খাটে না। একজন হিন্দু কয়েক বৎসর ইংলন্ডে বাস করিয়া অনুষ্ঠানবিশেষ আচরণ করিলে ইংরাজ হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর পূর্বপুরুষ ইংরাজের পূর্বপুরুষের সহিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কখনো একসূত্রে বদ্ধ ছিলেন না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংরাজেরা Nation বলিতে যাহা বুঝেন, আমরা জাতি বলিতে তাহা বুঝি না। জাতি শব্দ Nation অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত এবং Nation অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ হয়। আমরা মনুষ্য সাধারণকে মনুষ্যজাতি বলি, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুজাতি বলি, আবার তাহারও

উপবিভাগকে জাতি বলি, যথা, বাঙালি জাতি, আবার সামাজিক সংকীর্ণ শ্রেণী-বিভাগকেও জাতি শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি, যথা ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি ইত্যাদি। জাতি শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখিতে গেলে দেখা যায়, জন্মের সাদৃশ্য বুঝাইতেই জাতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ক্রমশ ইহার অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

প্রশ্নকর্তা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা হিন্দুজাতি বলিলে যাহা বুঝি, সে জাতিত্ব কিসে স্থির হয়? তাহার উত্তর, ধর্মে। কতকগুলি ধর্ম হিন্দুধর্ম বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম নামক এক মূল ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা চারি দিকে বিস্তারিত হইয়াছে, (তাহা হইতে আরও অনেক শাখা-প্রশাখা এখনও বাহির হইতে পারে) এই-সকল ধর্ম উপধর্ম যাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা হিন্দু। কিন্তু যখনি কোনো হিন্দু এই-সকল শাখা-প্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সর্বতোভাবে ভিন্ন ধর্মবৃক্ষ আশ্রয় করেন তখনি তিনি আর হিন্দু থাকেন না। মুসলমান জাতিদিগেরও এইরূপ। ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি য়ুরোপীয়দিগের এরূপ নহে। রাজ্যতন্ত্রের ঐক্যেই তাহাদের জাতিত্ব নির্ধারিত হয়। একজন ইংরাজ ও একজন মার্কিনবাসীর হয়তো আর কোনো প্রভেদ নাই, উভয়ের এক পূর্বপুরুষ, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ, তথাপি উভয়ে এক Nation-ভুক্ত নহেন, কারণ উভয়ের রাজ্য-তন্ত্রগত প্রভেদ আছে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু জাতির ধর্মই মুখ্য লক্ষণ, আহার ব্যবহার পরিচ্ছদ ভাষা প্রভৃতি গৌণ। ইংরাজ জাতির রাজ্যতন্ত্রই মুখ্য লক্ষণ, ধর্ম প্রভৃতি অবশিষ্ট আর-সকল গৌণ।

এইখানে একটি কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। 'জাতীয়' নামক একটি শব্দ আমাদের ভাষায় নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। 'দেশীয়' শব্দটি কানে যেমন দেশী বোধ হয়, 'জাতীয়' শব্দটি সেরূপ হয় না। অনবরত ব্যবহার করিয়া এ শব্দটি যাঁহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু 'জাতীয় পত্রিকা' বা 'জাতীয় নাট্যশালা' বলিতে কানে কেমন খারাপ শুনায়, কেবল তাহাই নয়, একজন সরল দিশি লোক ও শব্দটির অর্থ ঠিক বুঝিতেই পারিবে না; কারণ জাতি শব্দে আমাদের ভাষায় বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এত অর্থ বুঝায়, যে বিশেষণ যোগ করিয়া না দিলে উহার ঠিক অর্থ নির্দিষ্ট হয় না। হিন্দুজাতীয় পত্রিকা বা হিন্দুজাতীয় নাট্যশালা বলিলে শুনিবামাত্রই অর্থবোধ হয়। তাহাতে এই বুঝায়, ধর্ম ও অন্যান্য ঐক্য থাকাতে যে জাতি হিন্দু নামে উক্ত হইয়াছেন, এই পত্রিকা ও এই নাট্যশালা তাঁহাদেরই কর্তৃক ও তাঁহাদেরই সম্বন্ধীয়। জাতীয় পত্রিকা ও জাতীয় নাট্যশালার পরিবর্তে দেশীয় পত্রিকা ও দেশীয় নাট্যশালা শব্দ ব্যবহার করো, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে কোন্ শব্দটা সাধারণ লোকে শুনিবামাত্রই বুঝিতে পারে।

National fund নামক শব্দ 'জাতীয় তহবিল' 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' ইত্যাদি নানারূপে অনুবাদিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি অর্থের ব্যাঘাত হইতেছে না? যখন মুসলমানদিগের নিকট হইতেও উক্ত ভাণ্ডারের জন্য টাকা লওয়া হইতেছে, তখন উক্ত ভাণ্ডারকে জাতীয় কীরূপে বলা যায়? ইচ্ছা করিলে কে কী না বলিতে পারে কিন্তু ইহা আমাদের ভাষার বিরোধী। তাহার চেয়ে 'দেশীয় তহবিল' বা 'দেশীয় ধনভাণ্ডার' বলা হউক-না কেন? একেবারে অবিকল ইংরাজির তর্জমা করিবার আবশ্যক কী? ইংরাজি Nation শব্দের স্থলে আমাদের দেশ শব্দ ঠিক খাটে না বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যেখানেই National শব্দ ব্যবহার করেন, সেইখানেই সহজ বাংলায় 'দেশীয়' শব্দ প্রয়োগ হয়। National Institution-কে 'দেশীয় অনুষ্ঠান' বলিলেই তবে ঠিক National হয়, নতুবা উহা প্রায় ইংরাজিই থাকিয়া যায়।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। প্রাচীন হিন্দুগণ নিজের নামকরণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যান্য জাতির নাম দিয়াছিলেন, যথা শক, যবন, কিরাত রোমক ইত্যাদি, কিন্তু নিজের নাম নিজে দিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কেবল সাধারণত আর সকলের সহিত প্রভেদ জানাইবার সময় আপনাদিগকে আর্য ও আর সকলকে অনার্য বলিতেন। কিন্তু আর্য শব্দ একটি বিশেষণ শব্দ মাত্র, উহা জাতির বিশেষ নামবাচক শব্দ নহে। অতএব, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত

সাহিত্যে কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? যবন রোমক প্রভৃতিকে শুদ্ধমাত্র যবন রোমক বলা হইত, না যবন জাতি, রোমক জাতি বলা হইত? সংক্ষেপে, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃতে আছে কি না? যদি না থাকে তো কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি না? আর জাতি শব্দ ঠিক কী কী অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার হইত, তাহার প্রয়োগ সমেত কেহ অনুগ্রহ-পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে প্রাচীন ভাষায় 'বর্ণ' বলা হইত, কোথাও কি জাতি বলা হইয়াছে? মাগধ, কৈকেয়, প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে কি প্রাচীন সংস্কৃতে বিভিন্ন জাতি বলা হইয়াছে? এক কথায় জাতি শব্দে প্রাচীন সংস্কৃতে ঠিক কী কী অর্থ বুঝাইত, এবং কী কী বুঝাইত না, সে বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে চাহি।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯০

সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার[১]

উভয় পক্ষের কথা তো শুনা গেল। এখন বিচার করিয়া স্থির করিবার সময় আসিয়াছে। হাজার প্রয়োজনীয় বিষয় হউক তবু এক কথা বার বার শুনিতে ভালো লাগে না, তাহার পরে আবার, শ্রীমতীতে শ্রীমতীতে বোঝাপড়া চলিতেছিল মাঝে হইতে কোথাকার এক শ্রীযুক্ত আসিয়া যোগ দিলে পাঠকরা বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু দুই পক্ষে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইলে শীঘ্র মিটিবে না ও পাঠকদের বিরক্তিজনক হইবে বিবেচনা করিয়া আমি শ্রী তৃতীয় পক্ষ আসিয়া যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমত, গোড়ায় কী কী কথা উঠিয়াছিল ও তাহার কীরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সাজাইয়া দিই, তাহা হইলে বোধ করি আমাকে আর বেশি কথা বলিতে হইবে না।

প্রথম পক্ষ। আমাদের নব্য সম্প্রদায় উন্নতিপথের কণ্টকস্বরূপ কুসংস্কারগুলিকে একেবারে উন্মূলিত করিতে চান, ইহা অপেক্ষা দেশের সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু কোন্‌টা কুসংস্কার সেইটে বিশেষ মনোযোগ করিয়া আগে স্থির করা দরকার। মন্দ মনে করিয়া ভালোকে দূর করিয়া দিলে দেশের বিশেষ উপকার হয় না, কারণ, কেবলমাত্র মহৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ঘরকন্না চলে না। তাহা ছাড়া, দেশী কুসংস্কারের জায়গায় হয়তো বিলাতি কুসংস্কার রোপণ করা হইল, তাহার ফল হইল এই যে, গোরা ডাকিয়া সিপাই তাড়াইলে, এখন গোরার উৎপাতে দেশছাড়া হইতে হয়। যাহা হউক, ইহা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি সেই কুসংস্কারই পুষিতে হইল তবে আমাদের দেশের আয়ত্তাধীন রোগা ভেতো কুসংস্কারই ভালো, বিলাতের গোখাদক জোয়ান কুসংস্কার অতি ভয়ানক!

দ্বিতীয় পক্ষ। উত্তর নাই।

প্রথম পক্ষ। এমন কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা বিলাতি আচার-ব্যবহারের সহিত যাহার মিল আছে তাহাকেই সুসংস্কার মনে করেন ও যাহার বিলাতি প্রতিরূপ নাই তাহাকেই কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করেন। এ বিষয়ে বিবেচনাশক্তি খাটানো বাহুল্য জ্ঞান করেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা বিলাতি অনাবশ্যক আচার-ব্যবহারও সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি

১. ভারতী, আষাঢ় ১২৯০ সংখ্যায় বঙ্গমহিলা সভায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-কর্তৃক পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' প্রকাশিত হলে, ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীমতী' স্বাক্ষরে এর প্রতিবাদ মুদ্রিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় 'তৃতীয় পক্ষ' নামে 'শ্রীরঃ' স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় না যে, তোমরা আমাদের দেশের অনাবশ্যক, এমন-কি, বিশেষ আবশ্যক, অনুষ্ঠানগুলি সগর্বে ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা নব্য বালিকারা, আত্মীয় ও সখীদিগের জন্মতিথির দিনে ছবি-আঁকা কার্ড পাঠাইয়া ইংরাজি ধরনে উৎসব কর, ইংরাজি বৎসরের আরম্ভের দিন ইংরাজি প্রথানুসারে পরস্পরকে কুশল-লিপি প্রেরণ করিয়া থাক, এপ্রিলের ১লা তারিখে ইংরাজদের অনুকরণে পরস্পরকে নানাপ্রকার ঠকাইতে চেষ্টা কর, এ কাজগুলি কিছু মহাপাতক নয়, ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্যও নাই। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তোমরা ভাইদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা বড়ো হইলে জামাইষষ্ঠী পালন কর না কেন? এমনও দেখিয়াছি সামান্য ইংরাজি অনুষ্ঠানের ব্যত্যয় হইলে তোমরা লজ্জায় মরিয়া যাও, আর ভালো ভালো দিশি অনুষ্ঠান পালন না করিলে কিছুই মনে হয় না। ইহা হইতে এইটেই দেখা যাইতেছে যে, তোমরা সুসংস্কার কুসংস্কার বাছিয়া কাজ কর না, দিশি বিলাতি বাছিয়া কাজ কর।

দ্বিতীয় পক্ষ। দেশীয় ভাবের অনাদরে লেখিকার প্রাণে বাজিয়াছে বলিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতে পারেন নাই! লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী। এরূপ পক্ষপাতে হৃদয় প্রকাশ পায় বটে কিন্তু যুক্তির অভাব অনুমান হয়। অনেক নব্যদের কাছে সেকেলে ভাবের আদর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সাহেবিয়ানাই তাহার কারণ নয়। সমাজ সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, নব্য সম্প্রদায় তাহা বুঝিয়াছেন ও কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহের চোটে অনেক সময় হিতে বিপরীত করেন বটে, কিন্তু সেটা কি সাহেবিয়ানা? তাঁহারা সাহেবদের ভালো লইতে গিয়া ধাঁধা লাগিয়া মন্দও লন, কিন্তু দেশকে সাহেবি করিবার জন্য তাহা করেন না, দেশের ভালো করিবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন। কারণ, সাহেবি করিবার ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহারা হ্যাটকোট পরিয়া অবিকল ইংরাজ সাজিতে পারিতেন, কিছুমাত্র দিশি অবশিষ্ট রাখিবার দরকার কী ছিল? যাহা হউক, আমার কথাটার মর্ম এই, নব্য সম্প্রদায় যাহা-কিছু গলদ করেন তাহা অতিশয় উৎসাহের প্রভাবেই করিয়া থাকেন, সাহেবিয়ানা হইতে করেন না।

তৃতীয় পক্ষ। লোকের কাজ দেখিয়া মনের ভাব জানিতে হয়, আমি (এবং লেখিকাদ্বয়) কিছু অন্তর্যামী নহি। প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন যে, একদল লোক আছেন তাঁহারা ইংরাজি অনাবশ্যক এবং অর্থহীন প্রথাগুলিকেও সমাদরে গ্রহণ করেন, অথচ, দিশি অনাবশ্যক, এমন-কি, আবশ্যক প্রথাগুলিকে অকাতরে পরিত্যাগ করেন। ইহা দেখিলেই কী মনে হয়? মনে হয় যে, ইঁহারা আবশ্যক অনাবশ্যক দেখিয়া যে কিছু গ্রহণ করিতেছেন তাহা নয়, ইঁহারা বিলাতিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন, দিশিকে অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। সাহেব দেখিয়া তাঁহাদের ধাঁধা লাগিতে পারে বটে, কারণ আমাদের বরাবর কালো দেখা অভ্যাস, সুতরাং সহসা সাদা দেখিলে ধাঁধা লাগিয়া যায়— কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া নাহয় সাহেবদের দুটো মন্দই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া আমাদের স্পষ্ট ভালো জিনিসগুলিকে পরিত্যাগ করি কেন? শ্রীমতী— গোড়াতেই একটা ভুল করিতেছেন। এইরূপ ধাঁধা লাগাকেই যে বলে সাহেবিয়ানা! সাহেব দেখিয়া ধাঁধা লাগিয়া যখন একজন দিশি লোক সাহেবের অনাবশ্যক প্রথাকে আবশ্যক জ্ঞান করেন ও আমাদের আবশ্যক প্রথাকেও অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও সেই অনুসারে কাজ করেন তখনই বলা যায় তিনি সাহেবিয়ানা করিতেছেন। কারণ, এই সামান্য ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, একজন সাহেব দেখিয়াই আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব এমনি বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, দেশের ভালোও তাঁহার চক্ষে অনাবশ্যক বা মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই ভালো হইতে পারে, তিনি হয়তো সত্য সত্যই মনের সহিত সাহেবিকে শ্রদ্ধেয় ও দিশিকে ঘৃণ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং দেশে সাহেবি প্রচলিত করা ও দিশি নষ্ট করাই তিনি তাঁহার কর্তব্য বিবেচনা করেন, কিন্তু বিনা কারণে কেবলমাত্র ধাঁধা লাগিয়া এইরূপ মনে করাকেই বলে সাহেবিয়ানা অর্থাৎ সাহেবি-প্রিয়তা।

অতএব যখন দেবী জ্ঞানদানন্দিনী অকারণে বিলাতি প্রথা অনুষ্ঠান ও অকারণে দেশী প্রথা পরিত্যাগের উল্লেখ করিয়া তাহাকে সাহেবিয়ানা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আর যাহাই হউক, তিনি যে 'প্রকৃতিস্থ' ছিলেন তাহা সহজেই মনে হয়।

শ্রীমতী— বলেন, সাহেবিয়ানাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা পূরা সাহেবিয়ানা করেন না কেন? তাহা আমি কী জানি? কিন্তু তাঁহারা যতটা করিতেছেন ততটা যে সাহেবিয়ানা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, সে বিষয়ে প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— তাঁহারা কী যে করেন না, তাহা তিনি বলেন নাই, সুতরাং তাহার জবাবদিহি তিনি করিতে পারেন না। হইতে পারে, সমাজের শাসন একেবারে লঙ্ঘন করিতে তাঁহারা সাহস করেন না, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে যতটা সয় ততটা অবলম্বন করিতেছেন; হইতে পারে, পাড়া-প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে পারেন না; হইতে পারে, তাঁহারা যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থা পূরা সাহেবিয়ানার অনুকূল নহে। এমন আরও দুইশো কারণ থাকিতে পারে। এমনও হইতে পারে, সাহেবিয়ানাই তাঁহাদের আদর্শ বটে, অথচ সমাজ-সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন, আগাগোড়া সাহেবি করিলে সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না, সুতরাং কিছু কিছু দিশি রাখিয়া মাঝে মাঝে বিলাতি চাকচিক্য অবলম্বন করিয়া সংস্কার করিবার গর্ব অনুভব করা যায়, কেবল তাহাই নয়, সেই আত্মপ্রসাদের প্রভাবে moral courage-এর ধুয়া ধরিয়া দেশীয় সমাজকে উপেক্ষা করিবার বল সঞ্চয় করা যায়। এই পর্যন্ত থাক্‌। পুনশ্চ পূর্বপক্ষের কথা শোনা যাউক।

প্রথম পক্ষ। এতক্ষণ ছোটো ছোটো প্রথার কথা বলিলাম। কিন্তু এখন একটা বড়ো বিষয়ে হাত দিতেছি। কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'মেয়ে কি একটা ঘটিবাটি যে, একজনের হাত হইতে আর-একজনের হাতে পড়িবে?' এ কী হৃদয়হীন কথা? জগতে ঘটিবাটির অধিকার ছাড়া আর কোনো প্রকারের অধিকার নাই কি? স্নেহ প্রেমের কোনো অধিকার নাই কি? মনুষ্য-সমাজে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা কেন নাই? যার যা খুশি সে তা করে না কেন? তাহার কারণ মানুষের উপর মানুষের অধিকার আছে। পরস্পরের জন্য পরস্পরকে অনেকটা সহিয়া থাকিতে হয়, অনেকটা আত্মসংযম করিতে হয়। এই পরস্পরের প্রতি যে দৃষ্টি রাখা, এ কি কেবল সুবিধার শাসনেই হয়? তাহা নয়, সভ্য সমাজে হৃদয়ের শাসনই বলবান হইতে থাকে। আমি একটি জন্তুকে যত সহজে বধ করিতে পারি, একটি মানুষকে তত সহজে বধ করিতে পারি না, সমাজের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই কি তাহার কারণ? তাহা নয়। তাহার কারণ এই যে, একজন মানুষের হৃদয়ের উপর, দয়ার উপর আর একজন মানুষের অধিকার আছে, সেই অধিকার লঙ্ঘন করা অসভ্যতা, পাপ! এক জাতি বলিয়া মানুষের উপর মানুষের যেরূপ অধিকার আছে, তেমনি এক পরিবার বলিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের পরস্পরের প্রতি বেশি অধিকার আছে, সে অধিকার লঙ্ঘন করিলে সমাজে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপের সৃষ্টি হয়, আবার পরিবারস্থ বিশেষ ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ অধিকার আছে, এই-সকল অধিকারের সহিত ঘটিবাটির অধিকার কি তুলনীয়? অতএব মেয়ের উপরে বাপের অধিকার নাই এ কথা কী করিয়া বলা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষ। তাহা যেন বুঝিলাম, মানিলাম সম্প্রদান প্রথা অন্যায় নহে। কিন্তু ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, সংস্কারকদিগের বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে তো আর সাহেবিয়ানা বলা যায় না। কারণ সাহেবদের মধ্যে সম্প্রদান প্রথা আছে।

তৃতীয় পক্ষ। সাহেবদের মধ্যে কীরূপ প্রথা প্রচলিত তাহা আমি জানি না, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। সকলেই স্বাধীন, সকলেরই স্বতন্ত্র অধিকার আছে, ইত্যাদি ভাব আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, সেই-সকল সাহেবি মতের ধুলায় অন্ধ হইয়া দেশীয় ভাবকে তাড়াতাড়ি উপেক্ষা করিতে যাওয়া কতকটা সাহেবি-প্রিয়তার ফল। ইংরাজেরা যদি ঠিক ইহার

উল্টা কথাটা বলিতেন, আমরা হয়তো ঠিক ইহার উল্টা আচরণ করিতাম। যাহাই হউক, ইহা দেখা যাইতেছে, নব্যদিগের হৃদয়ে এমন একটি ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রভাবে কথায় কথায় অকাতরে তাঁহারা দেশীয় প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার প্রতি একটু দরদ থাকিলে যতটা সাবধানে যতটা বিবেচনা করিয়া কাজ করা যাইত, ততটা করা হয় না। একটা লম্বাচৌড়া মত শুনিবামাত্রই অমনি তড়িঘড়ি এক-একটা দিশি প্রথাকে নির্বাসন করিতে যাওয়ার ভাবটাই ভালো নহে।

প্রথম পক্ষ। আচ্ছা, যদি পূর্বোক্ত সংস্কারকগণ কন্যার উপরে পিতার বা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বাস্তবিকই স্বীকার না করেন, তবে কেন তাঁহারা, কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাহাকে তাহার পিতার পদবী দেন ও বিবাহিত হইলে কেন তাহাকে তাহার স্বামীর পদবীতে ডাকেন? যথা, অবিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি ঘোষ, বিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি নন্দী। তাহার নিজের নামের স্থায়িত্ব নাই কেন? সে কি একটা জড় পদার্থ, তাহার কি এতটুকু স্বাতন্ত্র্য নাই যে যখন যাহাদের ঘরে যাইবে তখনই তাহাদের নাম গ্রহণ করিবে?

দ্বিতীয় পক্ষ। লেখিকা কী অর্থে 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। স্ত্রীলোক বংশের পদবী গ্রহণ করিতে স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের যে কী খর্বতা হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। পুরুষরা তো বংশের উপাধি গ্রহণ করেন, সেইজন্য কি তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র কমিয়াছে?

তৃতীয় পক্ষ। এ কেমনতরো খাপছাড়া উত্তর হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পদবী গ্রহণে তো স্বাতন্ত্র্যের খর্বতা হয় না, কিন্তু পদবী পরিবর্তনে হয়। যত দিন স্ত্রী ঘোষ-পিতার অধীনে আছে ততদিন সে ঘোষ, আর, যখন সে বোস-স্বামীর বাড়িতে গেল তখনই সে বোস হইল, ইহাকে 'প্রকৃতিস্থ' লোকে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বলে না তো কী বলে? বিবাহের পর স্ত্রীর অনুসারে স্বামীর নামেরও পরিবর্তন হয় না কেন? স্বামীরা কর্তা বলিয়া। যাহা হউক, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য ভালো কি মন্দ সে কথা হইতেছে না, কথাটা এই যে যাঁহারা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের পাছে একটুখানি খর্বতা হয় বলিয়া সম্প্রদান প্রথা উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা কোন্ মুখে স্ত্রীলোকের পদবী পরিবর্তন প্রথা গ্রহণ করিতে পারেন?

প্রথম পক্ষ। তবে, যদি বল পরিচয়ের সুবিধার জন্য স্ত্রীলোকদের নামের সহিত পদবী গ্রহণ ও বিবাহ হইলে তাহার পরিবর্তন সমাজের বর্তমান অবস্থায় আবশ্যক করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, ঘোষ বা বোস বলিলে আমাদের দেশে পরিচয়ের বিশেষ কী এমন সুবিধা হইল? আমাদের দেশের ঘোষ বোস প্রভৃতি উপাধি পরিবার-বিশেষের নাম নহে, বিস্তৃত শ্রেণীবিশেষের উপাধি, সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয়ের কোনো সুবিধা হইল না।

দ্বিতীয় পক্ষ। পরিচয়ের সুবিধার জন্যই যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সে কথা লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? আমি তো মনে করি, দেবী ও দাসীর প্রভেদ উঠাইয়া দিবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এককালে শূদ্রেরা দাসত্ব করিত, তাই বলিয়া যখন দাসত্ব করে না তখনও যে নামের সহিত সেই দাসত্বের স্মৃতি যত্নপূর্বক পুষিয়া রাখিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। দ্বিতীয়ত, এখন জাতিভেদ উঠিয়া গিয়া অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে; একজন ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রপত্নী হইলে তিনি আপনাকে দেবী বলিবেন, না দাসী বলিবেন? এরূপ অবস্থায় তিনি কী করিবেন?

তৃতীয় পক্ষ। স্ত্রীলোকের নামের সম্বন্ধে শ্রীমতী অনামিকা একটি ভুল বুঝিয়াছেন দেখিতেছি। দেবী জ্ঞানদানন্দিনী স্ত্রীলোকদিগের নামের শেষে দেবী দাসী যোগ করা লইয়া কিছুই বলেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহার কী মত তাহা জানিও না। তিনি কেবল বলিয়াছেন স্ত্রীলোকদের নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা, কানেও খারাপ শুনায় বটে আবার তাহাতে পরিচয়েরও কোনো সুবিধা হয় না। সুতরাং, এ প্রথাটি ভালো নয়। শ্রীমতী— যে বলিতেছেন নামের সঙ্গে দেবী দাসীর প্রভেদ থাকা ভালো নয়, সে বিষয়ে আমারও তাঁহার সহিত কোনো বিবাদ নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের

নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা যে ভালো এ কথার সহিত পূর্বোক্ত কথাটার বিশেষ যোগ কোথায়। একটা ভালো নয় বটে, কিন্তু আর-একটা যে তাই বলিয়া ভালো তাহা কী করিয়া বলিব। আর শ্রীমতী— যে পরিচয়ের সুবিধার কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, সেটা ভালো করেন নাই। জিজ্ঞাসা করি, নামের সৃষ্টি কিসের জন্য? কেবলমাত্র পরিচয়ের জন্য, উহার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। যদি সে উদ্দেশ্য উপেক্ষা কর তবে নাম রাখিবার কোনো দরকার নাই। জাতিভেদের উপর আমাদের সমাজ-ব্যবহার অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং সামাজিকতার অনুরোধে দাসী ও দেবীর ভিন্ন পরিচয় পাওয়া আমাদের দেশে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহাদের সে অনুরোধ নাই, যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, তাঁহাদের আর দেবী দাসী বলিয়া পরিচয় দিবার দরকার নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বসু বা বাঁড়ুয্যে বলিয়াই বা পরিচয় দেন কীরূপে? কারণ 'বসু' ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয় নয়, পরিবারবিশেষগত পরিচয় নয়, উহা জাতিবিশেষগত পরিচয়। যাঁহারা বলেন 'আমি বসু' তাঁহারা বলেন, 'আমি কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষভুক্ত ব্যক্তি।' বসু বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। সুতরাং সেই তো তাঁহারা জাতিভেদের পরিচয় দিলেন। সেই তো তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির প্রভেদ স্বীকার করিলেন। আমাদের দেশের জাতিভেদ শাস্ত্র অনুসারে নির্দিষ্ট অতএব তুমি যদি একবার জাতিভেদ স্বীকার কর, তবে শাস্ত্র অনুসারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জাতি ও শূদ্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতি, এতটা পর্যন্তই যদি হইল তবে আর দেবী দাসী হইতে বেশি দূরে রহিল কই? তোমাদের কাজে ও কথায় মিল করিতে হইলে দেবী দাসীও ছাড়িতে হয়, ঘোষ বোসও ছাড়িতে হয়। হয়, কেবলমাত্র নামের পূর্বার্ধ রাখিয়া দাও, নয় রমণীপরিচয়সূচক এমন একটি নূতন সাধারণ শব্দ প্রচলিত করিয়া নামের শেষে যোগ করো যাহাতে জাতিভেদের অথবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টত্বের কোনো উল্লেখ না থাকে। বোধ করি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের 'বাই' শব্দ কতকটা এইরূপ। প্রতিবাদে যতগুলি কথা বলা হইয়াছিল, আমরা তাহার সকলগুলিই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, কোনোটিই বোধ করি ছাড়িয়া দিই নাই।

যাহা হউক, যতদূর দেখা গেল, তাহাতে দেবী জ্ঞানদানন্দিনীর অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লেখায় হৃদয় প্রকাশ পাইয়াছে, যুক্তিরও অভাব দেখিলাম না, এবং তাঁহার কথার প্রকৃত প্রতিবাদও দেখিলাম না, সুতরাং এখনও তাঁহারই মত প্রবল রহিল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৯০

ন্যাশনল ফন্ড

'ন্যাশনল' শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি। এমন কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই না, যাহার প্রতি ন্যাশনল শব্দের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি ন্যাশনল কসাইখানা করিলে কেমন হয়। সেখানে ন্যাশনল গোরু জবাই করিয়া ন্যাশনল হোটেলে ন্যাশনল বীফস্টেকের আয়োজন করা যাইতে পারে। কারণ, এখন একদল আর্য উঠিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতি ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না, কিন্তু ন্যাশনল শব্দের গণ্ডূষ করিয়া তাহাকে শোধন করিয়া লন।

ক্রমেই ন্যাশনলের দল-পুষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি ন্যাশনল ফন্ড নামে আর-একটা কথা শুনা যাইতেছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠানকে আগেভাগে জোর করিয়া ন্যাশনল বলা হয় তখনই মনের ভিতর কেমন সন্দেহ হয় বুঝি এ জিনিসটা ঠিক ন্যাশনল নয়, তাই ইহাকে এত করিয়া ন্যাশনল বলা হইতেছে। দুর্গাপূজাকে কেহ যদি বলে ন্যাশনল দুর্গাপূজা, তাহা হইলেই ভয় হয় ইহার কিছু গোলযোগ আছে। এই ফন্ডের সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে।

ন্যাশনল বলিতে আমি তো এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনল বলিবার আবশ্যক হয় না; কারণ তাহা ন্যাশনল নয় বলিয়া কাহারও মুহূর্তের জন্য সন্দেহও হয় না। আমরা অকারণে বড়ো বড়ো কথা ব্যবহার ভালো বলি না, কারণ, তাহা হইলে ক্রমে সে কথাগুলির প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় ও তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোনো ভালো কাজ হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য প্রস্তাবটি ন্যাশনল কি না তাহা স্থির করা আবশ্যক।

শুনা যাইতেছে একমাত্র Political agitationই ওই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ওই শব্দটার বাংলা কী ঠিক জানি না, কেহ কেহ বলেন রাজনৈতিক আন্দোলন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিলাম।

প্রথমত, Political agitation জিনিসটাই ন্যাশনল নয়। ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, ও কথাটা বোঝে খুব কম লোক, আবার যে দু-চার জন লোক বোঝে তাহাদের মধ্যে সকলের ও কাজটার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, কথাটার মানে জানে এই পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, এই কাজটার ভার কাহাদের উপরে এবং তাঁহারা কী উপায়ে ইহা সাধন করিতেছেন? যাঁহারা বাংলা ভাষা অবহেলা করেন, বাংলা ভাষা জানেন না, ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান। গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে National Fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে। অথচ মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, peopleদের উপরেই আমাদের ভরসা। এ-সব ভান করিবার দরকার কী? peopleরা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরাজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! তোমরা যদি তাহাদের ভালোবাসিতে, তবে তাহাদের ভাষা শিখিতে; বিলাতি হৃদয় কী করিয়া উত্তেজিত করিতে হয় তাহাই তোমরা একরত্তি বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া আসিতেছ, যাহারা হাততালি দিতে জানে না, যাহারা রেজোলিউশন মুব্ করে না, সেকেন্ড করে না, যাহারা constitutional history পড়ে নাই তাহাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ কোন্খানে, কোন্খানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তাহা কি তোমরা জান, না, জানিতে কেয়ার কর? শুনিয়াছি বটে, মাঝে মাঝে তোমরা মিটিং ডাকিয়া একজন ইংরাজিতে বক্তৃতা দাও, আর-একজন সেইটেকে বাংলায় ব্যাখ্যা করেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ও দুঃখজনক ব্যাপার কি কিছু আছে? যখন বাঙালির কাছে বাঙালিতে কথা কহিতেছে, তখনও কি ইন্টরপ্রেটরের দরকার হইবে? যদি বল, বাংলায় যাঁহাদের কাছ হইতে কাজের প্রত্যাশা করা যায় তাঁহারা বাংলা শুনিতে চান না, বাংলা ভাষা জানেন না, কাজেই ইংরাজিতে এ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইয়াছে, প্রধানত ইংরাজিতে ইহা প্রচার করিতে হইয়াছে— তবে আর কী বলিব— তবে এই বলিতে হয় বাংলাদেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, তবে আজিও বাংলাদেশে কোনো ন্যাশনাল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার সময় হয় নাই। তবে আর people-এর নাম মুখে উচ্চারণ কর কেন? উহা কি একটা ছেলে ভুলাইবার কথা? আর, সে লোকেরা কাহারা? তোমরাই তো তাহারা! তোমরাই তো বাংলা জান না, ইংরিজিতে কথা কও! ইংরাজি খবরের কাগজে তোমাদের কথা ছাপা না হইলে তোমাদের মনস্তুষ্টি হয় না!

তোমরা বলিবে ইহা পোলিটিক্যাল ব্যাপার, ইংরাজদের জানানো আবশ্যক, কাজেই ইংরাজিতে বলা উচিত। কিন্তু সে কোনো কাজের কথা নয়। যখন agitation করিবে তখন নাহয় ইংরাজিতে করিয়ো, কিন্তু যখন দেশের লোকের কাছে সাহায্য চাহিতেছ তখনো কি দেশের লোকের ভাষায় কথা কহিবে না?

কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। একমাত্র Political agitation-ই যাহার প্রাণ, তাহার উদ্দেশ্য সাধারণের কাছে বুঝাইবে কীরূপে? সাধারণে যে বুঝিবে না। না বুঝিলেও যে আপাতত বিশেষ

ক্ষতি আছে তাহা নহে, কেন, তাহা বলিতেছি।

যে-সকল দেশহিতৈষীদিগের Political agitation একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের উপর আমার বড়ো শ্রদ্ধা নাই। আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। যে নিতান্তই দরিদ্র সময়ে সময়ে তাহাকে ভিক্ষা করিতেই হয়, উপায় নাই, কিন্তু ভিক্ষাই যে একমাত্র উন্নতির উপায় স্থির করিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও ভক্তি থাকিতে পারে না। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ইতিহাস ভুল বুঝিয়া আমাদের এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে স্বাধীন দেশে Political agitation-এর অর্থ, আর পরাধীন দেশে উহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ। সে দেশে Political agitation অর্থ নিজের কাজ নিজে করা, আর এ দেশে Political agitation-এর অর্থ নিজের কাজ পরকে দিয়া করানো। কাজেই ইহার ফল উভয় দেশে এক প্রকারের নহে।

ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে প্রত্যহ আমাদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে, ক্রমশই আমাদের আত্মত্ব বিসর্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা শুভ্র ইংলন্ডের গায়ে একটা কালো পোকার মতো লাগিয়া থাকিব ও ইংরাজের গায়ের রক্ত শোষণ করিয়া আবশ্যকের অভাবে আমাদের পাকযন্ত্র অদৃশ্য হইয়া যাইবে! এইজন্যই কি ন্যাশনল ফন্ড?

আমরা কী শিখিতেছি? ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা কী কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি? না, কেমন করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়, পার্লামেন্টে কী উপায়ে মনের দুঃখ নিবেদন করা যাইতে পারে, কোন্ সাহেবকে কীরূপ করিয়া আয়ত্ত করা যায়, ঠিক কোন্ সময়ে ভিক্ষার পাত্রটি বাড়াইলে এক মুঠা পাওয়া যাইতে পারিবে। অনিমেষ নেত্রে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকো ইংরাজি কোন্ মন্ত্রীর কী ভাব, কখন ministry বদল হয়, কখন রাজা আমাদের অনুকূল, কখন আমাদের প্রতিকূল ঘড়ি ঘড়ি ইংরাজদের কাছে গিয়া বলো, তোমরা অতি মহদাশয় লোক, তোমরা ধর্মাবতার, তোমাদের কাছে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিয়া কি আমরা বঞ্চিত হইব? কখনোই না। আজ রাজার মুখ প্রসন্ন দেখিলে কালীঘাটে পূজা দাও, আর কাল তাঁহাকে বিমুখ দেখিলে ঘরে হাহাকার পড়িয়া যাক। যাও, ছ লাখ টাকা দিয়া একটা মস্ত constitutional ভিক্ষার ঝুলি কেনো, কখন কে লাটসাহেব হইল, কখন কে রাজমন্ত্রী হইল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া ঠিক সময় বুঝিয়া ভিক্ষার ঝুলি পাতো গে। কিন্তু, তার পরে মনে করো ইংরাজ চলিয়া গেল, মগের মুল্লুক হইল। তখন কাহার কাছে আবদার করিবে? তখন তোমাদের দিশি মুখে বিলাতি বোল শুনিয়া ইস্কুল মাস্টারের মতো কে তোমাদের পিঠে উৎসাহের থাবড়া দিবে? ঘর হইতে কাপড় আনাইয়া কে তোমাদের কাপড়টি পরাইয়া দিবে? সহসা পিতৃহীন আদুরে ছেলেটির মতো কঠোর সংসারে আসিয়া টিকিবে কীরূপে? আর কিছু না হউক সমস্ত বাঙালি জাতি যখন agitation-ওয়ালা হইয়া উঠিবে তখন হঠাৎ তাহাদের agitation বন্ধ হইলে যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবে। বরঞ্চ দুই দিন আহার বন্ধ হইলে চলিয়া যাইবে, কিন্তু দুই দণ্ড মুখ বন্ধ হইলে বাঙালি বাঁচিবে কী করিয়া?

ইহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে যাঁহারা কেবলমাত্র অথবা প্রধানত গবর্মেন্টের কাছে ভালোরূপ ভিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চান তাঁহারা কীরূপ দেশহিতৈষী। গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর

শুভ ফল হইত। দেশের লোককে তাঁহারা কেবলই জ্বলন্ত উদ্দীপনায় শাক্যসিংহ ব্যাস বাল্মীকি ও ভীষ্মার্জুনের দোহাই দিয়া গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাহিতে বলিতেছেন। তাহার চেয়ে সেই উদ্দীপনাশক্তি ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে উপার্জন করিতে বলুন-না কেন? আমরা কি নিজের সমস্ত কর্তব্য কাজ সারিয়া বসিয়া আছি যে, এখন কেবল গবর্মেন্টকে তাহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেই হইল! সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য, গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা গবর্মেন্টকে পরামর্শ দিতে যাওয়া পরে হইতে পারে, বা তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপে হইতে পারে।

গবর্মেন্টের কাছ হইতে আজ আমাদিগকে ভিক্ষা চাহিতে হইতেছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে আর-একটা প্রশ্ন উঠে। ভিক্ষা কে চায়? যাহার অধিকার নাই সেই চায়; স্বত্বাভাবে অর্থাভাবে এবং কোনো কোনো সময়ে বলের অভাবে যে তণ্ডুল মুষ্টিতে আমার অধিকার নাই সেই তণ্ডুল মুষ্টির জন্য আমাকে ভিক্ষা মাগিতে হয়। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনও আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া, অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই-চারি জন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইব, তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবি করিব, গবর্মেন্টকে দিতেই হইবে। আজ গবর্মেন্ট আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষার মতো দিয়াছেন, অনুগ্রহের মতো দিয়াছেন, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দিয়াছেন, এ বিষয়ে যেন নানা সংশয় আছে, নানা বিবেচনার বিষয় আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালী ভালো খাটিল না, তবে কালই হয়তো ইহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর জন্য আগে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিতাম ও গবর্মেন্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপ প্রস্তুত হইবার উপায় কী? তাহার এক উত্তর আছে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই-তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে এটি হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ করো, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি-চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কী কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, গবর্মেন্ট যখন একটা কলেজ উঠাইতে চাহিবে বা বিদ্যাশিক্ষা নিয়মের পরিবর্তন করিবে, তোমরা অমনি লাখ-দুই খরচ করিয়া সভা করিয়া, আবেদন করিয়া, বিলাতে লোক পাঠাইয়া, পার্ল্যামেন্টে দরখাস্ত করিয়া, ইংরাজিতে কাঁদিয়া কাটিয়া গবর্মেন্টকে বলিবে, 'ওগো গবর্মেন্ট, এ কালেজ উঠাইয়ো না।' যদি গবর্মেন্ট শুনিল তো ভালো, নহিলে সমস্ত ব্যর্থ হইল। তাহার চেয়ে তোমরা নিজেই একটা কলেজ করো-না কেন? গবর্মেন্টের কলেজের চেয়ে তাহা অনেকাংশে হীন হইতে পারে, শিক্ষার সুবিধা ততটা না থাকিতেও পারে, কিন্তু গবর্মেন্ট কলেজের চেয়ে সেখানে একটি শিক্ষা বেশি পাইবে, তাহার নাম আত্মনির্ভর। কেবলমাত্র পরকে কাজ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য তোমরা যে টাকাটা সঞ্চয় করিতেছ, সেই টাকায় নিজে কাজ করিলেই ভালো হয়, এই আমার কথার মর্ম।

যথার্থ দেশোপকার ব্রত অতি গুরুতর ব্রত, সে কাজ অতি কঠিন কাজ— তাহাতে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় না কিন্তু নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়। তাহাতে ছোটো ছোটো কাজে হাত দিতে

হয়, ক্রমে ক্রমে কাজ করিতে হয়, প্রত্যহ সংবাদপত্রের দৈনিক বাহবাই উদ্যমের একমাত্র জীবনধারণের উপায় নহে। অপর পক্ষে যাঁহারা agitation করিয়া কাজ করিতে চান তাঁহাদের কাজ কত সহজ, কত সামান্য! তাঁহাদের কাজ দেশের কোনো অভাব বা হানি দেখিলেই গবর্মেন্টকে তিরস্কার করা। অত্যন্ত সুখের কাজ! পরকে দায়ী করার চেয়ে আর সুখের কী হইতে পারে! পরকে কাজ করিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ, সে কাজ সাধন করা আমার কাজ নহে ইহার অপেক্ষা আরাম আর কী আছে! কিছুই করিলাম না, কেবল আর-একজনকে অনুরোধ করিলাম মাত্র, অথচ মনে মনে ভ্রম হইল যেন কাজটাই করিয়া ফেলিলাম। তাহার পরে আবার চারি দিকে একটা কোলাহল উঠিল, নামটা ব্যাপ্ত হইল। যত অল্পে যতটা বেশি হইতে পারে তাহা হইল, তাহার উপরে আবার মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম যে, দেশের জন্য আমি কী না করিলাম? কেবল মুখের কথাতেই এতটা যদি হয় তবে আর কাজ করিবার দরকার কী? একটা ছোটো রকমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : নাইট সাহেব যখন বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি সর্বদা দেশীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতেন, অবশেষে যখন তিনি অবসর লইলেন, তখন বোম্বাইবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কী করে, তাহারা তো আমাদের মতো এত কথা কহিতে পারে না কাজেই তাহাদিগকে কাজ করিতেই হইল— তাহাদিগকে টাকা দিতে হইল। এদিকে দেখো, রিয়ক সাহেব আমাদের অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন— স্বজাতি সমাজ উপেক্ষা এতটা করিতে কে পারে? ইল্‌বর্ট বিলের জন্য ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তিনি কতটা লড়িয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনে আছে। সেই রিয়ক যখন স্বজাতি-সহায়-বর্জিত হইয়া প্রায় রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃতজ্ঞ বাঙালিরা কী করিলেন? বাচস্পতি মহাশয়েরা সভা ডাকিয়া দু-চারিটা মিষ্ট মুখের কথা বলিয়া ও মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া এমনি পরিতৃপ্ত হইলেন যে, আর আর কিছু করিবার আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না।

সেই জিভের খাটুনিটা আরও বাড়াইবার জন্য ছ লাখ টাকা সংগ্রহ হইতেছে। আমি বলি, এই ছ লাখ টাকা খরচ করিয়া বাঙালিদের জিভের কাজ একটু কমে যদি, তবে এতটা অর্থব্যয় সার্থক হয়!

যাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী তাঁহারা দেশের অল্প উপকারকে নিজের অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন না। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানেন যে যদি হাঙ্গাম করা উদ্দেশ্য না হয়, দেশের উপকার করাই বাস্তবিক উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাতে এক রাত্রের মধ্যে যশস্বী হওয়া যায় না বটে, মোটা মোটা কথা বলিবার সুবিধা হয় না বটে কিন্তু দেশের উপকার হয়। তাঁহারা ইহা জানেন যে, মস্ত মস্ত উদ্দেশ্য জাহির করিলে দেশের যত না কাজ হয়, ছোটো ছোটো কাজ করিলে তাহার চেয়ে বেশি হয়। ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া একেবারে সমস্ত ভারতবর্ষের উপকার করিব এতটা সংকল্প না করিয়া যদি কেবল বাংলা দেশের জন্য ফন্ড সংগ্রহ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে তাহা সহজসাধ্য হয় ও সম্ভবপর হয়। শুনিতে তেমন ভালো হয় না বটে, কিন্তু কাজের হয়। যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখেন ও বিশেষ আবশ্যকের সময় সকলে একত্রে মিলিয়া যদি দেশহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেই বাস্তবিক উপকার হইবে। নহিলে মস্ত একটা নাম লইয়া বৃহৎ কতকগুলা উদ্দেশ্যের বোঝা লইয়া ন্যাশনল ফন্ড নামক একটা নড়নচড়নহীন অতি বৃহৎ জড়পদার্থ প্রস্তুত হইবে।

উপসংহারে বলিতেছি কেবলমাত্র Political agitation লইয়া থাকিলে আমরা আরও অকেজো হইয়া যাইব, আমরা নিজের দায় পরের ঘাড়ে চাপাইতে শিখিব— দুটো কথা বলিয়াই আপনাকে খালাস মনে করিব। একে সেই দিকেই আমাদের সহজ গতি, তাহার উপর আবার

এত আড়ম্বর করিয়া আমাদের সেই গুণগুলির চর্চা করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে যদি কাজ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও অসমর্থ পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া ইহার গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে। নচেৎ ঠিক উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হইবে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে না বরং হাঁক-ডাক কিছু বেশি হইবে তথাপি দেশের অস্থি-মজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

ভারতী
কার্তিক ১২৯০

টৌন্‌হলের তামাশা

সেদিন টাউনহলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়োলোক বড়ো বড়ো পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেশের লোক অবাক হইয়া গেল। শীতের সময় কলিকাতায় অনেক প্রকার তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কস্, অপেরা ইত্যাদি। কিন্তু বড়োলোকের নাচ্‌নী সচরাচর দেখা যায় না।

সাহেব বলিল, তাই, তাই, তাই; অমনি বড়ো বড়ো খোকারা হাততালি দিতে লাগিল!

কিন্তু ভালো দেখাইল না। কারণ, নাচন কিছু সকলকেই মানায় না। তোমাদের এ বয়সে, এ শরীরে এত সহজে যদি নাচিয়া ওঠ, সে একটা তামাশা হয় সন্দেহ নাই, রাস্তার লোকেরা হো হো করিয়া হাসিতে থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার লোকেরা তো আর হাসিতে পারে না! তাহাদের নিতান্ত লজ্জা বোধ হয়, দুঃখ হয়, ধিক ধিক করিয়া মুখ ফিরাইয়া, নতশির হইয়া চলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে ঠিক তামাশা বলা যায় না!

কিন্তু যাই বল, সাহেবদিগকে ধন্য বলিতে হয়। যাঁহারা উইল্‌সনের সার্কস্ দেখিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই দেখিয়াছেন ইংরাজ ঘোড়া নাচাইয়াছেন এবং অরণ্যের বড়ো বড়ো প্রাণীদের পোষ মানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বাংলার গোটাকতক জমিদার ধরিয়া আনিয়া এত সহজে বশ করিতে পারিবেন এ কে জানিত?

বশ করা কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বেই যে লাথি ঝাঁটা বৈ আর কিছু খোরাকি জোটে নাই, সেগুলি যে এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিয়া দানার লোভে তোমরা উহাদের কাছে ঘেঁসিয়া যাইতেছ এইটেই আশ্চর্য!

ডারুয়িন বলিয়াছেন, প্রাণীর ক্রমোন্নতি সহকারে মানুষের কাছাকাছি আসিয়া তাহার লেজ খসিয়া যায়। যেমন শারীরিক লেজ খসিয়া যায়, তেমনি তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক লেজটাও খসিয়া যায়। মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া, লাথি ঝাঁটা শিরোধার্য করিয়া কেবল একটুখানি সুবিধার অনুরোধে বাপান্তবাগীশের গা ঘেঁসিয়া গেলে মানসিক লেজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সে জিনিসটা যদি থাকে তো চাপিয়ে রাখো, অত নাড়িতেছ কেন? ওটা দেখিতে পাইলে পণ্ডিতেরা তোমাদিগকে হীন ও মহৎ প্রাণীদের মধ্যস্থিত missing link বলিয়া গণ্য করিতেও পারে!

তোমাদের একটা কথা আছে যে, 'কাহারও সহিত এক বিষয়ে মতভেদ হইলে অন্য বিষয়ে মতের ঐক্য সত্ত্বেও মিশিতে বাধা কী?' সে তো ঠিক কথা। কিন্তু মতের আবার ইতরবিশেষ আছে। 'ক' কখন কহিল, সূর্য পশ্চিমে ওঠে, তখন 'খ'য়ের সহিত এ সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ মতভেদ সত্ত্বেও 'ক'য়ে 'খ'য়ে গলাগলি ভাব থাকার আটক নাই। কিন্তু যখন 'ক'য়ের মত 'খ' এবং তাহার বাপ-পিতামহ সকলেই চোর, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তখন এ মতভেদ সত্ত্বেও উভয়ের আর ভালোরূপ বনিবনাও হওয়া সম্ভব নহে।

যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে

না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণা বোধ হয়।

তোমরা বলিবে, এ-সকল কথা বালকেরই মুখে শোভা পায়, ইহা পাকা কাজের লোকের মতো কথা হইল না। কার্য উদ্ধার করিতে হইলে অত বিচার করিয়া চলা পোষায় না। বড়ো বড়ো sentimentগুলি ঘরের শোভা সম্পাদনের জন্য, সচ্ছল অবস্থায় বড়ো বড়ো ছবির মতো তাহাদিগকে ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যখন গাঁঠের কড়িতে টান পড়িল, তখন সুবিধামতো তাহাদের একটাকে টাউনহলে নিলামে highest bidder-দের বিক্রি করিয়া আসিলাম, ইহাতে আর দোষ হইয়াছে কী? Political Economy-র মতে ইহাতে দোষ কিছুই হয় নাই, যেমন বাজার দেখিয়াছ তেমনি বিক্রয় করিয়াছ এতবড়ো দোকানদারি বুদ্ধি কয়জনের মাথায় জোগায়। কিন্তু তাই যদি হইল, তোমরাই যদি এমন কাজ করিতে পার ও এমন কথা বলিতে পার, তবে ভারতবর্ষ এতকাল তাহার নিজের ক্ষীরটুকু সরটুকু খাওয়াইয়া তোমাদিগকে পোষণ করিল কেন? যাহারা প্রত্যহ একমুষ্টি উদরান্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরে, এতবড়ো ভয়ংকর কাজের লোক হওয়া বরঞ্চ তাহাদিগকে শোভা পায়, বড়ো বড়ো sentiment বরঞ্চ তাহাদিগের নিকটেই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিন্তু তোমরা যে জন্মাবধি এতকাল এত অবসর পাইয়া আসিয়াছ একটা মহৎ sentiment চর্চা করিতেও কি পারিলে না? তবে আর কুলীন ধনী পরিবারদিগকে দেশ কেন পোষণ করিতেছে? তাহারা না খাটিবে, না তাহাদের অবকাশের সদ্‌ব্যবহার করিবে। দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য শোষণ করিয়া মস্ত মস্ত জমকালো বিস্ফোটকের মতো শোভা পাওয়াই কি তাহাদের একমাত্র কাজ! আমাদের বিশ্বাস ছিল, কুলক্রমাগত সচ্ছল সম্ভ্রান্ত অবস্থা উদরতা ও মহত্ত্ব সঞ্চয়ের সাহায্য করে— এরূপ কুলীনেরা সামান্য হীন সুবিধার খাতির অগ্রাহ্য করে ও মানের কাছে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে— দেশের সম্ভ্রম তাহারাই রাখে; আর তাই যদি না হয়, একটু মাত্র কাল্পনিক সুবিধার আশা পাইলেই অমনি তাহার যদি নীচত্ব করিতে প্রস্তুত হয়, নিজের অপমান ও দেশের অপমানকে গুলি-পাকাইয়া অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে তাহারা যত শীঘ্র সরিয়া পড়ে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেখিতেছি চোখে ঠুলি পরিয়া তাহারা কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই-চারি হাত জমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে, কিছুই উন্নতি হয় নাই, এক পা অগ্রসর হইতে পারে নাই! মান-সম্ভ্রম-মহত্ত্ব সমস্তই ঘানিতে ফেলিয়া কেবল তেলই বাহির করিতে হইবে! বোধ করি স্বদেশকে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমাদের ওই ঘানিতে ফেলিতে পার যদি একটুখানি তেল বাহির হয়! সমস্ত জীবন তোমাদের ওই ঘানি-দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মরো ও উহার ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দে জগতের সমস্ত সংগীত ডুবিয়া যাক!

তোমরা হিন্দু, তোমরা জাতিভেদ মানিয়া থাক। আমরণ তোমাদের সন্তানের যদি বিবাহ না হয় তথাপি সহস্র সুবিধা সত্ত্বেও একটা ফিরিঙ্গির সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দাও না, কেন? না শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু আর-একটি অলিখিত শাস্ত্র এবং মহত্ত্বর জাতিভেদ আছে, যদি সে শাস্ত্রজ্ঞান ও সে সহৃদয়তা থাকিত, তবে একটুখানি সুবিধার আশায় গোটাকতক অ্যাংলো-ইন্ডিয়নের সহিত মিলনসূত্রে বদ্ধ হইতে পারিতে না! সকলই প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিতে হইবে। নহিলে তোমরা যত শ্যাম তনু, ক্ষীণ, ক্ষুদ্রগণ ঘড়ির চেনটি পরিয়া ললিত হাস্যে মধুর সম্ভাষণে ওই বড়ো বড়ো গোরাদের আদর কাড়িতে গিয়াছ ও কৃতকার্য হইয়াছ ইহা কী করিয়া সম্ভব হইল। এ তো প্রকাশ্যে, এ তবু ভালো! কিন্তু বিশ্বাস হয় না লোকে কানাকানি করিতেছে, কালায় গোরায় গোপনে নাকি গান্ধর্ব মিলন চলিতেছে! শুনিতেছি নাকি কানে কানে কথা, হাতে হাতে টেপাটেপি ও পরস্পর সুবিধার মালাবদল হইতেছে।

সুবিধাই বা কতটুকু! তোমরা নিজে কিছু কম লোক নও। রাজ-সরকারে তোমাদের যথেষ্ট মান-মর্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। তাহা ছাড়া, তোমরা নিতান্ত মুখচোরাও নও যে, তোমাদের

হইয়া আর-একজনকে কথা কহিতে হইবে। তোমরা বেশ বলিতে পার লিখিতে পার, তোমাদের কথা গবর্মেন্ট কান পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। তোমাদের টাকা আছে, পদ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তবে দুঃখটা কিসের। তবে কেন ওই খোদাবন্দ্‌দিগের হাঁটুর কাছে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছ! যাহারা সকল বিষয়েই অনবরত গবর্মেন্টের অন্ধ-বিদ্রোহিতা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে কামানস্বরূপ করিয়া বারুদ ঠাসিয়া আগুন লাগাইয়া গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ করিতে থাকিলে কি সরকার বড়ো খুশি হইবে।

কী আর বলিব। ইহা এক অপূর্ব অথচ শোচনীয় দৃশ্য। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো মাথাগুলা যে এত সহজেই সোডা-ওয়াটারের ছিপির মতো চারি দিকে টপাটপ উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ও জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতেছে এ দৃশ্যে মহত্ত্ব কিছুই না। ইহাতে বঙ্গদেশের বর্তমানের জন্য লজ্জা বোধ হয় ও ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা জন্মে।

ভারতী
পৌষ ১২৯০

অকাল কুষ্মাণ্ড

সাবিত্রী লাইব্রেরির সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত

পরামর্শ দেওয়া কাজটা না কি গুরুতর নহে, অথচ যিনি পরমর্শ দেন তিনি সহসা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠেন, এই নিমিত্ত পরমার্শদাতার অভাব লইয়া সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে বোধ করি কখনো আক্ষেপ করিতে হয় নাই। নিতান্ত যে গরীব, যাহার একবেলা এক কুন্‌কে চাল জোটে, সে তিন সন্ধে তিন বস্তা করিয়া পরামর্শ বিনি খরচায় ও বিনি মাসুলে পাইয়া থাকে— আশ্চর্য এই যে তাহাতে তাহার পেট ভরিবার কোনো সহায়তা করে না। বিশেষত কতকগুলি নিতান্ত সত্য কথা আছে তাহারা এত সত্য যে সচরাচর কোনো ব্যবহারে লাগে না অর্থাৎ তাহারা এত সস্তা যে, তাহাদের পয়সা দিয়া কেহ কেনে না— কিন্তু গায়ে পরিয়া বদান্যতা করিবার সময় তেমন সুবিধার জিনিস আর কিছু হইতে পারে না। যৎপরোনাস্তি সত্য কথাগুলির দশা কী হইত যদি সংসারে পরামর্শদাতার কিছুমাত্র অভাব থাকিত! তাহা হইলে কে বলিত, 'বাপু সাবধান হইয়া চলিয়ো, বিবেচনাপূর্বক কাজ করিয়ো, মনোযোগপূর্বক বিষয়-আশয় দেখিয়ো; এগ্‌জামিন পাস হইতে চাও তো ভালো করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়ো— খামকা পড়িয়া হাত-পা ভাঙিয়ো না, খবরদার জলে ডুবিয়া মরিয়ো না— ইত্যাদি?' এই কথাগুলো কোম্পানির মাল হইয়া পড়িয়াছে, দরিয়ায় ঢালিতে হইলে ইহাদের প্রতি আর কেহ মায়া-মমতা করে না!

অনেক ভালো ভালো পরামর্শও দুরবস্থায় পড়িয়া সস্তা হইয়া উঠিয়াছে। সহসা তাহাদের এত বেশি আমদানি হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দাম নাই বলিলেও হয়। যাহাদের মূলধন কম, এমন সাহিত্য-দোকানদার মাত্রেই তাড়াতাড়ি এই-সকল সস্তা ও পাঁচরঙা পদার্থ লইয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, পুঁথিতে চটিতে, এক কলম, দু কলম, এক পেজ, দু পেজ, এক ফর্মা দু ফর্মা, যাহার যেমন সাধ্য পসরা সাজাইয়া ভারি হাঁকডাক আরম্ভ করিয়াছে। দেশকে উপদেশ এবং আদেশ করিতে কেহই পরিশ্রমের ত্রুটি করেন না; রাস্তায় যত লোক চলিতেছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি লোক পথ দেখাইয়া দিতেছে। (বাংলাটা Finger-Post-এরই রাজত্ব হইয়া উঠিল।) কিন্তু তাহাদের এই অত্যন্ত গুরুতর কর্তব্য সমাধান করিতে তাহারা এত বেশি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পথিকেরা চলিবার রাস্তা পায় না। সহসা সকলেরই একমাত্র ধারণা হইয়াছে যে, দেশটা যে রসাতলে যাইতেছে সে কেবলমাত্র উপদেশের অভাবে। কিন্তু কেহ কেহ এমনও বলিতেছেন যে, ঢের হইয়াছে— গোটাকতক কুড়োনো কথা ও আর তিনশোবার

করিয়া বলিয়ো না— ওটাতে যা-কিছু পদার্থ ছিল, সে তোমাদের আওয়াজের চোটে অনেক কাল হইল নিকাশ হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যের ডোঙাটা একটুখানি হাল্কা করিয়া দাও, বাজে উপদেশ ও বাঁধি পরামর্শ ইহার উপর আর চাপাইয়ো না— বস্তার উপর বস্তা জমিয়াছে, নৌকাডুবি হইতে আর বিস্তর বিলম্ব নাই— কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করো, ওগুলো নিতান্তই অনাবশ্যক। তুমি তো বলিলে অনাবশ্যক! কিন্তু ওগুলো যে সস্তা! মাথার খোলটার মধ্যে একটা সিকি পয়সা ও আধুলি বৈ আর কিছু নাই, মাথা নাড়িলে সেই দুটোই ঝম্‌ঝম্‌ করিতে থাকে, মনের মধ্যে আনন্দ বোধ হয়— সেই দুটো লইয়াই কারবার করিতে হইবে— সুতরাং দুটো-চারটে অতি জীর্ণ উপদেশ পুরোনো তেঁতুলের সহিত শিকেয় তোলা থাকে— বুদ্ধির ডোবা হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিলে তাহাই অনেকটা হইয়া ওঠে এবং তাহাতেই গুজ্‌রান্‌ চলিয়া যায়। একটা ভালো জিনিস সস্তা হইলে এই প্রকার খুচরা দোকানদার মহলে অত্যন্ত আনন্দ পড়িয়া যায়। দেখিতেছেন না, আজকাল ইহাদের মধ্যে ভারি স্ফূর্তি দেখা যাইতেছে! সাহিত্যের ক্ষুদে পিঁপড়েগণ ছোটো ছোটো টুকরো মুখে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ও অত্যন্ত গর্বের সহিত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে! এখানে একটা কাগজ, ওখানে একটা কাগজ, সেখানে একটা কাগজ, এক রাত্রের মধ্যে হুস করিয়া মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যখন ইংরিজি বিদ্যাটাকে কলা দিয়ে চটকাইয়া ফলার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পাতের চার দিকে পোলিটিক্যল্‌ ইকনমি ও কন্‌স্টিট্যুশনল হিস্ট্রির, বর্কলের ও মিলের এবং এ-ও-তার কিছু কিছু গুঁড়া পড়িয়াছিল— সাহিত্যের ক্ষুধিত উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী এক দল জীববিশেষ তাহাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি প্রভাবে শুঁকিয়া শুঁকিয়া তাহা বাহির করিয়াছে। বড়ো বড়ো ভাবের আধখানা শিকিখানা টুকরা পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া সরকারি সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে, ছোটো ছোটো মুদি ও কাঁসারিকুলতিলকগণ পর্যন্ত সেগুলোকে লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ইঁটপাটকেলের মতো ছোড়াছুড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত ছড়াছড়ি ভালো কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে— কারণ, এরূপ অবস্থায় উপযোগী দ্রব্যসকলও নিতান্ত আবর্জনার সামিল হইয়া দাঁড়ায়— অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে এবং সমালোচকদিগকে বড়ো বড়ো ঝাঁটা হাতে করিয়া ম্যুনিসিপলিটির শকট বোঝাই করিতে হয়।

এমন কেহ বলিতে পারেন বটে যে, ভালো কথা মুখে মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে হানি যে কেন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। হানি হইবার একটা কারণ এই দেখিতেছি— যে কথা সকলেই বলে, সে কথা কেহই ভাবে না। সকলেই মনে করে, আমার হইয়া আর পাঁচশো জন এ কথাটা ভাবিয়াছে ও ভাবিতেছে, অতএব আমি নির্ভাবনায় ফাঁকি দিয়া কথাটা কেবল বলিয়া লই-না কেন? কিন্তু ফাঁকি দিবার জো নাই— ফাঁকি নিজেকেই দেওয়া হয়। তুমি যদি মনে করো একটা ঘোড়াকে স্থায়ীরূপে নিজের অধিকারে রাখিতে হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল রশারশি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই হইল, তাহাকে দানা ছোলা দিবার কোনো দরকার নাই— এবং সেইমতো আচরণ কর, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে দেখিবে দড়িতে একটা জিনিস খুব শক্তরূপে বাঁধা আছে বটে কিন্তু সেটাকে ঘোড়া না বলিলেও চলে। তেমনি ভাষরূপ দড়িদড়া দিয়া ভাবটাকে জিহ্বার আস্তাবলে দাঁতের খুঁটিতে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই যে সে তোমার অধিকারে চিরকাল থাকিবে তাহা মনে করিয়ো না— তিন সন্ধ্যা তাহার খোরাক জোগাইতে হইবে। যে ভাবনার মাটি ফুঁড়িয়া যে কথাটি উদ্ভিদের মতো বাড়িয়ে উঠিয়াছে, সেই মাটি হইতে সেই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সে আর বেশিদিন বাঁচিতে পারে না। দিন দুই-চার সবুজ থাকে বটে ও গৃহশোভার কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তার পর যখন মরিয়া যায় ও পচিয়া উঠে তখন তাহার ফল শুভকর নহে। একটা গল্প আছে, একজন অতিশয় বুদ্ধিমান লোক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশে একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন ঘোড়াকে

নিয়মিতরূপে না-খাওয়ানো অভ্যাস করাইলে সে টেঁকে কি না। অভ্যাসের গুণে অনেক হয় আর এটা হওয়াই বা আশ্চর্য কী! কিন্তু সেই বিজ্ঞানহিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্প্রতি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে— প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ঘোড়ার খোরাক কমাইয়া যখন ঠিক একটিমাত্র খড়ে আসিয়া নাবিয়াছি, এমন সময়টিতে ঘোড়াটা মারা গেল! নিতান্ত সামান্য কারণে এত বড়ো একটা পরীক্ষা সমাপ্ত হইতেই পারিল না, ও এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াই গেল। আমরাও বুদ্ধিমান বিজ্ঞানবীরগণ বোধ করি কতকগুলি ভাব লইয়া সেইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি— কিছুমাত্র ভাবিব না— অথচ গোটাকতক বাঁধা ভাব পুষিয়া রাখিব, শুধু তাই নয় চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া রাস্তার ধুলা উড়াইয়া দেশময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইবে, অবশেষে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইবার ঠিক পূর্বেই দেখিব, কথা সমস্তই বজায় আছে অথচ ভাবটার যে কী খেয়াল গেল যে হঠাৎ মরিয়া গেল! অনেক সময়ে প্রচলিত কথার বিরুদ্ধ কথা শুনিলে আমাদের আনন্দ হয় কেন? কারণ, এই উপায়ে ডোবায় বদ্ধ স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ প্রচলিত মতগুলি গুরুতর নাড়া পাইয়া আন্দোলনের প্রভাবে কতকটা স্বাস্থ্যজনক হয়। যে-সকল কথাকে নিতান্তই সত্য মনে করিয়া নির্ভাবনায় ও অবহেলায় ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে ফের তাহাদের টানিয়া বাহির করিতে হয়, ধুলা ঝাড়িয়া চোখের কাছে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হয়— ও এইরূপে পুনশ্চ তাহারা কতকটা ঝকঝকে হইয়া উঠে। যতবড়ো বুদ্ধিমানই হউন-না-কেন সত্য কথার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার সাধ্য নাই— তবে যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে প্রচলিত সত্যের বিপক্ষে কোনো কথা শুনা যায় তখন একটু মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, সেটা একটা ফাঁকি মাত্র। তিনি সেই কথাটাই কহিতেছেন, অথচ ভান করিতেছেন যেন তাহার সহিত ভারি ঝগড়া চলিতেছে। এইরূপে নির্জীব কথাটার অন্ত্যেষ্টিসংকার করিয়া আর-একটা নূতন কথার দেহে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়— দেখিতে ঠিক বোধ হইল যেন সত্যটাকেই পুড়াইয়া মারিলেন, কিন্তু আসলে কী করলেন, না, জরাগ্রস্ত সত্যের দেহান্তর প্রাপ্তি করাইয়া তাহাকে অমর যৌবন দান করিলেন।

যুরোপে যাহা হইয়াছে তাহা সহজে হইয়াছে, আমাদের দেশে যাহা হইতেছে তাহা দেখাদেখি হইতেছে এইজন্য ভারি কতকগুলি গোলযোগ বাধিয়াছে। সমাজের সকল বিভাগেই এই গোলযোগ উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে। আমরা যুরোপীয় সভ্যতার আগডালে বসিয়া আনন্দে দোল খাইতেছি, তাহার আগাটাই দেখিতেছি, তাহার যে আবার একটা গোড়া আছে ইহা কোনোক্রমেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এরূপ ভ্রম শাখামৃগেরই শোভা পায়। যে কারণে এতটা কথা বলিলাম তাহা এই— যুরোপে দেখিতে পাই বিস্তর পাক্ষিক ত্রৈমাসিক বার্ষিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, ইহা সেখানকার সভ্যতার একটা নিদর্শন বলিতে হইবে। আমাদের দেশেও বিস্তর সাময়িক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই লইয়া কি উল্লাস করিব? এ বিষয়ে আমি কিন্তু একটুখানি ইতস্তত করিয়া থাকি। আমার সন্দেহ হয় ইহাতে ঠিক ভালো হইতেছে কি না। যুরোপে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্তর আছে তাই কাগজপত্র আপনা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা তাই দেখাদেখি আগেভাগে কাগজ বাহির করিয়া বসিয়া আছি, তার পরে লেখক লেখক করিয়া চতুর্দিকে হাৎড়াইয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে যে কুফল কী হইতে পারে, তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

আমার একটি বিশ্বাস এই যে, যুরোপেই কী আর অন্য দেশেই কী, সাহিত্য সম্বন্ধে নিয়মিত জোগান দিবার ভার গ্রহণ করা ভালো নয়; কারণ, তাহা হইলে দোকানদার হইয়া উঠিতে হয়। সাহিত্যে যতই দোকানদারি চলিবে ততই তাহার পক্ষে অমঙ্গল। প্রথমত, ভাবের জন্য সবুর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, লেখাটাই সর্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আশঙ্কার বিষয় আরেকটি আছে। ইংরাজেরা দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন— কিন্তু

স্বাধীন ভাবগুলিকে ক্রীতদাসের মতো কেনাবেচা করিবার প্রথা তাঁহারাই অত্যন্ত প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে শতসহস্র ভাব প্রত্যহই নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন অবস্থায় তাহারা যেরূপ গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে, দাসত্বের জোর-জবরদস্তিতে ও অপমানে তাহারা সেরূপ পারে না ও এইরূপে ইংরাজিতে যাহাকে cant বলে সেই cant-এর সৃষ্টি হয়। ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকাদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে তখন তাহাই cant হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্মরাজ্যের সকল বিভাগেই cant নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি সৃজিত হইতেছে। য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আক্ষেপ করেন যে, প্রত্যহ Theological cant, Sociological cant, Political cant-এর দলপুষ্টি হইতেছে। আমার বিশ্বাস তাহার কারণ— সেখানকার বহুবিস্তৃত সাময়িক সাহিত্য ভাবের দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। কেননা, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই বুঝাইতেছে— স্বাধীন ভাবেরই অবস্থান্তর cant। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি cant-এর দাসত্বশৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে সেই আবার স্বাধীন ভাব হইয়া ওঠে— এবং তাহাকেই সকলে বহুমান করিয়া পূজা করিতে থাকে। সত্যকথা মহৎকথাও দোকানদারীর অনুরোধে প্রচার করিলে অনিষ্টজনক হইয়া ওঠে। যথার্থ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে কথা দেবতার সিংহাসন টলাইতে পারিত, সেই কথাটাই কি না ডাকমাসুল সমেত সাড়ে তিন টাকা দরে মাসহিসাবে বাঁটিয়া-বাঁটিয়া ছেঁড়া কাগজে মুড়িয়া বাড়ি-বাড়ি পাঠান! যাহা সহজ প্রকৃতির কাজ তাহারও ভার নাকি আবার কেহ গ্রহণ করিতে পারে! কোনো দোকানদার বলুক দেখি সে মাসে মাসে এক-একটা ভাগীরথী ছাড়িবে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় লাটাই বাঁধিয়া ধূমকেতু উড়াইবে বা প্রতি শনিবারে ময়দানে একটা করিয়া ভূমিকম্পের নাচ দেখাইবে। সে হুঁকার জল ফিরাইতে, ঘুড়ি উড়াইতে ও বাঁদর নাচাইতে পারে বলিয়া যে অম্লান বদনে এমনতরো একটা গুরুতর কার্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিতে চাহে, ইহা তাহার নিতান্ত স্পর্ধার কথা। আজকাল খাতায় টুকিয়া রাখিতে হয়— অমুক দিন ঠিক অমুক সময়ে পকেট হইতে রুমালটি বাহির করিয়া দেশের জন্য কাঁদিব— তাহার পরদিন সাড়ে তিনটের সময় সহসা দেশের লোকের কুসংস্কার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিব না ও তাহাই লইয়া ঠিক তিনপোয়া-আন্দাজ রাগ ও একপোয়া-আন্দাজ দুঃখ করিব; বন্ধু যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসেন— ঊনত্রিশে চৈত্র ১১টার সময় আমার ওখানে আহার করিতে আসিয়ো, তখন আমাকে বলিতে হয়— 'না ভাই তাহা পারিব না। কারণ ত্রিশে চৈত্র আমার কাগজ বাহির হইবে, অতএব কাল ঠিক এগারোটার সময় দেশের অনৈক্য দেখিয়া আমার হৃদয় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে স্মরণ করিয়া আমাকে অতিশয় শোকাতুর হইতে হইবে।' য়ুরোপে লেখক বিস্তর আছে, সেখানে তবু এতটা হানি হয় না, কিন্তু হানি কিছু হয়ই। আর, আমাদের দেশে লেখক নাই বলিলেও হয়, তবুও তো এতগুলো কাগজ চলিতেছে। কেমন করিয়া চলে? লেখার ভান করিয়া চলে। সহৃদয় লোকদের হৃদয়ে অন্তঃপুরবাসী পবিত্র ভাবগুলিকে সাহিত্যসমাজের অনার্যেরা যখনি ইচ্ছা অসংকোচে তাহাদের কঠিন মলিন হস্তে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়া তুলিতেছে। এই-সকল ম্লেচ্ছেরা মহৎবংশোদ্ভব কুলীন ভাবগুলির জাত মারিতেছে। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে সমাজে তুলিতে হয়। কারণ, সকল বিষয়েই অধিকারী ও অনধিকারী আছে। লেখার অধিকারী কে? না, যে ভাবে, যে অনুভব করে। ভাবগুলি যাহার পরিবারভুক্ত লোক। যে-খুশি-সেই কোম্পানির কাছ হইতে লাইসেন্স লইয়া ভাবের কারবার করিতে পারে না। সেরূপ অবস্থা মগের মুলুকেই শোভা পায় সাহিত্যের রাম-রাজত্বে শোভা পায় না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সাহিত্যের অরাজকতার মধ্যে কি তাহাই হইতেছে না! না হওয়াই যে আশ্চর্য। কারণ এত কাগজ হইয়াছে যে, তাহার লেখার জন্য যাকে-তাকে ধরিয়া বেড়াইতে হয়— নিতান্ত অর্বাচীন হইতে ভীমরতিগ্রস্ত পর্যন্ত কাহাকেও ছাড়িতে পারা যায় না। মনে করো,

হঠাৎ যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, কেল্লায় গিয়া দেখিলাম সৈন্য বড়ো বেশি নাই— তাড়াতাড়ি মুটেমজুর চাষাভুষো যাহাকে পাইলাম এক-একখানা লাল পাগড়ি মাথায় জড়াইয়া সৈন্য বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলাম। দেখিতে বেশ হইল। বিশেষত রীতিমতো সৈন্যের চেয়ে ইহাদের এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে— ইহারা বন্দুকটা লইয়া খুব নাড়িতে থাকে, পা খুব ফাঁক করিয়া চলে এবং নিজের লাল পাগড়ি ও কোমরবন্ধটার বিষয় কিছুতেই ভুলিতে পারে না— কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধে হার হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই হইয়াছে— লেখাটা চাই-ই চাই, তা-সে যেই লিখুক-না-কেন। এ লেখাতেও না কি আবার উপকার হয়! উপকার চুলায় যাউক স্পষ্ট অপকার হয় ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন। অনবরত ভান চলিতেছে— গদ্যে ভান, পদ্যে ভান, খবরের কাগজে ভান, মাসিকপত্রে ভান, রাশি রাশি মৃত-সাহিত্য জমা হইতেছে, ভাবের পাড়ায় মড়ক প্রবেশ করিয়াছে। ভারত-জাগানো ভাবটা কিছু মন্দ নয়। বিশেষত যথার্থ সহৃদয়ের কাতর মর্মস্থান হইতে এই জাগরণ-সংগীত বাজিয় উঠিলে, আমাদের মতো কুম্ভকর্ণেরও এক মুহূর্তের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়; নিদেন হাই তুলিয়া গা-মোড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত-জাগানো কথাটা যেন মারিতে আসে। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আজ দশ-পনেরো বৎসর ধরিয়া অনবরত বালকে এবং স্ত্রীলোকে পর্যন্ত ভারত-জাগানোর ভান করিয়া আসিয়াছে— ভাবটা ফ্যাশন হইয়া পড়িল, সাহিত্য-দোকানদারেরা লোকের ভাব বুঝিয়া বাজারের দর দেখিয়া দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতে লাগিল; কাপড়ের একটা নতুন পাড় উঠিলে তাহা যেমন সহসা হাটে-ঘাটে-মাঠে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া ওঠে— ভারত-জাগানোটাও ঠিক তেমনি হইয়া উঠিল— কাজেই ঝট্ করিয়া তাহাকে মারা পড়িতে হইল। কুম্ভকর্ণকে যেমন ঢাকঢোল জগঝম্প বাজাইয়া উৎপীড়ন করিয়া কাঁচাঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিল ও সে যেমন জাগিল, তেমনি মরিল। ইহার বিপুল মৃতদেহ আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে একবার দেখো দেখি। এখনও কেহ কেহ কাজকর্ম না থাকিলে জেঠাইমাকে গঙ্গাযাত্রা হইতে অব্যাহতি দিয়া এই মৃতদেহের কানের কাছে ঢাকঢোল বাজাইতে আসেন। কিন্তু এ আর উঠিবে না, এ নিতান্তই মারা পড়িয়াছে। যদি ওঠে তবে প্রতিভার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন দেহ ধারণ করিয়া উঠিবে। এমন একটার উল্লেখ করিলাম কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনা শয্যার উপরে হাত-পা খিচাইয়া ধুনষ্টংকার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতরো দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসংকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে! চাহিয়া দেখো-না, বাংলা নবেলের মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভালোবাসাবাসির একটা ভান, কবিতার মধ্যে নিতান্ত অমূলক একটা হা-হুতাশের ভান, প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা উদ্দীপনা ও রোখা-মেজাজের ভান! এ তো ভান করিবার বয়েস নয়— আমাদের সাহিত্য এই যে সে-দিন জন্মগ্রহণ করিল— এরই মধ্যে হাবভাব করিতে আরম্ভ করিলে বয়সকালে ইহার দশা যে কী হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কথাটা সত্য হইলেই যে সমস্ত দায় হইতে এড়াইলাম তাহা নহে। সত্য কথা অনুভব না করিয়া যে বলে তাহার বলিবার কোনো অধিকার নাই। কারণ সত্যের প্রতি সে অন্যায় ব্যবহার করে। সত্যকে সে এমন দীনহীনভাবে লোকের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে, যে কেহ সহসা তাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। বিশ্বাস যদি বা করে তা মৌখিকভাবে করে, সসম্ভ্রমে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে আসন পাতিয়া দেয় না। সে যত বড়ো লোকটা তদুপযুক্ত আদর পায় না। অনবরত রসনায় রসনায় দেউরিতে দেউরিতে ফিরিতে থাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, ক্রমে রসনার শোভা হইয়া ওঠে, হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। হৃদয়ের চারা রসনায় পুঁতিলে কাজেই সে মারা পড়ে।

সত্যের দুই দিক আছে— প্রথম, সত্য যে সে আপনা-আপনিই সত্য, দ্বিতীয়, সত্য আমার কাছে সত্য। যতক্ষণ-না আমি সর্বতোভাবে অনুভব করি ততক্ষণ সত্য হাজার সত্য হইলেও আমার নিকটে মিথ্যা। সুতরাং আমি যখন অনুভব না করিয়া সত্য কথা বলি, তখন সত্যকে প্রায় মিথ্যা করিয়া তুলি। অতএব বরঞ্চ মিথ্যা বলা ভালো তবু সত্যকে হত্যা করা ভালো নয়। কিন্তু প্রত্যহই যে সেই সত্যের প্রতি মিথ্যাচারণ করা হইতেছে। যাহারা বোঝে না তাহারাও বুঝাইতে আসিয়াছে, যাহারা ভাবে না তাহারাও টিয়া পাখির মতো কথা কয়, যাহারা অনুভব করে না তাহারাও তাহাদের রসনার শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া লাঠি খেলাইতে আসে। ইহার কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই! অপমানিত সত্য কি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইবেন না! লক্ষ লক্ষ বৎসর অবিশ্রাম ভান করিলেও কি কোনোকালে যথার্থ হইয়া ওঠা যায়! দেবতাকে দিনরাত্রি মুখ ভেংচাইয়াই কি দেবতা হওয়া যায়, না তাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়!

সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাবের সংস্রবে আসিয়াই, বোধ করি, আমাদের এই উৎপাত ঘটিয়াছে। আমরা অনেক তত্ত্ব তাহাদের কেতাব হইতে পড়িয়া পাইয়াছি।— ইহাকেই বলে প'ড়ে পাওয়া— অর্থাৎ ব্যবহারী জিনিস পাইলাম বটে কিন্তু তাহার ব্যবহার জানি না। যাহা শুনিলাম মাত্র, ভান করি যেন তাহাই জানিলাম। পরের জিনিস লইয়া নিজস্ব স্বরূপে আড়ম্বর করি। কথায় কথায় বলি, উনবিংশ শতাব্দী, ওটা যেন নিতান্ত আমাদেরই। একে বলি ইনি আমাদের বাংলার বাইরন, ওঁকে বলি উনি আমাদের বাংলার গ্যারিবল্‌ডি, তাঁকে বলি তিনি আমাদের বাংলার ডিমস্থিনিস— অবিশ্রাম তুলনা করিতে ইচ্ছা যায়— ভয় পাছে এটুকুমাত্র অনৈক্য হয়— হেমচন্দ্র যে হেমচন্দ্রই এবং বাইরন যে বাইরনই, তাহা মনে করিলে মন কিছুতেই সুস্থ হয় না। জবরদস্তি করিয়া কোনোমতে বটকে ওক বলিতেই হইবে, পাছে ইংলন্ডের সহিত বাংলার কোনো বিষয়ে এক চুল তফাত হয়। এমনতরো মনের ভাব হইলে ভান করিতেই হয়— পাউডর মাখিয়া সাদা হইতেই হয়, গলা বাঁকাইয়া কথা কহিতেই হয় ও বিলাতকে 'হোম্' বলিতে হয়! সহজ উপায়ে না বাড়িয়া আর-একজনের কাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া লম্বা হইয়া উঠিবার এইরূপ বিস্তর অসুবিধা দেখিতেছি! আমরা খল্‌সেরা দেখিতেছি অ্যাংবাংগণ খুব থপ্‌থপ্ করিয়া চলিতেছে, সুতরাং খল্‌সে বলিতেছেন, আমিও যাই! যাও তাহাতে তো দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের চাল যে স্বতন্ত্র! অ্যাব্যাংয়ের চালে চলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের চলিবার সমূহ অসুবিধা হইবে এইটে জানা উচিত!

আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিতেছে। চারি দিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে, ভাবের ভাষা নহে। কানে তালা লাগিলে যেমন একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়— সে শব্দটা ঘূর্ণ্যবায়ুর মতো বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তিষ্কের সমস্ত ভাবগুলিকে ধূলি ও খড়কুটার মতো আস্‌মানে উড়াইয়া দিয়া মাথার খুলিটার মধ্যে শাঁখ বাজাইতে থাকে; জগতের যথার্থ শব্দগুলি একেবারে চুপ করিয়া যায় ও সেই মিথ্যা শব্দটাই সর্বেসর্বা হইয়া বৃত্রাসুরের মতো সংগীতের স্বর্গরাজ্যে একাধিপত্য করিতে থাকে; মাথা কাঁদিয়া বলে, ইহা অপেক্ষা অরাজকতা ভালো, ইহা অপেক্ষা বধিরতা ভালো— আমাদের সাহিত্য তেমনি করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে— শব্দ খুবই হইতেছে কিন্তু এ ভোঁ ভোঁ, এ মাথাঘোরা আর সহ্য হয় না! এই দিগন্ত-বিস্তৃত কোলাহলের মহামরুর মধ্যে, এই বধিরকর শব্দরাজ্যের মহানীরবতার মধ্যে একটা পরিচিত কণ্ঠের একটা কথা যদি শুনিতে পাই, তবে আবার আশ্বাস পাওয়া যায়— মনে হয়, পৃথিবীতেই আছি বটে, আকার-আয়তনহীন নিতান্ত রসাতলরাজ্যে প্রবেশ করিতেছি না।

আমরা বিশ্বামিত্রের মতো গায়ের জোরে একটা মিথ্যাজগৎ নির্মাণ করিতে চাহিতেছি— কিন্তু ছাঁচে ঢালিয়া, কুমারের চাকে ফেলিয়া, মস্ত একতাল কাদা লইয়া জগৎ গড়া যায় না! বিশ্বামিত্রের জগৎ ও বিশ্বকর্মার জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ— বিশ্বকর্মার জগৎ এক অচল অটল

নিয়মের মধ্য হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই; তাহা রেষারেষি করিয়া, তর্জমা করিয়া, গায়ের জোরে বা খামখেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্তই তাহার ভিত্তি অচলপ্রতিষ্ঠ। এই নিমিত্তই এই জগৎকে আমার এত বিশ্বাস করি— এই নিমিত্তই এক পা বাড়াইয়া আর-এক পা তুলিবার সময় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয় না পাছে জগৎটা পায়ের কাছ হইতে হুস করিয়া মিলাইয়া যায়! আর বিশ্বামিত্রের ঘরগড়া জগতে যে হতভাগ্য জীবদিগকে বাস করিতে হইত তাহাদের অবস্থা কী ছিল একবার ভাবিয়া দেখো দেখি! তাহারা তপ্ত ঘিয়ে ময়দার চক্র ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতে বসিত ইহা হইতে লুচি হইবে কি চিনির শরবত হইবে। এক গাছ ফল দেখিলেও তাহাদের গাছে উঠিয়া পাড়িতে প্রবৃত্তি হইত না, সন্দেহ হইত পাছে হাত বাড়াইলেই ওগুলো পাখি হইয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা মিলিয়া তর্ক করিত পায়ে চলিতে হয় কি মাথায় চলিতে হয়; কিছুই মীমাংসা হইত না। প্রতিবার নিশ্বাস লইবার সময় দুটো-তিনটে ডাক্তার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইত, নাকে নিশ্বাস লইব কি কানে নিশ্বাস লইব, কেহ বলিত নাকে, কেহ বলিত কানে। অবশেষে একদিন ঠিক দুপুরবেলা যখন সেখানকার অধিবাসীরা ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয় কি উপবাস করিতে হয়, এই বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিশ্বামিত্রের জগৎটা উল্টোপাল্টা, হিজিবিজি, হ-য-ব-র-ল হইয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটিয়া, বোমার মতো আওয়াজ করিয়া, হাউয়ের মতো আকাশে উঠিয়া সবসুদ্ধ কোন্‌খানে যে মিলাইয়া গেল, আজ পর্যন্ত তাহার ঠিকানাই পাওয়া গেল না! তাহার কারণ আর কিছু নয়— সৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্মিত হওয়ায় অনেক তফাত। বিশ্বামিত্রের জগৎটা যে অন্যায় হইয়াছিল তা বলিবার জো নাই— তিনি এই জগৎকেই চোখের সুমুখে রাখিয়া এই জগৎ হইতেই মাটি কাটিয়া লইয়া তাঁহার জগৎকে তাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, এই জগতের বেলের খোলার মধ্যে এই জগতের কুলের আঁটি পুরিয়া তাঁহার ফল তৈরি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই জগতের টুকরো লইয়া খুব শক্ত শিরীষের আঠা দিয়া জুড়িয়াছিলেন সুতরাং দেখিতে কিছু মন্দ হয় নাই। আমাদের এই জগৎকে যেমন নিঃশঙ্কে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ আপনার কাজ আপনি করিতেছে, আমার নিয়মে আপনি বাড়িয়া উঠিতেছে, কোনো বালাই নাই, বিশ্বামিত্রের জগৎ সেরূপ ছিল না; তাহাকে ভারি সন্তর্পণে রাখিতে হইত, রাজর্ষির দিন-রাত্রি তাহাকে তাঁহার কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইতেন, এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তবু তো সে রহিল না! তাহার কারণ, সে মিথ্যা! মিথ্যা কেমন করিয়া হইল! এইমাত্র যে বলিলাম, এই জগতের টুকরা লইয়াই সে গঠিত হইয়াছে, তবে সে মিথ্যা হইল কী করিয়া? মিথ্যা নয় তো কী? একটি তালগাছের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ বজায় থাকিতে পারে, তাহার ছাল আঁশ কাঠ মজ্জা পাতা ফল শিকড় সমস্তই থাকিতে পারে; কিন্তু যে অমোঘ সজীব নিয়মে তাহার নিজ চেষ্টা ব্যতিরেকেও সে দায়ে পড়িয়া তালগাছ হইয়াই উঠিয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহার তুলসীগাছ হইবার জো নাই, সেই নিয়মটি বাহির করিয়া লইলে সে তালগাছ নিতান্ত ফাঁকি হইয়া পড়ে, তাহার উপরে আর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না! তাহার উপরে যে লোক নির্ভর করিতে পারে, সে কৃষ্ণনগরের কারিগরের গঠিত মাটির কলা খাইতেও পারে— কিন্তু সে কলায় শরীর পুষ্টও হয় না, জিহ্বা তুষ্টও হয় না, কেবল নিতান্ত কলা খাওয়াই হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে এই বুঝাইতেছে যে, অংশ লইয়া অনেক লইয়া সত্য নহে, সত্য একের মধ্যে মূল নিয়মের মধ্যে বাস করে। আমাদের সাহিত্যে নবেল থাকিতে পারে, নাটক থাকিতে পারে, মহাকাব্য গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য থাকিতে পারে, সাপ্তাহিক পত্র থাকিতে পারে এবং মাসিক পত্রও থাকিতে পারে কিন্তু সেই অমোঘ নিয়ম না থাকিতেও পারে, যাহাতে করিয়া নবেল নাটক পত্রপুষ্পের মতো আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা একটি গঠিত সাহিত্য দিনরাত্রি চোখের সুমুখে দেখিতে পাইতেছি। আমরা লিখিবার আগেই সমালোচনা পড়িতে

পাইয়াছি; আমরা আগেভাগেই অলংকারশাস্ত্র পড়িয়া বসিয়া আছি, তাহার পরে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছি। সুতরাং ল্যাজায় মুড়ায় একাকার হইয়া সমস্তই বিপর্যয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যটা যেরূপ মোটা হইয়া উঠিতেছে তাহাকে দেখিলে সকলেই পুলকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ওই বিপুল আয়তনের মধ্যে রোগের বীজ বিনাশের কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন্ দিন সকালে উঠিয়াই শুনিব— 'সে নাই।' খবরের কাগজে কালো গণ্ডি আঁকিয়া বলিবে 'সে নাই।' 'কিসে মরিল?' 'তাহা জানি না হঠাৎ মরিয়াছে।' বঙ্গসাহিত্য থাকিতে পারে, খাঁটি বাঙালি জন্মিতে পারে, কিন্তু এ সাহিত্য থাকিবে না। যদি থাকে তো কিছু থাকিবে। যাঁহারা খাঁটি হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের কথা মরিবে না।

সভ্য ঘরে না জন্মাইলে সভ্যকে 'পুষ্যি' করিয়া লইলে ভালো কাজ হয় না। বরঞ্চ সমস্তই সে মাটি করিয়া দেয়। কারণ সে সভ্যকে জিহ্বার উপরে দিনরাত্রি নাচাইয়া নাচাইয়া আদুরে করিয়া তোলা হয়। সে কেবল রসনা-দুলাল হইয়া উঠে। সংসারের কঠিন মাটিতে নামাইয়া তাহার দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া যায় না। সে অত্যন্ত খোশ-পোশাকী হয় ও মনে করে আমি সমাজের শোভা মাত্র! এইরূপ কতকগুলো অকর্মণ্য নবাবী সভ্য পুষিয়া সমাজকে তাহার খোরাক জোগাইতে হয়। আমাদের দেশের অনেক রাজা-মহারাজা শখ করিয়া এক-একটা ইংরাজ চাকর পুষিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া দূরে থাক্ তাহাদের সেবা করিতে করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়! আমরাও তেমনি অনেকগুলি বিলিতি সভ্য পুষিয়াছি, তাহাদিগকে কোনো কাজেই লাগাইতে পারিতেছি না, কেবল গদ্যে পদ্যে কাগজে পত্রে তাহাদের অবিশ্রাম সেবাই করিতেছি। ঘোরো সভ্য কাজকর্ম করে ও ছিপছিপে থাকে, তাহাদের আয়তন দুটো কথার বেশি হয় না আর নবাবী সভ্যগুলো ক্রমিক মোটা হইয়া ওঠে ও অনেকটা করিয়া কাগজ জুড়িয়া বসে— তাহার সাজ-সজ্জা দেখিলে ভালো মানুষ লোকের ভয় লাগে— তাহার সর্বাঙ্গে চারি দিকে বড়ো বড়ো নোটগুলো বটগাছের শিকড়ের মতো ঝুলিতেছে— বড়ো বড়ো ইংরিজির তর্জমা, অর্থাৎ ইংরিজি অপেক্ষা ইংরিজিতর সংস্কৃত, যে সংস্কৃত শব্দের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে শুচি লোকদিগকে গঙ্গাস্নান করিতে হয়, এমনতরো বৃহদায়তন ম্লেচ্ছ সংস্কৃত ও অসাধু সাধু ভাষা গলগণ্ডের মতো, ফোঁকার মতো, ব্রণর মতো তাহার সর্বাঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে— তাহারই মধ্যে আবার বন্ধনী-চিহ্নিত ইংরিজি শব্দের উক্তির ছাপ— ইহার উপরে আবার ভূমিকা উপসংহার পরিশিষ্ট— পাছে কেহ অবহেলা করে এইজন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটটা করিয়া নকীব তাহার সাতপুরুষের নাম হাঁকিতে হাঁকিতে চলে— বেকন্, লক্, হব্‌স্, মিল্, স্পেন্সর, বেন্— শুনিয়া আমাদের মতো ভীতু লোকের সর্দিগর্মি হয়, পাড়াপেঁয়ে লোকের দাঁতকপাটি লাগে। যাহাই হউক, এই ব্যক্তিটার শাসনেই আমরা চলিতেছি। এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সভ্য বিলিতি বুটজুতা পরিয়া না আসিলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দিই না। এবং সভ্যের পায়ে [illegible] পায়ে নাগরা জুতো দেখিলে আমাদের পিত্তি জ্বলিয়া ওঠে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত [illegible] আরম্ভ করি! যদি শুনিতে পাই, সংস্কৃতে এমন একটা দ্রব্যের বর্ণনা আছে, যাহাকে টানিয়া-বুনিয়া টেবিল বলা যাইতে পারে বা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিশেষ একটা জায়গায় কাঁটাচামচের সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া গিয়াছে। বা বারুণী ব্র্যান্ডির, সুরা শেরীর, মদিরা ম্যাডেরার, বীর বিয়ারের অবিকল ভাষান্তর মাত্র— তবে আর আমাদের আশ্চর্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না— তখনই সহসা চৈতন্য হয় তবে তো আমার সভ্য ছিলাম! যদি প্রমাণ করিতে পারি, বিমানটা আর কিছুই নয়, অবিকল এখানকার বেলুন, এবং শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না, তাহা হইলেই ঋষিগুলোর উপর আর কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হয়! এ-সকল তো নিতান্ত অপদার্থের লক্ষণ! সকলেই বলিতেছেন, এইরূপ শিক্ষা, এইরূপ চর্চা হইতে আমরা বিস্তর ফল লাভ করিতেছি। ঠিক কথা, কিন্তু সে ফলগুলো কী রকমের? গজভুক্তকপিত্থবৎ।

ইহার ফল কি এখনি দেখা যাইতেছে না! আমরা প্রতিদিনই কি মনুষ্যত্বের যথার্থ গাম্ভীর্য

হারাইতেছি না। এক প্রকার বিলিতি পুতুল আছে তাহার পেট টিপিলেই সে মাথা নাড়িয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে, আমরাও অনবরত সেইরূপ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও করিতেছি, মাথা নাড়িয়া খঞ্জনীও বাজাইতেছি, কিন্তু গাম্ভীর্য কোথায়। মানুষের মতো দেখিতে হয় কই যে, বাহিরের পাঁচ জন লোক দেখিয়া শ্রদ্ধা করিবে! আমরা জগতের সম্মুখে পুৎলোবাজি আরম্ভ করিয়াছি, খুব ধড়্‌ফড় ছটফট করিতেছি ও গগনভেদী তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছি। সাহেবরা কখনো হাসিতেছেন, কখনো হাততালি দিতেছেন, আমাদের নাচনী ততই বাড়িতেছে, গলা ততই উঠিতেছে! ভুলিয়া যাইতেছি এ কেবল অভিনয় হইতেছে মাত্র— ভুলিয়া যাইতেছি যে জগৎ একটা নাট্যশালা নহে, অভিনয় করাও বা কাজ করাও তা একই কথা নহে। পুতুল নাচ যদি করিতে চাও, তবে তাহাই করো— আর কিছু করিতেছি মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়ো না; মনে করিয়ো না যেন সংসারের যথার্থ গুরুতর কার্যগুলি এইরূপে অতি সহজে অবহেলে ও অতি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছি; মনে করিয়ো না অন্যান্য জাতিরা শত শত বৎসর বিপ্লব করিয়া প্রাণপণ করিয়া, রক্তপাত করিয়া যাহা করিয়াছেন আমরা অতিশয় চালাক জাতি কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া তাহা সারিয়া লইতেছি— জগৎসুদ্ধ লোকের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের এই প্রকার চাটুলতা অত্যন্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই— কিন্তু ইহা হইতেই কি প্রমাণ হইতেছে না আমরা ভারি হাল্কা! এ প্রকার ফড়িংবৃত্তি করিয়া জাতিত্বের অতি দুর্গম উন্নতিশিখরে উঠা যায় না এবং এই প্রকার ঝিঁঝিপোকার মতো চেঁচাইয়া কাল নিশীথের গভীর নিদ্রাভঙ্গ করানো অসম্ভব ব্যাপার। অত্যন্ত অভদ্র, অনুদার, সংকীর্ণ গর্বস্ফীত ভাবের প্রাদুর্ভাব কেন হইতেছে! লেখায় কুরুচি, ব্যবহারে বর্বরতা, সহৃদয়তার আত্যন্তিক অভাব কেন দেখা যাইতেছে! কেন পূজ্য ব্যক্তিকে ইহারা ভক্তি করে না, গুণে সম্মান করে না, সকলই উড়াইয়া দিতে চায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ইহাদের বিশ্বাস নাই কেন? যখনি কোনো বড়ো লোকের নাম করা যায়, তখনি সমাজের নিতান্ত বাজে লোকেরা রাম শ্যাম কার্তিকেরাও কেন বলে, হ্যাঁঃ, অমুক লোকটা হম্বগ, অমুক লোকটা ফাঁকি দিয়া নাম করিয়া লইয়াছে, অমুক লোকটা আর-এক জনকে দিয়ে লিখাইয়া লয়, অমুক লোকটা লোকের কাছে খ্যাত বটে, কিন্তু খ্যাতির যোগ্য নহে। ইহারা প্রাণ খুলিয়া ভক্তি করিতে জানে না, ভক্তি করিতে চাহে না, ভক্তিভাজন লোকদিগকে হট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে, এবং যখন ভক্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করে তখন সে কেবল ইংরাজি দস্তুর বলিয়া সভ্যজাতির অনুমোদিত বলিয়া করে, মনে করে দেখিতে বড়ো ভালো হইল! এত অবিশ্বাস কেন, এত [illegible] এত স্পর্ধা কেন— অভদ্রতা এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে কেন, ছেলেপিলেগুলো [illegible] কেন, [illegible] ভীরুদিগের ন্যায় অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও [illegible] পারিলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে করিতেছে কেন, [illegible] বুকে [illegible] বাঁধিয়া [illegible] হাতের [illegible] [illegible] তুড়ি দিয়া ফুঁ দিয়া [illegible] উড়াইয়া [illegible]! তাহার [illegible], [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া— কিছুরই [illegible] যথার্থ [illegible] নাই, কিছুরই যে যথার্থ মূল্য আছে তাহা কেহ মনে করে না, সকলই মুখের কথা, [illegible] ও মাদকতার সহায় মাত্র। সেইজন্যই সকলেই দেখিতেছেন, আজকাল [illegible] ছিবলেমির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জগৎ যেন একটা তামাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমরা কেবল যেন মজা দেখিতেই আসিয়াছি। খুব মিটিং করিতেছি, খুব কথা কহিতেছি, আজ এখানে যাইতেছি, কাল ওখানে যাইতেছি, ভারি মজা হইতেছে। আতসবাজি দেখিলে ছেলেরা যেমন আনন্দে একেবারে অধীর হইয়া উঠে, এক-একজন লোক বক্তৃতা দেয় আর ইহাদের ঠিক তেমনিতরো আনন্দ হইতে থাকে, হাত-পা নাড়িয়া চেঁচাইয়া, করতালি দিয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারে না; বক্তাও উৎসাহ পাইয়া আর কিছুই করেন না, কেবলই মুখ-গহ্বর হইতে তুবড়িবাজি ছাড়িতে

থাকেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের আর কোনো উপকার না হউক অত্যন্ত মজা বোধ হয়। মজার বেশি হইলেই অন্ধকার দেখিতে হয়, মজার কম হইলেই মন টেঁকে না, যেমন করিয়া হউক মজাটুকু চাই-ই। যতই গম্ভীর হউক ও যতই পবিত্র হউক-না কেন, জীবনের সমুদয় অনুষ্ঠানই একটি মিটিং, গোটাকতক হাততালি ও খবরের কাগজের প্রেরিত পত্রে পরিণত করিতে হইবে— নহিলে মজা হইল না! গম্ভীরভাবে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার কাজ আপনি করিব, আপনার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া তাহারই সাধনায় অবিশ্রাম নিযুক্ত থাকিব, সুদূর লক্ষ্যে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সিধা রাস্তা ধরিয়া চলিব; চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব, কোথাকার কোন্ গোরা কী বলে না-বলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না এমন ভাব আমাদের মধ্যে কোথায়! কেবলই হৈ হৈ করিয়া বেড়াইব ও মনে করিব কী-যেন একটা হইতেছে! মনে করিতেছি, ঠিক এইরকম বিলাতে হইয়া থাকে, ঠিক এইরকম পার্লামেন্টে হয়, এবং আমাদের এই আওয়াজের চোটে গবর্মেন্টের তক্তপোশের নীচে ভূমিকম্প হইতেছে। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা করিতেছি, অথচ সেইসঙ্গে ভান করিতেছি যেন বড়ো বীরত্ব করিতেছি; সুতরাং চোখ রাঙাইয়া ভিক্ষা করি ও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে খাইতে মনে করি হ্যাম্প্‌ডেন ও ক্রমোয়েলগণ ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন; আহারটা বেশ তৃপ্তিপূর্বক হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চোখ-রাঙানি ও বুক-ফুলানির যতই ভান কর-না-কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের উন্নতির একমাত্র বা প্রধানতম উপায় বলিয়া গণ্য করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যথার্থ উন্নতি ও স্থায়ী মঙ্গল কখনোই হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অলক্ষ্য ও অদৃশ্যভাবে পিছনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিব। গবর্মেন্ট যতই আমাদিগকে এক-একটি করিয়া অধিকার ও প্রসাদ দান করিতেছেন, ততই দৃশ্যত লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু অদৃশ্যে যে লোকসানটা হইতেছে তাহার হিসাব রাখে কে? ততই যে গবর্মেন্টের উপর নির্ভর বাড়িতেছে। ততই যে ঊর্ধ্ব কণ্ঠে বলিতেছি 'জয় ভিক্ষাবৃত্তির জয়'— ততই যে আমাদের প্রকৃত জাতিগত ভাবের অবনতি হইতেছে। বিশ্বাস হইতেছে চাহিলেই পাওয়া যায়, জাতির যথার্থ উদ্যম বেকার হইয়া পড়িতেছে, কণ্ঠস্বরটাই কেবল অহংকারে ফুলিয়া উঠিতেছে ও হাত-পাগুলো পক্ষাঘাতে জীর্ণ হইতেছে। গবর্মেন্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের আশাভঙ্গ করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের মহৎ উপকার হয়, আমাদের সহসা চৈতন্য হয় যে, পরের উপরে যতখানা নির্ভর করে ততখানাই অস্থির, এবং নিজের উপর যতটুকু নির্ভর করে, ততটুকুই ধ্রুব! এ সময়ে, এই লঘুচিত্ততার নাট্যোৎসবের সময়ে আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ শিখাইবে কে? অতিশয় সহজসাধ্য ভান দেশহিতৈষিতা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যথার্থ গুরুতর কঠোর কর্তব্য সাধনে কে প্রবৃত্ত করাইবে! সাহেবদিগের বাহবাধ্বনির ঘোরতর কুহক হইতে কে মুক্ত করিবে! সে কি এই ভাঁ সাহিত্য! এ ফাঁকা আওয়াজ! সকলেই একতানে ওই একই কথা বলিতেছ কেন? সকলে একবাক্যে কেন বলিতেছ ভিক্ষা চাও, ভিক্ষা চাও! কেহ কি হৃদয়ের কথা বলিতে জানে না কেবলই কি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠাইতে হইবে! যতবড়ো গুরুতর কথাই হউক-না-কেন দেশের যতই হিত বা অহিতের কারণ হউক-না-কেন, কথাটা লইয়া কি কেবল একটা রবারে গোলার মতো মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া বেড়াইতে হইবে! এ কি কেবল খেলা! এ কি তামাশা, আর কিছুই নয়! হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার নাই, বিবেচনা করিবার নাই— গুলিডাণ্ডা খেলানো ছাড়া তাহার আর কোনো ফলাফল নাই! যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকে তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন— যে, যথার্থ কর্তব্য কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরে মুখাপেক্ষা না করিয়া পরের প্রশংসাপেক্ষা না করিয়া গম্ভীরভাবে আমরা নিজের কাজ নিঃ করিব, সবই যে ফাঁকি, সবই যে তামাশা, সবই যে কণ্ঠস্থ, তাহা নয়— কর্তব্য যতই সামা হউক-না-কেন, তাহার গাম্ভীর্য আছে, তাহার মহিমা আছে, তাহার সহিত ছেলেখেলা করি

গেলে তাহা অতিশয় অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠে। Agitation করিতে হয় তো করো, কিন্তু দেশের লোকের কাছে করো— দেশের লোককে তাহাদের ঠিক অবস্থাটি বুঝাইয়া দাও— বলো যে, গবর্মেন্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন, কেবল তোমরাই কিছু করিতেছ না। তোমরা শিক্ষা লাভ করো, শিক্ষা দান করো, অবস্থার উন্নতি করো। দেশের যাহা-কিছু অবনতি তাহা তোমাদেরই দোষে, গবর্মেন্টের দোষে নহে। এ কথা বলিবামাত্রই চারি দিকের খুচরা কাগজপত্রে বড্ড গোলমাল উঠিবে— তাহারা বলিবে এ কী কথা! ইংলণ্ডে তো এরূপ হয় না, Political Agitation বলিতে তো এমন বুঝায় না, Mazzini তো এমন কথা বলেন নাই; Garibaldi যে আর-এক রকম কথা বলিয়াছেন— Washington-এর কথার সহিত এ কথাটার ঐক্য হইতেছে না, যদি একটা কাজ করিতেই হইল তবে ঠিক পার্ল্যামেন্টের অনুসারে করাই ভালো ইত্যাদি। উহারাও আবার যদি কথা কহিতে আসে তো কহুক-না, উহাদের মাথা চাষ করিলে বালি ওঠে, আবাদ করিলে কচুও হয় না, অতএব বাঁধি বোলের মহাজনী না করিলে উহাদের গুজরান চলে না। কিন্তু হৃদয়ের কথা সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া কানের মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবেই ইহা নিশ্চয়ই!

সেদিন কথোপকথনকালে একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, রোমকেরা যখন প্রাচীন ইংলণ্ডের অকালসভ্য শেণ্টদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার ইংলণ্ডেই পড়িয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ যদি কখনো ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তবে জাহাজে গিয়া দেখিবে বাঙালিরা আগেভাগে গিয়া কাপ্তেন নোয়া সাহেবের পা-দুটি ধরিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া আছে! আর কেহ যাক না-যাক— আধুনিক বাংলা সাহিত্যটা তো যাইবেই! কারণ ইংরাজি সাহিত্যের গ্যাসলাইট ব্যতীত এ সাহিত্য পড়া যায় না, হৃদয়ের আলোক এখানে কোনো কাজে লাগিবে না, কারণ, ইহা হৃদয়ের সাহিত্য নহে। আমার বাংলা পড়ি বটে কিন্তু ইংরাজির সহিত মিলাইয়া পড়ি— ইংরাজি চলিয়া গেলে এ বাংলা রাশীকৃত কতকগুলো কালো কালো আঁচড়ে পরিণত হইবে মাত্র! সুতরাং সেই হীনাবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এ যে আগেভাগে জাহাজে গিয়া চড়িয়া বসিবে তাহার কোনো ভুল নাই— সেখানে গিয়া বাবুর্চিখানার উনুন জ্বালাইবে বটে, কিন্তু তবুও থাকিবে ভালো!

অকাল কুষ্মাণ্ড কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এরূপ সাহিত্যকে কি বলা যায় না!

একটা আশার কথা আছে; এ সাহিত্যে চিরদিন থাকিবার নহে। এ সাহিত্যে নিজের রোগ নিজে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ নিজের বিনাশ নিজে সাধন করিবে— কেবল দুঃখ এই যে, মরিবার পূর্বে বিস্তর হানি করিয়া তবে মরিবে; অতএব এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভালো। প্রভাত হইবে কবে, নিশাচরের মতো অন্ধকারে কতকগুলা মশাল জ্বালাইয়া তারস্বরে উৎকট উৎসবে না মাতিয়া, নিশীথের গুহার মধ্যে দল বাঁধিয়া বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিক উন্মত্ততা না করিয়া কবে পরিষ্কার দিনের আলোতে বিমল-হৃদয়ে আগ্রহের সহিত, সকলে মিলিয়া নূতন উৎসাহে, স্বাস্থ্যের উল্লাসে, সংসারের যথার্থ কাজগুলি সমাধা করিতে আরম্ভ করিব! সেই দিন প্রভাতে বাঙালির যথার্থ হৃদয়ের সাহিত্য জাগিয়া উঠিবে, অলসদিগকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিবে, নিরাশ-হৃদয়েরা পাখির গান শুনিয়া প্রভাতের সমীরণ স্পর্শ করিয়া ও নবজীবনের উৎসব দেখিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিবে অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে নিদ্রার রাজত্ব, প্রেতের উৎসব, অস্বাস্থ্যের গুপ্ত সঞ্চরণ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। জানি না সে কোন্ শক কোন্ সাল, সেই বৎসরই সাবিত্রী লাইব্রেরির যথার্থ গৌরবের সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, সেদিনকার লোক সমাগম, সেদিনকার উৎসাহ, সেদিনকার প্রতিভার দীপ্তি ও কেবলমাত্র বহিস্থিত দর্শকদের জড় কৌতূহলের ভাব নহে যথার্থ প্রাণে প্রাণে মিলন কল্পনাচক্ষে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যাইতেছে।

ভারতী
চৈত্র ১২৯০

হাতে কলমে

প্রেমের ধর্ম এই, সে ছোটোকেও বড়ো করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়োকেও ছোটো করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহসহকারে জলসেক করে যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড়ো কাজে হাত দেয়, তবে তাহার ক্ষুদ্র সোপানগুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত চরণের চিহ্ন পর্যন্ত ভালোবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করে। ছোটো কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, 'ও পরে হইবে।' তিনি বলেন, এক-পা এক-পা করিয়া চলাও তো আপামরসাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করিবেন এবং ইতিহাসে যদি সত্য হয় তবে ত্রেতাযুগে তাঁহারই এক পূর্বপুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন।[1] তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা 'উনবিংশ শতাব্দীর' শাস্ত্রসম্মত, ইতিহাসসম্মত, যাহা কনস্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্নাম আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুলপাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক পাকে জড়াইয়া একই কালে ভারতসমুদ্রের জলে চুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশের কোনো-একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জন্মিয়া ইঁহার আর কোনো কষ্ট নাই, কেবল স্থানাভাবের জন্য কিঞ্চিৎ কাতর আছেন। বামনদেব তিনপায়ে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তদাপেক্ষা বামন এই বামনশ্রেষ্ঠের জিহ্বার মধ্যে তিনটে লোক তিনটে বাতাসার মতো গলিয়া যায়! 'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী' ও 'সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্রের' মধ্যে অবিশ্রাম ফুঁ দিয়া ইনি একটা বেলুন বানাইতেছেন; অভিপ্রায়, আসমানে উড়িবেন; সেখানে আকাশ-কুসুমের ফলাও আবাদ করিবার অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি যদি ইঁহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করেন সে একরকম হয়, আর তা যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল। স্থানসংক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, কারণ আড়ম্বরের স্বভাবই এই, একবার সে যখন ঘুমায় তখন চতুর্দিকে হাত-পা ছড়াইয়া এমনি আয়োজন করিয়া ঘুমায় যে, কাহার সাধ্য তাহাকে জাগায়। তাহার জাগরণও যেরূপ বিকট তাহার ঘুমও সেইরূপ সুগভীর।

কেবল আড়ম্বর-প্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমার যে চক্ষে দেখি ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়োর প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্মশ্লাঘা, যশ, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় সদাসর্বক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্রত্বের চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ছোটোর প্রতি যে মন দেয়, তাহার তেমন উত্তেজনা কিছুই থাকে না, সুতরাং তাহার প্রেম থাকা চাই, তাহার মহত্ত্ব থাকা চাই— তাহার পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, সে প্রাণের টানে সে নিজের মহিমার প্রভাবে কাজ করে, তাহার কাজের আর অন্ত নাই।

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা

---

১. ইহা যদি কেহ 'রুচিবিরুদ্ধ' বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি 'উনবিংশ শতাব্দীর' ডারুয়িনের দোহাই দিব!

ছোটো কোন্‌টা বড়ো তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাসবিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়ো, আর দ্বারের নিকটস্থ একটি রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কী হয়, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্যন্ত জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না; আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কী! সে বড়োকে ছোটো মন করিতে পারে, ছোটোকে বড়ো মনে করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার— তাঁহাদের হাতের অপেক্ষা হাতিয়ার বেশি হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য কাজকর্ম সমস্তই একেবারে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এবং এই অবসরে দুশো পাঁচশো উর্ধ্বপুচ্ছ জিহ্বা এককালে ছাড়া পাইয়া দেশের লোকের কানের মাথাটি মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই-সকল ভীমার্জুনের প্রপৌত্রগণের, স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশি যে স্বদেশের 'লোকের' উপর প্রেম আর বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কীরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা' দিতেছেন, দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র তাহা হইতে এক জোড়া পক্ষিরাজের জন্ম হইবে।

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না, তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে কথায় বড়ো বড়ো চেক কাটে, কেননা কোনো ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। পুরাকালে কাঠবিড়ালীদের মধ্যে একজন জ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন। তিনি কুলবৃক্ষে বাস করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে যখন তাঁহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিল, তখন তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, একটি শ্বেত পদার্থের অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ ব্যাপক, একটি কুলফলের অপেক্ষা কুলফলত্ব বৃহৎ, কারণ তাহা চরাচরস্থ যাবৎ কুলফলের আধার। এই মহৎতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে কুলের প্রতি তাঁহার এমনি ঘৃণা জন্মিল যে, তিনি কুল ভক্ষণ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন— কুলত্বের চারা কীরূপে আবাদ করা যাইতে পারে ইহারই অন্বেষণে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর গবেষণার প্রভাবে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এমন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল যে, কুলত্বের চারা আজ পর্যন্ত বাহির হইল না। আজিও সেই কুলগাছ তাঁহার সমাধির উপরে মনুমেন্টস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভক্ত কাঠবিড়ালীগণ আজিও দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক সেই বৃক্ষ হইতে পেট ভরিয়া কুল খাইয়া যায়। বিষ্ণুশর্মার অপ্রকাশিত পুঁথিতে এই গল্পটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং অন্যান্য বাদানুবাদের ন্যায় উক্ত কুলফলত্ববাদও সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই 'বাদ'কে যে কোনো অনুষ্ঠান আশ্রয় করে সে উক্ত পূজনীয় কাঠবিড়ালী মহাশয়ের ন্যায় বেশিদিন বাঁচে না। আমাদের দেশহিতৈষিতাও বোধ করি নিজের মহত্ত্বের অভিমানে স্থূল খাদ্য ভক্ষণ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া হাওয়া ও বাষ্পের মতো খোরাকে জীবনধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দেখা যায় আমাদের এই দেশহিতৈষিতা পদার্থটা কামারের হাপরের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিতেছে এবং পরের মুহূর্তেই চুপসিয়া শুকনা চামচিকার আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি নাই। ইহা হাওয়ার গতিকে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে, আবার একটু আঘাত পাইলেই আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া যায়, তার পরে আর সে আওয়াজও করে না, কোলেও না। কিন্তু, খোরাক বদল করা যায় যদি, যদি ইহা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের প্রতি দক্ষিণহস্ত চালনা করে, তবে আর এমনতরো আকস্মিক

দুর্ঘটনাগুলো ঘটিতে পায় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাংলার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকে-প্রকারে জানাইতে চান তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে; তাঁহার তাঁহাদের 'মাথাব্যথার' কথাটা এমনই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোনো এক জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে, হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারি দিক হইতে যখন নিপীড়ত স্বদেশীদের আর্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতিবৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কী করিয়া? এই তো সেদিন শুনিলাম, স্বজাতিদুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিস্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিস্টরগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্প লোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের 'স্বদেশ' জিনিসটা কী জানিতে কৌতূহল হয়! সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ -বিবর্জিত রামায়ণ? না কদলার আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট কদলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড! ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতরো একটা ঘোড়া-ডিঙাইয়া ঘাস-খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণ-ব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ-হৃদয়ের রীতিমতো কন্সর্ট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করে। কিন্তু দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে— অলংকারশাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক অশ্রুজলে নহে— মনুষ্যচক্ষুপ্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালিবর্ষণে তাঁহাদের সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতিস্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কীরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানি না! অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই— অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া যাহারা খৃস্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোনো ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দন করিয়া তাহার কি কোনো ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি, বোধ করি ব্যাঘ্রের মতো ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে। ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিশ জাতি। তাহারাও খুনী, এইজন্য তাহারা খুনের মাদারটিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এইজন্য ডাকের পরিবর্তে দাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলন্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে। তাহাদের ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং

তাহাদের রোগীর জন্য অনন্ত অগ্নিদাহ প্রেস্ক্রিপশন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আর অন্বেষণে কী করিবে? Similia Similibus curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যাৎ সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। কিন্তু আমরা তো খুনী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোনো সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে, যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। নহিলে একে, ইংরাজেরা আমাদের বিধাতৃপুরুষ, মফস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, তাহারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক; কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাহাদের সহায়— এমন স্থলে একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা-ভরসা কোথায়!

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate করো, অর্থাৎ বাকযন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইল্‌বার্ট বিল ও লোকল সেলফ্ গবর্মেন্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখেবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনস্টিট্যুশনল হিস্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতায় শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে 'পোলিটিকল এডুকেশন' প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি এ-সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ব লাউ-কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নামিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কী করিয়া! যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল সেলফ্ গবর্মেন্টের মাচার উপর চড়াইয়া কী আর রাজা করিবে বলো! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কীরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ী ঠকঠক করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও তো এক কাজ করো; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ করো, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক। তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথায়। ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্রতিবিধান কিসে হইবে। Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস করাইয়া যেটুকু লাভ, তাহাতে এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হুজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ব কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ব কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিয়া বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটি কয়েককে বুঝেন ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন। আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাহাদের কড়িকাষ্ঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লটকাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্যে হইতে হইবে না। নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কীরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে! হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া মোরগপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ত্ব কী! যেমন তেলা মাথায় লোকে তেল দেয়, তেমনি টাকগ্রস্ত মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেইজন্য আমাদিগকে পরে অবমান করে। সেইজন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ত্ব লাভ করিব যে, পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুঁত খুঁত করিয়া মারা পড়িব না।

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই— ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এইজন্য সর্বত্র শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিয়ো না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি, প্রথমত, এ প্রস্তাবটা অসংগত, দ্বিতীয়ত, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভান করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কী! বিকারের রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি নাহয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কী করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে-সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমতো চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও তো এক-আধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং তো ব্যাধিমন্দিরং নহে, যে একেবারে ব্যাধিব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ-সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন আমাদের কী কাজ! এখন কি 'সভা' নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকার্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ উর্ধ্বশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক। এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙা-কুলার উপরে দেশের সমস্ত ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব ও যদি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপচ্ছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাইব! অর্থাৎ, কর্তব্য কাজকে কোনো মতেই গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনাবশ্যক জেঠাইমার মতো অবসর পাইবামাত্র সুদূরে গঙ্গাতীরে সমর্পণ করিয়া আসিব ও তাহার পরম সদ্গতি করিলাম মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসুখ অনুভব করিব! তাহা নহে। জিজ্ঞাসা করি, Public কোথায়, Public কী। চারি দিকে মরুভূমির এই যে বালুকাসমষ্টি ধূধূ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public। ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্তির মতো গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা

যত পারি কার্যভার নিক্ষেপ করি ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমার কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোনো কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কী করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোনো কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, একটা অত্যন্ত ফলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না। ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়তো এমনও মনে হয়, সভা করিয়া তোলা সভ্যদেশপ্রচলিত একটা দস্তুর; সুতরাং সভা না করিয়া কোনো কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ভে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কী, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারানী যেমন কুলগাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামী-কর্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পবলিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখনো তাহাকে আদর করিতেছি, কখনো তিরস্কার করিতেছি, কখনো বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতিহাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনও কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয় তো হউক, কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জন করিতে হইবে। এমন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্যতৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব 'আমরা' নামক সর্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবীতেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখরসকল জয়ের উপর ইতস্তত জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে তো আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পবলিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের এই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ তো একটা ভুঁইফোঁড়া ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশপাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেককে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে না কি কঠোর সাধনা, সে না কি নিভৃতে সাধ্য, সে না কি প্রকাশ্যস্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি, সে কঠিন কর্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই-সকল ছোটো কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ড মূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারি দিকে, আমাদের আশেপাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকি রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাসার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পবলিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগেভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠখড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্তি জনসমাজে আনয়ন করিয়া

আমরা তামাশা দেখিতেছি। শত্রুপক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পবলিকের উপযোগিতা স্বীকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পবলিক গঠন করিতে হইবে কী উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতে কলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্ বটবৃক্ষ হইতে যে পবলিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভাস্থলে নাবান তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর— এ তো চাঁদা করিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে-সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করি না কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মতো হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোনো অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না, কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিণী আনন্দবিধায়নী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক-বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া— সে তো অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক-না কেন।

ভারতী
ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

একটি পুরাতন কথা

অনেকেই বলেন, বাঙালিরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এইজন্য তাঁহারা বাঙালিদিগকে পরামর্শ দেন practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ওই কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, 'হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে।' আমি তাহার বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন— ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশি আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোনায় যেমন ভালো মজবুত গহনা গড়ানো যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না, তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা

আবশ্যকমতো দুই-একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্যসাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙালিদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙালিরা বিস্তর কাজে লাগে, কিন্তু কোনো কাজ করিতে পারে না। চাকরি করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কী— প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালোবাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে-শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না, সে অতি সাবধান-সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়— কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়— সুতরাং 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরবি বামনঃ' হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এইজন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্য হেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য সিদ্ধ না হয়— এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়তো অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়।

আমি সাবধানিতা বিজ্ঞতার নিন্দা করি না, তাহার আবশ্যকও হয়তো আছে। কিন্তু যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কী! তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমেসে বিজ্ঞতা কেবল বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও দেখা যায় না। শিশু যদি সাবধানী হইয়াই জন্মিত তবে সে চিরকাল শিশুই থাকিয়া যাইত, সে আর মানুষ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। কালক্রমে জ্ঞানার্জনশক্তির অশক্ত ডানা হইতে পালক ঝরিয়া যায়— তখন সে ব্যক্তি কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাবকদিগকে ডানা ছাঁটিয়া ফেলিতে বলে, ডানার প্রতি বিশ্বাস তাহার একেবারে চলিয়া যায়। এই ডানা যাহাদের শক্ত আছে তাহারাই নির্ভয়ে উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত, তাহাদিগকেই জরাগ্রস্তগণ sentimental বলিয়া থাকেন— আর এই ডানার পালক খসাইয়া যাহারা বদনমণ্ডল গোলাকার করিয়া বসিয়া থাকে, এক পা এক পা করিয়া চলে, ধূলির মধ্যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, চাণক্যেরা তাহাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না— কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি— আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ, ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তার আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তা আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা,

কৌশল, আপাতত প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্বল রুগ্‌ণ হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধাসকল তাহার চতুর্দিকে বল্মীকের স্তূপের মতো উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে। অনন্তের সমুদ্র হইতে দক্ষিণা বাতাস বহিলে তবেই তাহার স্ফূর্তি হয়; তবেই সে বল পায়, তবেই তাহার কুজ্‌ঝটিকা দূর হয়; তাহার কাননে যত সৌন্দর্য ফুটিবার সম্ভাবনা আছে সমস্ত ফুটিয়া উঠে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য, তাহা চতুর্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়— অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এইজন্যেই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদানগুলির উপর বুদ্ধির কাঁচি চালাইয়ো না। কলসি যত বড়োই হউক না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না। তখন যে তোমাকে ভাসাইয়া রাখে সেই তোমাকে ডুবায়।

ধর্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এইজন্যই সে আপাতত অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন-কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধিবিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বুদ্ধিবিচারের সীমা— কিন্তু ধর্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধিবিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সহস্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে। একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষানিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চিরনিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা নিবারণের কারণ বর্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে, দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধিবলে কিছুদিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতেও পারে, কিন্তু ধর্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্তি, সমাজের সৌন্দর্য, ও স্বাস্থ্য-বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোনো মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্মাণ করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি— কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ চিরপ্রবাহিত স্ফূর্তি চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা তো বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সংকীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবলমাত্র কম ও বেশি লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক প্রভেদই অত্যন্ত গুরুতর।

ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে— যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর-না-কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনোটা বা অল্প দিনে হয়, কোনোটা বা বেশি দিনে হয়।

এইজন্যেই বলিতেছি— মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তম আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সংকীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সংকীর্ণ সত্য, আপাতত সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থা বিশেষের উপর নহে— সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙিয়া যায়— তখন বিসর্জিত দেবপ্রতিমার তৃণ-কাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এইজন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার

সাহায্য করিবে, এইজন্যই পরের সাহায্য করিব— তাকে কখনোই পরের ভালো রূপ সাহায্য করিতে পার না ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনোই অধিক দিন টিকিবে না। কিসের বলেই বা টিকিবে। হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এতদিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে গিয়াছে, তাই এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড়ো জোর কলিকাতা শহরের ধুলাগুলি কাদা হইয়া উঠিত আর-কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালের দুই কলসি অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না— আর কেবলমাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা অধিক সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটা পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক— একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এইজন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলাযোগ বাধিত। বুদ্ধি-বিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা.করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোনো কাজই সতেজ করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না— সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্যঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোনো ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল। উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক-না-কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মতো একটা সুবিধার সুযোগ হইল— কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ ও ন্যায়ানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মতো মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ের যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া সংসারের কার্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচী অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচী গোপন কবিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমারা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই

উপরে তাহার সহস্রপ্রকারের প্রভাব কার্য করে; তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশজোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রঙ তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেইসঙ্গে লাল রঙ নীল রঙ সমুদয় রঙ মারা যাইবে— পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সবাই মিলিয়া সরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র political উদ্দেশ্যের মধ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য সমাজের অস্থিমজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য করিতেছে— একটি মাত্র উদ্দেশ্য বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্তন কর, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনি মতিভ্রমবশত একটি সংকীর্ণ হীত সমাজের চক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনি সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে; তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্‌গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরি-উক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কলকৌশল ধূর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো মানুষের মতো মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্য স্থানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসতল রাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্বথা পরিহর্তব্য।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড়ো বড়ো দেউড়ি আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোটো ছোটো খিড়কির দুয়ারগুলিই ভয়ানক, সে দিকে তেমন কড়াক্কড় নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমন হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনই আমি মনে করি 'লোকহিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই' তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল 'সত্য ভালো', সে বিশ্বাস সংকীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় 'সত্য ভালো, কেননা সত্য আবশ্যক।' সুতরাং যখনি কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভালো। সময় বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভালো এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময় বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, তো আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর— আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভালো।

প্রশ্ন— কেন ভালো? সময় বিশেষে সত্যই যদি ভালো না হয়, তবে লোকহিতই যে ভালো এ কথা কে বলিল?

উত্তর— লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভালো।

প্রশ্ন— কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর— আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

তদুত্তর— কই, তাহা তো সকল সময়ে দেখা যায় না। এমন তো দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর— তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন— তবে কাহাকে বলে।

উত্তর— স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর— আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভালোমন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাতত অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী

নহে তাহার প্রমাণ কী? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয় উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়— কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্বক প্রবল গর্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে শুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কী জান, আমিই বা কী জানি! লোকের শেষ কোথায়! লোক বলিতে বর্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনোই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোকে আশ্রয় সে কখনোই দিতে পারে না। বরং, মিথ্যা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে তো আমার এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

এত কথা আমি কি অনাবশ্যক বলিতেছি? এই-সকল পুরাতন কথার অবতারণা করা কি বাহুল্য হইতেছে? কী করিয়া বলিব! আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসংকোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছে না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন! অথচ কাহারো তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্বল. ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কী হইবে! যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মের সেই আদর্শপটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়— সেখানে সেই আদর্শে না জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে. তাই তাঁহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তা যদি হয় তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দিবে কে, সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে! সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া? তাহার অক্ষয় বলের ভাণ্ডার কোথায়! সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাঠিমের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীরা মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে— তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অসীম দেশ ও অসীম কালে তাঁহার হিত-ইচ্ছা কার্য করিতেছে— সুতরাং একটুখানি বর্তমান সুবিধার উদ্দেশ্যে খানিকটা মিথ্যার দ্বারা তালি-দেওয়া লোকহিত তাঁহার কার্য হইতেই পারে না। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছার নিম্নে পড়িলে ক্ষণিক ভালোমন্দ চূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার অগ্নিতে সংলোকও দগ্ধ হয় অসংলোকও দগ্ধ হয়। তাঁহার সূর্যকিরণ স্থানবিশেষের সাময়িক আবশ্যক অনাবশ্যক বিচার না করিয়াও সর্বত্র উত্তাপ দান করে। তেমনি তাঁহার অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালোমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীমকাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্বিচারে তাহার নির্দিষ্ট ফল ফলিতে থাকিবেই। আমরা তাহার সমস্ত ফল দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। এজন্যই আরও অধিক সাবধান হও। ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শে ইহাকে লইয়া খেলা করিয়ো না।

অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক আর লোকহিতের জন্যই হউক অসত্য বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এতই সংকুচিত যে অসত্য ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙালির হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা অসুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন-কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোকে যে-সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালোরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধি বিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়— সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গমশিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মতো সবল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্মদার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধিবিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে— বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এই ভাবের সমুদ্রকে বাঁধাইয়া বাঁধাইয়া যাঁহারা কূপ খনন করিতে চান, তাঁহারা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাদের নিজের গুরুভার বিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিন, কিন্তু সমস্ত স্বজাতিকে বিসর্জন না দিলেই মঙ্গল।

আমাদের জাতি নতুন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোনোমতেই কর্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতস্তত করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য-উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্য ভাঙাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। অল্প বয়সে শরীরের যে কাঠামো নির্মিত হয়, সমস্ত জীবন সেই কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়া চালাইতে হয়। এখন আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই বলিয়া থাকেন, বই বিক্রি করিয়া টাকা হয় না, এ সাহিত্যের মঙ্গল হইবে কি করিয়া!

বুড়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের টাকার থলি দেখিয়া হিংসা করিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এ বয়েসের এ কথা নহে। বই লিখিয়া টাকা নাই হইল! যে না লিখিয়া থাকিতে পারিবে না সেই লিখিবে, যাহার টাকা না হইলে চলে না সে লিখিবে না। উপবাস ও দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যের মূল পত্তন, ইহা কি অন্য দেশেও দেখা যায় না! বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কি কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিলেন? যদি তাঁহার কুবের ভাণ্ডার থাকিত রামায়ণ রচনার প্রতিবন্ধক দূর করিতে তিনি সমস্ত ব্যয় করিতে পারিতেন। প্রখর বিজ্ঞতার প্রভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে উদরের মধ্যেই সাহিত্যের মূল হৃদয়ের মধ্যে নহে। লেখার উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে লেখা মহৎ হইবে না।

যেমন করিয়াই দেখি, সংকীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনোই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনোই মহত্ত্বের স্ফূর্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি ধ্রুব বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সংকোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচারণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন, বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনোই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক, আত্মহিতই হউক লোকহিতই হউক, মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভান করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না— সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্বে উন্নত হইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভালো, তবু মিথ্যায় সংকুচিত হইয়া সুবিধার গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

কৈফিয়ত

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে 'পুরাতন কথা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর কতগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এইজন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু আনুষঙ্গিক যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাতত প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু বলেন, 'রবীন্দ্রবাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য

Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই...''সত্য'' ''মিথ্যা'' প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।'

বঙ্কিমবাবু যে অর্থে মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোনো সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করি। 'যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।'

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কী। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ— সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম— এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা-রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া 'আরও কিছু'-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশত সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খৃস্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃস্টিয়ান হইব— আমার নতুন হিন্দুয়ানিতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি— দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণত Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সংকীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত— 'সত্য' বলিতে প্রতিজ্ঞা 'রক্ষা' বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়— কেবলমাত্র সত্য শব্দ বুঝায় না।

তৃতীয়ত— বঙ্কিমবাবু 'সত্য' শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি 'মিথ্যা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে— কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্‌বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই— আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'যদি মিথ্যা কথা কহেন'— সত্য রক্ষা না করাকে 'মিথ্যা কথা কওয়া' কোনো পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন খৃস্টিয়ানই হউন স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদপরায়ণই হউন 'মিথ্যা কথা কহা' শুনিলেই তাহার প্রত্যহপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জুন এখানে কোনো সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোনো প্রকার সত্যের ভানও করেন নাই। আমি যদি বলি যে 'আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব' ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়— আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না

গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারিলেন না— মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশত এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্যবুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তথাপি সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে 'মিথ্যা কথা কহা' বলা যায় না যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজনখ্যাত দ্রোণপর্বস্থ কৃষ্ণের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষত যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সংগত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য। বিশেষত সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। 'হত ইতি গজে'র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোনো অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেইজন্যই বঙ্কিমবাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বঙ্কিমবাবু একস্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে, আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যাকথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোনোমতেই বোধ হয় না, কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম, 'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, 'প্রথম, "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতরে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ওই প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি।'

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্মভ্রষ্ট আর-একজন আচারভ্রষ্ট। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে, 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি— কিন্তু আমা-কর্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন— 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি।' কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখকালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই

দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনোমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশত আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদারহৃদয় মহদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষত তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন— 'তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখনো কখনো সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কী প্রকারে?'

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম 'তিনি একটি "হিন্দুর আদর্শ" কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে— তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা' উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা— ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই। বঙ্কিমবাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে, বঙ্কিমবাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা নহে, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি (জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিমবাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোনো-একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা— কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিমবাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোনো-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কী ছিল। কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ-গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিমবাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন— 'যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়'— সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন— এ তো আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিমবাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন 'প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে' সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভালো ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'লোকহিত' শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এইজন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড়ো ছড়াছড়ি বড়ো বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়ো! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে। তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবলমাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার তো কথাই নাই আঁষটে গন্ধটুকু পর্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি। 'মেছোহাটা'ই বলো আর 'প্রার্থনা মন্দির'ই বলো আমি কোথা হইতেও ফরমাশ দিয়া কথা আমদানি করি নাই— আমি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ধার ধারি না— হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন— প্রথম সংখ্যক 'প্রচার' বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার-পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কী যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে-সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্বলস্বভাবশত আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশত উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোনো ব্যক্তির মুখে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে 'প্রচার' আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য ভালো করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধের মর্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য-মিথ্যা বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ-সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোনো অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোনো দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্তব্যকার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্যে করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই-এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা

উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই-সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোনো মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোনো পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভালো, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোনো হিসাবেই ভালো নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিমবাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোনো সম্পর্ক নাই। বিশেষত নব্য হিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিমবাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের' কোনো যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতররূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোনো অধিকার নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে-সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপ্যুটি ম্যাজিস্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোনো গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়ত, আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।[১]

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানা দিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশীদ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জন দেন নাই— এইজন্য চারি দিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ

১. সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কী যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিমবাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে, বঙ্কিমবাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পর চন্দ্রনাথবাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিমবাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

করিয়াছে, কিন্তু কখনো তাঁহার গাম্ভীর্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোনো অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনও আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সরলভাবে যে-সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

ভারতী
পৌষ ১২৯১

[দুর্ভিক্ষ]

অধিক দূরে নয়, তোমাদের দ্বারের নিকট ক্ষুধিতেরা দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা দুই বেলা যে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুক্কুর বিড়ালদের ফেলিয়া দিতেছ, তাহার প্রতি তাহার কী কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তোমাদের নবকুমারের জন্মোপলক্ষে গৃহে কত আনন্দ পড়িয়াছে— আহারাভাবে কোলের ছেলেটির কাঁদিবার শক্তিও নাই— তোমাদের গৃহে বিবাহের বাঁশি বাজিতেছে, কেবল একমুষ্টি অন্নের অভাবে তাহাদের গৃহে বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে— স্ত্রীর মুখে অন্ন দিয়া স্বামী তাহার শেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারিতেছে না। তোমরা গৃহে বসিয়া নিশ্চিতমনে কত কথা লইয়া আলাপ করিতেছ, কত হাস্য-পরিহাস করিতেছ, সংসারের কত শত কাজে মন দিতেছ— তাহাদের আর কোনো কথা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো কাজ নাই— তাহাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দিনরাত্রির সমস্ত আশা কেবল একটি মুষ্টি অন্নের উপরে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষে এক্ষণে সমস্ত জগতে একমুষ্টি অন্নের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছু নাই— একমুষ্টি অন্ন উপাজর্নের চেয়ে আর মহত্তর উদ্দেশ্য নাই— এমন-কি, সমস্ত জগতে অন্নের অতীত আর কোনো কিছুই নাই।

ক্ষুধা যে কী ভয়ানক বিপদ, তাহা আমরা অনেকে কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য অনেক বিপদে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলে— কিন্তু ক্ষুধায় মনুষ্যত্ব দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধার সময় মনুষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আত্মরক্ষার জন্য যখন একমুষ্টি অন্নাভাবের সহিত মনুষ্যকে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন মনুষ্য একটি পিপীলিকার সমতুল্য। সে যুদ্ধেও যখন মনুষ্যের পরাজয় হয়— একমুষ্টি তণ্ডুলের অভাবেও যখন মনুষ্যজীবনের শত সহস্র মহৎ আশা উদ্দেশ্য ধরাশায়ী হয়, তখন মনুষ্যজাতির দীনতা দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বড়ো ভাই ছোটো ভাইয়ের মুখ হইতে তাহার বহু কষ্টের গ্রাস কাড়িয়া লইতে সংকুচিত হয় না— ক্ষুধায় মানুষ অত্যন্ত হীন, ক্ষুধায় কোনো মহত্ত্ব নাই। এই ক্ষুধার হাত হইতে কাতরদিগকে পরিত্রাণ করো— এই ক্ষুধায় মানুষদের— আপনার ভাইদের মরিতে দিয়ো না— সে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

তোমার যদি আপনার ভাই থাকে, তবে যাহার ভাই আজ অনাহারে মরিতেছে, তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাও— তোমার যদি আপনার মা থাকে, তবে অন্নাভাবে মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে হতাশ হইয়া যে তাকাইয়া আছে, তাহাকে কিছু সাহায্য করো— তোমার যদি নিজের সন্তান থাকে তবে কোলের উপর বসিয়া যাহার শিশু-সন্তান প্রতিমুহূর্তে শীর্ণ হইয়া মরিতেছে, তোমার উদ্ধৃত [উদ্‌বৃত্ত] অন্নের কিছু অংশ তাহাকে দাও। সত্যসত্যই তোমার কি কিছুই নাই? যে আজ কয় দিন ধরিয়া কেবল তেঁতুল বীজের শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে, তাহার চেয়েও কি

তুমি নিঃসম্বল? যে আজ তিনদিন ধরিয়া কেবল শুষ্ক ইক্ষুমূল জলে ভিজাইয়া অল্প অল্প চর্বণ করিতেছে, তাহাকেও কি তুমি সাহায্য করিতে পার না? তুমি হয়তো মনে মনে বলিতেছ— 'এত শত ধনী আছে তাহারাই যদি দুঃখীদের সাহায্য না করিল তো আমরা আর কী করবি!' এমন কথা বলিয়ো না। যে নিষ্ঠুর সে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিতেছে। যে পাষাণ কোনো বেদনাই অনুভব করে না সে নিজের জড়ত্বসুখ লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকুক, তাই বলিয়া তাহার দেখাদেখি আপনাকে পাষাণ করিয়ো না! বিলাসসুখ প্রতিদিবসের অন্নপানের ন্যায় যাহার অভ্যাস হইয়াছে যে নিজের সামান্য অনাবশ্যক সুখকে পরের অত্যাবশ্যক অভাবের চেয়ে গুরুতর জ্ঞান করে, সে দুঃখীর মুখের দিকে চায় নাই বলিয়া সকলেই যদি দুঃখীর প্রতি বিমুখ হয়, তবে তো মানবসমাজ রাক্ষসপুরী হইয়া উঠে। হৃদয়হীন বিলাসের ক্রোড়ে যে নিদ্রিত আছে, মহেশ্বরের বজ্রশব্দে যদি একদিন সে জাগিয়া উঠে তবেই তাহার চেতনা হইবে, নতুবা দুঃখী-অনাথের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

তত্ত্বকৌমুদী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

লাঠির উপর লাঠি

সম্পাদক মহাশয়

আপনি ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সম্ভাবনা নাই, ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত আমার মনে দু-একটা প্রশ্নোদয় হইয়াছে। সংশয় দূর করিয়া দিবেন।

আপনি য়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের যে তুলনা করিয়াছেন সে তুলনা ভালো খাটে না। আমাদের ব্যায়ামচর্চা কর্তব্যবোধে করিতে হইবে, য়ুরোপীয়দের ব্যায়ামচর্চায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সে অনেকটা জলবায়ুর গুণে। শীতের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় ব্যায়ামচর্চা। গ্রীষ্মের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় যথাসাধ্য বিরাম। তবে যে ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়াও ব্যায়াম ভুলেন না তাহার কারণ আজীবন ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার। আমরাও বোধ করি বিলাতে গেলে আমাদের জড়তা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা— দেখিতে হইবে আমার কী খাই ও য়ুরোপীয়রা কী খায়। য়ুরোপীয়েরা যে মদ মাংস খায় তাহার প্রবল উত্তেজনায় তাহাদের একদণ্ড স্থির থাকিতে দেয় না। আমরা ডাল ভাত খাইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকি, চোখে ঘুম আসে। তবে কি খাদ্য পরিবর্তন করিতে হইবে? সে কি সহজ কথা! আর য়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে তাই বা কে বলিবে। কেবল সে কথা নহে। এত টাকা কোথায়! পেট ভরিয়া ডাল ভাত তাই জোটে না। নুনের ট্যাক্সের দায়ে অনেক গরীব শুধু ভাত খাইয়া মরে, নুনও জোটে না। এদেশে সকলে মিলিয়া যে মাংস খাইতে আরম্ভ করিবে সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত বিরল।

ছাত্রেরা যে খেলাধুলা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে, তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। জ্যামিতি বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া তাহারা কিছু নিতান্তই আত্মহত্যা করিতে বসে নাই। আসল কথা এই যে, আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা যে কত গরীব সম্পাদক মহাশয়ের বোধ করি তাহা ধারণা নাই। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি ঠিক কল্পনা করিতে পারেন না যে তাঁহার 'বালকের' দু টাকা মূল্য দিবার সময় আমাদিগকে কত ভাবিতে হয়। আমি যে কাগজখানায় লিখিতেছি তাহাতে তাঁহারা জুতাও মোড়েন না। যে কলমটায় লিখিতেছি তাহা তাঁহাদের কান চুলকাইবারও অযোগ্য। আমাদের সবুর করিবার সময় নাই। বিদ্যাটাকে আফিসের ভাতের মতো গিলিতে হয়। পান তামাক খাইবারও সময় থাকে না। সম্পাদক বলিবেন তাহাতে

তো ভালো শেখা হয় না। কে বলে যে হয়। একজামিন পাস হয় সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন মাঝে মাঝে খেলাধুলা না থাকিলে একজামিনও পাস হয় না, তবে তাহার প্রমাণাভাব। বাঙালির ছেলের আর যাই দোষ থাক্ পাস করিতে তাহারা যে পটু এ কথা শত্রুপক্ষীয়দিগকেও স্বীকার করতে হয়।

তাড়াতাড়ি পাস না করিলে চলে কই? আমাদের টাকাও অল্প, জীবনও অল্প, অথচ দায় অল্প নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা বর্তমান। তিনি মাসে চল্লিশটি টাকা করিয়া বেতন পান। শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পেনশন লইতে হইবে। আমার দুটি ছোটো ভাই আছে। আমি বিদ্যা সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করিলে তবে তাহাদের রীতিমতো অধ্যয়নের কতকটা সুবিধা হইবে। আমি গত বৎসর এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়া একটা যৎসামান্য চাকরি জোটাইতে নিদেনপক্ষে আর পাঁচটা বৎসর মাথা খুঁড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার ভগ্নীটির বিবাহ না দিলে নয়। আমরা কায়স্থ। আমাদের ঘর হইতে মেয়ে বিদায় করিতে হইলে যথার্থই ঘরের লক্ষ্মী বিদায় করিতে হয়। সে যখন যায় ঘর হইতে সোনারুপার চিহ্ন মুছিয়া যায়। অ্যাসিড-বিশেষে বাসনের গিল্টি যেমন উঠাইয়া দেয়, আমাদের মেয়েরা তেমনি গৃহের সচ্ছলতা উদরের অন্ন উঠাইয়া লইয়া যায়। ঋণদায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় মোচন করিতে হয়। বাবার মুখে অন্ন রোচে না, রাত্রে নিদ্রা হয় না। পড়াশুনা আর চলে না, চাকরির চেষ্টা দেখিতেছি। বালকের কার্যাধ্যক্ষের কিংবা কেরানির কিংবা কোনো একটা কাজ খালি যদি হয় তবে হতভাগ্যকে একবার স্মরণ করিবেন।

ভগ্নীর বিবাহ দিতে হইলে নিজে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে হাতে কিঞ্চিৎ টাকা আসিবে। যে হতভাগ্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিব তাহার তহবিলে রসকষ কিছু বাকি থাকিবে না। তাহার পাতে পিঁপড়ার হাহাকার উঠিবে।

আমি সবে এল. এ. পাস করিয়াছি, আমার দর বেশি নয়। বিবাহ করিয়া নিতান্ত বেশি কিছু পাইব না। কিন্তু সংসারের নতুন বোঝার চাপুনি যে মাথায় পড়িবে তাহাতে মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না।

খেলাধুলা ছাড়িয়া কেন যে দিনরাত্রি ব্যাকরণ লইয়া পড়িয়াছি তাহা বোধ করি সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে কিছু বুঝিয়াছেন। কেবল পাস করিলেই চলিবে না, যাহাতে ছাত্রবৃত্তি পাই সে চেষ্টাও করিতে হইবে। আমার মতো ও আমার চেয়ে গরীব ঢের আছে। ছাত্রবৃত্তির প্রতি তাঁহারা সকলেই লুব্ধনেত্রে চাহিয়া— এমন স্থলে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে কি ইচ্ছা যায়? পেটের দায়ে বিলাতে দরজির মেয়েরা খেলা ভুলিয়া সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু ছাড়িয়া কামিজ সেলাই করিতেছে। কবি হুড তাহাদের বিলাপগান জগতে প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পেটের দায়ে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না, দিনরাত্রি ব্যাকরণের দুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছি। কই, আমাদের দুঃখের কথা তো কোনো মহাকবি উল্লেখ করেন না। উল্টিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানি না বলিয়া মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা সহিতে হয়। (বোধ করি যত সব স্কুল-পালানে ছেলেই কবি হয়। একজামিনের যন্ত্রণা তাহারা জানে না।)

আমি একজন অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ইংরাজের কাছে শুনিয়াছি যে সেখানকার দরিদ্র ছেলেরা মাথায় ভিজে তোয়ালে বাঁধিয়া ছাত্রবৃত্তির জন্য যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করে আমরা তাহার সিকিও পারি না। তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে। সেখানকার ঠাণ্ডা বাতাসের জোরে টিকিয়া থাকে, পাগল হইয়া যায় না। সেখানকার চেয়ে এখানে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা যদি বেশি দেখা যায় তবে এই বুঝিতে হইবে এখানে দরিদ্রের সংখ্যাও বেশি। এখানকার ছেলেরা যদি আমেরিকার ছেলেদের মতো লাঠি না ঘুরায় তবে তাহাতে আর কাহারো দোষ দেওয়া যায় না, সে দারিদ্র্যের দোষ। ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়ামচর্চা করিলে শরীর সুস্থ হয় এবং সুস্থ থাকিলেই

ভালো, অসুস্থ থাকিলে কষ্ট পাইতে হয়।

পড়াশুনা সম্বন্ধেও য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃদুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের আদরের ভাষা, প্রতিদিনের সুখদুঃখের ভাষা, সে ভাষা আমাদের মা-বাপের ভাষা, আমাদের ভাই-বোনের ভাষা, আমাদের খেলাধুলার ভাষা। আর বিমাতৃ-ভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, গিলিতে হয়। গলায় বাধে, নাক চোখ চলে ভাসিয়া যায়। 'হি ইজ্ আপ্'— তিনি হন উপরে, 'আই গেট্ ডাউন্'— আমি পাই নীচে— ইহা মুখস্থ করিতে করিতে কোন্ বাঙালির ছেলের না রক্ত জল হইয়া যায়! ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড়গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়। ইংরাজের কি সে অসুবিধা আছে? যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়, সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াইভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোনোমতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয়, তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মাথার উপরে দারিদ্র্যের বোঝা, সম্মুখে বিদেশীয় ভাষার দুর্গম পর্বত, তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইতে হইবে। সত্যসত্যই আমাদের লাঠি ঘুরাইবার সময় নাই।

আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল এক্জামিন পাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন; বাঙালি জাতটাই কি একেবারে এক্জামিন দিতে দিতে জগৎ সংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে? পাসকরা ছেলেদেরই শরীর তো ভাঙিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্‌ণ পাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে? মেয়েদেরও কি চোখে চশমা, পকেটে কুইনাইন, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় ছয় মাস ধরিয়া উন্মাদ উত্তেজনা, এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা— ইহা কি আমাদের দেশের সকমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে? পরীক্ষাশালায় প্রবেশ করিবার সময় বড়ো বড়ো জোয়ান বালকের যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহাতেই তাহাদের দশ বৎসর পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায়, তবে মেয়েদের দশা কী হইবে? মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি— কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সযত্নে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষকর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরবলাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করানো ভালো বোধ হয় না। পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লোভে একপ্রকার জুয়া খেলা। ইহা হৃদয়ের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ। প্রকাশ্য গৌরবলাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য সৌকুমার্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষার অপকার সম্পূর্ণ পাওয়া যায় অথচ জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলাদেশটা একটা প্রকাণ্ড ইউনিভার্‌সিটি চাপা পড়িয়া মরিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এসো-না কেন, আমরা এম. এ., বি. এ. ডিগ্রিগুলি গলায় বাঁধিয়া মেয়েপুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি? সে বড়ো গৌরবের কথা হইবে। আমেরিকা ও য়ুরোপ হাততালি দিতে থাকিবে।

এক কথা বলিতে গিয়া আর-এক কথা উঠিল। একেবারে যে যোগ নাই তাহা নহে। স্বাস্থ্যের কথা উঠিল বলিয়া এত কথা বলিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। লিখিতে বিস্তর সময় গেল, এতক্ষণ লাঠি ঘুরাইলেও হইত। যাহা হউক, এক্ষণে একজামিনের পড়া মুখস্থ করিতে চলিলাম।

বশংবদ শ্রীঃ-

বালক
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

সত্য

সরলরেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি— আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোনো দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবি করিতে আসিয়াছি, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড়ো হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এজন্য সত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামতো আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম তো সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে— সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এইজন্যই সত্যের এত বল। সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমতো বাঁকানো যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কী করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি এইজন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে-সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ-প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়; আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবীসুদ্ধকে দরিদ্র দেখি; অন্নপূর্ণাকে অন্নহীন বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল, আমরা প্রতিদিন

প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভালো শুনায় কাজের বেলায় তত ভালো বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না, মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না— চন্দ্র সূর্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূলে ভুল, মূলে অবিশ্বাস জন্মায়— মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ। এইজন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডালপালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোনো কাজের নহে, গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোনোপ্রকার ফন্দি করিয়া সিধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে দাঁড়াইব, সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা-ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের উপরে চতুর্দিক হইতে ধুলাবৃষ্টি হইতেছে— আমরা সত্যকে দেখিব কী করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মতো সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্বক আমাদিগকে চিন্তা করিয়া নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই— বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্তব্যের মতো করিয়া শিক্ষা দিতেছে। আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক— স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়— তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়চারণ করো পাপাচরণ করো তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়ো না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্যাদা নষ্ট হইবে— অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই-সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎ লোকেরা আসিয়া মানমর্যাদা, কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তিলাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান-সকল বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলিস্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানারূপে বিচলিত হইলেও চুম্বকশলাকা সরলভাবে উত্তরে দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকার্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি। ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রচারের চারি দিকের জটিলতা-সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া দুর্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোনো জাতি করে কি না জানি

না। আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যাকথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না— তাহাদের একটি ইংরাজি শব্দের নানান ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করি না। এমন-কি, আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বলি ও স্পষ্টত তাহাদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই তো এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুষি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে— স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতো মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্ধমাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যাকথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোনো দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্যকথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশিক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোনো হিসাব নাই ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কি না দেখিতে চাই। আমরা বাঙালিরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এতদিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে, প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না— আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মতো সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব— আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট ডাফ্‌রিনের প্রসাদে ভলান্টিয়ার হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্যকথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিসুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি যেমন-তেমন করিয়াই হৌক বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখো তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কী, সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে। আমরা বাঙালিরা আমাদের জীবনের যতটা সত্য করিয়া অনুভব করি আর-কোনো সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করি না— এইজন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু কোনো সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবলমাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। আর মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে, 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।' অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্তব্য সত্য নহে।

অতএব, প্রাণবিসর্জন শিক্ষা করিতে চাও তো সত্যাচরণ অভ্যাস করো। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভালো লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভালো নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভালো লাগিতেছে বলিয়াই যে

অমুক জিনিস বাস্তবিক ভালো তাহা কে বলিল? পাঁচজনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভালো, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভালো তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের সুখ চাহিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনো এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙালি তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে! চতুর্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসংগীত! নিদ্রিত বাঙালি তবে কি সত্যসত্যই সত্যের মর্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্বলচিত্তে রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করতে পারিব না, বিঘ্নবিপদ দেখিলে মূর্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব। যে বাঙালি স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অখাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোনো দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষণীয়, যে বাঙালি এই উপদেশ অসংকোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙালি কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে বাঙালি কখনো ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না। তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক এ-সকল কার্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যাকথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে— তদূর্ধ্বে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙালিদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামির উপরে! প্রবাদ আছে, 'হুজুগে বাঙালি'। বাঙালি মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দি করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এইজন্য বাঙালি কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যাকথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙালির জীবনটা কেবল গোঁজামিলন। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙালি ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙালি প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে।

কেবলই কি বাঙালিকে মিষ্ট মিথ্যাকথা-সকল বলিতে হইবে? কেবলই বলতে হইবে, আমরা অতি মহৎ জাতি, আমরা আর্যশ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন। আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে। বলিতে হইবে ইংরেজসমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে তদূর্ধ্বে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর এক-তিল পরিবর্তন চলিতে পারে না। এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহংকার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি 'পপুলার' হইতেই হইবে? আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটাই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক, তাহা ক্রমাগতই চতুর্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখস্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে। এখন মিথ্যাকথা সব দূর করো, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্যশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভালো করিয়া দেখো। আমাদের মজ্জার মধ্যে কী হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন্ মর্মস্থলে ঘুণ ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের

এমন দুর্দশা হইল, তাহা ভালো করিয়া দেখো। ইংরেজসমাজের মধ্যে এমন কী গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন-সকল বীরপুরুষ, স্বদেশপ্রেমী মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন-তৎপর নরনারী ইংরেজসমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কী গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন-সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যাঅহংকার-পরায়ণ সন্তান-সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে, সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখো। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভালো এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যাপ্রচার ছাড়া আর কোনো ফললাভ হইবে না।

সত্যকথা বলা ভালো আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, দুর্বলতাবশত পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি, ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তাবশত আমরা সত্যকে কেবলমাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না, তখন তাহার অর্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশত তাহা আর শুনিতে পাই না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন— বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে, কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভালোবাসি সে কি আমাদের কাছে কখনো পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারি দিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু। আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে মানবসভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানবহৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কী অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ করিত যে, তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে।

প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।' অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল, আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়তো তাহাতে এই প্রার্থনাস্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো' প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'দয়াময় তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো,' এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগানো হইয়াছে— কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরলহৃদয় ঋষি কি মিথ্যা

বলিয়াছেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে, যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কী। যে 'প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের ভয় কী! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণমুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে 'দয়াময়' বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্রভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গলরাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গলস্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে, আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্তন করিলাম, তাহার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মতো সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না। সত্যের প্রতি ভালোবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালোবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি-সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানুরাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে; এইজন্যই সত্যানুরাগকে এই-সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্যকথা বলো, সত্যাচরণ করো, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফ্যাশনের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষীরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাস্টিক করো, কেহ বলেন সভা করো, আন্দোলন করো, ভারতসংগীত গান করো, কেহ বলেন মিথ্যা বলো, মিথ্যা প্রচার করো, কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো, ও সত্যানুষ্ঠান করো। উপরি-উক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশি, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্যফল পাওয়া যায়; মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সংকুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড়ো হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না,

আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এইজন্য ফললাভ হইতেছে না। যেমন, যে রাগিণীতে যে গান গাও-না-কেন, একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি-না-কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এ কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই, ইহাকে তাঁহারা অলংকারের হিসাবে দেখেন, নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এদিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন-সকল সহসা একরাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচজন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কী করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। চিরনবীন চিরবলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অবহেলা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যাই নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র-সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি, অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানতা আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এইসকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ -বশত যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি. মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয়

হইয়া উঠে, পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাসের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধনজর্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসনপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন মিথ্যার সাহায্য না হইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্বলেরা সত্যপালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্যজাতি বলিষ্ঠ অসভ্যজাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্যশ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল— সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শতসহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে, হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম। আজ আর উত্থানশক্তি নাই— আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, 'দেও বাবা ভিখ্ দেও!'

বালক

চৈত্র ১২৯২

আপনি বড়ো

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড়ো হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্যবশত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহংকারের ধর্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটকে রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহংকারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মধ্যে রোধ করিয়া থাকিলে মহৎ ধৈর্যজনিত একপ্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহংকারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে শোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া [যায়] না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে একপ্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহংকার যাহাদের হৃদয়-বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে একপ্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখা সকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য তাহাদের সৌন্দর্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুণ্ডলিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাহারা বার্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনোকালে বার্ধক্যের পরিণত গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছিল, কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহংকার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাঙিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহংকার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। তাহারা কিছুতেই আপনার কাছে এবং পরের কাছে প্রমাণ করিতে পারে না যে তাহারা বড়ো, এইজন্য মনের খেদে মনে মনে আপনার বড়োত্বের প্রতি ক্রমশ অধিকতর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনাকে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কণ্টকশয্যায় যেমন বিরাম নাই, তেমনি সে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা নাই। তাহারা যত আপনাকে বড়ো মনে করে ততই আরও অধিকতর দগ্ধ হইতে থাকে।

আমি যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের বুদ্ধি আছে অথচ এমন ক্ষমতা নাই যে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। এই বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিতে পারে না। কেবল সচেতন বেদনা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে, আমরা আপনাকে এত বড়ো মনে করিতেছি তবুও কিছুতেই বড়ো হইয়া উঠিতেছি না। এই অলস অহংকার দাম্ভের নরকযন্ত্রণা বর্ণনায় স্থান পাইবার যোগ্য। বিপুল অভিমানে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছি অথচ এক-তিল প্রসর বাড়িতেছে না, সে কোন্ মহাপাতকের ভোগ!

এইরূপ বুদ্ধিমান গুপ্ত অহংকারী সর্বদাই বৃহৎ সংকল্প সৃষ্টি করিতে থাকে। সকল দিকেই হাত বাড়াইতে থাকে অথচ নাগাল পায় না। পাশের লোক তাহাকে যে, কোনো বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। এইজন্য কাহাকে কোনো লক্ষ্যমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে সেও এক-এক সময়ে তাড়াতাড়ি ছুটিতে আরম্ভ করে, পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসে ও মনে মনে কহে যদি শেষ পর্যন্ত যাইতাম তো আমিই জিতিতাম। সে চুপি চুপি এইরূপ প্রচার করে আমি যে কোনো কিছুতেই বাস্তবিক কৃতকার্য হইতে পারি নাই, সে কেবল ঘটনাবশত। কারণ যাহারা নিজ নিজ সংকল্পে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সে আপনাকে মনে মনে এত বড়ো বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে নিজের অক্ষমতা সে কল্পনা করিতে পারে না, ক্ষমতা আছে অথচ ক্রমিক প্রতিকূল ঘটনাবশত বড়ো হইতে পারিতেছি না, এই দুঃখে সে সর্বদাই এক প্রকার তীরস্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন-কি, তাহার ঈশ্বর ভক্তি চলিয়া যায়। তাহার সমস্ত ভক্তি সে নিজের পদতলে আনিয়া গোপনে আপনার পূজা করিতে থাকে— বলিতে থাকে 'আমি মহৎ— সমস্ত জগৎ আমার প্রতিকূল, ঈশ্বর আমার প্রতিবাদী। কিন্তু যে যাহা বলে বলুক, আমি আমাকেই আমার শিরোধার্য করিয়া সংসারের পথে সবলে পদক্ষেপ করিব।' এই বলিয়া সে কখনো কখনো সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া হঠাৎ এক রোখে ছুটিতে থাকে, সগর্বে চারি দিকে চাহিতে থাকে— বলে 'কী আমার দৃঢ়চিত্ততা! স্বকপোলকল্পিত কর্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি কী প্রবল উপেক্ষা!' বুঝিতে পারে না যে তাহা সহসা প্রতিহত সংকীর্ণ আত্মাভিমানের সফেন উচ্ছ্বাস মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি ইহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছেন কবে ইহারা আপন বুদ্ধিকে স্থায়ী কার্যে নিযুক্ত করিবে। বন্ধুদিগের উত্তেজনায় এবং আত্মাভিমানের তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশ্রাম চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে থাকে, মনে করে হাতের কাছে আমার অনুরূপ কার্য কিছুই নাই। কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয় পাছে ক্ষমতায় কুলাইয়া না উঠে এবং আত্মীয়সাধারণের চিরবর্ধিত প্রত্যাশার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণপূর্বক মহৎ কার্যের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করা এরূপ লোকের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রবল তর্ক এবং সমালোচনার আগ্নেয় বেগে ইহারা আপনাকে সকলের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিতে চায়। অভিমান-শাণিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমস্ত

সৃষ্টিকার্যকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে! অন্য সকলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারে বিপর্যস্ত করিয়া মনে করে, 'গঠন কার্যে নিশ্চয়ই আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে নহিলে এমন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বুঝিতে পারি কী করিয়া!' কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহারা কেন যে কোনো সৃজনকার্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশীবর্গ নিরতিশয় আশ্চর্য হইতে থাকে।

ইহারা নিতান্ত পার্শ্ববর্তী লোকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। কারণ পাশের লোক হইতে নিজের ব্যবধান অধিক নহে। পাশের লোক যদি বড়ো তবে আমিই বা বড়ো নহি কেন এই কথা মনে আসিয়া আঘাত দেয়। আমার বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অল্প নহে। বিচার করিতে তর্ক করিতে সূক্ষ্ম যুক্তি বাহির করিতে আমার মতো কয়জন আছে? তবে আমিই বা ইহার অপেক্ষা খাটো কিসে! এ ব্যক্তি কেবল আপন সামান্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং পাঁচজন মূর্খ লোকে ইহাকে বলপূর্বক বাড়াইয়া তুলিয়াছে— দৈবক্রমে আমার বিপুল শক্তি মহৎ মস্তিষ্কভারে চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আমাকে আমি এবং দুই-একটি বন্ধু ছাড়া আর কেহ চিনিল না! আমি বর্তমান থাকিতে আমার পার্শ্বে যে লোকের দৃষ্টি পড়ে ইহা অপেক্ষা মূঢ়-সাধারণের অবিবেচনার প্রমাণ আর কী আছে! এরূপ স্থলে নিকটস্থ লোককে খাটো করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা দূরস্থ লোকের অতিশয় প্রশংসা করে, হঠাৎ এত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে যে তাহার আর আদি অন্ত পাওয়া যায় না!

অধিকাংশ স্থলে ইহাদের কতকগুলি করিয়া নিজের জীব থাকে। তাহাদিগকে ইহারা সমাধা করিয়া তুলিতে চাহে। এই-সকল স্বহস্তগঠিত পুত্তল মূর্তিকে যখন তাহারা সর্বসাধারণের সমক্ষে পূজা করিতে থাকে, তখন তাহাতে করিয়া তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। কারণ এই পুত্তলপ্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহারা আপনাদের আত্মকর্তৃত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিতে থাকে।

ইহাদের একপ্রকার শুষ্ক বিনয় আছে তাহার মধ্যে বিনয়ের মাধুর্য কিছুই নাই। সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে। মনে হয় যেন অহংকার তাহার সমস্ত মাংসপেশী কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত করিয়া সবলে স্থির হইয়া আছে। বিনয়বচনের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিহাসের স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভিমান যেন গভীর বিদ্রূপভরে বিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। অথবা সে যেন সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছে, 'আমি নিজের মহোচ্চ স্কন্ধের উপর চড়িয়া এতই উন্নত উঠিয়াছি যে বিনয় প্রকাশ করিলেও আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আপনাকে বিস্তর বড়ো বলিয়া জানি এইজন্য বিস্তর অহংকারভরে বিস্তর বিনয় করিয়া থাকি।'

ইহারা যতই আত্মসংযম অভ্যাস করুক না, থাকিয়া থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ইহাদের কঠোর কটাক্ষ, নিষ্ঠুর বাক্য, ক্রূর পরিহাস বাহির হইয়া পড়ে। সংবরণ করিতে পারে না। তীব্র জ্বালাস্রোত মরুহৃদয়ের ভূগর্ভে অন্তঃসলিলা বহিতে থাকে, সময়ে সময়ে সামান্য কারণে ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনেত্র, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, বিদীর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বাহিরে উৎসারিত হইয়া উঠে। এক-এক সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক-একটি ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ সহাস্য বাক্যে তাহাদের গোপন মর্মগহ্বরের বিস্তীর্ণ অগ্নিকুণ্ড চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এরূপ আকস্মিক নিষ্ঠুরতার কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু সে কারণ অল্পে অল্পে বহুদিন ধরিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল। অবরুদ্ধ অহংকারে অজ্ঞানে অলক্ষিতভাবে যখন-তখন আঘাত সহিতেছিল, অবশেষে সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একদিন সামান্য আঘাতে দ্বিধা হইয়া যায় এবং অভিমানের বিষদন্ত সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আসিয়া বিদ্ধ করে।

এই হৃদয়বিবরবাসী অহংকারের উষ্ণ নিশ্বাস-বাষ্পে প্রশান্ত স্নেহ, নিরভিমান, প্রেম ও উদার করুণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমশ কলুষিত হইয়া উঠে। আত্মবিস্মৃত সরল সহৃদয়তার সুখ

আর ভোগ করিতে পারি না, সর্বদাই রুদ্ধ দ্বার, রুদ্ধ হৃদয়, তামসী মুখশ্রী, সংকীর্ণ জীবনের গতি। গৃহকোণ অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক উদারতার অভাব নাই, অথচ যথার্থ হৃদয়ের সহিত কাহাকেও হৃদয়ের কাছাকাছি অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারি না। এই বিচিত্র জনপূর্ণ সহস্র সুখদুঃখময় পৃথিবীতে সকলকে দূরে রাখিয়া, স্বজনদিগকে আঘাত দিয়া, আত্মম্ভরিতার অন্ধকূপের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া আমাদের মর্ত্যজীবন অন্ধকারে নিষ্ফল অতিবাহিত করিয়া দিই, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই জীবন্মৃত্যু হইতে শুভক্ষণে মুক্ত করিয়া দেয়!

কল্পনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা

সেদিন মোহিনী এক Theory বাহির করিয়াছিলেন যে, যে জাতি সমতলভূমিতে থাকে তাহারা অপেক্ষাকৃত ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হয়। কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক বোধ হয় না। যাহারা সমতলক্ষেত্রে থাকে, কষ্টস্বীকার করিয়া অতিক্রম করিবার অভ্যাস তাহাদের চলিয়া যায়, স্বভাবতই অলস হইয়া যায়। এইজন্য কোনোপ্রকার মানসিক [চিন্তা] তাহাদের পক্ষে দুঃসহ, ঘর-পড়া ন্যায়শাস্ত্রের জাদুপ্রভাবে সমস্তই তাহারা পরিষ্কার সমভূমি করিয়া দিতে চায়, সমস্তই একটা System একটা তন্ত্রের মধ্যে আনিতে চায়। তাহারা স্বাধীন মানবমন হইতে প্রসূত সাহিত্য [রচনার] একটা কল বানাইয়া দিয়াছে— এমন একটা স্বভাববিরুদ্ধ অলংকারশাস্ত্র গড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে আপন হইতে লিখিবার ল্যাঠা যথাসম্ভব ঘুচিয়া যায়। সংগীতকে তাহারা এমন রাগরাগিণীজালের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে [যাহাতে] গীতরচনা করিতে যান্ত্রিক শিক্ষা ছাড়া স্বাভাবিক ক্ষমতার বড়ো একটা আবশ্যক বোধ হয় না। সকল দুরূহ [প্রশ্নেরই] চটপট্ একটা মীমাংসা বাহির করিয়া ফেলে। কিছুতেই যখন পাওয়া যায় না তখন একটা গল্প তৈরি করে। পঞ্চপাণ্ডব যে এক স্ত্রী বিবাহ করিল সেটা যেম্‌নি বুঝিতে একটু গোল বাধে অম্‌নি তাহার গল্প বাহির হয়। [ইহ]জন্মে যাহার নিকাশ পাওয়া যায় না পূর্বজন্ম হইতে তাহার কৈফিয়ত তলব হয়। কিছুই অমীমাংসিত থাকে না। যাহারা সকল বিষয়েরই চরম মীমাংসার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, তাহারা কোনো বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসায় [পৌঁছিতে পারে] না, অথবা যদিবা পৌঁছায় তো দৈবাৎ পৌঁছায়— কারণ তাহারা হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকে [সত্য] মানিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চাহে। Facts কাহারো মন জোগাইয়া চলে না, এইজন্য Facts-কে তাহারা [ভয় পায়]— এইজন্য চোখ বুজিয়া বহিঃপ্রকৃতির মুখ-চাপা দিয়া নিজের মন হইতে মনের মতো তন্ত্র বাহির করিতে [চায়, এই] জন্য সমস্তটাকে অত্যন্ত Elaborate করিতে হয়— আরম্ভের কথাগুলো অসত্য হৌক কিন্তু সেগুলিকে মানিয়া [লইলে] তাহার পরে তাহাদের মধ্যে একটা সুবিস্তৃত জটিল সামঞ্জস্য স্থাপন করা আবশ্যক হয়, নহিলে লোকে সেগুলিকে গ্রাহ্য করিবে না। এইজন্য প্রাণপণে Consistent হইতে হয়, যাহাতে গঠননৈপুণ্য দেখিয়াই লোকের [বিশ্বাস] জন্মে। পৃথিবীকে দেখা হয় নাই অথচ পৃথিবীর বিষয় লিখিতে হইবে এইজন্য পৃথিবীকে অবিকল একটি [বিকশিত] শতদলের ন্যায় কল্পনা করা হইল তাহার প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নামকরণ হইল, সুমেরু-নামক কাল্পনিক পর্বতকে [তার] মধ্যস্থিত সুবর্ণ বীজকোষের মতো স্থাপন করা হইল, সমস্ত কল্পনার মধ্যে এমনি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষমা প্রকাশ পাইল যে অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহাকে অবিশ্বাস করা দুরূহ— এবং লোকেরাও বিশ্বাস করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল— অবিশ্বাসের পক্ষে যে অশান্তি ও পরিশ্রম আছে সেটুকু অলস লোকে বহন করিতে চায় না। সত্যের মধ্যে যে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে এ কথা সত্য— কিন্তু প্রথমত আংশিক সত্যগুলিকে খণ্ড খণ্ড বিশৃঙ্খলভাবে দেখিয়া ক্রমে যথানিয়মে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ

সুন্দর সত্যের প্রতি ধাবমান হওয়া যায়। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে আপনার মনের সংকীর্ণ কল্পনার ক্ষুদ্র পারিপাট্যটুকু লাভ করা যায় কিন্তু উদার প্রকৃতির বৃহৎ সামঞ্জস্য [দেখা] যায় না। টলেমির কাল্পনিক জ্যোতিষ্কমণ্ডল যতই সুবিহিত সুষম হউক-না- কেন সুষমা-সৌন্দর্যে প্রাকৃতিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাল্পনিক পারিপাট্যের চর্চা করিতে গেলে ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কারণ বহির্জগৎ হইতে তাহার বাধা নাই এবং তাহার টীকাভাষ্যও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রে [মাকড়সাজালে] প্রকৃতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়— তখনই এই কাল্পনিক জগৎই একপ্রকার সত্য হইয়া দাঁড়ায়।

আমার বিশ্বাস অন্য কোনো দেশের ধর্মশাস্ত্র লোকের আহার বিহার শয়ন নিদ্রা প্রভৃতি দিনের প্রত্যেক [মুহূর্তের] কার্য নিয়মে বাঁধিয়া দেয় নাই। আমাদের দেশেই এইরূপ অনুশাসন স্বাভাবিক এবং হয়তো আবশ্যক। আমাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইলে আমরা বাঁচিয়া যাই— নির্ভাবনা বাঁধা রাস্তায় চলিতে পারি। এমন-কি আমরা নিজের [স্বাতন্ত্র্য] রক্ষা করিতে পারি না— এমন স্থলে আমাদের হস্তে যে-কোনো বিষয়ে স্বাধীনতা দিবে তাহাই ক্রমে ক্রমে [নিতান্তই] শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। এইজন্য আমাদের দেশে বাঁধা নিয়মের প্রাদুর্ভাব এবং নিয়মের দাসত্বকে সাধারণে দুঃখ জ্ঞান করে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঁধা নিয়ম করিতে গেলেই সকল অবস্থা ও সকল [সময়ের] প্রতি দৃষ্টি রাখা অসম্ভব— সকল অবস্থায় সকল সময়েই সকলকেই সকল বিষয়েই একটা মোটামুটি নিয়মের মধ্যে আপনাকে যো-সো করিয়া স্থাপিত করিতে হয়। এইরূপে আমরা হাড়গোড় ভাঙিয়া সকলেই সমান নির্বীর্য নির্জীব... শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছি। আর যাহা হৌক বা না হৌক কোনো উপদ্রব নাই। ভাবনা-চিন্তা তর্ক [বিতর্কের বদলে] শাস্ত্র আছে এবং পঞ্জিকা আছে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া... মিলিয়া দুই হাতে শাস্ত্রখণ্ড অবলম্বন করিয়া ভবস্রোতে নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইতেছি, সন্তরণ শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, ব্যক্তিগত বল সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে, তাহা অন্যায়; একজন নিজের বলে আর-একজনের চেয়ে বেশি মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শান্তিপূর্ণ নিয়মবদ্ধ সমাজের মধ্যে আগাগোড়া একটা গোল উপস্থিত হয়। এইজন্য যখন রাম-রাজত্ব শূদ্রক তপশ্চরণাদি দ্বারা আপনাকে... পদবীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন দয়াময় রামচন্দ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। সীতার বনবাস আমাদের এই অতি-নিয়মবদ্ধ সমাজতন্ত্রের একটি দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিগত ন্যায়পরতাও এই সমাজশাসনে পিষ্ট হইয়া যায়— অর্থাৎ ব্যক্তি একেবারেই কেহ নহে... পূর্বেই বলিয়াছি ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই স্থির হইয়াছে যে, সামান্য এমন কোনো বিষয় নাই যাহাতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি। খাওয়া শোওয়া সে বিষয়েও হে শাস্ত্র তুমি বলিয়া দাও আমাদিগকে কী করিতে হইবে। কোথাও কিছু যদি ছিদ্র থাকে আমাদের আলস্যবশত ক্রমেই সেটা বাড়িয়া উঠিবে। সীতার প্রতি প্রমাণহীন সন্দেহ সেটা একটা ছিদ্র কিন্তু সেটা যদি রাখিতে দাও তবে আমাদের (জাতীয়) স্বভাবগুণে ক্রমে সেটা মস্ত হইয়া উঠিবে।

[আজি]কার দিনে যে সমস্যা উঠিয়াছে তাহা এই যে এমন লোকদিগকে কী নিয়মে চালনা করা উচিত? ইহারা [বহুদিন] হইতে স্বাধীনতা পায় নাই এবং না পাইবার কারণও ছিল। ইহারা পরজাতীয়ের নিকট হইতে যে স্বাধীনতা প্রত্যাশা করিতেছে তাহা কি সংগত? স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর সাধনা সকল জাতিরই [করিতে হয়] ... কিন্তু যদি অতি বিশেষ সাধনা কাহারো আবশ্যক থাকে তবে তাহা ভারতবর্ষীয়ের। কিন্তু ইহারা [যদি] কেবলমাত্র আবদার করিয়াই পায় তবে কি তাহা তাহাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে তাহাদের হাড়ে হাড়ে [প্রবেশ] করিতে পাইবে? তাহা কি তাহারা যথার্থ পাইবে, না বাহিরে দেখিতে হইবে যেন পাইল?

দ্বিতীয় কথা। আমরা যে যথার্থই স্বাধীনতা চাহি তাহা জানিবার উপায় কী? যাহা আমাদের

কখনো [আছে] কখনো নাই তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে পারি না। কারণ আমরা জানি না [সেটা] কী? আমরা শুনিয়াছি তাহা ভালো জিনিস, বিশ্বাস হইয়াছে তাহা পাইলে ভালো হয়... কিন্তু তাহা আমাদের আবশ্যক ও উপযোগী কি না তাহা বলা শক্ত। ঘোড়া মূল্যবান পদার্থ এবং ঘোড়া চড়িলে আনন্দ [হয়] একজন ছেলে এ কথা শুনিয়া বাপের কাছে আবদার করিতে পারে যে 'হে বাবা আমাকে একটা ঘোড়া দাও।' বাবা বলিল, 'কেন রে। তোর আবার এ বাতিক গেল কেন!' সে বলিল, 'কেন বাবা, [তুমি] তো বলো ঘোড়া খুব ভালো, ঘোড়ায় চড়তে ভালো লাগে।' তখন বাবা মনে করে, এ ছেলেটা ঘোড়ার ব্যবহার জানে না তাই ঘোড়ায় চড়তে এত ব্যস্ত। কিন্তু যদি ঘোড়ার পিঠে একে চড়িয়ে দিই তা হলে ওঠবার জন্যে যত [আগ্রহ] প্রকাশ করেছিল নাব্বার জন্যে ততোধিক আগ্রহ প্রকাশ করবে।...স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের [এইরূপ] ঘটিতে পারে। স্বাধীনতা কী তাহার স্বাদ জানিয়া এবং তাহা Realize করিয়া যদি স্বাধীনতা চাহিতাম [তাহা হইলে] লোকে নিদেন এইটে বুঝিত যে ঠিক জিনিসটা চাহিতেছে বটে। কিন্তু কানে-শোনা স্বাধীনতাব নামে [আমরা] যে কী চাহিতেছি তাহা আমরা নিজেই জানি না। যথার্থ স্বাধীনতা পাইলে হয়তো আমরা চীৎকার [করিয়া] বলিয়া উঠি 'দোহাই, তোমার কুস্তা বুলাইয়া লও।' কিছু আশ্চর্য নাই। স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় স্বভাব। আমরা চিরদিন শাস্ত্রের অধীন, রাজার অধীন, গুরুর অধীন, গুরুজনের অধীন— সেটা তো একটা দৈব ঘটনামাত্র [নয় তাহার] মূল কারণ আমাদের মর্মের মধ্যে নিহিত।

আমাদের দেশের এত অল্প পরিমাণ লোক শিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত— যে আমরা সমস্ত জাতির দায় স্কন্ধে লইতে পারি না। আমরা ক'জনে মিলিয়া যাহা চাহিতেছি তাহা সমস্ত জাতির পক্ষে বাস্তবিক ভালো কি মন্দ (তাহা) আমরা কি জানি? অশিক্ষিত লোকদের ভালোমন্দ সুবিচার করিবার ক্ষমতা আমরা অনেকটা হারাইয়া [ফেলিয়াছি]। শিক্ষিত লোকে নিজের অবস্থা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে যে বাল্যবিবাহ মন্দ, কিন্তু যখনি... [হইতে] মনে করে বর্তমান অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা মন্দ তখনি ভ্রমে পতিত হয়। এবং [অশিক্ষিত] লোকদের মৌন অবসরের মধ্যে সে যদি বকিয়া বকিয়া বাল্যবিবাহের বিপক্ষে একটা সাধারণ আইন জারী [করিয়া] লয় তবে সে কি গুরুতর অন্যায় করে? আমাদের গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া আমরা সমস্ত জাতির নামে [যখন] আবদার করিতে থাকি তখন বোধ করি মুহূর্তের জন্য আমাদিগকে সচেতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। [এখন] আবশ্যক শিক্ষা বিস্তার করা— অনেক অবস্থার অনেক লোক অনেকদিন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে বিষয়ে [নিজের]... মত প্রকাশ করে তাহাকে দেশের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা প্রথম প্রথম [আমা]দের জাতীয়স্বভাবের এক প্রকার বাহ্যিক বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ মনে হয় ইহারা [বুঝি] সত্যই ভারতবর্ষীয় বিশেষ ভাব পরিহার করিয়াছে এবং ইংরাজি institution সকলের উপযোগী হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত হইলে তবে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত [হইতে পারা] যাইবে। কেবল কতকগুলি লোকের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইয়া কীরূপে যে দেশের... অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা আমি জানি না।

[অনেকে বলিতে] পারেন যে ইংলন্ডেই কি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিক্ষিত? কিন্তু তবে [সেখানে কী করে] লোকেরা অশিক্ষিত লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারেন? কিন্তু আমার বিবেচনায় ইংলন্ডের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের অনেক প্রভেদ আছে। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির মূল কারণ তাহাদের সমাজ তাহাদের অবস্থার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং তাহাদের শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে জাতিগত ভেদ নাই, শিক্ষার ন্যূনাধিক্যের ভেদমাত্র। জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে— তবে কাহারো মনে স্পষ্ট কাহারো মনে অস্পষ্ট। আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে সম্পূর্ণ আলো-অন্ধকারের ভেদ। একের কথা আরেকের পক্ষে বিদেশীয়। উভয়ের মধ্যে

মানসিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একজন ইংরাজের সহিত বাঙালি অশিক্ষিতের যে প্রভেদ, ইংরাজিওয়ালা বাঙালির সহিত সাধারণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম প্রভেদমাত্র। আমাদের শিক্ষিত লোকদের আর-একটা গোল এই যে আমাদের এই নূতন শিক্ষা আমাদের মধ্যে কতটা খাপ খাইয়া বসিয়াছে তাহা আমরা অর্থাৎ কতক পরিমাণে আমরা নিজেকে নিজে জানি না। অর্থাৎ যে কথা [বলিতেছি] যে কাজ করিতেছি তাহা ঠিক বলিতেছি ঠিক করিতেছি কি না নিজেরই সন্দেহ বোধ হয়। তাহার [ফলে] আমাদের অশিক্ষিত সাধারণকে জানিবার উপায় হইতেও অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা কী এবং উহারা কে ঠিক জানি না। অনেক সময়ে চোখ বুজিয়া মনে করি যে যাহা মনে করিতেছি তাহাই ঠিক।... তবে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। স্বাধীনতা এতই আমাদের পক্ষে বিদেশীয় যে তাহা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে বাহিরের সাহায্য অনেক পরিমাণে আবশ্যক। প্রথমে কতকটা ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও... কতক পরিমাণে স্বাধীনতার স্বাদ আবশ্যক। অতএব এ অবস্থায় আমাদের ইচ্ছা ও... অভাব থাকিলেও আমরা অল্পে অল্পে স্বাধীনতা শিক্ষালাভের জন্য অন্য স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির নিকটে আবেদন করিতে পারি। তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। তাহার পরে আমাদের চেষ্টা স্বভাব ও অবস্থার উপর সমস্ত নির্ভর করিবে। কিন্তু যেমন করিয়াই দেখি ইহা একটা পরীক্ষা মাত্র। সকল জাতিই যে স্বাধীনতার সমান অধিকারী তাহা নহে। হয়তো এমন দেখা যাইতে পারে আমরা স্বাধীনতার যোগ্যই নহি। হয়তো আমরা অনেকগুলি স্বাভাবিক কারণে [অধীন] অবস্থার উপযোগী হইয়া আছি। সে কারণগুলি কী এবং সে কারণগুলি দূর হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। জলবায়ু ভৌগোলিক অবস্থা সমাজনীতি ধর্মনীতির মধ্যে ইহার মূল... কেবল দুই-একটা আকস্মিক অবস্থার উপর ইহার নির্ভর তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা [কামনা] করিতেছি তাহার একটা সীমা ও লক্ষ্য নিরূপিত হইতে পারে— নতুবা আমরা ইতিহাসে যাহাই পড়ি তাহাই হাত বাড়াইয়া চাহিয়া বসিব ইহা আমার ঠিক বোধ হয় না।

১৭/১১/[১৮৮৮]
শনিবার
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব

ক

আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের ভালোবাসার মধ্যে মাত্রাভেদ নহে জাতিভেদ বর্তমান। পুরুষের ভালোবাসা সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত, আর স্ত্রীলোকের ভালোবাসা নির্ভরপরতা সুতরাং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন। পুরুষের যথার্থ ভালোবাসা Ideal-এর প্রতি এবং স্ত্রীলোকের যথার্থ ভালোবাসা Real-এর প্রতি। এ স্থলে Ideal এবং Real আমি হয়তো একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ Ideality-র সহিতই বিশেষরূপে সম্বন্ধ এবং ক্ষমতার প্রতি অনুরাগ Reality-র মধ্যে নিবিষ্ট। ক্ষমতার প্রতি অবলম্বন করা যায়, তাহার মধ্যে আপন দুর্বলতা বিসর্জন দিয়া বিশ্রাম লাভ করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যকে ধরা যায় না, তাহার প্রতি ভর দেওয়া যায় না, আমাদের পক্ষে তাহার যে কী উপযোগিতা তাহা সম্পূর্ণ জানি না, এই পর্যন্ত জানি যে, তাহার প্রতি আমাদের আত্মার একটি অনিবার্য আকর্ষণ আছে। স্পর্শনযোগ্য নির্ভরযোগ্য Reality-র পক্ষে সৌন্দর্য অতি অক্ষম,

তাহাকে সযত্নে সকাতরে রক্ষা করিতে হয়; তাহা আঘাতে ক্লিষ্ট হয়, উত্তাপে ম্লান হইয়া যায় কিন্তু Ideality-র পক্ষে তাহার অসীম প্রভাব, সমস্ত বলবুদ্ধি অবহেলে তাহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। পুরুষ যখন রমণীকে ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিরাম পায় না; যদিও তাহার ভালোবাসার মধ্যে একটি অনির্বচনীয় সুখ থাকে তথাপি কী একটা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সুগভীর বিষাদ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কারণ সমুদয় যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে একটি চিরনিলীন আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিরাজ করিতে থাকে। যেমন ভালো গান শুনিলে প্রাণ উদাস হইয়া যায়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য অনুভব করিলে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মে। বস্তুর মধ্যেই সৌন্দর্যের সমাপ্তি নহে, সে যেন আপন আশ্রয়স্থলকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একটি অসীমতাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আমরা বস্তুকে গ্রহণ করি, স্পর্শ করি, ঘ্রাণ করি, কিন্তু সেই অসীমতাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। এইজন্য আমাদের কর্মের চঞ্চলতা দূর হয় না। এইজন্য আমরা ভ্রমবশত সহস্র বস্তুকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে চাহি এবং সেই স্পর্শকেই সৌন্দর্যের ভোগ বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এইরূপে ভ্রান্ত লোকের মন হইতে সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশ্বাস নিতান্ত শারীরিকতার মধ্যে হারাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য পুরুষের প্রেমের চাঞ্চল্য ও ভোগপ্রিয়তা লোকবিখ্যাত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে পরিপূর্ণতা (Perfection) অতি বিরল। একটি গাছের মধ্যে তাহার অধিকাংশ ফুল ও পাতা তাহার আপনার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সুন্দর হইয়া উঠে। কুশ্রী বেল জুঁই চাঁপা অতি দুর্লভ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শারীরিক সর্বতোমুখী সম্পূর্ণতা বিরল। সেইরূপ, আমার বিশ্বাস, সৌন্দর্যপ্রিয়তা হইতে যে প্রেমের উৎপত্তি তাহা উন্নতশ্রেণীয় প্রেম। এইজন্য সাধারণত সেই প্রেমের চরম বিকাশ দেখা যায় না, এবং অধিকাংশ স্থলে তাহার বিকার লক্ষিত হয়। আমি অনুভব করি পুরুষের সম্পূর্ণ প্রেমের সহিত স্ত্রীলোকের প্রেমের তুলনা হয় না। পুরুষ যখন তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি বৃহত্ত্ব কুসুমপেলব সৌন্দর্যের নিকট বিসর্জন দেয় তখন সেই প্রেমের মধ্যে একটি সুমহৎ রহস্য উদ্ভাবিত হইতে থাকে। প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল— এইজন্য সে তাহার মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে— ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। সৌন্দর্য তাহার হৃদয়কে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে না। সে যাহা পাইয়াছে তাহার মধ্যেই তাহার আকাঙ্ক্ষার অবসান। রমণী এই কারণে বিশেষ Practical। সে কিছু অসমাপ্ত দেখিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গল্পের সমস্ত হিসাব না চুকিয়া যায় ততক্ষণ সে জিজ্ঞাসা করে 'তার পর।' শুদ্ধ কাল্পনিকতার প্রতি তাহার এক প্রকার বিদ্বেষ আছে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় এই দেখিয়াছি রমণীরা প্রকৃত সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রাহী ও সমালোচক হইতে পারে না।

রমণীর প্রেমের মধ্যে পরিতৃপ্তি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু পুরুষের প্রেমের মধ্যে যে একটি চির অতৃপ্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় সুখ আছে তাহা বোধ করি খুব অল্প রমণী উপভোগ করিয়াছে। সেই প্রেমে যেন মানবাত্মার অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপূর্ব রাগিণীময় গান বাহিরের সৌন্দর্যময়ী অসীমতার দিকে কম্পিত হোমশিখার ন্যায় সর্বদা উত্থিত হইতে থাকে। প্রেমের অবস্থায় যত কবিতা এবং [গান তাহা] হৃদয় হইতেই বাহির হইয়াছে। সৌন্দর্যপ্রেমের মধ্যে সেই চিরচঞ্চলা শক্তি আছে যাহা হইতে কবিতা ও গান বাহির হইতে পারে— গভীর সুখ গভীর দুঃখ গভীর তৃপ্তির সহিত গভীর কামনার যোগে মানব হৃদয়ের এই-সকল কাতর গান জাগিয়া উঠে— প্রেমিক গাহিয়া উঠে—

> 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

কেহ কাহাকেও সত্য সত্যই লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয়ে রাখে নাই, কিন্তু উদ্দাম মুহূর্তের মধ্যে সেই লক্ষ যুগ রহিয়াছে। মনের মধ্যে অনুভব হয় যে, যে সৌন্দর্যের জন্যে হৃদয় কাতর লক্ষ যুগেও সে সৌন্দর্যের তৃপ্তি নাই কারণ তাহা অসীম।

খ

পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব

যদিও যোগেশচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত হাসিবেন তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার Ideal সৌন্দর্য আমি কেবল স্ত্রীসৌন্দর্যের মধ্যেই দেখিতে পাই। যতবার আমি সুন্দরী স্ত্রী দেখি ততবারই আমার মনে এক বৃহৎ... উদয় হয়— আমি মনে মনে না বলিয়া থাকিতে পারি না 'কী আশ্চর্য! কেমন করিয়া এমনটা হইল'! জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থলে আমি যেন এক লক্ষ্মীরূপিণী মানসী স্ত্রীমূর্তি দেখিতে পাই। কী পুষ্পলতার মতো লালিত্য, মাধুর্য পরিস্ফুটিত, কী গতির হিল্লোল! কী সর্বাঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ! কী আপনার মধ্যে আপনার সামঞ্জস্য, আত্মসম্ভ্রম, ইতরসাধারণ হইতে নির্লিপ্ত অনিন্দ্য শোভন ভাব! সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে কী একটি সুমধুর সংযম!

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিরা অনেক স্থলে রাধিকার যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন আমার বোধ হয় তাহা পুরুষের প্রেম, স্ত্রীলোকের প্রেম নহে। সৌন্দর্যের অতৃপ্তিভাব পুরুষের প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ— কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার যে ব্যাকুল সৌন্দর্যমোহ তাহা পুরুষ কবির পুরুষভাব হইতে উত্থিত। ঊষাকে দেখিয়া ঋষিরা যেমন গান গাহিয়া উঠিতেন, কৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখিয়া রাধা স্থানে স্থানে সেইরূপ গীতোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন ইহা আমার অত্যন্ত বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের মধ্যে সেই বিকশিত মঞ্জরিত পরিপূর্ণ সংহৃত হৃদয়ের ভাব দিয়া সুসংযত সৌন্দর্য মূর্তিমান হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহাকে দেখিয়া যথার্থ সৌন্দর্যস্তব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে না। পুরুষ কবিরা এইরূপে অনেক সময়ে আত্মভাব স্ত্রীতে আরোপ করিয়া একপ্রকার অস্বাভাবিক সুখ অনুভব করে— তাহারা কল্পনা করে 'আমরা উহাদিগকে যেরূপ আগ্রহের সহিত যেরূপ ভালোবাসিতেছি উহাদের কোমল হৃদয়ের মধ্য হইতে উহারাও আমাদিগকে অবিকল সেইরূপ ভালোবাসা দিতেছে।' কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহারা আমাদিগকে আর-এক রকম করিয়া ভালোবাসে এবং ভালোবাসিয়া আর-এক রকম সুখ পায়। আমরা উহাদিগকে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের সহিত মিলাইয়া উহাদের সীমা দূর করিয়া উহাদিগকে আয়ত্তের বাহির করিয়া সুখ পাই। আর উহারা আমাদিগকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের সীমা নির্ধারণ করিয়া আপন আয়ত্তটুকুর মধ্যে আনিয়া সুখ পায়। আমরা আশ্রয়হীন আকাশে সুখী হই, উহারা পরিবৃত নীড়ে নির্ভর করিয়া সুখী হয়। আমাদিগকে উহারা দৃঢ়, আশ্রয়যোগ্য definite মনে করিয়াই ভালোবাসে, আমাদের মধ্যে দর্শনস্পর্শনাতীত অতিলৌকিক অসীম suggestiveness দেখিয়া যে ভালোবাসে তাহা নহে।

গ

ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম

প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল শক্তি দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতাম ও সভয়ে তাঁহার নিকট নত হইতাম। তাহার পরে প্রকৃতির মধ্যে করুণার ভাব, লালন-পালনের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধক সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা সূত্রে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যপাশে বদ্ধ হইলাম। তাহার পরে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে 'কেন' 'কী বৃত্তান্ত' নাই— তুমি সুন্দর বলিয়া তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া ভালোবাসি। তুমি রাজা বলিয়া পিতা বলিয়া নহে, তুমি আত্মার আনন্দ বলিয়া।

মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি এই সৌন্দর্যপ্রেম চরম আধ্যাত্মিকতা। কারণ, ইহাতেই আত্মার নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা। বৈষ্ণব ধর্ম এই প্রেমের ধর্ম।

১৯/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য

জ্ঞানের রাস্তার দুই ভাগ আছে— একটা ঐন্দ্রিয়ক অর্থাৎ শারীরিক আর-একটা মানসিক। একটা, Facts প্রত্যক্ষ করা, আরেকটা তাহার মধ্য হইতে তত্ত্ব উদ্ভাবন। জলবায়ুর প্রভাবজনিত জড়তাবশত আমাদের দেশে সেই শারীরিক অংশের প্রতি অবহেলা ছিল। সুতরাং মানসিক দিকটাই স্বভাবত অতিপ্রবল হইয়া সমস্ত জ্ঞানরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। অলস শরীর পড়িয়া রহিল, মন ঘরে বসিয়া তন্ত্র বাঁধিতে লাগিল।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্রে বৃহৎ সভ্যতার দুই দৃষ্টান্ত আছে। এক চীন আর-এক ভারতবর্ষ। উভয় দেশেই সভ্যতার মধ্যে জীবনের গতি নাই— নূতন গ্রহণ ও পুরাতন পরিহার নামক জীবনের যে প্রধান তাহা নাই। যাহা কিছু উদ্ভূত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হইয়া যায়, তাহার আর বর্ধনশক্তি থাকে না। বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে তাহাদের চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে, বাধা অতিক্রমণের চেষ্টাতেই তাহারা স্বভাবত সুখ পায় এবং বহিঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলার সামগ্রী মনে করে না, সর্বদাই তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ দায়ে পড়িয়া আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কাল্পনিক কেল্লা কোনো কাজেই লাগে না। কঠিন Fact সকলের মধ্যে যে বৃহৎ নিয়ম বিরাজ করে সেই নিয়মকে আবিষ্কার করিলে তবে Facts-এর উপর জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে কেহ ইচ্ছা করিয়া ঘরে বসিয়া মিথ্যা মায়াগণ্ডি রচনা করিয়া চোখ বুজিয়া নিজেকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে না। শরীর মন দুই একসঙ্গে সমান বলে কাজ করিতে থাকে— তাই দুয়েরই উন্নতি হয় এবং মাঝে হইতে [কাম] সিদ্ধ হয়। আমরা যদি পৃথিবীতে না জন্মিয়া কোনো কল্পনারাজ্যে জন্মিতাম তাহা হইলে কোনো ভাবনা ছিল না; তাহা হইলে কেবলমাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু পৃথিবীতে শরীরকে অবহেলা করিয়া মন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বহিশ্চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে শরীর হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া [মন] অস্বাভাবিক কুষ্মাণ্ডের মতো অকালে অন্যায়রূপ ডাগর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলো আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করিয়াছিল, কিন্তু কোনোটাই পূর্ণতা লাভ করে নাই, সকলগুলোই মাঝে এক সময় হঠাৎ টোল খাইয়া তুবড়াইয়া বাঁকিয়া শুকাইয়া গেল। অঙ্কুর উদ্গম হইল শস্য হইল কিন্তু তাহার মধ্যে নূতন শস্যের বীজ হইল না। যাহা হইয়াছিল তাহার স্মৃতিমাত্র রহিল। নব নব জীবনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া রহিল না। য়ুরোপে Alchemy Chemistry হইল, Astrology Astronomy হইল— কিন্তু আমাদের দেশে শিশুবিজ্ঞান হঠাৎ লম্বা হইয়া উঠিয়া মাজা ভাঙিয়া পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ইহার কারণ আমাদের সভ্যতায় মন ও শরীর, অন্তর ও বাহিরের অসমান বিকাশ।

অধীনতার সহিত যখনি সংগ্রাম করিয়াছে য়ুরোপ তখনি জয়ী হইয়াছে। Catholic ধর্মের অধীনতার উপর Protestantগণ জয়ী হইল। জ্ঞান ধর্ম ও রাজ্য সম্বন্ধীয় অধীনতার বিরুদ্ধে য়ুরোপ বার বার জয়ী হইয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শাসনের সময় বুদ্ধধর্ম একবার বিদ্রোহ

আনয়ন করিয়াছিল— অধীনতাপাশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানবহৃদয় সেই একবার বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া নির্বাসিত হইল।

২০/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব

স্ত্রী-পুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। এই শক্তি ষোলো আনা মাত্রায় সমাজের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতা অনেকটা বল পায়। এই শক্তি হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের একটি প্রধান বল অপহরণ করা হয়। দাবাহীন শতরঞ্চ খেলার মতো হয়। য়ুরোপীয় সমাজে এই শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ নহে, সমস্ত সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত। স্ত্রী-সাধারণের প্রতি পুরুষসাধারণ এবং পুরুষসাধারণের প্রতি স্ত্রীসাধারণের আকর্ষণে সমস্ত সমাজ গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রী-প্রকৃতি এবং পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ে আপনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের প্রভাবেই মানব সমগ্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্প ও ফল যেমন সমগ্রভাবে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে, তেমনি প্রেমে মানব-প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র সমভাবে উত্তাপ সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহার চূড়ান্ত সুমিষ্টতা ও সৌরভ তাহার আদ্যোপান্তে পরিণত হইয়া উঠে। অনুশাসন ও সংহিতা ধোঁয়া দিয়া পাকানোর মতো তাহাতে এককালে সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় না। তাহাতে কোথাও রঙ ধরে কোথাও ধরে না, তাহাতে আঁঠি পর্যন্ত পাকিয়া উঠে না। প্রেমে আমাদের অন্তঃকরণ সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শক্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে— প্রেমের অভাবে অন্তঃকরণ অসাড় থাকে, কেবল বাহিরের শক্তি তাহার উপরে বলপ্রয়োগ করিয়া যতটুকু করিয়া তোলে। অতএব সংহিতা অনুশাসন মুমূর্ষু সমাজের প্রতি সেঁকতাপের ন্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সজীব সমাজের আপাদমস্তকে উক্ত কৃত্রিম তাপ অবিশ্রাম প্রয়োগ করিলে তাহার স্বাভাবিক তেজ হ্রাস হয়। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষপ্রেম স্বাভাবিক ব্যাপ্ত সূর্যতাপের ন্যায় সমাজের সর্বাঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল বীর্য ও সৌন্দর্য সমগ্রভাবে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বায়ুর ন্যায় অদৃশ্যভাবে সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। কেবল যন্ত্রের ন্যায় জড়চালনা নহে জীবনের বিচিত্র গতিহিল্লোল রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু এই জীবন পদার্থটা অত্যন্ত দুরায়ত্ত। তাহাকে কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে আনা যায় না। তাহার সহস্রমুখী নিয়ম সহজে ধরা দেয় না। অতএব যাহারা সমাজকে একটা স্বকপোলকল্পিত নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এই জীবন পদার্থটা তাহাদের অত্যন্ত বিঘ্নের কারণ হয়। ইহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া ইহাকে আধমারা করিয়া তবে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার নিজের একটা জটিল নিয়ম আছে কিন্তু সেটাকে কায়দা করিয়া আপন মতের স্বপক্ষে খাটাইয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অতএব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা উন্নতির একটা ভারি সহজ উপায় বাহির করিতে চান, তাঁহারা এই উপদ্রবটাকে সর্বাগ্রে নিকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ভারতবর্ষীয় সমাজের মৃত্যুবৎ শান্তির পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাতজনক, তাহাতে সমাজে একটা জীবনপূর্ণ চাঞ্চল্য সর্বদা সঞ্চরণ করিতে থাকে; এই চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ দমন করিয়া সমাজকে নিতান্ত ভালোমানুষ করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে প্রাচীররুদ্ধ করিয়া রাখা সেই উদ্দেশ্য সফলতার অন্যতম কারণ হইয়াছে। অনেক বিপদ অনেক অশান্তির হাত

এড়ানো গিয়াছে, সেইসঙ্গে অনেকখানি জীবন একরকম চুকাইয়া দেওয়া গেছে। আমরা সকল সভ্যসমাজ অপেক্ষা বেশি ঠাণ্ডা হইয়াছি, তাহার কারণ আমাদের নাড়ি নাই বলিলেই হয়।

আমাদের দেশে পরিবার আছে, কিন্তু সমাজ নাই তাহার এক প্রধান কারণ স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মধ্যে বদ্ধ, সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে। স্ত্রীলোকের প্রভাব কেবলমাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যেই পর্যাপ্ত। পরিবারের বাহিরে আর মানব সমাজ নাই, কেবল পুরুষ সমাজ আছে। কেবল পুরুষে পুরুষ গড়িতে পারে না। এমন-কি পুরুষ প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে স্ত্রীলোকেরই বিশেষ আবশ্যক। কারণ, স্ত্রীলোকেই চাহে পুরুষ পরিপূর্ণ রূপে পুরুষ হউক। পুরুষের উন্নত আদর্শ স্ত্রীলোকের হৃদয়েই বিরাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের জন্যই পুরুষদিগকে বিশেষরূপে পুরুষ হওয়া আবশ্যক।

কেহ বলিতে পারেন পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রভাব আবদ্ধ থাকাতে পরিবারের সুখ ও উন্নতি বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক লোকের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ কাজ আছে। প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে কেরানি হওয়া বা জজ হওয়া বা আর কিছু হওয়া। সমস্ত জীবন কেবলমাত্র বিশেষ আবশ্যকের জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। চাষা আজন্মকাল প্রধানত কৃষি ব্যবসায়ের জন্যই উপযোগী হইয়াছে, এইজন্য সে কেবল চাষা। ব্যবসায়ীদের প্রতি সাধারণ ঘৃণার ভাব কতকটা এই কারণবশত। তাহারা বিশেষ কাজের যন্ত্র হইয়া পড়ে, মানুষ হইতে পায় না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা অতি বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র পরিবারের সেবা করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে থাকে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবীতে যে-সকল উপায় আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের উপাদান সামগ্রী হইয়া উঠে। অবশ্য পরিবারের কাজ করিতে গেলে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চ মানব প্রবৃত্তির চর্চা স্বভাবতই হইয়া থাকে, এইজন্য আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষ সাধারণের অপেক্ষা অনেক ভালো, তথাপি ইহা নিশ্চয় স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ আমাদের দেশে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র গৃহিণী, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের সহিত কেবল আমাদের সুবিধার যোগ, শিক্ষিত পুরুষের অধিকাংশই তাহাদের নিকট রহস্য। অর্থাৎ মানবের উন্নতি ব্যাপারে তাহারা সামান্য দাসীর কার্য করে মাত্র। সুতরাং স্বভাবতই তাহাদের আত্মসম্ভ্রম থাকে না এবং সমাজের নিকট হইতে যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয় না— দীনভাবে নিতান্ত আচ্ছন্ন, সংকুচিত, জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদের সমগ্র মধুর মহৎ স্ত্রীপ্রকৃতি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না।

চাষা কেবলমাত্র চাষা থাকিয়াই চাষের কাজ একরকম চালাইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক কেবলমাত্র গৃহিণী হইয়া গৃহকার্য যথোচিত সম্পন্ন করিতে পারে না। কারণ ইহা কেবলমাত্র জড়প্রকৃতির সহিত কারবার নহে। সন্তান পালন কেবলমাত্র স্তনদান নহে, স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া কেবল স্বামীর ভাতের মাছি তাড়ানো, পা ধুইবার জল জোগানো নহে। এ-সকল কাজের জন্য প্রথমত সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক, মানুষ হওয়া আবশ্যক।

আমাদের জাতি কেবল পরিবারের সমষ্টি, কিন্তু জাতি নহে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ নহে। স্ত্রী-পুরুষের যোগে এই সমাজ স্থাপিত এবং স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণে ইহা গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। আমরা কেবল অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীলোকেরা কেবল আমাদের ঘরের কাজ অসম্পূর্ণরূপে করে মাত্র।

২৪/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের বহুল উল্লেখ আছে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ স্বাধীন প্রেমের কথা অতি...[অল্পই] আছে। য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা স্বাধীন প্রেমই অধিক বিস্তৃত। আমাদের সমাজে... [স্বাধীন] প্রেমের স্থান ছিল না। কিন্তু তথাপি মানবহৃদয় আপন স্বাধীন প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া রাখিতে পারে নাই। নানা কৌশলে প্রাচীন কবি সেই গভীর আকাঙ্ক্ষা কাব্যে ব্যক্ত করিতেন। প্রাচীররুদ্ধ সমাজের বহির্ভাগে তাঁহারা এমন সকল কল্পকুঞ্জ রচনা করিতেন যেখানে স্বাধীন প্রেম অব্যাহতভাবে ক্রীড়া করিতে পারিত। মালিনী [তটবর্তী] তপোবনে, বনজ্যোৎস্না ও সহকারকুঞ্জে বিকাশোন্মুখী শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সমাজকারাবাসী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাস্বপ্ন। শকুন্তলা সমাজবিরোধী কাব্য। বিক্রমোর্বশী অসামাজিক। তাহাতে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া... প্রেম সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকও অস্বাভাবিক সমাজের বিরুদ্ধে মানবহৃদয়ের বিদ্রোহ, [বসন্তসেনা] সমাজ হইতে নির্বাসিতা, তাহার প্রতি চারুদত্তের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন নাগরিকের একনিষ্ঠ প্রেম সমাজের বাঁধা নিয়মের প্রতি কবির বিশ্বাসের ও আন্তরিক অনুরাগের অভাব। মেঘদূত বিরহের কাব্য— বিরহাবস্থায় দাম্পত্য সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বাধীনভাবে ভালোবাসিবার অবসর পায়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সেই পড়ে... যেখানে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়।... আকর্ষণে এক হইতে আর-একের দিকে ধাবমান হইবার জন্য হৃদয় মধ্যবর্তী আকাশ পায়। যেখানে দাম্পত্য... সেখানে একটি চিরস্থায়ী বিরহ থাকে, সেই বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের আকর্ষণ আপন কার্য করিতে... হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বহির্মুখী করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে
বরমপি বিরহো, ন সঙ্গমস্তস্যা
সঙ্গে সৈব তথৈকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

...বিরহে হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকে, সে আপনার প্রেম দিয়া সমস্ত বিরহকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। এইজন্য... দাম্পত্যের মধ্যে বিরহ আনিয়া প্রেমকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী একাকিনী মহাদেবের সেবা করিতেছেন ইহা সমাজ নিয়মের ব্যতিক্রম, কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে তৃতীয় ...অমন অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি হইবে কী করিয়া? একদিকে বসন্তপুষ্পাভরণা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো শিরিষ...বেপথুমতী উমা, আর-একদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়, চক্ষুর পলকে [উভয়ের] মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের আকর্ষণ বদ্ধ হইবে কী করিয়া? ইহাতে কঠিন নিয়মের কারাপ্রাচীরের মধ্য হইতেও স্বাধীন প্রকৃতির জয়সংগীত ধ্বনিত হইতেছে। রাধাকৃষ্ণের সমাজবিদ্রোহী প্রেমগান যে আমাদের এই আটঘাট [বাঁধা] সমাজের ও সর্বত্র প্রচলিত হইল ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে আমাদের রুদ্ধ হৃদয় ব্যাকুলভাবে প্রেমের স্বাধীনতা [খুঁজিতেছে]। চিরদিন বদ্ধ থাকিয়াও সৌন্দর্যের প্রতি হৃদয়ের সেই স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট [হয় নাই]। কারণ,... সমাজনিয়ম আর যাহাই করুক, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য আপন জটিল জালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রকৃতি তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য দ্বারা সর্বদা আমাদের সৌন্দর্যচাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখে... সে কী করিতে চায়; বৃদ্ধ সমাজপতিরা এই চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য নানা ফন্দি বাহির করেন, কিন্তু সেই চঞ্চলতা জীবন থাকিতে কিছুতেই বাঁধা পড়ে না।

প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে লোপ করিয়া বাহাদুরী করাকে সভ্যতা বলে না, সাধারণ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া... নিয়মিত করাই সভ্যতার কার্য। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি অমোঘ আকর্ষণ

আছে এইজন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি উভয়ের... দিলে মঙ্গল হয় না, সেই আকর্ষণকে যথানিয়মে মানবের কার্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমরা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে লোপ করিতে পারি না, কিন্তু নিয়মিত করিয়া আপন কার্যে লাগাইতে পারি।

বিদ্যাসুন্দর এবং আমাদের সাধারণ প্রচলিত প্রেমগান হইতে এই প্রমাণ হয় যে, সমাজনিয়মের শাসন সত্ত্বেও প্রেম আমাদের হৃদয় হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল সূর্যকিরণের অভাবে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, কেবল তাহা মুক্ত আকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কুঞ্চিত কীটের ন্যায় মৃত্তিকাতলে সহস্র গহ্বর খোদিত করিয়াছিল। হেয় বিকৃত অমরতা লাভ করিয়া সে তলে তলে সমাজকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিতেছিল।

২৬/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

CHIVALRY

কুমারী Mary-র প্রতি ভক্তি য়ুরোপে স্ত্রীসম্মানের এক প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে chivalry-র প্রচলন হয় নাই কেন? chivalry-র মধ্যে যে সম্মানের ভাব আছে তাহা প্রেমের সম্মান তাহা ভক্তির সম্মান নহে। সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি যে একটি সযত্নসম্ভ্রম ভাবের উদয় হয় chivalry তাহাই। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সম্মান আছে, তাহা জননীভাবে, দেবীভাবে। তাহার কারণ, কেবলমাত্র পতিব্রতা সতী এবং জননী এই দুইভাবে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ভক্তির যোগ্য। তাহারা কোনোকালে কুমারী বা সুন্দরী নহে— সুন্দরী না হওয়াটার অর্থ এই যে, সাধারণের মধ্যে তাহাদের সৌন্দর্যের কোনো কার্য নাই। আমাদের দেশে কুমারী শিশু আছে কিন্তু কুমারী স্ত্রীলোক নাই। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই। প্রেম আকর্ষণই স্ত্রীলোকের প্রধান বল; যে সমাজে স্ত্রীলোক প্রেম উদ্রেক করিতে পারে সেই সমাজেই স্ত্রীলোক প্রকৃত আত্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজে সেই প্রেম উদ্রেকের বাধা আছে সেইখানে স্ত্রীলোকের প্রধান বল অপহরণ করা হইয়াছে। স্ত্রী বলিয়া নহে, জননী বলিয়া নহে, স্ত্রীলোক বলিয়াই স্ত্রীলোকের একটি মাহাত্ম্য আছে, সে মাহাত্ম্য পুরুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত; কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের মধ্যে [রুদ্ধ] থাকিলে স্ত্রীলোক সেই আপন রাজ্য হইতে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হয়। কেবল সতী বা জননীভাবে এক প্রকার দূরস্থিত মৃদু ভক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেভাবে ধন মন জীবন সমর্পণ করা যায় না। কিন্তু পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য ধন মন জীবন দান করিবে প্রকৃতিতে এইরূপ কথা আছে, স্বভাব শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। সুতরাং আত্মোৎসর্গের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত হয় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে নয় নানাবিধ গোপন পথ অবলম্বন করে। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের প্রতি স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গ হইতে সহস্র মানবকার্যের জন্য আত্মোৎসর্গ শিক্ষা হয়। স্বাভাবিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের ধন মন প্রাণ কাড়িতে পারা যায় না। আমাদের দেশের লোকেরা উক্ত তিনটে পদার্থ গর্ত খুঁড়িয়া কত সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুদৃঢ় অভ্যাসবশত এক প্রকার দাসের মতো প্রাণ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রাণ দিবার শিক্ষা কেবল প্রেম হইতেই হয়।

নানা কারণে আমার মনে হয় না যে দেবভক্তি হইতে chilvary-র উৎপত্তি। আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে কৃত্রিম কুমারী পূজা আছে কিন্তু প্রকৃত কুমারী পূজা নাই। যেখানে স্ত্রীলোক রুদ্ধ নহে সেইখানেই chilvary-র জন্ম। chilvary অন্ধ পশুবলের উপরে সৌন্দর্যের জয়লাভ সৌন্দর্যের স্বাভাবিক কার্যই তাই। স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্ত্রীলোক সবল হয় এবং সবলতা লাভ

করিয়া স্ত্রীলোক জয়ী হয়। কেবল স্বামী পুত্র পরিবারের নহে, সমস্ত পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করিয়া তবে সমাজে একটি সমগ্র স্ত্রীলোক উদ্ভিন্ন হইতে পারে। সেই স্ত্রীলোককে আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আংশিক অসম্পূর্ণ স্ত্রীলোককে মাতা দেবী সম্বোধন করিয়া দূরে চলিয়া যাই। Browning-এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই; যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ভালোবাসে তাহা হইলেও যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়। স্ত্রীলোক কেবল মাতা ও দেবী হইতে চাহে না, পুরুষের হৃদয় অধিকার করিয়া তবে তাহারা পূর্ণতা লাভ করে।

২৬/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

নব্যবঙ্গের আন্দোলন

আজকাল গবর্নমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা দেখিয়া আশা ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা বেশি সেখানে আশঙ্কাও বেশি। স্বজাতির উন্নতি যদি বাস্তবিক প্রিয় এবং ঈপ্সিত হয় তবে ভাবনার কারণ সম্বন্ধে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধভাবে কেবল আনন্দ করিয়া বেড়ানো স্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা স্বজাতিবৎসল, তাঁহাদের কি মাঝে মাঝে সর্বদাই এরূপ আশঙ্কা উদয় হয় না, এই যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি, এ কি সত্য না স্বপ্ন? যদি একান্ত অমূলক হয় তবে আগেভাগে তাড়াতাড়ি আনন্দ করিয়া বেড়ানো পরিণামে দ্বিগুণ লজ্জা ও বিষাদের কারণ হইবে।

ন্যাশনাল শব্দটা যখন বাংলা দেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারি দিকে ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল মেলা, ন্যাশনাল সং (song), ন্যাশনাল থিয়েটার— ন্যাশনাল কুজ্ঝটিকায় দশ দিক আচ্ছন্ন।

হঠাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ ছিল। প্রথম ইংরাজি শিখিয়া বাঙালি যুবকেরা বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোরু খাওয়া তাঁহারা নৈতিক কর্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুজাতিকে গবাদি চতুষ্পদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মিত। ইতিমধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়- প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম দেশে অল্পে অল্পে মূল বিস্তার করিতে লাগিল। আমাদের দেশে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বহু প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এই জ্ঞানই স্বদেশীয় প্রাচীনকালের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের মূল কারণ হইল। এমন সময়ে য়ুরোপেও সংস্কৃত ভাষার আদিমতা, আমাদের প্রাচীন দর্শনের গভীরতা, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের মাধুর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। তখন হিন্দুসভ্যতার কাহিনী বিলাত হইতে জাহাজে চড়িয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ পুঁথি খুলিয়া অনুসন্ধান করিতে বসিয়া গেলেন, আমরা পুঁথি বন্ধ করিয়া ঢোল লইয়া ন্যাশনাল বোল বাজাইতে বাজাইতে ভারি খুশি হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার বশবর্তী হইয়া সমস্ত স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ দুষ্প্রাপ্য দুর্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে লাগিলেন, আর আমরা তখন হইতে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের শাস্ত্রালোড়নের পরিশ্রম স্বীকার করিলাম না অথচ শাস্ত্রের উপরিভাগ হইতে অহংকার-রস শোষণ করিয়া লইয়া বিপরীত মাত্রায় স্ফীত হইয়া উঠিলাম।

যে জাতি স্বদেশের প্রাচীনকাল লইয়া বহুদিন হইতে অবিশ্রাম অহংকার করিয়া আসিতেছে অথচ স্বদেশের প্রাচীনকালের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য তিলমাত্র শ্রম স্বীকার করিতে

প্রস্তুত নহে তাহাদের রচিত একটা আন্দোলন দেখিলে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে যে, ইহার সহিত যতটুকু অহংকার-আস্ফালনের যোগ ততটুকুই তাহাদের লক্ষ্য ও অবলম্বনস্থল, প্রকৃত আত্মবিসর্জন অনেক দূরে আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গীতসূত্রসার' নামক অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় লোকের প্রাচীন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে। কিন্তু তাহা ইতিহাস-প্রিয়তাজনিত নহে, তাহা আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল।' এ কথা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয়। মনে আছে বাল্যকালে যখন ন্যাশনাল ছিলাম তখন অর্ধজ্ঞত ইতিহাসের অনতিস্ফুট আলোকে অহরহ প্রাচীন আর্যকীর্তি সম্বন্ধে জাগ্রতস্বপ্ন দেখিয়া চরম আনন্দ লাভ করিতাম। ইংরাজের উপর তখন আমাদের কী আক্রোশই ছিল! তাহার কারণ আছে। যখন কাহারো মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর সমকক্ষ সমযোগ্য লোক, অথচ কাজকর্মে কিছুতেই তাহার প্রমাণ হইতেছে না, তখন উক্ত প্রতিবেশীর বাপান্ত না করিলে তাঁহার মন শান্তিলাভ করে না। আমরা ন্যাশনাল অবস্থায় ঘরে বসিয়া এবং সভায় দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ইংরাজ জাতির বাপান্ত করিতাম; বলিতাম, আমাদের পূর্বপুরুষ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন তখন ইংরাজের পূর্বপুরুষ গায়ে রঙ মাখিয়া কাঁচা মাংস খাইয়া বনে বনে নেকড়িয়া বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে। আবার বিদ্রূপ করিয়া এমনও বলিতাম— ডারুয়িন ইংরাজ তাই আদিম পূর্বপুরুষদিগকে বানর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজের লালমূর্তি ও কদলীপ্রিয়তার উল্লেখপূর্বক চতুর্ভুজ জাতীয় রক্তমুখচ্ছবি জীবের সহিত তুলনা করিয়া ন্যাশনাল পাঠকদিগের মনে সবিশেষ কৌতুক উদ্দীপন করিতাম। ইংরাজি বই পড়িতাম, ইংরাজি কাগজ লিখিতাম, ইংরাজি খাদ্য একটু বিশেষ ভালোবাসিতাম, ইংরাজি জিনিসপত্র বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিতাম, মূর্তিমান ইংরাজ দেখিলে মনে বিশেষ সম্ভ্রমের উদয় হইত, অথচ তাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি রাগ বাড়িত বৈ কমিত না। দেশে ডাকাতি হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম, বলিতাম, অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল, আবার গ্রামের কাছাকাছি ডাকাতির সংবাদ পাইলে ইংরাজ শাসনের শৈথিল্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

এই ন্যাশনাল উদ্দীপনা এককালে অত্যন্ত টনটনে হইয়া উঠিয়াছিল এখন ইহা chronic ভাব ধারণ করাতে ইহার প্রকাশ্য দব্‌দবানি অনেকটা কমিয়াছে। অনেকটা সংহত হইয়া এখন ইহা Political agitation আকার ধারণ করিয়াছে।

এই আজিটেশনের মধ্যে একটা ভাব এই লক্ষ হয় যে, আমাদের নিজের কিছুই করিবার নাই, কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্নমেন্টের কোর্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক। আমরা বড়ো, তবু আমাদিগকে ভারি ছোটো দেখাইতেছে, সে কেবল তোমরা চাপিয়া রাখিয়াছ বলিয়া। স্প্রিংয়ের পুতুল বাক্সর মধ্যে চাপা থাকে ডালা খুলিবামাত্র এক লম্ফে নিজমূর্তি ধারণ করে। আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছুই করিবার নাই— তোমরা বাহির হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপন্ দিয়া ডালা খুলিয়া দাও আমরা ক্যাঁচ্ শব্দ করিয়া গাত্রোত্থান করি।

আবার এইসঙ্গে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতা তাঁহারা সম্প্রতি এক বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের মতো এমন সমাজ আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক এবং বাল্যবিবাহ ব্যতীত তাহার সেই পরম আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হয় না, আবার একান্নবর্তী প্রথা না থাকিলে উক্ত বিবাহ টেঁকে না— এবং যেহেতুক হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক, বিধবা বিবাহ অসম্ভব, এদিকে জাতিভেদ প্রথা এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক সমাজের শৃঙ্খলা, শ্রমবিভাগও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কারণ। অতএব আমাদের সমাজ একেবারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন। য়ুরোপীয় সমাজ ইন্দ্রিয়সুখের উপরেই গঠিত, এইজন্য তাহার মধ্যে আদ্যোপান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আবার বলেন, আমাদের দেশের প্রচলিত উপধর্ম মানবজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানব-বুদ্ধির অতীত।

সবসুদ্ধ দাঁড়াইতেছে এই সমাজ বা ধর্ম সম্বন্ধে হাত দিবার বিষয় আমাদের কিছুই নাই। যাহা আছে সর্বাপেক্ষা ভালোই আছে এখন কেবল গবর্নমেন্ট আমাদের ডালা খুলিয়া দিলেই হয়। মাঝে একবার দিনকতক সমাজ সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতির অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি কেবল দুই-চারি ঘর উৎপীড়িত সমাজবহির্ভূত ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া আর সর্বত্রই সমাজনিয়ম পূর্ববৎ সমানই ছিল। জড়তা এবং কর্তব্যের সংগ্রামে জড়তাই জয়লাভ করিল, অবশেষে কালক্রমে তাহার সহিত অহংকার আসিয়া যোগ দিল। মাঝে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাঙালি ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসাকে যখন আবার কর্তব্য বলিয়া স্থির করি তখন যেমন নিরনুতাপ আরাম ও নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সুযোগ এমন অন্য সময়ে নহে। আমরা প্রাচীন দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া পশ্চাতের দিকে সমস্ত স্থূল শরীরটিকে হেলান দিয়া রাখিয়াছি— সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই একটা গুরুতর অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি— কেবল মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়া গবর্নমেন্টকে ডাকিয়া বলিতেছি, 'বাবা, এই খাটসুদ্ধ তাকিয়াসুদ্ধ তুলিয়া তোমাদের বিলাতের বানানো একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও আমি ভোঁ হইয়া উন্নতির টর্মিনসে গিয়া পৌঁছিব।'

নব্যবঙ্গেরা প্রথম অবস্থায় গোরু খাইত এবং মনে করিত, এই সহজ উপায়ে ইংরাজ হইতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আবিষ্কার করিল পূর্বপুরুষেরাও গোরু খাইতেন অতএব তাঁহারা য়ুরোপীয় অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং আমরা ইংরাজের চেয়ে কম নহি। সম্প্রতি তৃতীয় অবস্থায় গোবর খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে মনে ইংরাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত প্রমাণ হইয়া গেছে, গোরুর চেয়ে গোবরে ঢের বেশি আধ্যাত্মিকতা আছে; সমস্ত মাথাটার মধ্যে কিছুই নাই থাকুক শুদ্ধ পশ্চাদ্দিকে টিকিটুকুর ডগায় আধ্যাত্মিকতা গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। পূর্বে যখন দেশে বড়ো বড়ো বনেদি টিকির ছিল তখন সে ছিল ভালো। আজকাল শিক্ষিত লোকদের মাথার পিছনে যে ক্ষুদ্রকায় হঠাৎ-টিকির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা হইতে কেবল একটা অনাবশ্যক অস্বাভাবিক কৃত্রিম দাম্ভিকতা উৎপন্ন হইতেছে।

যদি কোনো দুঃসাহসিক ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে, কেবল গবর্নমেন্টকে ডাকাডাকি না করিয়া আমাদের নিজের হাতেও কিছু কাজ করা আবশ্যক তাহা হইলে সে কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে ইচ্ছা করে। তাহার প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, কী কী উপায়ে আমাদের দেশের অভাববিশেষ নিরাকৃত হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে— কম কাজ করিয়া বেশি করিতেছি দেখানোই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আমাদের যে কিছু দোষ আছে, আমাদের যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করিয়া যোগ্য হওয়া আবশ্যক এ কথা আমরা সহ্য করিতে পারি না। মনে হয় ওরকম কথা Patriotic নহে। মনে হয় ও কথা সত্য হইলেও বলা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে গবর্নমেন্ট সচেতন হইয়া উঠিবে। অতএব নিদেন Policy-র জন্য বলা আবশ্যক আমাদের যাহা হইবার তাহা বেবাক হইয়া গেছে, এখন তোমাদের পালা। আমরা সকলেই সকল বিষয়ের জন্য যোগ্য, এখন তোমরা যোগ্যের সহিত যোগ্যকে যোজনা করো। আমি নিজের কথা আলোচনা করিয়া এবং আমার অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাজ্যশাসনের আমরা যোগ্য, Representative Government লাভে আমরা অধিকারী। কথাগুলা উচ্চারণ করিতে পারিলেই যে প্রকৃত বস্তুতে অধিকার জন্মে তাহা নহে। অন্য দেশের লোকেরা যাহা প্রাণপণ চেষ্টায়, স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও প্রবল বীরত্বের প্রভাবে আবিষ্কার ও উপার্জন করিয়াছে, আমরা তাহা কানে

শুনিয়াই আপনাদিগকে অধিকারী জ্ঞান করিতেছি। শিক্ষা করিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি গবর্নমেন্ট এমন একটা নিয়মজারী করিতেন যে, আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরীক্ষায় আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ না করিলে সে বিষয়ে কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না, তাহা হইলে বোধ করি কথাবার্তা এক প্রকার বন্ধ হয়। আমাদের চরিত্রে আমাদের জীবনে আমরা যোগ্যতা লাভ করিব না, পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি fact শিক্ষা তাহাও করিব না। দেশের যে-সকল অভাব মোচন অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিব না, অথচ কোন্ মুখে বলিব, আমরা আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত Political agitation-এ যোগ দিয়াছি?[১]

এ-সকল agitation-এর উপর যে সাধারণ লোকের বিশেষ বিশ্বাস আছে তাহাও দেখিতে পাই না। এ-সকল বিষয়ে কেহ ঝট করিয়া টাকা দিতে চাহে না, বলে— ও কতদিন টিকিবে! আর তাহা ছাড়া আমাদের দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে— কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল্! সাধারণ কার্যে টাকা দিয়া লোকের বিশ্বাস হয় না যে, সে টাকার যথোপযুক্ত সদ্‌ব্যয় হইবে। মনে করে পাঁচজনের টাকা গোলেমালে দশজনের ট্যাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে অথবা এমন এলোমেলোভাবে খরচ হইবে যে, সমস্তটাই ন দেবায় ন ধর্মায় হইবে। আমরা বলি 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' অর্থাৎ মাকে গঙ্গাযাত্রা করানো এক বিষম লেঠা, নিতান্ত কেহ না থাকিলে কাজেই কায়ক্লেশে নিজেকে ভার লইতে হয় কিন্তু যখন আরও পাঁচটা ভাই আছে, তখন আর কে ওঠে! আমরা আমাদের জাতভাইকে এমন চিনি যে কাহারো বিশ্বাস হয় না যে, সাধারণের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এমন-কি, বাণিজ্যে যাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে তাহাতেও আমরা পাঁচজনে মিলিয়া লাগিতে পারি না। একে তো পরস্পরকে অবিশ্বাস করিব অথচ নিজেও কাজ করিব না। কাহারো সততা এবং সত্যনিষ্ঠার উপর বিশ্বাস নাই। গোড়াতেই মনে হয় সমস্তটা ফাঁকি একটা হুজুক মাত্র।

ইহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত। আমরা সত্যপরায়ণ নহি সুতরাং কোনো কাজেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বাস ব্যতীত কোনো কাজই হয় না, আবার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব গোড়ায় দরকার চরিত্র গঠন। জাতির মধ্যে উদ্যম, সত্যপরতা, আত্মনির্ভর, সৎসাহস না থাকিলে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেন্টেটিব গবর্নমেন্ট ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের

---

১. লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কী করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উক্তরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।—ভারতী-সম্পাদক।

লোকদের ডাকিয়া ক্রমাগত এই কথা বলা আবশ্যক যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট প্রসাদে সুশাসন প্রভৃতি যে-সকল ভালো জিনিস পাইয়াছি, কোনো জাতি সেগুলি পড়িয়া পায় নাই, তাহার জন্য বিস্তর যোঝাযুঝি, সংযম, আত্মশিক্ষা, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা যে-সকল অধিকার অনায়াসে অযাচিতভাবে পাইয়াছি, তাহার জন্য গবর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণপণে যেন তাহার যোগ্য হইবার চেষ্টা করি— কারণ পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেননা তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্টভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না। আমরা যে সুখ পাইতেছি আমরা তাহার যোগ্য নহি, আমরা যে দুঃখ পাইতেছি সে কেবল আমাদের নিজের দোষে। এ কথা শুনিলে লোকে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিবে না— এ কথা কেবলমাত্র জয়ধ্বজায় লিখিয়া উড়াইয়া বেড়াইবার কথা নহে, এ কথার অর্থ নিজে কাজ করো, ধৈর্যসহকারে শিক্ষা লাভ করো, বিনয়ের সহিত গভীর লজ্জার সহিত আপনার দোষ ও অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া তাহা আপন যত্নে দূর করিবার চেষ্টা করো, যাঁহাদের কাছে সহস্র বিষয়ে ঋণী আছ তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করো, সে ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করো। আমাদের লোকের একটি যে দোষ আছে ভিক্ষাকে আমরা হক্ মনে করি, পরের উপার্জনের উপর অতি অসংকোচে আপনার ভাগ বসাই, আবার তাহাতে সামান্য ত্রুটি হইলে চোখ রাঙাইয়া উঠি এই প্রকৃতিগত অভ্যাস যেন ত্যাগ করি। কেবল অলসভাবে পড়িয়া পড়িয়া পরের কর্তব্য সমালোচনা করিয়া নিজের কর্তব্য ভুলিয়া না যাই। গবর্নমেন্টের 'আহ্লাদে ছেলেটি'র মতো কেবল সকল বিষয়েই আবদার করিব এবং নিজের দোষ স্মরণ করাইয়া দিলেই অমনি ফুলিয়া দাপাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া দিব এই ভাবটি ত্যাগ করি। আজকাল যে কাণ্ড চলিতেছে তাহাতে ইহার উল্টা ভাবটাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, গবর্নমেন্ট সহস্র বিষয়ে অপরাধী এবং আমাদের কোনো অপরাধ নাই— অলস এবং অহংকারী লোকদের মন হইতে এ ভাবটা দূর করাই একান্ত চেষ্টাসাধ্য, এ ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা করে না।

ভারতী ও বালক
ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

ইতিহাস

ঝান্সীর রানী

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্য-বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে, এক- একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোলভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলন্ডের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্ পত্রে লিখেন যে, 'তাঁতিয়া টোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড়ো বড়ো থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০/২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায় জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যকভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।' এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।'

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত

না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি এত দিনে ইংলন্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেক্‌জান্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরও গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি যুদ্ধ সময়ের আরও অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের একপ্রান্তে তাহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্‌ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোনো মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি, নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্‌সীর রানী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহৌসি ঝান্‌সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্‌সীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকাস্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার সকল অতিসুন্দররূপে

বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হৃতরাজ্য-রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণ সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে-সেই সকল প্রাচীরের চতুর্দিকে সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্‌সিরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্‌সি নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ওই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনো মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্নঅংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন কার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন-কি, এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ওই রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃ. অব্দে লক্ষ্মীবাই হৃত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্‌সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বন্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১ মার্চ রানী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বানপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্‌সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর দিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়া টোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর ৫০/৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট

কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভালো ভালো গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানীর শরীর-রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেইসঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেন্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্‌সী হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন। বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী-কর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানীর রক্ষক হইলেন।

৪ এপ্রিলে ইংরাজরা সমস্ত ঝান্‌সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রের অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী-কন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া বংশের শেষ বাজিরাওয়ের দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্‌সীরানী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারিক্রোশ রানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়া টোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়া টোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইয়ো, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

১ জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানীর মাতা 'গুজ্জারাজা' সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রানী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদয় বন্দোবস্ত রানী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়র শত্রুহস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্বলভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দরুন বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনো-মতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মীবাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনো ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৪

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চারশো বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে— সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা, নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের

মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন; বলিয়া দিলেন, 'এক গাঁয়ে লুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।' নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, 'আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে। এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।' বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, 'এ বড়ো ভালো কথা।' নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহার পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত লাভ করিলে?' নানক বলিল, 'বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে!' কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? এত গোল কেন?' যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।' এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের 'পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান

করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।' ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও— টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না; কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে নুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড়্ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভ বলিয়া কোন্-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না; তিনি বলিলেন, 'যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারো কাছে চাই না।' নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, 'তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!' নানক বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও।' নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।' নানক বলিলেন, 'তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।'

নানক অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল আজ

তাহার হিসাব করিয়া দেখো দেখি। আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চারশো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে।

বালক
বৈশাখ ১২৯২

গুটিকত গল্প

১

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি এক সময়ে ইংরাজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ চলিতেছে তখন কী-গতিকে একজন ইংরাজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন-কি, এক-এক দিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে রোদ উঠিলে ইংলন্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল-সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গরমির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলন্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া দেখে একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্তদিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব— নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে? সে সেই ভাঙা পিপের কাঠের চারি দিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া একপ্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনি তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে, এমন সময় ফরাসি সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না— এতদিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরাজ বালককে বলিলেন— 'তোমার এ কী রকম সাহস! এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও। দেশে তোমার কেই বা আছে।'

সেই ইংরাজ বলিল— 'আমার মা আছে। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন— 'আচ্ছা— মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তাহার মা না-জানি কত মহৎ।'

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন— এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলন্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিন কাছে রাখিয়াছিল।

২

একশো বৎসরেরও অধিক হইল একদিন জর্মনির একটি ছোটো প্রদেশের চার্লস্ নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে একদল লোক জমা হইয়াছে। বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কী, ব্যাপারটা কী? রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার সহিসের ছেলে ডানেকর, পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়— সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে, তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড়ো ভালোবাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে তখন ভারি খুশি হইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিল— বলিল, 'তুমি নিজের কাজে মন দাও তো বাপু। লেখাপড়া শিখিতে হইবে না!' এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। ডানেকর জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোটো ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে— ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন— এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব— এইজন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ শিখাইত না— অনেক সময়ে ডানেকর লুকাইয়া গোপনে শিক্ষা করিত। স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর, আরও বেশি করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মতো পাথরের মূর্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই রাজার নাম আজ আর বড়ো কাহারো মনে পড়ে না, কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে!

৩

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঙ্জীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন— 'কোনো প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।' মুকুন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা,

তাহাই হইবে।' নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন— 'ওহে তুমি তো মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এসো দেখি!' এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কী কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, 'যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে তো আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।' এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক-এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে— একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভালো বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও নাই সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার সাবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর-একটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আমি তো আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন তো লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।' বাদশার পুত্র বলিলেন— 'আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।' নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা একদল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকট আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেইসঙ্গে কথা দিলেন যে বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনোরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঙ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন— 'আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে— কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে। কখনো কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো নোয়াইব না।' সভার লোকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোটো দরজার মতো ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নীচু না করিলে চলে না— সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও আমি দিব।' রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'আমার অচলগড়ের মতো রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।' বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা

রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনোই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

বালক
বৈশাখ ১২৯২

আকবর শাহের উদারতা

একজন প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারী আকবর বাদশাহের উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন-কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড়ো বড়ো ওমরাওগণ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে পর্টুগিজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুঠ করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্মজ শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটমাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন— 'যে কার্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।'

বালক
আষাঢ় ১২৯২

ন্যায় ধর্ম

প্রুসিয়ার 'মহৎ' উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেড্‌রিক সম্রাট রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকলগৃহ মাঝে পড়াতে তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না?' কৃষক উত্তর করিল— 'ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ওইখানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন, এবং ওইখানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।'

সম্রাট কহিলেন, 'আমি ওই স্থানে আমার প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাহি।'

কৃষক কহিল, 'মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ওই জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।'

সম্রাট কহিলেন—'তুমি যদি বিক্রয় না কর তো ওই গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি।'

কৃষক কহিল, 'না, পারেন না। বার্লিন নগরে বিচারক আছে।'

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা

আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজ পর্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রানীর সম্বন্ধে এইরূপ আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রানীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্বকালে ধোলকা গ্রামে তিনি 'মীনলতলাও' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ওই পুষ্করিণীর পূর্ব দিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তনসামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রানী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রানী যেরূপ কীর্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রানী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনলতলাওয়ের পূর্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, 'ন্যায় ধর্ম দেখিতে চাও তো মীনলতলাও যাও।'

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বীর গুরু

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে-সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সেগুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়োলোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্ত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নবধর্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আট জন গুরু জন্মিয়াছেন, আট জন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরঞ্জীব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঞ্জীবের লোক যখন তেগ্‌বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্বপুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক আমাকে যদি বধ করে তো আমার শরীরটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়। আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিয়ো, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।' বলিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেহ বা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক তাহার প্রমাণস্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!' তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন, 'সে তো আমার কাজ নহে। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে

মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।' এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড় পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারি উঠাইয়া আঘাত করিলে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, 'শির দিয়া, সির নেহি দিয়া।' অর্থাৎ মাথা দিলাম, গুপ্তকথা দিলাম না।' এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্যে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরু গোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, 'আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ-নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।'

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, 'যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে।' ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়ি হাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখ জাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মনের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে

একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল-নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া চারি দিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্ত খাঁ ও শম্‌স্‌ খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাত মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ-নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'এসো, তবে আর-একবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক। যদি মরি তাহা হইলে কীর্তি থাকিয়া যাইবে; যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মতো মরিলে গৌরব আছে, ভীরুর মতো মরা হীনতা।' কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরাও যাও!' তাহারা বলিল, 'যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ করো গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।' এই চল্লিশ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষ-পক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচ জন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারো হাজার সৈন্য জড়ো হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, 'এবার হয় জয় করিব নয় মরিব।' জয় হইল। মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট আরঙ্গজীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।' গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে-সকল অত্যাচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

'আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে-সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ একদিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।' এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন যে, 'তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!' পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঙ্জীবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরঙ্জীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহাদুরশা সম্রাট হইয়াছেন। বাহাদুরশা বহুবিধ সওগাত উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যুঘটনা বড়ো শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মতো হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ জন্মিয়াছিল। একদিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছুদিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠান-তনয়কে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ ভীরু।' কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এইজন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিল।

আর-একদিন সেই পাঠানের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম, ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিয়ো না।'

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোওয়াইয়া ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানে সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সংকল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সংকল্প বিফল হইল বটে, কিন্তু তিনিই প্রধানত শিখদিগকে যোদ্ধৃজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

শিখ-স্বাধীনতা

গুরু গোবিন্দই শিখদের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা-নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে বধ করিলেন। সির্‌মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারানপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট বাহাদুরশা'র মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে একদল শিখসৈন্য পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্তা বয়াজিদ্ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল; দিল্লির সম্রাট কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সম্মদ খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত তুরানিকে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে এক দল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্ খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরানি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান-শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য-যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে, যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্ খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন দিল্লিতে নীত হইলেন তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্শাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন যে, 'শিখেরা মরিবার সময় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন-কি, এইজন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।' অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কী করিয়া?' বন্দা বলিলেন, 'পাপীর শাস্তি-বিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা-কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।' বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস

ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে-সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই ষাণ্মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদিরশা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদিরশা জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন— প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে চলিয়াছে। কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল। ইহাতেও মুসলমানেরা বড়ো একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনও সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কী, আমি মাথাটা দিতেছি।'

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্তা জেইন খাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে দুর্দান্তপরাক্রম পাঠান আমেদশা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলসমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়, তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদশা অমৃতসরের শিখ-মন্দির ভাঙিয়া দিলেন। গোরক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মসজিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুদ্যম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর-নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্তা জেইন খাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত সির্হিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি-মলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে

আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মসজিদ ভাঙিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকররক্তে মসজিদ-ভিত্তি ধৌত করানো হইল। সর্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখমুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এতদিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইল। তার পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইল। সে-সকল কথা পরে হইবে।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীহেমলতা দেবী। মূল্য আট আনা।

বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এত কোমল করিয়াছেন, যে সেই কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতার দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন। তথাপি তাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য এই কোমলতা অত্যাবশ্যক। মাকে কোমলকান্ত করিয়া বিধাতা বলিয়াছেন বাল্যাবস্থায় মাধুর্যের আনন্দচ্ছটা এবং স্নেহের সুধাভিষেকে মানুষ পালনীয়। পীড়ন, শাসন, সংকীর্ণ নিয়মের লৌহশৃঙ্গল তখনকার উপযোগী নয়। খাওয়ানো পরানো সম্বন্ধীয় মানুষ করা চিরকাল এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছে। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন মানুষ-করা ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল অন্নপান নহে বিদ্যাদানেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম সমান আছে। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের পাঠালয় এবং পাঠ্যনির্বাচনসমিতি তাহার নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় শিশু হইয়া জন্মিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইবে এই ভয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মত এই যে, মা মাসি দিদিরাই অন্নপান ও জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সর্বতোভাবে পালন পোষণ করিবেন। তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। বেত্রবজ্রধর গুরুমহাশয় তাঁহাদের স্নেহস্বর্গের অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। ছেলে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠশালায় যায় তখন মাকে কি কাঁদাইয়া যায় না? এই প্রকৃতিদ্রোহী অবস্থা কি চিরদিন জগতে থাকিবে?

সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিত মহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদিগকে শিক্ষা দান তাঁহাদের শিক্ষালাভের একটি প্রধান সার্থকতা। অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন স্কুলে প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসের অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত তাহার ভাষা সরল, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ

এবং ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন-কি, আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার্ উইলিয়ম্ হন্টারের 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।

কিন্তু টেক্সট্‌বুক্ কমিটির খাতিরে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার বইখানিকে যে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করিয়া লিখিতে পারেন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। ইস্কুলে ছেলেদের যে-সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক শুষ্ক তথ্য মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় লেখিকা তাহার সকলগুলি বর্জন করিতে সাহসী হন নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, মোগল রাজত্বের পূর্বে তিনশত বৎসরব্যাপী কালরাত্রে ভারত সিংহাসনে দাসবংশ হইতে লোদিবংশ পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গের যে রক্তবর্ণ উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত কাহারই বা মনে থাকে। এবং মনে রাখিয়াই বা ফল কী? অন্তত এ ইতিহাসে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা থাকিলেই ভালো হইত। নীরস ইংরাজ শাসনকাল সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে আর্য-ইতিবৃত্তের তারিখ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। 'খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন", "ভারতবর্ষে আসিবার একহাজার বৎসর পরে তাঁহারা মিথিলা প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন"— এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।

সিরাজদৌল্লার রাজ্যশাসনকালে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের "সিরাজদ্দৌলা" পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। শ্রীনিখিলরায় প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২ টাকা আট আনা।

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে অথচ কোথাও তাহার জন্য শূন্য স্থান নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টীমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারি দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে— চারি দিকে আপিস ঘর, আদালত ঘর, থানা ঘর মাথা তুলিতেছে, ইংরাজের নূতন চুনকামকরা ফিট্‌ফাট্ ধব্‌ধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে— কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম্ দরবার, নির্বাণদীপ বেগম মহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথ পুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিশ্বাসে দূরস্মৃতি আলোচনায় নিরত হইয়াছে।

নিখিলবাবু তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে সেকাল একালের তুলনা বা ভালোমন্দ বিচারের অবতারণা করেন নাই। তিনি সেই প্রাচীন কালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র আকারে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকদের

সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি যেন নবাবী আমলের ভগ্নশেষের অ্যালবম্‌। চিত্রগুলি সেদিনকার অসীম ঐশ্বর্য এবং বিচিত্রব্যাপারসংকুল মহৎ প্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা এবং গভীর বিষাদের উদ্রেক করিতেছে।

এ প্রকার ঐতিহাসিক চিত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে। নিখিলবাবুর এই সদৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবল একটি নিন্দার বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। নিখিলবাবু যেখানে সরলভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার রচনা অব্যাহত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি অলংকার প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

ঐতিহাসিক চিত্র

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব-উপলক্ষে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না— সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে : কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে! সম্পাদক মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আর-একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য— আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালোরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি

পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক-মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন— 'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ-কাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই তো প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না— সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে— বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (productive এবং unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না; কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়— তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কী বাণিজ্যে, কী সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা

সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনও ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশেও যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক চিত্র
পৌষ ১৩০৫

বিজ্ঞান

সামুদ্রিক জীব

প্রথম প্রস্তাব

কীটাণু

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল। স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চর্তুদিকব্যাপী, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কী মহান, কী গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, কত পর্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় সমুদ্র-বর্ণনাস্থলে যে একটি লোমহর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৪১

'যতই তোমার ভাব, ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কী কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বকে;
কী এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে!

৪৩

কী ঘোর গর্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখ,
কী বিষম ছটফট ধড়ফড় করে;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পুরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত;
আর্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন্ এক অপূর্ব পর্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্বোচ্চ চূড়ায়;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হতে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি— তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখো যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয় নি ব্যাকুল?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আনো ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক ওদের উপরে;
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংসার।'

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ অ্যাল্‌জি (Algæ) নামক উদ্ভিদ পর্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্রগর্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই!

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীরযন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহারাই পৃথিবীর প্রাণীসৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল, অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এইখানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর-এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর-একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোনো পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ-পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ-পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয়তো তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর-এক দল কীটাণু

উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদ-ভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্‌খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণী-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলনশীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এইরূপে আপাতত প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদজীব বা উদ্ভিদ-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়। এবং তাহাদের কোনো কোনো অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা-প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমত ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করিতে বোধহয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা তো জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্তন করে, তাহারা তো জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদজীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণী-জগতের শেষ শ্রেণীর নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদজীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেনহয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাকযন্ত্র নাই, জলজ উদ্ভিদগণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে, নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্ধিত ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে গুটাইয়া আসে ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই-তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibæ) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কী প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে যে, ইহাদের আকৃতি কোনোমতে নির্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কী করিয়া জীবন ধারণ করে? এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোনো একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্বোক্ত জাতীয় আর-এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়, তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির দুই শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবলমাত্র ইহাদেরই দেহে নির্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রের বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চুনের পর্বতগুলি ইহাদের দেহে নির্মিত। যে চা-খড়ির পর্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলন্ডের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্মিত, তাহা ইহাদেরই দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর-এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্বিগ্নি (D'orbigny) তিন গ্রাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই-একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কীরূপে দ্বীপ ও পর্বতসমূহ নির্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা-প্রশাখাবান অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ওই ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা শিকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকাস্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। দুজার্দ্যা (Durjadin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরও শরীরে এ পর্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রে নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই-এক কথা বলা যাউক। বাল্মীকি

সমুদ্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, 'স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতলস্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।' এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখনো ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণসমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের দেহ-নিঃসৃত ফস্‌ফরিয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকামত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কী সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইনফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্তা, এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইনফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে, তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড অপেক্ষা ছয়-সাত গুণ অধিক হয়। মরুপ্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিত-কণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন-কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দমে উর্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন— অনেক উচ্চ পর্বত ইহাদেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র— বিন্দু-জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে— তাহাদের স্তূপে পর্বত নির্মিত হইয়াছে।

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন-কি, স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফসফেট অফ সোডা বা কার্বোনেট অফ সোডা অথবা নাইট্রেট কিংবা অক্সালেট্‌স অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গীগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশ ওই কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন 'আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারই খণ্ডাংশ হয়তো আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু শরীর হইতে এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবনকাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখো, যতদিন পরেই হউক-না-কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর-একটি আশ্চর্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিতভাবে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সে হয়তো তাহার পূর্ব শরীরের ষোড়শ অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি অ্যামোনিয়াসিক্ত একটি পালক ডুবানো যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত-পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভালো জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায় কিন্তু যখনই অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই-সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোনো কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে তাহাতেও লয়বেনহয়েক এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর স্ক্রুর ন্যায় পেঁচালো। ইহারা এমন আশ্চর্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোখ দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোনো কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর-এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মতো একটুতেই ইহারা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহারা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর-এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে, অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র-পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৫

দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ

হর্বর্ট্ স্পেন্সর তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "The use of Anthropomorphism" নামক প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। অগ্রে, তিনি যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ করি, পরে আমাদের যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিব।

স্পেন্সর বলেন মনুষ্য-সমাজে যখন যে ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব থাকে, তখনকার পক্ষে সেই ধর্মমতই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ কথা শুনিলেই হয়তো অনেকে আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন।

মনুষ্য-বিশেষ এবং মনুষ্য-সমাজ উভয়েই গাছের মতো করিয়া বাড়ে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনুষ্যের ধর্মমত, মনুষ্যের রাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ন্যায় অবস্থানুসারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যেরূপ ধর্ম প্রয়োজনীয়, সে সময়ে সেইরূপ ধর্ম আপনাআপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা যাক।

ইহা সাধারণত সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে গেলে, আমরা তাঁহাতে আমাদের নিজত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের মনের ধর্ম। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়। কোনো ধর্মে ইহারই মাত্রাধিক্য দেখিলেই আমাদের ঘৃণা উদয় হয়। যখন শুনা যায়, পলিনেসীয় জাতির ধর্মে তাহাদের দেবতারা মৃত মনুষ্যের আত্মা ভক্ষণ করে, অথবা প্রাচীন গ্রিসীয়দিগের দেবতারা কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই, তখন আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণা উদয় হয়। কিন্তু যদি আমরা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখি, যদি আমরা দেবভক্তদিগের মনোভাব ও সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই ধর্মই সেই অবস্থার উপযোগী, অতএব তাহা নিন্দনীয় নহে।

কারণ, ইহা কি সত্য নহে যে কেবল অসভ্য দেবতাদেরই ভয়ে অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় তাহাদের শাসন বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক, ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক? বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য-বৃত্তিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী হিন্দুরা যে তপ্ত-তৈল-কটাহপূর্ণ নরকে বিশ্বাস করে, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ভালো হয় নাই? এবং এইরূপ নরক সৃষ্টি করিতে পারে এমন নিষ্ঠুর দেবতা থাকাও আবশ্যক, সেইজন্যই তো তাহাদের দেবতারা ফকিরদের আত্মপীড়ন দেখিয়া সুখী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে অসভ্য দেবতাই উপযোগী। আমরা যে ঈশ্বরকে আমাদের নিজ স্বভাবের আদর্শ করিয়াই গড়ি, তাহা আমাদের পক্ষে শুভ বৈ অশুভ নহে।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, যে ধর্ম যে অবস্থার উপযোগী নহে, সে ধর্ম সে অবস্থায় বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোনো মতে টিঁকিতে পারে না। অসভ্য দেশে খৃস্টান ধর্ম নামেমাত্র খৃস্টান ধর্ম, অসভ্যদিগের প্রাচীন ধর্ম তাহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে থাকে।

স্পেন্সরের মত উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

স্পেন্সরের প্রথম যুক্তি এই— মনুষ্য দেবতাকে নিজের আকার দিয়া পূজা করে অতএব, মনুষ্যেরও যেরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে, দেবতারও সেইরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। মনুষ্য যখন ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ থাকে, মনুষ্য যখন দয়াবান হয়, তখন তাহাদের দেবতারাও দয়াবান হয়, ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি জাতির দেব চরিত্রে বা ধর্মে যত দিন গর্হিত আচরণের উল্লেখ থাকিবে, ততদিন জানা যাইবে যে, সে জাতির স্বভাবও গর্হিত।

স্পেন্সরের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, 'যেমন মানুষ, তেমনি দেবতাই তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী।' তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল ধর্মই স্ব স্ব ভক্তের নিকট উপযোগী। কারণ পূর্বেই প্রমাণ হইয়াছে, মানুষ স্বভাবতই নিজেরই মতো করিয়া দেবতা গড়িয়া লয়, এখন যদি প্রমাণ

হয়, সেইরূপ দেবতাই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী, তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে, সকল জাতিরই নিজের নিজের ধর্ম নিজের নিজের পক্ষে উপযোগী। স্পেন্সর ধর্মের উপযোগিতা কাহাকে বলিতেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। দুষ্কর্ম হইতে বিরত করিয়া রাখাই ধর্মের উপযোগিতা।

স্পেন্সরের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যত দিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে, তত দিনই সে টিকিতে পারে, তাহার উর্ধ্বে নহে। অতএব জাতিবিশেষের স্বভাব যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্ম অনুপযোগী হইয়া পড়ে, অতএব আপনাআপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পূর্বে যদি নূতন ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে যাও, তবে তাহা স্থান পায় না।

স্পেন্সর যে বলিতেছেন, যে, মনুষ্যেরা যখন নিজে ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ হয়, তাহাদের নিজের যে-সকল দুষ্প্রবৃত্তি থাকে দেবতাদিগের প্রতিও তাহাই আরোপ করে, তাহা নিতান্ত অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ যুক্তি। যদি এমন হইত, মনুষ্য সর্বতোভাবে নিজের মন হইতেই দেবতা কল্পনা করিত, বাহ্য-জগতের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত দেবতা-কল্পনার কোনো যোগ না থাকিত, তাহা হইলে স্পেন্সরের কথা সত্য হইত। কিন্তু তাহা তো নহে। ধর্মের শৈশব অবস্থায় মনুষ্যেরা বাহ্য প্রকৃতির এক-এক অংশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। তখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, সকলই দেবতা। যদি কোনো ভক্ত অগ্নিকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহার নিজের স্বভাব নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার দেবতাকেও নিষ্ঠুর করিয়াছে, যদি কেহ বায়ুকে কোপন-স্বভাব কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে নিজে কোপন-স্বভাব। সে যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিকাশ করিয়া কুটির, গ্রাম, বন, ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, সে তখন নিজে দয়ালু হইলেও অগ্নিকে নিষ্ঠুর দেবতা সহজেই মনে করিতে পারে। বাহ্য জগতে সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু দুইই আছে অতএব যাহারা বাহ্য-জগতের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা কতকগুলি দেবতাকে স্বভাবতই নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে। বিশেষত অসভ্য অবস্থায় পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যু, অতএব সে অবস্থায় নির্দয় দেবতা কল্পনা কেবলমাত্র মনের উপরেই নির্ভর করে না। অতএব আমি দয়ালুই হই, আর নিষ্ঠুরই হই, অগ্নির ধ্বংসশক্তিকে যতদিন দেবতা বলিয়া মনে করিব, ততদিন তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির স্বভাবের পরিবর্তন হইবে না তো। অতএব দেবতায় হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না। আমাদের শাস্ত্র হইতে ইহার শত শত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার নিজ কন্যার প্রতি আসক্তির বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ ঘৃণিত আচরণ আর্যদিগের মধ্যে কখনোই প্রচলিত ছিল না, তবে এরূপ অসংগত কল্পনা কী করিয়া প্রাচীন আর্যদের হৃদয়ে উদিত হইল?

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— প্রজাপতি নিজের দুহিতা আকাশ অথবা উষাকে দেখিয়া তাহার সহিত সংগত হইলেন। দেবতাদের চক্ষে এ আচরণ পাপ, অতএব তাঁহারা কহিলেন, যিনি নিজের দুহিতা ও আমাদের ভগ্নীর প্রতি এরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপ করেন, অতএব তাঁহাকে বিদ্ধ করো। রুদ্র তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।— আমাদের বোধ হয় ইহা উষার প্রতি কুজ্ঝটিকা-আক্রমণের রূপক। কারণ ভাগবত পুরাণের এক স্থলে আছে— পিতার অধর্মে মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র মুনিগণ মরীচিকে পুরোভাগে লইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন, 'তুমি যে আত্মদমন না করিয়া নিজ-দুহিতাগামী হইয়াছ, এমন পূর্বেও কখনো কৃত হয় নাই, এমন পরেও কখনো কৃত হইবে না। হে জগদ্গুরু, যাহাদের অনুসরণ করিয়া লোকে ক্ষেম প্রাপ্ত হয় এমন তেজস্বীদের পক্ষে এ কার্য কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে।' নিজের সন্তানদিগকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া প্রজাপতি লজ্জিত হইলেন ও নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘোর দেহ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ও তাহাই পণ্ডিতেরা অন্ধকার নীহার বলিয়া জানেন।

ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা উষার পরিবর্তে বাণী রহিয়াছে, আমরা উভয়কে মিলিত করিলাম। উপরে যাহা উদ্‌ধৃত হইল তাহাতেই দেখা যাইবে, ব্রহ্মার পাপাচরণ আর্যদিগের দ্বারা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিন্দনীয় হউক বা না হউক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, কুজ্ঝটিকা বলপূর্বক উষাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য ঘটনা-স্বরূপ।

গ্রীসীয় পুরাণে কোনো দেবতা যদি নিজের কুটুম্বকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি এই যে, গ্রীসীয়গণ এমন অসভ্য ছিল যে, কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করিত, অথবা কুটুম্ব মাংসে ভক্ষণ করা অন্যায় মনে করিত না? রজনী ও প্রভাত সম্বন্ধে এক সমস্যা শুনিয়াছিলাম, যে, জন্মাইয়া মাকে সন্তান খাইয়া ফেলিতেছে। উপরি-উক্ত গ্রীসীয় কাহিনীও কি সেরূপ কোনো একটা রূপকমূলক হইতে পারে না? যদি ইহা সত্য হয় যে, গ্রীসীয়গণ কুটুম্বকে ভক্ষণ করিত না ও কুটুম্ব ভক্ষণ করা পাপ মনে করিত, তবে তাহাদের দেবতাদের কেন কুটুম্ব মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিল। যদি বল, অসভ্য অবস্থায় এককালে হয়তো গ্রীসীয়গণ আত্মীয়দিগকে উদরসাৎ করিয়া অধিকতর আত্মীয় করিত, সেই সময়েই উক্ত কাহিনীর আরম্ভ হয়— তবে, যখন সভ্য অবস্থায় গ্রীসীয়দের সে বিষয়ে মত ও আচরণ পরিবর্তিত হইল, তখন তাহাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হইল না কেন?

মানুষেরা যে-সকল কার্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুষ্ঠান করে না ও যে-সকল কার্যকে নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করে, সে-সকলও যদি তাহাদের দেবতায় আরোপ করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তাহারা নিজের গুণ-দোষগুলিই দেবতায় আরোপণ করে?

অবস্থানুসারে সকল ধর্মই উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিতে গিয়া স্পেন্সর বলিতেছেন, 'ইহা কি সত্য নহে যে, কেবল অসভ্য দেবতাদের ভয়েই অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয়, তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।' স্পেন্সরের এ কথাটাও সর্বাঙ্গীণ সত্য নহে। ধর্মের একটা অবস্থা আছে, যখন কার্যসিদ্ধির জন্য, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও স্বভাবত অনিষ্টকারী দেবতাদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য দেব-আরাধনা করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। চুরি করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, খুন করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, কার্যসিদ্ধি হইবে। শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়াছে, দেবতার পূজা করিলাম, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। ওলাবিবি, শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করি, নহিলে তাহারা আমার অনিষ্ট করিবে। এরূপ অবস্থায় দেবতারা যতই নিদারুণ হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য তাহারা কিছুমাত্র উপযোগী নহে। বরঞ্চ দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক ও দুষ্কর্মের সহায়। কালীর উপাসনা করিয়া ও কালীর নিকট নরবলি দিয়া দস্যুদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তির কি কিছু উপশম হয়? তাহারা কি তাহাদের দুষ্কর্মে দ্বিগুণ বল পায় না? অন্য শত সহস্র বাহ্য কারণ হইতে দস্যুদের স্বভাব পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু যুগযুগান্তর কালী পূজা করিয়া আসিলে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বর্ধিত হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। তবে দেবতা নিদারুণ হওয়াতে উপাসকের দুর্দান্ত ভাবের দমন হইল কই? বরঞ্চ সে আরও স্ফূর্তি পাইল। সমাজের যখন কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, যখন, দেবতাদের কতকগুলি শুভ আদেশ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও সেইগুলি লঙ্ঘন করিলে দেবতার কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তখন স্পেন্সরের কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজের অনেক উন্নতির ফল। এখনও শত শত লোক চারি দিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেবলমাত্র বিপদ-সম্পদের জন্যই দেব-আরাধনা করে, তাহারা অন্যায় মকদ্দমা জিতিবার জন্য, নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার জন্য দেবতার পূজা করে ও একবার মনেও করে না যে, দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই দেবতার প্রসাদ

প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা তিন সন্ধ্যা দেবতার পূজা করিতে ভোলে না, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অসংকোচে শত সহস্র পাপাচরণ করে। পূজার একটা ফুল কম পড়িলে, একটা সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহারা সশঙ্কিত হইয়া উঠে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে কিছু মনেই করে না! দেবতার নিকট রক্তপাত করিয়া ও দেবতার নিকট মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহাদের স্বভাবের কি উন্নতি হইতে পারে?

এইস্থলে হর্বার্ট স্পেন্সর একটি গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

'Certainly, such conceptions as those of the Greeks, who ascribed to the personages of their Pantheon every vice, are repulsive enough. But... the question to be answered is, whether these beliefs were beneficent in their effects on those who held them.'

এই-সকল বিশ্বাস যে উপাসকদিগের পক্ষে যথার্থ হিতসাধক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, অসভ্যদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় ততই তাহাদের শাসন কঠোর হওয়া আবশ্যক। এবং শাসন কঠোর হইতে গেলেই শাসনকর্তা দেবতাদিগকেও নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্পেন্সরের যুক্তির পক্ষে আবশ্যক, ততটুকুই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশটুকু গোপন করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাই কিছু একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তি (Vice) নহে। দেবতা নিষ্ঠুর না হইতেও পারে, দেবতা যদি চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ শঠ হয়, দেবতা যদি মিথ্যাবাদী ভীরু হয়, তাহা হইলে সে দেবতা উপাসকের কী হিতসাধন করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি! সকল দেবতারই যদি উপযোগিতা থাকে এমন মত হয়, তবে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কী? সমস্ত ছাঁটিয়া এই দাঁড়ায় যে, স্পেন্সরের মতে অসভ্য অবস্থায় নিষ্ঠুর দেবতারই উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ কথাও সর্বতোভাবে সত্য নহে। সমাজের এমন অবস্থা আছে, যখন দেবতা যতই নিষ্ঠুর হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হইতে থাকে বৈ হ্রাস পায় না। যদি বল, সে সময়ে তাহাদের নিজ ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম তাহাদের নিকট টিকিতে পারে না, অতএব সেই ধর্মই তাহাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব ধর্ম ও সেই হিসাবে উপযোগী ধর্ম, তবে আমরা বলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? স্পেন্সর যে একমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকটে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, ফিজি দ্বীপবাসী ভেওয়া খৃস্টান অনুতাপীগণ আত্মার অশান্তিবশত অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে; চেতনা লাভ করিয়া তাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পেন্সর কহিতেছেন, ফিজি দ্বীপবাসীগণ নিতান্ত অসভ্যজাতি। তাহারা মানুষ খায়, শিশু হত্যা করে, নরবলি দেয়। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই। তাহারা সর্পের পূজা করে। দেখা যাইতেছে, তাহারা খৃস্টান হইয়া খৃস্টান ধর্মের প্রতিহিংসা, অনন্ত যন্ত্রণা ও শয়তান-তন্ত্রটুকুই বাছিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্তই তাহারা ভয়ে আর্তনাদ করে। তাহাদের সেই পুরাতন সর্প-উপাসনাই খৃস্টান ধর্ম নাম ধারণ করিয়াছে মাত্র। উন্নততর ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভেওয়া খৃস্টানগণের যে কিছু উন্নতি হয় নাই, উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে তাহার কিছু প্রমাণ হয় না।

যদি এমন যুক্তি প্রয়োগ কর যে, যতদিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে ততদিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে, অতএব যে ধর্ম যে দেশে টিকিয়া আছে, সে ধর্ম সে দেশের উপযোগী। তবে সে সম্বন্ধেও আমাদের দুই-একটি কথা আছে।

মনুষ্য স্বভাবে উভয়ই আছে, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। আবশ্যকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তন যে হইয়াই থাকে তাহা নহে। মনুষ্য স্বভাবে কেন, সমস্ত জগতেই এই নিয়ম। প্লায়োসিন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ে যে অঙ্গুলির অসম্পূর্ণ আরম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহার কোনো কাজে লাগে না, উপযোগিতার নিয়মানুসারে তাহা কেন

ধ্বংস হইল না? স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষ জাতিরও স্তন আছে, এমন-কি, তাহাদের 'mammary glands' পর্যন্ত বর্তমান আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেক পুরুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ জীবেরা যে কোনো কালে শাবকদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত যদি পুরুষ মানুষ সন্তানকে স্তন দান করিয়া না থাকে তবে এই অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গ কেন পুরুষ শরীরে বর্তমান রহিল?

উপাধ্যায় হেকেল বলেন, জীবিত প্রাণীদিগের মধ্যে দুই প্রকারের উদ্যম আছে; এক কেন্দ্রানুগ (centripetal) যাহাতে করিয়া তাহাদের বংশপরম্পরাগত বিশেষত্ব রক্ষা করে; আর এক কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) যাহাতে করিয়া বাহ্য অবস্থার অনুকূল করিয়া তাহাদের পরিবর্তন সাধন করে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে অনেক অনাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিয়া যায়। "The Genealogy of Animals" নামক প্রবন্ধে উপাধ্যায় হক্সলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

'I think it must be admitted that the existence of an internal metamorphic tendency must be as distinctly recognized as that of an internal conservative tendency; and that the influence of conditions is mainly, if not wholly, the result of the extent to which they favour the one, or the other, of these tendencies.'

এই নিয়ম ধর্ম সম্বন্ধেও খাটে। যদি স্বীকার করা যায়, যে অসভ্য অবস্থায় দুর্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, যত দিন পর্যন্ত কোনো জাতির সেই নরকে বিশ্বাস বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই যে, তাহাদের সেই অসভ্য অবস্থা ও দুর্দান্ত হৃদয় আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহা নহে। অবস্থা-বিশেষে একটা বিশ্বাসের জন্ম হইলে অবস্থার পরিবর্তনে যে সেই বিশ্বাসের ধ্বংস হয় তাহা নহে। বিশেষত স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস শীঘ্র ধ্বংস হইবার কোনো কারণ নাই। তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের প্রতিকূল অবস্থাবিশেষ কিছুই বর্তমান নাই। অতএব একবার যাহা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা পুনশ্চ ভাঙিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকের উল্লেখ করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সর হিন্দুদিগকে বিশ্বাসঘাতক, চৌর, মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহাই যদি হইল, তবে আমরা খৃস্টানদিগকে কী না বলিতে পারি! আমাদের শাস্ত্রে অনন্ত যন্ত্রণা নাই। যাহাদের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, না জানি তাহাদের স্বভাব কী পৈশাচিক হইবে! আসল কথা এই বিশ্বাসকে মানুষেরা উপযোগিতার চক্ষে দেখে না। 'আবশ্যক হইয়াছে, অতএব, আইস আমরা বিশ্বাস করি' এমন করিয়া যদি লোকে বিশ্বাস করিত, 'আবশ্যক চলিয়া গিয়াছে, অতএব আইস আমরা বিশ্বাস করিব না' এমন করিয়া যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে সমস্তই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইত। একবার যাহা বিশ্বাস হয়, সে বিশ্বাস অনেক কাল চলিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করি। কোনো রাজ্যে এক জনের দোষে যদি আর-একজনকে শাস্তি দিবার প্রথা থাকে তবে সে প্রথাকে কে না নিন্দা করিবে? ন্যায়পরতার যে ভাব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে, তাহার সহিত উক্ত রূপ বিচারের ঐক্য হয় না। কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত খৃস্টের মৃত্যু ঘটনাকে খৃস্টানেরা কেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতার প্রমাণ স্বরূপেই উল্লেখ করেন? তাঁহারা নিজে যাহা করেন না, অন্যকে যাহা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন, তাহাকেই ন্যায়পরতা বলিয়া ১৮০০ বৎসর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কীরূপে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে বিশ্বাস কীরূপে চলিয়া আসে? ইংরাজেরা অনেকে যে বিশ্বাস করেন যে, এক টেবিলে ১৩ জন খাইলে তাহাদের মধ্যে ১ জনের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অনেকবার হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন তথাপি তাহা যায় না কেন?

অবশেষে জিজ্ঞাসা করি, গরিব হিন্দুদিগের প্রতি কেন যে নানাবিধ রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কি একটা কারণ আছে? কুম্ভীপাক নরকের কথা পড়িয়াই কি স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী? না, উহা একটা জানা সত্য, ও বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি বা দ্বিমত হইতে পারে না? হিন্দুরা যে বিশ্বাসঘাতক, চোর ও মিথ্যাবাদী সেইটে আগে প্রমাণ করিয়া তার পরে কুম্ভীপাক নরকের কথা তুলিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিলে ঠিক ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হইত।

স্পেন্সর বলিয়াছেন, হিন্দুদের কঠোর নরক আছে, অতএব নিষ্ঠুর দেবতাও আছে। দেবতারা যে নিষ্ঠুর, তাহার প্রমাণ কী? না, তাহাদের ফকিরেরা আত্মপীড়ন করে। যে দেবতারা কষ্ট দেখিয়া সুখী হয়, তাহারা অবশ্য নিষ্ঠুর। প্রথমত, ফকিরেরা হিন্দু নহে। দ্বিতীয়ত, অনেক হিন্দু দেবতার নিকট আত্মপীড়ন করিয়া থাকে বটে (যেমন তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দেওয়া ইত্যাদি) কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহাদের দেবতা নিষ্ঠুর। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য। আমাদের দেশে অনেক ভিক্ষুক আছে, তাহারা হত্যা দিয়া ভিক্ষা আদায় করে। তাহার কারণ এমন নহে যে ভিক্ষাদাতারা কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া ভিক্ষুককে পুরস্কার দেন। মনুষ্যের পরকষ্ট-অসহিষ্ণুতার প্রতি ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুকদের এমন বিশ্বাস আছে যে তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেকে পীড়ন করে। দেবতার দয়ার প্রতিও হিন্দু উপাসকের তেমনি বিশ্বাস। সে জানে যে, আমি যদি নিজেকে এতখানি কষ্ট দিই, তবে দয়াময় কখনোই সহিতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই আসিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি আমাদের তপস্বীদিগকে স্পেন্সর ফকির বলিয়া থাকেন তবে সে সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে দেহকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তপস্বীরা যে ঐহিক সুখ ও আরাম হইতে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে বঞ্চিত করিতেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহার মর্ম হয়তো ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে স্পেন্সরের ভ্রম বদ্ধমূল। এ ভ্রম কেবলমাত্র যে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার *Data of Ethics* নামক গ্রন্থে স্পেন্সর ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছেন।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৯

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

আমরা তো জানিতাম, আমাদের দেশেই যত বিশ্বের মশা। শীতের দেশে মশার উৎপাত নাই। সে কথাটা ঠিক নহে। মেরু প্রদেশের আলাস্কা নামক শীতপ্রধান স্থানে মশার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। একজন লিখিয়াছেন— এখানে পশুপক্ষী শিকার করা দায়, ঘন মশার ঝাঁক মেঘের মতো উড়িয়া লক্ষ্য আচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো মশায় সেখানকার কুকুর মারিয়া ফেলে। সোয়াট্‌কা সাহেব লিখিতেছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন মশায় সেখানকার বৃহৎ ভল্লুককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভল্লুক মশা-সমাচ্ছন্ন জলাপ্রদেশে গিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া দুই পা দিয়া মশার ঝাঁকের সহিত যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মশার গায়ে তাহার বড়ো বড়ো নখের একটি আঁচড়ও পড়ে না, এবং মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না। অবশেষে মশার দংশনে অন্ধ হইয়া ভল্লুক পড়িয়া থাকে, ও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শীতপ্রধান মেরুদেশে মশার যেমন প্রবল প্রতাপ এমন আর কোথাও নহে। জাহাজে করিয়া যাঁহারা মেরুদেশে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। যেখানে যেখানে জাহাজ থামে সেইখানেই মশার পাল আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করে— জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রক্ত-শোষণ করিতে থাকে। জাহাজ হইতে নামিয়া দুইজন বীরপুরুষ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাহার একজন জর্মন্ সেনা। ইনি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহণে বীরপরাক্রমে ফ্রান্স পর্যটন করিয়াছিলেন,

কোনো বিপদ হয় নাই; কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে ঘোড়া হইতে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া যান। মশার জ্বালায় ঘোড়া এবং আরোহী এমনই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আত্মসংযমন উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সৈন্য জাহাজে আসিয়া গল্প করিলেন— 'পেটের মধ্যে মশা যায়, নিশ্বাস টানি নাকে মশা ঢোকে, থু থু করিয়া মুখের মধ্য হইতে মশা ফেলিয়া দিতে হয়।' সে দেশে গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব বরঞ্চ কিছু কম থাকে, কারণ পাখিরা আসিয়া অনেক মশা খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত পাখি আছে, মশাও তো কম নাই।

জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোনো জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ককাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ, চতুর্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।

যুদ্ধে বন্দুকের গুলি কত যে বৃথা খরচ হয়, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এক-একটি সৈন্য মারিতে ১৩০০ গুলি খরচ হইয়াছে। সল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে প্রত্যেক সৈন্য বধ করিতে ৪২০০ গুলি লাগিয়াছে।

অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও ক্রমাগত তরঙ্গিত বিচলিত হইতেছে; ভূপৃষ্ঠে জোয়ারভাটা খেলিতেছে। কোথাও বা বড়ো ঢেউ কোথাও বা ছোটো ঢেউ উঠিতেছে। পৃথিবীর তরঙ্গসংকুল দেশের মধ্যে জাপান একটি প্রধান স্থান। সেখানে ছোটো বড়ো ঢেউ ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। আমাদের এখানে এতটা ঢেউ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যে স্থির আছে তাহা নহে। সমুদ্রে দাঁড় ফেলিলে সমুদ্রের জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, রাস্তা দিয়া গাড়ি প্রভৃতি চলিলে ভূতল তেমনি কাঁপিতে থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই ভূ-তরঙ্গ সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার-সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল, প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে, অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে, সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন একরকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন নড়িতে থাকে, মাকড়সার বিচ্ছিন্ন পাও তেমনি নড়িয়া থাকে। কোনো শত্রু আসিয়া পা ধরিলে মাকড়সা অনায়াসে পায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার পা খসাইয়া ফেলে। দুই-একটা পা গেলেও তাহাদের বড়ো একটা ক্ষতি হয় না— অনায়াসে ছুটিয়া চলে।

বিলাতের উদ্যানকারদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেখানে বিলাতি বেগুনের গাছ রোপণ করা হয় সেখানে পোকামাকড় আসিতে পারে না। যে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা আছে তাহার চারি পাশে বিলাতি বেগুন রোপণ করিয়া গাছকে রক্ষা করা যায়। এটা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

পণ্ডিতবর টাইলর সাহেব বলেন— পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উদ্ভিদদের কার্যেও কতকটা যেন স্বাধীন বুদ্ধির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ নিতান্ত যে জড়যন্ত্রের মতো কাজ করে তাহা নহে, কতকটা যেন বিচার-বিবেচনা করিয়া চলে। টাইলর সাহেব এই বিষয় লইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন কৃত্রিম বাধা স্থাপন করিলে গাছেরা তাহা নানা উপায়ে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, এমন-কি, নিজের সুবিধা অনুসারে পল্লব সংস্থানের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে নারাকাল ও আলেপিতে যে বন্দর আছে, সেখানে সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। চারি দিকে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা উপপ্লব তখনও এ বন্দর দুটির শান্তিভঙ্গ হয় না। ইহার একটি কারণ আছে। ইংরাজিতে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তেল ঢালিলে তাহা শান্ত হয়। অনেকে তাহা অমূলক মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তেল ঢালিলে জলের ঢেউ থামিয়া যায়। কিছুদিন হইল একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রত্যেক জাহাজে প্রচুর পরিমাণে তৈল রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; ঝড়ের সময় অল্পে অল্পে সেই তৈল জাহাজের দুই পার্শ্বে ঢালিতে হইবে। নারাকাল এবং আলেপি বন্দরের সমুদ্রতল হইতে ক্রমাগত পেট্রোলিয়ম তৈল উত্থিত হইতেছে। কালিফর্নিয়াতীরের নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে। সেখানকার সমুদ্রও শান্ত থাকে।

আমেরিকার শিল্পী ও মজুরদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিদ্যাচর্চা প্রচলিত আছে এইজন্য সেখানকার হাতের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌-এ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দুইশো লোকের মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। একমাত্র মাসচুসেট্‌স্‌ প্রদেশে দুই হাজার পুস্তকালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আটশত লোকের মধ্যে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। অনেকে মনে করেন বিদ্যাশিক্ষায় শিল্পকাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বিদ্যাশিক্ষায় সকল কাজেরই সহায়তা করে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে জর্মনদের যে জিত হইল তাহার একটা প্রধান কারণ তাহারা শিক্ষিত— এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকতর নিপুণতা লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, যাহাদের এক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ তাহাদের অন্য ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু এ কথা সকল স্থানে খাটে না। দেখা গিয়াছে যাহারা বধির তাহারাই অধিকাংশ অন্ধ এবং যাহারা অন্ধ তাহারাই অধিকাংশ বধির।

কার্বনিয়ে নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত বলেন যে, গঙ্গার নিকটবর্তী জলাশয়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, তাহারা পাখির ন্যায় জলে নীড় প্রস্তুত করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত। ইহারা জলের মধ্য হইতে একপ্রকার উদ্ভিদ মুখে করিয়া জলের

উপরে রাখে, পুনর্বার তাহা জলমগ্ন না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহারা মুখ হইতে বায়ু নির্গত করিয়া জলবুদ্‌বুদের উপর তাহা ভাসাইয়া রাখে। পরদিন সেই গাছের মধ্যে জলবুদ্‌বুদ পুরিয়া দেয় এবং তাহা গোলাকারে পরিণত করে। পুরুষ মৎস্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়িতে আহূত হয়। ডিম পাড়িয়া সে তো প্রস্থান করে, পুরুষ মৎস্য সেই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করে। এইরূপে দশ দিবস যায়। ডিম ফুটিয়া গেলে সে সেই নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুটা করিয়া জলবুদ্‌বুদ কতকটা বাহির করিয়া দেয়। তখন তাহা আর গোলাকার থাকে না, প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আমরা তো গঙ্গার কাছাকাছি থাকি, কিন্তু এ মাছটি যে কী মাছ তাহা তো ঠিক জানি না। গঙ্গাতীরবর্তী পাঠকেরা কি এই মাছের কোনো খবর রাখেন?

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়

আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মতো আছে তাহার বিশেষ কার্য কী এ পর্যন্ত ভালোরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই-এক জন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কী করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোনো ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনোরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না— পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিংবা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। এক- প্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাত হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্‌ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চ-নীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেই প্রকার তরলদ্রব্য আছে, সম্ভবত তাহা আমাদের গতিপরিবর্তন অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

ইচ্ছামৃত্যু

শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য নাই। পরিপাক রক্তচলাচল প্রভৃতি কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছা করিলে চোখের পাতা বুজিতে পারি কিন্তু কান বুজিতে পারি না। সীল মৎস্য জলে ডুবিবার সময় স্বেচ্ছামতো নাক কান বুজিতে পারে। আমাদের নাসা ও কর্ণ রুদ্ধ করিবার মাংসপেশী আছে কিন্তু তাহারা প্রায় অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে— দুর্গন্ধ অনুভব করিলে আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে পারি বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু দৈবাৎ এক-এক জন লোক পাওয়া যায় যাহারা জন্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে কান

দুলাইতে পারে, মাথার উপরকার চর্ম নাড়াইতে পারে। গোরু জাবর কাটিতে পারে মানুষের পক্ষে তাহা অসাধ্য, কিন্তু অনেক লোক ইচ্ছা-মাত্র অনায়াসে বমন করিতে পারে, দৈবক্রমে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উপর তাহাদের কর্তৃত্ব জন্মিয়াছে। সকলেই জানেন আমাদের কতকগুলি স্নায়ু আছে যাহারা আমাদের ইচ্ছার হুকুম তামিল করে। ইচ্ছা হইল হাত তুলিব অমনি স্নায়ুযোগে সেই হুকুম হাতের মাংসপেশীর উপর জারি হইল, হাত উঠিল। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, শরীরের সর্বত্র এই ইচ্ছাদূতের গতিবিধি নাই; দৈবাৎ শরীরসংস্থানের কোনোরূপ বিপর্যয়বশত এই ইচ্ছা-প্রচারী স্নায়ুর অস্থানে সঞ্চার হইয়া মানুষের অসাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্মিতে পারে। সাধারণত ইচ্ছামাত্র শরীরক্রিয়া নিরোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার এক আশ্চর্য উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। কর্নেল টাউনশেন্ড নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন। প্রথমে ডাক্তাররা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্নেল সাহেব চিত হইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাড়ী কমিয়া হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া আসিল; অবশেষে জীবনের কোনো লক্ষণ রহিল না। ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। কিন্তু আবার আধঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার নাড়ী ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ করিল, তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মাংসপেশীর উপর তাঁহার স্বেচ্ছাস্নায়ুর অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আধঘণ্টাকাল শরীরক্রিয়া রোধ করিয়া কীরূপে প্রাণরক্ষা হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়। কিন্তু যোগী ও রোগীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগী সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন রোগী দেহযন্ত্রের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিক্রমে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব

পৌরুষ সম্বন্ধে স্ত্রী-মাকড়সার সহিত পুরুষ-মাকড়সার তুলনাই হয় না। প্রথমত, আয়তনে মাকড়সার অপেক্ষা মাকড়সিকা ঢের বড়ো, তার পর তাহার ক্ষমতাও ঢের বেশি। স্বামীর উপর উপদ্রবের সীমা নাই, তাহাকে মারিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া দেয়। এমন-কি, অনেক সময় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া খাইয়া ফেলে; এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ।

উটপক্ষীর লাথি

নীড় রচনার সময় এই মরুবিহারী বিরাট পক্ষী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। নিকটে মানুষ দেখিলে ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে, পা দুলাইয়া দুলাইয়া এক প্রচণ্ড লাথি কসাইয়া দেয়। এই এক লাথির চোটে অশ্বের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে শুনা যায়। এই পাখির আক্রমণ হইতে ছুটিয়া পালানো অসম্ভব। দ্রুতবেগে ইহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সহিষ্ণুভাবে ইহার লাথি সহ্য করাই একমাত্র গতি। একজন এইরূপ পাখির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সবলে তাহার গ্রীবা ভূমিতে নত করিয়া ধরিয়াছিল। দৈবক্রমে পাখির লাথি নিজেরই নতমস্তকের উপর পড়িয়া আপনার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল এবং সেই লোকটি বিনা আঘাতে পরিত্রাণ পাইল।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

জীবনের শক্তি

আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি আমাদের শরীরের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; তাহাতে যে কী বিপুল শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

আমাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোটরে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশ স্যাকরার হাপরের মতো সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। দিনরাতি এ কাজের আর বিশ্রাম নাই। এইটুকু চর্মযন্ত্রের পক্ষে কাজও নিতান্ত সামান্য নয়। রক্তসঞ্চারী কোটরদ্বয়ের বাম কোটরটি প্রত্যেক সংকোচনে চার আউন্স রক্ত নয় ফুট দূরে উৎসারিত করে। দক্ষিণ কোটরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু তাহাকেও খাটিতে হয়। সুস্থশরীর বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫/৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্তসঞ্চালনক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তিদ্বারা তিন হাজার মণের অধিক (১২০ টন) ভার এক ফুট উর্ধ্বে তুলা যাইত।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ অবিশ্রাম চলিতেছে তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও বিরাম নাই। তাহাতে করিয়া বক্ষস্থল ক্রমাগত উঠিতেছে পড়িতেছে এবং বুকের পাঁজরা মাংসপেশী এবং ফুসফুস সেই উত্থান-পতনের কার্যে লাগিয়া রহিয়াছে। বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রমকালে সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে। এতটা বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণ বড়ো সামান্য কাজ নহে। তাহা ছাড়া ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর এই বাতাস বাধা দেয় এবং মাংসপেশীর বলে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের শ্বাসসাধক মাংসপেশী যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহার দ্বারা ২০০ মণের অধিক ভার (২১ টন) এক ফুট উর্ধ্বে তুলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ, পাকযন্ত্রের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া বাকি আছে, সে-সমস্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন আলস্যেও কী প্রচুর শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা তো কেবল চব্বিশ ঘণ্টার হিসাবের কিঞ্চিদংশ দেখিলাম। একজন মানুষের সমস্ত জীবিতকাল আলোচনা করিলে জীবনের শক্তি যে কী অপরিমেয় তাহা বুঝা যায়।

ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা

সার এডমন্ড হর্নবি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমায় যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্নবি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্বমতো প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতক বা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্নবির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না

করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্নবি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষত হর্নবি সাহেব একটি বড়ো আদালতের বড়ো জজ— প্রমাণের সত্য-মিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার চারি মাস পরে 'নর্থ চায়না হেরাল্ডে'-র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমতো প্রতিবাদ করেন।

১। হর্নবি সাহেব বলেন, বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্নবি তাঁহার সহিত একত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্নবি নামক কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্নবি সাহেবের প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে গত হন এবং ঘটনার চারি মাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্নবি সাহেব ইন্‌কোয়েস্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক 'করোনার' সাহেবের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইনকোয়েস্ট বসে নাই।

৩। হর্নবি সাহেব ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনে কোনো রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্নবি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে। এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮/৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার হর্নবি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা এক প্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানব শরীর

যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অণুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্মিত। কেবল মানবশরীর নহে উদ্ভিদ প্রভৃতি যে-কোনো জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম ব্যতীত আর কোনো পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্বদা কার্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক-একটি কোষ নির্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘনীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্মাণ করিতেছে, শরীরের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্যের ভাগ আছে, পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্যই প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই-সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা জোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্মাণ করিতেছে— আরও কতক সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে-সকল জীব-কোষে নির্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গবর্তী কোষের এইরূপ কার্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে-সকল কোষে নির্মিত তাহারা শরীরের সর্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্যে নিযুক্ত।

অতএব মানবশরীরটা একটা সমাজের মতো। অসংখ্য প্রজার ঐক্যসমষ্টি। একটা সৈন্যের দল যেমন অশ্বারোহী পদাতি প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক অংশে নানা লোকের সমষ্টি অথচ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ প্রাণীর মতো অতিশয় সংহত ঐক্য রক্ষা করিয়া চলে; কতকগুলি মরিতেছে আবার নূতন লোক আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে— মানবের জীবিত শরীর অবিকল সেইভাবে কাজ করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র, এমন-কি তাহার চেয়ে ঢের বেশি।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য

জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ এ কথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। সকলেই জানেন গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায়, এই জীবাণুই তাহার কারণ। এই জীবাণুবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনো লেখক বলেন, এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্টিরিয়া নামক জীবাণু লন্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত প্যাস্টর্ এই জীবাণুকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একদলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, এবং অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন-বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ

কিছুই নাই। সেখানে হয় বালুকাময় মরুভূমি নয় অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোনো মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোনো উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন একসময়ে গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বড়োই ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্যাস্টর অন্য কর্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যাস্টর ডাক্তার নহেন, জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়নশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি— মদ কী করি গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং প্যাস্টরও এই কার্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ ও প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এত অদৃশ্য শত্রু অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্বর্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইলসন সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই, আসলে, বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিত কণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিত বর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকটে রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে— অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিত কণাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ওই লোহিত কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের একভাগ। গতসংখ্যক সাধনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণীপিণ্ডের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছাক্রমে রক্তবহ নাড়ি ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় অ্যামিবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার নাম 'ফ্যাগোসাইট' অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম 'লিউকোসাইট' বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কীরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার ল্যাজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ি ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেতকোষ দলে দলে তাহার ল্যাজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতরো মনঃসংযোগপূর্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কা লোপ পায় সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে-সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক-সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্মরণ হইতেছে, অন্যত্র কোনো প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছি কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে-কোনো পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হয় এই সর্বভুকগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুকরা বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে— চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈন্যকণিকাগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া সে স্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পুঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজগুলিকে ইহারা চারি দিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক, বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্রসূর্যকে কেন বড়ো দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনার কোনো পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রক্টর ও র‍্যানিয়ার্ড সাহেবের রচিত 'ওল্‌ড্‌ অ্যাণ্ড্‌ নিয়ু অ্যাস্ট্রনমি' নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশত সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন-কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।

কী কী কারণবশত এরূপ ঘটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্তমান অবলম্বনীয় গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শনে চন্দ্রসূর্যমণ্ডল ছোটো দেখিতে হয়— তবে তাহাদিগকে বড়ো

বলিয়া ভ্রম হয় কেন?

প্রক্টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপস্বরূপ দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি দূরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণত আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড়ো বেশি নাই, কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানত দিগন্তবর্তী আকাশকে ঊর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্রসূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশত তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়; এইজন্য, চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড়ো করিয়া লই।

ইহার অনুকূলে একটি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। সাদা কাগজে খুব বড়ো একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকো। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের সাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষরের অনুরূপ একটা সাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে। কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা দূরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটা অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনোই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষরটিই চক্ষুরতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াশার ভিতর দিয়া চন্দ্রসূর্যকে ওই একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান, আয়তনের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিস ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিসকে বেশি দূরের বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র মধ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড়ো প্রমাণ হয় নাই।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

অভ্যাসজনিত পরিবর্তন

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কীরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্তন সকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, হয় যে, এ কথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্মান পণ্ডিত বাইস্‌মান্ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত নূতনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্

সাহেবও বাইস্‌মানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভালো জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোনো কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গ হীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্‌ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ, যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোনো কোনো লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশ অভ্যাসজনিত না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শৃঙ্গ। যে-সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল এবং হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; সেই পরিবর্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্‌ বলেন এ কথার কোনো প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে দেখা যায় কোনো কোনো দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মতো উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোনো জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোটো শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখির পালক এ-সমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিস অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানত অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্‌ বলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবনরক্ষা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, অথচ এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবনধারণ করা দুরূহ; অতএব যে-সকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে তিলমাত্র আঘাত লাগিলেই জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে পারে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিঁকিয়া যায়। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেসের মতে অভিব্যক্তির অভ্যাসের কোনো কার্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, যে সন্তানগণ কোনো কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটা অতিরিক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, সুতরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন জীব স্থায়ী হয়। শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে একটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার শিংয়ের জোরে সেই বেশি আহার এবং মনোমতো হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ততই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০০

ওলাউঠার বিস্তার

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণত টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। শহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল শহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং শহরের সম্রেষে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লন্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল জোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ ওয়াটার কোম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেম্‌স্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্ ওয়াটার কোম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লন্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডন্ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কীরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডোরাডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলন্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোনো মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিস্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোনো বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ

খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোনো কোনো বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এ স্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

'ইংলন্ড' নামক স্টীমার ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ওই পাইলট এবং তাহার দুই জন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ওই পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুকে দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ববাদীসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ধুলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার, প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

ঈথর

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই— পৃথিবীতে প্রধানত সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানকার আকাশে যদি কোনো জানত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহনকার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষত আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোনো কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই, কারণ, কিরণমাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ ক '। শক্তি অবিচ্ছিন্ন মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড়ো কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতেরো ফুট চওড়া ১০০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড়ো একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ

করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া অসংলগ্ন পরমাণুপুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিসটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপবোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে-সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ীর বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতন্ত্রের ধারণার বাহিরে। বর্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্বনির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি এবং মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোনো একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ

বৃষ্টির জল ভূতলে আসিয়া পড়িলে তাহার কিয়দংশ মাটিতে শুষিয়া লয়, কিয়দংশ বাতাসে উবিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলস্রোত এবং নদী-আকারে ভূমিতল হইতে গড়াইয়া পড়ে।

মাটি যদি তেমন কঠিন হয় তবে অনেকটা জল উপরে থাকিয়া গিয়া বিল, জলা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

যে জল মাটির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মৃত্তিকা-শোষিত জলের কিছু অংশ ঘাস এবং গাছের শিকড় টানিয়া লয় এবং সেই রস পাতার মধ্য দিয়া বাষ্প আকারে উবিয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ জল ছিদ্র এবং ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয় এবং স্তর যদি ঢালু হয় তবে সেই ভূমধ্যস্থ জলও তদনুসারে গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

মৃত্তিকাস্তর ছিদ্রবহুল হইলে উপরিস্থ জলস্রোত কীরূপ অন্তর্ধান করে তাহা ফল্গু প্রভৃতি অন্তঃসলিলা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর উপরকার জল ক্রমে মাটির ভিতরে কত নীচে পর্যন্ত চুঁইয়া পড়ে এবং কেন বা একস্থানে আসিয়া বাধা পায় এখনও তাহার ভালোরূপ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভূতলের নিম্নস্তরে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই একটি সম্পূর্ণ জলসিক্তস্থানে আসিয়া পৌঁছানো যায়, সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেক ছিদ্র বায়ুর পরিবর্তে কেবলমাত্র জলে পরিপূর্ণ।

যেমন সমুদ্রের জল সর্বত্রই সমতল তেমনি মাটির নীচের জলেরও একটা সমতলতা আছে। কোনো বিশেষ প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা কী, তাহা সে দেশের কূপের জলতল দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

এই জল অবিশ্রাম মন্দগতিতে সমুদ্র অথবা নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং ঋতুবিশেষে এই জলতল কখনো উপরে উঠে কখনো নীচে নামিয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভূগর্ভস্থ জলতলের উচ্চতা পরিমিত হয়।

জলা জায়গায় হয়তো কয়েক ফুট নীচেই এই জলতল পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো জায়গায় বহুশত ফুট নিম্নে এই জলতল দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রদেশে ভূতলের যত নিম্নে জলধারণযোগ্য অভেদ্য মৃত্তিকাস্তর আছে সে প্রদেশে ভূগর্ভস্থ জলতল সেই পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়।

এই ভূগর্ভস্থ সর্বব্যাপী জলপ্রবাহ মানুষের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। কূপ সরোবর উৎস প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই জলই পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করে— এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঋতুবিশেষে এই ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা উঠিয়া-নামিয়া থাকে। এবং এই উঠা-নাবার সহিত রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে। পেটেন্‌কোফার সাহেব বলেন, জলতল যত উপরে উঠে টাইফয়েড জ্বর ততই বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতে, ভূমির আর্দ্রতা রোগবীজপালনের সহায়তা করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

কোনো কোনো পণ্ডিত অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ভূগর্ভস্থ জল ভূতলের অনতিনিম্নে পর্যন্ত যখন উঠে তখন পৃথিবীর অনেক আবর্জনার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে।

কীরূপে মিশ্রিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে শহরের মতো পয়ঃপ্রণালীর পাকা বন্দোবস্ত নাই সেখানে অনেক স্থলে কুণ্ডের মধ্যে মলিন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে— যখন উপরে উঠে তখন মলমিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত জলের সংযোগ হইতে থাকে এবং সেই জল রোগবীজ ও দূষিত পদার্থসকল বহন করিয়া কূপ ও সরোবরকে কলুষিত করিয়া ফেলে।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বিস্তর সতর্কতার আবশ্যক। কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া জলাশয়ের জল মলিন করিতে না দিলেও অদূরবর্তী আবর্জনা প্রভৃতির মলিনতা জলমধ্যে সঞ্চারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এই মলিনতা অনেক সময় দূরের জলাশয়কে স্পর্শ করে অথচ নিকটের জলাশয়কে অব্যাহতি দেয় এমন দেখা গিয়াছে। তাহার একটি কারণ আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী জলাশয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবর্জনাকুণ্ডের উজানে যে কূপ প্রভৃতি থাকে তাহা নিকটবর্তী হইলেও, মলিন পদার্থ স্রোতের প্রতিকূলে সে জলাশয়ে গমন করিতে পারে না, কিন্তু অনুকূল স্রোতে দূষিত পদার্থ অনেক দূরেও উপনীত হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের অভিমুখ-গতি কোন্ দিকে তাহা স্থির হইলে জলাশয়ের জলদোষ নিবারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কূপ হইতে অধিক পরিমাণে জল তুলিয়া লওয়া হইলে সেই শূন্যপ্রায় কূপ চতুর্দিক হইতে বলসহকারে জল আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন উপর হইতে নিম্ন হইতে দূর-দূরান্তর হইতে জলধারা আকৃষ্ট হওয়াতে সেইসঙ্গে অনেক দূষিত পদার্থ সঞ্চারিত হইতে পারে। অছিদ্র জমির অপেক্ষা সছিদ্র বালুময় জমিতে এইরূপ আকর্ষণের সম্ভাবনা অনেক অধিক। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ এইরূপ উপায়ে বালু-জমিতে অতি শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভূতলের নিম্নে যেমন জলপ্রবাহ আছে, তেমনি বায়ুপ্রবাহও আছে। এঁটেল মাটিতে এই বায়ুপ্রবাহ কিছু কম এবং সছিদ্র আল্‌গা মাটিতে কিছু বেশি।

আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই-সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়; ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মাটির আর্দ্রতা এবং উত্তাপ অনুসারেও এই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িতে

থাকে। ম্যুনিক্ শহরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আষাঢ়-শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়।

সাধারণত ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আল্‌গা ভাঙা মাটিতে কার্বনিক অ্যাসিড অল্প এবং যে শক্ত মাটিতে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক। চষা জমি অপেক্ষা পতিত জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড চতুর্গুণ অধিক। ইহার কারণ, যে মাটির মধ্যে বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড অধিক সঞ্চিত হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের ন্যায় ভূগর্ভস্থ বায়ুরও একটা স্রোত আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গেছে। এই বায়ুচলাচলের উপর আমাদের স্বাস্থ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। কারণ, দেখা গিয়াছে এই বায়ুতে বহুল পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য দূষিত গ্যাস আছে। তাহা ছাড়া, মাটির ভিতরকার রোগ-বীজ এই বায়ুপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে পারে।

নানা কারণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর প্রবাহ রক্ষিত হইয়া থাকে। ভূতলের উপরিস্থ বায়ু-চলাচল তাহার একটা কারণ।

আরও কারণ আছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হয় তখন সেই বৃষ্টিজল ভূগর্ভস্থ বায়ুকে ঠেলিয়া অনেকটা নীচের দিকে লইয়া যায় এবং সিক্তভূমি হইতে তাড়িত হইয়া শুষ্কভূমি দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে। যে বাড়ির মেজে ভালো করিয়া বাঁধানো নহে বর্ষার সময় ভূগর্ভবায়ু সেই মেজে দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়। কোনো কোনো স্থলে ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন বহুকাল অনাবৃষ্টি-অন্তে বৃষ্টিপতনের পর সহসা নিউমোনিয়া কাশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার একটি কারণ এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টিতাড়িত ভূগর্ভবায়ু রোগ-বীজ সঙ্গে লইয়া নানা শুষ্ক স্থান দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি, পেটেন্‌কোফারের মতে, যখন ভূগর্ভস্থ জলতল উপরে উঠিতে থাকে তখন সেই জলসংযোগে কোনো কোনো রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ-বীজের উপর জলের ক্রিয়াই যে তাহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। জলতল যত উপরে উঠে ভূগর্ভের বায়ুকেও সে তত ঠেলিয়া তুলিতে থাকে— এবং সেই বায়ুর সঙ্গে অনেক দূষিত বাষ্প এবং রোগ-বীজ উঠিয়া পড়ে।

ভূগর্ভে বায়ু-চলাচলের আর-একটি বৃহৎ কারণ আছে। তাহা আকাশ-বায়ু এবং ভূগর্ভ-বায়ুর উত্তাপের অসাম্য। তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মাটি নানা প্রকৃতির আছে এবং সকল মাটি সমান সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু জল সকল মাটি অপেক্ষাই বিলম্বে উত্তাপ গ্রহণ করে।

যে জিনিস সহজে উত্তাপ গ্রহণ করে সে জিনিস সহজে উত্তাপ ত্যাগও করে। এই কারণে, জল মাটি অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয় এবং উত্তাপ ছাড়িতেও বিলম্ব করে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি রৌদ্রোত্তাপ সহজে গ্রহণ করে না। তেমনি, সহজে ত্যাগও করে না, শুষ্ক বেলে মাটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে আবার শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়।

ভূমির উত্তাপের ফল কেবল যে ভূমিতেই পর্যবসান হয় তাহা নহে। আকাশের বায়ুতাপের প্রতিও তাহার প্রভাব আছে। সাধারণত উক্ত হয় যে, শুষ্ক বায়ু বিকিরিত উত্তাপকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় এবং ভিজা বায়ু সেই উত্তাপ বহুল পরিমাণে শোষণ করিয়া লয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক বাতাস প্রকৃতির কোথাও দেখা যায় না, এইজন্য সকল বায়ুই সূর্যোত্তাপ এবং পৃথিবী হইতে বিকিরিত উত্তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বাতাসের তাপ অব্যবহিত সূর্যতাপের অপেক্ষা ভূমির তাপের দ্বারাই অধিক পরিমাণে নিয়মিত হয়। তপ্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রথমত বায়ুর নিম্নতন স্তর উত্তপ্ত হইয়া বিস্তার লাভ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নীচে নামিয়া ভূমির তাপ গ্রহণ করে, এমনি করিয়া সমস্ত বায়ু গরম হইয়া উঠে। সকলেই জানেন, বহু উচ্চ আকাশের বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুর অপেক্ষা

অনেক পরিমাণে শীতল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে মাটির তাপ এবং বাতাসের তাপ সমান নহে। এবং সাধারণত মাটির তাপই অধিক।

মাটি ভালো তাপ-পরিচালক নহে, এইজন্য মাটির উপরিতলের উত্তাপ নিম্নতলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। এই কারণেই গ্রীষ্মকালে ভূতল যখন উষ্ণ হইয়া উঠে তখন নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপ হ্রাস হয় তখন সেই শৈত্য নিম্নস্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; এইজন্য শীতকালে ভূমির উপরিতলের মাটির অপেক্ষা নিম্নতলের মাটি বেশি গরম থাকে। চাণক্য-শ্লোকে আছে যে, কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া থাকে। পূর্বলিখিত নিয়মানুসারে ইহার কারণ নির্ণয় কঠিন নহে।

গ্রীষ্মকালে ভূতল ভূগর্ভ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত হওয়াতে ভূমির উপরিস্তরবর্তী বায়ু নিম্নস্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিতে থাকে এবং শীতকালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ঘর যদি অগ্নির উত্তাপে অত্যন্ত গরম করা যায় এবং মেজে যদি উপযুক্তরূপ বাঁধানো না থাকে তবে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ গ্যাস সেই গৃহে ভাসমান হইয়া উঠিতে থাকে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অল্পকাল হইল ডবলিন শহরের রাস্তা পাথরে বাঁধানো হইয়াছে। তাহার পর হইতে সেখানে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভূগর্ভবায়ু এখন রাজপথে বাহির হইতে পায় না, কাঁচা মেজের ভিতর দিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমধ্যে দূষিত বাষ্পের সঞ্চার হয়।

এমনও দেখা গিয়াছে খুব শীতের সময় যখন পথঘাটে বরফ জমিয়া যায়, তখন রাজপথের নিম্নবর্তী গ্যাস-পাইপের পলাতক গ্যাস রাস্তা দিয়া বাহির হইবার স্থান না পাইয়া ঘরের ভিতরে বাহির হইতে থাকে এবং এইরূপে বিষাক্ত বায়ু গ্রহণে অনেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রবন্ধ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে জলাশয়ের নিকটবর্তী কোনো স্থানে দূষিত পদার্থ না জমিতে পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। এবং ঘরের মেজে ও বাড়ির চারি দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া ভূগর্ভস্থ দূষিত বাষ্পমিশ্রিত বায়ুর পথ রোধ করা বিশেষ আবশ্যক।

সাধনা
আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বিবিধ

সান্ত্বনা

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন? অমনি দশ জনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে, করিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হাজার কষ্ট হইলেও 'কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই' করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, সে হাসির চেয়ে আর কষ্টকর কিছু আছে? এ হাসি হাসার অপেক্ষা যদি সমস্ত দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করিয়া ভাবিতে পারিতাম তবে বাঁচিয়া যাইতাম। তাহারা কি এ-সকল বুঝে না? হয়তো বুঝে, কিন্তু মনে করে, পাছে আমি মনে করি যে, আমি এমন মুখ বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া আছি, তথাপি আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই তাহাদের কর্তব্য কাজ করিতে আসে। যেমন চিঠিতে মান্যবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়িবার সময় আমরা চোখ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাঁহার প্রাণেরও অধিক, অতীত কালের শিরোনামা-স্রষ্টারা উহা আমাদের বরাদ্দ দিয়াছেন মাত্র, তেমনি উহারা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া করিতেছে, তাহাতে আমার যে কী সান্ত্বনা হয়, তাহা আমিই জানি। অধিকাংশ লোক সান্ত্বনা করিবার পদ্ধতি জানে না, তাহারা যে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসে, সে দুঃখ তাহাদের সান্ত্বনা বাক্য অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়। সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরও তো কত লোক তোমার মতো কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই, প্রথমত, যে এ কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছু মাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না, দ্বিতীয়ত, মনে হয় যে, আমার মনের দুঃখ সে বুঝিলই না, যে সকলের সঙ্গে আমার দুঃখের তুলনা করিয়া বেড়ায়, সে আমার দুঃখের মর্যাদাই বুঝে নাই, আমার যেটুকু দুঃখ হইয়াছে তাহাতেই তোমার মমতা জন্মায় তো জন্মাউক, নহিলে আর কেহ এরূপ দুঃখ পায় কি না, আর কাহাকেও এত কষ্ট পাইতে হয় কি না, এত শত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার দুঃখের গুরুলঘুত্ব ওজন করিয়া তবে তুমি আমার সহিত একটুখানি মমতা করিতে আসিবে, আমার সে মমতায় কাজ নাই। যদিও মমতা উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্বেই ওই-সকল ভাবনা হয়তো অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে কার্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুখে ওই-সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্টকর হইয়া পড়ে, আর কাহারো হয় কি না জানি না কিন্তু আমার হয়। আমি কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলে অমনি করি না, আমি হয়তো বলি যে, আহা, বাস্তবিক তোমার বড়ো কষ্টের অবস্থা, সে মনে করে যে, আহা, তবু আমার কষ্ট একজন বুঝিতে পারিল, সে তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে ও তখন আমার কাছে কত কথাই বলিতে থাকে, এইরূপে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। এমন করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক যে, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি না বুঝিতে পারে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসা হইয়াছে। আমি যদি বুঝিতে পারি আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে, অমনি মনে হয়, ও ব্যক্তি আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে নাই, ও ব্যক্তি মনে করে যে, আমার এ কষ্টে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে, নহিলে সে আমার এ কষ্ট থামাইতে চেষ্টা করিবে কেন? যে ব্যক্তি মনে করে যে, যে কষ্টে আমি শোক করিতেছি সে কষ্ট শোকের উপযুক্ত নহে, সে ব্যক্তি আমার কষ্টে তেমন মমতা অনুভব করিতেছে না, ইহা অনেকটা নিশ্চয়। সে হয়তো মনে করিতেছে যে এ কী ছেলেমানুষ! আমি হইলে তো এরূপ করিতাম না। মনে না করুক আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করাইতে চায়। অতটা আত্মাবমাননা

স্বীকার করিয়া আমি মমতা প্রর্থনা করি না। একজন যে গম্ভীরভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতিশয় কষ্টকর। কী। আমি যে কষ্টে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কষ্ট পাইবার যোগ্যই নহে; আমার কষ্ট এতই সামান্য, আমি এতই দুর্বল যে অত সামান্য কষ্টেই কষ্ট পাই? এ কথা মনে করিয়া কেহ কেহ হয়তো সান্ত্বনা পাইতেও পারে, আপনার প্রতি ধিক্কার দিতেও পারে ও ক্রমে দুঃখ ভুলিতেও পারে। কিন্তু আমার মতো লোকও তো ঢের আছে, আমার সে সান্ত্বনাকারীর প্রতি রাগ হয়, মনে হয় কী, আমাকে এত ক্ষুদ্র ঠাহরাইতেছে? তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক তো আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া থুমাইয়া দিই, তবে তোমায় কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না। আসল কথাটা এই যে, সান্ত্বনা অনেক সময় বড়ো বিরক্তিজনক, অনেক সময় মনে হয় যে, আমার নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া তাহা মিছামিছি নষ্ট করিয়া দিতেছে মাত্র; দুঃখ ভাবনা ভাবিবার সময় নষ্ট হইলে যে কষ্ট হয় না তাহা নহে, দুঃখের ভাবনা ভাবিবার সময় লোকে গোলমাল করিতে আসিলে বড়ো কষ্ট হয়, এইজন্যই বিজনে দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভালো লাগে। শোকার্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দুঃখের কারণ কষ্টের হউক কিন্তু দুঃখের ভাবনা অনেকটা সুখের, যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পার তো ভালো, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাত দিয়ো না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৪

নিঃস্বার্থ প্রেম

দেখো ভাই, সেদিন আমার বাস্তবিক কষ্ট হয়েছিল। অনেকদিন পরে তুমি বিদেশ থেকে এলে; আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। 'আমাদের কি মনে পড়ত?' তুমি ঠোঁটে একটু হাসি, চোখে একটু ভ্রূকুটি করে বললে, 'মনে পড়বে না কেন? উত্তরটা শুনেই তো আমার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হল; নিতান্ত দুঃসাহসে ভর করে সংকুচিত স্বরে আর-একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক দিন পরে এসে আমাদের কেমন লাগছে?' তুমি আশ্চর্য ও বিরক্তিময় স্বরে অথচ ভদ্রতার মিষ্টহাসিটুকু রেখে বললে, 'কেন, খারাপ লাগবার কী কারণ আছে?' আর সাহস হল না। ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আর হল না। বিদেশে গিয়ে অবধি তুমি আমাকে দু-তিনখানা বৈ চিঠি লেখ নি, সেজন্য আমার মনে মনে একটুখানি অভিমান ছিল। বড়ো সাধ ছিল, সেই কথাটা নিয়ে হেসে হেসে অথচ আন্তরিক কষ্টের সঙ্গে, ঠাট্টা করে অথচ গম্ভীরভাবে একটুখানি খোঁটা দেব', কিন্তু তোমার ভাব দেখে, তোমার ভদ্রতার অতিমিষ্ট হাসি দেখে তোমার কথার স্বর শুনে আমার অভিমানের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তখন আমিও প্রশ্নের ভাব পরিবর্তন করলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'যে দেশে গিয়েছিলে সে দেশের জল-বাতাস নাকি বড়ো গরম? সে দেশের লোকেরা নাকি মস্ত মস্ত পাগড়ি পরে, আর তামাক খাওয়াকে ভারি পাপ মনে করে? এখান থেকে সেকেন্ড ক্লাসে সেখেনে যেতে কত ভাড়া লাগে?' এইরকম করে তোমার কাছ থেকে সেদিন অনেক জ্ঞান লাভ করে বাড়ি ফিরে এয়েছিলুম! তোমার আচরণ দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলুম শুনে তুমি লিখেছ যে, 'প্রথমত আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি যে তোমার ওপর কোনো প্রকার কুব্যবহার করেছিলুম, তা তো মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি-বা তোমার কতকগুলি প্রশ্নের ভালোরকম উত্তর না দিয়ে দু-চার কথা বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, তাতেই বা আমার দোষ কী?

সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারই বা তোমার কি আবশ্যক ছিল?' তোমার প্রথম কথার কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। সত্যিই তো, তুমি আমার সঙ্গে কোনো কু-ব্যবহারই কর নি। যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সকলগুলিরই তুমি একটা-না-একটা উত্তর দিয়েছিলে, তা ছাড়া হেসেও ছিলে, গল্পও করেছিলে। তোমার কোনোরকম দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর নি; সে তোমাকে বা আর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না সুতরাং তার আর বাহুল্য উল্লেখ করব না। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, কেন তোমাকে ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আচ্ছা ভাই তোমার তো হৃদয় আছে, একবার তুমিই বিবেচনা করে দেখো-না— কেন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তোমার ভালোবাসার উপর সন্দেহ হয়েছিল বলেই কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, যে, 'আমাদের কি মনে পড়ত' কিংবা 'আমাদের কি ভালো লাগছে', না তোমার ভালোবাসার ওপর সন্দেহ তিলমাত্র ছিল না বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম? যদি স্বপ্নেও জানতুম যে, আমাকে তোমার মনে পড়ত না, কিংবা আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, তা হলে কী ও-রকমের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতুম। তোমার মুখে শোনবার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, বিদেশে আমাকে তোমার প্রায়ই মনে পড়ত। কেবলমাত্র ওই কথাটুকু নয়, ওই কথা থেকে তোমার আরও কত কথা মনে আসত। আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বলবে— 'অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখলুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হল, আহা ভা— যদি এখানে থাকত তা হলে তার বড়ো ভালো লাগত!' একটা ছোটো প্রশ্ন থেকে এইরকম কত উত্তরই শুনতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তখন মনের ভিতর এইরকম অনেক কথা চাপা ছিল!

আমি তোমার কাছে দুঃখ করবার জন্যে এ চিঠিটা লিখছি নে; কিংবা তোমার কাছে অভিমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়! আমি ভাই, কোনো কোনো লোকের মতো ঢাক ঢোল বাজিয়ে অভিমান করতে পারি নে; যার প্রতি অভিমান করেছি, তার কাছে গিয়ে 'ওগো আমি অভিমান করেছি গো, আমি অভিমান করেছি' বলে হাঁকাহাঁকি করতেও ভালোবাসি নে। যদি আমি অভিমান করি তো সে মনে মনে। আমার অভিমানের অশ্রু কেউ কখনো দেখতে পায় না, আমার অভিমানের কথাও কেউ কখনো শোনে নি; অভিমান আমার কাছে এমনই গোপনের সামগ্রী। তাই বলছি তোমার কাছে আজ আমি অভিমান করতে বসি নি। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি তর্ক আছে, তার মীমাংসা করতে আমার ভারি ইচ্ছে।

তোমার সমস্ত চিঠিটার ভাব দেখে আমার এই মনে হল যে তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা আর ভালোবাসা ফেরত পাবার আশা করে না। যেখানে ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা পাবার আশা আছে সেইখানেই স্বার্থপরতা আছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা বলি শোনো। আমরা অনেক সময়ে ভালো করে অর্থ না বুঝে অনেক কথা ব্যবহার করে থাকি। মুখে মুখে কথাগুলো এমন চলিত, এমন পুরোনো, হয়ে যায় যে, সেগুলো আমরা কানে শুনি বটে কিন্তু মনে বুঝি নে, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কথাটাও বোধ করি সেইরকম একটা কিছু হবে। যখন আমরা শুনে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝি নে, একটু পীড়াপীড়ি করে বোঝাতে বললে হয়তো দশজনে দশ রকম ব্যাখ্যা করি। স্বার্থপরতা কথা সচরাচর আমরা কী অর্থে ব্যবহার করে থাকি? আহার করা বা স্নান করাকে কি স্বার্থপরতা অতএব নিন্দনীয় বলে? আহার না করা বা স্নান না করাকে কি নিঃস্বার্থপরতা অতএব প্রশংসনীয় বলে? মূল অর্থ ধরতে গেলে আহার বা স্নান করাকে স্বার্থপরতা বলা যায় বৈকি? কিন্তু চলিত অর্থে তাকে স্বার্থপরতা বলে না। সকল মানুষই মনে মনে এমন সামঞ্জস্যবাদী, যে, যখন বলা হল যে, 'আহার করা ভালো' তখন কেউ এমন বোঝেন না, বিরাম বিশ্রাম না দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই আহার করা ভালো। তেমনি যখন আমরা স্বার্থপরতা কথা ব্যবহার করি, তখন কেউ মনে করে না যে, নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বার্থপরতা বা বাতাস খাওয়া স্বার্থপরতা। যা-কিছু পঙ্কজ তাকে যেমন পঙ্কজ বলে না, যা

কিছু অ-চল তাকে যেমন অচল বলে না, তেমনি যা-কিছু স্বার্থপরতা তাকেই স্বার্থপরতা বলে না। খাওয়াদাওয়াকে স্বার্থপরতা বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র খাওয়াদাওয়া করে আর কিছু করে না, কিংবা যার খাওয়াদাওয়াই বেশি, পরের জন্য কোনো কাজ অতি যৎসামান্য, তাকে স্বার্থপর বলা যায়। আবার তার চেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খায়। এ ছাড়া আর কোনো অর্থে, কোনো ভাবে স্বার্থপর কথা ব্যবহার করা হয় না। তা যদি হয় তা হলে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলতে কী বুঝায়? যদি মূল অর্থ ধর তাহলে ভালোবাসাই স্বার্থপরতা। যখন এক জনকে দেখতে ভালো লাগে, তার কথা শুনতে ভালো লাগে, তার কাছে থাকতে ভালো লাগে ও সেইসঙ্গে সঙ্গে তাকে না দেখলে, তার কথা না শুনলে ও তার কাছে না থাকলে কষ্ট হয়, তার সুখ হলে আমি সুখী হই, তার দুঃখ হলে আমি দুঃখী হই, তখন অতগুলো ভাবের সম্মিলনকেই ভালোবাসা বলে। ভালোবাসার আর-একটা উপাদান হচ্ছে, সে আমাকে ভালো বাসুক, অর্থাৎ তার চোখে আমি সর্বাংশে প্রীতিজনক হই এই বাসনা। ভেবে দেখতে গেলে এর মধ্যে সকলগুলিই স্বার্থপরতা। এতগুলি স্বার্থপরতার সমষ্টি থেকে একটি স্বার্থপরতা বাদ দিলেই কি বাকিটুকু নিঃস্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়? কিন্তু যেটিকে বাদ দেওয়া হল সেটি অন্যান্যগুলির চেয়ে কী এমন বেশি অপরাধ করেছে? তা ছাড়া এর মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। এর একটি যখন নেই তখন বোঝা গেল যে, যথার্থ ভালোবাসাই নেই। যাকে তোমার দেখতে ভালো লাগে না, যার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, যার কাছে থাকতে মন যায় না তাকে যদি ভালোবাসা সম্ভব হয় তা হলেই যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে না তাকে ভালোবাসাও সম্ভব হয়। যাকে দেখতে শুনতে ও যার কাছে থাকতে ভালো লাগে, কোনো কোনো ব্যক্তি দুদিন তাকে দেখতে শুনতে না পেলে ও তার কাছে না থাকলে তাকে ভুলে যায় ও তার ওপর থেকে তার ভালোবাসা চলে যায়, তেমনি আবার যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে তার ভালোবাসা না পেলেই কোনো কোনো ব্যক্তির ভালোবাসা তার কাছ থেকে দূর হয়; তাদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাদের গভীররূপে ভালোবাসবার ক্ষমতা নেই। এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ভালোবাসার যতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ করলুম, ভালোবাসা যেখানে থাকে তারাও সেইখানে থাকবেই থাকবে। তাদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকুকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলাও যা আর ঘড়ির কল বা তার কাঁটা বা তার সময় চিহ্ন বাদ দিয়ে তাকে খাঁটি ঘড়ি বলাও তা। এখন এক-এক সময় হয় বটে, যখন ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনেই আসে না— যেমন দ্বারশূন্য বাতায়নশূন্য আলোকশূন্য জনশূন্য কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা কল্পনাতেই আসে না; কিন্তু সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা মনে আসে না বলে বলা যায় না যে স্বাধীনতার ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। তেমনি যখন আমার ভালোবাসার পাত্র আকাশের জ্যোতির্ময় জলদ-সিংহাসনে, আর আমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় একটি সামান্য কীট ধুলায় অন্ধ হয়ে বিচরণ করছি— যখন তার পদ-জ্যোতির একটুমাত্র আভাস দেখা, যখন সংগীত নয় কথা নয়, কেবল অতি দূর থেকে তাঁর কণ্ঠের অস্ফুট স্বরটুকু মাত্র শোনা আমার অদৃষ্টে আছে, যখন তাঁর নিশ্বাস বহন ক'রে তাঁর গাত্র স্পর্শ ক'রে তাঁর কুন্তল উড়িয়ে বাতাস আমার গায়ে অমৃত সিঞ্চন করে, ও সেইটুকু সুখেই আমার চোখ ঢুলে পড়ে, আমার গা শিউরে উঠে, তার চেয়ে আমার আর কোনো আশা নেই, তখন যদি আমার ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনে না আসে তো তা থেকে বলা যায় না যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা স্বভাবতই ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে থাকবে এমন নয়, সেইরকম অবস্থায় ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা মনে স্পষ্ট না আসুক, তবু কি সে ব্যক্তির মনে তৃপ্তি থাকে? সর্বদাই কি তার মনটা হাহাকার করতে থাকে না? তার মনের মধ্যে কি এমন একটা নিদারুণ অভাব ঘোরতর শূন্যতা থাকে না, যে-শূন্য সমস্ত জগৎ গ্রাস করেও পূর্ণ হতে পারে না? তার হৃদয়ের সে মরুভাব কেন? সে কি তার প্রতিদানের মর্মভেদী আশাকে নিরাশার সর্বব্যাপী বালুকার তলে নিহিত করে ফেলা হয়েছে বলেই না? এমন কোনো

অমানুষিক মানুষকে কি কেউ দেখেছে, যে ভালোবাসার প্রতিদান না পেয়েও, প্রতিদানের আশা বা কল্পনা না করেও মহাযোগীর মতো মনের আনন্দে আছে। প্রতিদানের আশা ত্যাগ করেও অনেকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ভালোবেসে কি সুখী হয়? আচ্ছা তর্কের অনুরোধে মনেই করা যাক যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা যে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই তা নয়, কিন্তু তাই বলে কি প্রতিদান পাবার একটা ইচ্ছামাত্রই স্বার্থপরতা? যোগাভ্যাস-ক্রমে কোনো যোগী ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে দূর করে নিষ্কাম হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা কি স্বার্থপরতা? আমার শরীরের ধর্মই এই যে, অবস্থা বিশেষে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, সে উদ্রেকটুকু অবশ্য স্বার্থপরতা নয়; কিন্তু আমার সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে আর-একজন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যদি তার আহার থেকে বঞ্চিত করি, তা হলে আমার স্বার্থপরতা হয় বটে! আমার মনের ধর্ম এই যে, ভালোবাসার প্রতিদান পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছাটুকুই স্বার্থপরতা নয়; তবে যদি সেই ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে এমন অন্যায় উপায়ে আমার ভালোবাসার পাত্রের কাছে প্রতিদান পাবার চেষ্টা করি যে, সে তাতে কষ্ট পায় বা বিপদে পড়ে তা হলেই সেটা স্বার্থপরতা হয়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিঠি পড়ে একটা কারণে বড়ো হাসি পেল। ভাবে বোধ হয় যে, তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা ভালোবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাকবে তা নয়, অনাদর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যেরকম অবস্থা হোক না তারা কেবল নিজে ভালোবেসেই সুখী থাকবে। ভালোবাসার লোকের মিষ্টি হাসিমুখখানি দেখলে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে তার কাছে আদর পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখলে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন?

আমি কাকে স্বার্থপর ভালোবাসা বলি জান? যে ভালোবাসা খাঁটি ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালোবাসায় ভালোবাসার চাকচিক্য আছে, ভালোবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভালোবাসা নেই। সেরকম ভালোবেসে যে তোমার ভালোবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ করে ফেলছ তাতে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে যে সে রক্তমাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বৈ আর কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, তাতে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না! যখন তার প্রতিমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আনো, তখন তোমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক তিল নির্মল স্থান রাখ নি যেখানে তাকে বসাতে পারো! তোমার বীভৎস দুর্গন্ধময় হৃদয়ে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, দিনরাত তার পদে কুৎসিত লালসা ও কলুষিত কল্পনা উপহার দিচ্ছ, তেমন বীভৎস প্রতিমাপূজাকে যদি ভালোবাসা নিতান্ত বলতে হয় তা হলে একেই আমি স্বার্থপর ভালোবাসা বলি। আমার মত এই যে, দৈত্যদের যেমন দৈত্যই বলে, কুদেবতা বা কোনো রকম বিশেষত্ব-বিশিষ্ট দেবতা বলে না তেমনি উপরি-উক্ত ব্যবহারকে স্বার্থপর ভালোবাসা না বলে তার যা যথার্থ নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত, তার জাল-নাম ভালোবাসা তার যথার্থ নাম ইন্দ্রিয়পরতা। ভালোবাসার চক্ষে যাকে দেখা যায়, কল্পনা তাকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার চার দিকে স্বর্গের কিরণ দীপ্তি পেতে থাকে— আর ইন্দ্রিয়পরতার চক্ষে যাকে দেখ, সে যদি স্বর্গীয় হয় তবু তোমার কল্পনা তাকে সে স্বর্গের আসন থেকে নামিয়ে, পৃথিবীর আবর্জনা-মধ্যে স্থাপন করে, এর চেয়েও কি স্বার্থপরতা আর আছে?

ভারতী
কার্তিক ১২৮৭

যথার্থ দোসর

হে তারকা, ছুটিতেছে আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি, বলো গো বলো গো মোরে,
তুমি তারা রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে?
ম্লান মুখ হে শশাঙ্ক, ভ্রমিছ সমস্ত রাত্রি,
আশ্রয় আলয়-হীন আকাশ-পথের যাত্রী,
দিবসের, নিশীথের কোন্ ছায়াময় দেশে
বিশ্রাম লভিতে তুমি পাইবে গো অবশেষে?

পরিশ্রান্ত সমীরণ, বলো গো খুঁজিছ কারে?
আতিথ্য না পেয়ে ভ্রম' জগতের দ্বারে দ্বারে,
গোপন আলয় তব আছে কি মলয় বায়,
তরঙ্গ-শয়নে কিংবা নিভৃত নিকুঞ্জ-ছায়?

—Shelley

আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়-প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সংগীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন। যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপ-ধ্বনি উঠিয়াছে। কিছুতেই একটা আশ্রয় মিলিতেছে না, এই একটা ভাব; যেন একটা আশ্রয় আছে, আমি জানি, তাহার ঠিক রাস্তাটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মিলিতেছে না, দিক্‌ভ্রম ঘুচিলেই মিলিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস। মনে হইতেছে জানি, অথচ জানি না, কী চাহি তাহা যেন ভাবিলেই মনে আসিবে, অথচ মনে আসে না। এক-এক সময়ে একজনকে ডাকিয়া, যেমন কী জন্য ডাকিলাম ভুলিয়া যাই, তখন যেমন অধীরতা উপস্থিত হয়, ইহাও সেইরূপ অধীর ভাব। এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালোবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব নাই। প্রেমের অগ্নি, আলেয়ার আলোকও বিদ্যুতের শিখার ন্যায় আপনি জ্বলিতেছে। অথচ তাহার ইন্ধন নাই। ভালোবাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এমনতর প্রেম পূর্বকার কবিদিগের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকেরা বুঝে না। পূর্বকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল, হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালোবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন, এইজন্য তাহাদের প্রেমের ধর্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। তাহারা মিলনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন, বিরহে একেবারে মুমূর্ষ হইয়া পড়িতেন। অতৃপ্তির নীচু সুরের নিশ্বাস তাঁহারা ফেলিতেন না, আর্তনাদের উঁচু সুরে তাঁহারা বিরহের গান গাহিতেন। সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জিত ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। এমন এক সময় ছিল যখন প্রেম ইন্দ্রিয়গত ছিল, যখন বড়ো বড়ো চোখের কটাক্ষে কবিদিগের হৃদয়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হইত, তিলফুল নাসা কুঞ্চিত দেখিলে তাঁহারা জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। ফণিনী-গঞ্জিত বেণী তাঁহাদের হৃদয়কে সাতপাকে বাঁধিয়া রাখিত। তখন বিরহিণী গান করিত, 'আসার আশা রবে, কিন্তু নবযৌবন রবে না!' ক্রমে প্রেমের

অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহারা এমন ভালোবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহাতে মুখ চক্ষু নাসিকার কোনো হাত নাই। তাঁহারা যাহাকে ভালোবাসিতেন, তাহার শরীরকেই ভালোবাসিতেন না, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতেন না, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কবিরা ভালোবাসিতেছেন, অথচ ভালোবাসিবার লোক নাই। এক ব্যক্তির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য, অথচ তাহার সঙ্গে কোনো জন্মে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়, জানাশুনা পর্যন্ত হয় নি। মন যেন কে-একজনকে ভালোবাসিতেছে, অথচ নিজে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না। পূর্বে নাক-চোখ-মুখের উপর ভালোবাসার পরগাছা ঝুলিত; অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালোবাসার উদ্ভিদ গজাইত, যদিও তাহার বীজ পাখিতেই আনিয়া দিত, বা বাতাসেই বহন করিয়া আনিত, বা কী করিয়া আসিত কেহ ঠিকানা করিতে পারিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ভালোবাসা হৃদয়ে সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার মাপে ঠিক হইবে, এমন ব্যক্তিবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। দুই-চারিটা (বা তাহার অধিক) গায়ে দিয়া দেখে। কোনোটা বা ঢিলা হয় কোনোটা বা কষা হয়; কোনোটা বা মনে হয় হইবে, কিন্তু গায়ে দিলে হয় না; কোনোটা বা আর-সব দিকে বেশ হইয়াছে কেবল গলার কাছটা আঁট হয়; কোনোটা বা ভালোরূপে না হউক একপ্রকার চলনসইরূপে হয় ও তাহা লইয়াই ভালোবাসা সন্তুষ্ট থাকে। আগে ছিল প্রথমে আমদানি, পরে 'চাহিদা' (demands), এখন হইয়াছে প্রথমে 'চাহিদা' পরে আমদানি। ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। এখন কবিরা দেখিতেছেন, হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি। প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু পূর্বে খুব একটা বড়ো চোখ, সোজা নাক বা বিম্বৌষ্ঠের নাড়া না খাইলে কবিরা বুঝিতেই পারিতেন না যে, হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেন যে, ওই বড়ো চোখ ও বিম্বৌষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বলিয়া এক ব্যক্তি বুঝি হৃদয়ে বলপূর্বক আতিথ্য গ্রহণ করিল; এইজন্যই কেহ-বা তাহাকে ভালো মুখে সম্ভাষণ করিত, কেহ-বা গালাগালমন্দ দিত; যাহার যেমন স্বভাব! সে যে ঘরের লোক এমন কাহারো মনে হয় নাই।

পূর্বকার কবিরা সহসা আশ্চর্য হইতেন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? এ পাষাণ-হৃদয়া, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ, ইহার নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, তবে ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? ইহার বিশেষ কোনো গুণ নাই, আমি যে যে গুণ ভালোবাসি, তাহা যে ইহার আছে এমন নহে, আমি যে যে দোষ ঘৃণা করি, তাহা যে ইহার নাই এমন নহে, আমি চেষ্টা করিতেছি ইহাকে না ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসি কেন? এখনকার কবিরা এক-একবার সহসা আশ্চর্য হন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম না কেন? এ কোমল-হৃদয়, আমার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী, যে যে গুণ আমি ভালোবাসি সকলই ইহার আছে, যে যে দোষ ঘৃণা করি সকলই ইহার নাই; আমি ইচ্ছা করিতেছি ইহাকে ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসিতে পারিলাম না কেন? সাধারণ লোকে সহজেই উত্তর দিবে, চেষ্টা করিয়া কি ভালোবাসা বা না বাসা যায়? সে তো অতি সহজ উত্তর, কিন্তু কেনই বা না যাইবে? ভালো না বাসিলে যাহাকে ঘৃণা করিতাম, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসিব? আর যে সর্বতোভাবে ভালোবাসিবার যোগ্য কেনই বা তাহাকে না ভালোবাসিব? এক দল কবি তাহার উত্তর দিতেছেন—

কে জানে কোথায় এই জগতের পরে
রয়েছে অপেক্ষা করি দীর্ঘ— দীর্ঘ দিন
একটি আশ্রয়হীন হৃদয়ের তরে
আরেকটি হৃদয় একেলা সঙ্গীহীন।
উভয়ে উভয়ের খুঁজে দিনরাত্রি ধ'রে

অবশেষে তাদের সহসা একদিন
দেখা হয় দুই জনে কে জানে কী করে।
উভয়ে সম্পূর্ণ হয়ে হয় রে বিলীন।
জীবনের দীর্ঘ নিশা তখনি ফুরায়
অনন্ত দিনের দিকে পথ খুলে যায়।

—Edwin Arnold

অর্থাৎ একটি হৃদয়ের জন্য আর-একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শত ক্রোশ ব্যবধানে, এমন-কি জগৎ হইতে জগদন্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না-হউক, জানাশুনা থাকুক বা না-থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোনো দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোনো দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য। সামাজিক বিবাহ, অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন-কি, হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমরণ-স্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক। হয়তো একজন বৃদ্ধ একজন তরুণীকে বিবাহ করিল, উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল প্রভেদ, মাল্য পরিবর্তন হইল, কিন্তু হৃদয় স্ব-স্ব স্থানে রহিল। হয়তো একজন রূপবতী একজন ধনবানকে বিবাহ করিল; ধনের আকর্ষণে রূপ অগ্রসর হইল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণে হৃদয় অগ্রসর হইল না। হয়তো এমন দুইজনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্বে যাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হয় নাই। হয়তো এমন বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল উভয়ের প্রকৃতিতে দারুণ বৈসাদৃশ্য। এই বৃদ্ধ ও তরুণী, এই রূপবতী ও ধনবান, এই দুই বিসদৃশ প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখনো অনন্ত-কাল-স্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই-দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে। সেই নির্দিষ্ট হৃদয়। হয়তো পৃথিবীতে তাহার সহিত দেখাশুনা হইল না, কবে যে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কোথায় সে আছে তাহা জানি না। কিন্তু—

কোথা-না-কোথাও আছেই আছে
যে মুখ দেখি নি, শুনি নি যে স্বর;
সে হৃদয়, যাহা এখনো— এখনো
আমার কথায় দেয় নি উত্তর।
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
ছাড়াইয়া দেশ, সাগরের তীরে,
হয়তো বা কোথা দৃষ্টির বাহিরে,
হয়তো ছাড়ায়ে চাঁদের সীমানা,
হয়তো কোথায় তারকা অজানা,
রয়েছে তাহারি কাছে,
কে জানে কোথায় আছে!
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
একটি হয়তো বেড়া বা দেয়াল
মাঝে রাখিয়াছে করিয়া আড়াল।

নব বরষের ঘাসের 'পরে
গত বরষের কুসুম ঝরে,
নূতন, পুরানো, মাঝখানে তার
হয়তো দাঁড়ায়ে সেজন আমার।

—Christina Rossetti

হয়তো ওই একটি বেড়ার আড়াল পড়িল বলিয়া, যাহার সহিত আমার চিরজীবনের সম্বন্ধ, তাহার সহিত ইহজন্মে আর দেখা হইল না। হয়তো রাজপথে সে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, মুখ ফিরানো ছিল বলিয়া দেখা হইল না, মিলন হইল না। তোমার জন্য যে হৃদয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে তোমার মনের এমনই ধর্ম যে, তাহাকে দেখিয়া তুমি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং সেও তোমাকে ভালোবাসিবে, প্রকৃতি এমনই উপায় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবে কেন সংসারে প্রণয় লইয়া এত গোলযোগ হয়? তবে কেন 'প্রকৃত স্রোত প্রশান্তভাবে বহে না?' যতক্ষণে না আমাদের যথার্থ দোসরকে পাই, ততক্ষণে তাহার সহিত যাহার কোনো বিষয়ে মিল আছে, আমরা তাহার প্রতিই আকৃষ্ট হই। এমনও সচরাচর হইয়া থাকে, প্রথমে একজনকে ভালোবাসিলাম, তাহার কিছুদিন পরে তাহাকে আর ভালোবাসিলাম না, এমন-কি, আর-একজনকে ভালোবাসিলাম। তাহার কারণ এই যে প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছুদিন নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালোবাসা স্থান পরিবর্তন করিল। এমন এক-এক সময় হয়, আমরা সহসা এক ব্যক্তির মুখের এক পার্শ্বভাগ দেখিতে পাইলাম, সহসা মনে হইল, ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, হয়তো তাহার ভুরুর প্রান্তভাগ, তাহার অধরের সীমান্তভাগ মাত্র দেখিয়া মনে হইয়াছে ইহার সহিত অমুকের আদল আসে, হয়তো সমস্ত মুখটা দেখিলে দেখিতে পাই কিছুমাত্র আদল নাই। অনেক সময়ে দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হয় ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, কাছে আসিয়া দেখি তাহা নয়, অনেক সময় পশ্চাৎ হইতে দেখিয়া মনে হয় 'এ অমুক হইবে', সম্মুখে আসিয়া দেখি যে সে নয়। আমরা অনেক সময়ে পাশ হইতে ভালোবাসি, দূর হইতে ভালোবাসি, পশ্চাৎ হইতে ভালোবাসি, সুতরাং এমন হয় যে সম্মুখে আসিয়া কাছে আসিয়া আর ভালোবাসি না। অনেক সময়ে আবার হয়তো সত্যসত্যই আমরা আদল দেখিতে পাইয়া ভালোবাসি, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর আদল দেখিতে পাইলে আর-একজনকেও ভালোবাসিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের ভালোবাসার প্রতিদান দৈবক্রমে পাইতেও পারি, আবার অনেক সময়ে না পাইতেও পারি। এই-সকল কারণেই প্রেমে এত গোলযোগ বাধে। এই-সকল কারণেই আমরা (তাহার দোষ থাকুক বা গুণ থাকুক) একজনকে অন্ধভাবে ভালোবাসি, অথচ কেন ভালোবাসি ভাবিয়া পাই না, সে আমাদের প্রতি সহস্র নির্যাতন করুক, সহস্র অন্যায় ব্যবহার করুক, কিছুতেই তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না। এই-সকল কারণেই, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এইরূপ চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি ভালোবাসিব, আর এইরূপকে ভালোবাসিব না।

একটি রঙের সহিত আর-একটি রঙ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সেই উভয় বর্ণের অতি সূক্ষ্মতম বর্ণাণুগুলি কোন্ সীমায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল আমরা দেখিতে পাই না, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারি যে, উভয় বর্ণের বর্ণাণুগুলির মধ্যে পরস্পর মিলিবার শক্তি আছে, আর কোনো শ্রেণীর বর্ণাণু হইলে মিলিতে পারিত না। তেমনি আমার বর্ণাণু আর কোন্ হৃদয়ের বর্ণাণুর সহিত মিলিতে পারিবে, তাহা কোনো পার্থিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়িবার জো নাই, কিন্তু মিল আছেই। এমন বস্তু নাই যাহার মিল নাই। এ জগতে মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে। এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা। এত মিল, এত অনুপ্রাস কোনো কবিতাতেই নাই।

যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে, মনুষ্যের হৃদয়ে দোসর পাইবার ইচ্ছা কী বলবতী, তাহার জন্য সে কী না করিতে পারে, সে ইচ্ছার নিকটে জীবন পর্যন্ত কী অকিঞ্চিৎকর, মনের মতো দোসর পাইলে সে কী আনন্দই পায়, না পাইলে সে কী হাহাকারই করে, তখন মনে হয় যে, প্রতি লোকের দোসর আছেই, এককালে-না-এককালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। সংসারে যখন মাঝে মাঝে দোসরের মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, জলাশয় কোনো দিকে-না-কোনো দিকে আছেই, নহিলে আকাশপটে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতই না। মনের মানুষ পাইবার জন্য যেরূপ দুর্দান্ত ইচ্ছা অথচ সংসারে মনের মানুষ লইয়া এত অশ্রুপাত, হৃদয়ের এত রক্তপাত করিতে হয় যে, মনে হয় একদিন বোধ করি আসিবে যেদিন মনের মানুষ মিলিবে, অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না। ভালোবাসা ও সুখ, ভালোবাসা ও শান্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোকে ভালোবাসে, অথচ ভালোবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। এ অসম্পূর্ণ অবস্থা, একদিন-না-একদিন দূর হইবে। যখন বন্ধুত্বের প্রতারণায় প্রেমের যন্ত্রণায় মন অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, মন একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, তখন ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনা কী হইতে পারে? একবার যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এ-সমস্ত মরীচিকা; তাহার যথার্থ ভালোবাসিবার লোক যে আছে সে কখনো তাহাকে কাঁদাইবে না, তাহাকে তিলমাত্র কষ্ট দিবে না, তাহার সহিত একদিন অনন্ত সুখের মিলন হইবে, তখন কী আরাম সে না পায়। আর-একজন 'আমার' আছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে তেমন 'আমার' আর কেহ নাই। এমন সময় যখন আসে, যখন ভালোবাসিবার জন্য হৃদয় লালায়িত হয়, এমন ঋতু যখন আসে যখন

'How many a one, though none be near to love,
Loves then the shade of his own soul half seen
In any mirror—'

তখন হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালোবাসো, তাহার সহিত কথোপকথন করো। তাহাকে বলো, 'হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।'

তাহাকে বলো—

In all my singing and speaking,
I send my soul forth seeking;
O soul of my soul's dreaming;
When wilt thou hear and speak?
Lovely and lonely seeming,
Thou art there in my dreaming.
Hast thou no sorrow for speaking
Hast thou no dream to seek?
In all my thinking and sighing,
In all my desolate crying,
I send my heart forth yearning ,
O heart that may'st be nigh!
Like a bird weary of flying,
My heavy heart, returning,

Bringeth me no replying.
  Of word, or thought, or sigh.
In all my joying and grieving.
  Living, hoping, believing,
I send my love forth flowing,
  To find my unknown love.
O world, that I am leaving,
O heaven, where I am going,
Is there no finding and knowing,
  Around, within or above?
O soul of my soul's seeing
  O heart of my heart's being.
O love of dreaming and waking
  And living and dying for—
Out of my soul's last aching
Out of my heart just breaking—
Doubting, falling forsaking,
  I call on you this once more.
Are you too high or too lowly
  To come at lengh upto me?
Are you too sweet or too holy
  For me to have and to see?
Wherever you are, I call you,
Ere the falseness of life enthral you,
Ere the hollow of death appal you,
  While yet your spirit is free.
Have you not seen, in sleeping,
  A lover that might not stay,
And remembered again with weeping
And thought of him through the day
Ah! thought of him long and dearly,
Till you seemed to behold him clearly
And could follow the dull time merely
With heart and love far away?
And what are you thinking and saying,
In the land where you are delaying?
Have you a chain to sever?
  Have you a prison to break?
O love! there is one love for ever,
And never another love— never,
And hath it not reached you, my praying?

And singing these years for your sake?
We two made one, should have power
To grow to a beautiful flower,
A tree for men to sit under
Beside life's flowerless stream;
But I without you am only
A dreamer fruitless and lonely;
And you without me, a wonder
In my most beautiful dream.

—Arthur O'Shaughnessy

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

গোলাম-চোর

অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেকগুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চিরজন্ম গোলাম-চোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারও গোলাম-চোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাস খেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলাম-চোর হইতে হয়। আমরা সকলেই চাই— মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোনো উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকি করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। মনে করো অ্যাকাউন্টেন্ট জেনেরালের আপিসে গোলাম-চোর খেলা হইতেছে— যতক্ষণ হিসাবে মিল হইতেছে ততক্ষণ কোনো গোলযোগ নাই। প্রথম সাহেব খেলোয়াড় যেই অমিলের গোলামটি পাইয়াছেন অমনি এক হাত দু হাত করিয়া সকলের শেষ খেলোয়াড় কেরানি বাবুটির হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিলেন, মাঝে হইতে গরিব কেরানি বাবুটি গোলাম-চোর হইয়া দাঁড়াইলেন। দায়িত্বের গোলামটি কেহই হাতে রাখিতে চায় না। এমন প্রতি বিষয়েই গোলাম-চোর খেলা চলিতেছে। খুব সামান্য দৃষ্টান্ত দেখো। ঘোড়ার নিলামে যাঁহারা ঘোড়া কেনেন, সকলেই জানেন, যাহার হাতে খোঁড়া ঘোড়ার গোলাম আছে, কেমন কৌশলপূর্বক তোমার হাতে তাহা চালান করিয়া দেয়, যখন টানিবার উপক্রম করিয়াছ, তখন হয়তো জানিতে পার নাই, গোলাম টানিয়া চৈতন্য হইল, সেই নিলামেই গোলাম আর-একজনের হাতে চালান করিয়া দিলে। এমন দশ হাত ফিরিয়া জানি না কোন্ হতভাগ্য গোলাম-চোর হয়।

বাপের হাতে একটি অতি কুরূপা কন্যার গোলাম আসিয়াছে, গোলাম-দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বেহাত করিতে পারিলে বাঁচেন, হতভাগ্য বরের হাতে বেমালুম চালান করিয়া দিলেন, বর বেচারি শুভ দৃষ্টির সময়ে দেখিল, সে গোলাম-চোর হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা প্রায় গোলাম-চোর হন। তাঁহারাই নাকি সকলের শেষ খেলোয়াড়— এমন প্রায়ই হয় যে, গোলাম ছাড়া আর কোনো কাগজ তাঁহাদের টানিবার থাকে না, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হোমিওপ্যাথির হাতে গোলামটি সমর্পণ করিয়া বিদায় হন, তিনি গোলাম-চোর হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরেন।

অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি, তখন হয়তো আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায়

মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মতো গোলাম-চোর হইয়া থাকি। মনে করো, আমার বিদ্যার তাস মিলিয়াছে, ধনের তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা অপযশের গোলাম টানিয়া বসিয়াছি, গোলাম-চোর বলিয়া পাড়ায় টী টী পড়িয়া গিয়াছে। মনে করো, আমার ভ্রাতার তাস মিলিয়াছে, বন্ধুর তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা স্ত্রীর গোলাম টানিয়াছি, আমরণ গোলাম-চোর হইয়া কাটাইতে হইল। এইরূপ একটা-না-একটা গোলাম সকলেরই হাতে আছে। তথাপি মানুষের এমনি স্বভাব, একজন গোলাম-চোর হইলেই নিকটবর্তী খেলোয়াড়েরা হাসিয়া উঠে; তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের হাতে, সে রঙের না হউক, অমন দশখানা অন্য রঙের গোলাম আছে। জীবনের তাস খেলা যখন ফুরায়-ফুরায় হয়, সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসার মিল-অমিল সকল তাসই যখন মৃত্যু একত্র করিয়া চিরকালের তরে বাক্সয় তুলে, তখন যদি প্রতি খেলোয়াড় একবার করিয়া গনিয়া দেখে, কতবার সে গোলাম-চোর হইয়াছে আর কত রঙের গোলাম তাহার হাতে আসিয়াছিল, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারে, অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় তাহার হার কি জিত।

আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মতো গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনিতে পাই যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। চৌধুরী হালদারের হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া টানা-পদ্ধতি নাই। চৌধুরীর হাতে যদি দুরি থাকে আর হালদারের হাতেও দুরি থাকে তবেই শুভ, নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য। কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাৎ একটা তাস টানিল, চৌষট্টিটা তাসের মধ্যে হয়তো সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিরাম বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলাম-চোর হইবেন। কিন্তু বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।

অনেক অসাবধানী এমন আলগা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের হাতের কাগজ সকলেই দেখিতে পায়। পাঠকেরা যেন এমন করিয়া তাস না ধরেন। এমন অনেক বড়ো বড়ো ধনী খেলোয়াড় দেখিয়াছি, তাঁহারা এমনই আলগা করিয়া তাস ধরেন যে, প্রতিবেশীরা তাঁহাদের হাত হইতে আবশ্যকমতো সাতা টানে, আটা টানে, নহলা টানে, তাঁহারা মনে মনে ফুলিতে থাকেন, তবে বুঝি গোলামটাও টানিবে। তাঁহাদের হাতের কাগজ সব ফুরাইয়া যায়, কেবল গোলামটাই অবশিষ্ট থাকে।

পাঠকদের হাতে যদি গোলাম আসিয়া থাকে, চালান করিয়া দিবার কৌশল অবগত হউন। কোনো মতে মুখ-ভাবে না প্রকাশ হয়, হাতে গোলাম আছে। অনেক বড়ো বড়ো হৌসের হাতে গোলাম আসিয়া থাকে, লোকে যদি অঙ্কুশ মাত্রে জানিতে পারে যে, হৌসের হাতের কাগজে গোলাম দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেই তাহার খেলা সাঙ্গ হয়। যে পরিবারের হাতে মূর্খ বরের গোলাম আছে, তাহারা যদি চারি দিকে কেতাব ছড়াইয়া রাখে, মুখস্থ বুলি বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও গোলাম চালাইয়া দিতে পারে। তুমি আমি যদি এ সংসারে মুখের জোরে চলিয়া যাইতে পারি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারি, রায় বাহাদুর হইতে পারি, তাহা হইলে আরও অনেক গোলাম চলিয়া যাইতে পারে।

একে তো গোলাম-চোর হইতেই বিশেষ আপত্তি আছে, তাহাতে যদি জানিতে পারি যে, আর-একজন কৌশল করিয়া ভাঁড়াইয়া আমার হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিয়াছেন, তাহা

হইলে কিছু অপ্রস্তুত হইতে হয়। সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিয়া সহসা আবিষ্কার করেন, যে, গোলাম-চোর হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কী, অনেক পাঠক তাসের কাগজ চেনেন না, তাঁহারা অনেক সময়ে জানিতেই পারেন না যে, তাঁহারা গোলাম টানিয়াছেন। রঙচঙ দেখিয়া তাঁহারা ভারি খুশি হন, কিন্তু যাঁহারা তাসের কাগজ চেনেন, তাঁহারা গোলাম-চোরকে দেখিয়া মনে মনে হাসেন।

যাহা হউক, পাঠকেরা একবার ভাবিয়া দেখুন, কতবার গোলাম-চোর হইয়াছেন, কত রঙের গোলাম তাঁহার হাতে আছে। প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, কথাটা চাপিয়া রাখুন, কিন্তু প্রতিবেশী গোলাম-চোর হইলে তাহা লইয়া অতিরিক্ত হাস্য-পরিহাস না করেন।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়

জঠর-তত্ত্ববিৎ বুধগণ উদর-সেবাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। চর্বণ করা, শোষণ করা, লেহন করা ও পান করা। আহারের অনুষঙ্গিক ও অতি নিকট সম্পর্কীয় একটি পদার্থ আছে, পুরাতন নস্য-সেবকেরা তাহাকে অনাদর করিয়াছেন যথা, ধূমায়ন অর্থাৎ ধোঁয়ান। যাহা হউক, 'ভক্ষণ ও ভক্ষণায়ন' সভার সভ্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের পাঁচটা পরিচ্ছেদ নির্মাণ করিয়াছেন, প্রথম চর্ব্য; দ্বিতীয় চোষ্য; তৃতীয় লেহ্য; চতুর্থ পেয় ও পঞ্চম ধৌম্য। এই শেষ পরিচ্ছেদটাকে অনেকে রীতিমতো পরিচ্ছেদ বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহারা ইহাকে পরিশিষ্ট স্বরূপে দেখেন।

আমাদের বুদ্ধির খোরাককেও এইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত লালা আহার-বিহারী উদরাম্বুধি মহাশয় দেখিবেন, তাঁহাদের ভোজের সহিত বুদ্ধির ভোজের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

চর্ব্য। কাঁচা, আভাঙা সত্য। ইহা একেবারে উদরে যাইবার উপযোগী নহে। গলা দিয়া নামে না, পেটে গিয়া হজম হয় না। ইহা অতিশয় নিরেট পদার্থ। ইংরাজি বুদ্ধিজীবী ঔদরিকগণ ইহাকে facts বলেন। যদি ইহাকে দাঁত দিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, রহিয়া বসিয়া না খাও, যেমন পাও তেমনি গিলিতে আরম্ভ কর তবে তাহাতে বুদ্ধিগত শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এইটি না জানার দরুন অনেক হানি হয়। স্কুলে ছেলেদের ইতিহাসের পাতে যে আহার দেওয়া হয় তাহা আদ্যোপান্ত চর্ব্য। বেচারিদের ভাঙিবার দাঁত নাই, কাজেই ক্রমিক গিলে। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা আসিয়াছে; কোন্ রাজা কোন্ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে ও কোন্ সালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই-সকল শক্ত শক্ত ফলের আঁঠিগুলি তাহাদের গিলিতে হয়। মাস্টারবর্গ মনে করেন, ছাত্রদের মনের ক্ষেত্রে এই যে-সকল বীজ রোপণ করিতেছেন, ভবিষ্যতে ইহা হইতে বড়ো বড়ো গাছ উৎপন্ন হইবে। কথাটা যে চাষার মতো হইল; কারণ, এ যে ক্ষেত্র নয়, এ পাকযন্ত্র। এখানে গাছ হয় না, রক্ত হয়। আজকাল য়ুরোপে এই সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পাঠ্য ইতিহাস লিখিবার ধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার ইতিহাস কতকগুলা ঘটনার সংবাদপত্র ও রাজাদিগের নামাবলী নহে। অবশ্য চর্ব্য পদার্থের কাঠিন্যের কমবেশ পরিমাণ আছে। কোনোটা বা চিবাইতে কষ্ট বোধ হয় না মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়, কোনোটা চিবাইতে বিষম কষ্ট হয়। যাঁহাদের বুদ্ধি দাঁত-ওয়ালা, চর্ব্য তাঁহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। তাঁহারা কঠিন কঠিন চর্ব্যগুলিকে লইয়া বিশ্লেষণ দাঁত দিয়া ভাঙিয়া, মুখের মধ্যে আনুমানিক ও প্রামাণিক যুক্তির রসে রসালো করিয়া লইয়া এমনি আকারে তাহাকে পরিণত করেন যে, তাহার চর্ব্য অবস্থা ঘুচিয়া যায় ও সে পরিপাকের উপযোগী ও রক্ত-নির্মাণক্ষম হইয়া উঠে। ইহা একটি শারীর-তত্ত্বের নিয়ম যে, খাদ্য যতক্ষণ চর্ব্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ facts যখন কেবলমাত্র facts রূপেই থাকে, ততক্ষণ তাহা

রক্ত নির্মাণ করিতে পারে না, রক্তের সহিত মিশিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, আমাদের অসংখ্য এম-এ বি-এ'দের খাইয়া খাইয়া পিলে হয়; উদরী হয়; কাহারো কাহারো বা অপরিমিত চর্বি হয়, ও বাহির হইতে বিষম বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বল হয় না।

আমরা এখনও ভালো করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি না, আমরা চোষ্য খাইয়া থাকি। যাহাদের দাঁত উঠে নাই তাহারা শোষণ করিয়া খায়। মাতৃস্তন্য শোষণ করিয়া খাইতে হয়। অর্থাৎ মাতার শরীরে চর্ব্য দ্রব্য সকল হজম হইয়া সার দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সন্তান তাহাই শোষণ করিয়া খায়। অনেকগুলি সহজ সত্য আমরা অতীত কালের স্তন হইতে পান করি। বহুবিধ অভিজ্ঞতার চর্ব্য খাইয়া খাইয়া অতীতের স্তনে সেই দুগ্ধ জন্মিয়াছিল। আমরা বিনা আয়াসে তাহা প্রাপ্ত হই। তাহা আর চিবাইতে হয় না, একেবারে পরিপাকের উপযোগী হইয়াই থাকে। কোনো কোনো মাতার স্তনে দুগ্ধ অধিক থাকে, কাহারো দুগ্ধ কম থাকে। আমরা একটা বিলাতি দাইয়ের দুগ্ধ পান করিতেছি, আমাদের মায়ের দুধ কম। এই অস্বাভাবিক উপায়ে দুধ খাওয়া অনেকের সহে না, অনেকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহা বড়োই ব্যয়সাধ্য। পণ্ডিতদিগের মত এই যে, আমাদের সাহিত্য-মা যদি ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া, দুধ কিনিয়া নিজে খাইয়া, শরীর সুস্থ রাখিয়া স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চার করিতে পারেন, তবে দাই নিযুক্ত করা অপেক্ষা তাহাতে অনেক বিষয়ে ভালো হয়। সন্তানদের সে দুধ ভালোরূপে হজম হয়, সকল সন্তানই সে দুধ পাইতে পারে ও তাহা ব্যয়সাধ্য হয় না। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, নিতান্ত শিশু-অবস্থা অতীত হইয়া গেলে একটু একটু করিয়া চর্ব্য দেওয়া আবশ্যক, তাহাতে দাঁত শক্ত হয়, দাঁত উঠিবার সহায়তা করে। অনেক সময়ে চিবাইয়া দাঁত শক্ত করিবার জন্য ছেলেদের হাতে চুষি দেয়। বড়ো বড়ো উন্নত সমাজ এক কালে এইরূপ খাদ্য ভ্রমে চুষি চিবাইয়াছে, তাহাতে আর কিছু না হউক, তাহাদের দাঁত উঠিবার অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে এইরূপ কূট তর্কের চুষি চিবানোর প্রার্দুভাব হইয়াছিল। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি তর্ক এইরূপ চুষি, অতএব দাঁত উঠিবার সহায়তা করিতে কঠিন দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক। আমাদের, বোধ করি, এতটুকু দাঁত উঠিয়াছে যে, একটু একটু করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি। অতএব হে বঙ্গ বিদ্বন্মণ্ডলী, একটা ভালো দিন স্থির করিয়া আমাদের অন্নপ্রাশন করা হউক। হে মাসিকপত্রসমূহ, আমাদের কেবলমাত্র দুগ্ধ না দিয়া একটু একটু করিয়া অন্ন খাইতে দিয়ো।

'লেহ্যে'র কোঠায় আসিবার আগে 'পেয়' সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের শরীরের পক্ষে চর্ব্য যেরূপ আবশ্যক, পেয়ও সেইরূপ আবশ্যক। শরীরের তরল জলীয় অংশ পূরণ করাই পানীয় দ্রব্যের কাজ। অতএব, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বুদ্ধিজীবী লোকদের খোরাকে কবিতাই পানীয়। ইহা তাঁহাদের রক্তের জলীয় অংশ প্রস্তুত করে, ইহা তাঁহাদের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়। ইহা কখনো মাদকের স্বরূপে তাঁহাদের মুহ্যমান দেহে চেতনার বল সঞ্চার করে, অলস শরীরে স্ফূর্তি ও উদ্যমের উদ্রেক করে, সময় বিশেষে আবেশে গদগদ করিয়া দেয়। আবার কখনো শীতল জলস্বরূপে সংসারের রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তির পিপাসা শান্তি করে, শরীর শীতল করে। দেহের রক্ত উষ্ণ হইয়া যখন একটা অসংযত উত্তেজনা শরীরে জ্বলিয়া উঠে তখন তাহা জুড়াইয়া দেয় অর্থাৎ, অকর্মণ্যকে উত্তেজিত করে, অশান্তকে শান্তি দেয়, শ্রান্ত ক্লান্তকে বিশ্রাম বিতরণ করে। অতএব বয়স্ক বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে বুদ্ধির খাদ্য চর্ব্য সকলও যেমন আবশ্যক, আবেগের পানীয় কবিতাও তেমনি উপযোগী।

চর্ব্য কঠিন ও পেয় গভীর, কিন্তু লেহ্য তরল, অগভীর ও বিস্তৃত। যাহাদের শোষণ করিবার বয়স গিয়াছে, অথচ দাঁতের জোর কম, তাহারা লেহ্য খাইয়া বাঁচে। অধিক চিবাইতে হয় না, অধিক তলাইতে হয় না, উপর হইতে লেহন করিয়া লয়। এই বেচারিদের উপকার করিবার জন্য অনেক দন্তবান বলিষ্ঠ লোকে কঠিন কঠিন চর্ব্য পদার্থকে বিধিমতে গলাইয়া, রসে পরিণত করিয়া লেহ্য বানাইয়া দেন। নিতান্তই যাহা গলে না তাহা ফেলিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ

গলাইতে অধিকাংশ সময়ে পানীয় পদার্থের আবশ্যক করে। প্রক্টর সাহেব কঠিন জ্যোতির্বিদ্যাকে পানীয় পদার্থে গলাইয়া জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে প্রায় এক-এক পাত্র লেহ্য প্রস্তুত করিয়া দেন। আজকাল ইংলন্ডে এই লেহ্য সেবনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পড়িয়াছে। ম্যাকমিলান, ব্ল্যাকবুড প্রভৃতি দোকানদারেরা এইরূপ নানা প্রকার পদার্থের লেহ্য প্রস্তুত করিয়া ইংলন্ডের ভোজনপরায়ণদের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত আশঙ্কা করিতেছেন যে, লেহ্য সাহিত্যের অধিক প্রাদুর্ভাব হইলে লোকের দাঁতের ব্যবহার এত কমিয়া যাইবে যে, দাঁত ক্রমশই শিথিলতর হইয়া পড়িবে।

এই সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের আবার নানা প্রকার আস্বাদন আছে, কোনোটা বা মিষ্ট, কোনোটা বা তিক্ত, কোনোটা বা ঝাল, কোনোটা বা অম্ল। কোন্ প্রকারের খাদ্য মিষ্ট তাহা বলিবার আবশ্যক নাই, সকলেই জানেন। যাহা তীব্র, ঝাঁঝালো বিদ্রূপ; যাহাতে বেলেস্তরার কাজ করে; যাহা খাইতে খাইতে চোখে জল আসে, তাহাই ঝাল। অনেকের নিকট ইহা মুখরোচক, কিন্তু শরীরের পক্ষে বড়ো ভালো নহে। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে 'ঝাল ঝাড়া'। অর্থাৎ মনে জ্বালা ধরিলে আর-একজনকে জ্বালানো। বেচারি পূর্ববঙ্গবাসীগণ ক্রমাগতই ঝাল খাইয়া আসিতেছে। অম্লরস ঝালের মতো ঝাঁঝালো উষ্ণ নহে। ইহা বড়ো ঠাণ্ডা আর হজমের সহায়তা করে। ইহার বর্ণ লঙ্কার ন্যায় লাল টক্‌টকে নয়, দধির ন্যায় বিশদ, স্নিগ্ধ। ইহাকে ইংরাজিতে humour বলে, বাংলায় কিছুই বলে না। ইহার নাম বিমল, অপ্রখর রসিকতা। ইহা মুচকি হাসির ন্যায় পরিষ্কার ও শুভ্র। ইহা দুধকে ঈষৎ বিকৃত করিয়া দেয়, কিন্তু সে বিকৃত পদার্থ অন্যান্য বিকৃত পদার্থের ন্যায় ঘৃণাজনক, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ নহে। সেই বিকারের কেমন একটু বেশ মজার স্বাদ আছে। আমাদের বঙ্কিমবাবুর সকল লেখায় এইরূপ কেমন একটু অম্লরসের সঞ্চার আছে, মুখে বড়োই ভালো লাগে। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে অনেক সময়ে তিনি শুষ্ক চিড়া-সকল দই দিয়া এমন ভিজাইয়া দিয়াছেন যে, সে চিড়ার ফলারও ভোক্তাদের মুখরোচক হইয়াছে। 'ঘোল খাওয়ানো' বলিয়া একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ— মুচকি হাসিয়া অতি ঠাণ্ডা ভাবে একজনের পিত্ত টকাইয়া তুলা, ইহাতে ভোজন-কর্তার হাস্য ও পিত্ত একসঙ্গে উদ্দীপিত করে; ঝালের সে গুণটি নাই, অশ্রুর সহিত তাহার কারবার! অতিরিক্ত টক ভালো নহে। টক কেন, সকল দ্রব্যেই প্রায় অতিরিক্ত কিছুই ভালো নহে। যখন মিষ্ট খাইয়া খাইয়া রুচি খারাপ হইয়া গেছে তখন তিক্ত কাজে দেখে। সম্পাদকগণ ও গ্রন্থকারবর্গ আমাদের বাঙালি পাঠকদের মিষ্ট ছাড়া আর কিছু খাওয়াইতে চান না। যাহা পাঠকদের মুখে রোচে, তাহাই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দেন, স্বাস্থ্যজনক হউক আর না হউক। তাঁহারা ক্রমাগত পাঠকদের শুনাইতে থাকেন—'আমাদের দেশের যাহা-কিছু তাহাই ভালো, বিদেশ হইতে যাহা আনীত হয় তাহাই মন্দ। যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতে ভালো আর কিছু নাই, যাহা নূতন আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা মন্দ আর কিছু হইতে পারে না।' এই-সকল কথা আমাদের পাঠকদের বড়োই মিষ্ট লাগে, এইজন্য দোকানেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। আমার বোধ হয় এখন একটু একটু তিক্ত খাওয়াইবার সময় আসিয়াছে, নতুবা স্বাস্থ্যের বিষম ব্যাঘাত হইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে তামাকের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জঠর-তত্ত্বের যে পরিচ্ছেদে এই তামাকের কথা আছে, তাহার নাম ধূমায়ন। বুদ্ধির ভোজে নভেলকে তামাক বলে। বুদ্ধিজীবীগণ ইহাকে বুদ্ধিগত শরীরের পক্ষে অপরিহার্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের অনেকে ইহাকে মৌতাতের স্বরূপে দেখেন। বড়ো বড়ো আহারের পর এক ছিলিম তামাক বড়ো ভালো লাগে, পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক বিশেষ আবশ্যক। নিতান্ত একলা বসিয়া আছি, হাতে কিছু কাজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছি। ইহার মাদকতা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহার ফল উপরি-উল্লিখিত ভোজ্যসমূহের অপেক্ষা অনেকটা ক্ষণস্থায়ী ও লঘু, খানিকটা ধোঁয়া টানিলাম, উড়িয়া গে[illegible] তামাক পুড়িয়া গেল, আগুন নিভিয়া গেল, লঘু

ধোঁয়ার উপর চড়িয়া সময়টাকে আকাশের দিকে চলিয়া গেল। তামাকের আবার নানাবিধ শ্রেণী আছে। অনেক আষাঢ়ে আছে, যাহাকে গাঁজা বলা যায়। বঙ্কিমবাবু ডাবা হুঁকায় আমাদের যে তামাক খাওয়ান এমন তামাক সচরাচর খাওয়া যায় না। ইহার গুণ এই, ধোঁয়া অনেকটা জলের মধ্য দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বঙ্কিমবাবুর হুঁকার খোলে অনেকটা কবিতার জল থাকে। এক-এক জন লোক আছে, তাহারা হুঁকার জল ফিরায় না; দশ দিন দশ ছিলিম তামাক সাজিয়া দেয়, একই জল থাকে। এক-এক জন পাঠক আছে, তাহাদের চুরট না হইলে চলে না। তাহারা বর্ণনা চায় না, কবিত্বপূর্ণ ভাব চায় না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভাবের লীলাখেলা দেখিতে চায় না; তাহারা মাথায়-আকাশ-ভাঙা, গা-শিওরনো, চমক-লাগা ঘটনার দশ-বারোটা গরম গরম টান টানিয়া একেবারে সমস্তটা ছাই করিতে চায়। কোনো কোনো নবন্যাসবর্দার আমাদের গুড়গুড়িতে তামাক দেন। তাহার দশ হাত লম্বা, দশ পাক পেঁচানো নলের মধ্য দিয়া ধোঁয়া মুখের মধ্যে আসিতে অনেকটা দেরি করে। কিন্তু একবার আসিলেই অবিশ্রাম আসিতে থাকে। কোনো কোনো হুঁকায় আগুন (interest) নিভিয়া যায়। কোনো কোনো কলিকায় পাঠক যদি শ্রম স্বীকারপূর্বক প্রথম প্রথম খানিকটা ফুঁ দিয়া দিয়া আগুন জাগাইয়া রাখিতে পারেন, তবে শেষাশেষি অনেকটা ধোঁয়া পান।

মাসিক সংবাদপত্রের ভাণ্ডারে উপরি-উল্লিখিত ভোজের সমস্ত উপকরণগুলিই থাকা আবশ্যক। সকল প্রকার ভোক্তার খোরাক জোগানো দরকার। বিভিন্ন বিভিন্ন দোকানে ফুরন করা থাকে, কিন্তু তাহারা প্রতিবারে সময়মতো সরবরাহ করিতে পারে না, কাজেই এক-একবার এক-এক শ্রেণীর পাঠক চটিয়া উঠেন। ভারতীয় নিমন্ত্রণ-সভায় সম্পাদক মহাশয়, স্বর-রহস্য, জ্যামিতি, ভৌতিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি যে-সকল দাঁতভাঙা চর্ব্যের পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক বিশেষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছে যে, যে-সকল গুরুপাক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাদিগকে আর-একটু লেহ্য আকারে পাতে দিলে মুখে তুলিতে ভরসা হয়, নচেৎ তাহাতে পাত পূরিবে বটে, কিন্তু পেট পূরিবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৮

দরোয়ান

আমাদের কর্তা আমাদের যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন, সেখানে এত প্রকারের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, আমাদের প্রত্যেকের মনের দেউড়িতে তিনি যুক্তি বা বুদ্ধি বলিয়া এক-একটা দরোয়ান খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। এ ব্যক্তি আমাদের কী ভয়ানক শাসনেই রাখিয়াছে। আমাদের উপরে ইহার কী দারুণ একাধিপত্য! ইনি যাহাদের না চেনেন, এমন কোনো লোককে ঘরে ঢুকিতে দেন না। সদা সর্বদা পাহারা। ইনি যে গণ্ডিটি দিয়া রাখিয়াছেন, তাহার বাহিরে আমাদের কোনো মতেই যাইতে দেন না। রাত্রি হইলে এ লোকটি ঘুমাইয়া পড়ে, সেই অবসরে অনেক প্রকারের লোক পা টিপিয়া পা টিপিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, কখনো বা উৎপাত করে কখনো বা আমোদে রাখে। যেই দরোয়ানটা জাগিয়া উঠে, ঘরের মধ্যে গোলযোগ শুনিতে পাইয়া সে ডাকিয়া উঠে, 'কে রে? আমার হুকুম না লইয়া ঘরে কে আসিয়াছিস?' অমনি আমাদের স্বপ্ন-নাটকের পাত্রগণ, আমাদের Dreamatis Personœ[1] দরজা দিয়া, জানালা দিয়া, খিড়কি দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালায়। আমরা সকলে ছেলেমানুষ লোক, যে আসে তাহাকেই বিশ্বাস করি, এই নিমিত্ত দরোয়ান এমন কাহাকেও প্রবেশ করিতে

১. অপূর্ব লাটিন হইল।

দেয় না যে বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্বপ্নে আমরা কাহাকে না বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আমাদের দরোয়ান হাজার হুঁশিয়ার হউক-না-কেন, ভদ্রলোকের মতো কাপড়-চোপড় পরিয়া অনেক অবিশ্বাস্য লোক আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা অনেক লোকসান করিয়া থাকে। অনেক সময়ে আমাদের প্রতিবেশীর দরোয়ান আমাদের দরোয়ানকে সাবধান করিয়া দেয়। যদি দরোয়ানের তাহাতে চৈতন্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেন। নানা চরিত্রের দরোয়ান আছে, ভাব অতিথিগণ তাহাদের নানা উপায়ে বশ করিতে পারে। কেহ-বা হীরার আংটি ঘড়ির চেন-পরা বাবুটিকে দেখিলেই ছাড়িয়া দেয়; কেহ-বা মিষ্ট কথা শুনিলেই গলিয়া যায়, অবিশ্বাস মন হইতে চলিয়া যায়; কেহ-বা বিশ্বাস করুক বা না করুক, সন্দেশের লোভ পাইলে চক্ষুকর্ণ বুজিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয়। কত বড়ো বড়ো জাঁকালো-মত, ভুঁড়িবান ভাব হীরা জহরাৎ পরিয়া কত নাবালকের বৈঠকখানায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, অথচ তাহারা আদরের যোগ্য নহে; কত মতকে আমরা মিঠা ভাবা, মিঠা গলা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়াছি; আবার অনেক মতকে আমরা ঠিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া, বিশ্বাস করিবার প্রলোভন আছে বলিয়া ঘরে ঢুকিতে দিই। অনেক সময়ে দিনের বেলায় দরোয়ান ঝিমায়। দুই প্রহরে চারি দিক হয়তো ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে, খাটিয়াটির উপরে পড়িয়া দরোয়ানের তন্দ্রা আসিয়াছে, সেই সময়ে কত শত পরস্পর অচেনা ভাব আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত দেখিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করে; কত প্রকার অদ্ভুত খেলা খেলিতে থাকে তাহার ঠিকানা নাই; অনেকের এইরূপ অলস দরোয়ান আছে। আবার এক-একটা এমন দুর্দান্ত ভাব আছে যে, আমাদের দরোয়ানদের ঠেঙাইয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই মনে করো, ভূতের-ভয় বলিয়া এক ব্যক্তি যখন কাহারো মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যুক্তিসিং হাজার ঢাল-তলোয়ার লইয়া আস্ফালন করুন-না-কেন, তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারেন না। কাহারো বা রোগা দরোয়ান, কাহারো বা ভালো মানুষ দরোয়ান, কাহারো বা অলস দরোয়ান।

এক-একটি ছেলে আছে, যাহার এই দরোয়ানটির উপর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহাকে না লইয়া কোথাও যাইতে চায় না; সকল কাজেই তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দেয়। সে ভাবে, কে জানে কোথায় কে দুষ্ট লোক আছে, কোথায় কোন্‌খানে গিয়া পৌঁছাইব, তাহার ঠিক নাই। সে যেখানে আছে, যুক্তিও তাহার তক্‌মা পরিয়া পাগড়ি আঁটিয়া আসাসোঁটা ধরিয়া কাছে কাছে হাজির আছে। আবার এমন এক-একটা যথেচ্ছাচারী দুষ্ট ছেলে আছে, যে এই দরোয়ানটাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। সে ভাবে, এ একটা কোথাকার মেড়ুয়াবাদী আমার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে। একটা যে সংকীর্ণ গণ্ডি টানিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে কষ্টই থাক্ আর দুঃখই থাক্, আগুনেই পুড়ি, আর জলেই হাবুডুবু খাই, তাহার বাহিরে কোনো মতেই যাইতে দেয় না। অবশেষে নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া দুষ্টামি করিয়া তাহাকে মদ খাওয়াইয়া দেয়; এইরূপে বুদ্ধি যখন মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা গণ্ডির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হয়। অনেক লোকে যে মদ খাইতে ভালোবাসে, তাহার কারণ এই যে, তাহারা স্বাধীনতা পাইতে চায়; বুদ্ধিটাকে কোনো প্রকারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে চায়; ইহাতে যে বিপদই ঘটুক-না-কেন তাহারা ভাবে না। এই উভয় দলেই কিছু অন্যায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন। নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারটি দেয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানোও ভালো নয়। যুক্তির সীমানা ছাড়াইয়া যে নিরাপদ স্থান নাই, এমত নহে। অতএব মাঝে মাঝে যুক্তির অনুমতি লইয়া কল্পনার রাজ্যে খুব খানিকটা ছুটিয়া বেড়াইয়া আসা উচিত। এইরূপে যুক্তিকে কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া মাঝে মাঝে ছুটি দিলে তাহার শরীরের পক্ষেও ভালো।

'সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে।' অর্থাৎ বুদ্ধি-দরোয়ান সিদ্ধিটি খাইলে থাকে ভালো। অল্প পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে ভালো থাকে বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে খুব বলবান দরোয়ান নহিলে সামলাইতে পারে না; মাথা ঘুরিয়া যায়, ভোঁ হইয়া পড়ে। অল্প সিদ্ধি খাইলে সাবধানিতা বাড়ে, কিন্তু অধিক সিদ্ধি খাইলে এমন যশের নেশা লাগিতে পারে যে, একেবারে অসাবধানী হইয়া পড়া সম্ভব। শুনিয়াছি সিদ্ধি ও ভাঙে প্রভেদ নাই। হিন্দুস্থানীতে যাহাকে ভাঙ্ বলে বাঙালিরা তাহাকেই সিদ্ধি বলে। জাতি বিশেষে এইরূপ হওয়াই সম্ভব। একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া, উদ্যম হারাইয়া, অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকায় সিদ্ধি, অর্থাৎ চরম ফল, সেইটি হইলে সে চূড়ান্ত মনে করে; আর-একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া অজ্ঞান হইয়া থাকা ভাঙ্ মাত্র; অর্থাৎ অবসরমতো একটু একটু কাজে ভঙ্গ দেওয়া, সচরাচর অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে একটু বিক্ষিপ্ত হওয়া। যাহা হউক, আমাদের বুদ্ধির দরোয়ানদের মধ্যে সিদ্ধি ও ভাঙ্ দুই এক পদার্থ নহে। উভয়ের ফল বিভিন্ন। সিদ্ধিতে উত্তেজিত উল্লাসিত করিয়া তুলে, ভাঙেতে অবসন্ন ম্রিয়মাণ করিয়া দেয়। লেখকের দরোয়ানটা ক্রমিক ভাঙ্ খাইয়া আসিতেছে। সে বেচারির কপালে সিদ্ধি আর জুটিল না।

দরোয়ানদের আর-একটা কাজ আছে। লাঠালাঠি করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। আমোদের জন্যও বটে, কাজের জন্যও বটে। এক-এক জন এমন দাঙ্গাবাজ লোক আছে, তাহারা তাহাদের লাঠিয়াল দরোয়ানটাকে সভাস্থলে, নিমন্ত্রণে, যেখানে-সেখানে লইয়া যায়, সামান্য সূত্র পাইলেই অমনি অন্যের দরোয়ানের সঙ্গে মারামারি বাধাইয়া দেয়। এই লোকগুলা অত্যন্ত অসামাজিক। একটা দরোয়ানকে কাছে হাজির রাখা দোষের নহে, কিন্তু ছুতানাতা ধরিয়া, যখন-তখন যেখানে-সেখানে একটা তর্কের লাঠি চালাইতে হুকুম দেওয়া মনের একটা অসভ্য অসামাজিক ভাব। নিজের বুদ্ধিকে যাহারা ভেড়া মনে করে, তাহারাই বুদ্ধিকে লইয়া এইরূপ ভেড়ার লড়াই করিয়া বেড়াক। কিন্তু যাহারা ভেড়া-বুদ্ধি নহে তাহারা যেন উহাদের অনুকরণ না করে। উহারা এমনতরো দাঙ্গাবাজ যে, দাঙ্গা করিবার কিছু না থাকিলে দেয়ালে ঢুঁ মারিয়া থাকে। সর্বত্রই এমনতরো বাহাদুরি করিয়া বেড়ানো সুরুচি-সংগত নহে।

এক-এক জনের দেউড়িতে এমন এক-একটা লম্বাচৌড়া দরোয়ান আছে, তাহাকে কেহ কখনো লড়িতে দেখে নাই, অথচ তাহাকে মস্ত পালোয়ান বলিয়া লোকের ধারণা। মুখে মুখে তাহার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে; কী করিয়া যে হইল, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তাহাকে দরোয়ানেরা দেখে, নমস্কার করে, আর চলিয়া যায়। তাহার এক সুবিধা এই যে, তাহাকে প্রায় লাঠি ব্যবহার করিতে হয় না। অন্য লোকদের বড়ো বড়ো ভাব, বড়ো বড়ো মতসকলকে কেবল চোখ রাঙাইয়া ভাগাইয়া দেয়। যদি দৈবাৎ কেহ সাহস করিয়া তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতে যায়, তবেই তাঁহার সর্বনাশ। এক-একটা দরোয়ান আছে, গায়ে ভয়ানক জোর, কিন্তু সাহস কম; কোনো মতেই কুস্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু কোনো কোনো দরোয়ানের গায়ে জোর কম থাকুক, এত প্রকার কুস্তির প্যাঁচ জানে যে, অপেক্ষাকৃত বলবানদেরও পাড়িয়া ফেলিতে পারে।

যাঁহারা দেউড়ির উন্নতি করিতে চান তাঁহারা দরোয়ানদের ভালো আহার দিবেন, মাঝে মাঝে ছুটি দিবেন, দিনরাত্রি অকর্মণ্য করিয়া রাখিবেন না, আর মদ খাইতে না দেন। আমরা যেরূপ শিশু-প্রকৃতি, যাহা তাহা বিশ্বাস করি, সকলই সমান চক্ষে দেখি; আমরা যে বিপদের দেশে আছি, নানা চরিত্রের, নানা ব্যবসায়ের লোকের মধ্যে বাস; এখানে ভালো দরোয়ান রাখা নিতান্তই আবশ্যক। তাহা ছাড়া, নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া নিজের দরোয়ানকে যেন কেবলমাত্র নিজের কাজেই নিযুক্ত না রাখি, আবশ্যকমতো পরের সাহায্য করিতে দেওয়া সামাজিক কর্তব্য। আমাদের দেশে অতি পূর্বকালে পুলিসের পদ্ধতি ছিল। ব্রাহ্মণ, ঋষি ইন্‌স্পেক্টরগণ নিজের নিজের কনস্টেবল লইয়া বাড়ি বাড়ি, রাস্তায় রাস্তায়, হাটে-বাজারে, চোর-ডাকাত তাড়াইয়া

বেড়াইতেন। তাঁহাদের বেতন ছিল, ওই কাজেই তাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহার একটু কুফল এই হয় যে, স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে বা ভুল বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টরগণ যথার্থ ভদ্রলোকদের প্রতিও উৎপীড়ন করিতে পারেন। শুনা যায় তাঁহারা সেইরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বৌদ্ধদলেরা খেপিয়া এমন পুলিস ঠেঙাইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, কন্‌স্টেবলগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী-দল বেশি দিন টিকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিল। আজকাল এরূপ পুলিসের পদ্ধতি নাই। সুতরাং সাধারণের উপকারার্থে সকলকেই নিজের নিজের দরোয়ানকে মাঝে মাঝে পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা উচিত। দেশে এত শত প্রকার সিঁদেল চোর আছে, রাত্রিযোগে এমন পা টিপিয়া তাহারা গৃহে প্রবেশ করে যে, এরূপ না করিলে তাহাদের শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার দরোয়ানটা রোগা হউক, যাহা হউক, তাহাকে এইরূপ অনরারি পুলিস কন্‌স্টেবলের কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক সময়ে লড়াই করিয়া সে বেচারি পারিয়া উঠে না, বলবান দস্যুদের কাছ হইতে লাঠি খাইয়া অনেকবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৮

জীবন ও বর্ণমালা

আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের এমনি খরদৃষ্টি (বলা বাহুল্য, 'খরদৃষ্টি' ষষ্ঠী তৎপুরুষ নহে) যে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে একটি তৃণ পর্যন্তও এড়ায় না। তিনি সকলেরই মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান। যে যেমন ভাবেই কথা কহুক-না-কেন, তিনি তাহার মধ্য হইতে এমন একটি ভাব বাহির করিতে পারেন, যাহা বক্তার ও শ্রোতার মনে কস্মিন কালেও উদয় হয় নাই। ইহাকেই বলে প্রতিভা! প্রতি সামান্য কথার অসামান্য অর্থসকল বাহির করিয়া সংসারে তিনি এত অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না! সাধারণ যশের কথা! এই অতি উদার মহৎ গুণ প্রতিপদে চালনা করিতে করিতে দৈবাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা অতি নিরীহ কার্যও তিনি সাধন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি বর্ণমালার গূঢ় অর্থ বাহির করিয়াছেন অথচ তাহাতে কাহারো সর্বনাশ করা হয় নাই এই নিমিত্ত তাহা সংক্ষেপে পাঠকদের উপহার দিব।

এই পণ্ডিত-প্রবর আজ পঁচিশ বৎসর, বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশুদের কর্ণধার হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-তরঙ্গিণী পার করিয়া আসিতেছেন। যদি কোনো শিশু বিস্মৃতির ভাটায় এক পা পিছাইয়া পড়ে, তবে তাহার কর্ণ ধরিয়া এমন সুন্দর ঝিঁকা মারিতে পারেন যে, সে আর এগোইবার পথ পায় না। 'উঃ' 'ইঃ' 'আঃ' প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি অতি সহজে, সতেজে ও সমস্ত মনের সহিত উচ্চারণ করাইবার জন্য তিনি অতি সহজ কতকগুলি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বর্ণমালা সম্বন্ধে ইঁহার কথাগুলি বিনা উত্তরে শিরোধার্য করা উচিত।

লিখিত ভাষা-বিশেষ পড়িবার জন্য যে বর্ণমালা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। তাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই সমস্ত স্পষ্ট হইবে। ইংরেজদের ও আমাদের বিবাহ পদ্ধতির কী প্রভেদ, তাহা দেখিতে মনুও খুলিতে হইবে না, ইতিহাসও পড়িতে হইবে না; বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখো, বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজি বর্ণমালায় 'L' অক্ষরের পর 'M' অর্থাৎ Love-এর পর Marriage। আমাদের বর্ণমালায় 'ব'-এর পর 'ভ' অর্থাৎ বিবাহের পর ভালোবাসা। ইহার উপরে আর কথা আছে? আসল কথা এই, সমাজ যে নিয়মে গঠিত হয়, বর্ণমালাও সেই নিয়মে গঠিত হয়।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর ধরিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার বিশাল নাসাগহ্বরে এক-এক টিপ

করিয়া নস্য নামাইয়াছেন ও বর্ণজ্ঞান-সমুদ্র হইতে এক-এক রাশি রত্ন তুলিয়াছেন। পাঠকদিগকে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, আমাদের জীবনেও পাঁচ ভাগ আছে। কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য।

কবর্গ, অর্থাৎ শৈশব। (কাঁ)দা, (খে)লা, (গে)লা, (ঘা)লাগা ও উ আঁ(ঙ) করা; ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

চবর্গ, কৈশোর। এখন আর গিলিতে হয় না, (চি)বাইতে শিখিয়াছে; গড়াইতে হয় না, (চ)লিতে শিখিয়াছে; (ছু)টাছুটি করিতে পারে। সামাজিকতার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পাঁচ জন সমবয়স্কে মিলিয়া (জ)ড়ো হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু প্রথম সামাজিকতার আরম্ভে (ঝ)গড়া হইবেই। অসভ্যদের মধ্যে দেখো। তাহারা একত্র হইয়া ঝগড়া করে, ঝগড়া করিতেই একত্র হয়। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ মিলন ও বিবাদ উভয়ই। সামাজিকতা শব্দের অর্থও কতকটা সেইরূপ। বালকেরা ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে। এবং পরস্পরের মধ্যে ঈঁ অঁ(ঞ) নামক একটা কুঁজ-বিশিষ্ট বক্র-ভাবের ও তদনুযায়ী মুখভঙ্গির আদান-প্রদান চলিতেছে।

টবর্গ বা যৌবন। এইবার যথার্থ জীবনের আরম্ভ। ইহা পাঁচ বর্গের মধ্যবর্গ। ইহার পূর্বে দুইটি বর্গ জীবনের ভূমিকা; ইহার পরে দুইটি বর্গ জীবনের উপসংহার। এবং এই বর্গই জীবন। এইবার (ট)লমল করে তরী; এ পথে যাইব কী ও পথে যাইব? পথে বিষম (ঠে)লাঠেলি; ভিড়ের মধ্যে সকলেই পথ করিয়া লইতে চায়! (ঠো)কর খাইতেছে (ঠে)কিয়া শিখিতেছে বা শিখিতেছে না। বন্ধন আরম্ভ হইতেছে; যশের (ডো)রে, প্রেমের (ডো)রে, চির-উদ্দীপিত আশার (ডো)রে মন বাঁধা পড়িতেছে। যশেরই হউক আর অপযশেরই হউক, চারি দিকে (ঢা)ক (ঢো)ল বাজিতেছে। চোখে নিদ্রা নাই, মাঝে মাঝে (ঢু)লিয়া থাকে মাত্র। ইহা একটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কাল। যৌবন কাল টঠ অক্ষরের ন্যায় কঠিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। 'ক' ও 'চ'-র ন্যায় কচি নহে 'ত'য়ের ন্যায় শিথিল নহে, 'প ফ'য়ের ন্যায় একেবারে ওষ্ঠাগত নহে।

তবর্গ বা প্রৌঢ়। 'ট'য়ে যাহা কঠিন ছিল, 'ত'য়ে তাহা শিথিল (ত)লতোলে হইয়া পড়িয়াছে। এখন (ত)লাইয়া বুঝিবার কাল। যৌবনে উপরে উপরে যাহা চক্ষে পড়িত, তাহাই খাঁটি বলিয়া মনে হইত, এখন না (ত)লাইয়া কিছু বিশ্বাস হয় না। মনের দরজায় একটা (তা)লা পড়িয়াছে। যৌবনে এক মুহূর্তের তরে দ্বার বন্ধ করা মনে আসিত না; সেই অসাবধানে বিস্তর লোকসান হইয়াছে, এমন-কি, আস্ত মনটি চুরি গিয়াছে এবং সেই ডাকাতির সময় মনের সুখ শান্তি সমুদয় ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া গিয়াছে। কেহ-বা হারানো মন ভাঙাচোরা অবস্থায় উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, কেহ-বা পারেন নাই, আস্তে আস্তে দুয়ারে তালা লাগাইয়াছেন। ইঁহাদের মন (থি)তাইয়া আসিয়াছে, এক জায়গায় আসিয়া (দাঁ)ড়াইয়াছেন; মত বাঁধিয়াছেন, সংসার বাঁধিয়াছেন, ছেলেমেয়েদের বিবাহে বাঁধিয়াছেন। মাঝে মাঝে একটা একটা (ধা)ক্কা খাইতেছেন; (যৌবনের ন্যায় সামান্য ঠোকর খাওয়া নহে) উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেল, জামাই যথেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছে, দেনায় বিষয় যায় যায়। অবশেষে তাহার মন (ন)রম হইয়া আসিয়াছে, তাহার শরীর মন (নু)ইয়া পড়িয়াছে। তবর্গে লোকে (তা)স্ খেলে, (তা)মাক খায়, (দা)লানে বসিয়া (দ)লাদলি করে, (নি)ন্দা করে ও (নি)দ্রা যায়। যৌবনে ঢুলিত মাত্র, এখন (নি)দ্রা আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক, দন্ত্য ন শেষ হইল, দন্তেরও শেষ হইল।

পবর্গ বা বার্ধক্য। প্রৌঢ়ে যাহা নুইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন তাহার (প)তন হইল। পতিত বৃক্ষকে যেমন সহস্র লতায় চারি দিক হইতে জড়াইয়া ধরে, তেমনি সংসারের সহস্র (ফাঁ)দে বৃদ্ধকে চারি দিক হইতে আচ্ছন্ন করে; ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি। (বি)রাম, (বি)শ্রাম। (ভ্রা)ন্তি, (ভ)য়, (ভ)র, (ভি)ক্ষা ও অবশেষে (ম)রণ। ঢোলা নয়, নিদ্রা নয়, মহা নিদ্রা।

মানুষ (ক)(র্ম)-ক্ষেত্রে নামিল— ক হইতে আরম্ভ করিল, ম-য়ে শেষ করিল। কাঁদিয়া জন্মিল, ক্রন্দনের মধ্যে অপসারিত হইল। কিন্তু মানুষের এই সমগ্র জীবন আরম্ভ ক-বর্গের মধ্যে প্রতিবিম্বিত আছে। ক-বর্গে কী কী আছে? কাঁদা, খেলা, গেলা, ঘা লাগা ও ঙঁ আঁ করা। প্রথম কাঁদা, শৈশবের ক্রন্দন, দ্বিতীয় খেলা, কৈশোরের খেলা। তৃতীয় গেলা অর্থাৎ ভোগ, যৌবনের ভোগ। চতুর্থ ঘা লাগা, প্রৌঢ়ের শোক। পঞ্চম ঙঁ আঁ করা, বৃদ্ধের রোগ; বৃদ্ধের বিলাপ। জীবনের ভোজ অবসান হইলে যে-সকল ছেঁড়া পাত ভাঙা পাত্র, বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট ইতস্তত পড়িয়া থাকে, তাহাও ক-বর্গের মধ্যে গিয়া পড়ে, যথা— (কা)ঠ, (খা)ট, (গ)ঙ্গার (ঘা)ট ও বিলাপের ঙঁ আঁ শব্দ। আরম্ভের সহিত অবসানের এমনি নিকট সম্বন্ধ।

অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি আমাদের জীবনের অনুভাবসমূহ। এগুলি ব্যতীত কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াইতে পারে না। জীবনের যে-কোনো ঘটনা ঘটুক-না তাহার সহিত একটা অনুভাবের স্বরবর্ণ লিপ্ত আছেই। কখনো বা তৃপ্তিসূচক আ, কখনো বা তীব্র যন্ত্রণা-সূচক ই, কখনো বা গভীর যন্ত্রণা-সূচক উ, আমাদের ঘটনার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। মর্ত্য-জীবনের বর্ণমালায় সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত অভাব-সূচক 'অ' লিপ্ত থাকে। তাহাই তাহার মূল সহচর। অদৃষ্ট আমাদের এই-সকল অক্ষর সাজাইয়া এক-একটা গ্রন্থ রচনা করিতেছে। কাহারো বা কাব্য হয়, কাহারো বা দর্শন হয়, কাহারো বা ছাড়া ছাড়া অর্থহীন কতকগুলা অক্ষর-সমষ্টি হয় মাত্র, দেখিয়া মনে হয়, তাহার অদৃষ্ট হাত-পাকাইবার জন্য চিরজীবন কেবল মক্‌শো করিয়াই আসিতেছে, পদরচনা করিতে আর শিখিল না! এই-সকল রচনার খাতা হাতে করিয়া বোধ করি পরলোকে মহাগুরুর নিকটে গিয়া একদিন দাঁড়াইতে হইবে; তিনি যাহাকে যে শ্রেণীর উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

বিষয়টা অত্যন্ত শোকাবহ হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের আলংকারিকেরা বিয়োগান্ত নাটকের বিরোধী। তবে কেন আমাদের বৈয়াকরণিকেরা এমনতরো বিয়োগান্ত করুণ রসোদ্দীপক বর্ণমালার সৃষ্টি করিলেন? কিন্তু পাঠকেরা ভুলিয়া গেছেন, আমাদের সাহিত্যে পাঁচ অঙ্কেই নাটক শেষ হয় না, আরো দুটো অঙ্ক বাকি থাকে। পাঁচটা বর্গেই আমাদের বর্ণমালা শেষ হয় না, আরো দুটো বর্গ থাকে। মরণেই আমাদের জীবন-পুস্তকের সমাপ্তি নহে; তাহা একটা পদের পর একটা দাঁড়ি মাত্র। অমন কত সহস্র পদ আছে, কত সহস্র দাঁড়ি আছে কে জানে? অবশিষ্ট দুটি বর্গের কথা পরে বলিব; আপাতত পাঠকদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য এইটুকু বলিয়া রাখি 'হ'য়ে আমাদের বর্ণমালা শেষ। হ অর্থে হওয়া, মরা নহে। অতএব বিলাপ করিবার কিছুই নাই। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের নাটকের ন্যায় (কাঁ)দায় আরম্ভ (হা)সায় শেষ।

আমাদের বর্ণমালা 'অহং' শব্দের একটি ব্যাখ্যা। অ-য়ে ইহার আরম্ভ, হ-য়ে ইহার শেষ।

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

রেল গাড়ি

আমরা মনে করি, বিশ্বাসের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির হাত ধরিয়া আমরা জ্ঞানের পথে চলিতে পারি। অনেক ন্যায়রত্ন এই বলিয়া গর্ব করেন যে— সমস্ত জীবনে তাঁহারা যত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাসের কোনো হাত নাই। ইঁহারা ইহা বুঝেন না যে, বিশ্বাস না থাকিলে যুক্তি এক দণ্ড টিকিয়া থাকিতে পারে না। যুক্তিকে বিশ্বাস করি বলিয়াই তাহার এত জোর, নহিলে সে কোথাকার কে? যুক্তিকে কেন বিশ্বাস করি, তাহার একটা যুক্তি কেহ দেখাইতে পারে? কেহই না। অতএব দেখা যাইতেছে যুক্তির উপর আমাদের একটা যুক্তিহীন বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস আছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থকে বিশ্বাস করি কোন্ যুক্তি

অনুসারে? স্পৃশ্যমান বস্তুর উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করি কোন্ যুক্তি অনুসারে? তথাপি আমাদের বিশ্বাস, যুক্তিই সর্বেসর্বা, বিশ্বাস কেহই নয়। ইহা হইতে একটা তুলনা আমার মনে পড়িতেছে। যুক্তি হচ্ছে, স্টিম-এঞ্জিন, আর বিশ্বাস হচ্ছে রেলের রাস্তা। বিশ্বসুদ্ধ লোকের নজর এঞ্জিনের উপরে; সকলে বলিতেছে— 'বাহবা, কী কল বাহির হইয়াছে! অত বড়ো গাড়িটাকে অবাধে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।' নীচে যে একটা রেল পাতা রহিয়াছে, ইহা কাহারো চোখে পড়ে না, মনেও থাকে না। বিশ্বাসের রেলের উপর একটা বাধা স্থাপন করো, একটা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া রাখো, অমনি গাড়ি থামিয়া যায়; দুটি ক্ষুদ্র নুড়ি রাখিয়া দেয়, অমনি গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে, ইহা কেহ মনে ভাবিয়া দেখে না কেন? যেখানে বিশ্বাসের রেল, সেইখানেই যুক্তির গাড়ি চলে, যে রাস্তায় রেল পাতা নাই, সে রাস্তায় চলে না, ইহা কাহারো মনে হয় না কেন? তাহার কারণ আর-কিছু নয়; স্টিম-এঞ্জিনটা বিষম শব্দ করে, তাহার একটা সারথি আছে, তাহার শরীর প্রকাণ্ড, তাহার মধ্যে কত-কী কল উঠিতেছে, পড়িতেছে, এগোইতেছে, পিছাইতেছে; তাহার চোখ দিয়া আলো, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে; পদভরে মেদিনী কম্পমান। আর, রেল কত দিন হইতে পাতা রহিয়াছে, কে পাতিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই; অধিক শব্দ করে না, বরঞ্চ শব্দ নিবারণ করে; নিঃশব্দে রাস্তা দেখাইয়া দেয়, বহন করিয়া লইয়া যায়। সে পথ, সে বিঘ্ন-অপহারক সে ধ্রুব, নিশ্চল, পুরাতন, ভারবহ। সে কাহারো নজরে পড়ে না; আর, একটা ধূমন্ত, ফুঁসন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত পদার্থকে সকলে সর্বেসর্বা বলিয়া দেখে।

রেলের গাড়ির তুলনা যদি উঠিলে, তবে ও বিষয়ে যত কথা উঠিতে পারে, উঠানো যাক। সাহিত্যের রেল গাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ ফার্স্ট ক্লাসে, কেহ সেকেন্ড ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্স্ট ক্লাসে টিকিট লইয়া গাড়িতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁহার স্টেশন ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলংকার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি যে, যেখানে কালের Terminus— যাহার ঊর্ধ্বে আর স্টেশন নাই, যে স্টেশনে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই স্টেশনে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাহা সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলমালে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে; সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু-এক স্টেশনে গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়; কেহ কেহ এমন কত স্টেশন পার হইয়া যায় কেহ খোঁজ লয় না। ইহা তো কেবলমাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন। আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড ক্লাসকে ফার্স্ট ক্লাসে চড়াইয়া দেন। এমন তো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সংকোচ-পরায়ণ বেচারি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া, ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়েন, কত শত স্টেশন পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই-সকল বে-বন্দোবস্ত কোনো কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখো, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে; হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয়, সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ-সকল কেবল অসাবধানিতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে, তত দিন শত শত ফার্স্ট ক্লাসের আরোহী থার্ড ক্লাসে চড়িবে, থার্ড ক্লাসের আরোহী ফার্স্ট ক্লাসে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর-একটা আমার দুঃখ আছে।

রেলোয়ের কর্মচারীগণ বিনা টিকিটে সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছেন, নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে, তিনি নিজে আপনাকে যত বড়ো ব্যক্তিই মনে করুন-না, যতক্ষণে না তিনি ট্যাঁকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহংকারে এতখানি ফাঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকিটে অসংকোচে গাড়িতে চড়িয়া বসেন, ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহার কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও করে না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখিল, তাঁহার পাকা দাড়ি, পাকা চুল; অনেকদিন হইতে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া আসিতেছেন; তাঁহাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হইল না সাহসও হইল না। কাহারো বা হীরার আংটি, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল— আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য রেলোয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যত বড়ো লোকই হউন-না-কেন টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, অধিক কড়াক্কড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেন মিস্ করেন, তাঁহাদের জন্য বড়ো মায়া করে। তাঁহারা ঠিক সময়ে আসেন নাই। সময়মাফিক আসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাসের লোক গাড়িতে উঠিল, এমন-কি, কত লোক টিকিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল; অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্স্ট ক্লাসের লোক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান, স্টেশনে অপেক্ষা করেন না। এইরূপে কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, পকেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? জেফ্রি যে ট্রেনে গার্ড ছিলেন, বাইরন যে ট্রেনে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেন ধরিবার জন্য ওয়ার্ড্‌স্বার্থ ও শেলী স্টেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে; তাঁহারা ট্রেন মিস্ করিলেন; দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে পর তাঁহারা স্থান পাইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্প্রতি যে ট্রেন চলিতেছে, অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তি সে ট্রেনটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন আর-একখানা ট্রেন এল বলে!

বঙ্গীয় সাহিত্য ট্রেনে ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাসে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই-এক জনকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড জানে যে, তাহারা থার্ড ক্লাসের আরোহী। তাহাদের বলে, বাংলার মিল্‌টন, বাংলার বাইরন, বাংলার ফসেট্‌ ইত্যাদি, অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্‌টন, বাইরন, ফসেটের সমতুল্য নহে; অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাসে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কী? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সংকোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই তো ভালো হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য কোম্পানিতে, খুচরা, টুকরা মাল-বোঝাই গোটা কতক মালগাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, একরকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব-আরোহীদিগের জন্য আরোহী-শকট অর্থাৎ মাসিক প্রবন্ধ-পত্র ভালো চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে শ্বেতবর্ণ খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বলো! সাহিত্য এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে ভারতবর্ষের রাজা-গঞ্জে রানী-গঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর অকালে নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর এক উদ্যমের কয়লা আছে, তাহাও বাংলা দেশে এমন বিরল ও বাংলার কয়লার এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন

জ্বলে যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে; স্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকি আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিভিয়া গিয়াছে।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৮

লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী

গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে লেখাগুলিকে ভালো বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। অবশেষে সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়োই আনন্দ হইবে।

কিন্তু কই, তাহা তো হইল না! আজ সমস্তদিন ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে সদ্যপ্রসূত বইখানি হাতে লইয়া এ-পাত ও-পাত করিতেছি, কিছুই ভালো লাগিতেছে না।

লেখাগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রাণ বলিতেছে 'বাছারা, আজ তোদের এমনতর দেখিতেছি কেন? অক্ষরগুলি মাথায় মাথায় সমান, কাষ্ঠের মতো খাড়া দাঁড়াইয়া আছে! একটু কিছুই এদিক-ওদিক হয় নাই। লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপরে পাতার সংখ্যা। এ-সব তো সিপাহিদের মতো ছোরা-ছুরি-সঙ্গিন ওচানো সার-বাঁধা পোশাক-পরা অক্ষর। এ-সব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর, যেখানে যত বই দেখি, সকলই তো এইরকম অক্ষরের দেখিতে পাই! আমার সে বাঁকাচোরা সরু-মোটা অক্ষরগুলি কী হইল? কোনোটা-বা শুইয়া, কোনোটা-বা বসিয়া, কোনোটা উপরে, কোনোটা-বা নীচে। সেগুলি তো এমনতর কোণ-ওয়ালা খোঁচা-খোঁচা রেখা-রেখা খাড়া-খাড়া অক্ষর নহে; গোল, মোলায়েম, আঁকাবাঁকা, জড়ানো, অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরগুলি স্ব-স্ব প্রধান নয়। সকলেই সকলের গায়ে পড়িয়া, গলা ধরিয়া, হাতে হাতে জড়াইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকে। তাহাদের পানে চাহিলে ভাবের একটা চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবটিকে রক্তমাংসের বলিয়া মনে হয়। সে লেখা আমার প্রিয়জনেরা সকলেই ভালো করিয়া জানে, সে লেখা পথের প্রান্তে কুড়াইয়া পাইলেও তাহারা আমার বলিয়া চিনিতে পারে, সে লেখা বিদেশে পাইলে তাহাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাহারা সে লেখার মধ্যে আমার মুখ দেখিতে পায়, আমার স্পর্শ অনুভব করে, আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায়। সে আমার চিরপরিচিতগণ গেল কোথায়? আর এরা কে রে! এরা তো সব দাসের জাতি। সীসার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, ভাবশূন্য মুখে খাড়া রহিয়াছে, টাকার লোভে কাজ করিতেছে। ইহাদের সহিত আমার ভাবের নাড়ির টান নাই, ইহারা আমার ভাবগুলির প্রতি মমতার দৃষ্টিতে চায় না। আমার কাজ সমাধা করিয়া দিয়াই আবার তখনই হয়তো আমার সমালোচকের কাজ করিতে যায়! এ-সকল হৃদয়হীন দাসগুলিকে দেখিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গেছে।

ওরে, তোদের সে কাটাকুটিগুলি গেল কোথায়! তোদের সে কালির দাগগুলা যে দেখি না! পূর্বে তো তোদের এমনতর নিখুঁত ভদ্রলোকটির মতো চেহারা ছিল না। ঘরের ছেলের মতো গায়ে ধুলা-কাদা মাখা, কাপড়ে দাগ, সেই তো তোকে শোভা পাইত। আর আজ সহসা তোদের এমনতর পরিপাটি বিজ্ঞভাব দেখিলে যে জেঠামি বলিয়া মনে হয়। বাপু, তোরা কি জানাইতে চাস তোদের মধ্যে একেবারে বানান ভুল ছিল না? কোথাও দন্ত্য সয়ের জায়গায় তালব্য শ ছিল না? আজ বড়ো লজ্জা বোধ হইল? পাড়াগেঁয়ে ছেলে শহরে আসিয়া যেমন প্রাণপণে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় তোদেরও কি সেই দশা হইল? তোরা আমার পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তোদের উচ্চারণ শুনিয়া শহরশুদ্ধ লোকের পেট ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু বাপের কানে অমন মিষ্ট

আর কী আছে। তোদের সে বানান-ভুলগুলি আমার পরিচিত হইয়া গেছে, তোদের মুখের সহিত, আমার স্নেহের সহিত তাহারা জড়িত হইয়া গেছে। তাহাদের না দেখিলে আমি ভালো থাকি না। তাহাদের না দেখিলে তোদের যে ভাবে লিখিয়াছিলাম, সে ভাব আমার ঠিক মনে পড়ে না।

আগে তোদের আদর কম ছিল? জলটি লাগিলে তোদের অক্ষর মুছিয়া যাইত, একটি পাতা দৈবাৎ ছিঁড়িয়া বা হারাইয়া গেলে হাজার টাকা দিলেও আর সেটি পাওয়া যাইত না। ছাপার অক্ষর ধোয় না মোছে না, একটা বই হারাইয়া গেলে একটা টাকা দিলেই তৎক্ষণাৎ আর-একটা বই আসিয়া পড়ে। তোরা এখন আর অমূল্য নহিস, একমাত্র নহিস, তোদের গায়ে দোয়াত-শুদ্ধ কালি উলটাইয়া পড়িলেও কেহ আহা-উহু করিবে না।

আসল কথা, এখন তোরা যে নতুন কাগজে, নতুন অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিস, ইহাতে তোদের আজন্মকালের ইতিহাস লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তোদের দেখিলেই মনে হয় যেন তোরা এই নির্ভুল নির্বিকার অবস্থাতেই একেবারে হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িলি। যে মানুষকে ভাবিতে হয়, যাহাকে সংশোধন করিতে হয় তাহার ঘরে যেন তুই জন্মগ্রহণ করিস নাই! কেহ যদি তোকে তোর খাতা-নিবাসী সহোদরটির কথা জিজ্ঞাসা করে, তুই যেন এখনই লজ্জিত হইয়া বলিবি, ও আমার বাড়ির সরকার! এইজন্যই কেহ তোকে মায়া করে না, তোর একটা দোষ দেখিলেই সমালোচকেরা ঝাঁটা তুলিয়া ধরে। কাঁচা কালির অক্ষর ও কাটাকুটির মধ্যে তোকে দেখিলে কি কেহ আর তোকে অমন কঠোর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে পারে! তুই এমনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অক্ষরে সাজসজ্জা করিয়াছিস যে তোর সামান্য ভুলটিও কাহারো বরদাস্ত হয় না।

সেই কাঁচা অক্ষর, কাটাকুটি, কালির দাগ দেখিলেই, আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে; কখন লিখিয়াছিলাম, কী ভাবে লিখিয়াছিলাম, লিখিয়া কী সুখ পাইয়াছিলাম, সমস্ত মনে পড়ে। সেই বর্ষার রাত্রি মনে পড়ে, সেই জানলার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে। আর, আর-একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই তো যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল! তোদের সেই সুখদুঃখপূর্ণ শৈশবের ইতিহাস আর তেমন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তাই আর তেমন ভালো লাগে না।

তোরা আমার কন্যা। যখন তোরা খাতায় তোদের বাপের বাড়িতে থাকিতিস, তখন তোরা কেবলমাত্র আমারই সুখ-দুঃখের সহচরী ছিলি। মাঝে মাঝে তোদের কাছে যাইতাম, তোদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতাম, মনের ভার লাঘব হইত। বন্ধু-বান্ধবরা আসিলে তোদের ডাকিয়া আনিতাম, তাহারা আদর করিত। তাহারা কহিত এমন মেয়ে কাহারো আজ পর্যন্ত হয় নাই, শীঘ্র হইবে যে এমন বোধ হয় না, শুনিয়া বড়ো খুশি হইতাম। এখন আর তোরা আমার নহিস, তোদের রাজশ্রী শ্রীমান সাধারণের হাতে সমর্পণ করিয়াছি।। তোরা এখন দিনরাত্রি ভাবিতেছিস আমার এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ জামাতা বাবাজি তোদের আদর করে কি না। যদি দৈবাৎ কোথাও একটা ভুল হয়, পান হইতে চুন খসে, অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শুদ্ধিপত্রে মার্জনা ভিক্ষা করিস। রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস। শ্বশুরবাড়ি পাছে কেহ তোকে ভুল বোঝে এই ভয়েই সারা, সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সমালোচনা শাশুড়িমাগী উঠিতে বসিতে খুঁত ধরে। কথায় কথায় তোদের বাপের বাড়ির দৈন্য লইয়া খোঁটা দেয়। বাপের বাড়ির নিঃসংকোচ লজ্জাহীনতা, ঘোমটাহীন এলোথেলোভাব যত্নপূর্বক দূর করিয়াছিস, শ্বশুরবাড়ির খোঁপা-বাঁধা পারিপাট্য ও ঘোমটা-দেওয়া বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছিস। এক কথায়, বাপের বাড়ির আর কিছু রহিল না। এখন আর

একমাত্র আমার কথাই ভাবিস না, কে কী বলে তাই ভাবিয়া সারা।

আবার আমার চিরায়ুষ্মান জামাইটির মতো খামখেয়ালি মেজাজের লোক অতি অল্পই আছে। সে আজ আদর করিল বলিয়া যে কালও আদর করিবে তাহা নহে। এক-এক সময় তাহার এক-একটি সুয়ারানী থাকে তাহারই প্রাদুর্ভাবে আর বাকি সকল রূপবতী গুণবতীগণ দুয়ারানীর শ্রেণীতে গণ্য হইয়া যায়। তাহার রাজান্তঃপুরে কত আদরের মহিষী আছে, তাহাদের মধ্যে আমার এই গুটিকতক ভীরু স্বভাব দুর্বল কুসুম-পেলবা কন্যা স্থাপন করা কি ভালো হইল! একবার চাহিয়া দেখো, অপরিচিত স্থানে গিয়া, অনভ্যস্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে যেন এক সার কাঠের পুতুলের মতো দেখাইতেছে। আর যাহাই হউক, আমার এ সাদাসিধা পাড়াগেঁয়ে কবিতাগুলিকে এরকম ছাপার অক্ষরে মানায় না। দম্ভোলি, ইরম্মদ ও কড়কড় শব্দ নহিলে যেন ছাপার অক্ষর সাজে না।

এমন কাজ কেন করিলাম। কবিতাগুলি যখন খাতায় ছিল তখন আমার সুখের কি অভাব ছিল! এখন যে সকলেই বিদেশীর মতো ইহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে! কেহ বলিবে ভালো, কেহ বলিবে মন্দ, কেহ সম্মান করিবে, কেহ অপমান করিবে, কিন্তু ইহার ত্রুটি তো কেহই মার্জনা করিবে না; ইহাকে আপনার লোক বলিয়া কেহই তো কোলে তুলিয়া লইবে না! আপনার ধন পরের সম্পত্তি হইয়া গেল, যে যাহা করে, যে যাহা বলে চুপ করিয়া সহিতেই হইবে। আয় রে ফিরিয়া আয়— তোদের সেই কাঁচা অক্ষর, বানান-ভুল, কালির দাগের মধ্যে ফিরিয়া আয়, স্নেহের আরামে থাকিবি। চব্বিশ ঘণ্টা সোজা লাইনের নীচে অমনতর খাড়া হইয়া থাকিতে হইবে না।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

গোঁফ এবং ডিম

সকলেই বলিতেছেন, এখানে গোঁফ না বলিয়া গুম্ফ বলা উচিত ছিল। আমি বলিতেছি তাহার কোনো আবশ্যক নাই। গোঁফটা কিছু এমন একটা হেয় পদার্থ নহে যে, তাহাকে সংস্কৃত গঙ্গাজলে না ধুইয়া ভদ্রসমাজে আনা যায় না। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ। গোঁফের পিতামহের নাম ছিল গুম্ফ; তিনি ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্যদের মুখে যথাকাল বিরাজ করিয়া গুম্ফলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহারই কুল-কজ্জল বংশধর শ্রীযুক্ত গোঁফ অধুনা চাটুর্যে বাঁড়ুয্যে মুখুয্যেদের ওষ্ঠ বৈদুর্য সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি নাসারন্ধ্রের সমীরণ সুখে সেবন করিতেছেন। অতএব গোঁফ যখন তাহার পিতা-পিতামহের বাস্তুভিটা না ছাড়িয়া তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরের পৈতৃক স্বত্ব সমান প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে, তখন যদি তাহাকে তাহার নিজের নামে অভিহিত না করিয়া গুম্ফের নামে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, তবে অভিমানে সে চিবুকের নীচে আসিয়া ঝুলিয়া পড়ে।

তোমাদের কল্পনাশক্তি সামান্য, এইজন্যই ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া না বলিলে তোমাদের কানে পৌঁছায় না! বাজের শব্দ তোমরা শুনিতেই পাও না, কাজেই তোমাদের জন্য ইরম্মদের কড়্‌কড়্ করা আবশ্যক। প্রকৃতির ছোটো জিনিসের মহত্ত্ব তোমরা দেখিতে পাও না, এইজন্য তোমাদিগকে হাঁ করাইবার অভিপ্রায়ে বড়ো বড়ো আতস কাচ আনাইয়া শিশুদের মুখের উপর ধরিয়া তাহাদিগকে দৈত্য দানব করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমাদের স্থূল কল্পনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমি এই দুই-চারি ইঞ্চি গোঁফকে টানিয়া টানিয়া চিনেম্যানের টিকির মতো অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া তুলি, এবং গোঁফ শব্দের সহজ-মাহাত্ম্যের পেটের মধ্যে গোটা আষ্টেক-দশ বড়ো বড়ো অভিধান পুরিয়া তাহাকে উদরী রোগীর মতো অসম্ভব স্ফীত

করিয়া তুলি তাহা আমার কর্ম নহে।

আমি আজ গোঁফের সম্বন্ধে কেবলমাত্র গুটিকতক সহজ সত্য বলিব ও আমার বিশ্বাস, তাহা হইলেই কল্পনাবান মনস্বীগণ স্বতই তাহার পরম মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

ইহা দেখা গিয়াছে গোঁফ যতদিন না উঠে ততদিন পরিষ্কাররূপে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। স্ত্রীলোকদের গোঁফ উঠে না, স্ত্রীলোকদের পরিপক্ব বুদ্ধিরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদে পড়িলে বুদ্ধির নিমিত্ত গোঁফের শরণাপন্ন হইতে হয় না, এমন কয়জন গুঁফো লোক আছে জানিতে চাহি। সংসার ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গোঁফের হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া ১০/১৫ মিনিট অনবরত খোশামোদ করিতে হয়, তবেই তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তের সেব্যমান হস্তে পাকা বুদ্ধি অর্পণ করেন।

অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধির সহিত গোঁফের সহিত একটা বিশেষ যোগ আছে। বয়স্কেরা যে শ্মশ্রুগর্বে গর্বিত হইয়া অজাত-শ্মশ্রুদিগকে অর্বাচীন জ্ঞান করেন, অবশ্যই তাহার একটা মূল আছে। গোঁফ উদ্গত হইয়াই তৎক্ষণাৎ একজোড়া ঝাঁটার মতো বালকদের বুদ্ধিরাজ্যের সমস্ত মাকড়সার জাল ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলে, ভাবের ধুলা ঝাড়িয়া দেয়, সমস্ত যেন নূতন করিয়া দেয়। অতএব এই অজ্ঞান-ধূমকেতু গোঁফ যুগলের সহিত বুদ্ধির কী যোগ আছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

এ বিষয়ে মনোনিবেশপূর্বক ধ্যান করিতে করিতে সহসা আমার মনে উদিত হইল, 'গোঁফে তা দেওয়া' নামক একটি শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আপেল ফল পতন যেমন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইয়াছিল, 'গোঁফে তা দেওয়া' শব্দটি তেমনি বর্তমান আলোচ্য মহত্তর আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইল। ইহা হইতে এই অতি দুর্লভ সত্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় যে বায়ুবাহিত বা পক্ষীমুখভ্রষ্ট বীজ অপেক্ষা তদুৎপন্ন বৃক্ষ অনেকগুণে বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

'তা দেওয়া' শব্দ আমার মাথায় আসিতেই আমার সহসা মনে পড়িল যে নাকের গুহার নীচে এই যে গোঁফটা ঝুলিতেছে ইহা বুদ্ধির নীড় মাত্র। বুদ্ধি বল, ভাব বল, এইখানে তাহার ডিম পাড়িয়া যায়। কতশত বুদ্ধির ডিম, ভাবের ডিম আমাদের গোঁফ-নীড়ের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, দিবারাত্রি উত্তপ্ত নিশ্বাসবায়ু লাগিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কি আমরা জানিতে পারি? মায়াবিনী প্রকৃতিদেবী সকল কার্য কী গোপনেই সম্পন্ন করিতেছেন! বিশেষত অপরিস্ফুট জন্ম-পূর্ব অবস্থায় তিনি সকল দ্রব্যকে কী প্রচ্ছন্ন ভাবেই পোষণ করিতে থাকেন। বৃক্ষ হইবার পূর্বে বীজ মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, প্রাণীদিগের ভ্রূণ জঠরান্ধকারে নিহিত থাকে, এবং এই চরাচর অস্ফুট শৈশবে অন্ধকারগর্ভে আবৃত ছিল, মনুষ্যের বুদ্ধির এবং ভাবের ডিমও গোঁফের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে থাকে। মনুষ্যবুদ্ধি বিজ্ঞান মায়াবীর কাঁধে চড়িয়া প্রকৃতির মহা-রহস্যশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে ও সেই রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রের মধ্য দিয়া সেই অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কয়জন বিজ্ঞানবিৎ গোঁফের অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাবডিম্ব পরিস্ফুটনের মহত্তত্ত্ব আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি আজ দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই গোঁফের মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার অগণ্য শাখা-প্রশাখার উপরে কতবিধ জাতীয় ভাব আসিয়া নিঃশব্দে ডিম পাড়িয়া যাইতেছে, তাহাই চুপ করিয়া দেখিতেছি।

আমরা অনেক সময়ে জানিতেই পারি না কোথা হইতে সহসা এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কেমন করিয়া জানিব বলো! কখন আমাদের গোঁফে নিঃশব্দে ডিম্ব ভাঙিয়া পাখিটি মাথায় আসিয়া উড়িয়া বসিল, তাহা সব সময়ে টের পাওয়া যায় না তো। কিন্তু যখন আমাদের তাড়াতাড়ি একটা কোনো বুদ্ধির আবশ্যক পড়ে, তখন স্বভাবতই আমরা ঘন ঘন

গোঁফে তা দিতে থাকি, ও তামাক টানিয়া তাহার উত্তপ্ত ধোঁয়া গোঁফের শাখায় শাখায় সঞ্চারিত করিয়া দিই।

আজ গোঁফের কী মহত্ত্ব আমাদের মনের সম্মুখে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। ভাবের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া করিয়া আমরা গোঁফের গঙ্গোত্রী শিখরের উপরে গিয়া উপনীত হইয়াছি। আজ ভূতত্ত্বশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর যুগপরম্পরা অতিক্রম করিয়া, দ্রব অবস্থায় পৃথিবী যে চতুর্দিকব্যাপী ঘন মেঘনীড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল, ভাবজগতের সেই আদিম গুম্ফমেঘনীড়ের মধ্যে বিজ্ঞান-বলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মহৎ ভাবে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাসদেবের যে অত্যন্ত বৃহৎ এক জোড়া গোঁফ ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কারণ যে গোঁফে তিনি বৃহৎ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের আঠারোটা ডিম নয়টা নয়টা করিয়া দুইদিকে অদৃশ্যভাবে ঝুলাইয়া বহন করিয়া বেড়াইতেন সে বড়ো সাধারণ গোঁফ হইবে না। ক্রম্‌ওয়েল সাহেবের গোঁফে ইংলন্ডের বর্তমান পার্ল্যামেন্টের ডিম যখন ঝুলিত, তখন কেহ দেখিতে পায় নাই, আজ দেখো, সেই পার্ল্যামেন্ট ডিম ভাঙিয়া মস্ত ডাগর হইয়া ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া বেড়াইতেছে। পিতামহ ব্রহ্মার আর কিছু থাক্ না থাক্, চার মুখে চার জোড়া খুব বড়ো বড়ো গোঁফ অনন্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে? নহিলে চরাচর কোথায় থাকিত।

হায় হায়, যাহারা গোঁফ কামায়, তাহারা জানে না কী ভয়ানক কাজ করিতেছে। হয়তো এক জোড়া গোঁফের সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশের স্বাধীনতা কামাইয়া ফেলা হইল! একটা ভাষার সাহিত্য কামাইয়া ফেলা হইল! হয়তো কাল প্রত্যুষেই আমি মানব সমাজে এক ভূমিকম্প উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় গোঁফ কামাইয়া ফেলিলাম, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাজের ভূমিকম্প কামাইয়া ফেলিলাম! কবি গ্রে সাহেব কবরস্থানে গিয়া মূক, গৌরবহীন মৃত গ্রাম্য মিল্‌টনদের স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি নাপিতের ক্ষৌরশালায় গিয়া কবির দিব্যচক্ষে ছিন্ন গোঁফরাশির মধ্যে শত শত ধূলিধূসরিত সভ্যতা, সাধু সংকল্প ও মহৎ উদ্দেশ্যের ভ্রূণহত্যা দেখিতে পাইতেন, ধূলিতে লুণ্ঠমান নীরব সংগীত শিশু, অঙ্কুরে বিদলিত মহত্ত্বের কল্পবৃক্ষ সকল দেখিতে পাইতেন, তবে না জানি কী বলিতেন।

আমি যখন কোনো বড়ো লোক দেখি, তখন তাঁহার গোঁফজোড়াটা দেখিয়াই সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহার সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি যদি গোঁফে চাড়া লাগান্ তো ভয়ে তর্ক বন্ধ করিয়া ফেলি! মনে মনে একবার কল্পনা করিয়া দেখি, যেন, বর্তমান কাল অত্যন্ত ভীত হইয়া ওই গোঁফের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাবিতেছে, না জানি কোন্ একটা বলবান ভবিষ্যৎ-বাচ্ছা কাল-পরশুর মধ্যে ডিম্ব ভেদ করিয়া গরুড়-পরাক্রমে ওই গোঁফের ভিতর দিয়া হুস্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, ও বর্তমান কালটাকে সিংহাসন হইতে হেঁচড়াইয়া আনিয়া নিজে তাহার উপরে গট্ হইয়া বসিবে! মনে মনে এই কামনা করি যে নাপিতের ক্ষুর কখনো যেন ও গোঁফজোড়া স্পর্শ না করে!

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা গোটাকতক তীক্ষ্ণ-চঞ্চু ক্ষুদ্রচক্ষু হিংস্র পাখি পুষিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা কোনো কালে নিজে ডিম পাড়িতে পারে না, কেবল পরের নীড়ে খোঁচা মারিয়া ও পরের শাবককে ঠোকরাইয়া বেড়ায়। এইরূপে ইহাঁরা অনেক ভালো ভালো জাতের ভাবগুলিকে বধ করিয়া থাকেন। মনে মনে বিষম অহংকার। কিন্তু ইহা হয়তো জানেন না, যদি এই শাবক বেচারিরা নিতান্তই শিশু অবস্থায় এরূপ খোঁচা না খাইত ও পুষ্ট হইয়া কিছু বড়ো হইতে পারিত, তবে এই নৈয়ায়িক হিংস্র পক্ষীগণ ইহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। আমার সামান্য গোঁফ হইতে আজ এই যে একটি পাখি বাহির হইয়াছে, ইহার জন্ম সংবাদ পাইয়াই অমনি চারি দিক হইতে নৈয়ায়িক পক্ষীগণ ইহার চারিদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেহ-বা ইতিহাসে ঠোঁট শানাইয়া আসিয়াছেন, কেহ-বা পুরাণের আগায় ঠোঁট ঘষিয়া আসিয়াছেন, কেহ-

বা তর্কশাস্ত্র নামক ইস্পাতের ছুরি দিয়া ঠোঁট চাঁচিয়া চাঁচিয়া নিন্দুকের কলমের আগার মতো ঠোঁটটাকে খরধার করিয়া আসিয়াছেন, রক্তপাত করিবার আশায় উল্লসিত। ইঁহারা আমার শাবককে নানারূপে আক্রমণ করিতেছেন। একজন নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিতেছেন, যে, 'তোমার কথা অপ্রামাণ্য। কারণ ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ গোঁফ দাড়ি এমন-কি, চুল পর্যন্ত কামাইয়া কেবল একটুখানি টিকি রাখিতেন! তাঁহারা কি আর বুদ্ধির চর্চা করিতেন না!' এই লোকটার কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া একবার ভাবিলাম, 'আমি ভাবকে জন্ম দিয়া থাকি, কাজেই ন্যায়শাস্ত্র লইয়া খোঁচাখুঁচি করা আমার কাজ নহে। আমরা ভাবের উচ্চ আসনে বসিয়া থাকি, কাজেই উহারা নীচে হইতে চেঁচামেচি করিয়া থাকে। করুক, উহাদের সুখে ব্যাঘাত দিব না।' অবশেষে গোলমালে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উহাদেরই অস্ত্র অবলম্বন করিতে হইল। আমি কহিলাম— 'প্রমাণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বেড়ানো আমার পেশা নহে, সুতরাং আমার সে অভ্যাস নাই; আমি কেবল একটি কথা বলিতে চাহি, ভারতবর্ষে যখন বৃহৎভাবের জন্ম হইত, তখন ঋষিদের বড়ো বড়ো গোঁফ ছিল। অবশেষে ভাবের জন্ম যখন বন্ধ হইল, কেবলমাত্র সঞ্চয়ের ও শ্রেণীবিভাগের পালা পড়িল, তখন গোঁফের আবশ্যকতা রহিল না। তখন সঞ্চিত ভাবের দলকে মাঝে মাঝে টিকি টানিয়া জাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত, তখন আর তা দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু আর্যদের অবনতির আরম্ভ হইল কখন হইতে? না, যখন হইতে তাঁহারা গোঁফ কামাইয়া টিকি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। এককালে যে ওষ্ঠের ঊর্ধ্বে ভাবের নিবিড় তপোবন বিরাজ করিত, এখন সেখানে সমতল মরুভূমি! কেবল প্রাচীন কালের কতকগুলি ভাবের পক্ষী ধরিয়া স্মৃতির খাঁচায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সকালে বিকালে একটু একটু শুষ্ক মস্তিষ্ক খাইয়া থাকে। অনেকগুলা মরিয়া গিয়াছে, অনেকগুলা ডাকে না, কেহ আর ডিম পাড়ে না, স্বাধীন ভাবে গান গায় না, কেবল টিকি নাড়া দিলে মাঝে মাঝে চেঁচায়! গোঁফ কামাইয়া এই তো ফল হইল! অতএব হে ভারতবর্ষীয়গণ, আজই তোমরা 'রাখো গোঁফ কাটো টিকি'।

'যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ কাব্যের প্রতি বিমুখ, যাঁহারা পদে পদে ফল, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব দেখিতে চান তাঁহাদের নিমিত্ত আমার এই গোঁফ তত্ত্ব আবিষ্কারের ফল বুঝাইয়া দিই! আমার এই লেখা পড়িলে ভারতবাসীদের চৈতন্য হইবে যে— ভারতবর্ষে বহুবিধ খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে যেরূপ তাহা থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি আমরা গোঁফের উপযোগিতা জানি না বলিয়া তাহার যথার্থ সদ্‌ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, ও এইরূপে দেশের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। আজ হইতে আমরা যদি গোঁফের শুশ্রূষা করি, গোঁফে অনবরত তা দিতে থাকি ও গোঁফ না কামাই, তবে তাহা হইতে না জানি কী শুভ ফলই প্রসূত হইবে। যেদিন ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক আকর্ণ-পূরিত গোঁফ নাপিতের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে, সেদিন ভারতবর্ষের কী শুভদিন! আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি পূর্ব দিকের মেঘমালার অন্ধকার হইতে যেমন ধীরে ধীরে সূর্য উত্থান করিতে থাকেন, তেমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি সন্তানের গুম্ফমেঘের মধ্য হইতে ওই দেখো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য ধীরে ধীরে উত্থান করিতেছে, ওই দেখো সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য ও শাক্যসিংহের পবিত্র জন্মভূমিতে পুনরায় প্রভাত কিরণ বিস্তীর্ণ হইতেছে!' (ঘন ঘন করতালি)।

হে আমি, হে গোঁফতত্ত্ববিৎ বুধঃ, তুমি আজ ধন্য হইলে। আজ তোমার গোঁফের কী গর্বের দিন। তাহারই নীড়জাত শাবকগুলি আজ কলকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে তোমার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইয়া আসিতেছে এবং সেই গোঁফ স্নেহভরে নতনেত্রে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সগর্বে মুখ হইতে উড্ডীন শাবকদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

হে সমালোচকশ্রেষ্ঠ, তুমি যদি এই শাবকগুলি ধরিয়া তোমার খরশাণ কলম দিয়া জবাই কর

ও লঙ্কা মরিচ দিয়া রন্ধন কর তবে তাহা নব্যশিক্ষিত পাঠকদের মুখরোচক হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কাজটা কি হিন্দুসন্তানের মতো হইবে?

ভারতী
আষাঢ় ১২৯০

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্য কেবলমাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভালো করিয়া থাকা। সত্য শিব না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্যজীবন সত্য, কর্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

ভারতী
আষাঢ় ১২৯১

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষের কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃস্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি— 'প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীনকালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি।'[১]

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি এই তো আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্বে হয় তো কত পূর্বে ও যদি পরে হয় তো কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত— চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদে আছে— 'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কী লেখা আছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসরমতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ

---

১. *Memories of Catternob Cruikshank Hutchinson,* Vol. V, p. 1058.

ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাস্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাংলা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মতো বিনা চাষে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

---

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin. Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্‌ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

১. See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language,* Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

২. *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

---

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin, Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

১. See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language*, Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

২. *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

সিংহল দ্বীপের অন্তর্বর্তী ত্রিনকমলিতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। 'হ'টিকে কেহ বা 'ক্ষ' বলিতেছেন, কেহ-বা 'ঞ্চ' বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে 'হ' তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার 'ভ'টিকে কেহ-বা বলেন 'র্চ্চ', কেহ-বা বলেন 'ক্লৈ', কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 'ভানুসিংহ' শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলিতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর-একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্তী একটি পর্বতে সূর্যের (ভানু) প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংস হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্তি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্তিখোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে— স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোনো অর্থই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিনকমলির কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্তবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্রবাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণসমেত একটা প্রস্তরফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিন্‌কমলির অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়তো বা অন্যান্য মতিমান লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীতভাবে তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক বা না হউক সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা তো স্থির হইয়া গেল।

নবজীবন
শ্রাবণ ১২৯১

পুষ্পাঞ্জলি

সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? সেখানে তো মা আছে— তাহারা কি তাহাদের ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া, চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে? কত শত সেখানে কুটির গাছপালার মধ্যে, নদীর ধারে, পর্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে অরণ্যের প্রান্তে আপনার আপনার স্নেহ প্রেম সুখ-দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সেখানে আমাদের কোনো অজ্ঞাত একটি পাখি এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখ-দুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখির গান মিশিয়া যায়। তাহাদের দেশে যে-সকল কবিরা বহুকাল পূর্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের 'পরে শুইয়া এই পাখির গান শুনিত ও গান গাহিত। সে হয়তো আজ বহুদিনের কথা— কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও তো সহসা এই স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখির গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে-সমস্ত সুখ-দুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত ঠিক আমাদের মতো করিয়াই খেলিত, এমনি করিয়াই কাঁদিত— তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না। তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্তভাবেই লাগিত— তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত— তাহারা এককালে বালক-বালিকা ছিল— যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত, তখন মনে হইত না তাহারাও বড়ো হইবে। কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারি দিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে 'নাই' হইয়া গেল। বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ বকুল গাছটি দেখিতেছি— একদিন কোন্ সকাল বেলায় কী সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপণ করিতেছিল— সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার নাম করে না, তাহারা আর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না— যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে এমনি ভান করে— যেন তাহাদের সহিত কাহারো যোগ ছিল না!

—

কিন্তু, এই বুঝি এ জগতের নিয়ম! আর, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে! যতদিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে— তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়— তোমাকে এই জগৎ দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়। খরতর কালস্রোতের মধ্যে তোমাকে খরকুটার মতো ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হু হু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিন-দুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য

আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালোবাসার এই পুরস্কার! কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এই তো চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এই তো চিরদিন হইবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই— তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা হয়তো আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়তো আমাকে চাহিতেছে! এককালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল— কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে— কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না। আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক। বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে— যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে— যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালোবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে এই জগতের মধ্যাহ্ন কিরণে কি তাহার সেই ভালোবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে, তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না।

—

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারো মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

—

আমরা যাহাদের ভালোবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্না রাত্রির একটা অর্থ আছে— বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতরো দেখিতে হইয়াছে— নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত। তাই যখন একজন প্রিয় ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়— মনে আশ্চর্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না। যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়-ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালোবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালোবাসার চারি দিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক একদিন কী মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে. প্রভাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্যসাগরেও তাহারই একতালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে— কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান। কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও

তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল! একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না!

—

যখন আমাদের প্রিয়-বিয়োগ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয় অথচ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে; যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে জিনিস থাকে তাহা ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ সমস্ত সত্য কি না; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায়, তখন আমরা জগৎকে চারি দিকে স্পর্শ করিয়া দেখি— ইহারা সব ছায়া কি না, মায়া কি না, ইহারাও এখনই চারি দিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কি না। কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে, তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরও দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে ফুলেরা বলিত, সে না থাকিলে ফুটিব না, যে জ্যোৎস্না বলিত সে না থাকিলে উঠিব না, তাহারাও আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, তেমনি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনও ঠিক ততখানি সত্যই আছে— একচুলও ইতস্তত হয় নাই!—

এইজন্য সে যে নাই এই কথাটাই অত্যন্ত বেশি করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর সমস্তই অতিশয় আছে।

—

আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য, আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শত সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর কোনো সম্বন্ধই রহিল না— সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল— এ-জন্মের মতো আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরও সতেরো বৎসর যাইতে পারে! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কত নূতন সুখ আসিবে, কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো হাসিবেন না— কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো কাঁদিবেন না। কত শত দিন-রাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক

মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়— তাঁহারও কত নূতন সুখ-দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোনো যোগ নাই। যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক।

—

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে-না-হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত! বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকুমাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কী মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্য-পরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দ, আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালোবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা— এমন কত-কী দৃশ্য সূর্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম! এখন আর তাহা হয় না! আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের একজায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে! এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়! তখন আর বাঁশি বাজে না! বাপ-মায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়— একদিন সকালে মধুর সূর্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না! বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে সেই ছোটো মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল। অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যেরূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কী খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল! সেদিনও প্রভাত এমনি মধুর ছিল!

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ-দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ-দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কী করিয়া! সে কেন চোখের জল ফেলিল! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্ম কালের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জন দিয়া গেল কোথায়! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাই-বোনদের সঙ্গে চিরদিন খেলা করিল না! সে আপনার সাধের জিনিস-সকল ফেলিয়া, আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড়ো ভালোবাসার লোকদের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া— যে কোলে ছেলেরা খেলা করিত, যে হাতে সে রোগীর সেবা করিত, সেই স্নেহমাখানো কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্যসত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল!

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল? এমন রোজই কোনো-না-কোনো জায়গায় বাঁশি তো বাজিতেছেই! কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না, কেবল চোখে তাহাদের কাতরতা এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নহে কিন্তু সকলেরই তো পরিণাম আছে। পরিণামের অর্থ— উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া, বিসর্জনের পর মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা। পরিণামের অর্থ— সূর্যালোক এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া— সহসা জগতের চারি দিক সুখহীন, শান্তিহীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া! পরিণামের অর্থ— হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে,

সমস্তই শেষ হইয়া গেছে অথচ চারি দিকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া— প্রতি মুহূর্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে— আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয়। সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্র পাষাণময় 'নয়' নামক প্রকাণ্ড লৌহদ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে এক তিল উদ্ঘাটিত হয় না।

—

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কী গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চিরদিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয়, সে হয়তো সেইখানেই রহিয়া গেল। এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মতো অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশেপাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে তাহাদের বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। সারাদিন আঘাত তো করিতেছিই, আঘাত তো সহিতেছিই, কিছুতেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না! তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না— দেখিতে পাই না— কোন্‌খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈলশিখর-চ্যুত পাষাণ-খণ্ডের মতো। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে— আবার, হয়তো, আমরা কাহার সুখের কুটিরের উপর অভিশাপের মতো পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি। ইহার কোনো উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু-না-কিছু পীড়া দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈবক্রমে তাহাদের ভারসহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না। যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।

—

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়। নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত, আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে-বিতর্কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে— 'এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম। কখনোই নহে।' তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে— 'আশ্চর্য কী! তেমন সুন্দর মুখখানি— কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি সেও যে— আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত! বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কী!' এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে চায় না। তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকি কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে, তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক। কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে। তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি? হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরও বেশি করিয়া ধরি না কেন? এ সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনোই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না! সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই। যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক আর সমুদ্রের পারেই হউক—

মরিয়াই হউক, আর বাঁচিয়াই হউক! মিছামিছি তো আর ভাবা যায় না।

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এতবড়ো যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে সে কি সত্যসত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই-সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্যতৎপর, দুঃখে ভাবনার ভারাক্রান্ত দীনহীন গলদ্‌ঘর্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। সে টাকা কি কোথাও ভাঙাইতে পারা যাইবে না! এখানে না হয়, আর কোথাও! এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এতবড়ো মহত্ত্ব ও এতবড়ো স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতরো অসীম ব্যাপার নির্মিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শীতবস্ত্রটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কারস্বরূপ কেবলমাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল হইয়া সকলকেই মরণের মহামরুর মধ্যে নির্বাসিত হইতে হয়— তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্‌কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়— এমন-কি, পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন স্থলে প্রকৃতি যে চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে, তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে। তুমি যখন ছিলে, তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে বুঝি তাহারই 'পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে— তুমি এসো, তোমাকে রোজ ফুল দিব। হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভালো করিয়া দেখিতে পায় না— আর যখন সে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যায়, এ জন্মের মতো দেখা ফুরাইয়া যায়— তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কী হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালোবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি— কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর-সকলেই ইচ্ছা করিলে এ ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে— কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না!

—

তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্তি, তখনও যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে— হৃদয়ের সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড়ো ভালোবাসিতে সেই ছোটো মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে— তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে! এখন আর কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত-প্রীতি স্নেহ-সান্ত্বনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল— এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

—

পুষ্পাঞ্জলি
রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

যাহারা ভালো, যাহারা ভালোবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো— তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়— তাহাদের বিলাপ ধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না। তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না আহা!— তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়! হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে তোমার কাছে লুকাইয়া রাখ-না কেন— ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন— তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও— পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্‌ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে— খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণে সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না— তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে— এইজন্য কখনো-বা উপহাস করিয়া কখনো-বা অনাবশক জ্ঞান করিয়া এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে, সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।

ভারতী
বৈশাখ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালোবাসা দিয়া জড়ানো। কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারি দিকে তাহাদের ভালোবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে কতই ভালোবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারি দিকে গাছটি পালাটি, ছেলেটি, গোরুটি, তাহার ভালোবাসার কত জিনিসপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেইটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মতো মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মতো কেমন অপূর্ব সৌন্দর্যপ্রাপ্ত হয়। ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালোবাসে, প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়! যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ চলিয়া যায় কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ভালোবাসিয়া যে গাছটি রোপণ করিয়াছিল সে গাছটি রহিয়া গেছে, তাহার ঘর-বাড়িটি আছে, ভালোবাসিয়া সে কত কাজ করিয়াছে সে কাজগুলি আছে— জয়দেব তাঁহার কেন্দুবিল্বগ্রামের তমালবনে বসিয়া ভালোবাসিয়া কতদিন মেঘের দিকে চাহিয়া গিয়াছেন, তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সেই বহুদিনসঞ্চিত ভালোবাসা একটি গানের ছত্রে রাখিয়া গিয়াছেন— মেঘৈর্মেদুরম্বরম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শতসহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শতসহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে, আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।

২

আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত। আমাদের এক-এক জনের মধ্যে অতীত কালের কত কোটি কোটি মাতার মাতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি পিতার পিতৃস্নেহ,

কত কোটি কোটি মনুষ্যের প্রণয় প্রেম সৌভ্রাত্র পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কত বিস্মৃত যুগ-যুগান্তর আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত। তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু' দেখা যাইত, তখন এমন অপূর্ব আনন্দ লাভ করি। তখন আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগকে অনুভব করিতে পাই, তাঁহাদের সেই মেঘ-দেখার সুখ আমাদের আপনাদের মধ্যে লাভ করি, বুঝিতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা গেছেন তাঁহারাও আছেন।

৩

মানুষের প্রেম যেন জড়পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। নূতন বাড়ির চেয়ে যে বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কী মাহাত্ম্য আছে। মানুষের প্রেম যেন তাহার ইটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহুদিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ— আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘজীবন, আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

৪

ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের কাছে ওই প্রাচীন নারিকেল গাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখনই ওই গাছগুলিকে দেখি তখনই উহাদিগকে রহস্য-পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহারা যেন অনেক কথা জানে! তা নহিলে উহারা অমন নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে কেন? বাতাসে অমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতেছে কেন? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সময়ে উহাদের মাথার উপরকার ডালপালার মধ্যে অমন অন্ধকার কেন? গাছেরা বাস্তবিক রহস্যময়। উহারা যেন বহুদিন দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছে। এ পৃথিবীতে সকলেই আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু আনাগোনার রহস্য কেহই ভেদ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের মতো যাহারা মাঝখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাই যেন এই অবিশ্রাম আনাগোনার রহস্য জানে। চারি দিকে কত-কে আসিতেছে যাইতেছে উহারা সমস্তই দেখিতেছে, বর্ষার ধারায়, সূর্যকিরণে, চন্দ্রালোকে আপনার গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৫

ছেলেবেলায় এককালে যাহারা এই গাছের তলায় খেলা করিয়াছে, যাহাদের খেলা একেবারে সাঙ্গ হইয়া গেছে, আজ এ গাছ তাহাদের কথা কিছুই বলিতেছে না কেন? আরও কত দ্বিপ্রহর রাত্রে এমনি ভাঙা মেঘের মধ্য হইতে ভাঙা চাঁদের আলো নিদ্রাকুল নেত্রে পরাজিত চেতনার মতো অন্ধকারের এখানে-সেখানে একটু-আধটু জড়াইয়া যাইতেছিল; তেমন রাত্রে কেহ কেহ এই জানলা হইতে নিদ্রাহীন নেত্রে ওই রহস্যময় বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল, সে কথা ইহারা আজ মানিতেছে না কেন? সে যে কীভাবে কী মনে করিয়া জীবনের কোন্‌ কাজের মধ্যে থাকিয়া ওই গাছের দিকে— গাছ অতিক্রম করিয়া ওই আকাশের দিকে— চাহিয়াছিল, ওই গাছে ওই আকাশে তাহার কোনো আভাসই পাই না কেন? যেন এমন জ্যোৎস্না আজ প্রথম হইয়াছে, যেন এ বাতায়ন হইতে আমিই উহাদিগকে আজ প্রথম দেখিতেছি, যেন কোনো মানুষের জীবনের কোনো কাহিনীর সহিত এ গাছ জড়িত নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। ওই দেখো, উহারা যেন দীর্ঘ হইয়া মেঘের দিকে মাথা তুলিয়া সেই দূর অতীতের পানেই চাহিয়া আছে। উহাদের ধীর

গম্ভীর ঝর ঝর শব্দে সেই প্রাচীনকালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে, আমিই কেবল সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখ-দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে, আমিই কেবল সেই দৃষ্টির বিনিময় দেখিতে পাইতেছি না। আজিকার এই জ্যোৎস্নারাত্রির মধ্যে এমন কত রাত্রি আছে; তাহাদের কত আলো-আঁধার লইয়া এই গাছের চারি দিকে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ওই ছায়ালোকে বেষ্টিত স্তব্ধ প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

৬

শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এতদিন জগৎসংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের মাথার উপর ভারের মতো চাপিয়া ছিল, আজ শোকের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া যায়। চন্দ্র সূর্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ-দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিসের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করি যে, আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা তো বন্ধন নহে, তাহা তো লূতা-তন্তুর মতো বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারি দিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে-সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব; এতদিন আমরা বাড়ি-ঘর-দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশি করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতাম তাহারা তত পর নহে, এইজন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন আমার চারি দিকে একটা গণ্ডি আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখি সেটা কিছুই নহে, গণ্ডির ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমনি। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

৭

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনই স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেঁড়ে এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের বন্ধন জড়াইতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে সেখানকার চন্দ্র সূর্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে আমরা মস্ত হইয়া বিরাজ করি। কাছে একটা কিছু পাইলেই হইল। এমনই আমরা মাকড়সার জাতি!

৮

সংসারে লিপ্ত না থাকিলে তবেই ভালোরূপে সংসারের কাজ করা যায়। নহিলে চোখে ধুলা লাগে, হৃদয়ে আঘাত লাগে, পায়ে বাধা লাগে। মহৎ লোকেরা আপন আপন মহত্ত্বের উচ্চ

শিখরে দাঁড়াইয়া থাকেন, চারি দিকের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান। ক্ষুদ্রসকল বৃহৎ হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহাদের বৃহত্ত্ববশত চতুর্দিক হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন আছেন বলিয়াই চতুর্দিকের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত মমতা আছে। যে ব্যক্তি সংসারের আবর্তের মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে, সে কেবল আপনার সহিত পরের সম্বন্ধ দেখিতে পায়, কিন্তু মহৎ যে সে আপনা হইতে বিযুক্ত করিয়া পরকে দেখিতে পায়, এইজন্য পরকে সেই বুঝিতে পারে। কাজ সেই করিতে পারে। হাতের শৃঙ্খল সেই ছিঁড়িয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সহস্র ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিতে না পারে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র উঁচু-নিচুতে যাহার পা বাধিয়া যায় সে আর চলিবে কী করিয়া। সংসারের সুখে-দুঃখে যাহারা ভারাক্রান্ত, সংসারপথের প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমি তাহাদিগকে মাড়াইয়া চলিতে হয়। এইজন্য ঘর হইতে আঙিনা তাহাদের বিদেশ, আপনার সাড়ে-তিন হাতের বাহিরে তাহাদের পর। এইজন্যে তাহারা দূরদেশের কথা, জগতের বৃহত্ত্বের কথা, সত্যের অসীমত্বের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আপনার খোলসটির মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস বদ্ধ। অসীম জগৎ-সংসারের অপেক্ষা আপনার চারি দিকের বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের নিকট অধিক সত্য।

শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হই। এইজন্য শোকে আমরা মহত্ত্ব উপার্জন করি। এইজন্য বিধবারা মহৎ। এইজন্য বিধবারা সংসারের কাজ অধিক করিতে পারে।

৯

মানুষের মধ্যে উদারতা এবং সংকীর্ণতা দুই থাকা চাই, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। উদারতা এবং সংকীর্ণতার মিলনে জগৎ সৃষ্ট। অসীম ভাব সীমাবদ্ধ আকারে প্রকাশ হওয়ার অর্থই জগৎ। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু, একত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ জীবন। অর্থাৎ, পঞ্চ একে পরিণত হওয়া, বৃহৎ ক্ষুদ্রে পরিণত হওয়াই সৃষ্টি। অতএব একাধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, উদারতা সংকীর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রকৃতিতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ মেলামেশা করিয়া থাকে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি একসঙ্গে কাজ করে, ঐক্য এবং অনৈক্য এক গৃহে বাস করে। দুই বিপরীতের মিলনই এই বিশ্ব। মনুষ্য এই বিশ্ব-নিয়মের বাহিরে থাকে না। মনুষ্যও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মিলনস্থল। মনুষ্য, আপনাস্থ না থাকিলে, পরের দিকে যাইতে পারে না, সীমাবদ্ধ না হইলে সে অসীমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, অনন্তকালে থাকিলে সে কোনোকালে হইতেই পারিত না।

১০

আমরা বদ্ধ না হইলে মুক্ত হইতে পাই না। ইংরাজিতে যাহাকে Freedom বলে তাহা আমাদের নাই, বাংলায় যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলে। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যাহার গৃহ নাই, তাহাকে কখনো গাছতলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটিরে আশ্রয় লইতে হয়; যাহার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নহে; তাহার এক ধ্রুব আশ্রয় আছে। যে নৌকা হালের অধীন নহে সে কিছু স্বাধীন বলিয়া গর্ব করিতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশ দিকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব, স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নহে, স্বাধীনতার অর্থ নোঙরের শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া রাখা।

১১

যাহাদের সহিত চোখের দেখা মুখের আলাপ মাত্র, তাহাদের সহিত আমরা চিরদিন নির্বিরোধে কাটাইয়া দিতে পারি, বিবাদ হইলেও তাহার পরদিন আবার তাহাদের সহিত হাস্যমুখে কথা কওয়া যায়, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা যায় কিন্তু যেখানে গভীর প্রেম ছিল, সেখানে যদি বিচ্ছেদ হয় তো হাসিমুখে কথা কহা আর চলে না, ভদ্রতা রক্ষা আর হয় না। অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর জীবের গাত্রে একটা আঁচড় লাগিলে সে মরিয়া যায় আর নিকৃষ্ট পুরুভুজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খেলাইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট প্রেমের বন্ধনও এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে।

১২

অনেক বড়ো মানুষ দেখা যায় তাহারা ক্রমাগত আপনাদের চারি দিকে বিপুল মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, অতিশয় স্ফীত হইয়া সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আমার তো বোধ হয় এইরূপ বিপুল স্ফীতির যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রচুর মাংসস্তূপ, প্রকাণ্ড জড়তা ও অসাড়তা এখনকার দিনের উপযোগী নহে। এককালে ম্যামথ্ ম্যাস্টডন, হস্তিকায় ভেক, প্রকাণ্ডকায় সরীসৃপগণ পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়াছিল। এখন সে-সকল মাংসপিণ্ডের লোপ হইয়া গেছে ও যাইতেছে। এখন পরিমিতদেহ ও সূক্ষ্মস্নায়ু জীবদিগের রাজত্ব। এখন সুমহৎ জড় পদার্থেরা অন্তর্ধান করিলেই পৃথিবীর ভার লাঘব হয়।

১৩

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নূতন কবির আর আবশ্যক কী? পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনিই কী বলা হইতেছে? এখন পুরাতন লইয়াই কাজ চলিয়া যায়।

সকল গোরুই তো জাবর কাটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঘাস বন্ধ করিলে জাবর কাটাও বেশি দিন চলে না। নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করিয়া থাকে। নূতনের মধ্যেই পুরাতন বাঁচিয়া থাকে, পুরাতনের মধ্যেই নূতন বাস করে। পুরাতন বৃক্ষ যে প্রতিদিন নূতন পাতা নূতন ফুল নূতন ডালপালা উৎপন্ন করে তাহার কারণ তাহার জীবন আছে। যেদিন সে আর নূতন গ্রহণ করিতে পারিবে না ও নূতন দান করিতে পারিবে না সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সেদিন জানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের হৃদয়ের সহিত প্রাচীন কবিতার যোগ-রক্ষা প্রবাহ-রক্ষা করিতেছে কে? নূতন কবিতা। নূতন কবিতা শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা কোন্ স্রোত বাহিয়া পুরাতনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইব? আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করিয়া রাখিতেছে কে? নূতন কবিতা।

জগৎ হইতে সংগীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তের নূতন পাখির গান বন্ধ করিতে কে চাহে। বসন্ত যদি পুরাতন গানকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না গাওয়াইত, পুরাতন ফুলকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না ফুটাইত তবে তো নূতনও থাকিত না পুরাতনও থাকিত না, থাকিত কেবল শূন্যতা, মরুভূমি।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ২

এক 'আমি' মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়াছে দেখো। 'আমি'-কে যেমনি লোপ করিয়া ফেলিবে অমনি প্রকৃতির পূর্ব-পশ্চিমে, অতীত-ভবিষ্যতে, অন্তর-বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে। 'আমি' আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি। মনে করিতেছি আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ, জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু 'আমার পিঠ' ও 'আমার পেট' এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। 'আমি'কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে। যেখানে যত বিবাদ, যত অনৈক্য, যত বিশৃঙ্খলা, 'আমি'টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।

২

উদরের ভিতরকার একটা অংশই যে কেবল পাকযন্ত্র তাহা নহে, আমাদের মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের পাকযন্ত্র। ইহারা সমস্ত জগৎকে আমাদের উপযোগী করিয়া বানাইয়া লয়। আমাদের যাহা যতটুক যেরূপ আকারে আবশ্যক, ইহাদের সাহায্যে আমরা কেবল তাহাই দেখি, তাহাই শুনি, তাহাই পাই, তাহাই ভাবি। অসীম জগৎ আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় বিরাজ করিতেছে! আমাদের যে জগৎদৃশ্য, জগৎজ্ঞান, তাহা, আমাদের ভুক্ত জগৎ, পরিপাকপ্রাপ্ত জগতের বিকার, তাহা আমাদের উপযোগী রক্ত মাত্র, আমাদের ইন্দ্রিয় মনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় মনের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহা প্রকৃত জগৎ নয়, অসীম জগৎ নহে।

৩

আমরা সকলে বাতায়নের পাশে বসিয়া আছি। আমরা বাতায়নের ভিতর হইতে দেখি, বাতায়নের বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই না। এইজন্য নানা লোক নানা রকম দেখে। কেহ এ-পাশ দেখে কেহ ও-পাশ দেখে, কাহারো দক্ষিণে জানলা কাহারো উত্তরে জানলা। এই আশপাশ দেখিয়া, খানিকটা ভুল দেখিয়া, খানিকটা না দেখিয়া যত আমাদের ভালোবাসা ঘৃণা, যত আমাদের তর্কবিতর্ক। একেকটি মানুষ একেকটি খড়খড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি, কেহ-বা হাসিতেছি কেহ-বা নিশ্বাস ফেলিতেছি। জানলার ভিতরকার ওই মুখগুলি কেহ যদি আঁকিতে পারিত! পৃথিবীর রাস্তার দুই ধারে ওই-সকল অন্তঃপুরবাসী মুখের কতই ভাব, কতই ভঙ্গি! সবাই ছবির মতো বসিয়া কতই ছবি দেখিতেছে!

৪

'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' কারণ অনেক সত্য কথা কে বলিতে পারে! স্থূল কারাগারের ফুটাফাটা দিয়া সত্যের দুই-একটা রশ্মিরেখা শুভলগ্নে দৈবাৎ দেখিতে পাই। একটুখানি সত্যের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থাকিয়া যায়। সংশয় নিশীথের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশ্বাসকে তারার মতো দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনে করে সত্যকে ফলাও করিয়া তুলিতে হইবে— তাহাকে বৃহৎ করিয়া একটা বিস্তৃত তন্ত্রের মতো শাস্ত্রের মতো গড়িয়া তুলিতে হইবে— প্রলোভনে এবং দায়ে পড়িয়া সে ব্যক্তি একটি সত্যের সহিত অনেক মিথ্যা মিশাল দেয়। সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়। সত্য হীরার মতো একটুখানি পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাই তাই ভালো। কত মূল্যবান সত্যের কণিকা সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছে।

৫

ব্যাপ্ত হইলে যাহা অন্ধকার, সংহত হইলে তাহা আলোক, আরও সংহত হইলে তাহা অগ্নি। বৃহত্ত্বই জড়ত্ব। সংক্ষেপ সংহতিই প্রাণ। সংহত হইলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি, জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলিয়া বৃহত্ত্বের উপাসনা করিয়া থাকি। বৃহত্ত্বে অভিভূত হইয়া যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য। আরম্ভ বৃহৎ পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্তের মুখ অতি বৃহৎ আবর্তের শেষ একটি বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে যাইতেছে কি না কে জানে! কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে কি না কে জানে!

৬

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হইতে হয়। আয়তন লইয়া আমাদিগকে কেবল যুদ্ধ করিতে হয়। কাহার সঙ্গে? দানব-কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে— আয়তন আমার; আমার জিনিস আমাকে ফিরাইয়া দাও। অবিশ্রাম লড়াই করিয়া অবশেষে কাড়িয়া লয়। শ্মশানক্ষেত্রে তাহার ডিক্রিজারি হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন মহা আয়তনে মিশিয়া যায়।

৭

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতিব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করিব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে সে দৃঢ়বিশ্বাসে যুদ্ধ করিতেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরিতেছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অনেক মরিয়া তবে বাঁচিবার উপায় বাহির হইবে। আমরা সংহতিকে অধিকার করিয়া ব্যাপ্তিকে জিতিব— মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

৮

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ— আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি— অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে আমার হইয়া আমরা পর হইয়া যাই। আমাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হইবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছাড়িয়াছেন। সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই তাঁহাদের লড়াই। তাঁহারা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করিবেন। সংকীর্ণতার বলে বিকীর্ণতা লাভ করিবেন।

৯

সংহত দীপশিখা তাহার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কাঠে, উপকরণে ইতস্তত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তখন গৃহই তাহাকে বধ করিয়া রাখে, সে জাগিতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হইব ততটা অধিকার করিব এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হইবে তুমি ততই অধিকৃত হইবে। কিন্তু চারি দিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাইবে, তখন তোমার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারি দিক উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে পারিবে এইরূপ কাহারো কাহারো মত।

১০

য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম— ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান শাস্ত্র— ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চরম— সংহতি, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। য়ুরোপীয়েরা প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চান, ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃতিকে জয় করিতে চান। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করিতে পারিলে বিরাট প্রকৃতিকে জয় করা যায়। এই কি যোগশাস্ত্র?

১১

আমার কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন— অতীতকাল অমরাবতী। আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝি যে, অতীতে যাহারা বাস করে তাহারা অমর। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্তমান কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহত্ত্ব, অতীতকালে সেই মহত্ত্বরাশি সংহত হইয়া যায়। বর্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। বর্তমান বিচ্ছিন্ন, অতীত সমগ্র। যাহাকে প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যুই দেখিতে পাই, যাহাকে অতীতে দেখি তাহার অমরতা দেখিতে পাই।

১২

আরম্ভের মধ্যে পূর্ণতার ছবি ও সমাধানেই অসম্পূর্ণতা— মানুষের সকল কাজেই প্রায় বিধাতার এই অভিশাপ। যখন গড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রতিমা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, যখন শেষ করিয়া ফেলি তখন দেখি তাহা ভাঙিয়া গেছে। সুদূর গৃহাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন গৃহের প্রতি এত টান যে, গৃহ যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে গৃহ আর মনে পড়ে না। যাহাকে আশা করি তাহাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হইলে তাহাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ, চাহিলে যতখানি পাই, পাইলে ততখানি পাই না। যখন মুকুল ছিল তখন ছিল ভালো, ফলের আশা তাহার মধ্যে ছিল, যখন মাটিতে পড়িয়াছে তখন দেখি মাটি হইয়াছে ফল ধরে নাই। এইজন্য আরম্ভ দিনের স্মৃতি আমাদের নিকট এত মনোহর, এইজন্য সমাপ্তির দিনে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকি, নিশ্বাস ফেলি। জন্মদিনে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি প্রতিদিন বাজে না। অক্রূনেত্রে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে। বাঁশি গানকে বধ করিতেছে। হাতের দ্বারা হাতের কাজ আঘাত পাইতেছে।

১৩

আসল কথা, শেষ মানুষের হাতে নাই। 'শেষ হইল' বলিয়া যে আমরা দুঃখ করি তাহার অর্থ এই— 'শেষ হয় নাই তবুও শেষ হইল! আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে অথচ চেষ্টার অবসান হইল।' এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সম্পূর্ণতার অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১৪

জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না— যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোটো বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে-কাজ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড়ো কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে আপনাকে ছোটো করিয়া লইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এত বড়ো মনে করে। মনুষ্যের পদমর্যাদা সে যদি যথার্থ বুঝিত, তাহা হইলে তাহার এত অহংকার থাকিত না।

১৫

আমি কি জানিতাম অবশেষে আমি খেলেনাওয়ালা হইব? প্রতিদিন একটা করিয়া কাচের পুতুল গড়িয়া সাধারণের খেলার জন্য জোগাইব। আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ— আমারই জীবনের একেকটি দিন। দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন তো কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য আকারে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে আমার সমস্ত দিনটি হাতে করিয়া লইয়া তাহাকে কেবল একটি পুতুল করিয়া তুলিতেছি— আমি কি জানি না আমার যতগুলি পুতুল ভাঙিতেছে আমিই ভাঙিয়া যাইতেছি। অবশেষে যখন একে একে সবগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল তখন কি আমার সমস্ত জীবন বিফল হইয়া গেল না। এই চীনের পুতুলগুলি লইয়া আজ সকলে হাসিতেছে খেলিতেছে, কাল যখন এগুলিকে অকাতরে পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিবে তখন কি সেই হৃতগৌরব ভগ্ন কাচখণ্ডের

সঙ্গে আমার সমস্ত মানব জন্মের বিসর্জন হইবে না। 'আমি নিষ্ফল হইলাম' বলিয়া যে দুঃখ সে অপরিতৃপ্ত অহংকারের দুঃখ নহে। ইহা নিজের হাতে নিজের একমাত্র আশা একমাত্র আদর্শকে বিসর্জন দিয়া প্রাণাধিকের বিনাশের জন্য শোক!

১৬

কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়ো। তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্রমাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি— আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙিয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙিয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙিলাম। আমি নিষ্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না!

১৭

সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত্যু না হয় তো বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে, সে আগেকার মতো তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে এক দিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখির বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখির গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯২

বর্ষার চিঠি

সুহৃদ্‌বর, আপনি তো সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদলাটা কল্পনা করুন।

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাংলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম— আপনি বসে বসে ভাবুন। ভরা পুকুর, আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া, জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথগাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দির স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে; বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, পাঠশাল ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সংকীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে; খুঁটিতে বাঁধা গোরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চিৎকার করছে; আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসছে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মতো আমবাগান, তার পরে এক-একটি করে বাঁশঝাড়, এক-একটি করে কুটির, এক-একটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে, কুটিরের দুয়ারে বসে ছোটো ছোটো মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকছে 'আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে'— অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি— বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়োসড়ো কম্বলমোড়া মাঝির

মাথায় অবিশ্রাম ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে। আর কলকাতায় বৃষ্টি পড়ছে আহিরিটোলায়, কাঁশারিপাড়ায়, টেরিটির বাজারে, বড়বাজারে, শোভাবাজারে, হরিকৃষ্ণর গলি, মতিকৃষ্ণর গলি, রামকৃষ্ণর গলিতে, জিগ্‌জ্যাগ্‌ লেনে— খোলার চালে, কোঠার ছাতে, দোকানে, ট্রামের গাড়িতে, ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের মাথায় ইত্যাদি।

কিন্তু আজকাল ব্যাঙ ডাকে না কেন? আমি কলকাতার কথা বলছি। ছেলেবেলায় মেঘের ঘটা হলেই ব্যাঙের ডাক শুনতুম— কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা এল, সার্বভৌমিকতা এবং 'উনবিংশ শতাব্দী' এল, পোলিটিকল্‌ অ্যাজিটেশন, খোলা ভাঁটি এবং স্বায়ত্তশাসন এল, কিন্তু ব্যাঙ গেল কোথায়? হায় হায়, কোথায় ব্যাস বশিষ্ঠ, কোথায় গৌতম শাক্যসিংহ, কোথায় ব্যাঙের ডাক!

ছেলেবেলায় যেমন বর্ষা দেখতেম, তেমন ঘনিয়ে বর্ষাও এখন হয় না। বর্ষার তেমন সমারোহ নেই যেন, বর্ষা এখন যেন ইকনমিতে মন দিয়েছে— নমোনমো করে জল ছিটিয়ে চলে যায়— কেবল খানিকটা কাদা, খানিকটা ছাঁট, খানিকটা অসুবিধে মাত্র— একখানা ছেঁড়া ছাতা ও চীনে বাজারের জুতোয় বর্ষা কাটানো যায়— কিন্তু আগেকার মতো সে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি দেখি নে। আগেকার বর্ষায় একটা নৃত্য ও গান ছিল, একটা ছন্দ ও তাল ছিল— এখন যেন প্রকৃতির বর্ষার মধ্যেও বয়স প্রবেশ করেছে, হিসাব কিতাব ও ভাবনা ঢুকেছে, শ্লেষ্মা শঙ্কা ও সাবধানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকে বলছে, সে আমারই বয়সের দোষ।

তা হবে! সকল বয়সেরই একটা কাল আছে, আমার সে বয়স গেছে হয়তো। যৌবনের যেমন বসন্ত, বার্ধক্যের যেমন শরৎ, বাল্যকালের তেমনি বর্ষা। ছেলেবেলায় আমরা যেমন গৃহ ভালোবাসি এমন আর কোনো কালেই নয়। বর্ষাকাল ঘরে থাকবার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোনবার কাল, ভাইবোনে মিলে খেলা করবার কাল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব উপকথাগুলো কেমন যেন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। ঘনবৃষ্টিধারার আবরণে পৃথিবীর আপিসের কাজগুলো সমস্ত ঢাকা পড়ে যায়। রাস্তায় পথিক কম, ভিড় কম, হাটে ঘাটে কাজের লোকের ঘোরতর ব্যস্ত ভাব আর দেখা যায় না— ঘরে ঘরে দ্বাররুদ্ধ, দোকানপসারের উপর আচ্ছাদন পড়েছে— উদরানলের ইস্টিম প্রভাবে মনুষ্যসমাজ যে রকম হাঁসফাঁস ক'রে কাজ করে সেই হাঁসফাঁসানি বর্ষাকালে চোখে পড়ে না এইজন্যে মনুষ্যসমাজের সাংসারিক আবর্তের বাইরে বসে উপকথাগুলিকে সহজেই সত্য মনে করা যায়, কেউ তার ব্যাঘাত করে না। বিশেষত মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে উপকথার উপকরণ আছে যেন। যেমন মেঘ ও বৃষ্টিধারা আবরণের কাজ করে— তেমনি বৃষ্টির ক্রমিক একঘেয়ে শব্দও একপ্রকার আবরণ। আমরা আপনার মনে যখন থাকি তখন অনেক কথা বিশ্বাস করি— তখন আমরা নির্বোধ, আমরা পাগল, আমরা শিশু; সংসারের সংস্রবে আসলেই তবে আমরা সম্ভব-অসম্ভব বিচার করি, আমাদের বুদ্ধি জেগে ওঠে, আমাদের বয়স ফিরে পাই। আমরা অবসর পেলেই আপনার সঙ্গে পাগলামি করি, আপনাকে নিয়ে খেলা করি— তাতে আমাদের কেউ পাগল বলে না, শিশু বলে না— সংসারের সঙ্গে পাগলামি বা খেলা করলেই আমাদের নাম খারাপ হয়ে যায়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় বুদ্ধি বিচার তর্ক বা চিন্তার শৃঙ্খলা— এ আমাদের সহজ ভাব নয়, এ আমাদের যেন সংসারে বেরোবার আপিসের কাপড়— দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময়েই তার আবশ্যক— আপনার ঘরে এলেই ছেড়ে ফেলি। আমরা স্বভাব-শিশু, স্বভাব-পাগল, বুদ্ধিমান সেজে সংসারে বিচরণ করি। আমরা আপনার মনে বসে যা ভাবি— অলক্ষ্যে আমাদের মনের উপর অহরহ যে-সকল চিন্তা ভিড় করে— সেগুলো যদি কোনো উপায়ে প্রকাশ পেত। সংসারের একটু সাড়া পেয়েছি কী, একটু পায়ের শব্দ শুনেছি কী অমনি চকিতের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে নিই— এত দ্রুত যে আমরা নিজেও এ পরিবর্তনপ্রণালী দেখতে পাই নে। তাই বলছিলেম যদি কোনোমতে আমরা আপনার মনে থাকতে পাই তা হলে আমরা অনেক অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে পারি। সেইজন্যে গভীর অন্ধকার রাত্রে যা সম্ভব বলে বোধ হয় দিনের আলোতে তার অনেকগুলি কোনোমতে সম্ভব বোধ হয় না— কিন্তু

এমনি আমাদের ভোলা মন যে, রোজ দিনের বেলায় যা অবিশ্বাস করি রোজ রাত্রে তাই বিশ্বাস করি। রাত্রিকে রোজ সকালে অবিশ্বাস করি, সকালকে রোজ রাত্রে অবিশ্বাস করি! আসল কথা এই, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন, সংসারের মধ্যে পড়ে সে বাঁধা পড়েছে— আমরা দায়ে পড়েই অবিশ্বাস করি— একটু আড়াল পেলে, একটু ছুটি পেলে, একটু সুবিধা পেলেই আমরা যা-তা বিশ্বাস করে বসি, আবার তাড়া খেলেই গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করি। নিতান্ত আপনার কাছে থাকলে তাড়া দেবার লোক কেউ থাকে না। বর্ষাধারার ক্রমিক ঝর্ঝর শব্দ সংসারের সহস্র শব্দ হতে আমাদের ঢেকে রাখে— আমরা অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দের আচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা উপভোগ করি। এইজন্যই বর্ষাকাল উপকথার কাল। এইজন্য আষাঢ় মাসের সঙ্গেই আষাঢ়ে গল্পের যোগ। এইজন্যই বলছিলাম, বর্ষাকাল বালকের কাল— বর্ষাকালে তরুলতার শ্যামল কোমলতার মতো আমাদের স্বাভাবিক শৈশব স্ফূর্তি পেয়ে ওঠে— বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ে, বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতেম— বাতাসে দুমদাম করে দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াত, ছাতের উপরকার চারিটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠত, চারটে জলধারাকে দিক্‌হস্তীর শুঁড় বলে মনে হত। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুটত (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক-এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াত— বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাকত এবং পুকুরের বড়ো বড়ো মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনায় বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কী অন্ধকারই হয়ে যেত, এবং বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাস্টার মহাশয়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হত তা যদি মাস্টারমশায় টের পেতেন তা হলে—। শুনেছি এখনকার অনেক ছেলে মাস্টারমশায়কে প্রিয়তম বন্ধুর মতো জ্ঞান করে, এবং ইস্কুলে যাবার নাম শুনে নেচে ওঠে। এটা শুভলক্ষণ বোধ হয়। কিন্তু তাই বলে যে ছেলে খেলা ভালোবাসে না, বর্ষা ভালোবাসে না, গৃহ ভালোবাসে না এবং ছুটি একেবারেই ভালোবাসে না— অর্থাৎ ব্যাকরণ ও ভূগোলবিবরণ ছাড়া এই বিশাল বিশ্বসংসারে আর কিছুই ভালোবাসে না, তেমন ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও কিছু নয়। তেমন ছেলে আজকাল অনেক দেখা যাচ্ছে। তবে হয়তো প্রখর সভ্যতা, বুদ্ধি ও বিদ্যার তাত লেগে ছেলেমানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কমে এসেছে, পরিপক্কতার প্রাদুর্ভাব বেড়ে উঠেছে। আমাদেরই কেউ কেউ ইঁচড়ে-পাকা বলত, এখন যে-রকম দেখছি তাতে ইঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, গোড়াগুড়িই কাঁঠাল।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বরফ পড়া

(দৃশ্য)

ছবির রেখা মন হইতে কেমন অল্পে অল্পে অস্পষ্ট হইয়া আসে; প্রতিদিন যে-সকল জিনিস দেখি, তাহাদেরই ছায়া অগ্রবর্তী হইয়া মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কিছুদিন আগে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতিবিম্ব গোলেমালে কোথায় মিলাইয়া যায়, ভালো করিয়া ঠাহর করিবার জো থাকে না।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আমি ইংলন্ডে যাই, সে আজ সাত বৎসর হইল। তখন আমার বয়সও নিতান্ত অল্প ছিল। তখন ইংলন্ডে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার একটা মোটামুটি ভাব মনে আছে বটে, কিন্তু তাহার সকল ছবি খুব পরিষ্কাররূপে মনে আনিতে পারি না, রেখায় রেখায় মিলাইয়া লইতে পারি না। ইহারই মধ্যে আমার স্মৃতিপটবর্তী ইংলন্ডের উপর কোয়াশা পড়িয়া আসিতেছে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া দেখিতে হয়। সেইজন্য আজ স্মৃতিপট রৌদ্রে বাহির করিয়াছি।

আমি যখন ইংলন্ডে গিয়া পৌঁছাই, তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। তখনও খুব বেশি শীত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমরা ব্রাইটনে ছিলাম। ব্রাইটনে তখনও যথেষ্ট রৌদ্র ছিল। রৌদ্রে পুলকিত হইয়া সমুদ্রের ধারের পথে ছেলে বুড়ো ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়াছে। রোগীরা এবং জরাগ্রস্তরা ঠেলাগাড়িতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে একটি-দুইটি মেয়ে, বা পরিবারের কেহ। মেয়েরা নানাসাজপরা, ছাতা মাথায়। ছোটো ছেলেরা লোহার চাকা গড়াইয়া পথে ছুটিতেছে। সমুদ্রের তীরে কোনো মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া। সমুদ্রের ঢেউয়ের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ নানাবিধ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে। ইটালীয় ভিক্ষুক পথে পথে আর্গিন বাজাইয়া ফিরিতেছে। শাকসবজিওয়ালা, দুধওয়ালা, গাড়ি করিয়া ঘরে ঘরে জোগান দিয়া ফিরিতেছে। বেড়াইবার পথে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহিণী পাশাপাশি ছুটিয়াছে— পশ্চাতে কিছুদূরে একটি করিয়া অশ্বারোহী সহিস তকমা পরিয়া অনুসরণ করিতেছে। এক-একটি শিক্ষক তাহার পশ্চাতে এক পাল ইস্কুলের ছেলে লইয়া— অথবা এক-একটি শিক্ষয়িত্রী ঝাঁকে ঝাঁকে ইস্কুলের মেয়ে লইয়া সার বাঁধিয়া সমুদ্রতীরের পথে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে; হাওয়া না হউক— রৌদ্র খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রায় মাঝে মাঝে ছেলেদের লইয়া সমুদ্রতীরের তৃণক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতাম। ছুটাছুটি করিবার ঠিক বয়স নয় বটে— কিন্তু সেখানে আমাদের এই রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার সমালোচনা করিবার যোগ্যপাত্র কেহ উপস্থিত ছিলেন না। দশটা-এগারোটার সময় আমাদের বেড়াইবার সময় ছিল। যাহা হউক, আমরা যখন ব্রাইটনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমুদ্রতীরে সূর্যকরোৎসব।

দিন যাইতে লাগিল— শীত বাড়িতে লাগিল। রাস্তার কাদা শীতে শক্ত হইয়া উঠিল। ঘাসের উপরে শিশির জমিয়া যাইত, কে যেন চুন ছড়াইয়াছে। সকালে উঠিয়া দেখি শার্শির কাচে চিত্রবিচিত্র তুষারের স্ফটিকলতা আঁকা রহিয়াছে। কখনো কখনো পথে দেখিতাম, দুই-একটা চড়ুই পাখি শীতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গাছের যে কয়েকটা হলদে পাতা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল, শীর্ণ ডালগুলো বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বস্ত-হৃদয় ছোটো ছোটো রবিন পাখি কাচের জানালার কাছে আসিয়া রুটির টুকরা ভিক্ষা চায়। সকলে আশ্বাস দিল, শীঘ্রই বরফ পড়া দেখিতে পাইবে।

ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়। কনকনে শীত। জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, পরদা ফেলা। গ্যাস জ্বলিতেছে। গরমের জন্য আগুন জ্বালা হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা আহার করিয়া অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমরা গল্পে নিমগ্ন। দুটি ছেলে আমার প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আমার সঙ্গে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতেন না, তাহার সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও আমি এখানে সে-সকল কথার উল্লেখ করিতে চাহি না। তাহারা এখন বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, 'বালক' পড়িয়া থাকে— তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা লিখিয়া শেষকালে জবাবদিহি করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর কিছুদিন পরে তাহারা আবার প্রতিবাদ করিতেও শিখিবে। তখন আমি তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না— এই ভয়ে আমি ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যাহার যেমন সাধ্য অনুমান করিয়া লইবেন— আমি ইচ্ছাপূর্বক কোনোরূপ দায় স্কন্ধে লইতে চাই না।

গরম হইয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল, বরফ পড়িয়াছে। কখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই, আমাদের দ্বার সমস্ত রুদ্ধ ছিল। ছেলেপিলে মিলিয়া

লাফালাফি করিয়া বাহিরে গিয়া দেখি— কী চমৎকার দৃশ্য! শীতে জ্যোৎস্না-স্তর যেন জমিয়া জমিয়া, রাস্তায়, ঘাসের উপর, গাছের শূন্য ডালে, গড়ানো স্লেটের ছাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। পথে লোক নাই। আমাদের সম্মুখের গৃহশ্রেণীর জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। সেই রাত্রি ও নির্জনতা, জ্যোৎস্না ও বরফ সমস্ত মিলিয়া কেমন এক অপূর্ব দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল। ছেলেরা (এবং আমিও) ঘাসের উপর হইতে বরফ কুড়াইয়া পাকাইয়া গোলা করিতেছিল। সেগুলো ঘরে আনিতেই ঘরের তাতে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল।

আমার পক্ষে এই প্রথম বরফ পড়া রাত্রি। ইহার পরে আরও অনেক বরফ পড়া দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে; বিশেষত এতদিন পরে। সর্বাঙ্গ কালো গরম কাপড়ে আচ্ছন্ন; রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। আকাশ ধূসর বর্ণ। গুঁড়িগুঁড়ি বরফ কুইনাইনের গুঁড়ার মতো চারি দিকে পড়িতেছে। বৃষ্টির মতো টপ্‌টপ্ করিয়া পড়ে না— লঘুচরণে উড়িয়া উড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া পড়ে। কাপড়ের উপরে আসিয়া ছুঁইয়া থাকে, ঝাড়িলেই পড়িয়া যায়। চারি দিক শুভ্র। কোমল বরফের স্তরের উপর গাড়ির চাকার দাগ পড়িয়া যাইতেছে। শুভ্র বরফের আস্তরণের উপরে কাদাসুদ্ধ জুতার পদচিহ্ন ফেলিতে কেমন মায়া হয়। মনে হয়, স্বর্গ হইতে যেন ফুলের পাপড়ি, যেন পারিজাতের কেশর ঝরিয়া পড়িতেছে। পথিকদের কালো কাপড়ে কালো ছাতায় বরফ লাগিয়াছে।

কেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। প্রথমে পথে ঘাটে সাদা-সাদা রেখা-রেখার মতো পড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ির সম্মুখেই অল্প একটুখানি জমি আছে, তাহাতে খানকতক গাছের চারা ও গুল্ম আছে— গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার; সেই ডাঁটাগুলি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই— সবুজে সাদায় মেশামেশি হইতেছে। গাছের চারাগুলো যেন শীতে হীহী করিতেছে। তাহাদের গাত্রবস্ত্র গিয়াছে, বরফের সাদা শোক-উত্তরীয় পরিয়া তাহাদের শিরার ভিতরকার রস যেন জমিয়া যাইতেছে। বাড়ির কালো স্লেটের চাল অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ক্রমে সাদা হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল— ছোটো ছোটো চারা বরফে ডুবিয়া গেল। জানালার সম্মুখে সংকীর্ণ আলিসার উপরে বরফের স্তর উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই-একজন পথিক দেখা যায়, তাহাদের নাক নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ শীতে সংকুচিত। অদূরে গির্জার চূড়া শ্বেতবসন প্রেতের মতো আকাশে আবছায়া দেখা যাইতেছে।

শীত যে কতখানি তাহা এই ভাদ্রমাসের গুমটে কল্পনা করা বড়ো শক্ত। মনে আছে, সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া হাত এমন অসাড় হইয়া যাইত যে, পকেটে রুমাল খুঁজিয়া পাইতাম না। গায়ে গরম কাপড়ের সীমা পরিসীমা নাই— মোটা জুতো ও মোটা মোজার মধ্যে পায়ের তেলো দুটো কথায় কথায় হিম হইয়া উঠিত। রাত্রে কম্বলের বস্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও পাশ ফিরিতে নিতান্ত ভাবনা উপস্থিত হইত, কারণ যেখানে ফিরিব সেইখানেই ছ্যাঁক করিয়া উঠিবে। শুনা গেল, একটা জেলে-নৌকায় চারজন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, কোনো জাহাজের কাছে আসিতে জাহাজের লোকেরা দেখিল, তাহারা চারজনেই শীতে জমিয়া মরিয়া আছে। রাত্রে গাড়ির উপরে গাড়ির কোচমান মরিয়া আছে। জলের নলের মধ্যে জল জমিয়া মাঝে মাঝে নল ফাটিয়া যায়। টেম্‌স্ নদীর উপরে বরফ জমিয়াছে। হাইড্‌পার্ক নামক উদ্যানের ঝিল জমিয়া গেছে। প্রতিদিন শতসহস্র লোক একপ্রকার লৌহপাদুকা পরিয়া সেই ঝিলের উপর স্কেট করিতে সমাগত।

এই স্কেট করা এক অপূর্ব ব্যাপার। কঠিন জলাশয়ের উপর শতসহস্র লোক স্কেটজুতা পরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হেলিয়া দুলিয়া পিছলিয়া চলিতেছে। পালে নৌকা চলা যেমন, স্কেটে মানুষ চলাও তেমনি— শরীর ঈষৎ হেলাইয়া মাটির উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাওয়া যায়। পদক্ষেপ করিবার পরিশ্রম নাই— মাটির সহিত বিবাদ করিয়া, পদাঘাতের দ্বারা প্রতিপদে মাটিকে পরাভূত করিয়া চলিতে হয় না।

কিন্তু কল্পনাযোগে আমাদের দেশে সেই বিলাতের শীত আমদানি করিবার চেষ্টা করা বৃথা— আমাদের এখানকার উত্তাপে তাহা দেখিতে দেখিতে তাতিয়া উঠে, বরফের মতো গলিয়া যায় তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের এখানকার লেপ-কাঁথার মধ্যে তাহার যথেষ্ট সমাদর হয় না।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

শিউলিফুলের গাছ

আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ফুল ফেলিতেছি; আমার তো আর কোনো কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার সাদা সাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রুজলের মতো আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

আমার চারি দিকে কী শোভা! কী আলো! আমার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ নাচিতেছে। বীণার তারের উপর মধুর সংগীত যেমন আপনার আনন্দে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর্গেই চলিয়া যায়; আমার পাতায় পাতায় প্রভাতের আলো তেমনি করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চমক খাইয়া আকাশে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, সেই আলোকের চম্পক-অঙ্গুলি স্পর্শে আমার প্রাণের ভিতরেও ঝিন্‌ঝিন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কাঁদিয়া উঠিতেছে— আমি আপনাকে আর রাখিতে পারিতেছি না— বিহ্বল হইয়া আমার ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়। আধো-আধো স্বরে সে আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কথা কহে, সে তাহার খেলার গল্প করে, আকাশের মেঘ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের কাহিনী বলে— বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, চলিয়া যায়— আবার কখন আপন মনে ফিরিয়া আসে। সে যখন দূর হইতে আসিয়া দুই-একটা কথা বলিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার উড়ন্ত আঁচলটি আমার গায়ে একটু ঠেকিয়া অমনি উড়িয়া যায়, আমার সমস্ত ডালপালা চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার ফুলগুলি তাহার পিছন পিছন উড়িয়া যায়, স্নেহভরে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

দুপুরবেলা চারি দিক নিঝুম হইয়া গেলে একটি পাখি আসিয়া আমার পাতার মধ্যে বসিয়া এক সুরে ডাকিতে থাকে। তাহার সেই সুর শুনিয়া ছায়াখানি আমার তলায় ঘুমাইয়া পড়ে। বাতাস আর চলিতে পারে না। মেঘের টুকরা স্বপ্নের মতো ভাসিয়া যায়। দূর হইতে রাখালের বাঁশির স্বর মিলাইয়া আসে। ঘাসের ভিতরে বেগুনি ফুলগুলি বৃন্তসুদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া থাকে। দুই-একটা করিয়া আমার ফুল যেন ভুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাহারাও সেই পাখির এক সুরে এক গানের মতো, সমস্ত দুপুরবেলা একভাবে একছন্দে একটির পরে একটি করিয়া ঝরিতে থাকে— ভূমিতে পড়িয়া মরিতে থাকে— আপনার মনে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যার কনক-উপকূল ছাপাইয়া অন্ধকার যখন জগৎ ভাসাইয়া দেয়, আমি তখন আকাশে চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমার আজন্মকালের ঝরা ফুলগুলি আকাশে তারা হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যেও দু-একটা কখনো কখনো ঝরিয়া আসে, বোধ করি আমারই তলায় আসিয়া পড়ে, সকালে তাহার উপরে শিশির পড়িয়া থাকে। এইরূপ স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখি; নিশীথের মাধুরী আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমি স্বপ্নে অনুভব করিতে থাকি ধীরে ধীরে আমার কুঁড়িগুলি আমার সর্বাঙ্গে পুলকের মতো ছাইয়া উঠিতেছে। আধঘুমঘোরে শুনিতে পাই আমার সন্ধ্যাবেলাকার ফোটা ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি সমস্ত দিনরাত্রি এই নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া আছি— আমি চলিতে পারি না, খুঁজিতে পারি না, কোথায় কী আছে সকল দেখিতে পাই না। আমি কেবল আকাশের গুটিকত তারা চিনিয়া রাখিয়াছি, আর কাননের গুটিকতক গাছ দেখিতে পাই, তাহারা প্রভাতের আনন্দে আমারই মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমার কাছে দূর বন হইতে ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু সে ফুল আমি দেখিতে পাই না। পল্লবের মর্মর শুনিতে পাই কিন্তু কোথায় সে ছায়াময় বন! শুভ্র ক্ষীণ মেঘ আকাশের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়— কিন্তু কোথায় সে যায়! যে পাখি অনেক দূর হইতে উড়িয়া আমার ডালে আসিয়া বসে সে কেন আমাকে জগতের সকল কথা বলিয়া যায় না!

আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি— যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এইজন্য আমি সমস্তদিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই— আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই, আমার আনন্দের বার্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌঁছায়, নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।

ছোটো মেয়েটি আমার তলা হইতে অবহেলে অমনি একমুঠো ফুল কুড়াইয়া লয়, মাথায় দুটো ফুল গুঁজিয়া চলিয়া যায়। কোথায় কোন্ নদীর ধারে কোন্ ছোটো কুটিরে তাহার ছোটো ছোটো সুখদুঃখের মধ্যে আমার ফুলের গন্ধ মিশাইতে থাকে। বৃদ্ধ সকালে সাজি করিয়া আমার ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করে, তাহার ভক্তির সহিত আমার ফুলের গন্ধ আকাশে উঠিতে থাকে।

আমি প্রতিদিন সকালে যে আনন্দপূর্ণ সূর্যালোক, স্নেহপূর্ণ বাতাস পাই, আমি আমার ফুলের মধ্যে করিয়া সেই আলোক সেই বাতাস ফিরাইয়া দিই। জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরও থাকিলে আরও দিতাম।

দিয়া কী হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়— কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল তো শূন্য হয় না, প্রতিদিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্যালোকে ফুটাইয়া তুলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্রধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই আমি কেবল জানি; তার পরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটানো ফুল বিসর্জন অবশ্য কিছু-না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাতসংগীতের তালে তালে আমার ফুলের পতন হয়। সেই সুমধুর ছন্দে আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্যগীত সম্পূর্ণ হইতেছে।

আকাশের তারাগুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল, তাহারা কি কোনো কাজে লাগে না? মালার মতো গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পাও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্যের স্তরের উপর স্তরে জগৎব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোটো পাপড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।

বালক
অগ্রহায়ণ ১২৯২

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব

বানর বলিতেছেন— আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন বনুবংশজাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। নল নীল অঙ্গদ এবং সুবিখ্যাত মর্কটেরা এই বনুবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার।

আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ— আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি। যেহেতু তাহারা অপক্ক কদলী দগ্ধ করিয়া খায়, এরূপ আচরণ আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। তাহা ছাড়া তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এমনি অশুচি! আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না তাহাদের সমাজে এমনি সহৃদয়তার অভাব। শ্রেষ্ঠজাতি বানর জাতি এই-সকল কারণে মনুষ্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কত দিব? আমরা পুরুষানুক্রমে কখনো চাষ করিয়া খাই না। সনাতন বানরশাস্ত্রে চাষ করার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বনুর সময়ে যে নিয়ম ছিল আমরা আজও সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি— এমনি আমরা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ম্লেচ্ছ মনুষ্য জাতি চাষ করিয়া খায়, তাহারা চাষা।

চাষ না করাই যে সাধু আচার তাহার প্রমাণ এই, এতকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বানরসমাজে চাষ না করাই প্রচলিত। চাষ করাই যদি সদাচার হইত, তবে বনু-আচার্য কি চাষ করিতে বলিতেন না? আমাদের বানর বংশে যে মহাত্মা জাম্বুবানের মতো এত বড়ো দূরদর্শী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কই তিনি তো চাষের কোনো উল্লেখ করেন নাই। তবে যদি আধুনিক অর্বাচীন নব্য বানরের মধ্যে কোনো মহাপুরুষ লেজ খসাইয়া মানুষীয়ানা করিতে চান, তবে তিনি সনাতন পবিত্র বানর প্রথা ত্যাগ করিয়া চাষ করিতে থাকুন!

কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় এই যে, বানরদের শ্রেষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া মানুষেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিতে আসিয়াছে যে, মানুষরা বানর বংশজাত। এইরূপ মিথ্যাযুক্তির সাহায্যে গোলেমালে কোনোপ্রকারে মানুষ বানরের দলে মিশিতে চায়! হে বানর ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সাবধান, মানুষ যে বানর এরূপ গুরুতর ভ্রম মনে স্থান দিয়ো না।

গোটাকতক বিষয়ে বানরে ও মানবে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা হইতে কী প্রমাণ হইতেছে! এই প্রমাণ হইতেছে যে, মানবেরা বানর হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত আমাদের অনুকরণ করিতেছে— ক্রমাগত আমাদিগকে ape করিতেছে। ম্লেচ্ছ মানব কাঁচকলা খাইত বটে, কিন্তু পক্ক কদলীর গৌরব আমাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। উকুনবাছা সম্বন্ধেও মানবীরা আমাদের অতি অসম্পূর্ণ অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ বানরেরা তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। আনন্দ উপলক্ষে অনেক সময়ে মানবেরা দন্তপঙ্‌ক্তি বিকাশ করে বটে, এবং মনে করে বুঝি অবিকল বানরের মতো হইলাম— কিন্তু সে মুখভঙ্গি আমাদের পবিত্র বানরজাতি-প্রচলিত সনাতন দন্তবিকাশের কাছ দিয়াও যায় না।

মানবের ভাষায় দুই-একটা এমন শব্দপ্রয়োগ দেখা যায় বটে, যাহাতে সহসা কোনো নির্বোধের ভ্রম হইতেও পারে যে বানরের সহিত মানবের যোগ আছে। 'লেজে তেল দেওয়া' 'লেজ মোটা হওয়া' শব্দ মানবেরা এমনভাবে ব্যবহার করে যেন তাহাদের সত্যসত্যই লেজ আছে। কিন্তু উহা ভান মাত্র— উহাতে কেবল তাহাদের হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ পায় মাত্র— হায় রে দুরভিলাষ! আমি শুনিয়াছি দুরাশাগ্রস্ত লোককে মানুষ বলিয়া থাকে 'অমুক কাজ করিয়া এমনি কী চতুর্ভুজ হইয়াছ!' ইহাতে চতুর্ভুজ হইবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা প্রকাশ পায়। শ্রেষ্ঠ বনুবংশজাত বানরেরা সহজেই চতুর্ভুজ হইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ মানবেরা শত জন্ম তপস্যা করিলেও তাহা হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মানবেরা বানর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন-কি, বস্ত্রদ্বারা তাহারা সযত্নে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পাছে তাহাদের রোমাবলীর বিরলতা ও লাঙ্গুলের অভাব ধরা পড়ে— পবিত্র বানরতনুর সহিত ম্লেচ্ছ মানবতনুর প্রভেদ দৃশ্যমান হয়। লজ্জার বিষয় বটে। কিন্তু বনুবংশীয়দের কী আনন্দ! আমরা কী গৌরবের সহিত আমাদের লাঙুল আস্ফালন করিতে পারি।

আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে— কারণ শ্রেষ্ঠজাতির শাস্ত্র নিকৃষ্টজাতি কখনোই বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষের ভাষায় কি কোনো প্রকৃত তত্ত্বকথা আছে— যদি থাকিত তবে কি আমাদের পবিত্র কিচিকিচির সহিত তাহার কোনো সাদৃশ্য পাইতাম না?

অতএব আমাদের বনুদেব ও হনুমদাচার্য চিরজীবী হইয়া থাকুন, আমরা যেন চিরদিন বানর থাকি, এবং কিচিকিচি শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বানরত্ব লাভ করি। আমাদের সনাতন লেজ যেন সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, এবং আস্ফালনের প্রভাবে তাহা দিনে দিনে যেন দীর্ঘতর হইতে থাকে! আর যে যা খায় খাক আমরা যেন কেবল কলা খাইতেই থাকি, এবং শ্রেষ্ঠ বানর ব্যতীত অন্য জীবকে দেখিবামাত্র দাঁত খিঁচাইয়া আনন্দলাভ করি।

বালক
চৈত্র ১২৯২

কার্যধ্যক্ষের নিবেদন

কার্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশত কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক কার্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক— তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এই-সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্যধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

বালক কার্যাধ্যক্ষ

বালক
চৈত্র ১২৯২

সৌন্দর্য ও বল

পরিমিত বেশভূষা দ্বারা স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমাদের খারাপ লাগে না। কিন্তু কেহ বিশেষ কোনো হাবভাবভঙ্গি অনুশীলন করিয়া রূপচ্ছটা বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং অধিকাংশ স্থলে রূপসীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ইহার কারণ কী? সৌন্দর্য আমাদের মনে পূর্ণতার ভাব আনয়ন করে, পূর্ণতার সহিত চপলতার যোগ নাই; পূর্ণতার মধ্যে একটি বিরাম আছে। পরিমিত বসনভূষণ আমাদের মনকে নিমেষে নিমেষে উত্তেজিত করে না— রূপের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটি পরিপূর্ণতা আমাদের সমক্ষে আনয়ন করে। এইজন্য সর্বত্র বলে লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। লজ্জা অর্থে সংযম, সামঞ্জস্য, বিরাম। কোনো প্রকার গতিচাপল্য বা উচ্চস্বর প্রভৃতি যাহাতে সৌন্দর্যের শোভন সামঞ্জস্য নষ্ট করে তাহা নির্লজ্জতার অঙ্গ। এই হিসাবে অত্যধিক অলংকার এবং অতি রঙচঙ নির্লজ্জতা। বিবসন নিশ্চল প্রশান্ত গ্রীক প্রস্তরমূর্তির মধ্যে একটি আশ্চর্য সসম্ভ্রম সলজ্জ ভাব আছে— কিন্তু বিস্তর বাহার-করা বাসাচ্ছাদিতা ভঙ্গি-নিপুণা রূপসীর মধ্যে তাহা নাই। চেষ্টার

ভাব পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে— বসনভূষণ অপেক্ষা হাবভাবে অধিক চেষ্টা প্রকাশ পায়— মন প্রতিক্ষণে প্রশ্ন করে এমন সময়ে হাত কেন নাড়িল, অমন সময়ে ঘাড় কেন বাঁকাইল, যদি তাহার কোনো স্বাভাবিক উদ্দেশ্য না খুঁজিয়া পায় তবে তখনই বুঝিতে পারে তাহা সৌন্দর্য-বৃদ্ধির চেষ্টা; এবং মন বলে সৌন্দর্যের সহিত চেষ্টার তো কোনো যোগ নাই। বলের সহিত সৌন্দর্যের প্রভেদ তাহাই। চেষ্টা হইতে চেষ্টার জন্ম হয়। বলের মধ্যে চেষ্টা আছে, এইজন্য সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের মনে চেষ্টার উদয় হয়। এইজন্য বলের অধীন হইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, দাসত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে পরাজয় অনুভব করি। নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র সৌন্দর্যের নিকট আমরা নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র ভাবে আত্মসমর্পণ করি। তাহার মধ্যে যখনই চেষ্টা দেখি তখনই তাহা বলের সামিল হইয়া দাঁড়ায়, তৎক্ষণাৎ আমাদের মন সচেতন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হয়। 'দেখি, কে হারে কে জেতে' এই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২১।১১।১৮৮৮

আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব

আবশ্যকের প্রতি আমাদের এক প্রকার ঘৃণা আছে। যাহার মধ্যে আবশ্যকের ভাব যত পরিস্ফুট তাহাকে ততই নীচশ্রেণীয় মনে করি। চাষ নিতান্তই আবশ্যকীয়— বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে একান্ত আবশ্যকতা তত জাজ্বল্যরূপে নজরে পড়ে না। যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং তাহারা নীচশ্রেণীয়, যাহারা বসিয়া খায় সমাজের পক্ষে তাহাদের তেমন স্পষ্ট আবশ্যক দেখা যায় না তাহারা উচ্চশ্রেণীয়। ঘটিবাটির প্রতি আমাদের এক ভাব ফুলদানির প্রতি অন্যভাব। এইজন্য আমরা আবশ্যকের বিবাহকে হেয় এবং প্রেমের বিবাহকে উচ্চশ্রেণীয় মনে করি। স্ত্রীকে যদি আবশ্যক জ্ঞান করি তবে স্ত্রী দাসী, স্ত্রীকে যদি ভালোবাসি তবে সে লক্ষ্মী। Marriage de convenance-কে এইজন্য ইংরাজেরা সাধারণত কেমন ঘৃণার ভাবে উল্লেখ করে। প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সেই অত্যাবশ্যকতা নাই, এইজন্য তাহার মধ্যে স্বাধীনতার গৌরব আছে, তাহাতে দাসত্ববন্ধন নাই। মর্ত্যের সমস্ত নিয়ম আবশ্যকের নিয়ম, প্রেম যেন সেই নিয়মকে অতিক্রম করিয়া অমর্ত্য উজ্জ্বলভাব ধারণ করে এবং সেই প্রেমের বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে বিশুদ্ধ সম্মানের ভাব আসিয়া পড়ে। মনুষ্য সহস্র আবশ্যক বন্ধনে বদ্ধ প্রকৃতির দাস— কেবল প্রেমের মধ্যে সে আপনাকে স্বাধীন ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করে। এই স্বাধীনতার বন্ধন অন্য সকল বন্ধন অপেক্ষা গুরুতর, কারণ অন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়াস আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে, এ বন্ধনে সেই প্রয়াসকেও অভিভূত করিয়া রাখে। সেইজন্য এক হিসাবে প্রকৃত স্বাধীনতা সকল অধীনতা অপেক্ষা দৃঢ়তর অধীনতা— কারণ স্বাধীনতা সবল অধীনতা, পরাধীনতা দুর্বল অধীনতা। যথেচ্ছাচারিতাকে আমি স্বাধীনতা বলিতেছি না তাহা, অধীনতার সোপান ও অঙ্গ।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২১।১১।১৮৮৮

শরৎকাল

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নির্মল নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি। এই প্রথম বর্ষা অপগমে প্রভাতের প্রকৃতি কী অনুপম প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কী এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোনাকে গলাইয়া

বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ু-হিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে, কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝা যায় না। শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। কবিতার মধ্যে অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না— মনে হয় ও একটা কবিতার অলংকার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি। নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে-সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক-এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহা বিস্মৃত, অতি বিস্তৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরৎকালের সূর্যালোকে আমার এইরূপ অবস্থা হয়। দুই-একটা জীবনের ঘটনা, দুই-একটা অতীতকালের মধুর শরৎ মনে পড়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে যে-সকল শরৎকাল মনে পড়ে না, যে-সকল ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন-চারের পূর্বে একটি শরৎকাল আমি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। বাড়ির প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরও দুটি-একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশেপাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধহয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।

এক মুহূর্তের জন্য প্রগাঢ় সুখ অনুভব করিলে, সেই মুহূর্তকে যেমন আর মুহূর্ত বলিয়া মনে হয় না— মনে হয় যেন তাহার সহিত অনন্তকালের পরিচয় ছিল, বোধহয় আমারও সেইরূপ এক শরৎকাল রাশীকৃত শরৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই শরতের মর্মের মধ্য দিয়া যেন বহুসহস্র সুদূর শরৎপরম্পরা দেখিতে পাই— দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণী যেমন অবিচ্ছিন্ন সংহতভাবে দেখা যায়, সেইরূপে— অর্থাৎ সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা নিবিড় শারদ আনন্দের ভাবরূপে।

আমার মনে হয় স্বভাবতই শরৎকাল স্মৃতির কাল এবং বসন্ত বর্তমান আকাঙ্ক্ষার কাল। বসন্তে নবজীবনের চাঞ্চল্য, শরতে অতীত সুখদুঃখময় জীবনের পূর্ণতা। বাল্যকাল না গেলে যেন শরতের অতলস্পর্শ প্রশান্তি অনুভব করা যায় না।

আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮৯।
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
মানসী, আশ্বিন ১৩২০

ছেলেবেলাকার শরৎকাল

এই শরতের প্রভাতের রৌদ্রে জানলার বাহির দিয়া গাছপালার দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় চারি দিকের প্রকৃতির শোভা কী একান্ত ভালো লাগিত। ভোরের বেলায় বাড়িভিতরের বাগানে গিয়া পথের দুইধারি ফুটন্ত জুঁই ফুলের গন্ধে কী আশ্চর্য আনন্দ লাভ করিতাম! গাছের গোপন সবুজের মধ্য হইতে একটি আধফুটো জহরী-চাঁপা খুঁজিয়া পাইলে কী যেন একটা সম্পদ লাভ করিতাম মনে হইত। বাহিরের তেতালার টবে অনাহূত অতিথির মতো একটু বুনোলতা কী সুযোগে জন্মিয়াছিল, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া যখন দেখিতাম সেই লতা বেগুনি ফুলে একেবারে ভরিয়া গেছে আমার মনে কী এক অপূর্ব বিস্ময়পূর্ণ উল্লাসের সঞ্চার হইত। বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা বটে। সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই একেবারে, দুর্বল, কোমল পেলব, কতরকমের সুন্দর ভঙ্গিমায় বঙ্কিম ক্ষীণ লতাটির শাখায় শাখায় ফুল— নবীন, পরিপূর্ণ পরিস্ফুট— সকল রঙগুলি ফলানো, রঙের আভাসগুলি অতি সুকোমলভাবে আঁকা, পাপড়ির অগ্রভাগগুলি অতি সযত্নে বাঁকাইয়া অমনি টুপ করিয়া একটুখানি মুখ করিয়া দেওয়া, সুকুমার বৃন্তটুকুর উপর অতি সরল সুন্দর ভারলেশহীন নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসানো— কোথাও কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিমুখ ভাব নাই— সমস্ত বিশ্বসংসার যেন তাহার প্রতি একাগ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং সে যেন সমস্ত বিশ্বের প্রতি পরিপূর্ণ প্রসন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার প্রত্যেক সুকুমার বঙ্কিমার লেশটুকুর মধ্যে অপরিসীম প্রেমের ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গের সুকোমল সুগোলতার মধ্যে, বিশেষত তাহার বুকের মাঝখানটিতে যেখানে চারি দিকের রঙের ঘোর অতি ধীরে ধীরে নরম হইয়া একেবারে মোলায়েম সাদা হইয়া আসিয়াছে— যেন অনন্তকালের সযত্ন সোহাগের চুম্বন লাগিয়া আছে। অতিশয় আশ্চর্য! একটি গোপন জহরী চাঁপা একটি গোপন সম্পদ তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা ছেলেমানুষের অপরিণত হৃদয়ের মোহমাত্র নহে। এখন সে বিস্ময়ের আনন্দ চলিয়া গেছে। এখন একটা অনাদৃত বুনোলতার বেগুনি ফুলকে নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ মনে হয়। ফুল যে ফুটিবারই কথা। ফুল সুন্দর বটে এবং অনেক ফুল দুর্লভও বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই নিবিড় বিস্ময়ের স্থান নাই। ভিক্ষুকের যখন ভিক্ষা বরাদ্দ হইয়া যায়, তখন তাহার আর কৃতজ্ঞতা জন্মে না। শিশুকালে আমরা ভালো করিয়া জানিতাম না চারি দিকের এ অসীম সৌন্দর্য আমাদের নিত্যনিয়মিত বরাদ্দ। জননী যেমন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে অজস্র স্নেহের দ্বারা আমাদিগকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহার মধ্যে অনেকটাই আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত, তাহার অনেকটা আমাদের নজরে পড়ে না, তাহার অনেকটা আমরা অবহেলে গ্রহণ করি, কিন্তু বিচার করি না, কিন্তু উদার মাতৃস্নেহের তাহাতে কিছুই আসে যায় না— ইহাও সেইরূপ।

১০।১০।৮৯

[২৫ আশ্বিন ১২৯৬]

ইন্দুর-রহস্য

দিনকতক দেখা গেল সুরির দুটো-একটা বাজনার বই খোয়া যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার তো কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দুর জাতির স্বাভাবিক... মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। তাহারা যেরূপ নিজের ল্যাজের উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক পর্যবেক্ষণ করে, তাহাদের যেরূপ উজ্জ্বল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, যেরূপ তীক্ষ্ণ দন্ত, যেরূপ আগ্রহপূর্ণ সন্ধানপর নাসিকা, যেরূপ ঊর্ধ্বোত্থিত সতর্ক

কর্ণযুগল, যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে চারি দিকে ধাবমান হইবার ক্ষমতা, সকল জিনিসেই যেরূপ ছিদ্রখনন করিবার তৎপরতা এবং যাহা পায় তাহারই টুক্‌রা যেরূপ সযত্নে নিভৃত গহ্বর— Laboratory-র মধ্যে সঞ্চয় করিবার স্পৃহা তাহাতে তাহাদের Scientific training সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব-বৈজ্ঞানিক ইন্দুরবংশে একটি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ইন্দুর। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বইয়ের সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছে। বিচিত্র ঐকতানপূর্ণ সংগীতের আশ্চর্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার বই ক্রমাগত analyse করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহার মিলন সাধন করিতেছে। মনে করিতেছে ঠিক রাস্তা পাইয়াছে, এখন অধিকতর গবেষণার সহিত analyze করিয়া গেলে সংগীততত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। এখন বাজনার বই কাটিতে শুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সরু নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে— মাঝে হইতে সংগীত দেশছাড়া। আমার মনে কেবল এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদানসম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে? অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার— কোনো জ্ঞানবান জীব-কর্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার; সেই সংস্কারের একটা পরম সফলতা এই দেখা যাইতেছে তাহারই প্ররোচনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু এক-একদিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। সেটা ব্যাপারটা কী? সেটা একটা রহস্য বটে। কিন্তু এই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে এই রহস্য শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৬।১০।১৮৮৯

কাজ ও খেলা

কাজ ও খেলা নামক ৭৩-সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

খেলা কাহাকে বলে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

আমাদের মানবকার্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তি ও শক্তির চর্চা হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমে তাহারা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত সঞ্চিত ও অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। সকল সময়ে আমরা তাহাদের হাতে কাজ দিতে পারি না। অথচ কাজ করিবার জন্য তাহারা অস্থির। সুতরাং যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি ও এই উপায়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চিত উদ্যমকে ছাড়া দিয়া আনন্দ অনুভব করি। অনেক সময়ে দীর্ঘ আলস্যের পর মাংসপেশীর রুদ্ধ উদ্যমকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খাটাইয়া লইতে ইচ্ছা করি। মানবহৃদয়ে একটা প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি আছে, দৈনিক কাজে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয় না, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভান করিয়া হারজিতের খেলা গড়িয়া তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়।

সভ্যতা-বৃদ্ধিসহকারে আমাদিগকে অনেক প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং খেলাচ্ছলে তাহাদের নিবৃত্তি সাধন করিতে হয়। অসভ্য অবস্থায় শুদ্ধমাত্র গৌরবলাভের জন্য যুদ্ধ এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায়। সভ্য অবস্থায় নানা প্রণালী বাহিয়া এই প্রবৃত্তি আপন শক্তি-উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত করিতেছে। কতক কাজের ঠেলাঠেলিতে, কতক লেখালেখিতে, কতক শারীরিক কতক মানসিক প্রতিযোগিতায় এবং বাকি নানাবিধ খেলায়। কাব্য লিখিয়া, কাব্য পড়িয়া, অভিনয় দেখিয়া ও করিয়া নানা প্রবৃত্তির অলক্ষিত চরিতার্থতা সাধন হয়।

সত্যকার কাজে এত অধিক উত্তেজনা, তাহার সহিত স্বার্থের এত যোগ, তাহাতে এত প্রাণপণ কঠিন চেষ্টার উদ্রেক হয় যে শুদ্ধমাত্র প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির সুখ তাহাতে লাভ করা যায় না। বিশেষত তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে। কার্যের কঠিন শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। খেলার মধ্যেও নিয়ম আছে নহিলে বাধা-অতিক্রমণের স্বাভাবিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়— কিন্তু সে নিয়মের বাধার মধ্যে কেবল ততটুকু দুঃখ আছে যতটুকু না থাকিলে সুখ নির্জীব হইয়া পড়ে। নিয়মকে নিয়ম অথচ তাহার ভার কিছুই নাই। অত্যাবশ্যকের মধ্যে স্বাধীনতার একান্ত পরাভবদুঃখ অনুভব করিতে হয়, খেলায় তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে কাজের ভান করিয়া শারীরিক মানসিক নানাবিধ শক্তিচালনা করা খেলা। কিন্তু ইহাতেও কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। প্রবঞ্চনা করাকে খেলা বলে না। অনেকে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া সুখ পায়, কিন্তু তাহাকে খেলা বলিলে চলে না। খেলার মধ্যে প্রকাশ্য ভান থাকা চাই। আপনা-আপনির মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া প্রবঞ্চনা। আমাদের একটা অংশ ভুলিতেছে এবং আরেকটা অংশ ভুলিতেছে না এমনি একটা ব্যাপার। আমরা যদি আপনাকে ও অন্যকে বা কেবল আপনাকে বা কেবল অন্যকে সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা করি তাহা হইলে আর খেলা হয় না।

অতএব 'কাজের ভান'ই খেলা বটে কিন্তু এমনি বাঁচাইয়া চলিতে হইবে যে বেশি 'কাজ'ও না হয় বেশি 'ভান'ও না হয়। সর্বস্ব অথবা বিস্তর টাকা পণ রাখিয়া জুয়াখেলা খেলাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। লাভ-স্পৃহা ও প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিকে খেলার দ্বারা চরিতার্থ করিতে গেলে অল্প পয়সাকে বেশি পয়সা মনে করিয়া লইতে হয়— নতুবা খেলার বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না; স্বার্থের সহিত জড়িত হইলে খেলার লঘুতা দূর হয়, সে আমাদের প্রাণটা যেন চাপিয়া ধরে।— অপরপক্ষে Flirtationকে খেলা বলা যাইতে পারে। নিরুদ্যম প্রেমের প্রবৃত্তিকে খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিবার জন্য যদি উভয়পক্ষের মধ্যে মনে মনে বোঝাপড়া থাকে তবে তাহা খেলা বটে— কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা বা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিলে তাহা আর খেলা থাকে না। রীতিমতো প্রবঞ্চনা করিতে গেলে খেলার লঘুতা চলিয়া যায়— কারণ, খেলায় দুইপক্ষ কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে ধরা দেয়, এইজন্য ভান করা গুরুতর চেষ্টাসাধ্য বা অধিক চিন্তার কারণ হয় না— তাহাতে আমাদের ধর্মবুদ্ধি পীড়িত হয় না এবং লোকসমাজের নিন্দা সহ্য করিতে হয় না— সমস্ত ফলাফল অল্পেই চুকিয়া যায়। নিয়মবন্ধন, কর্মফল, স্বার্থের প্রবল আকর্ষণ এইগুলো যথাসাধ্য বাদ দিয়া সুস্থ শরীর- হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে খাটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য।

তবে দেখা যাইতেছে শারীরিক মানসিক শক্তিচালনার উদ্দেশে কাজের প্রকাশ্য ভান করা খেলা। অতএব Political Agitation-এর সঙ্গে খেলার তুলনা খাটে কি না ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা কি আপনাকে ও পরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি না?

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

১৭।১০।১৮৮৯

[ঘানির বলদ]

ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরছি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করছি তবে সেটা তার একটা অন্ধ ভ্রম, কিন্তু সে যদি জানে আমি সর্ষেকে পেষণ করে তার মধ্যেকার নিগূঢ় তেলটুকু বের করে নিচ্ছি তবে সে ঠিক কথাটা জানে।

বিজ্ঞান নিজের ঘানিযন্ত্রের চতুর্দিকে যতই সশব্দে ঘুরছে, রহস্যরাজ্যের সীমার দিকে এক পা অগ্রসর হতে পারছে না, কিন্তু বিবিধ বীজকে বিশ্লেষণ এবং পেষণ করে তার ভিতরকার তেল অনেকটা পরিমাণে বের করছে, এবং সে তেল থেকে মানুষের গৃহকোণের অন্ধকার দূর করবার একটা উপাদান তৈরি করছে সে কথা নিয়ে সে বাস্তবিক গর্ব করতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

[জীবনের বুদ্‌বুদ]

মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ উঠছে। খানিকক্ষণের জন্যে সূর্যালোকে নীলাকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে; তার পরে হঠাৎ ফেটে যায়, জীবনের তপ্তবাষ্পটুকু বেরিয়ে যায়, মৃত্তিকার আবরণটুকু এই মৃৎ-সাগরে মৃত্যুসাগরে লুপ্ত হয়, কারো গণনার মধ্যে আসে না।

উপমাটা অত্যন্ত পুরাতন, কিন্তু যখনই ভেবে দেখা যায় তখনই নূতন মনে হয়। মৃত্যুর চেয়ে পুরাতন এবং মৃত্যুর চেয়ে নূতন আর কিছু নেই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।৪।৯১। বির্জিতলাও।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

বাগান

ভদ্রতার ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচরণের একটু বিশেষত্ব আছে। কুৎসিত শব্দ ভদ্রলোকের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না, এবং যাহার মনে আত্মসম্মান বোধ আছে সে কখনো হাঁটুর উপরে একখানা ময়লা গামছা পরিয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তেমনি ভদ্রলোকের বাসস্থানেরও একটা পরিচ্ছদ এবং ভাষা আছে, নিদেন, থাকা উচিত। ভদ্রলোকের কুলে শীলে ঘরে বাহিরে সর্বত্রই একটা উজ্জ্বলতা থাকা চাই— যেখানে তাঁহার আবির্ভাব সেখানে পৃথিবী আদৃত শোভিত এবং স্বাস্থ্যময় যদি না হয়, যদি তাহার চারি দিকে আগাছা, জঙ্গল, বাঁশঝাড়, পানাপুকুর এবং আবর্জনাকুণ্ড থাকে তবে সেটা যে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয় এ কথা আমরা সকল সময় মনে করি না। কেবল লোক দেখাইবার কথা হইতেছে না। অশোভনতার মধ্যে বাস করিলে আপনার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না, নিজের চতুর্দিক নিজেকে অপমান করিতে থাকে, আর সুখ-স্বাস্থ্যের তো কথাই নাই। আমরা যেমন স্নান করি এবং শুভ্র বস্ত্র পরি তেমনি বাড়ির চারি দিকে যত্নপূর্বক একখানি বাগান করিয়া রাখা ভদ্রপ্রথার একটি অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

রসিক লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর আর-একটা নূতন বাবুয়ানার অবতারণা হইতেছে, অন্নচিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না বাগান করিবার অবসর কোথায়। কিন্তু এ কথাটা একটা ওজরমাত্র। কাজের তো আর সীমা নাই! বঙ্গদেশে এমন কোন্ পল্লী আছে যেখানে প্রায় ঘরে ঘরে দুটি-চারটি অকর্মণ্য ভদ্রলোক পরমালস্যে কালযাপন না করেন। শহরের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অবসর নাই এমন ব্যস্ত লোক অতি বিরল। তাহা ছাড়া বাংলা দেশের মৃত্তিকায় একখানি বাগান করিয়া রাখা যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্যাতীত তাহাও নহে। তবে আলস্য একটা অন্তরায় এবং ঘরের চারি দিক সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যজনক করিয়া রাখা তেমন অত্যাবশ্যক বলিয়া ধারণা না হওয়ায় তাহার জন্য দুই পয়সা ব্যয় করিতে আমরা কাতর বোধ করি এবং যেমন-তেমন করিয়া ঝোপ-ঝাড় ও কচুবনের মধ্যে জীবনযাপন করিতে থাকি। এইজন্য বাংলার বসতি-গ্রামে মনুষ্যযত্ন-কৃত সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল পদে পদে অযত্ন অনাদর ও আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের ভিতরে বাহিরে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অন্তর বাহিরকে আকার দেয় এবং বাহিরও অন্তরকে গড়িতে থাকে। বাহিরে চতুর্দিক যদি অযত্নসম্ভূত শ্রীহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তবে অন্তরের স্বাভাবিক নির্মল পারিপাট্যপ্রিয়তাও অভ্যাসক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি করা একটা মানসিক শিক্ষার অঙ্গ বলিলেই হয়। ওটা কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নহে। সন্তানদিগকে সৌন্দর্য, নির্মলতা এবং যত্নসাধ্য নিরলস পারিপাট্যের মধ্যে মানুষ করিয়া তুলিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগের হৃদয়ে উচ্চ আত্মগৌরব সঞ্চার করা পিতামাতার একটা প্রধান কর্তব্য। চারি দিকে অবহেলা, অমনোযোগ আলস্য এবং যথেচ্ছ কদর্যতার মতো কুশিক্ষা আর কী আছে বলিতে পারি না। বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা এবং উন্নতি-ইচ্ছা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিলে ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। বাসস্থানের বাহিরে যেখানে অবহেলায় জঙ্গল জন্মিতেছে, অযত্নে সৌন্দর্য দূরীভূত হইতেছে সেখানে ঘরের মধ্যে মনের ভিতরেও আগাছা জন্মিতেছে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ঠাকুরঘর

বড়ো ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা গায় পাতিয়া লয়। বিশেষত যদি দুটো অপবাদের কথা থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে, সকলেই মনে করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভারি খুশি হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে— নতুবা এমন লোক আর কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহংকারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে তো খুশি হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই দুই-দশজন নয় একেবারে দেশের লোকে তাড়া করিয়া আসে। ইহার কারণ কী?

তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া কলা খাইতেছি? অর্থাৎ যেটা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া উচিত, গোপনে তাহার মধ্য হইতে উপাদেয় জিনিসটি লইয়া নিজে ভক্ষণ করিতেছি? আসলে, দেবতার প্রতি ষোলো-আনা বিশ্বাসই নাই?

যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।

যে কারণেই হৌক, আমরা সহজে ঠাকুরঘর আর ছাড়িতে চাই না। কার্যক্ষেত্রে বিস্তর কাজ, এবং অনেক চিন্তা, এবং বাধা-বিপত্তির সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম। কিন্তু ঠাকুরঘরে কোনো কাজকর্ম নাই; কেবলই স্তবপাঠ এবং ঘণ্টানাড়া। অথচ নিজের কাছে এবং পরের কাছে অতি অল্প চেষ্টায় পরম পবিত্র ভক্তিভাজন হইয়া উঠা যায়।

যদি কেহ বলে, ওহে, কাজকর্মের চেষ্টা দেখো। আমাদের ঠাকুর বলেন, আমরা জাত-পুরোহিত, কাজকর্মকে আমরা হেয় জ্ঞান করি; আমাদের পক্ষে সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এমন উন্নত মহানভাবে বলেন শুনিয়া তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলি— যে আজ্ঞা! আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন। ম্লেচ্ছদের মতো আপনি কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে-সকল বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন এবং যেগুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্বিবাদে সম্পন্ন করুন।

সাধনা
শ্রাবণ ১২৯৯

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাংলা পদ্য, বিশেষত গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমরা সর্বদাই কী-যেন কে-যেন কখন-যেন কেমন-যেন কী-যেন-কী-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনোরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কী-যেন হইয়া যাইব; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি— মনে কোনো জায়গায় কোনোরূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রি বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোনো ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সংগীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাঁহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চুন খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যেদিন চাঁদ উঠে সেদিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক, দেখি তাহাতে কীরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধু ভাষায় পরস্পর সম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিত স্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোনো প্রকার স্বপ্নই টিকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্ডিওরেন্সের টাকা,

ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোনো বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোনো পূর্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনোরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি, নীরব চিন্তা সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা এবং নীরব কবিতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধু-বান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া 'কে-যেন' 'কী-যেন' আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর-সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কী করিব? কী করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানো; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য! আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়— কী করিলে একটি 'কে-যেন' একটি 'কী-যেন' পাওয়া যায়!—

ভারতী ও বালক
আশ্বিন ১২৯২

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কী হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি।

কিছুদিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পারে কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনও লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালোবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব— এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ-হৃদয় তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই— অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই— একদিন প্রত্যূষে উঠিলাম। দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!'

সে তৎক্ষণাৎ কহিল, 'বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম।'

আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম, 'প্রবঞ্চনা করিস না রে জগা, সত্য করিয়া বল— এ তোড়া তোকে কে দিল!'

সে কহিল, 'প্রভু, এ আমি নিজে বানাইয়াছি!'

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম— 'আমার মাথা খাইস জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল!'

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল উচ্চারণমিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল— 'প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তে রচনা।'

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা— আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা, প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদগদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন— 'এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক!'—

জগা তো চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি-একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল— বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কী হইল। কী যেন-আমাকে কী করিল! কে যেন আমাকে কী বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি— এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি— আমার কাছে চিরজীবনের মতো কী-যেন-কী হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনই জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

ভারতী ও বালক
আশ্বিন ১২৯৯

[লেখক-জন্ম]

পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ করিয়াছিলাম নতুবা লেখক হইয়া জন্মিলাম কেন? মনের ভাবগুলা যখন বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছি তখন বাহিরের লোক উচিত অনুচিত যে কথাই বলে না শুনিয়া উপায় নাই। সুধাকর চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যেই আরামে শয়ান থাকিতে তাহা হইলে কবিদের কবিত্ব করিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে কিন্তু নিশীথের শৃগাল তোমার

দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তারস্বরে অসম্মান জানাইয়া যাইত না।

মনের ভাব যখন মনে ছিল সে যেন আমার গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল; এখন কী মনে করিয়া তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষের তলায় স্থাপন করিলাম? সকল জীবজন্তুই কি তাহার সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বের চোখের সামনে পাথর হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

তাহার পর আবার আত্মীয় বন্ধুদের কাছেও জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে, ওটা কীভাবে বলিলে, সেটার অর্থ কী? এও তো বিষম দায়! যেন আমি কোদাল দিয়া পথ কাটিতেছি বলিয়া গাড়ি করিয়া মানুষকে পার করিয়া দেওয়াও আমার কর্তব্য।

যাহা হৌক, ঝগড়া কাহার সহিত করিব? জন্মকালে অদৃষ্ট পুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বসিয়া কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপিলেখক মহাশয়কে তাঁহার কোন্ লিখনের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা করিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আর তাঁহারই বশবর্তী হইয়া আমরা যদি দুটো কথা লিখি তাহা হইলে কথার আর শেষ থাকে না।

পকেটবুক

[রচনাকাল : ফাল্গুন ১২৯৯]

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে-সকল ত্রুটির যত-কিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্মা হইয়া কর্ণধারের মতো পত্রিকার চূড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মতো কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মতো— সমস্ত দিন খেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া জোগান দিতে হয়; তাহাতে পরম ধৈর্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই— অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প— অথচ চাল বিলাতি, নিয়ম অত্যন্ত কড়া; সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্মবশত কম্পোজিটরের রোগতাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলমালে ঠিকা লোক পাওয়াও দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই-সকল বাধা-বিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা

পূরণ করিবার মতো যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মতো অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সংকট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহু বামনের চেষ্টার মতো হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্টস্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি এই ফলের যাহা-কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা-কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ-সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোনো কার্যে ব্রতী হন না— আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণাবাতাসের মতো যখন কর্মের আবর্ত ঘেরিয়া ফেলে তখন ধূলায় বেশি দূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভালো দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোনো মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন— এবং পার্শ্ববর্তিনী ঘৃণাসংকুচিতা মহিলাকে কহিলেন, 'ভদ্রে, কোনো নির্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত।' গরম সুপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হউক, সম্পাদন কার্যে ত্রুটি উপলক্ষে যাঁহারা আমাকে মার্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে-সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্ত্বার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারতী
চৈত্র ১৩০৫

গ্রন্থসমালোচনা

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
সে দিন আমরা একখানি বাংলা কবিতা গ্রন্থে দেখিতেছিলাম সীতা দেবীকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ যখন চলিয়া আসিতেছেন, তখন সীতা দেবী সকাতরে তাঁহাকে একটু দাঁড়াইবার জন্য এই বলিয়া মিনতি করিতেছেন—

"লক্ষ্মণ দেবর কেন ধাওয়া-ধাওয়ি যাও রে।
তোমার দাদার কিরে বারেক দাঁড়াও রে।"

এমন-কি, মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দেবকে কী বেরঙে আঁকিয়াছেন।— ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম— যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র মূর্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপূর্ণ—"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কী আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? কল্পনার আদর্শভূত একটি পশুপক্ষীরও একগাছি লোমের হানি করিলেও আমাদের সহ্য হয় না। সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যু-বধ, আর কি তাঁহার রাবণ-বধ— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক তো প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু এক খণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্য গুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক-খণ্ড— এবং তাঁহার অভিমন্যু-বধ ও রাবণ-বধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ। অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয় অভিমন্যু-বধ কাব্য পড়িয়া সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠে। যে অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জুন ও বীরাঙ্গনা সুভদ্রার সন্তান, তাহার তেজস্বিতা তো থাকিবেই, অথচ অভিমন্যুর কথা মনে আসিলেই সূর্যের কথা মনে আসে না, কারণ সূর্য বলিতেই কেবল প্রখর তীব্র তেজোরাশির সমষ্টি বুঝায়— কিন্তু অভিমন্যুর সঙ্গে কেমন একটি সুকুমার সুন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত আছে যে, তাহার জন্য অভিমন্যুকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজস্বিতা তো কিছুই নাই। সেইজন্য অভিমন্যুকে আমরা চন্দ্র-সূর্য-মিশ্রিত একটি অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। অভিমন্যু-বধের অভিমন্যু, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু সেই আমাদের অভিমন্যু— সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি— কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ-বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীরকার্য সাধনে— সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে। বলিতে কি, মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংসে সাধন করিয়াছেন গিরিশবাবু অভিমন্যুকে কি অর্জুনকে কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই— ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব। তাঁহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকি আছে। তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি।

স্বপ্নদেবীর সঙ্গে রজনীর যে আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও আমাদের প্রিয় সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকদের কর্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল যে নাটকের রাক্ষস-রাক্ষসীদের কথাগুলিতে বেণীসংহারের কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমরা এ কথা বলিতে সংকুচিত হইব না যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি— একজন প্রকৃত ভাবুক। তাঁহার রাবণ-বধে যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই রাবণ-বধ নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুট রূপে রাবণ-বধ নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপরে আমাদের একটি কথা কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষত দেবী আরাধনা ও দেবী স্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটি ও সেই স্থানের বর্ণনাটি আমাদের বড়ো মনঃপূত হয় নাই। আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।

অভিমন্যু সম্ভব কাব্য। শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ইডেন্ প্রেস, মূল্য ছয় আনা মাত্র।
এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যখানি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের কল্পনা সুকুমার কিশোর কল্পনা। স্থলে স্থলে তাহার পদস্খলন হয়। সর্বত্রই সমভাবে তাঁহার বলিষ্ঠ স্ফূর্তি দেখা যায় না। ভাষাও সকল স্থানে সহজ স্রোতোবাহী হয় নাই। তথাপি আমরা কাব্যখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

The Indian Homoeopathic Review. Edited by B. L. Bhaduri.
এখানি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাসিক পত্র। কবিরাজী বা হাকিমী, অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি, কোন্ প্রথাটা যে আমাদের উপকারী— সে বিষয় লইয়া তর্ক করিতে আমরা এখন চাহি না— চাহিলেও সিদ্ধান্তে আসিতে আমরা পারগ কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে এরূপ সাময়িক পত্রে আমাদের উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই— এই পত্র আংশিক ভাবে বাংলা ভাষায় না হইয়া সমস্তটাই বাংলা ভাষায় প্রচারিত হইল না কেন?— কাহাদের জন্য এ পত্র প্রকাশিত হইতেছে?— যদি বাঙালিদের জন্য হয় তবে তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রচারিত হওয়া উচিত। আর যদি ইংরাজদের জন্য হয়, তবে ইহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। তবে এই আধা-ইংরাজি আধা-বাঙালি পত্র— এই "ইঙ্গ-বঙ্গ" মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য কী?

এই-সকল কথা মহোদয় সম্পাদকের ভাবা উচিত ছিল। আমরা স্বীকার করি যে সম্পাদকীয় কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের সরল ও সহজ বাংলাতে যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার আমরা সুখ্যাতি করি, কিন্তু এই পত্রিকাতে আরও বিস্তর লোকের লেখা আছে। M. M. Bose. M. D. L. R. C. P. একজন উক্ত পত্রিকার লেখক। তিনি ইংলন্ড ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়াও লিখিতেছেন যে "May we hope that our educated countrymen of the locality will come forward to help the commission with informations as respects to drinking water &c." তিনি আরও লিখিতেছেন "We would like to call the attention of manager &c to the teaching of elimentary

knowledge of Animal Physiology &c." যদিও আমরা স্বীকার করি, বাঙালির ইংরাজিতে ভুল থাকাই সম্ভব, তথাপি যেমন করিয়া হউক ইংরাজি যে লিখিতেই হইবে তাহার আমরা কোনো আবশ্যক দেখি না। তবুও যাহা হউক লেখকের উন্নত উদ্দেশ্য দেখিয়া তাঁহার ইংরাজি লেখা মার্জনা করা যায়। আমরা এই অত্যাবশ্যক পত্রটির উন্নতি কামনা করি।

ভারতী
মাঘ ১২৮৮

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা। এমনতর মাথা-মুণ্ড-বিরহিত নাটক আমরা কখনো দেখি নাই। ইহার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে অর্থ, না আছে ভাব, না আছে একটা পরিষ্কার উপন্যাস। লেখকের কল্পনা, লাগাম খুলিয়া লইয়া, এই ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর ঘোড়দৌড় করাইয়াছেন। গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।

সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
লক্ষ্মণ-বর্জন। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্য কাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সীতার বনবাসে লক্ষ্মণের বীরত্বই যথার্থ বীরত্ব। রাম যে কর্তব্যজ্ঞানের গুরুভারে অভিভূত হইয়া সীতাকে বনবাসে দিতে পারিয়াছেন, লক্ষ্মণের নিকট সে কর্তব্যজ্ঞান নিতান্ত লঘু। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যে, নির্দোষী সীতাকেও বনবাস দিতে হইবে, ইহার কর্তব্যতা লক্ষ্মণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তবুও সেই সীতাকে বনবাসে দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। রাম তো আজ্ঞামাত্র দিয়া গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ স্বহস্তে সেই সীতাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে রামকে নায়ক না করিয়া লক্ষ্মণকে নায়ক করিলে একটি অতি মহান চিত্র অঙ্কিত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সীতার বিসর্জন আমাদের সমালোচ্য দৃশ্যকাব্যের এক অংশ মাত্র, উহাই সমস্ত নহে; সুতরাং সীতা বর্জনের মধ্যে যতটা কবিত্ব আছে, তাহা ইহাতে স্ফূর্তি পায় নাই। সীতা বর্জন ব্যাপারে রামের বাহ্য ঘটনার সহিত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, কর্তব্যজ্ঞানের সহিত অনুরাগের সংগ্রাম; লক্ষ্মণের কর্তব্যের সহিত কর্তব্যজ্ঞানের অনৈক্য, করুণার সহিত নিষ্ঠুরতার অনিচ্ছা সহবাস; সীতার জীবনের সহিত মরণের তর্কবিতর্ক, অর্থাৎ মরণের প্রতি অনুরাগের ও জীবনের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের সম্বন্ধ, এই যে-সকল দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব ও কর্তব্যের সহিত হৃদয়ের সংগ্রাম আছে, তাহা এই দৃশ্যকাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটি ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইতে পারে না। ইহাতে সমস্তটার একটি ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীতা-বর্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোনো বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান বাৎসল্য ভিক্ষা করা,

"জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম।
ছিন্ন অন্য ডুরি,

প্রেমে বাঁধা রেখো মা সংসারে;
ওরে, কে অভাগা এসেছে জঠরে?"

অতি সুন্দর হইয়াছে।

"যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে।
শিশুদুটি ঘুমায় কুটিরে,
চাঁদ পানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।"

এই সরল কথায় সীতার বেশ একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিক উদ্‌ধৃত করিবার স্থান নাই, উদ্‌ধৃত করিলাম না।

লক্ষ্মণ-বর্জন বিষয়টি অতি মহান, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কি না সন্দেহ। লেখক রাম-চরিত্রের অর্থ, রামচরিত্রের মর্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামের সমস্ত কার্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটি অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটি অক্ষর— প্রেম। এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানিতে লেখক একটি মহান কাব্যের রেখাপাত মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই, যে, বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইখানে দেখিতে হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কী লইয়া। কে কত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহা লইয়া বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ বা আত্মরক্ষার জন্য বীর, কেহ বা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তান-স্নেহের জন্য বীর, দেশ-হিতৈষী স্বদেশ-প্রেমে বীর। তেমনি লক্ষ্মণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে তাঁহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর। যখন সত্যের অনুরোধে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,

"সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জনে পূজা করি সম্পূরণ!
ত্যাগ-শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপনা বর্জন,
রঘুমণি,
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু!
সেই প্রেম বলে
না টলিনু শক্তি-শেল হেরি,
উচ্চ-হৃদে পেতে নিনু শেল
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ!"

রাম ও লক্ষ্মণ, হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চ-শ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।

মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল প্রণীত। পুস্তকখানির জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ

অনুসন্ধান, বিস্তৃত সংগ্রহ ও সরল অনুবাদের ভাষায় আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। বাংলায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমরা যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট।

কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত।
এই গ্রন্থখানিতে দুটি-একটি মিষ্ট কবিতা আছে।

সরলা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
এই দুইখানি গ্রন্থ ক্ষুদ্রায়তন সরল সামাজিক উপন্যাস। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই।

আদর। (প্রিয়তমার প্রতি)। শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ প্রণীত।
ইহা পড়িয়া প্রিয়তমা সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু পাঠকেরা সন্তুষ্ট হইবেন না।

উর্মিলা-কাব্য। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
এই কাব্যখানির বিষয় নূতন ও কবিতাপূর্ণ। ইহাতে উর্মিলার দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। উর্মিলা বনবাসিনী সীতাকে পত্র লিখিতেছেন। এই ক্ষুদ্র পত্রখানিতে উর্মিলার চরিত্র ও উর্মিলার মনোভাব সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। বিরহিণী উর্মিলা প্রাসাদের উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে কল্পনা-কুহকে নিজের চারি দিকে নানাবিধ মায়াজাল রচনা করিতেছেন ও ভাঙিতেছেন, এ ভাবটি সুন্দর হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহাতে সুন্দর কবিতা আছে।

সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবী, হায় সে চুম্বন—
নিচল যমুনাজলে চন্দ্র-কর-লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট শোভা কুসুমের শিরে
নিশির শিশির পাত; নীরব, মৃদুল!

পত্র শেষ করিয়া পত্র সম্বন্ধে উর্মিলা কহিতেছেন—

পাঠ করি মনোসাধে, পরম কৌশলে
নিদ্রিত নাথের বক্ষে নিঃশব্দ চরণে—
রাখিয়া আসিয়ো দিদি করি গো বিনতি।

...

নিদ্রান্তে চকিতে যবে হেরিয়া এ লেখা,
শুধাবেন "কে আনিল!" কহিয়ো তাঁহারে,
"স্বর্গ হতে ফেলেছেন বুঝি রতিদেবী
চেতাইতে সুকঠিন অপ্রেমিক জনে,
নহে মানবের কাজ, দেবের এ লীলা।"
দাও গো বিদায় তবে আসিছে মন্থরা।
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানায়ো শ্রীরামে,
কহিয়ো তাঁহারে দেবি, "দেব রঘুমণি
ফিরিয়া আসিলে ঘরে, ব্যাপিকা উর্মিলা,
পূর্বের কৌতুক আর করিতে নারিবে,
হাসিতেন রঘুবর সে ব্যঙ্গ কৌতুকে।
সে আমোদ হাসিমুখ ভুলিয়া গিয়াছে।"

...

আর জানাইয়ো দিদি তোমার দেবরে—
কী জানাবে? জানাবার কি গো আর আছে?
জানাইয়ো উর্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইয়ো উর্মিলার নয়নের বারি,
জানাইয়ো, প্রিয় দিদি, জানাইয়ো তারে,
অযোধ্যার রাজপুরে কি নিশি দিবসে,
উর্দ্ধমুখে, কখনো বা অবনত মুখে,
বিগলিত কেশপাশ পাণ্ডুর অধরা,
একটি রমণী মূর্তি ঘোরে অবিরত!

নির্ঝরিণী। (গীতি কাব্য) প্রথম খণ্ড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা।
এই কাব্যগ্রন্থখানিতে "আঁখির মিলন" প্রভৃতি দুই-একটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণত সমস্ত কবিতাগুলি তেমন ভালো নহে।

রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক। শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।
এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির স্থানে স্থানে বর্ণনা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তদুপযুক্ত রচনা হয় নাই। বুদ্ধদেব বা রামমোহন রায়ের স্বগত-উক্তি ও কথোপকথনগুলি উপদেশ-প্রবাহের ন্যায় শুনায়, তাহার সহিত কল্পনা-মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কবিতা করিয়া তোলা হয় নাই। কাব্যখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখক তাঁহার বিষয়ের মহান ভাব যতটা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, ততটা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ভারতী
ফাল্গুন, ১২৮৮

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
এই গ্রন্থ দুইখানি বহুকাল হইল, প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সম্প্রতি সমালোচনার্থে পাইয়াছি। যদি কোনো পাঠক আজিও এ গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অনুরোধ করি, এ দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। ইহার পূর্বে ভালো জীবনবৃত্ত বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত উৎকৃষ্টতর। তাহার দুই কারণ আছে— প্রথম, ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তে গ্রন্থের নায়কের সহিত লেখকের জ্বলন্ত সমবেদনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে; লেখক হৃদয়-লেখনী দিয়া সমস্ত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এই নিমিত্ত পাঠকদের হৃদয়ের পত্রে তাহার মুদ্রাঙ্কন পড়িয়াছে। দ্বিতীয়, প্রথম পুস্তকখানি মস্তিষ্ক ও জ্ঞান চর্চার বিবরণ, দ্বিতীয় পুস্তকখানি হৃদয় ও কার্যের কাহিনী, সুতরাং বিষয়ের গুণে শেষ গ্রন্থটি অধিকতর মনোরম হইয়াছে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
আজকাল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। এই নিমিত্ত বঙ্গদেশে লেখকের সংখ্যা অল্প হইলেও লেখার আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যসমাজে অত্যন্ত

চুরির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, যোগেন্দ্রবাবুর আর্যদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ এইরূপ চুরি যায়; চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্যদর্শন-সম্পাদক তাঁহার ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রাচীন ভারতের উন্নতি লইয়া গর্ব, আধুনিক ভারতের অবনতি লইয়া দুঃখ, ঐক্যের অভাব লইয়া বিলাপ, বদ্ধপরিকর হইবার জন্য উত্তেজনা এত শুনা গিয়াছে যে, ও বিষয়ে শুনিবার আর বাসনা নাই। শুনিয়া যত দূর হইতে পারে তাহা এত দিনে হইয়াছে বোধ করি, বরঞ্চ ভাবগতিকে বোধ হয় মাত্রা অধিক হইয়া গিয়াছে। না যদি হইয়া থাকে তো আশ্চর্য বলিতে হইবে। ভারতের বিষয়ে কতকগুলা বিলাপ ও উদ্দীপন বাক্য উচ্চারণ করিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। যখন দেশানুরাগের ভাব মাত্র লোকে জানিত না, তখন তাহা উপযোগী ছিল। ভারতের যে পূর্বে উন্নতি ছিল ও এখন যে অবনতি হইয়াছে, ভারতের উন্নতি সাধন করিতে সকলের যে সম্মিলিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই এতবার শুনিয়াছেন, যে, এ বিষয় বোধ করি কাহারো জ্ঞানের অগোচর নাই। অতএব আর অধিক নহে। এখন "ঐক্য" "উন্নতি" "বন্ধন" প্রভৃতি কতকগুলা সাধারণ কথা পরিত্যাগ করিয়া, ঐক্য ও উন্নতি সাধনের যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে সেই-সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বড়ো বড়ো কথা শুনিয়া আমাদের যুবকদিগের একটা বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দুই দুর্বল হস্তে দুই গুরুভার তরবারি লইয়া অধীনতা ছেদন করিবার জন্য দিগ্‌বিদিক্‌ হাতড়াইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের যদি বলা যায়, অত হাঙ্গাম করিবার আবশ্যক কী? অধীনতার অন্বেষণে ছুঁচাবাজির মতো চারি দিকে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বেড়াইতেছে কেন? অধীনতা যে তোমাদের দুয়ারের কাছে। এমন-কি, তোমাদের গৃহের কোণ হইতে শত শত অধীনতার পাশ অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো তোমাদের হাত-পা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তলোয়ার দুটা রাখো। একে একে ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলা মোচন করো। এ কথা শুনিলে তাঁহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাহাজের কাছি, লোহার শিকল ছিঁড়িবার জন্য তলোয়ার ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের ওই সরু সুতাগুলি দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। কেবল বড়ো বড়ো ভারী ভারী কথা শুনিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে। এখন ছোটো ছোটো ঘরের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। এখন এই মহাবীরবৃন্দকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁহাদের মুখের কথাগুলাকে ছাঁটিয়া, তাঁহাদের হাতের তলোয়ার দুটাকে নামাইয়া ছোটোখাটো ঘরের কাজে নিযুক্ত করানো আবশ্যক হইয়াছে। বনে মহিষ তাড়াইতে যাইবার পূর্বে ঘরে ইন্দুরের উৎপাত দূর করা হউক। তাই বলিতেছি হৃদয়োচ্ছ্বাসের অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের দেশানুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান পাঠকদের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা অল্প। তাই বলিয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসের সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে যাহা সময়োপযোগী, বিশেষ-বিষয়গত ও সমাজের হিতসাধক।

স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ছয় আনা।

যোগেন্দ্রবাবুর অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যেই আর-এক জন লেখক বঙ্গভাষায় আর-এক মহাত্মার জীবনবৃত্ত, রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; লেখক অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণ করিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসাযোগ্য। গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ, পরিষ্কার সরস হয় নাই। অনর্থক কতকগুলা কঠোর সংস্কৃত কথা ও ঘোরালো পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, এইজন্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য হয় নাই। গ্রন্থকার হানিমানের জীবনী হইতে পদে পদে রাশি রাশি নীতি কথা বাহির করিয়াছেন,

সেগুলি বিশেষ করিয়া লিখিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের প্রধান দোষ এই যে, হানিমানের প্রতি পাঠকদের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। একটা শ্রমসাধ্য চেষ্টার ভাব গ্রন্থের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। দুটা-তিনটা করিয়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া, "আহা" "আশ্চর্য" "ধন্য" "ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে" "অদ্ভুত হানিমানের সকলি অদ্ভুত" ইত্যাদি বিস্ময়াত্মক কথা পদে পদে ব্যবহার করা হইয়াছে; যেন, পাঠকদিগকে ঠেলিয়া, ধাক্কা মারিয়া, চোখে আঙুল দিয়া কোনো প্রকারে আশ্চর্যান্বিত করিতেই হইবে, ইহাই লেখকের ব্রত হইয়াছে। এরূপ করিলে অনেক সময়ে পাঠকদের বিরক্তি বোধ হয়। নিজের ভাব পদে পদে প্রকাশ না করিয়া বর্ণনার গুণে স্বভাবতই পাঠকদের ভাব উদ্রেক করা সুলেখকের কাজ। অধিক করিয়া বলিয়া শ্রোতাদিগকে অভিভূত করিয়া দিবার বাসনা মহেন্দ্রবাবুর লেখার প্রধান দোষ দেখিতেছি। যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্‌ধৃত করি।

"ফ্রেঞ্চ জর্মান, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষায় মিলানীর, 'অসাধারণ' অধিকার।... সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি 'অলৌকিক ব্যুৎপত্তি-শালিনী'। তিনি স্বীয় 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' রচনা বিষয়ে এক 'অলোকসামান্য' কবি। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে 'প্রাণ মন বিগলিত' হইয়া যায়— 'শরীর শিথিলিত' হইয়া পড়ে। 'আহা কি সুন্দর মধুর কবিতা'! 'অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে' উঠিতে থাকে এবং ভাবগ্রহ সমাপ্ত হইলে, 'উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়'। ইচ্ছা করে অনবরত তাহা আবৃত্তি করি। এই তো গেল কাব্যের কথা। চিত্র অঙ্কনেও 'অনির্বচনীয় যোগ্যতা— অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা'।"

বিশেষণগুলা দেখিলে ভীত হইয়া পড়িতে হয়। হানিমানের স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীতে এত বড়ো আর-একটি লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। এমন কাহারো নাম শুনি নাই, একাধারে কবিতা ও চিত্রবিদ্যায় যাঁহার "অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা!" জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে ভাষাকে ইহা অপেক্ষা আরও অনেকটা সংযত করা আবশ্যক। বিষয়টিও ভালো, উপস্থিত গ্রন্থখানিও অনেক বিষয়ে ভালো, এই নিমিত্তই এত কথা বলিলাম।

যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
এ প্রহসনখানি মলিয়েরের-রচিত "Le medecin malgre lui" নামক ফরাসী প্রহসনের স্বাধীন অনুবাদ। লেখক কেন যে তাহা স্বীকার করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করাতে দোষের কিছুই নাই। বিদেশীয় ভাষার ভালো ভালো কাব্য নাটক বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইবার কথা। গ্রন্থখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত। মূল্য ১।০।
এই গ্রন্থের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী দোষ গুণ বলিতে আমরা ভরসা করি না। তবে ইহার একটি প্রধান গুণ এই দেখিলাম, ইহাতে আমাদের দেশী ও ইংরাজি উভয়বিধ ঔষধের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইহা কোনো পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় সকল বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ...এদেশে সচরাচর যে-সকল পীড়া জন্মে তাহাদের ডাক্তারী ও দেশীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত দেশীয় ঔষধ সকল প্রায় পল্লীগ্রামের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সহজ সহজ পীড়ায় ও যে-সকল স্থানে চিকিৎসক পাওয়া না যায় তথায় এই পুস্তকের সাহায্যে গৃহস্থগণ অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।" আমরাও তাহাই আশা করি।

শার্ঙ্গধর। মহর্ষি শার্ঙ্গধর কৃত স্বনামখ্যাত আয়ুর্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য দুই টাকা দুই আনা।
আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের এইরূপ সহজ অনুবাদ নানা কারণে হিতসাধক। এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া

গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যাবনিক পরাক্রম। (উপন্যাস।) শ্রীনীলরত্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য বারো আনা।
এই গ্রন্থখানির কিছুই প্রশংসা করিবার নাই।

স্বপন-সঙ্গীত। (গীতিকাব্য।) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
এখানি একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখকের এখনো হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য দশ পয়সা মাত্র।
মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০ মাত্র।
উক্ত গ্রন্থকার-রচিত দুই-চারিখানি গীতিনাট্য আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গীতগুলি রাগ-রাগিণী সংযোগে গাহিলে কিরূপ শুনায় বলিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে ভালো লাগিল না।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৯

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য বারো আনা।
এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না আছে ইতিহাস, না আছে উপন্যাস। নভেলের সমস্ত কাঠ-খড় আনা হইয়াছে, কেবল মূর্তি গড়া হয় নাই।

হরবিলাপ। শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানিতে কতকগুলি সুন্দর গান আছে। পড়িতেই যখন ভালো লাগিতেছে, তখন সুর-সংযোগে শুনিলে আরও ভালো লাগিবার কথা। এই গ্রন্থখানি অভিনয়ের যোগ্য কি না বলিতে পারি না, কারণ ইহাতে উপাখ্যান ভাগ কিছুই নাই বলিলেও হয়, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠের যোগ্য ও গানগুলি গাহিবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

কমলে কামিনী বা কুলেশ্বরী। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানি পড়িতে তেমন ভালো লাগিল না। কমলে-কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্ত যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে, সেই গানটিই পুস্তকের মধ্যে ভালো লাগিল।

কল্পনা-কুসুম। শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী-কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ।।০ আনা।
এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্পষ্টই মনে হয়, লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে। "অভাগিনীর বিলাপ" "নারদ" প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি প্রণীত। মূল্য দশ আনা।
কবিতাবলীর এই প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আর বাসনা রহিল না। যে বন্ধু গ্রন্থকারকে এই কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিকই বন্ধুর মতো কাজ করেন নাই।

কুসুমারিন্দম। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহার আদ্যোপান্ত একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খল গোলমাল। ইহার অনেক জায়গায় বাস্তবিকই লেখকের ছেলেমানুষী প্রকাশ পাইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে লেখকের ক্ষমতা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য। মূল্য এক আনা।
সমালোচনা স্থলে ভারতী বর্তমান গ্রন্থকারের কোনো একটি কাব্যকে ভালো বলেন নাই, এই অপরাধে ভারতীকে আক্রমণ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যখানি পড়িয়া তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মতের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। এই লেখার দরুন পাঠকদিগের নিকটেও যে তাঁহার পূর্বগ্রন্থের বিশেষ আদর বাড়িবে, তাহাও নহে। তবে লিখিয়া ফল কী হইল? লেখক কি মনে মনে বড়ো আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? তবে তাহাই করুন, তাহাতে আমরা ব্যাঘাত দিব না।

কথাটা এই যে, নিজের লেখা ভালো বলিয়া লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না, কিন্তু সমালোচকেরও যে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া যাইবে এরূপ আশা করাটা কিছু অতিরিক্ত হয়। আমাদের মতে অনর্থক গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্তব্য কাজ নহে। কিন্তু যে সমালোচক কোনো প্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধ মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভালো দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ানো, মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।

তৃণপুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। মূল্য আট আনা।
ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। মনে হয় যেন, ইহার অনেকগুলি কবিতাতে লেখকের যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন; তাহার একটা বিশেষ ভাব নাই, একটা দাঁড়াইবার স্থান নাই, একটা উদ্দেশ্য নাই— অথচ তাহার একটা নাম আছে ও তাহার সহিত মিল বা অমিল বিশিষ্ট, বাংলায় বা বিকৃত বাংলায় লিখিত কয়েকটি ছত্র সংলগ্ন আছে। তবে, স্থানে স্থানে কবিত্বের রেখা পড়ে, কিন্তু আবার তখনি মুছিয়া যায়— কবিত্বে সমস্ত ছত্রগুলি ভরিয়া উঠে না, কঠিন ও বিকৃত ভাষার উৎপীড়নে ও ভাবের অভাবে কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লেখক অনেক স্থলে ইংরাজি ভাব বাংলায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দোষের কথা নহে, কিন্তু তিনি ইংরাজিকে বাংলা করিতে পারেন নাই, মাঝের হইতে বাংলাকে কেমন ইংরাজি করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, লেখক বাংলায় কবিতা লিখিতে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত এখনো তাঁহার ভাবের প্রবাহ উন্মুক্ত হয় নাই, এখনো তিনি প্রতিকূল ভাষাকে আপনার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন নাই, ভাষা তাঁহাকে অপরিচিত দেখিয়া তাঁহার ভাবগুলির প্রতি ভালোরূপ আতিথ্য-সংকার করিতেছে না। দেখা যাউক ভবিষ্যতে কী হয়।

শান্তি-কুসুম। শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
বিষয়টা কিছুই নহে, লিখিবার যোগ্যই নয়। বোধ করি গ্রন্থখানি ব্যক্তিবিশেষের জন্য লিখিত, সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। সুতরাং এ গ্রন্থ সমালোচনা করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, লেখাটি বড়ো ভালো হইয়াছে। বাংলা ভাবটি অবিকল বজায় আছে। আধুনিক গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে এ গ্রন্থখানি সহসা পড়িলে ইহার ভাষা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ইহার আর কোনো গুণ নাই।

সুরসভা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য দুই আনা।
কৈলাস-কুসুম। ...

মণি মন্দির।... মূল্য তিন আনা।
পার্থ প্রসাদন।...

প্রমীলার পুরী। ... মূল্য এক আনা।
এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি ব্যতীত আর সকলগুলিই গীতিনাট্য। গীতিনাট্যের যথার্থ সমালোচনা সম্ভবে না, কারণ গীতগুলি কেবলমাত্র পড়িয়া সমালোচনা করা যায় না। গান

লিখিবার সময় কবিত্ব কিছু-না-কিছু হাতে রাখিয়া চলিতে হয়, সমস্তটা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তাহা হইলে সুরের জন্য আর কিছুই স্থান থাকে না। গানের লেখাতে কবিত্বের যে কোরকটুকুমাত্র দেখা যায় সুরেতে তাহাকেই বিকশিত করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত সকল সময় গান পাঠ করা বিড়ম্বনা, তথাপি বলিতে পারি, এই গীতিনাট্যগুলির স্থানে স্থানে ভালো ভালো গান আছে। মণি-মন্দিরের গানগুলিই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে।

ষড়ঋতুবর্ণন কাব্য। শ্রীআশুতোষ ঘোষ প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা।
গ্রন্থকার লিখিতেছেন "বহু দিবস হইতে আমার ইচ্ছা ছিল যে, পদ্যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিব; অধুনা অনেক কষ্টে দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অমিত্রাক্ষর চতুর্দশপদী ষড়ঋতুবর্ণন নামক কাব্যখানি রচনা করিয়া মহানুভাব পাঠক মহাশয়গণের করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।" গ্রন্থকর্তার এতদিনকার এত আশার গ্রন্থখানিকে ভালো না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুরোধ পালন করিতে হইলে এ গ্রন্থখানিকে কোনো মতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত। শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।
প্রকাশক সিন্ধুদূতের ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃ-সকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্ব হেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।... বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী, ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে, এবং কী প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য কিন্তু ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্র বিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি।

"একি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে র'য়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব ত্যেজেছে আমারে।"

রীতিমতো ছত্র বিভাগ করিলে উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

"একিএ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে
সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব
ত্যেজেছে আমারে।"

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

"আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে,
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁফ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেল তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়।

রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো—

মন্ বেচারীর কি দোষ আছে,
তারে, যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের "তারে" নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়—

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ, শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই—

মন্বেচারী কি দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে "নাচাও" শব্দের "ও" অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ, এই "ও"টি হসন্ত ও, পরবর্তী "তে"-র সহিত ইহা যুক্ত।

উপরে দেখাইলাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী। আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

আমাদের সমালোচ্য কবিতার বিষয়টি—"জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জনৈক নির্বাসিত ফরাসীস্ সাধারণতান্ত্রিক বীরবর কর্তৃক স্বদেশ সমীপে সাগরদূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ।" এই গ্রন্থ সচরাচর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভালো। তবে সত্য কথা বলিতে কী ইহাতে ভাষার অবিরাম প্রবাহ যেমন দেখিলাম কবিতার উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না।

রামধনু। — শিল্প বিজ্ঞান স্বাস্থ্য গৃহস্থালী বিষয়ক সরল বিজ্ঞান। ঢাকা কলেজের লেবরেটরি অ্যাসিস্‌টাণ্ট ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকেল অ্যাসিস্টেণ্ট শ্রীসূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই বৃহদায়তন ১৯৩ পৃষ্ঠার অতি সুলভমূল্য গ্রন্থখানি পাঠকদিগের বিস্তর উপকারে লাগিবে সন্দেহ নাই। ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিতান্ত সরল। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহাতে যে-সকল গার্হস্থ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার বিস্তর কাজে

লাগিবে। দোষের মধ্যে, ইহাতে বিষয়গুলি ভালো সাজানো নাই, কেমন হিজিবিজি আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার চিত্রগুলিও অতি কদর্য, কতকগুলা অনাবশ্যক চিত্র দিয়া ব্যয়বাহুল্য ও স্থানসংক্ষেপ করিবার আবশ্যক ছিল না, যেগুলি না দিলে নয় সেইগুলি মাত্র থাকিলেই ভালো ছিল। যাহা হউক, পাঠকেরা, বিশেষত গৃহিণীরা, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

ঝংকার। গীতিকাব্য। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।।০ আনা।
এরূপ বিশৃঙ্খল কল্পনার কাব্যগ্রন্থ সচরাচর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে এক-একটি ছত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে, কিন্তু কাহার সহিত কাহার যোগ, কোথায় আগা কোথায় গোড়া কিছুই ঠিকানা পাওয়া যায় না। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে কেবল বরষণ নামক কবিতাটিতে উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় না।

উচ্ছ্বাস। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র।
লেখক কবিতা লিখিতে নূতন আরম্ভ করিয়াছেন বোধ হয়, কারণ তাঁহার ভাষা পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই। বিশেষত গ্রন্থের আরম্ভ ভাগের ভাষা ও ভাববিন্যাস পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থের শেষ ভাগে উল্লাস শীর্ষক কবিতায় কবিত্বের আভাস দেখা যায়। ইহাতে প্রাণের উদারতা, কল্পনার উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ইহাতে ভাষার জড়তাও দূর হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

সংগীত সংগ্রহ। (বাউলের গাথা)। দ্বিতীয় খণ্ড।
এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতেছেন, "যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউলের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব— কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ করিবার বড়ো কোনো উপায় নাই— তখন সুশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর স্বভাবপূর্ণ সংগীত কেন সংগ্রহ করিব না আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি।" এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথমত গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে হয়, বাউল সম্প্রদায় -রচিত গান অথবা বাউলদিগের অনুকরণে রচিত গান-সংগ্রহই ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য-রচিত "মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং" ইত্যাদি সংস্কৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুন্সী জালালউদ্দিন-রচিত "আহে বন্দে খোদা, যুরা ছুচ্চা কারো" ইত্যাদি দুর্বোধ উর্দুগান ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই গ্রন্থে দেখা যায়। একটা তো নিয়ম রক্ষা, একটা তো গণ্ডি থাকা আবশ্যক। নহিলে, বিশ্বে যত গান আছে সকলেই তো এই গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা— আমরা কেন যে প্রাচীন ও অশিক্ষিত লোকের রচিত সংগীত বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কী বিস্ময়, কী আনন্দ। আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই, মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক খরস্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া

বেড়াইতেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, সুতরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়, এ কি আমার নিজের হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখরনিঃসৃত সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোনো সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কী প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে! অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ওরে বংশীবট, অক্ষয় বট, কোথা রে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধা কুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্ধন!

গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্‌ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দে রে নিতাই ধন।।
ওরে বৃন্দাবনের পশুপাখীর রব শুনি না কি কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা যদি না হইত, আজ যদি সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাইতাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন।—
কালীকচ্ছের কোনো পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী— সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।
পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিম্নে সমস্তগুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কী? শিখিলে উপকার কী?
২। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়।
৩। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।
৪। স্ত্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।
৫। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্যা হয়।
৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরি করিবে না জমিদারি মহাজনী করিবে?
৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কী ক্ষতি আছে।
৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না— পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা—
গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকর্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তকখানি ইংরাজি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজকাল "A Higher English Grammar, by Bain."

"Studies in English" by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Banerjee, প্রভৃতি যে-সকল পুস্তক এন্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার সহিত আমাদের অনেকগুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সুরুচিসংগত জ্ঞান করি। আমাদিগের বিশ্বাস যে পুস্তকখানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

ভারতী

ভাদ্র, আশ্বিন ১২৯১

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

নাটকটি অসম্ভব আতিশয্যে পরিপূর্ণ। সমস্তটা একটা সামাজিক ভেলকির মতো। কতকগুলি অদ্ভুত ভালো লোক এবং অদ্ভুত মন্দ লোক একটা অদ্ভুত সমাজে যথেচ্ছা অদ্ভুত কাজ করিয়া যাইতেছে, মাথার উপরে একটা বুদ্ধিমান অভিভাবক কেহ নাই। স্থানে স্থানে লেখকের পারিবারিক চিত্ররচনায় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তীর্থযাত্রাকালে বৃদ্ধ কর্তা-গিন্নির গৃহত্যাগের দৃশ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ।

দেহাত্মিক-তত্ত্ব। ডাক্তার সাহা প্রণীত।

এই গ্রন্থে শ্রীদর্শন রাজচক্রবর্তী নামক একব্যক্তি গুরুর আসনে উপবিষ্ট। ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। গুরুজি রূপকচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছেন— শিষ্য সেই উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। দেহ-মন ও জগতের শক্তি সকলকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করিয়া জগৎ-ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "যোগাকর্ষণ-দেব" "মাধ্যাকর্ষণ-দেব" "রসায়ন-দেব" "মস্তিষ্কাদেবী"প্রভৃতি দেব-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সার মর্ম এই যে, ব্রহ্ম কতকটা দৈহিকভাবে ও কতকটা আত্মিকভাবে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সকল ধর্মের মধ্যেই কতকটা দৈহিক ও কতকটা আত্মিক ভাব বিদ্যমান। উপদেশের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"বলি, মস্তিষ্কা দেবি! আপনার কয়টি পুত্র ও কয়টি কন্যা আমায় বলিবেন কি?"

"ভোলানাথ! তুমি কী নিমিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার সাধ্য নয় যে, তুমি এ সকল বুঝিতে পার। এই দেখো, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার নাম স্পর্শ সত্তা বা ত্বক্‌, এই আমার দ্বিতীয় কন্যা, রসনা। এই আমার প্রথম পুত্র নয়ন, দ্বিতীয় পুত্র শ্রবণ, এই আমার তৃতীয় কন্যা নাসিকা" ইত্যাদি। গ্রন্থের "দৈহিক ভাবটি" অতি পরিপাটি। গ্রন্থের আত্মিক ভাব বুঝিবার জন্য ভোলানাথের ন্যায় সমজদার ব্যক্তির আবশ্যক। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিতে পারি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে "মস্তিষ্কা দেবী"কে বিবিধ শৈত্য-উপচারে ঠাণ্ডা রাখা কর্তব্য।

সাধনা

ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গ্রন্থখানি ছোটো ছোটো গল্পের সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ গল্পই সুপাঠ্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই লেখকের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় নহে। যিনি "শ্যামার কাহিনী" লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতূহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না। "শ্যামার কাহিনী" গল্পটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত এবং মূর্তিমান, ইহার কোথাও বিচ্ছেদ নাই। অন্য গল্পগুলিতে লেখকের নৈপুণ্য থাকিতে পারে কিন্তু এই গল্পেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লীলা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
লেখক এই গ্রন্থখানিকে "উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান বিরোধ। ইহাতে উপন্যাসের সুসংলগ্নতা নাই এবং গল্পের অংশ অতি যৎসামান্য ও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনেক অকারণ অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইয়াছে, এবং লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ এবং গায়েপড়া গোছের হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাংলার গার্হস্থ্য চিত্র ইহাতে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের নাম যদিও 'লীলা' কিন্তু কিরণ ও সুরেশচন্দ্রই ইহার প্রধান আলেখ্য। তাহাদের বাল্যদাম্পত্যের সুকুমার প্রেমাঙ্কুর-উদ্‌গম হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ মনোবিচ্ছেদের উপক্রম পর্যন্ত আমরা আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়াছি— অন্যান্য আর সমস্ত কথাই যেন ইহার মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। যাহা হউক, বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই-একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙালি পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব, কেবল সুরেশচন্দ্রকে স্থানে স্থানে ভালো বুঝিতে পারি নাই এবং লীলা ও আনন্দময়ী তেমন জীবন্তবৎ জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। মনোমোহিনী অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু কী আবশ্যক উপলক্ষে যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না; কেবল, পিতৃধন-গর্বিতা রমণীর চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক ইঁহার অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।— যদিও গল্পের প্রত্যাশা উদ্রেক করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন তথাপি বঙ্গগৃহের উজ্জ্বল চিত্রদর্শনসুখলাভ করিয়া তাঁহাকে আনন্দান্তঃকরণে মার্জনা করিলাম।

রায় মহাশয়। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
যখন এই গল্পটি খণ্ডশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা 'সাধনা'য় ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম। লেখকের ভাষা এবং রচনানৈপুণ্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার লেখার বেশ-একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই; লেখক যেন সমস্ত বিষয়টিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিয়াছেন; যে একটি নিষ্ঠুর কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিছুই যেন তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে। এরূপ বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।
প্রকাশক বলিতেছেন "সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীনবাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা। হয়তো রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন।'— এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অতিশয় কঠিন কার্য। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না, পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাই না। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ-সকল পত্র কবির জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোনো বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়সম্বন্ধীয় যে-সকল বিশ্রব্ধ কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভালো হইত। প্রথম পত্রেই উমেশবাবু ও মধুবাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সংকোচজনক বোধ হইয়াছে— এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি

দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে— প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গিটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করা যায়— কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই-সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীনবাবুও যে এই-সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র।
জগতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া জ-রি নামক প্রচ্ছন্ননামা কোনো ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। জগৎ ক্ষমা করিবে কি না জানি না কিন্তু আমরা এ ধৃষ্টতা মার্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং ঝুঁটা সেন্টিমেন্টালিটির চূড়ান্ত দেখানো হইয়াছে। এবং সর্বশেষে আড়ম্বরপূর্বক জগতের নিকট ক্ষমাভিক্ষার অভিনয়টি সর্বাপেক্ষা অসহ্য।

প্রকৃতির শিক্ষা।
গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড়ো অসংগত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক— নতুবা তাহার কোনো বন্ধন থাকে না, সমস্ত অশোভনভাবে আলুলায়িত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থের আরম্ভ দেখিয়াই ভয় হয়।

"আর পারি না! সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে শান্তির পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর ঘুরিতে পারি না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতার উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয়ের সদ্ভাব ফল শুকাইয়া যাইতেছে, চারি দিকে কঠোরতা, কেবল কঠোরতাই দেখিতেছি। কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। জীবনটা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছে। যেন কী হৃদয়হীন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, যেন ভালো করিয়া, বুক ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। কী যে ভার বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না।... আর ভালো লাগে না ছাই সংসার!"

যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায় তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোনো অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারও কোনো লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এইজন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সংগীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি বা কোনো চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা থাকে তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেনরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।
এ গ্রন্থখানি লিখিবার ভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। গ্রন্থকার যদি নিজের বক্তৃতা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত রাখিয়া কেবলমাত্র দ্বারকানাথের জীবনীর প্রতি মনোযোগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিব এই আশ্বাসে গ্রন্থখানি পড়িতে বসি, কিন্তু মাঝের হইতে সমাজ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত শুনিবার জন্য আমাদের কী এমন মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তিনি যেন পাঠকসাধারণের একটি জ্যেষ্ঠতাত অভিভাবক— একটি ভালো ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন "দেখ্ দেখি এ ছেলেটি কেমন! আর তোরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হলি কেন!" আমরা দ্বারকানাথ মিত্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি

এইজন্য কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত ও সুমহৎ উপদেশ বাক্যাবলি হইতে পৃথক করিয়া আমরা স্বরূপত তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বড়োলোকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত আপনাকে অন্তরালে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যত্র তাঁহাদের মতের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু যেখানে বড়োলোকের কথা হইতেছে সেখানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের কথার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরক্তিভাজন হইতে হয়।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৯

অশোকচরিত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।
এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোনো বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে-সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর-একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে, অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি 'ফাউ' স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। 'ফাউ'টিও ফেলার সামগ্রী নহে— উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

পঞ্চামৃত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।
এই গ্রন্থে আমাদের দেশের পূর্বতন ভগবদ্‌ভক্ত মহাত্মাদিগের যে-সকল কল্যাণপ্রদ বচন উদ্‌ধৃত হইয়াছে তাহা বাছা বাছা রত্ন। এই গ্রন্থখানি কবিরত্ন মহাশয় অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি তো সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেনই; কিন্তু জনসমাজে একজন যদি শারীরিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত। শেষোক্ত ব্যাধির ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শুভানুধ্যায়ী দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু ব্যক্তিদিগের অমৃতময় আশ্বাসবাণী এবং উপদেশ। বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেষোক্ত-রূপ মহৌষধ স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। এইজন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ জয়যুক্ত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাধনা
পৌষ ১২৯৯

কঙ্কাবতী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার

বিষয় বাহ্যত যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক-না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়ত, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর-একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমতো করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে 'অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়ান্ডারল্যান্ড' নামক একটি ইংরাজি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই-সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাংলায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, খেলারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। তাহাদের সমস্ত সাহিত্যেই এই তরুণতার আভাস পাওয়া যায়। চার্লস ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাংলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত— তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কী? ইহা হইতে কী পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কী, লক্ষ্য কী? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ,

সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কী রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙো মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো-চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটি সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা

ফাল্গুন ১২৯৯

ভক্তচরিতামৃত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

এই দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় নব্যভারতে রূপ ও সনাতনের অকৃত্রিম সাধুতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে রূপ সনাতনের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট নহে। এমন-কি, গৌড়েশ্বর হুসেন্ সাহা [শাহ্] রূপকে পরস্বলুণ্ঠনকারী পলাতক দস্যু জ্ঞান করিতেন ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে, এবং সনাতন রাজকার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন এ কথাও চরিতলেখক স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য ভক্ত সাধুচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে সংকোচ বোধ হয়। তাহার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত, মানুষের চরিত্র আদ্যোপান্ত সুসংগত নহে। অনেকগুলি ছিদ্র সত্ত্বেও মোটের উপরে চরিত্রবিশেষকে মহৎ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কালবিশেষে ধর্মনীতির আদর্শের কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে ধর্মনীতির যে অংশে সাধারণের শৈথিল্য ছিল এখন হয়তো সে অংশে নাই অপর কোনো অংশে আছে। এক সময় ছিল, যখন সম্রাটের প্রাপ্য নবাব লুণ্ঠন করিত, নবাবের প্রাপ্য ডিহিদার লুণ্ঠন করিত এবং দস্যুতা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে বিরাজ করিত। সে দস্যুতা এক প্রকার প্রকাশ্য ছিল এবং সাধারণের নিকট তাহা লজ্জার কারণ না হইয়া সম্ভবত শ্লাঘার বিষয় ছিল। সকলেই জানেন অল্পকাল পূর্বেও উপরি পাওনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ভদ্রসমাজের

মধ্যেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি কিন্তু এ কথা সত্য। অতএব, স্বসাময়িক সাধারণ দুর্নীতিবশত কোনো কোনো বিষয়ে সৎপথভ্রষ্ট হইলেও মহৎলোকের সাধুতার প্রতি সম্পূর্ণ সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না।

তৃতীয়ত, আমাদের সম্মুখে সমস্ত প্রমাণ বর্তমান নাই। সামান্য দুই-একটা আভাস মাত্র হইতে বিচার করা সংগত হয় না।

চতুর্থত, রূপ এবং সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সকল গুণ ছিল যাহাতে নিকটবর্তী লোকদিগকে তাঁহারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন— এবং আজ পর্যন্ত তাহারই স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে অন্য সমস্ত প্রমাণাভাবে ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোরবাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য— মানবজীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবধর্মের সুগভীর তত্ত্বসকল যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোরবাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভালো লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন তো তিনিই সুখী হইয়াছেন— আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।
ঠগী কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।
রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভালো লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরিলিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ। অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক সংশোধিত। মূল্য এক টাকা।
আমরা সম্পাদকোচিত সর্বজ্ঞতার ভান করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার-কৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোনোপ্রকার ভ্রম অথবা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। তবে যখন সামশ্রমী মহাশয়-কর্তৃক সংশোধিত তখন আমরা বিশ্বাসপূর্বক এই টীকা এবং অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারি। এই উপনিষৎগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সীতানাথবাবু যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার

টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে জগতের এই প্রাচীনতম তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।

প্রবেশ লাভ করিয়াছি এ কথা বলা ঠিক হয় না। কারণ, এই প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত সংশ্লিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, শ্লোকগুলি যেন কঠিন তপস্যার সংঘর্ষজনিত এক-একটি তেজ-স্ফুলিঙ্গের মতো ঋষিদের হৃদয় হইতে বর্ষিত হইতেছে— যে স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শন ষড়শিখা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

এই-সকল উপনিষৎ-কথিত শ্লোকগুলি সর্বত্র সুগম নহে এবং বহুকালের পরবর্তী কোনো ভাষ্যকার, ঋষিদের গূঢ় অভিপ্রায় যে সর্বত্র ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন অথবা সক্ষম হইতে পারেন এরূপ আমাদের বিশ্বাস নহে; কারণ, অনেক স্থলেই শ্লোকগুলি পড়িলে, আর কিছুই ভালো বুঝা যায় না, কেবল এইটুকু বুঝা যায়, যে, সেগুলি নিগূঢ় এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত মাত্র। সেই সংকেতের প্রকৃত অর্থ তপোবনবাসী সাধক এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই ভাবার্থ ক্রমশ শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এবং কালভেদে মতের বিচিত্র পরিণতি অনুসারে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইবার কথা। তাঁহারা যে শব্দ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন এখন আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে সম্ভবত তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এইজন্য সর্বত্র আমরা ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না। অথচ অনেকগুলি উজ্জ্বল সত্যের আভাস আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলিকে যখন আপন মনে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করি তখনই সংশয় হয়, ইহার কতখানি বাস্তবিক সেই ঋষির কল্পিত এবং কতখানি আমার কল্পনা। একটি উদাহরণ দিলে পাঠকগণ আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

অথর্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে আছে— প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া রয়ি (অর্থাৎ আদিভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; মূর্ত ও অমূর্ত (সংশ্লিষ্ট) যাহা-কিছু এই সমস্তই রয়ি; (তন্মধ্যগত) মূর্ত বস্তু তো রয়ি বটেই।

বন্ধনী চিহ্নবর্তী শব্দগুলি মূলের নহে। অতএব, পিপ্পলাদ ঋষি রয়ি এবং প্রাণ শব্দ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যকার-কৃত অর্থের অনুবর্তী হইয়াও যে, সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না; কারণ, আদিত্যকেই বা কেন চৈতন্য এবং চন্দ্রমাকেই বা কেন আদিভূত বলা হইল তাহার কোনো তাৎপর্য দেখা যায় না। অথচ আভাসের মতো এই তত্ত্ব মনে উদয় হয়, যে— দুই বিরোধী শক্তির মিলনে এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, ভালো ও মন্দ, চেতনা ও জড়তা, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার— রয়ি এবং প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রশ্নোপনিষদের স্থানান্তরে রহিয়াছে শুক্লপক্ষ প্রাণ এবং কৃষ্ণপক্ষ রয়ি; দিন প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। কর্ণ দ্বারা আমরা রয়িকে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রাণকে প্রাপ্ত হই।

যাহাই হৌক, এই শ্লোকগুলি হইতে আমাদের মনে যে তত্ত্বটি প্রতিভাত হইতেছে তাহা এই উপনিষদের অভিপ্রেত কি না আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না— আর কাহারও মনে অন্য কোনোরূপ অর্থেরও উদয় হইতে পারে।

অর্থ স্পষ্ট হৌক বা না হৌক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাংলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্বত্রই অনির্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোনো ধর্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম

করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্য দিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাংলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে; কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য। এইজন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নির্বাক্ আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।*

সাধনা
পৌষ ১৩০১

হাসি ও খেলা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

বইখানি ছোটো ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে-সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।

ছেলেরা অত্যন্ত মূঢ় অবস্থাতেও কত আনন্দের সহিত ভাষা-শিক্ষা এবং কিরূপ কৌতূহলের সহিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রকৃতি যে নিয়মে যে প্রণালীতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মানুষ তাহার অনুসরণ না করিয়া নিজের পদ্ধতি প্রচার করিতে গিয়া শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের আনন্দময় সুকুমার জীবনে একটা উৎকট উপদ্রব আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে হইবে; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভালো ভালো চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, একসঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ কল্পনাশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশুদিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।

পাঠশালার শুষ্ক শিক্ষাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রত্যাশা রাখি না। কারণ, অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে, ঔষধ যতই কুস্বাদু, চিকিৎসার পক্ষে তাহা ততই উপযোগী, এবং কঠোর ও অপ্রিয়

---

*এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেনোপনিষৎ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।

ইহার তাৎপর্য এই— মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের উপরে উপনীত হয়। প্রাণ কাহার দ্বারা প্রৈতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের অভিমুখে গতিলাভ করিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রেরিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে যোজনা করেন।

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

শিক্ষাই শিশুদের অজ্ঞানবিনাশের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ। অতএব, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের ভার বিদ্যালয়ের নিষ্ঠুর কর্তৃপক্ষদের হস্তে রাখিয়া আপাতত ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙালির ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বইখানি যেমন ভালো বাঁধানো, তেমনি ভালো করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহ গ্রন্থখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। আশা করি, যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সেজন্য বাঙালি অভিভাবক মাত্রেই দৃষ্টি রাখিবেন।

এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশুপাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসংগতিদোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশুহস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শঙ্করাচার্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র, ও মোহমুদ্গর, কুলশেখরের মুকুন্দমালা, এবং বিশ্বরূপস্তোত্র বাংলা পদ্যানুবাদসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। বাংলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহৃত হইতে থাকে; কিন্তু ইহার বাংলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়—

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র পরম পাবন,
একান্তেতে সদা যারা করে উচ্চারণ;
নিখিল জীবের পতি, পশুপতি দেবে,
হৃদয়েতে ভক্তিভরে সদা যারা ভাবে;
ভিক্ষাশী হইয়া, সুখে সর্বত্র চারণ,
কৌপীনধারীরা হেন, বটে ভাগ্যবান্।

এক তো, আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়ত, বাংলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না। একস্থানে দেখা গেল "পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ" পদটিকে অনুবাদে "আহারের পাত্ররূপ শুধু বাহুদ্বয়" করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এ স্থলে পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

চাণক্যশ্লোকের নীতিগুলি যে নূতন তাহা নহে কিন্তু তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংক্ষিপ্ততাগুণে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়; তাহাকে মুখে মুখে বহনযোগ্য এবং হাতে হাতে চালনযোগ্য করা চাই; চাণক্যশ্লোকের সেই গুণটি আছে, এইজন্য তাহা আমাদের সংসারের কাজে পুরাতন মুদ্রার মতো চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি বাংলা ছন্দে সংক্ষিপ্ততা ও ত্বরিতগতি না থাকাতে সংস্কৃতের জোড়া কথাকে ভাঙিয়া এবং ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া গুরু কথার গুরুত্ব এবং লঘু কথার লঘুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময়ে যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে এই কথাটিকে চাণক্য সংক্ষেপে সুনিপুণভাবে বলিয়াছেন।—

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥

মনে রাখিবার এবং আবশ্যকমতো প্রয়োগ করিবার পক্ষে এ শ্লোকটি কেমন উপযোগী! ইহার বাংলা অনুবাদে মূলের উজ্জ্বলতা এবং লাঘবতা হ্রাস হইয়া এরূপ শ্লোকের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়াছে।

ফল আর ছায়া যাতে আছে এ উভয়,
এরূপ তরুর তলে লইবে আশ্রয়।
দৈববশে ফল যদি নাহি মিলে তায়,
সুশীতল ছায়া তার বলো কে ঘুচায়।

দুটিমাত্র ছত্রে ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল।

সাধনা
মাঘ ১৩০১

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানি একটি রীতিমতো উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বী স্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ববিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ কথা একবারও ভুলিতে পারি নাই, যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মতো হয় নাই, তাহারা যে-সকল কথা কয় তাহার মধ্যে সর্বদাই লেখকের প্রম্প্‌টিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সম্ভবতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, উপন্যাসের সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোনোপ্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই

হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিসও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া যায়। 'মন্টেক্রিস্টো'-উপন্যাস বর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ড্যুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয়তো নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল, যে, যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থ-বর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতি এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয় লেখক এ-সকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভালো করিয়া জানেন; কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।
গ্রন্থখানি দুই ফর্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে "রাত্রি দ্বি-প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতিদেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কী না সংঘটিত হইত পারে।" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার হইতে উদ্‌ধৃত কোটেশনগুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে তো যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্য তাহাকে দিতে হয় না, তাহার উপরে সুলভ প্রিয়বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এইজন্য, যখন কোনো গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক, যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোনো লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন— হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কী না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

সাধনা
ফাল্গুন ১৩০১

নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।
গ্রন্থখানি নাটক। এই নাটকের কি গদ্য, কি পদ্য, কি ঘটনা সংস্থান, কি চরিত্রচিত্র, কি আরম্ভ, কি পরিণাম সকলই অদ্ভুত হইয়াছে। ভাষাটা যেন বাঁকা বাঁকা, নিতান্তই বিদেশীয় বাংলার মতো এবং সমস্ত গ্রন্থখানি যেন পাঠকদের প্রতি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, স্থানে স্থানে ইহাতে নাট্যকলা এবং কবিত্বের আভাস নাই যে তাহাও নহে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। তাই এক-এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।

শুভ পরিণয়ে।
বন্ধুর শুভ পরিণয়ে কোনো প্রচ্ছন্ননামা লেখক এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা

পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই, এই কারণে আমাদের পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি।

সাধনা

চৈত্র ১৩০১

রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম.এ. কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত— বাংলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীনবাবুর রঘুবংশ অনুবাদখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাংলা ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভালো ঠেকিল না। বাংলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে— তাহা চতুর্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলোটি মাত্রা আছে— এইজন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পানসিতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্‌ধৃত করিলাম :

> প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
> শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
> শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিণী
> শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।
>
> সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
> ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
> রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
> কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা।

শেষোদ্‌ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্বোদ্‌ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন-কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর-একটি যুক্ত অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

ফুলের তোড়া। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কোকিল" কবিতাটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

নীহার-বিন্দু। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন— 'পাখি গান গাহিয়া যায়— সুর, মিষ্ট কি কড়া— মানুষে শুনিয়া, ভালো কি মন্দ বলিবে— সে তার কোনো ধার ধারে না; সে শুধু, আপন মনে আপনিই,

নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।' অতএব ভরসা করি আমরা এই গ্রন্থলিখিত গান ক'টি ভালো না বলিলেও গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

সাধনা
বৈশাখ ১৩০২

নির্ঝরিণী। শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ সর্বতোভাবে নিরপেক্ষচিত্তে সমালোচনা করা কঠিন। বিশেষত বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থের লেখিকা নিতান্ত অল্পবয়স্কা এবং নববৈধব্যবেদনায় ব্যথিতা। গ্রন্থকর্ত্রীও ভূমিকায় পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে "কতখানি কবিত্ব আছে, কতখানি উচ্চতা আছে, কতখানি মাধুরী ও সৌন্দর্য আছে তাহার বিচার না করিয়া, বালিকার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পুস্তক প্রকাশিত করা সার্থক হইবে।"

এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবীনা লেখিকা তাঁহার কবিতাগুলিকে কেবল কবিত্বের হিসাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন না, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের সুখ দুঃখশোকের জন্য সমবেদনা প্রত্যাশা করিতেছেন। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর অল্পবয়স এবং সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত দুঃখসুখের প্রকাশ যতক্ষণ না সর্বজনীন ও সর্বকালীন সৌন্দর্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহারও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যে প্রধানত আত্মহৃদয়ের পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম্' নামক কাব্য কেন সর্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তাহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগশোকের প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রাগিণীতে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে— নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ্য বিলাপ টেনিসনের পক্ষে লজ্জার কারণ হইত।

অতএব, এই গ্রন্থের যে যে অংশে মুখ্যরূপে বালিকার আত্মশোকের কথা আছে তাহা আমরা সসংকোচে পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। যথার্থ পতিশোকের উচ্ছ্বাসে যখন বালিকা বিধবা বিলাপ করিতে থাকে— তখন সেই বিলাপকে সমালোচনার যন্ত্রাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে বসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল সাধারণভাবে এই কথা বলিতে পারি, যে, প্রথম জোয়ারের জলের ন্যায় প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসে কাব্যকলার পরমাবশ্যক সংযম অনেকটা ভাসিয়া যায়, সর্বত্রই যেন বাহুল্য দৃষ্ট হইতে থাকে। শোক যখন জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একটি উদার গম্ভীর বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে তখনি তাহা কাব্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইবার অবসর লাভ করে।

এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী যেখানেই ব্যক্তিগত শোকের অন্ধ কারাগার হইতে বাহিরের সৌন্দর্য-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়। "অনন্ত কালের পরিচয়" এবং "বিশ্বপ্রেম" নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা, দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোনো বালিকার রচনায় কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়াছেন, এবং বঙ্কিমকেও সেইসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ছেলেকে হাস্যমুখে

ছোটো বড়ো পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখকসাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসাহিত করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহেন নাই। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। ... স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য (?) পরে কা কথা।"

শুনিয়া ভয়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এত বড়ো দোর্দণ্ড-প্রতাপের নিকট সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি কর্তব্যবোধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। বর্তমান গ্রন্থকার পাঠকদিগকে নিতান্ত যেন ঘরের ছেলে অথবা স্কুলের ছাত্রের মতো দেখিয়া থাকেন। এক স্থলে শুদ্ধমাত্র বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গানটি তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবীণ হেড্‌মাস্টারের মতো লিখিতেছেন "বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?" তাহার পরেই প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়া লেখক নবীন রসিক পুরুষের মতো বলিতেছেন "কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে? আ মরি মরি! কী সুর রে!" পরপৃষ্ঠায় পুনশ্চ অতি পরিচিত কুটুম্বের মতো পাঠকদের গায়ে পড়িয়া বলিতেছেন "আরও শুনিবে? তবে শুন।" এক স্থলে দামোদরবাবুর রচিত 'কপালকুণ্ডলার অনুবৃত্তি' গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখক নথ-পরিহিতা প্রৌঢ়ার মতো বলিতেছেন— "সে, মৃন্ময়ী আবার পুনর্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়াকপাল আর কি!" ভাষার এই-সকল অশিষ্ট ভঙ্গিমা ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্বাসনযোগ্য।

গ্রন্থকার, বঙ্কিম-রচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই অতি সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রশংসা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন-কি, সেই ওজন অনুসারে 'মডেল ভগিনী'কেও 'চন্দ্রশেখরে'র সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য-সমালোচনা-কালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে, মানবসংহিতাই আদর্শ।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০২

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। মূল্য বারো আনা।

এই গ্রন্থে প্রধানত বিদ্যাপতির এবং সংক্ষেপে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার সকলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের ভালোরূপ অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ ত্রৈলোক্যবাবু এই গ্রন্থে যেরূপ সতর্কতা ও ভূয়োদর্শন সহকারে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে সাহসপূর্বক তাঁহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন কবির জীবনী স্বতন্ত্র ভাগ না করিয়া দেওয়াতে ইচ্ছামতো বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ হইয়াছে; গ্রন্থে একখানি সূচিপত্র থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

প্রসঙ্গমালা। মূল্য চারি আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।
মনোহর পাঠ। মূল্য ছয় আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।
এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ দুটি নীতিপ্রসঙ্গ, প্রাণীপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত। বিষয়গুলি সরস করিয়া লেখাতে এই দুইখানি পুস্তক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের মনোরম হইয়াছে সন্দেহ নাই। গল্পগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশীয় গল্প হইলে ভালো হইত। প্রসঙ্গমালায় "স্পষ্টবাদিতা" নামক গল্পে

যে একটু কৌতুক-কৌশল আছে তাহা বালকবালিকাদের বোধগম্য হইবে না। গ্রন্থ দুইখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার উপযোগী হইয়াছে কেবল আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভূরি পরিমাণ ছাপার ভুল সংশোধিত হইবে।

ন্যায় দর্শন। গৌতমসূত্র, নূতন টীকা, বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা।[১]

এতৎশীর্ষক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। কেননা, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় গৌতমের ন্যায় অনুবাদিত হয় নাই এবং উহার নূতন টীকাও এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। ভরসা করি, এই পুস্তক প্রচারিত হইলে সাহিত্য সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

অনেক বঙ্গীয় পাঠক (যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন) গৌতমের ন্যায় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, এই পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের সে ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ হওয়া সুসম্ভব।

গৌতমের সূত্রনিচয় আমাদের সমালোচ্য নহে। নূতন টীকা ও তাহার বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা সমালোচ্য হইলেও ন্যায় বিষয়ে অল্পাধিকার থাকায় আমরা ওই দুই অংশের যথোচিত সমালোচনা অর্থাৎ গুণদোষ বিচার করিতে অক্ষম। তবে পুস্তক পাঠে যাহা বোধগম্য হইয়াছে তাহা সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা দোষাবহ নহে বিবেচনায় ওই দুই বিষয়ে অল্প কিছু বলিলাম।

কোনো গভীর বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে গেলে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে সে দোষ ব্যতীত অন্য কোনো দোষ প্রাপ্ত ন্যায়দর্শনের নূতন টীকায় লক্ষিত হইল না। নূতন টীকার ভাষাটি বিশেষ সুখবোধ্য হইয়াছে। বাংলা ব্যাখ্যাও বিশেষ মনোরম ও নির্দোষ হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকারেরা যে রীতিতে শব্দ বিন্যাস করিতেন, ন্যায়দর্শনের টীকা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ না হইলেও সাধারণত এই বলা যাইতে পারে যে, নূতন টীকাটি মন্দ হয় নাই। কেননা, কোথাও পদার্থের বৈপরীত্য ঘটনা হয় নাই। চতুরস্রা বুদ্ধির অথবা বহুদর্শনের অভাবে যে-সকল গুণের অভাব হইয়াছে, তাহার একটি এই—

টীকালেখক প্রথম সূত্রর টীকায় "প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং ষোড়শ পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ অসাধারণধর্ম্মপ্রকারেণাবধারণাৎ নিঃশ্রেয়সাবিগমঃ মোক্ষপ্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ" এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই স্থানে অন্তত এরূপ একটা কথা লেখা উচিত ছিল যে, বস্তুতত্ত্ব আত্মতত্ত্বজ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। কেননা, আত্মাতিরিক্ত প্রমেয়ের জ্ঞানে মোক্ষ হয় না, এ কথা বোধ হয় সকল লোকেই জানে। দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।

"যদি পুনঃ প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সংস্যাৎ ন মোক্ষ্যমাণা মোক্ষায় ঘটেরন্। নহি কস্যচিৎ কচিচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি। তস্মাৎ আত্মাদ্যেব প্রমেয়ং মুমুক্ষুণা জ্ঞেয়ম ইতি।"—বার্ত্তিক।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অতি সমঞ্জসরূপে ওই কথার সংগতার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থং যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্। ইহ তু অধ্যাত্ম বিদ্যায়াং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ অপবর্গঃ।"

বার্ত্তিককার ঐ ভাষ্যের আরও অধিক বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"সর্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চেতি। ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদিসাধনা নাঃ সাধ্যত্বাদিপরিজ্ঞানঃ অনুপহতত্বাদিপরিজ্ঞানঞ্চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোপি স্বর্গপ্রাপ্তি। তথাহ্যত্র। স্বর্গঃফলং শ্রূয়তে। অথ বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? ভূম্যাদিপরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং কৃষ্যাদ্যধিগমশ্চ

১. সুশিক্ষিত সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ির দ্বারা বরাহনগরে প্রকাশিত।

নিঃশ্রেয়সমিতি তৎফলত্বাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানকেন্ত নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগস্তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয়াদি। ইহ তু অধ্যাত্মবিদ্যায়াং আত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সমপবর্গ ইতি।"

নিঃশ্রেয়স শব্দের মোক্ষ অর্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কারণ কোটিতে পরিত্যক্ত হয়। কেননা একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। নিঃশ্রেয়স শব্দের মঙ্গল সাধারণতার্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়। কেননা, বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ ত্রুটি আরও কতিপয় স্থানে লক্ষিত হয়, সে-সকল পরিহৃত হইলে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে।

কাতন্ত্রব্যাকরণম্ ভাবসেনত্রৈবিদ্যবিরচিতরূপমালা প্রক্রিয়াসহিতম্।

ব্যাকরণমিদং বাঙ্গৈঃ পণ্ডিতৈঃ কলাপব্যাকরণমিত্যাখ্যায়তে। স্বীকুর্বন্তি চাস্য ব্যাকরণস্যোৎকৃষ্টত্বং পণ্ডিতাঃ ক্রান্তি চাস্য হেতুরুৎকৃষ্টত্বে সারল্যমিতি। বয়মপাস্য সুষ্ঠুতাং অবগচ্ছামঃ। যৎকারণং অনেনৈব ব্যাকরণেন সুকুমারমতিকুমারাণাং স্বল্পায়াসেন ব্যাকরণপদপদার্থজ্ঞানং জায়ত ইতি। সন্তি হি বহুনি ব্যাকরণানি সিদ্ধান্তকৌমুদীপ্রমুখানি। পরন্তু তেষামতি দুরূহত্বাৎ ন যোগ্যানি বালানাম্। ব্যাকরণস্যৈতস্য দুর্গসিংহকৃতা বৃত্তির্বঙ্গে প্রচরদ্রূপা ন তু ভাবসেনত্রৈবিদ্যদেববিরচিত রূপমালা। ইয়ং সমীচীনতমা রূপমালা প্রক্রিয়া দুষ্প্রাপ্যা আসীৎ। সম্প্রতি তু তদন্বিতং কৃত্বা কাতন্ত্র সূত্রমুদ্রণেন মহানুপকারোজাত ইতি মন্যামহে। এতদেব ব্যাকরণং রূপমালা প্রক্রিয়া সহিতং চেৎ পাঠশালায়াং প্রচরদ্রূপং ভবেৎ তর্হি বালানাং ব্যাকরণজ্ঞানং সহজেনোপায়েন সম্পৎস্যত ইত্যাশাস্মহে বয়ম্। অস্য চ মুদ্রণকার্য সর্বাঙ্গ সুন্দরংজাতমিত্যপরঃ পরিতোষহেতুরস্মাকং। কিং বহুনা, এতৎ প্রকাশকার শ্রীহীরাচন্দ্র নিমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠনে মুম্বয্যবাসিনে বয়ং প্রশংসাবাদং উদীরয়াম ইতিশম্।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ বঙ্গদেশে কলাপ ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাকরণ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যাকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার অনেকগুলি বৃত্তি ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দুর্গসিংহকৃত ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে প্রচলিত। দুর্গসিংহের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাবসেন ত্রৈবিদ্য দেবের "রূপমালা প্রক্রিয়া" নাম্নী ব্যাখ্যা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত এদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মণগ্রামোৎপন্ন বুম্বাপুরানিবাসী পণ্ডিত শ্রীনাথরামশাস্ত্রী ও বুম্বাইনিবাসী শ্রীহীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী এই দুই মহানুভাব উক্ত ব্যাখ্যার সহিত (রূপমালার সহিত) কাতন্ত্র সূত্র মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের সমূহ উপকার করিয়াছেন। পুস্তকের অক্ষর, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, সমস্তই উত্তম এবং পরিশুদ্ধতায় অনবদ্য। মূল্য এক টাকা সুতরাং অধিক নহে। বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তক মুগ্ধবোধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইলে ব্যাকরণ শিক্ষা সহজসাধ্য হইতে পারে।

সাধনা
ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

সাহিত্য চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু। মূল্য এক টাকা।

পূর্ণবাবু আর্য সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্য তুলনা করিয়া সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নৈপুণ্যসহকারে তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যে, যে সরস্বতী এতদিন বিশ্বজনের বিচিত্রদল হৃৎপদ্মের উপর বিরাজ করিতেছিলেন তিনি হঠাৎ অদ্য পূর্ণবাবুর কঠিন গণ্ডিটুকুর মধ্যে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হইবেন কি না। এবং তাহার জগদ্বাসী শতলক্ষ ভক্তের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন

অসীমবিস্তৃত মানব হৃদয়ের রাজসিংহাসন পরিহার করিয়া পূর্ণবাবুর নীতি পাঠশালার হেড্‌মাস্টরি পদ গ্রহণ না করেন। সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে সাহিত্যে খুন ভালো কি ভালো নয়, সাহিত্যে প্রেমের কোনো বিশেষ রূপ গ্রাহ্য কি পরিত্যাজ্য তাহা এক কথার বলিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। কোনো বিশেষ কাব্যে বিশেষ স্থানে খুনের অবতারণায় সাহিত্যরস নষ্ট হইয়াছে কি না তাহাই রসজ্ঞলোকের বিচার্য— চরিত্র বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রেমের কিরূপ বিকাশ সুরসিক পাঠকচিত্তে অখণ্ড আনন্দের কারণ হয় তাহাই সাহিত্যে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। সাহিত্যের কল্পনাসংসার এই বাস্তব সংসারের ন্যায় অসীম বিচিত্র এবং পরম রহস্যময়, তাহা কেবলমাত্র, একখণ্ড আর্যদের বেড়া-দেওয়া ধর্মের ক্ষেত এবং আর-এক খণ্ড অনার্যদের প্রবৃত্তির কাঁটাবন নহে।

বামা সুন্দরী বা আদর্শ নারী। শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন-প্রণীত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি বামাসুন্দরসী নামধেয়া কোনো স্বর্গগতা পুণ্যবতী মহিলার জীবনচরিত, ভক্ত-কর্তৃক রচিত। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সংকোচ বোধ করি। লেখকের আন্তরিক ভক্তি-উচ্ছ্বাস তাঁহার ভক্তি-ভাগিনীর জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনার একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চেষ্টা তাঁহার উদ্দেশ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ করিয়াছে তথাপি বামাসুন্দরীর এই চরিত্রচিত্রে গৃহধর্মের নিঃস্বার্থপর উন্নত আদর্শ কতক পরিমাণে ব্যক্ত হইয়াছে। উপদেশপূর্ণ উচ্চভাবকে অতিস্ফুট করিবার প্রয়াসে চিত্রখানি সজীব, স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই।

শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ। শ্যামাচরণ দে-প্রণীত। মূল্য এক টাকা।
আমাদের দেশের বহুবিস্তৃত একান্নবর্তী পরিবারে রোগেরও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট এবং শুশ্রূষারও অভাব নাই। বরং অতিশুশ্রূষায় রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে। এবং আত্মীয়দের একান্ত চেষ্টা ও উদ্‌বেগেবশতই শুশ্রূষার ফল অনেক সময় বিপরীত হয়। রোগীর সুখস্বাস্থ্যবিধান কেবলমাত্র ইচ্ছা ও প্রয়াসের দ্বারা হয় না— সেজন্য শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া রোগীর পরিচর্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়ম পালন বড়োই আবশ্যক— রুগ্‌ণকক্ষে প্রবেশ অবারিত, কথাবার্তা অসংযত, এবং সমস্তই বিধিব্যবস্থাহীন হইলে চলে না। কিন্তু হায়, সতর্ক এবং সুবিহিত ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং চারি দিক হইতে আত্মীয়জনোচিত হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশের সমস্ত পথ খুলিয়া রাখিতে গিয়া বিধিব্যবস্থার নিয়ম সংযমে সম্পূর্ণ ঢিলা দিতে হয়।

এই কারণে সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের দেশে মহোপকারী বলিয়া বোধ করি। গ্রন্থকার উপযুক্ত গ্রন্থ এবং সুচিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত; ডাক্তারি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবিহীন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপাদেয়।

কিন্তু কেবলমাত্র পাঠদ্বারা অল্পই ফল লাভ হইবে, শিক্ষা এবং চর্চা চাই। বালিকামাত্রেরই এই গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। ঔষধ প্রয়োগ, ব্যান্ডেজ বাঁধা, পুল্টিস দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা, রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা, সংক্রামক রোগাদিতে মারীবীজনাশক উপায়াদির সহিত সুপরিচিত হওয়া, এ-সমস্তই স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যনির্দিষ্ট অঙ্গরূপে প্রচলিত হওয়া কর্তব্য। আজকাল দুরূহ শিক্ষা প্রণালী, পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা চেষ্টায় পুরুষ জাতির মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগ্‌ণসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোগী-পরিচর্যা বিদ্যাটা যদি আমাদের স্ত্রীগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করেন তবে দেশটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারে। তাঁহারাও যদি বাতি জ্বালিয়া রাত জাগিয়া আকণ্ঠ পড়া গিলিয়া পুরুষদের সহিত ঊর্ধ্বশ্বাসে বিদ্যা-বাহাদুরির ঘোড়-দৌড় খেলাইতে যান, দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত এবং হরিণচক্ষু চশমাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন তবে জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়— কিন্তু পরাজয় আমাদের জাতীয় সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্যের।

বাসনা। শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত। মূল্য আট আনা।
বঙ্গসাহিত্যের এক সময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া সমালোচকগণ সামাজিক কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেখিকা এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলে কিঞ্চিৎ যশঃ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন অনেক লেখিকা সাহিত্য-দরবারে উপস্থিত হওয়াতে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে— সুতরাং আজকাল স্ত্রীরচনা হইলেও কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া প্রশংসা বিতরণ করিতে হয়, এইজন্য উপস্থিত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীরসময় লাহা -বিরচিত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমষ্টি। এই পেলব কাব্যখণ্ডগুলির মধ্যে একটি সুকুমার মৃদু সৌরভ আছে। লেখকের ভাষায় যে একটি মিষ্ট সুর পাওয়া যায় তাহা সরল সংযত ও গম্ভীর এবং তাহাতে চেষ্টার লক্ষণ নাই। যদি এই-সকল পুষ্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ ফলের আশা থাকে, যদি লেখকের রচনা চিন্তার বীজ এবং ভাবের রসে ভরিয়া পাকিয়া উঠে তবেই তাহা সার্থক হইবে, নচেৎ আপন মৃদু গন্ধ ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ধূলিতে তাহার অবসান। যে-সকল বসন্তমুকুলে বৃন্তের জোর থাকে তাহারাই কালবৈশাখীর হাত হইতে টিকিয়া গিয়া সফলতা লাভ করে; লেখকের এই ক্ষুদ্র কাব্যগুলির মধ্যে নবমুকুলের গন্ধটুকু আছে কিন্তু এখনো তাহার বৃন্তের বল প্রমাণ হয় নাই।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

চিন্তালহরী। শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।
শামুক যেমন তাহার নিজের বাসভবনটি পিঠে করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় এ গ্রন্থখানিও তেমনি আপনার সমালোচনা আপনি বহন করিয়া বাহির হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন চিন্তালহরী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইলে তিনি ইহার প্রচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না; এবং ইহাও বলিয়াছেন "ইহার প্রতি প্রবন্ধে ভাবুকমাত্রেরই মর্মের কথার— প্রাণের ব্যথার পরিস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে।" অবিনাশবাবু জানেন না, ওই মর্মের কথা এবং প্রাণের ব্যথার অবতারণাকে ভাবুকেরা যত ভয় করেন এমন আর কাহাকেও নহে; ও জিনিসটা মর্মের মধ্যে প্রাণের মধ্যে থাকিয়া গেলেই ভালো হয়— এবং যদি উহাকে বাহিরে আসিতেই হয়ে তবে অপরিমিত প্রগল্‌ভতা ও ভাবভঙ্গিমার অবারিত, আড়ম্বর পরিহার করিয়া সরল সংযত সুন্দর বেশে আসাই তাহার পক্ষে শ্রেয়।

ইংরাজিতে যাহাকে বলে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম অর্থাৎ ভাবুকগিরি ফলানো, সহৃদয়তার ভড়ং করা, তাহার একটা বাংলা কথা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কথা না থাকিলেও জিনিসটা যে থাকে বাংলা সাহিত্যে এই ভাবুকতাবিকারে, কৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে তাহার প্রমাণ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

ভূমিকম্প। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
ইহারও আরম্ভে বন্ধু-কর্তৃক এই কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ও প্রশংসাবাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গদ্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এক সম্প্রদায় পাঠকের রুচিকর; এবং তাহার রচনা সহজসাধ্য ও অহমিকাগর্ভ হওয়ায় অনেক লেখক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই কারণে সেই-সকল অশোভন অশ্রুজলার্দ্র বিলাপ প্রলাপ ও কাকুক্তির আক্রমণ হইতে গদ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা

সমালোচকমাত্রেই করা কর্তব্য। কিন্তু পদ্যে অমিত্রাক্ষরছন্দে গত বর্ষের ভূমিকম্পমূলক ইতিহাস, বর্ণনা ও তত্ত্বোপদেশ কবিসাধারণের নিকট অনুকরণযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয় ভাষ্য। সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাসিত। প্রতিখণ্ডের মূল্য ছয় আনা।
ইংরাজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি সমালোচক সমালোচনা কার্যে নিযুক্ত থাকেন। বিষয়ভেদে যথোপযুক্ত লোকের হস্তে গ্রন্থ সমালোচনার ভার পড়ে। বাংলা পত্রিকার কম্পোজ করা এবং ছাপানো ছাড়া বাকি অধিকাংশ কাজই একা সম্পাদককে বহন করিতে হয়। অথচ সম্পাদকের যোগ্যতা সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণের নিকট মুখরক্ষা করিতে হইলে অনেক চাতুরী অনেক গোঁজামিলনের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাতে ভগবদ্গীতার বিচিত্র ভাষ্যের যথোচিত সমন্বয় হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নাই। অথচ এখানি পণ্ডিতপ্রবর গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়-কর্তৃক রচিত— সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলিয়া আমরা অবহেলা-অপরাধের ভাগী হইতে পারি না। ইহার অনুবাদ অংশ যে নির্ভরযোগ্য, এবং ইহার বিস্তারিত বাংলা ভাষ্য যে, মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ্য সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী। ১৫শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

এবারকার ভারতীতে লজ্জাবতী নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোটো গল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি-একটি বাঙালি অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনোপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গি করিয়া বসানো হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোনো বাড়াবাড়ি নাই, রকম-সকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই, অথচ পাঠসমাপ্তি কালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। 'বিলাপ' একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোনো আবশ্যক দেখি না। —লিটারেরি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গির অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্বত্রই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা সারস্বতমণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে সেরূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের কোনো বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে, এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোনো রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে, "ও-সকল তুমি বুঝিবে কী করিয়া!" সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গরসপূর্ণ হৌক-না-কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে, এবং ইহাতে কাহারও কোনো উপকার দেখি না। —প্ল্যাঞ্চেট। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষত শেষ কবিতাটি কোনো বাঙালির নিকট হইতে আশা করা যায় না। —'একাল ও ওকালের মেয়ে' যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক ট্রামে চড়িতেছে; পূর্বে যাহারা ঠন্‌ঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতি জুতা-মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্তমান কালোচিত পরিবর্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র এই নূতন পরিচ্ছদ-পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন, প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালোই বল আর মন্দই বল পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম— বর্তমান সহস্র নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনু-কথিত ধর্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দু-এক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্তিক। [১২৯৮]
'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম'; বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবনচরিত ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া গেলে ভালো হইত। যাহা হৌক, লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেইসঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে। "সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী" প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক। "মহা তীর্থযাত্রা" লেখকের নরোয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড়ো বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "শকাব্দ" প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য-কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময়ে মধ্য এশিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণত বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না— আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য। "আত্মসম্ভ্রম" প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই-এক জায়গা উদ্‌ধৃত করি। বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, "তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটাম ল্যাভেন্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।... ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের অর্ধেক আধিপত্য রেল ও স্টিমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।"

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। [১২৯৮]
এই সংখ্যায় 'ফুলদানী' নামক একটি ছোটো উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে -প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড়ো বেশি য়ুরোপীয়— ইহাতে বাঙালি পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়োই ব্যাঘাত করিবে। এমন-কি, সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষত মূল গ্রন্থের ভাষা-মাধুর্য অনুবাদে কখনোই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়। "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন স্ত্রী-ডাক্তার স্ত্রী-অ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রী-গ্রন্থকারদিকের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড়ো বড়ো ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ এলিয়ট তাহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি— 'কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে

স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমত, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই "মানুষ করা" কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সেগুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার সেই-সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই-সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এইজন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন— ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে— অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা-পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যাবসা, বিজ্‌নেস্‌। এইজন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভালো, তাহার ফলাফল এখনো পরীক্ষা হয় নাই।

তবে এ কথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে 'মানুষ করিয়া' তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমতো শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরানি করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন-তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না-বাড়না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

কার্তিক। [১২৯৮] কার্তিক মাসের সাহিত্যে "হিন্দুজাতির রসায়ন" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলংকারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালিদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমত, একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়ত, আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙালি তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণত বাঙালি লেখকেরা নিজের জবানী কোনো কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন— হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্‌বেলিত করিয়া তোলেন। 'আত্মজীবনচরিত' যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলংকার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কী প্রভেদ!

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। [১২৯৮]
"হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাংলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন 'ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতি আলু, কপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।' 'সোডা লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ-সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।' তিনি বলেন, শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন।' 'যজ্ঞ-উপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকরত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য করিয়া থাকে?' 'ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহারা কী প্রকারে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?' লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কী, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কীরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্তমানকালে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে। "ঋষি চিত্র" একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ

হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর-কোনো বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে। নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' খণ্ডশ বাহির হইতেছে। রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কী ছিল কী না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোনো ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাংলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের শখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুটি-চারিটি মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না। মনে করো তাহার কোনো-একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন 'আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখো দিন কি রাত্রি।' অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন 'অহো কী আশ্চর্য! ঋষিবাক্যের কী মহিমা! গুরুদেবের কী তত্ত্বজ্ঞান! দিবালোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না'। যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন তো ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই-একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধুলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়, বাঙালির এই স্বরচিত ভারতবর্ষ, সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাংলাদেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি "আধ্যাত্মিক' গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়; সেখানেও কয়েকজন নিস্তেজ নির্বীর্য মানুষ অদৃষ্টের কর-ধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম অর্থে সর্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্থ, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকরণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ 'না'-কে হাঁ করা কাল 'হাঁ'-কে না করার ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙালির কল্পনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব— প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমতো ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রানী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডান দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পুরিতাম। বলা বাহুল্য, চিনির প্রাচুর্যে রানী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশবাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না; মৃত্যুর যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজনিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রানী রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে?— দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনই ভাঙন আরম্ভ হয় জীবনের এই

নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে চলে না, এই ঋষি-রচিত সমাজ বিশ্বামিত্র-রচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইঁহারা এক মুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতের জন্য বর্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম? 'য়ুরোপীয় মহাদেশ' লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট এবং ইংরাজি, বাংলা, ফরাসি (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাংলা লেখার মধ্যে অনেকখানি করিয়া ইংরাজি এই পত্রে অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না। 'বঙ্গবাসীর মৃত্যু' প্রবন্ধে লেখক বড়ো বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখিতেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মতো লঘু হইয়া যায়।

সাহিত্য। অগ্রহায়ণ।

বর্তমান-সংখ্যক সাহিত্যে 'আহার' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।[1] 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' চন্দ্রশেখরবাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'মুক্তি' একটি ছোটো গল্প। কতকটা রূপকের মতো। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি— কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না— এইজন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে— যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনোটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ। —চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' নামে খৃ. সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবিতর্কের আবর্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

সাধনা

পৌষ ১২৯৮

---

১. দ্র. "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত", সমাজ, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৪৬২

নব্যভারত। পৌষ [১২৯৮]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় কথায় তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় না তুলিয়া এবং মাকড়সার জালের মতো চতুর্দিকে ইংরাজি বাংলা নোটের দ্বারা মূল কথাটাকে আচ্ছন্ন ও লুপ্তপ্রায় না করিয়া তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে ধারাবাহিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের সম্মুখে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন এজন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ অন্নের অপেক্ষা অধিক গুরুভার বলিয়া অনুভব হয়, সেই কারণে রমেশবাবুর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের নিকট তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না; তাঁহারা মনে করিবেন ইহাতে যথেষ্ট 'গবেষণা' প্রকাশ হয় নাই; পড়িতে নিতান্ত সহজ হইয়াছে। বিপর্যয় পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য আমরা বিস্তর দেখিয়াছি। তর্কের ধুলায় অস্পষ্ট প্রাচীন জগৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ো আনন্দ লাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাহিত্য। পৌষ [১২৯৮]

পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে 'রায় মহাশয়' নামক এক উপন্যাস বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোনো মত দেওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাবাটি পরিষ্কার এবং সরস, ও পল্লিগ্রামের জমিদারি সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে। মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' নামক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতি, যে, 'সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমল প্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত ও একপ্রকার দৃঢ়তায় আবৃত' তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন 'এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্কবিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না।' এখনো কোনো আবশ্যক দেখি না। যাহা সত্য তাহা স্বতই সত্য, তর্কবিতর্কের সাহায্যবশতই সত্য নহে। নিকৃষ্টতা কখনোই শ্রেষ্ঠতাকে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব শ্রেষ্ঠতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। কেহ যদি-বা মুখে তাহাকে অস্বীকার করে তাহাতে তাহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ, কার্যে তাহার গৌরব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজকাল কোনো কোনো নারীলেখক এই প্রমাণকার্যে এতই প্রাণপণে লাগিয়াছেন যে, মনে হয়, এ বিষয়ে যেন তাঁহাদের নিজেরই মনে কথঞ্চিৎ সংশয় আছে। আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন। আর-একটি কথা আছে; যে রমণীগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগযুগান্তর হইতে যে কর্তব্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সে পথ ত্যাগ করিলে ক্রমশ কীরূপ অবস্থা ঘটিবে বলা কঠিন। নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।— বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্যসম্পাদক মহাশয় সাধনার সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান। কার্তিক [১২৯৮]

এই নামে এক নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ

দেউস্কর 'এটা কোন্ যুগ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ। লেখক মনুসংহিতা, মহাভারত ও হরিবংশ হইতে দেখাইয়াছেন যে সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসরে, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসরে ও কলিযুগ এক সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সর্বসমেত চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগ আরম্ভের পর ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মনুর মতে খৃস্টজন্মের ১৯০০ বৎসর পূর্বেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে। তবে এখন এটা কোন্ যুগ। কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি ইহার মীমাংসা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই-সকল যুগবৎসর দৈব বৎসর। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃস্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব বৎসরের কথা লেখক পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোনো উত্তর দেন নাই। উত্তর দেওয়াও কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হৌক বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মতো জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য। মাঘ [১২৯৮]

—লয়।[১] এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকতক কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন, কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতিবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংস করাই, যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর-কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব ততদিন আমি মায়াবদ্ধ; যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কারণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়ামোহের বিনাশ। এমন সর্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দুসমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা সত্য; তাহার ফল হইয়াছে আমাদের এ কূল ও কূল দুই গেছে। প্রত্যেকে এক-একটি সোহহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জীব হইয়া আছে। মরণও হয় না, অথচ ষোলো আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মতো সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশে মুখে মুখে

১. দ্র. "চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব" এবং "নব্যলয়তত্ত্ব", বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৬-৪২৩

বৈরাগ্যের কথা প্রচলিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথাসাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি 'বিরাট' হিন্দুর 'বিরাট' হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শনশাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা; যদি বা কিছুকালের মতো কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুর্গুণ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্ক শূন্য বিরাট বৈরাগ্যমরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর-একটি কথা বলিবার আছে। আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা-কীর্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্য জাতিকে খাটো করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিতে চেষ্টা করি। তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ আদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য দেশের সাধারণ-প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথবাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুরা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যেই নিযুক্ত, আর যুরোপীয়েরা কেবল আত্মসুখের জন্যই লালায়িত। তিনি একদিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, অন্য দিকে যুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন 'ক্ষুধায় অন্ন এক মুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আলপিন কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে।'

চন্দ্রনাথবাবু যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখেন তো দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শের সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারীগণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতিবাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত যুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সংগত।

যুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, 'মাধুর্য এবং জ্যোতি' সমস্ত মানব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তরে জীবন বিসর্জন করিতেছে। আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্মসুখান্বেষণও বড়ো কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং এক দিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্বাসনে একাকী ধর্মপ্রচার করিতে ও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর

শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অন্য দিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এমনি মিশ্রিত, এমনি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ— অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই 'বিরাট' হোক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় [অগ্রহায়ণ ১২৯৮] আমরা 'শিক্ষিতা নারী' নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভুল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমনভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জনকারিণীদিগকে প্রধানত, শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি 'নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন' এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন 'মূল' বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙালিরা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙালির জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকেই মূল না বলিয়া দুর্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকলপ্রকার অধীনতারই মূলে দুর্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন যে, এই সুসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চা এবং জ্ঞানোপার্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধি-সংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপরাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা 'ওরিজিনাল্ সিন্' একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপানো নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সেজন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে-সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমন-কি, তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল নারীরা পুরুষের নামে এ কী এক নূতন অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমাদের কাছে নিতান্ত বেআইনি রকম ঠেকিতেছে।— রমণী সৌন্দর্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্যবোধ অনেক বিলম্বে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু অনাদৃত

সৌন্দর্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়া বলের প্রতি তাহার কোনো ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশু খৃস্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরও অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা; সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌন্দর্যকে উদ্ধার করিবে; এজন্য নারীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই-একটা বাংলা কথা আমাদের কানে নিরতিশয় বিলাতি রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মাননীয়া লেখিকা মার্জনা করিবেন। 'কর্ষিত বিচারশক্তি' 'মানসিক কর্ষণ' শব্দগুলা বাংলা নহে। একস্থানে আছে 'সংসারে যে গুরুতর কর্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।' 'সমভাবময় হৃদয়' কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জমা ঠাহর করিতে পারিলাম না সুতরাং উহার অর্থ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; 'কর্ষিত মস্তক' কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

'সোম' নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 'সোম' বলিতে কী বুঝাইত ভবিষ্যৎসংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

'রায় মহাশয়' গল্পে বাংলার জমিদারি শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশা করি, ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

নব্যভারত। মাঘ [১২৯৮]

'আলোক কি অন্ধকার?' সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কী করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না— যাঁহার যে প্রকার ধ্যান-ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম আর কোথায়? ছিন্নভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম।' লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষের হাওয়া খাইয়া ভারতের 'শরীরে হৈমমুকুট' পরাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম কী? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে আবার কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ 'অবতার' আনিবেন? যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্‌খানে? এবং এই হিন্দুধর্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

'সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী' লেখাটি কৌতূহলজনক। 'জাতীয় একতা' প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

'দোকানদারী।' বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের অশ্রুগদ্‌গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোনো উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সাহিত্য। ফাল্গুন [১২৯৮]

'সোম।' এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বরপ্রেমানন্দের তুলনা অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফেজের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোনো গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

'আহার।' শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন 'আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত— কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়? যদি বল ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে! যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড-পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'; মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু? ওই পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ওই মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো, এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য এ কথা কোন্ দেশের লোক জানে না? আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।* আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন; এই অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর দিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজ-জীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনি অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দু নামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্ম-নিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্ স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

'কাশ্মীর'। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাংলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজি কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোনো কাগজের প্রতিধ্বনি নহে, ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

নব্যভারত। চৈত্র [১২৯৮]
—'পঞ্জিকা বিভ্রাট'। প্রবন্ধটি ভালো এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে। 'জীবন ও কাব্য'।— লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে এ কথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন— তিনি বলেন বর্তমান বাংলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গকবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানবজীবনেও কত প্রহেলিকা

* এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

কত রহস্য আছে, তাহা উদ্‌ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ-কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালির আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মতো লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন, অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত— আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

'সুখাবতী'। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত। 'তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে, জগতে যাহা-কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবগণ -কর্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে।' আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন 'সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব' ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসবকার্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল।...

গঙ্গাযমুনার সংগম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ-ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসবকার্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি 'সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ-সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এই-সমস্ত গৃহের এক-একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপত্তু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপত্তুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক

হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি-অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক-এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত। শেষদিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলংকার পরিত্যাগপূর্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য জোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, 'আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদায় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদায় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।' এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

সাধনা
বৈশাখ ১২৯৯

নব্যভারত। বৈশাখ [১২৯৯]

'পুরাতন ও নূতন'। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়— কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছুমাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে কথা কীটের মতো অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল— 'নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না' অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল 'বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্‌গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নবীন সূর্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।' তস্য পুত্র : 'নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্ধান হয়।' তস্য পুত্র : 'নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।' (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্র : 'নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?' অবশেষে '৯৯ উদয়ে ওই দেখো ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।' এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল— নববর্ষ আসিয়াছে, অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ.হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই 'হ্রাসবৃদ্ধি' কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন— 'হ্রাসবৃদ্ধির

কথাটা বলিয়াছি তো আর-একটু ভালো করিয়া বলি। ছোটো ছেলেটি ক্রমাগতই বড়ো হইতেছে। কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরও পুরাতন, আরও পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।'— ছোটো ছেলেটি যে ক্রমে বড়ো হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন— কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড়ো হইয়া থাকে সেইসঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।— 'মামলায় মরণ'। মামলা-মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কীরূপ সর্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ংগম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে— সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙালির ঘরে মামলা-মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মতো এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা তো একপ্রকার আইনসংগত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্বস্ব পর্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশবাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে, মোকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।— 'মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্তি' প্রবন্ধে জেনেরাল বুথ যে কীরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর-কিছু না হউক আমাদের— বাঙালিদের— অত্যুগ্র আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তো সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ [১২৯৯]

'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় -রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্বিশেষে ভালোবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিই।— লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন— 'আমি বাহিরের বারান্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভালো বাসবেন না।' তুমি অমনি শিরশ্চালনপূর্বক, 'ভালো বসবি, ভালো বসবি' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভালো বাসিব

বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সেদিন, সকলের অনুরোধে, আর ভালো বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, 'না ভালো বস্‌বি' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভালো বস্‌বিনি, আমি ভালো বস্‌ব' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গি ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।'—

'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। 'নূতন বাড়ি' গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না— প্রভু মহেন্দ্রনাথবাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবি ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯]
'লয়'। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। 'প্রাইভেট্ টিউটার'।— পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোটো গল্প। গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয় একটা-দুটা আত্মহত্যা, নয় সমাজ-বিদ্রোহ, নয় কোনো রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক, লেখক এমতভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁধা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণত নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক— একদিকে হৃদয়ের টান, আর-এক দিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর— একটুখানি উপন্যাসের ধরনে প্রেমচর্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা শখ মাত্র, কিন্তু শামলা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙালির পক্ষে নিতান্ত শখের নহে, ওইটেই জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোনো রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরানি নহে, সে উপন্যাসের নায়ক— কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। 'বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব'।— বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই-একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ় [১২৯৯]
'কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা'। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে— তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি খবর আমরা পাই না, খাঁটি খবর আমরা চাইও না— মনে করি, খুব অলংকার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোনো একটা আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে-সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপূত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য আসল কথাটা ভালো করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনি গাহিতে,

বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্রবাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। 'সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা'— প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

সাধনা
শ্রাবণ ১২৯৯

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]
'মেঘনাদবধচিত্র'।— বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে [শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪] মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।[১]— রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি' নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনার্যজাতীয়েরা কী করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়— প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম না।— 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'। ইহাতে যে-সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ-সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্‌ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙিবার এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।[২]— 'অনাহারে মরণ'। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙালি জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই-এক স্থলে আমাদের খটকা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে 'তাঁহারা বাক্যসার, বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক 'better patriots'।' ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন। সেইজন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ [১২৯৯]
'মধুচ্ছন্দার সোমযাগ'।— বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে, লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে 'মধুবিদ্যা' নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু

---

১. দ্র. পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১১২-১৪৮, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৮২-১২৫ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৭৫

২. দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪০৫-৪১৩

অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, 'ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কীরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।' এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কী তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। 'উপাধি-উৎপাত' প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন-কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণত যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ— কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্য পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, বঙ্কিমবাবু গবর্মেন্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেন্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই— তিনি গবর্মেন্টের পুরাতন কর্মচারী— তাঁহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেন্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে— তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর— তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত— অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। 'বন্ধু' গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সংগীতমিশ্রিত সৌন্দর্য নিক্ষেপ করিয়াছে।— 'আদর্শ সমালোচনা'। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব 'আদর্শ-সমালোচনা'-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তো হয়তো কৃতকার্য হইতেও পারেন। 'কালিদাস ও সেক্ষপিয়র' লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।[১] এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কী করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথবাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোটো অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড়ো

১. দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৯-৪২৩

অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড়ো অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

সাধনা
ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশ্যা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। অমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থবিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাংলা রূপকথা (Folk-lore), প্রবচন (Proverb), হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বর্তমান-সংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদক-লিখিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে-সকল ছত্র ভূদেববাবুর গ্রন্থ হইতে উদধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি :

'মিল্টন যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।'

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় য়ুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ী শিখার কিয়দংশ কোনো উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙালি লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন— তাহা নহে। 'ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ংকর কার্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।'

বিস্তারিত ভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোনো দেশের কোনো প্রহসনেও এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া সর্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ 'নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত'

হইয়াছিল, যদিচ 'তখন ইংরেজি ভাবের প্রচার ও ইংরেজি শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল' এবং 'বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলন্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল' কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাহিত্য পরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।

সাধনা
পৌষ ১৩০১

প্রদীপ। বৈশাখ [১৩০০]

'লাল পল্টন' ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনা। বিষয় এবং লেখকের নাম শুনিলেই পাঠকদের সন্দেহ থাকিবে না যে প্রবন্ধটি সর্বাংশেই পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গত দুই-তিনবারের অনুবৃত্তি। আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোনো শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসংগত। এইরূপে গৌরববান রচনাও তাহার লঘুপক্ষ সঙ্গীদের দ্রুতগামী জনতার মধ্যে পাঠকদের মনোযোগ হইতে ক্রমশই দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকে এবং কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠে। ক্ষমতাপন্ন লেখকদের লেখার এরূপ দুর্গতিসম্ভাবনা আমাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে হয়। যাহাই হৌক, বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। 'বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা'— আমরা এরূপ গদ্য রচনার পক্ষপাতী নহি। ইহার মধ্যে ভাবুকতার চেষ্টা এবং চিন্তাশীলতার আড়ম্বর আছে কিন্তু আসল জিনিসটুকু নাই। 'বৃহস্পতির কলঙ্ক' সরল, সরস এবং কৌতুকাবহ। ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর যে কী বিভ্রাট ঘটিতে পারে সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিয়ঁ তাঁহার 'পৃথিবীর সংহার' নামক ফরাসি উপন্যাস গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সৌরজগতের বিপুলতম গ্রহ বৃহস্পতি ধূমকেতুর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে কীরূপে আপন অন্তঃপুরসাৎ করিয়াছেন অপূর্ববাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের অবলা পৃথিবী উন্মাদ ধূমকেতুকে সেরূপ নিরাপদে আয়ত্ত করিতে পারে কি না সন্দেহ। 'চুলকাটা মিষ্‌মী' সচিত্র প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত, স্বভাবসংগত এবং সুরচিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সচিত্র যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহাত্মাগণের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন নানা কারণে শ্রেয়স্কর।

উৎসাহ। ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]

অক্ষয়বাবুর 'লাল পল্টন'কে যখন সাময়িক পত্রের অধিকার হইতে পরাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখন উৎসাহে প্রকাশিত তাঁহার 'অজ্ঞেয়বাদ'কে কোনোমতে আমল দিতে পারি না। বিষয়টি দুরূহ এবং ইহার যুক্তিগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, এমত অবস্থায় ইহাকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবন্ধের দুরূহতা বাড়িয়া যায় অথচ তাহার যুক্তির সংযত বল খণ্ডীকৃত হয়। লেখাটি এই খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এক্ষণে গ্রন্থাকারে ইহার সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণের প্রত্যাশায় রহিলাম। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত চক্রবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' নামক দুইশত বৎসরের একটি

প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু শশধর রায় 'বর্ণ' প্রবন্ধে মনুষ্য-ত্বকের বর্ণোৎপত্তির কারণ আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদের বোধ হয়, এবং লেখকও স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধ-ধৃত মত পরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। 'ভৌতিক নোট' গল্পটি সুনিপুণ। ছোটো কথা, আকারে অতি ছোটো এবং উপদেশে অত্যন্ত বড়ো বটে কিন্তু বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এইজন্য রচনার বিশেষরূপ নৈপুণ্য না থাকায় তাহা নিরর্থক। 'উকিল কলঙ্ক'-নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে ওকালতি করিয়াছেন; সব শেষে তাহাতে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নীতি-উপদেষ্টাগণ নিজের হাতে ধর্মনীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন, বিচিত্র মনুষ্য-চরিত্র তাহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না এবং জোর করিয়া চালনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

নব্যভারত। বৈশাখ [১৩০৫]
'কি চাই কি পাই?' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষদুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে এবং এই মাটির পৃথিবীতে দোষগুণে জড়িত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনোপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু নব্যভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন 'পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।' মূঢ়সাধারণে ভুল করিত তিনি কেবল তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য গ্রাহক ও লেখক খুঁজিতেছেন। কিন্তু লেখক বলেন 'সাহিত্যের সেবা আমার কেবল কথার কথা, উপলক্ষ মাত্র; আমি লোক খুঁজিয়া লোক ধরিয়া কেবল অন্তর পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এমন লোক সম্মুখে পড়ে নাই, যিনি পরের সেবা করিতে করিতে আপনার স্বার্থ ভুলিয়াছেন, যিনি অম্লান চিত্তে দেশের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন— যিনি চরিত্রে অটল, পুণ্য পবিত্রতায় উজ্জ্বল, যিনি দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি পূর্ণাদর্শ।' এইরূপে অনাহূত পরকে যাচাই করিয়া বেড়াইবার অনাবশ্যক কার্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষক মহাশয় এতই কষ্ট পাইতেছেন যে, আপন নাট্যমঞ্চের উপর চড়িয়া বসিয়া সকলকে বলিতেছেন 'কাতরে পা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আদর্শ রূপে দাঁড়াও।' তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইতে হয় কিন্তু 'ঘৃণালজ্জা' ত্যাগ করা সহজ নহে। এমন-কি, তিনিও তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আদর্শরূপে দাঁড়াইতে গিয়া তিনিও স্থানে স্থানে পরমসাধুতাসম্মত বিনয়ের আবরণ রাখিয়াছেন; তিনিও বলিয়াছেন 'আমি পতিত, মলিন, পাপে জর্জরিত— আমি অসারের অসারে মণ্ডিত— ঘৃণিত, মলিন। পরিত্যক্ত, নির্যিত, লাঞ্ছিত হওয়াই আমার পক্ষে সাজে ভালো।' বিনয়ের সাধারণ অত্যুক্তিগুলিকে কেহ কখনো সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না— সম্পাদক মহাশয়ও সেরূপ আশঙ্কা করেন নি। যদিবা আশঙ্কা থাকে লেখক তাহার প্রচুর প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, নীচত্ব ভুলিয়া মহত্ত্ব, পশুত্ব ভুলিয়া চিন্ময়ত্ব, রিপুর উত্তেজনা ভুলিয়া সংযম পাইব আশায়, তোমার আহ্বানে, আমি কাঙাল, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মুকুট মস্তকে বহিয়া, আত্মীয়দিগের মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম।' ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দুটি-চারটি আছে মাত্র এবং সেই ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষদের ন্যায় আমাদের সম্পাদক মহাশয়ও কাঙাল, এবং তিনিও মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসেন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলিতে পারেন নাই যে, যে দারিদ্র্য তিনি মস্তকে বহিয়াছেন তাহা 'মুকুট'— এবং সেই মুকুট নাড়া দিয়া তিনি অদ্য আমাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিয়াছেন। ক্রমে যতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার লজ্জা ততই ঘুচিয়াছে— সকলকে ধিক্‌কার দিয়া বলিয়াছেন 'সাধে কি আমি নৈরাশ্যের আগুন

জ্বালিয়া ভস্ম হইতে বসিয়াছি! পিতামাতার স্নেহের বন্ধন যাহার ছিন্ন, সে যে ভালোবাসার কত কাঙাল, তাহা, তুমি, ঐশ্বর্যের দাসানুদাস, কী বুঝিবে? আমি ভালোবাসার কাঙাল, কিন্তু ভালোবাসাকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, দেবত্বের আকর্ষণে।' সম্পাদক মহাশয়কে আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই— কারণ আমরা ঐশ্বর্যের দাসানুদাস এবং তাঁহার মহীয়ান্ মস্তকে দারিদ্র্যের মুকুট; কিন্তু এমনি করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিজেই বুঝাইতে শুরু করেন তাহা হইলে না বুঝিয়া আমাদের উপায় থাকিবে না। 'দেবত্বের আকর্ষণে' তিনি আমাদিগকে ছাড়াইয়া যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন— 'আদর্শ ভুলিয়া আমি জটিল, কুটিল, মলিন, অপবিত্র ভালোবাসা বা একতা চাহি না। যদি তাহারই কাঙাল হইতাম, যাহাদের সহিত রক্তের সংস্রব ছিল তাঁহাদের স্নেহ ভুলিতাম না। তাঁহাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া দূরে দূরে, বিদেশে বিদেশে, নির্জনে নির্জনে, একাকিত্বের রাজ্যে কাঙালের ন্যায় বেড়াইতাম না!' কিন্তু এ কথা কেহ মনে করিয়ো না, নব্যভারতের সম্পাদক হওয়ার পর হইতে অদ্য পঞ্চদশ বৎসর ইহাঁর এই দশা! বাল্যকালে সুলক্ষণগুলি ছিল লেখক সে আভাস দিতে ছাড়েন নাই। 'আদর্শহীনতার জন্য বাল্যকাল হইতে কতজনের স্নেহডোর ছিঁড়িয়াছি; যত লোকের নিকট গিয়াছি, যখনই তাঁহাদের মধ্যে আদর্শহীনতা দেখিয়াছি, তখনই ছুটিয়া পলাইয়াছি। সেজন্য তাঁহারা আমার প্রতি আজ কত বিরক্ত! সেজন্য তাঁহারা কত ক্রোধান্বিত!!' আমাদের সহিত কত প্রভেদ! আমরা যখন ইস্কুল পলাইতাম, আমাদের সম্পাদক মহাশয় সেই বয়সে 'আদর্শহীনতা' হইতে পলায়ন করিতেন। মাস্টার আমাদের প্রতি রাগ করিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত জগতের সমস্ত আদর্শহীন ব্যক্তিরা! ভাবিয়া দেখো, সেই বালকটি বড়ো হইয়াছে এবং আজ লিখিতেছে 'চাহিয়াছি সত্য, পাইয়াছি মিথ্যা; চাহিয়াছি পুণ্য, পাইয়াছি পাপ; চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাড়ম্বর; চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব; চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা; চাহিয়াছি অমরত্ব, পাইয়াছি নশ্বরত্ব। কী তীব্র অভিজ্ঞতা!!' মহাপুরুষকে মিনতি করি তিনি শান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ভাষাকে সংযত করুন, পৃথিবীকে ক্ষমা করুন, পাঠকদিগের প্রতি দয়া করুন, তাঁহার নববর্ষ-নাট্যশালার কৃত্রিম বজ্রটিকে প্রতিসংহার করিয়া লউন। তিনি যে সত্য চাহিয়াছিলেন সে গৌরব তাঁহারই থাক্ এবং যে মিথ্যা পাইয়াছেন সে লাঞ্ছনা আর সকলে বহন করিবে; তিনি যে পুণ্য চাহিয়া ফিরিয়াছিলেন সে দুর্বিষহ সাধুতা তাঁহাতেই বর্তিবে, এবং যে পাপ পাইয়াছেন সে অক্ষয় কলঙ্ক অপর সাধারণের ললাটে আঁকিয়া দিন; তিনি স্বর্গীয় তাই স্বর্গ চাহিয়াছিলেন কিন্তু নরক পাইয়াছেন সে হয়তো তাঁহারই আত্মদোষে নহে; তিনি অকপট, তাই চাহিয়াছিলেন আন্তরিকতা কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরটা— সে আর কী বলিব! পরন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন, পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেও সকলে তেমনটি হইতে পারিবে না, কারণ, 'ঘৃণালজ্জা' একেবারেই পরিত্যাগ করা বড়ো কঠিন!

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলকচিহ্নগুলি (!) স্থানে স্থানে দ্বিগুণীকৃত করিয়া কোনো লাভ নাই। উহাকে লেখার মুদ্রাদোষ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোনো একটি নব্যতর-ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয় তবে তিনি 'কী তীব্র অভিজ্ঞতা' লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি!!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন— এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। এ কথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার ভাবাই যথেষ্ট, তাঁহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]
'নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় -রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অপর দিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'আজকালকার ছেলেরা' শীর্ষক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। ছাত্রদের স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমশ যে হীনতা পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; লেখিকার মতে তাহার একটি কারণ, আজকাল বিদ্যাদান দোকানদারিতে পরিণত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বপ্রকার শাসন শিথিল করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষার উত্তেজনা, পাঠ্যগ্রন্থের পরিমাণ, কী-পুস্তকের প্রচার এবং প্রাইভেট স্কুলগুলির প্রতিযোগিতায় মুখস্থ শিক্ষা ক্রমেই প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিয়াছে; পাঠ্যগ্রন্থ হইতে নব নব সরস ভাব গ্রহণের দ্বারা বালকদের হৃদয় স্বতই যে উপায়ে জাগ্রত হইয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখন তাহা যেন প্রতিরুদ্ধ হইতেছে; এখন কেবল কথা ও কথার মানে, শিক্ষার সমস্ত শুষ্ক ধূলিরাশি, তাহাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 'ওয়েল্‌স্‌-কাহিনী' প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, ওয়েলস্‌ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেখানকার অধিবাসীগণ স্বপ্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমরা বলিতেছি তৎসত্ত্বেও যদি তাহারা দায়ে পড়িয়া ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণপূর্বক ইংরাজের সহিত এক হইয়া না যাইত তবে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার হস্ত এড়াইয়া তাহারা কখনোই জাতিমহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত না। আমাদের দেশের উড়িয়া, আসামি ও বেহারিগণ যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙালির সহিত মিশিতে পারে তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে। 'সার্‌ সৈয়দ আহমদ খাঁর' সচিত্র জীবনী পাঠ করিলে আমরা একটি অকৃত্রিম মহৎ জীবনের আদর্শ লাভ করিতে পারি। আলিগড়ে যেরূপ কলেজ তিনি স্থাপন করিয়াছেন সেইরূপ ছাত্রনিবাসসহ-কৃত একটি কলেজ বাংলাদেশে স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসাহ। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'পুণ্যাহ' প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র, মনোরম এবং কৌতুকাবহ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু সেকালের মুসলমানরাজত্বের একটি অদৃশ্য বিস্মৃত ক্ষুদ্র কোণের উপর একটি ছোটো বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছেন এবং পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য তৎকালীন ইতিহাসরহস্যের প্রতি উৎসুক করিয়া তুলিয়াছেন। 'জগৎশেঠ' প্রবন্ধটি সুলিখিত সারবান। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধগুলি যেরূপ শুষ্ক, তর্কবহুল ও নোট-জালে জড়ীভূত জটিল ছিল অক্ষয়বাবু-নিখিলবাবুর ন্যায় লেখকদের প্রসাদে সে দশা ঘুচিয়া গেছে এবং বাংলা ইতিহাসের শুষ্ক তরু পল্লবিত মঞ্জরিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। 'সে দেশে' শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরসমাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে— ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য, এবং তাহারা অতিবিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম :—

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফোটে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়।

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কালো কেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়।
সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোছনা তা নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীত ভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।
সে দেশে সরলা আছে, রবি শশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে, একত্র উভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু 'রমণীর অধিকার' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; কিন্তু যাহাদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উপযোগী যুক্তি ও প্রমাণবিন্যাস এই ক্ষুদ্রপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না। 'হেমের অনধিকার' নামক গল্পে স্ত্রীবিয়োগবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপকারীদের প্রতি করুণরসমিশ্রিত একটি নিগূঢ় বিদ্রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে যে একটি গোপন অলীকতা আছে লেখক সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছেন।

নির্মাল্য। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
এই নূতন পত্রের অধিকাংশ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ পূর্ব্ববারের অনুবৃত্তি। শেষ পত্রে প্রকাশিত 'প্রিয়তমের প্রতি নামক কবিতায় একটি অভূতপূর্ব অসাধারণ নূতনত্ব দেখা গেল; লেখাটি আমরা বঙ্কিমবাবুর পুরাতন রচনা বলিয়াই জানি কিন্তু নির্মাল্যে উক্ত কবিতার নিম্নে রমণীমোহন বসুর নাম প্রকাশিত; ওইটুকু নূতন, নির্লজ্জভাবে নূতন!

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। [১৩০৫]
এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী -লিখিত 'সহরৎ-এ-আম্' প্রবন্ধটি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষে পব্লিক-ওয়র্ক্স্-ডিপার্টমেণ্ট ছিল—লেখক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই বিভাগের পারসি নাম ছিল সহরৎ-এ-আম, অর্থাৎ সাধারণের সুবিধা। তাহার এইরূপ কর্তব্য বিভাগ ছিল— '১ম, প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা। ২য়, ডাকখানার বন্দোবস্ত। ৩য়, ঝটিতি শুভাশুভ সমাচার প্রেরণ বা জ্ঞাপন। ৪র্থ, সমাচার পত্র প্রকাশ করা। ৫ম, পূর্তবিভাগ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।' এই প্রবন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্র, ও ডাক বন্দোবস্তের যে আলোচনা আছে তাহা কৌতূহলজনক। পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুদূর হইতে বিশুদ্ধ জল আনিবার যে ব্যবস্থা ছিল তৎপ্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন— 'এখন water works-এর সহিত তখনকার জলের কলের প্রভেদ এই যে, ইঞ্জিনের ব্যবহার মুসলমানদের সময়ে ছিল না, অথচ ইংরাজের জলের কলের ন্যায় অনায়াসে অনর্গল নির্মল জল দিবারাত্রি মিলিত, সুতরাং প্রজাসাধারণের নিকট হইতে জলের ট্যাক্স লওয়া হইত না।...

পিপাসিতকে পানীয় জল দিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা লওয়া আসিয়ার (oriental) রাজাদিগের ধর্ম ও আচারবিরুদ্ধ। জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রজাসাধারণকে জল জোগাইয়া কর গ্রহণ করেন না।' ইংরাজের ব্যবস্থায় জলও যেমন কলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে করও তেমনি কলে আদায় হইয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের মতো বোধ হয়, তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ-রাজকার্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটা বৃহৎ দোকান : সওদাগরের 'একচেটে' রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়। এমন-কি, রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেও দীনতম প্রজাকেও ট্যাক হইতে পয়সা গণিয়া দিতে হয়। হইতে পারে, সে কালে বিচারক ঘুষ লইতে ছাড়িত না, কিন্তু তাহা রাজার দাবি নহে, তাহা কর্মচারীর চুরি। তখন রাজপথ, পান্থশালা, দীর্ঘিকা রাজার দান বলিয়া প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিত। এখন পথকর পাবলিক কর গণিয়া দিয়াও তাহার প্রত্যক্ষফল অল্প লোকে দেখিতে পায়। পূর্বে রাজার জন্মদিনে রাজাই দান বিতরণ করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন এক্ষণে রাজকীয় কোনো মঙ্গলউৎসবে প্রজাদিগকেই চাঁদা জোগাইতে হয়। জেলায় ছোটোলাট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনকে আপনাদের নিকট স্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদের আপনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাদের সেই কৃতকীর্তিতে রাজা নিজের নাম অঙ্কিত করেন। কানুজংশনে যখন প্লেগ-সন্দিগ্ধদের বন্দীশালা দেখিতাম তখন বারংবার এ কথা মনে হইত যে, অশোকের ন্যায় আকবরের ন্যায় কোনো প্রাচ্য রাজা যদি সাধারণের হিতের জন্য এইপ্রকারের অবরোধ আবশ্যক বোধ করিতেন তবে তাহার ব্যবস্থা কখনোই এমন দীনহীন ও একান্ত অপ্রবৃত্তিকর হইত না— অন্তত নিরপরাধ অবরুদ্ধদের পানাহার রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইত; যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন অথচ রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট যে-সকল দুর্ভাগা তাঁহাদের সযত্নসেব্য অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায় ভাবে বন্দীকৃত, হয়তো পাথেয়বান সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্তত প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনোমতে রাজোচিত বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের জন্য রাজার হিতচেষ্টা বিভীষিকাময় না হইয়া যথার্থ রমণীয় মূর্তি ধারণ করিত যদি এই-সকল অবরোধশালা এবং মারী হাসপাতালের মধ্যে যত্ন ও ঔদার্য প্রকাশ পাইত। দৃষ্টিমাত্রেই যাহার বহিরাকারে দৈন্য এবং অবহেলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে সাংঘাতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা মিলিবে ইহা কাহারও প্রতীতি হয় না; রাজপুরুষের নিকট সর্ববিষয়ে আমাদের মূল্য যে কতই অল্প তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংকটের সময় আমাদের আতঙ্ক বাড়িয়া যায় এবং তখন ভীতসাধারণকে সান্ত্বনাদান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঘোষণাদ্বারা আশ্বাসের দ্বারা যথেষ্ট ফল হয় না; যে-সকল প্রত্যক্ষ রাজচেষ্টা বরাভয় উদারমূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে রাজার কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক। যাহা সংকল্পে শুভ এবং যাহা পরিণামে শুভ তাহাকে আকারেপ্রকারেও শুভসুন্দর করিয়া না তুলিলে তাহার হিতকারিত্ব সম্পূর্ণ হয় না, এমন-কি, অনেক সময় তাহা হিতে বিপরীত হয়। যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরাজি কবি হুড্-রচিত 'এ প্যেরেন্টাল্ ওড্ টু মাই সন্' নামক কবিতার মর্ম গ্রহণ করিয়া 'আদর' নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে— তাহাতে মূল কবিতার হাস্যমিশ্রিত স্নেহরসটুকু আছে অথচ তাহাতে অনুবাদের সংকীর্ণতা দূর হইয়া কবির স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্লেগ্ বা মহামারী' সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের 'খলিফাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গেছে— নব্যভারতে তাহার খণ্ডশ পুনঃপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র।

সাহিত্য। গতবর্ষের [১৩০৪] মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্য একত্রে হস্তগত হইল।

বাংলায় আজকাল ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্যের অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, 'সাহিত্য' পত্রের সমালোচ্য তিন সংখ্যা তাহার প্রমাণ। মাঘের পত্রে 'রাজা টোডরমল্', 'রানী ভবানী' এবং 'বাংলার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ' এই তিনটি প্রবন্ধ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রানী ভবানী' একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনেক দিন হইতে খণ্ডাকারে সাহিত্যে বাহির হইতেছে। 'বৈকুণ্ঠ' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি ইতিহাসের অন্যায় অভিযোগ সকল ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচারের উপরেও যে আপিল চলিতে পারে সুযোগ্য লেখক মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মনে ক্রমে সংশয় জন্মিতেছে যে, বাল্যকালে বহুকষ্টে যে কথাগুলো মুখস্থ করিয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে আবার তাহার প্রতিবাদগুলি মুখস্থ করিতে হয় বা! পরীক্ষাশালা হইতে নির্গত হইয়া ওগুলো যাঁহারা ভুলিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্যে 'রানী ভবানী', 'মগধের পুরাতত্ত্ব' এবং 'রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ' এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। কোন্ শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত তাহার নির্ণয়ে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। 'সহযোগী সাহিত্যে' লেখক মহাশয় সমালোচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে লেখকসম্প্রদায় পরম উপকৃত হইবেন। আমরা তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনোরূপ দোষ দেখাইলে আর আমাদিগের সহ্য হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালিবর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধুরা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে আপনারাই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদের 'লিটারারি' মোসাহেবগণ আমাদের এইরূপ কার্যকেও মহৎ কার্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ত্রুটি করে না।' এরূপ তীব্র ভাষায় এরূপ অনুতাপ-উক্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু লেখক নিজের প্রতি যতটা কালিমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সূক্ষ্মচর্ম কেবল তাঁহার একলার নহে, প্রায় লেখকমাত্রেরই। এবং তিনি আত্মগ্লানির প্রাবল্যবশত লেখকবর্গ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন ঠিক সেই কথাই সমালোচকদিগকেও বলা যায়। সকল লেখাও নির্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর মাংস যেরূপ ভক্ষ্য নহে, সেইরূপ সমালোচকের সমালোচনা সাহিত্যসমাজে অপ্রচলিত। সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্ধার সূচনা করে, এবং কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে জানিব যে তাহা 'আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান' করে না? যে লেখকের কিছুমাত্র পদার্থ আছে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই থাকিবে— বিপক্ষ দল স্বপক্ষকে বলেন স্তাবক, এবং স্বপক্ষ দল বিপক্ষকে বলেন নিন্দুক; সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকও কোনো এক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া 'মোসাহেব' 'স্তাবক' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভক্তকে 'স্তাবক' এবং বিরক্তকে 'নিন্দুক' বলে তাহারাই, যাহারা সত্য প্রচার করিতে চাহে না, বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু লেখক যখন বিশ্বসাধারণের বিশেষ হিতের জন্য সমালোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে নিরতিশয় পুরাতন ও সাধারণ সত্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে তখন এ-সকল বিদ্বেষপূর্ণ অত্যুক্তি অসংগত শুনিতে হয়।

পূর্ণিমা। শ্রাবণ [১৩০৫ ?]
'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়'। লেখক মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচকদের প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে প্রবন্ধের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন 'ইনিও (বঙ্কিমবাবু) নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই।' এইরূপ সাধারণভাবের রূঢ় উক্তি, হয় অনাবশ্যক, নয় অন্যায়। কারণ, নিন্দুক ও মূর্খগণ, কেবল বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কেন, অনেকেরই সম্বন্ধে নিন্দা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে— সেটা কিছু নূতন কথাও নহে, আশ্চর্যের কথাও নহে। তবে যদি এ কথা লেখকের বলিবার অভিপ্রায় হয় যে, যাহারা বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে তাহারা মূর্খ ও নিন্দুক তবে তিনি নিজেও অপবাদভাজন হইবেন। 'সাহিত্য ও সমাজ' নামক পুস্তিকায় বিষবৃক্ষের কী সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখি নাই; লেখক সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার যেরূপ মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যদি অযথা না হইয়া থাকে, তবে সেই সমালোচক মহাশয় অন্তত বুদ্ধিপ্রভাবের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু 'মীরকাসিম'-লেখকের প্রতি মতবিরোধ লইয়া অবজ্ঞা প্রকাশের অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আমরা সমালোচ্য প্রবন্ধলেখকের অপেক্ষা ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাসিম-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আমরা উচিত বোধ করি না। কারণ, ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে অন্য হিসাবে অক্ষয়বাবুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালানুক্রমে ভূপঞ্জরের যেরূপ স্তর পড়িয়াছিল হিমালয় পর্বতে তাহার অনেক বিপর্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোনো ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়কে খর্ব করিলেও কালিদাসের নিকট তাহার দেবাত্মা গুপ্ত থাকে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোনো খর্বতা হয় নাই। উপন্যাসের [ইতিহাসের] বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও যা, আর ধান্যজাত মদিরা অন্ন হইয়া উঠে নাই বলিয়া রাগ করাও তাই। উপকরণের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে কিন্তু তবুও অন্ন মদ্য নহে এবং মদ্য অন্ন নহে এ কথাটা গোড়ায় ধরিয়া লইয়া তবে বস্তু-বিচার করা উচিত। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কী? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন. এবং যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীয় উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনোমতেই সহ্য করিতে পারেন না— কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে। উদ্যান প্রহরীরই জিম্মায় থাক্, কিন্তু এক সখীর কুঞ্জ হইতে আর-এক সখী পূজার জন্য হৌক বা প্রসাধনের জন্য হৌক যদি একটা ডালি ফুল পল্লব তুলিয়া লইয়া যায় তবে তিনি তাহার কৈফিয়তের দাবি করিয়া এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোনো ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

প্রদীপ। আষাঢ় [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হস্তে পড়িলে সুলভ এবং শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত। 'সমরু' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় নবাবী আমলের সৈন্যরচনায় য়ুরোপীয় নায়কদিগের কর্তৃত্ব আলোচনা করিয়াছেন। 'চৈতালি-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য' নামক প্রবন্ধরচয়িতার প্রতি ভারতী-সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন। কোনো লেখকের কবিতা যে সকল পাঠকেরই ভালো লাগিবে এমন দুরাশা কেহ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি সরল শ্রদ্ধার সহিত তাহার মর্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং উপভোগের আনন্দ মুক্তভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার উৎসাহ লেখকের কাব্যকাননে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণের ন্যায় কার্য করে। 'ঋণ-পরিশোধ' গল্পে ভাষার সরসতা সত্ত্বেও ঘটনা বর্ণনা এবং চরিত্র রচনার মধ্যে একটা বানানো ভাব থাকাতে তাহা পাঠকের নিকট সত্যবৎ প্রত্যয়জনক হইয়া উঠে নাই। প্রভাতকুমারের অধিকাংশ কবিতায় যে একটি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ হাস্য থাকে 'অনন্ত শয্যা' কবিতাটির মধ্যেও তাহা পাওয়া যায়।

অঞ্জলি। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]। ২য় সংখ্যা। এখানি একটি শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত -কর্তৃক সম্পাদিত।
আমরা এই পত্রিকার উন্নতি প্রার্থনা করি। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে য়ুরোপে উত্তরোত্তর আলোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা কী উপায়ে সহজ, মনোরম স্থায়ী এবং যুক্তিসংগত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পুস্তকের প্রচার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাসাধন করিতে হয় বলিয়া বাঙালির শিক্ষাকার্য একটি গুরুতর ভারস্বরূপ হইয়া আমাদের শরীর মনকে জীর্ণ করিতেছে— অতএব শিক্ষার নবাবিষ্কৃত সহজ ও প্রকৃষ্ট পথগুলির সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ ফলপ্রদ হইবার কথা কিন্তু আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষকগণ চিরপ্রচলিত দুঃখাবহ পথগুলি যে সহজে ছাড়িবেন এমন আশা রাখি না। যাহা হউক, আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃতভাষা, ইংরাজিভাষা, ব্যাকরণ, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রতিবৎসর যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ও পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয় তাহার উপযুক্ত সমালোচনা আমরা অঞ্জলির নিকট হইতে আশা করি।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

সাহিত্য। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। নামটি এবং বিষয়টি আমাদের অপরিচিত। লেখক বলিতেছেন, ভগবান শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ 'বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই— অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ।' এই নিদানতত্ত্বের ব্যাখ্যা লইয়া নানা মত আছে, ত্রিবেদী মহাশয় তাহাতে আর-একটি যোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা কিয়দ্দূর পর্যন্ত শক্ত মাটির উপর দিয়া আসিয়া চোরাবালির মধ্যে হারাইয়া গেছে; পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি ইতিহাসসংগত হয়, অর্থাৎ স্বাধীন যুক্তিমূলক না হইয়া যদি নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যদ্বারা পোষিত হয়, তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধদর্শন আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক দর্শনের সহিত প্রধানত একমতাত্মক। কিন্তু প্রচুর

ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না। অতএব ত্রিবেদী মহাশয় যে পথে চিন্তা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই পথে গবেষণারও প্রেরণ আবশ্যক। 'একনিষ্ঠ বিবাহ' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য। 'মহারাজ রামকৃষ্ণ' পাঠকদের বহুআশাউদ্দীপক একটি প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ। লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখিতেছেন 'ইংরাজেরা যখন দেওয়ানি সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কী কৌশলে একালের উপাধিব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম।'

প্রদীপ। শ্রাবণ [১৩০৫]
'জীবজাতি নির্বাচন' প্রবন্ধটি সরল অথচ গভীর এবং চিন্তাউদ্রেককারী। জাতি নির্বাচন যে কত কঠিন তাহাই প্রমাণপূর্বক সেই সোপান বাহিয়া লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় অভিব্যক্তিবাদের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সচিত্র জীবনচরিতের প্রথম অংশ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

অঞ্জলি। আষাঢ় [১৩০৫]
'বণিক বন্ধু' নামক প্রবন্ধে পণ্য ও বণিক্‌ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'সংস্কৃত পণ ধানু হইতে বণিজ্‌ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা বণ ধাতু না করিয়া পণধাতু কেন করিলেন উহার তত্ত্ব এক রহস্যময় ব্যাপার। পুরাকালে রোমানেরা ফিনিসিয়ানদিগকে পুণিক বলিত। পুণিকেরা অতিবৈয়াকরণ যুগে ভারতবর্ষে ব্যাবসা-বাণিজ্য করিত। ভারতবাসীরা পুণিকদিগকে পণিক বলিত। পণিক সাধিবার জন্য পণ ধাতুর সৃষ্টি হইল। উত্তর কালে (আভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পণ্য রাখিয়া পণিকদের মাহাত্ম্য বিলোপ হওয়াতে পণিকনামও সংস্কৃত অভিধান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পণিকদের পরে— সুদীর্ঘকাল পরে ভেনিজিয়া বা বণিজগণ ভারতে আগমন করে। তখন বৈয়াকরণিক ঋষিযুগ অতীত হইয়াছে। সংস্কৃতের আইনকানুন হইয়াছে, সংস্কৃত পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী, কাজেই পরবর্তীরা অনন্যোপায় হইয়া নবাগত বিজাতীয় শব্দগুলিকে নিপাতনের হাত ছোঁয়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। বণিজ্‌ শব্দও সেইরূপ শোধিত ও পণ ধাতুর পোষ্যপুত্র হইল। এই ভেনিস বা বণিজ্‌দের অতি আদরের সামগ্রী বলিয়া নীল বণিকবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

ভারতী
ভাদ্র ১৩০৫

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫] সংখ্যা একত্রে হস্তগত হইল।
জ্যৈষ্ঠের সাহিত্যে 'মোহনলাল' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবুর প্রতিবাদ করিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা আমাদের আয়ত্তাতীত। লেখাটি ভাষার সরস সুস্পষ্টতা ও প্রমাণ সংগ্রহ এবং বাঙালি পাঠকের বিশেষ আগ্রহজনক কয়েকটি নূতন তথ্যের জন্য বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। 'সেকালের কলিকাতা গেজেট' সুপাঠ্য কৌতুকাবহ প্রবন্ধ। আষাঢ়ে নিখিলবাবুর 'মীরণের পরিণাম রহস্য' রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্যজনক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু-কর্তৃক সম্পাদিত।
বর্তমান সম্পাদকের হস্তে আসিয়া অবধি এই পত্রিকা আশাতীত গৌরব লাভ করিয়াছে। এখন

ইহার কোনো সংখ্যাই অবহেলাপূর্বক হারাইতে দেওয়া যায় না— ইহার প্রতি সংখ্যাই বঙ্গ সাহিত্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া তুলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গুরুতর কর্তব্য যথারূপে নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পালন করিবার শক্তিও তাঁহার আছে।

প্রদীপ। ভাদ্র [১৩০৫]
'বেনামী চিঠি' কৌতুকরসপূর্ণ ক্ষুদ্র সুলিখিত গল্প। গত বৎসর সূর্যের পূর্ণগ্রাস পরিদর্শন উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন হিল্স্ কেম্ব্রিজের নিউয়ল সাহেব পুলগাঁও স্টেশনে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্মেন্ট ইঁহাদের সহায়তার জন্য দেরাদুন হইতে কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'পুলগাঁওয়ে সূর্যগ্রহণ' প্রবন্ধের লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। কীরূপ বহুচেষ্টাকৃত অভ্যাস ও সতর্কতার সহিত কিরূপ যন্ত্রসাধ্যবৎ শৃঙ্খলা সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূর্যগ্রাসের বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনকার্য সমাধা হয় এই প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। 'ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভাষায় সময়োপযোগী আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিলাতফেরতার দল যত সংখ্যায় বাড়িবে ততই তাঁহাদের বাহ্য বেশভূষার অভিমান ও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যাইবে। প্রথম চটকে যে বাড়াবাড়ি হয় তাহার একটা সংশোধনের সময় আসে। হিন্দুসমাজও ক্রমে আপন অসংগত ও কৃত্রিম কঠোরতা শিথিল করিয়া আনিতেছে, তাঁহারাও যেন তাঁহাদের পুরাতন পৈতৃক সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিনীতভাবে ধারণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বোধ করি কন্‌গ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ আমাদের পক্ষে সুদৃষ্টান্তের কাজ করিতেছে। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সুরচিত জীবনী শেষ হইয়া পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্রের সচিত্র জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। স্বদেশের মহৎজীবনী প্রচারের দ্বারা প্রদীপ উত্তরোত্তর জ্যোতি লাভ করিতেছে।

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
'বিশ্বরচনা' প্রবন্ধটি সুগম্ভীর। 'জগৎশেঠ' নিখিলবাবুর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলার ইতিহাস উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। 'রাজা রামানন্দ রায়' স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মার জীবনচরিত; উৎসাহের ক্ষুদ্রায়তনবশত ক্ষুদ্রখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে ইহাই এ প্রবন্ধের একমাত্র দোষ। 'ভূগর্ভে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নপূর্বক পাঠ্য। আষাঢ় মাসের উৎসাহে 'হেস্টিংসের শিক্ষানবিশী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে অনেক গুরুতর কথার সন্নিবেশ আছে। হেস্টিংস যখন ইংরাজের নবরাজ্যক্ষেত্রে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছেন তখনি বর্ধিতপ্রতাপ নন্দকুমারের ছায়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর যখন হেস্টিংসের দিন আসিল তখন কি তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়াছিলেন?

অঞ্জলি। শ্রাবণ [১৩০৫]
আমরা আশা করি, অঞ্জলিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে; নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। আজকাল শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া ইংরাজিতে এত পুস্তক এবং পত্রিকা বাহির হইতেছে যে শিক্ষাসুগমের নূতন নূতন উপায় সম্বন্ধে লেখা শেষ করা যায় না। 'উচ্চারণ দোষ সংশোধন', 'ভৌগোলিক নাম লিখন ও পঠন', 'পুনরালোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ হয় নাই— অনেকটা সাধারণ কথার উপর দিয়াই গিয়াছে। এবারকার অঞ্জলিতে 'সোনারুপার বিবাদ' প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল এবং

সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্তমান কালে মুদ্রাবিপাকের আলোচনা দেশে বিদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ এ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর।

ভারতী
আশ্বিন ১৩০৫

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা [১৩০৫]

বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয় বিন্যাসে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে। পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। বিশেষত কয়েকটি পদের মধ্যে চণ্ডিদাসের জীবনবৃত্তান্তের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন-গ্রন্থ-সকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলা পদবিন্যাস-প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

'স্ত্রী কবি মাধবী' প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন— 'এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবী দেবী।' মাধবী উৎকলবাসিনী। প্রবন্ধে তাঁহার রচিত বাংলা পদাবলীর যে আদর্শ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। তাহার ভাষা পুরুষ বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। সেই প্রাচীনকালে উৎকল ভূমি বাংলা ভাষার উপর যে অধিকার লাভ করিয়াছিল এক্ষণে নব্যউৎকল তাহা স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছে তাহা বাংলার পক্ষে দুঃখের কারণ এবং উৎকলের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

'গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন' দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় বর্তমান পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিলাসপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিয়া পরম সৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভট্টপুত্র হৃষীকেশের পৌত্র, মধুসূদনের পুত্র, পরাশর-গোত্রজ (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রবরভুক্ত) যজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ী চাবটিগ্রামবাসী ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্মাকে বর্তমান তাম্রশাসন দান করেন।' যিনি দিয়াছেন এবং তাম্রশাসনোক্ত যে গ্রাম দান করা হইয়াছে পত্রিকায় তাহার আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনাই নাই। কুলজিগ্রন্থ হইতে তাঁহার বিবরণ উদ্ধার করিলে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের অনেক সহায়তা হয়।

'ধোয়ী কবির পবনদূত' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোহর হইয়াছে। গীতগোবিন্দের শ্লোকে ধোয়ী কবির নামোল্লেখ অনেকে দেখিয়াছেন। অনেকে দিন অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তাঁহার রচিত পবনদূত কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার যে বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সরস হইয়াছে।

'পাঁচালিকার ঠাকুরদাস' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি বাংলা পাঁচালি-সাহিত্য-ইতিহাসের একাংশ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]

এই যুগল-সংখ্যক প্রদীপ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রায় প্রত্যেক গদ্য

প্রবন্ধই আদরণীয় হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী -রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মতো প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রীমহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

'হামির' প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

'হাফ্‌টোন্ ছবি' শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা। অনেকেই হয়তো জানেন না হাফ্‌টোন্ লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশত তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি বাঙালির মধ্যে প্রথম নিজচেষ্টায় হাফ্‌টোন্ শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কার সাধনে কৃতকার্য হন। ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ু এবং সর্বপ্রকার সহায়তা ও পরামর্শের অভাব সত্ত্বেও এই নূতন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে কী পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা অব্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন। উপেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ অপেক্ষা তাঁহার রচিত যে সুন্দর আলেখ্যগুলি প্রদীপে বাহির হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

'হীরার মূল্য' নামক ছোটো গল্পটিতে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বাভাবিক প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পটি ভাষার শ্রী, আখ্যায়িকার কৌশল, চরিত্ররচনার সহজ-নৈপুণ্য এবং সংক্ষিপ্ত সংহত উজ্জ্বলতাগুণে হীরকখণ্ডের মতো দীপ্তি পাইতেছে। গল্পটি পাঠ করিতে করিতে নবাব পরিবারের একটি হিন্দুস্থানী আবহাওয়া পাঠকের অন্তঃকরণকে বেষ্টন করিয়া ধরে। 'রাসায়নিক পরিভাষা' খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচনা। প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি জর্মনির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যেখানে লাটিনমূলক পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে জর্মানেরা সে স্থলে স্বদেশীভাষামূলক পরিভাষা ব্যবহার করিতেছেন। প্রফুল্লবাবু আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত মাণ্ডেলিয়েফ্ রাসায়নিক তত্ত্বে নূতন পথ-প্রদর্শক। ইনি রুশীয়। 'কিছুদিন হইল এই জগদ্‌বিখ্যাত রাসায়নিক ও তাঁহার সহযোগীগণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ হইয়া দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর পরকীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ মহাসংকটে পড়িলেন। কাজেই অনেকে রুশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রসায়নবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের দুই জন বিলাতি বন্ধু কঠোর পরিশ্রমের পর মাণ্ডেলিয়েফ্ মূল ভাষায় পাঠ করিয়া সার্থকতা লাভ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য বাংলা ভাষা কি এতই অপরাধ করিল যে, ইহাকে রাসায়নিক পরিভাষা সংকলন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।' বঙ্গ ভাষাও রুশীয় ভাষার ন্যায় গৌরব লাভ করিবে এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা আর সংকোচ বোধ করি না; সম্প্রতি যে দুই-একজন বাঙালি আমাদিগকে এই উচ্চ আশার দিকে লইয়া যাইতেছেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

'দাতা কালীকুমার' প্রবন্ধে লেখক এ কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বর্গগত কালীকুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত কোনোমতেই বিস্মৃতির যোগ্য নহে। আশা করি এই মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবনচরিত আমরা গ্রন্থাকারে দেখিতে পাইব। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও নূতন শিক্ষায় একান্নবর্তী পরিবারবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে; কালীকুমার দত্তের মহৎ জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ বাঙালি পাঠকের নিকট প্রাচীন বাংলা সমাজের এক উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্তমান সংখ্যক প্রদীপে তাঁহার বন্ধু এবং ভারতের বন্ধু আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।'

'স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী উক্ত মহাত্মা

সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র অধিক বয়সে বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা যেমন সরস, প্রাঞ্জল এবং পরিপক্ক ছিল তেমনি তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত। কেবল যে রচনাগুণে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন তাহা নহে; রজনীকান্তবাবু লিখিতেছেন, 'ব্যবহারে তিনি কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কোনোরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম এ কথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার সহ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা মিলিত হইলে কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার কোনোরূপ আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার রামনগর বাসাবাটিতে গিয়াছি, এক কম্বলাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি কিছু-না-কিছু শিখিয়া আসিয়াছি। নিয়ম পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না।'

সর্বশেষে, আমরা প্রদীপের উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি। প্রদীপ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তৈল পুড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় কোন্ দিন তাহার অকাল নির্বাণ হইবে। এত ছবি না ছাপাইয়া এবং এত খরচপত্র না করিয়াও কেবল প্রবন্ধগৌরবে প্রদীপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি

মণিপুরের বর্ণনা

সার জেমস্ জন্স্টন্ জুন মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় মণিপুরের যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহসা মনের মধ্যে একটি বিষাদের ভাব উদয় হয়।

স্থানটি রমণীয়। চারি দিকে পর্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা; বাহিরের পৃথিবীর সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্‌যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমতো পরিশ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সংবৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে, বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানি করে না। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এখানকার দৃশ্যটি বড়ো মনোহর হইয়া উঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল, পাকাধানে শস্যক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা শোভন বস্ত্র পরিয়া দলে দলে ধান কাটিতেছে, বলিষ্ঠ পুরুষেরা শস্যের আঁটি বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। নিকটে গোরুগুলি ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে, শস্যবিচ্ছিন্ন তৃণ এক পার্শ্বে রাশীকৃত হইতেছে, ধান যখন ঘরে আসিবে তখন সেই তৃণে আনন্দোৎসবের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

রাজধানীতে সন্ধ্যাবেলায় হাট বসে, সেইটেই দিবসের মধ্যে প্রধান ঘটনা। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে থাকে পথ হাট লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পুরুষদের নির্মল শুভ্র বসন এবং মেয়েদের নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা। মেয়েরাই বিক্রেতা। দেখিতে পাওয়া যায় মাথায় পণ্য দ্রব্য এবং কোলে অথবা পিঠে কচি ছেলে লইয়া তাহারা 'সেনা কাইথেল' অর্থাৎ সোনাবাজারে হাট করিতে আইসে, পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাজারের কাছে পোলো খেলিবার মাঠ। শহরের ভালো ভালো খেলোয়াড় এমন-কি রাজপুত্রগণ সেইখানে প্রায় প্রত্যহ খেলা করে; সেখানে কুস্তিও চলে এবং রাজসৈন্যদের কুচও হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির চারি দিকে খাল কাটা আছে সেইখানে আশ্বিন মাসে একবার করিয়া নৌকা বাচ হয়। সেই উপলক্ষে মহা সমাগম হয়। রাজা, রাজকুটুম্ব, রানী এবং রাজকন্যাগণ নির্দিষ্ট মঞ্চে বসিয়া বাচ খেলা দেখেন; মেয়েদের কোনোরূপ পর্দা নাই, অবগুণ্ঠন নাই।

ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী, দেওয়ালি, হোলি, রথযাত্রা প্রভৃতি আরও অনেক উৎসব আছে। আষাঢ় মাসে এক ব্যায়াম-উৎসব হইয়া থাকে তখন চারি দিক হইতে সমাগত পাহাড়িয়াদিগের সহিত মণিপুরীদের কুস্তি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামনৈপুণ্যের পরীক্ষা হয়।

এই প্রচ্ছন্ন পর্বতপুরীতে ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু এখানে সরল সুখ-সন্তোষের লেশমাত্র অভাব নাই। রাজা যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাদিগের মনে স্বজাতীয় রাজগৌরব সর্বদা জাগরূক। তাহারা বহুকাল হইতে আপনাদের রাজা এবং রাজকীয় বিবিধ অনুষ্ঠান, আপনাদের সোনার হাট, নৌকাখেলা, উৎসব আমোদ লইয়া শৈলকুলায়ের মধ্যে সুখে বাস করিতেছে। এই জগতের একান্তবর্তী সন্তোষকলকূজিত নিভৃত নীড়ের মধ্যে সভ্যতার নির্মম হস্তক্ষেপ দেখিলে এই কথা মনে পড়ে,

গড়ন ভাঙিতে, সখি, আছে নানা খল,
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড়ো বিরল।

আমেরিকার সমাজচিত্র

বিখ্যাত ইংরাজলেখক হ্যামিল্টন আইডে লিখিতেছেন যে, যদিও আমেরিকায় আইরিশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাফ্রি এবং চীনেম্যান প্রভৃতি বিচিত্র জাতির সমাবেশ হইয়াছে তথাপি তাহাদের মধ্যে একটা স্বভাবের ঐক্য দেখা যায়। যাহার টাকাকড়ি আছে সে আপন নিবাসস্থান শহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা প্রধান কর্তব্য বোধ করে। তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না; একদণ্ড স্থির থাকিতে হইলে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়। নিজের কাজই করুক বা সাধারণের কাজেই লিপ্ত থাকুক প্রাণপণ খাটুনির ত্রুটি নাই। চিকাগো শহর একবার আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইয়া গেল আবার দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে এমনি কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, আজকাল অত বড়ো শহর মুলুকের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজ যেখানে হতাশ্বাস হইয়া নিরস্ত হয়, মার্কিন সেখানে কিছুতেই দমে না। ব্যবসায়ে একবার যথাসর্বস্ব খোয়াইয়া পুনর্বার নবোদ্যমে অর্থসঞ্চয় আমেরিকায় প্রতিদিন দেখা যায়। ইহারা হাল ছাড়িয়া দিবার জাত নয়। ইংরাজের একান্ত অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের তাক লাগিয়া যায়, ইংরাজ আবার আমেরিকার অপ্রতিহত উদ্যম দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে।

কিন্তু লেখক বলেন, অবিশ্রাম কাজ করিয়া ইহারা যে সুখী আছে তাহা বলা যায় না। পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রমের পর শ্রান্তি এবং মেয়েদের মধ্যে নিয়ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনপ্রিয়তাকে সুখের অবস্থা বলা যায় না। আমেরিকায় দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর নাট্যাভিনয় অপেক্ষা ভাঁড়ামি মস্করামি প্রভৃতিতে অধিকসংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। লোকেরা এত অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করে যে, অবসরের সময় তাহারা নিছক আমোদ চায়, যাহাতে মনোযোগ, চিন্তা বা মনোবৃত্তি বেশি উদ্রেক করে এমন কিছুই তাহাদের সহ্য হয় না।

মেয়েরা কেবলই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চঞ্চলভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। শহর হইতে দূরে আপনার নিভৃত কুটিরের মধ্যে গার্হস্থ্য এবং গ্রাম কর্তব্য লইয়া দিনযাপন করা মার্কিন মেয়ের পক্ষে অসাধ্য। কোথায় ব্রাউনিং সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথায় বাগ্‌নারের সংগীত সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; কোথায় কোন্ পণ্ডিত আজ্‌তেক জাতির বিবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছে, কোথায় ভূতনামানো হইতেছে, চঞ্চল কৌতূহল লইয়া সর্বত্রই আমেরিকানি উপস্থিত আছেন। সাধারণ ইংরাজ মেয়ে বিদ্যালয় ছাড়িলেই মনে করে শিক্ষা সমাপ্ত হইল, কিন্তু মার্কিন মেয়ে একটা-না-একটা কোনো অধ্যয়ন লইয়া লাগিয়া আছেই। সকলেরই প্রায় ক্ষুদ্র পরিবার এবং দুটি-চারটি চাকর, গৃহকর্ম সামান্য, এইজন্য মেয়েরা আমোদ অথবা শিক্ষা লইয়া চঞ্চলভাবে ব্যাপৃত থাকে। অনেক গৃহস্থ আপন কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে য়ুরোপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বলেন, আমেরিকায় মেয়েরা বড়ো শীঘ্র পাকা হইয়া যায়। নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই লোকলৌকিকতা আমোদ-অনুষ্ঠানে সকলের সহিত সমকক্ষভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমাভিনয়ে অকালেই তাহাদের তারুণ্যের স্নিগ্ধ সৌরভ দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, ইংরাজলেখক বলিতেছেন এমন অতিকর্মশীলতা এবং অতিচাঞ্চল্য সুখের অবস্থা নহে।

পৌরাণিক মহাপ্লাবন

বাইবল্-কথিত মহাপ্লাবনের বিবরণ সকলেই বিদিত আছেন। এবারকার পত্রিকায় বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক হক্‌স্‌লি তাহার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম যে-যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেইখানে বিজ্ঞানের 'ঠেকো' দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলন্ডে সেইরূপ বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রোদ্ধারের কার্যে নিযুক্ত করার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু সত্যের দ্বারা

ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনই দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনই জানা যায় শাস্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে শুনা যায় প্রাচীন গ্রীক ধর্মশাস্ত্র মরিবার প্রাক্‌কালে নানা প্রকার রূপক ব্যাখ্যার ছলে আপনার সার্থকতা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তৈল না থাকিলে কেবল দীর্ঘ বর্তিকায় প্রদীপ জ্বলে না; কালক্রমে বিশ্বাস যখন হ্রাস হইয়াছে তখন বড়ো বড়ো ব্যাখ্যাকৌশল সূক্ষ্ম শির তুলিয়া অন্ধকারকে আলো করিতে পারে না।

মুসলমান মহিলা

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরাজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা জেনানার সুখ-দুঃখ সত্য-মিথ্যা কে প্রমাণ করিবে? তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্ধুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এই মতোই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন— 'বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে? তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।' আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে না। যে হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা জহরাতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপ-মায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।' ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সা চাহি না বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।' সে কহিল, 'এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে।'

তাহার রকম-সকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, 'যে রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।' বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয় পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া

তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই-চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এইরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম্ বাগড়ম্ বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব

মে মাসের পত্রিকায় আচার্য ম্যাক্সমূলার লিখিতেছেন প্রাচীনতার একটি বিশেষ গৌরব আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনায় সেইটেকেই মুখ্য আকর্ষণ জ্ঞান করা উচিত হয় না। যাহা-কিছু বহুকেলে এবং সৃষ্টিছাড়া তাহাই যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহা নহে। বরঞ্চ প্রাচীনের সঙ্গে যখন নবীনের যোগ দেখা যায়, যখন সম্পর্কসূত্রে নবীন প্রাচীন হইয়া যায় এবং প্রাচীন নবীন হইয়া আসে, তখনই আমাদের যথার্থ আনন্দ বোধ হয়। আর্য সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, ইহার দ্বারা দূর নিকটবর্তী হইয়াছে এবং যাহাদিগকে পর মনে করিতাম তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিয়াছি। মনুষ্যপ্রেম বিস্তারের, পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের একটি প্রাচীন পথ পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ কেবল একটি শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নহে, মনুষ্যত্বই ইহার আত্মা, মানবই ইহার লক্ষ্যস্থল।

তিনি বলিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখো 'ইন্ডো-য়ুরোপিয়ান' শব্দটার মধ্যে কতটা মহত্ত্ব আছে। এই নামে ইংরাজি, জর্মান, কেল্টিক্, স্লাভোনিক, গ্রীক এবং লাটিন -ভাষীদের সহিত সংস্কৃত, পারসিক এবং আর্মানি -ভাষীরা এক হইয়া গিয়াছে। এই নামে এমন একটি বৃহৎ মিলনমণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম জাতি যাহার অঙ্গ— এই নামের প্রভাবে সেই-সমস্ত জাতি আপনাদের অন্তরের মধ্যে বৃহৎ ইন্ডো-য়ুরোপীয় ঐক্যের, প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছে।

ম্যাক্সমূলার মহাত্মার মতো কথা বলিয়াছেন। হায়, তিনি জানেন না তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই 'আর্য' শব্দ লইয়াই আমাদের দেশে দূরে নিকটে, মানবে মানবে কাল্পনিক ব্যবধান স্থাপিত হইতেছে। বাঙালি পণ্ডিতের মুখে যখন এই 'আর্য' নাম উচ্চারিত হয় তখন তাহার সুদূরব্যাপী উদারতা ঘুচিয়া গিয়া তাহা একটা গ্রাম্য দলাদলির কলহকোলাহলে পরিণত হয়। নামের দোষ নাই, যাহার যেমন প্রকৃতি, ভাষা তাহার মুখে তেমনি আকার ধারণ করে।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'আর্যামি এবং সাহেবিয়ানা' পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়

যে-সকল ইংরাজ স্ত্রীলোক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত লেখিকা লিন্ লিন্টন্ জুলাই মাসের নাইন্টিন্থ

সেঞ্চুরিতে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যক সাধনায় 'সাহিত্যে' প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের সমালোচনায় রমণীদের বিশেষ কার্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম পাঠকগণ লিন্ লিন্টনের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিস্তর ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

লেখিকা বলেন, কথাটা শুনিতে ভালো লাগুক বা না লাগুক, জননী হওয়াই স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা, এবং প্রকৃতি সেই কারণেই তাহাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছে। যাহাতে করিয়া রমণীর সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও শিশুসন্তান পালনপোষণ করিবার শক্তি হ্রাস করে তাহা সমাজ ও প্রকৃতির নিকটে অপরাধস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।

মনুষ্যের কতকগুলি বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের আকরস্থল আছে, গৃহ তাহার মধ্যে একটি। যদি পুরুষেরা উপার্জন রাজ্যশাসন প্রভৃতি বাহিরের কার্য এবং স্ত্রীলোকেরা স্বজনসেবা সমাজরক্ষা প্রভৃতি ভিতরের কার্য না করে তবে এই গৃহ এক দণ্ড টিকিতে পারে না। সমাজের যতই উন্নতি হয় স্ত্রী-পুরুষের কার্যবিভাগ ততই সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্য দিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাঁহাদিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্মপ্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্বরা পরিপূর্ণা বিচিত্রফলশালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি, এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিবার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি আছে যাহার আর উত্তর সম্ভবে না। রাজকার্যে যখন আবশ্যক হইবে তখন পুরুষেরা রণক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে বাধ্য কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যুদ্ধ বাধাইবার বেলা স্ত্রীলোক থাকিবেন আর রক্তপাতের বেলায় পুরুষ এটা ঠিক সংগত হয় না। আর স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী হইবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়ুরোপের কতকগুলি দারুণতর যুদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারাই ঘটিয়াছে। মাডাম্ ডে ম্যান্টর্ন কি শান্তিপ্রয়াসিনী ছিলেন? ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের প্রাক্‌কালে 'বর্লিনে চলো' বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল, যে উন্মত্ততার ফলে এত রক্ত এবং এত অর্থব্যয় হইয়া গেল, সম্রাজ্ঞী য়ুজেনির কি তাহাতে কোনো হাত ছিল না? রুশিয়ার সুন্দরী যুবতীদের মধ্যে কি এমন কোনো নাইহিলিস্ট নাই যাঁহারা হত্যা ও সর্বনাশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন? বাতাসে উইলোপত্র যেরূপ কাঁপিয়া ওঠে, উত্তেজনাবাক্যে রমণীহৃদয় সেইরূপ বিচলিত হয়। তাহার পর একবার রমণী খেপিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাধা-বিপদের চেতনা থাকে না, হিতাহিতের জ্ঞান দূর হইয়া যায়।

ফ্রান্সে সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের শাসন যেরূপ বলবৎ এমন আর কোথাও নয়, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোক যখনই রাজ্যতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটাইয়াছে।

সর্বময় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং আপনার মতকেই পাঁচ কাহন করা স্ত্রীস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমেরিকায় রমণী যখনই প্রবল হয় একেবারে জবরদস্তি করিয়া মদের দোকান ভাঙিয়া দেয় এবং জোর হুকুমে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া বসে। এদিকে ইঁহারা নিজে হয়তো চা, ইথর্ ক্লোরালে অভিষিক্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও স্নায়ু জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন, অপ্রিয় কর্মফল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিবিধ বিপজ্জনক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করে!

মাতৃত্বের মধ্যে একটি অপ্রতিহত কর্তৃত্ব আছে। শিশুসন্তানের উপর মায়ের অখণ্ড অধিকার। এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে তাহার কোনো জবাবদিহি নাই। যুগ-যুগান্তর এই মাতৃকর্তৃত্ব চালনা করিয়া রমণীহৃদয়ে একটা অন্ধ আত্মপ্রভুত্বের ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। বংশরক্ষার পক্ষে এই নিজ হৃদয়ানুসারী কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিশেষ আবশ্যক কিন্তু রাজ্যরক্ষার পক্ষে, ব্যাপক ন্যায়াচরণের পক্ষে, সাধারণ হিতোদ্দেশে অল্পসংখ্যকের দমনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য

ইংরাজ যে কী কৌশলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যরক্ষা করিতেছেন, অগস্ট মাসের নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় সার অ্যালফ্রেড লায়াল 'সীমান্তপ্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য' নামক প্রবন্ধে তাহা অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, নিজ অধিকারের সন্নিকটে যখন প্রবল প্রতিবেশী থাকে তখন ইংরাজ মাঝখানে একটি করিয়া আশ্রিত রাজ্যের ব্যবধান রাখিয়া দেন। আশ্রিতরাজ্য স্থাপনের অর্থ এই যে, পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজাকে বল বা কৌশলের দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করানো। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ করার থাকে যে, ইংরাজ তাহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং সে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রবল রাজাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন তখন মহারাট্টাদের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মাঝখানে অযোধ্যাকে আশ্রিতরাজ্যস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই কারণেই মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যসকলকে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পঞ্জাব অধিকারের পূর্বে শিখদিগের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য শতদ্রুতীরে গুটিকতক ছোটো ছোটো পোষ্য রাজা রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া লইল।

ভারতের নীচের দিকে সমুদ্র ও উপরের দিকে হিমালয়ের দুই মস্ত বেড়া আছে। অতএব মনে হইতে পারে একবার ভারতের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আর আশ্রিত রাজ্যপাতের আবশ্যক নাই। কিন্তু ওদিকে মধ্য এশিয়া হইতে রুশিয়া ঠিক ইংরাজের কৌশল অবলম্বন করিয়া এক-এক পা অগ্রসর হইতেছে। সেও খানিকটা করিয়া দখল এবং খানিকটা করিয়া সন্ধিরাজ্য স্থাপন করে। এমনি করিয়া ইংরাজ ও রুশিয়া দুই সাম্রাজ্যের সন্ধিরাজ্য অক্সস নদীর দুই তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষে বোখারা এবং ইংরাজের পক্ষে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। অতএব পর্বতের আড়ালে আসিয়াও রক্ষা নাই, তাহার পরপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সহিত যে কোনোরূপ পাকাপাকি লেখাপড়া আছে তাহা নহে— কিন্তু ইংরাজ এই পর্যন্ত একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পারস্য ও রুশিয়ার সহিত কথা আছে তাঁহারা সে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে স্বরাজ্য ও সন্ধিরাজ্যে মিলিয়া ইংরাজের আধিপত্য ক্রমশই বিপুল হইয়া উঠিতেছে। এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহারা নিজেই অনেক সময় শঙ্কা পান, কিন্তু সহসা আর অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এতদিন পরে ইংরাজের প্রতাপ পূর্ব ও পশ্চিমে দুই শক্ত জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই সুনিয়ন্ত্রিত দুই বৃহৎ রাজ্যের কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে রুশিয়া এবং একদিকে চীন।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্যন্ত কোনো সন্ধিরাজ্য স্থাপনার আবশ্যক হয় নাই। কারণ সেখানে তিনটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক প্রহরী আছে। হিমালয়, তৎপশ্চাতে মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালক্ষেত্র এবং তাহার উত্তর মঙ্গোলীয় মরুভূমি। কিন্তু উত্তর রাষ্ট্র হইতে নেপালের সহিত কোনোপ্রকার গোলযোগ ইংরাজ সহ্য করিবেন না; এবং এক সময় তিব্বত ইংরাজাশ্রিত সিকিমের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বছর দুয়েক হইল তাহার সহিত ইংরাজের একটি ছোটোখাটো খিটিমিটি বাধিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পূর্বাঞ্চলে বর্মার অভিমুখে চীনের সংস্রব সম্বন্ধে ইংরাজকে অনেকটা সাবধান থাকিতে হয়। যখন বর্মা ইংরাজের হস্তে আসে নাই তখন উহা একটি ব্যবধানস্বরূপ ছিল— এখন বর্মা অধিকার করিয়া ইংরাজ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াছেন; এইজন্য সম্প্রতি ইংরাজ বর্মা ও চীনের মধ্যবর্তী ক্যাম্বোডিয়ার অর্ধস্বাধীন অধিনায়কগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

এইরূপে হিমালয়কে তাকিয়া করিয়া দুই দিকে দুই পাশবালিশ লইয়া ইংরাজ এক মস্ত রাজ-শয্যা পাতিয়াছেন কিন্তু গদি যে আর বেশি অগ্রসর হইবে এমন সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই।

কেবল ভারতবর্ষের আশপাশ নহে ওদিকে ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টর, সাইপ্রেস দ্বীপ, লোহিত সমুদ্রের প্রান্তে এডেন ইংরাজ-সতর্কতার পরিচয়স্থল। এডেন ভারতসমুদ্রপথে প্রবেশ করিবার প্রথম পদনিক্ষেপস্থান। এইখানে ইংরাজ একটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে। এডেনের অনতিদূরবর্তী সাকোট্রা দ্বীপ ইংরাজের আশ্রিত এবং এডেনের পূর্ব দিকে ওমান হইতে মস্কট ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত আরবের সমস্ত উপকূল ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজের জাহাজ সেখানকার সামুদ্রিক পুলিসের কাজ করে এবং আরব নায়কগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ইংরাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার উপর আবার ইজিপ্টের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি। সেটা পাইলে ইংরাজের রাজপথ আরও পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার প্রতি সমস্ত য়ুরোপের সমান টান থাকাতে ইংরাজের তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, ভারতের রাজলক্ষ্মীকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজের দূরদর্শিতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এমন আটেঘাটে বন্ধন, এমন অন্তরে বাহিরে পাহারা, এমন ছোটো বড়ো সমস্ত ছিদ্রাবরোধ কোনো আসিয়িক চক্রবর্তীর কল্পনাতেও উদয় হইতে পারিত না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

বিখ্যাত রণসংবাদদাতা আর্চিবল্‌ড্‌ ফর্বস্‌ কয়েক সংখ্যক নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরিতে অনেকগুলি রণক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের সময় জর্মান সৈন্য যখন প্যারিস নগরী অবরোধ করিয়াছিল তখন অবরুদ্ধ পুরীর মধ্যে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিসমার্ক উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, প্যারিস আপন রসে আপনি সিদ্ধ হইতেছে। ঘোড়া কুকুর খাইয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন প্যারিস আপনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। রাজপথে আলো নাই, গ্যাস নির্মাণ করিবার কয়লার অভাব, হোটেলে হাসপাতাল, আহারের দোকান বন্ধ, বাণিজ্যের চলাচল রহিত, পথে কেবল সারি সারি মৃতদেহ-বাহক চলিয়াছে, অধিবাসীগণ ক্ষুধায় শীর্ণ এবং অনেকেই খঞ্জ ও অঙ্গহীন। যুদ্ধাবসানে দানব্রত-ইংরাজ প্যারিসে অন্নছত্র স্থাপন করিল। কিন্তু মানী লোকেরা বরঞ্চ মরিতে পারে কিন্তু দানগ্রহণ করিতে পারে না। লেখক বলিতেছেন, বিশেষত স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে অভিমান অত্যন্ত প্রবল। হয়তো খবর পাওয়া গেল, দুই জন স্ত্রীলোক অমুক বাসায় উপবাসে দিনযাপন করিতেছে। বার্তা লইতে গেলেই তাহারা মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া বসে, বলে, 'ইংরাজ অতিশয় দয়ালু জাতি এবং ঈশ্বর তাহাদের কল্যাণ করুন। উপরের তলায় কতকগুলি দরিদ্র বেচারা আছে বটে, তাহারা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাও, সেজন্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু না, আমরা দানগ্রহণ করিতে পারিব না।' এই বলিয়া সেই জ্যোতির্হীন নেত্র কোটরাবিষ্ট কপোল শীর্ণ রমণী ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

স্ত্রী-মজুর

কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে। কল-কারখানা য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড অংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহার অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তৃত

হইতেছে। পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কল-কারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তাহার ভার সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়োই শক্ত, কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরী সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে বিশেষ কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া, পূর্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণে বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সেজন্য পুরুষ কারিগরেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল চরকা কাটা প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে, অথচ কাজের আবশ্যক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য স্ত্রীলোক এবং বালকও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরী কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটো-একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসি লেখক জুল্ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুরদিগের বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে যে, ইহাতে করিয়া সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাছাড়া কারখানাওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশুসহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনও সমান তেজে চলিতেছে। কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়। বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-মজুরদের খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন চারি দিক হইতে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হয়। সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক বারো ঘণ্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘণ্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাস করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, স্ত্রী-মজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ করা এবং প্রসবের দুই-তিন দিন পরেই বারো ঘণ্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই-সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্‌ণ সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড়ো সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে!

লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে, পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তানপালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই— জিনিসপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশি?

প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার

য়ুরোপের মধ্যযুগে যখন এক সময় বিদ্যার আদর সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থের অন্বেষণ পড়িয়া যায়। বহু চেষ্টায় ধর্মমন্দিরস্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণকার্য এখনও চলিতেছে। কাজটা কীরূপ অসামান্য যত্নসাধ্য তাহা নভেম্বর মাসীয় 'লেজার আওয়ার' পত্রের প্রবন্ধবিশেষ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বাহির হইতে পারে তাহা বোধ করি একপ্রকার সমাধা হইয়াছে। কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। কেবল বসিয়া বসিয়া পুঁথি বাছা বিস্তর ধৈর্যসাধ্য, তাহা ছাড়া আর একটা বড়ো কঠিন কাজ আছে। পুরাকালে লিপিকরগণ অনেক সময়ে একটা পুঁথির অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর আর একটা গ্রন্থ লিখিতেন। বহুকষ্টে সেই মোছা অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপ এক-একখানি পুঁথি লইয়া এক-এক পণ্ডিত বিস্তর চেষ্টায় গুটিকতক লুপ্তপ্রায় দাঁড়ি কষি বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আবার আর এক পণ্ডিত দ্বিগুণতর ধৈর্যসহকারে তাহাতে আরও গুটিকতক যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

নেপল্‌সের নিকটবর্তী ক্ষেত্র খনন করিয়া হর্ক্যুলেনিয়ম্‌ নামক একটি প্রাচীন নগর ভূগর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে সেকালের এক পুস্তকালয় বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সহস্র সহস্র পুঁথি একেবারে কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহার কতকগুলি পুঁথি অসামান্য যত্নে অতি ধীরে ধীরে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো বিশেষ ভালো বহি এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

উত্তর ইজিপ্টের মরুমৃত্তিকা এত শুষ্ক যে তাহার মধ্যে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। কাগজ সূতা বস্ত্র পাতা প্রভৃতি দ্রব্যও তিন সহস্র বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে— যেন তাহা সপ্তাহখানেক পূর্বে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইলিয়াড্‌ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মৃতদেহের সহিত একত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন প্রাচীন ইজিপ্টীয়গণ বিশেষ উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা কাগজ দিয়া এই মৃতদেহের আবরণ প্রস্তুত করিতেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছেঁড়া কাগজ। মাঝে মাঝে আস্ত কাগজও পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যখণ্ড, দানপত্র, হিসাব, খৎ, চিঠি এই উপায়ে হস্তগত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্বেকার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-ভরসা, কত বৈষয়িক বিবাদ-বিসম্বাদ, দর-দাম, মামলা-মোকদ্দমা আজ বিস্মৃত মৃতদেহ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? কিন্তু কাহার সেদিকে দৃষ্টি আছে? যে বিদেশীরা আমাদের খনি খুঁড়িয়া সোনা তুলিতেছে,

মাটি চষিয়া নব নব পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারাই পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদেরই কৃত তর্জমা পড়িয়া আমরা এক-একজন আর্য দিগ্‌গজ হইয়া উঠিতেছি এবং মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।

ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্

য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসি পণ্ডিত রেনাঁ বলিতেছেন, বর্তমানকালে, এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্য দিকে সভ্যতার সমস্ত সুখ-সম্পদ সাধারণের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ব বিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে, এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এইজন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

এতকাল এই সোশ্যালিজ্‌ম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচরস্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত করিতেছে।

ইহাতে সোশ্যালিজ্‌মের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান-ক্যাথলিকমণ্ডলীর অধিপতি পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসি মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ী টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্‌মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার 'পরে কখনোই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

আমেরিকানের রক্তপিপাসা

বিখ্যাত আমেরিকান কবি লোয়েল তাঁহার কোনো কবিতায় লিখিয়াছেন, আমেরিকার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত এই সমগ্র বৃহৎ জাতি রক্তের গন্ধ ভালোবাসে। একজন ইংরাজ লেখক নবেম্বর মাসের 'কন্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রিকায় এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা কখনো আমেরিকায় পদার্পণ করে নাই, বহি পড়িয়া আমেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না আমেরিকায় জীবনের মূল্য কত যৎসামান্য এবং

সেখানকার লোকেরা খুন অপরাধকে কত তুচ্ছ মনে করে। প্রথমত, সকল দেশেই যে-সকল কারণে কম-বেশি খুন হইয়া থাকে আমেরিকাতেও তাহা আছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকাংশ লোকেই অস্ত্র বহন করিয়া বেড়ায় এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। কালিফর্নিয়া বিভাগের সুপ্রীমকোর্টের এক জজ রেলোয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে বসিয়াছেন, আদালতের আর-একটি উচ্চ কর্মচারী তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইতিমধ্যে এক বারিস্টার পূর্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া জজের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেন, এমন-কি, তাঁহার গায়েও হাত তোলেন। অন্য কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুড়িয়া বারিস্টারকে বধ করিলেন, এমন-কি, সে মরিয়া পড়িয়া গেলেও তাহাকে আর এক গুলি মারিলেন। বারিস্টারের স্ত্রী চিৎকার করিয়া গাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাল অনুসন্ধান করিয়া একটি পিস্তল বাহির করিলেন। জুরিরা তাহাই দেখিয়া অপরাধীকে খালাস দিল; কারণ এই পিস্তল দিয়া জজকে খুন করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। সকলেই এই আইনের, এই বিচারের, এই কর্মচারীর সতর্কতার বিস্তর প্রশংসা করিল। পুলিসের হাতেও সর্বদা অস্ত্র থাকে এবং তাহাদের দ্বারা শত শত অন্যায় খুন ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্ক শহরে একজন পুলিসম্যান খবর পাইল একজন চোর অমুক রাস্তা দিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, একজন লোক কোনো বাড়ির সিঁড়ির উপর ঘুমাইতেছিল, গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। পুলিসম্যান তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি দৈবাৎ তাহাকে না লাগিয়া পথের অপর প্রান্তে আর-একজন পথিককে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। অবশেষে পলাতক ধরা পড়িলে জানা গেল তাহার কোনো অপরাধ ছিল না; সে কেবল ভয়ে দৌড় দিয়াছিল। বিচারে স্থির হইল পুলিসম্যান তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছিল। যে দেশের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা, পুলিসের এইরূপ ব্যবহার, সে দেশের সাধারণ লোকেরাও যে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনোরূপ সংযম অভ্যাস করে না, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দেশের সর্বত্রই পরিবারগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত বিবাদ, এমন-কি, অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য বচসাতেই খুনাখুনি ঘটিয়া থাকে। প্রায় মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে, পথে, কর্মস্থানে অথবা সভাস্থলে দুই বিপক্ষে সাক্ষাৎ হইল, কেহ কোনো কথা না বলিয়া পরস্পরের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল, একজন অথবা দুইজনেই মরিয়া পড়িয়া গেল। কেবল ছোটোলোকের মধ্যে নহে, শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক ভদ্র খুনী সমাজের মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিতেছে; তাহারাও নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত নহে, তাহাদের বন্ধু এবং সমাজও তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব করে না।

আমেরিকায় বালকে, এমন-কি, স্ত্রীলোকেও অনেক খুন করিয়া থাকে। লেখক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন, দেখিলেন, একজন ভদ্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আর একজন ফিট্‌ফাট্‌ কাপড় পরা ভদ্রলোক যেমন দাঁড়াইল, অমনি দুই-এক কথার পরেই স্ত্রীলোকটি এক পিস্তল বাহির করিয়া সম্মুখবর্তী লোকটির প্রতি পরে পরে তিন-চারটি গুলি চালাইয়া দিল, লোকটা রাস্তায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। লেখক খবরের কাগজ পড়িয়া জানিলেন, মৃত ব্যক্তিটি বিখ্যাত দালাল; তাহার নিকটে কোনো সূত্রে স্ত্রীলোকটির টাকা পাওনা ছিল কিন্তু আইনের দ্বারা বাধ্য করিবার কোনো উপায় না পাইয়া খুন করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটায়। মেয়েটির সাহস এবং তাহার চমৎকার লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে। আমেরিকার এরূপ স্ত্রীলোকের বিশেষ সমাদর আছে। পুরুষেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, যে রমণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শয়তানের অংশ নাই, তাহার এক কড়াও মূল্য নাই।

ইহা ছাড়া বিনা দোষে কালা আদমি খুনের যে দুটা-চারটা দৃষ্টান্ত লেখক প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের পাঠকদের জন্য তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

লেখক আমেরিকান জাতীয় চরিত্রগত এই বর্বরতার যে একটি প্রধান কারণ নির্দেশ

করিয়াছেন তাহা বিশেষ অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়াছে। দাসদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলে ন্যায়ান্যায় বোধ হ্রাস হইয়া মনুষ্যত্বের সংযম দূর হয়। অবশেষে চরিত্রের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিতে থাকে।

আমাদের বিবেচনায় লেখক একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। এককালে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি নির্দয় উপদ্রবও যে এই চরিত্রগত পশুত্বের একটি মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে অপ্রতিহত পশুবলচালনার স্থান, সেখানেই মানুষের ভয়ানক বিপদ। স্বার্থ অথবা আত্মগৌরবের অনুরোধে নিরুপায়ের প্রতি আপনার কর্তৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া নিজেরই অমূল্যধন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ম্লান হইয়া আসে। ভারতশাসন ভারতবাসীদের পক্ষে যেমনই হউক ইংরাজের পক্ষে সুশিক্ষার কারণ নহে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে একটি অনুরাগহীন অবহেলার ভাব সহজেই উদয় হইতেছে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ অল্পে অল্পে অবনত হইতেছে সন্দেহ নাই। ফিট্‌জ্‌জেমস্‌ স্টীফন্‌, স্যার লেপেল গ্রিফিন প্রভৃতি অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের রচনায় একপ্রকার কঠিন নিষ্ঠুরতা, একটা নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা যায়, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে অসীম ক্ষমতা-মদিরার স্বাদ পাইয়া তাঁহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা বিষ আছে; যখন এক জাতি আর-এক জাতিকে আহার করিতে বসে তখন ভক্ষ্য জাতি মরে এবং ভক্ষক জাতির শরীরেও বিষ প্রবেশ করে। আমেরিকানদের রক্তের মধ্যে বিষ গেছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

উন্নতি

দিনেমার দার্শনিক হারাল্‌ড্‌ হ্যফ্‌ডিং জুলাই মাসের 'মনিস্ট্‌' পত্রিকায় মঙ্গলের মূলতত্ত্ব নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে অংশ ভারতবর্ষীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অবধানের যোগ্য, আমরা সংকলিত করিয়া দিলাম।

যে-সকল জীবের চিত্তবৃত্তি নিতান্ত আদিম অবস্থায় আছে তাহাদের পরিবর্তন সহজে ঘটে না। তাহাদের জীবনধারণের সামান্য অভাবগুলি যতদিন পূরণ হইতে থাকে ততদিন তাহারা একভাবেই থাকে। ইনফ্যুসোরিয়া, রিজোপড্‌ প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর জন্তুগণের আজও যে দশা, যুগ-যুগান্তর পূর্বেও অবিকল সেই দশা ছিল। তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত বাহ্য অবস্থার এমনি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যে, কোনোরূপ পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটে না। মনুষ্যের মধ্যেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারি দিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে তাহাদিগকে পরিবর্তন এবং উন্নতির দিকে প্রবর্তিত করিবার কোনোরূপ উত্তেজনা থাকে না। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংকীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে থাকে। জটিল এবং বিচিত্র অবস্থাপন্ন মানবদের অপেক্ষা ইহাদের সুখ-সন্তোষ অনেকটা সম্পূর্ণ এবং অবিমিশ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছোটো পাত্র বড়ো পাত্র অপেক্ষা ঢের কম জলে ঢের বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

তবে তো সেই ছোটো পাত্র হওয়াই সুবিধা। জীবনের কেবল কতকগুলি একান্ত আবশ্যক পূরণ করিয়া হৃদয়ের কেবল কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নির্বিকার শান্তি লাভ করাই তো ভালো। ফ্যুজিদ্বীপবাসীরা তো বেশ আছে— দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীরা বন্যজীবনের মধ্যে তো চিরকাল সমভাবেই কাটাইয়াছিল, সভ্যতার নব নব অশান্তি এবং বিপ্লবের কোনো ধার তাহারা ধারে না।

কিন্তু সে আক্ষেপ এখন করা বৃথা। সভ্য জাতিদের পক্ষে এরূপ জীবনযাত্রা নিতান্ত অসহ্য। তাহার কারণ, সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার নাম কাজ করিবার ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছা। এক কথায়, তাহাকে অসন্তোষ বলা যাইতে পারে। এ মনোবৃত্তি সকল জাতির সকল অবস্থায় থাকে না।

প্রথম প্রথম বাহিরের তাড়ায় মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে, কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয়; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে। তখন মানুষ বাহিরের শাসন হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করে; বাহ্য অভাব মোচন হইলেও অন্তরের সেই নবজাগ্রত শক্তি বিশ্রাম করিতে চাহে না, তখন নব নব উন্নত আদর্শের সৃষ্টি হইতে থাকে; তখন হইতে আমাদের পক্ষে নির্জীব নিস্পন্দভাবে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং তাহাতে আমরা যথার্থ সুখও পাই না।

জাতীয় আত্মরক্ষার পক্ষে এই প্রবৃত্তির একটা উপযোগিতা আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব কোথাও নাই। তোমার অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বে যদি বা পরিবর্তন তেমন খরস্রোতে প্রবাহিত না হয় তথাপি অনতিদূরে কোনো-না-কোনো জাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতেছেই, সুতরাং কোনো-না-কোনো সময়ে তাহাদের সহিত জীবিকাযুদ্ধের সংঘর্ষ অনিবার্য। সে সময়ে, যাহারা বহুকাল স্থিরভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আছে তাহাদের পক্ষে নূতন আপৎপাতের বিরুদ্ধে নূতন পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না; যাহারা কর্মানুরাগী উদ্যোগী জাতি তাহারাই পরিবর্তনে অভ্যস্ত এবং সকল সময়েই প্রস্তুত, সুতরাং এই চঞ্চল সংসারে টিকিবার সম্ভাবনা তাহাদেরই সব চেয়ে বেশি।

কেবল জাতি নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ নিহিত করিয়া সুখী হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখা যায়, ঘরের আদুরে ছেলে হইয়া চিরকাল খোকা হইয়া থাকার অনেক সুবিধা থাকিতে পারে; কিন্তু চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়া চলে না, এক সময়ে কঠিন সংসারের সংস্রবে আসিতে হয় তখন নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতা লাভ অপেক্ষা বৃহৎ বিকাশের উদ্যম ভালো।

উন্নতি বলিতে সর্বকামনার পর্যবসানরূপিণী একটা নির্বিকার নিরুদ্যম অবস্থা বুঝায় না। ভবিষ্যতের নব নব মঙ্গল সম্ভাবনার জন্য নব নব শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলাই উন্নতি। সেই-সমস্ত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমাগত নূতন নূতন উদ্দেশ্যের পশ্চাতে নূতন নূতন চেষ্টা ধাবিত হইতে থাকে। সেইসঙ্গে কেবল উদ্যমেই কার্যে বিকাশেই একটা সুখ জাগ্রত হইয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতির পরিচালনাতেই একটা গভীর আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দে সভ্য জাতিরা এমন সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে পারে যাহার পেষণে অসভ্য জাতিরা মারা পড়ে। এই যে একটি স্বতন্ত্র উন্নতির প্রবৃত্তি, এই যে কর্মের প্রতিই একটা স্বতন্ত্র অনুরাগ, ইহা লইয়াই সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

সুখ দুঃখ

যাহারা রীতিমতো বাঁচিতে চাহে, মুমূর্ষুভাবে কালযাপন করিতে চাহে না, তাহারা দুঃখ দিয়াও সুখ কেনে। হাফ্‌ডিং বলেন ভালোবাসা ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। ভালোবাসাকে সুখ বলিবে না দুঃখ বলিবে? গেটে তাঁহার কোনো নাটকের নায়িকাকে বলাইয়াছেন যে, ভালোবাসায়

কভু স্বর্গে তোলে, কভু হানে মৃত্যুবাণ।

অতএব সহজেই মনে হইতে পারে এ ল্যাঠায় আবশ্যক কী? কিন্তু এখনও গানটা শেষ হয় নাই। সুখ দুঃখ সমস্ত হিসাব করিয়া শেষ কথাটা এইরূপ বলা হইয়াছে—

সেই শুধু সুখী, ভালোবাসে যার প্রাণ।

ইহার মর্ম কথাটা এই যে, ভালোবাসায় হৃদয় মন যে একটা গতি প্রাপ্ত হয় তাহাতেই এমন একটা গভীর এবং উদার পরিতৃপ্তি আছে যে, প্রবল বেগে সুখ-দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াও মোটের উপর সুখের ভাবই থাকিয়া যায়, এমন-কি, এই আন্দোলনে সুখ বল প্রাপ্ত হয়।[১]

এই সুখের সহিত দুইটি মানসিক কারণ লিপ্ত আছে। প্রথমত, দুঃখ যে পর্যন্ত একটা বিশেষ সীমা না লঙ্ঘন করে সে পর্যন্ত সুখের পশ্চাতে থাকিয়া সুখকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। এই কারণে, যাহারা সুখের গাঢ়তাকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করে তাহারা অবিমিশ্র সামান্য সুখের অপেক্ষা দুঃখমিশ্রিত গভীর সুখের জন্য অধিকতর সচেষ্ট। দ্বিতীয়ত, দুঃখেরই একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ, দুঃখের দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা প্রবল বেগ, সমস্ত প্রকৃতির একটা একাগ্র পরিচালনা উপস্থিত হয় তাহাতেই একটা বিশেষ পরিতৃপ্তি আছে। ক্ষমতার চালনামাত্রই নিতান্ত অপরিমিত না হইলে একটা আনন্দ দান করে। বিখ্যাত দার্শনিক ওগুস্ত্ কোঁৎ তাঁহার প্রণয়িনীর মৃত্যুর পরে এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমি মরিবার পূর্বে মনুষ্যপ্রকৃতির সর্বোচ্চ মনোভাব যে অনুভব করিতে পারিয়াছি সে কেবল তোমারই প্রসাদে। এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যত কিছু কঠিনতম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি সেইসঙ্গে এ কথা সর্বদাই মনে উদয় হইয়াছে যে, হৃদয়কে পরিপূর্ণ করাই সুখের একমাত্র উপায়, তা সে যদি দুঃখ দিয়া তীব্রতম যন্ত্রণা দিয়া হয় সেও স্বীকার।'— আমরা যদি দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে চাই তবে কিছুতেই ভালোবাসিতে পারি না। কিন্তু ভালোবাসাই যদি সর্বোচ্চ সুখ হয় তবে দুঃখের ভয়ে কে তাহাকে ত্যাগ করিবে! কর্মানুষ্ঠানের প্রবলতা ও জীবনের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর ব্যয়, মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং অবিশ্রাম আন্দোলন আছেই। কিন্তু জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদগুলি বিনামূল্যে কে প্রত্যাশা করে!

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের কথা উপরে প্রকাশিত হইল এখন কবি চণ্ডিদাসের দুটি কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। রাধিকা যখন অসহ্য বেদনায় বলিতেছেন—

'বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ'

তখন—

চণ্ডীদাস কয় 'এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!'

দুঃখই যদি গেল তবে সুখ কিসের!

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

সোশ্যালিজম্

বিলাতি খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যালিজম্ মতটা কী তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।

---

১. বলা আবশ্যক, এ-সকল কথা বলিষ্ঠ এবং মহৎহৃদয় লোকদের কথা। যাহারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র তাহারা এত দুঃখ এবং এত সুখ সহিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে দুঃখের পরিণামই অধিক হইয়া পড়ে। এইজন্য তাহারা বলিয়া থাকে, আমার সুখে কাজ নাই দুঃখেও কাজ নাই আমি স্বস্তি পাইলেই বাঁচি।

সোশ্যালিস্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে; এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এ স্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্ ব্যাক্স্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সংকলন করিয়া দিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে ইংলন্ডে যাঁহারা কোনো কোনো প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের বর্তমান মতাবলম্বীদিগকে 'লিবারাল্' কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিস্টদিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই 'লিবারালিজম্' বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থসঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারাল্‌দের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজম্ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্মচ্যুত প্রাচীন কারিকরের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারিকর অনেকটা নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারিকরের নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

স্যোশ্যালিস্ট্‌রা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে করো। সোশ্যালিস্ট বিধানমতে কোনো এক লোকের উপর সরকারি রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমসলা যোগ করিয়া তাহার কোনো লাভ নাই— কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না— সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোনো লাভ নাই এবং ভালো রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভালো রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত সস্তায় কাজ করিতে পারে— অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিসটা ভালো করিবার দিকে তাহার কোনো দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, অতএব নির্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য

সোশ্যালিস্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেইজন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক— কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে যে, উদ্দেশ্য যাহাই হউক ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামতো আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখনো সমাজ টিকিতে পারে না, অতএব একটা কোনোরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনোরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনাসংগত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংস্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স্‌সাহেব বলেন, আদিমকালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল, সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়; ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এখন প্রত্যেকে বড়ো হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ— প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

প্রাচীন শূন্যবাদ

মায়ার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশ্যে কীরূপ তর্কের মায়াপাশ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা 'বিনয় সূত্র' নামক কোনো এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্তি আচার্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছুই যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইঁহার উদ্দেশ্য। কী করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন— দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরি-উক্ত বচনে এই কথা মনিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে এ কথা কে বলিল?

কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হি তত্ত্বমেব ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি যদাত্মানং কথং দ্রক্ষ্যতি তৎ পরান্।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে

অন্যকে কী করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। 'তস্মান্নাস্তি দর্শনং।'

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

'যদ্যপি স্বাত্মানং দর্শনং ন পশ্যতি, তথাপি অগ্নিবৎ পরান্ দ্রক্ষ্যতি। তথাহি অগ্নি পরাত্মানমেব দহতি ন স্বাত্মানং এবং দর্শনং পরানেব দ্রক্ষ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।
অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না— ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তরদাতা বলেন— এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

কারণ,

ন পর্যাপ্তোহগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
সদর্শনঃ স প্রত্যুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শন প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

'গম্যমানগতাগত' বলিতে কী বুঝায় সেটা একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'গতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং এবং অগ্নিনাপি দগ্ধং ন দহ্যতে নাদগ্ধং দহ্যতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে তাবদদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।'
অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কই? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দাহ হইল কই? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নহে অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই, যাহা হইয়া গেছে তাহা তো চুকিয়াই গেছে, যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে মাত্র তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

'এবং দর্শনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অগ্নিদৃষ্টান্তেন সহ গম্যমানগতাগতৈর্যস্মাৎ সমং দূষণং অতোহগ্নিবদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ন যুজ্যতে।'

তবেই তো এক 'গম্যমানগতাগতে'র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত অসিদ্ধ হইয়া গেল। সিদ্ধ হইল কী?

'ততশ্চ সিদ্ধমেতৎ স্বাত্মবদ্দর্শনং পরানপি ন পশ্যতীতি।'
অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পরকেও দেখিতে পায় না।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৯

পরিবারাশ্রম

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র শহর আছে। সেখানে আজ চোদ্দ বৎসর হইল গোডাঁ সাহেব নূতন ধরনে এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্মাতা একটি কর্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কী উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্ধক্য প্রভৃতি

অনিবার্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টার ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানত লোহার উনান, অগ্নিকুণ্ড, ইমারৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেনশন নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে-কেহ ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে গোড্যাঁ সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জিত ধনের অর্ধেক, অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌন্ড এই কারখানায় দান করিয়া যান। শর্ত এই থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাবসকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, এমন-কি, সর্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য জোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে-সকল আমোদ-আহ্লাদের আবশ্যক, তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্যন্ত না কাজে নিযুক্ত হয় সে পর্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

কর্মশালার নিকটেই মজুরদের বাসা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানায় শ্রমজীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে, যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পারে এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন : ১. পানদোষ; ২. বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা; ৩. গর্হিত আচরণ; ৪. শ্রমবিমুখতা; ৫. নিয়মের অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা; ৬. সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াকড়। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, এবং কাজ করিতে করিতে গুনগুনস্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, কসাইখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন থাকিবে।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহে পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে-সকল কু-প্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয় সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই। প্রথমত সকলকেই কাজ করিতে হয় এবং প্রত্যেকে

আপন কার্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও কর্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহারে সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পরিবারাশ্রমের সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমন-কি, আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্রবাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

মানুষসৃষ্টি

জুন মাসের 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রিকায় বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যান্‌লি সাহেব মধ্য-আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এক সময় পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তু ছিল না, কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়োগোছের ব্যাঙ ছিল। আর আকাশে ছিল চাঁদ। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, দেখো ব্যাঙ, মনে করিতেছি পৃথিবীর ফলশস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী নির্মাণ করিব।

ব্যাঙ কহিল, আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালোরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।

চাঁদ কহিল, আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে শক্তি নাই।

ব্যাঙ কহিল, ভাই, তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাকো-না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্তব্য কার্য।

অতঃপর ব্যাঙ ভাবাবেশে ক্রমশ স্ফীত হইয়া একজোড়া পূর্ণতা-প্রাপ্ত নরনারীকে জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ কী কাণ্ড করিয়াছ? এই যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ ইহাদের না আছে বুদ্ধি না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহাদিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাঙটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষ দুটোকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, ইতস্তত টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। এবং পুরুষের নাম দিল বাটেটা এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখো, এই তৃণলতা তরুগুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজেরা ভালোমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। এবং তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম ইহাকে রক্ষা করিবে এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।

এই শিক্ষা দিয়া এবং রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড়ো খুশি হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধ হয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল— হে চাঁদ, আমি তো আমার স্ত্রীর পছন্দমতো কোনো খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না, একটা উপায় বলিয়া দাও!

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, দেখো দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে?

বাটেটা কহিল, বাঃ অতি চমৎকার!

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, খাইয়া দেখো দেখি কেমন বোধ হয়?

সে খাইয়া মহা খুশি হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড়ো পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, জিনিসটি উত্তম কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইলে চাঁদ কহিল, দেখো দেখি ওই কী যায়?

বাটেটা কহিল, ও তো মহিষ।

চাঁদ বলিল— ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কী যায়?

বাটেটা কহিল— ছাগল।

চাঁদ কহিল— আচ্ছা। তাহার পশ্চাতে কী বল দেখি!

বাটেটা কহিল— হরিণ।

চাঁদ কহিল— অতি উত্তম। তাহার পরে?

বাটেটা— ভেড়া।

চাঁদ— ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কী উড়িতেছে দেখো দেখি!

বাটেটা— মুরগি এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল— বেশ বলিয়াছ। তা, এই-সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহারই মাংস স্ত্রীকে রাঁধিয়া খাওয়াও।

এইভাবে সময় যায়। আদি-দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে মস্ত একটা আগুনের চাকার মতো আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, বাটেটা এ কি হইল?

বাটেটা কহিল, চাঁদকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তো বলিতে পারি না। এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল— রোসো, আগে এই নূতন আলোকটা নিবিয়া যাক তার পরে কথাবার্তা হইবে।

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য এবং রাত্রে আমি এবং আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিবে। এ নিয়মের কোনো কালে লঙ্ঘন হইবে না। এবং যেহেতু তোমরা সর্বপ্রথম প্রাণী তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাঙটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। সবশেষে কহিল, যে পর্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যকমতো তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না— কিন্তু তোমাদের অবর্তমানে মানুষের সহিত আলাপ পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা-কিছু শিখিবে ছেলেদের শিখাইয়া দিয়ো।

মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোল্যুশন থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ; কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনও তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্প চূর্ণ করে।

জিব্রল্টার বর্জন

গ্যাম্বিয়র সাহেব বলিতেছেন, ইংরাজ জিব্রল্টারের উপর দুর্গ ফাঁদিয়া ভারতবর্ষের পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে তাহার পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, যুদ্ধের সময় যদি সুয়েজখালের পথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে জিব্রল্টার দুর্গের উপযোগিতা থাকে; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, রুশিয়া প্রভৃতি কোনো য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ইজিপ্ট কোনো পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজকে খালের পথে প্রবেশ করিতে দিবে না। ফ্রান্স [ফরাসি] এবং রুশিরা যদি কখনো একত্র মিলিত হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে তবে তুরস্কের অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকার ইংরাজের নাই, কারণ, ইংরাজ সেখানে অতিথি মাত্র। অতএব বিপদের সময় সুয়েজপথের কোনো মূল্য দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে। লেখক বলেন, জিব্রল্টার প্রণালী দিয়া অন্য য়ুরোপীয় সৈন্যপ্রবেশ প্রতিহত করা সহজ নহে, কারণ, প্রণালীটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের যোগসাধন করিয়া ফ্রান্স যে খাল খনন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাধা হইলে জিব্রাল্টরের কোনো মূল্যই থাকে না।

আরও একটা কথা আছে। সুয়েজখাল বালির মধ্য দিয়া একটা সামান্য নালা মাত্র। সের দেড়েক ডাইনামাইট লাগাইলেই তাহাকে ধ্বংস করা যায় এবং একটা জাহাজ যদি ইঁট ও লোহার রেলে বোঝাই পূর্বক আড় করিয়া মাঝখানে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই পথ বন্ধ।

লেখক বলেন, ভূমধ্যসাগরের পথ ছাড়িয়া ইংলন্ড যদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ ঘুরাইয়া লন তাহা হইলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকে না। তাহা হইলে য়ুরোপের সহিত আর কোনো সংস্রবই থাকে না, সমস্ত পথ খোলসা পাওয়া যায়।

লেখক প্রস্তাব করেন, স্পেনকে জিব্রল্টার ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্তে তাহার নিকট হইতে ক্যানারি দ্বীপ লওয়া হউক। সেখানে পথের মধ্যে দিব্য একটি দুর্গ ফাঁদিয়া বেশ শক্ত হইয়া বসা যায় এবং জাহাজ মেরামত, কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামতো আড্ডা হয়।

পর্টুগালের নিকট হইতে ম্যাডেরা দ্বীপটাও পাঁচরকম প্রলোভন দ্বারা জোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইজিপ্টের দখল ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে ম্যাডাগাস্কর চাহিয়া লইলে ফ্রান্স নারাজ হইবে না।

তাহার পর ইংলন্ড হইতে বুক ফুলাইয়া ধূমোদ্গার করিয়া রণতরী ছাড়িবে এবং অবাধে সমস্ত আটলান্টিক কর্ষণ করিয়া ভারতসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ভারতবর্ষের ঘাটে আসিয়া লাগিবে; য়ুরোপের চোখরাঙানিকে আর কিছুমাত্র কেয়ার করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলন্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

পলিটিক্স্‌

আমাদের জাতীয় প্রজাসমিতি বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়েব এবং হিন্দুহিতৈষিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্ট স্ব স্ব বক্তৃতাস্থলে পলিটিক্সের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবি বেসেন্টের মতে পলিটিক্স্‌ ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ঠিক মিশ খায় না। চিন্তা করা, শিক্ষাদান করা এবং কার্যসাধন করা এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটি মহত্তর কার্যই ভারতবর্ষকে শোভা পায়, শেষোক্ত কার্যটা পলিটিক্সের অঙ্গ এবং তাহা ভারতবর্ষীয়ের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত হয় না।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অট্টালিকাকে আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে মাটির মধ্যে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যদি কেহ মনে করেন অট্টালিকার যতটুকু মাটির মধ্যে প্রোথিত হইল সেটা অপব্যয় হইল, সেটাকে উচ্চে যোগ করিয়া দিলে অট্টালিকা আরও উচ্চতর হইতে পারিত তবে তাঁহাকে উন্নতির স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শক্তিপরম্পরার মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। যে জাতি কেবল চিন্তা ক'রে কার্য করে না তাহার চিন্তাশক্তি ক্রমশ বিকৃত হইয়া যায়; যে জাতি কেবল কার্য করে চিন্তা করে না তাহার কার্যকারিতা নিষ্ফল হইতে থাকে। একটা জাত কেবল চিন্তা করিবে এবং আর-একটা জাত কেবল কার্য করিবে এমন বিভাগের নিয়ম টিকিতে পারে না; কারণ যে যেখানে অসম্পূর্ণতা পোষণ করে সেইখানে আঘাত লাগিয়াই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোনো প্রাণীকে প্রচুর বাঁধা খোরাক দিয়া কেবলমাত্র মেদবৃদ্ধি করিলে তাহার মাংস অন্যের পক্ষে বড়ো উপাদেয় হয় কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের সুবিধা দেখি না; আমরা ঘরে বসিয়া কেবলই চিন্তার খোরাকে পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য মাংসাশী জাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে, এখন বুঝিতেছি শিং নাড়িয়া গুঁতা দিবার শিক্ষাটা আমাদের নিজের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার শিক্ষাই পলিটিক্স্‌ নহে। চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে মনুষ্যসমাজে কার্যে পরিণত করিবার উপায়সাধনও পলিটিক্সের অঙ্গ। এ সম্বন্ধে মি. ওয়েব যাহা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলেন— Politics are amongst the most comprehensive spheres of human activity and none should eventually be excluded from their exercise. There is much that is ludicrous much that is sad, much that is deplorable about them : yet they remain, and ever will remain the most effective field upon which to work for the good of our fellows.

মি. ওয়েব বলেন, রাজনীতির নির্মল ক্ষেত্র নীচ স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে। পরার্থপরতায় ও সর্বসাধারণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গেরই নাম 'পাবলিক লাইফ' বা রাজনীতিকের জীবন। সে জীবন সর্বথা সংস্কৃত, সংযত ও সমুন্নত থাকা প্রয়োজন। যতই ক্ষুদ্র, যতই নিম্ন ও অবনত, অবমানিত ও ঘৃণিত হউক, জাতি বর্ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যাধিকার আছে, ফলত অবনতকে উন্নত ও পদদলিতকে মনুষ্যত্বের স্বত্ব ও দায়িত্বাধিকার প্রদান করাই উচ্চ রাজনীতি।

ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসির অনাবিল অংশ। ইহাই 'উচ্চতর পলিটিক্স্‌'। এবারকার কংগ্রেস সভাপতি অত্যল্প মাত্র মাত্রায় আমাদিগকে ইহারই আভাস দিয়াছিলেন।

পরন্তু বিবি বেসেন্ট বলেন পুরাতন সমাজের বনিয়াদ প্রথমত এবং প্রধানত মনুষ্যের কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্য পরিচালনের উপকরণেই গঠিত হইয়াছিল; তাহার পর মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটি সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় মনুষ্যের কর্তব্যপরায়ণতাই সমাজ সংরক্ষণার্থে প্রচুর; উহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার রক্ষণচেষ্টার সংযোগ শুভদায়ক নহে। অতএব পলিটিক্স্ কেবল কর্তব্যাবধারণ, পরিচালন ও শাসনেই পর্যবসিত হওয়া উচিত; স্বত্বাধিকার বলিয়া যে সামগ্রীটি উপরপড়া হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা মনুষ্যসমাজের সীমানার মধ্যেই না থাকা ভালো। বলা বাহুল্য বিবির এই মর্মের উক্তি এবং ইঙ্গিত, তাঁহার প্রতি আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আমরা আদৌ অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নই। তিনি নিজেই অনতিকালপূর্বে, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারের সমূহ পক্ষপাতিনী এবং অগ্রগণ্যা পরিচালিকা ও প্রচারিকা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের ভাগ্যদোষেই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার পূর্বপ্রচারিত পবিত্র মত প্রত্যাহার করিতেছেন। কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্যপালনের মাহাত্ম্য অবিসম্বাদিত। উহা সমাজের, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি, আদি উপাদান; তাহাতে কিছু মাত্র-সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুভব করিয়া কর্তব্যপালন, বোধ হয়, কেবল মানবধর্ম-যুক্ত জীব মানুষেই করে; পশু, পতঙ্গ, কীটাণুকীটে মনুষ্যোচিত উচ্চতর কর্তব্যপালন করে না; তাহাদের মধ্যে কর্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্তি হওয়াই সম্ভবে না। মনুষ্য জানে সে মানুষ; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সুতরাং কর্তব্যপালনের দায়িত্ব তাহার আছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক স্বত্বাধিকারের সঙ্গেই দায়িত্ব সংযুক্ত। মনুষ্য যে-সকল স্থলে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত, তথায় তাহার কর্তব্যজ্ঞান পশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার আশা করা যায় না। ফলত মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারজনিত দায়িত্ব হইতেই প্রধানত তাহার কর্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। যে স্থানে সে দায়িত্বের অভাব, সে স্থলে কর্তব্যজ্ঞানের অনটন অবশ্যম্ভব। পরন্তু, মনুষ্যত্বের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে তৎপর হওয়া নিজেই মানবধর্মের একটি প্রধান কর্তব্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতে চিন্তা করিত এবং শিক্ষাদান করিত তাহার কি কেবল কর্তব্যজ্ঞানই ছিল স্বত্বাধিকার ছিল না? রাজ্যের মধ্যে তাহার কি একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিল না? অপর সাধারণের নিকট তাহার কি কোনোপ্রকার দাবি ছিল না? প্রাচীন ইতিহাসে এমন আভাসও কি পাওয়া যায় না যে, একসময়ে ব্রাহ্মণের স্বত্বাধিকার লইয়া ক্ষত্রিয়দের সহিত তাহার রীতিমতো বিরোধ বাধিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যদি আত্মসম্মান, আপনার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে না পারিত তবে সে কি চিন্তা করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইত? পরন্তু তখন রাজা এবং গুরু, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়া ছিলেন যে, অপর সাধারণের মনুষ্যোচিত অধিকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল— তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা, তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন— ভারতবর্ষের পতনের সেই একটা প্রধান কারণ, এখনকার পলিটিক্সের গতি অনুসারে সর্বসাধারণেই আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই আপন মনুষ্যগৌরব অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের কর্তব্য সাধনে উৎসাহী হইবে। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে আপন খেয়াল অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিবে না, যাহার হাতে শাস্ত্র আছে সে কেবলমাত্র অনুশাসন দ্বারা অন্যের চিন্তা এবং কার্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে না। রাজমন্ত্রীরাও ন্যায়মতে (অর্থাৎ দীনতম ব্যক্তিরও ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া) আইন করিবেন, রাজপুরুষেরাও আইনমতে শাসন করিবেন, গুরুও যুক্তির দ্বারা আপন মত প্রচার করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক আপন স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আপন সাধ্যমতো আপনার উন্নতি এবং সেইসঙ্গে জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্বত্বাধিকার ব্যতীত কর্তব্য অনুভব করা এবং কর্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। স্বত্বাধিকার সংক্ষেপ হইলে কর্তব্যের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

ইংলন্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বৈভববিলাসের বিপন্নতা ও বীভৎস ব্যাপার দেখাইয়া বিবি বেসেন্ট আমাদিগকে পাশ্চাত্য জড়বাদের আপাতমনোহর এবং অত্যন্ত মোহকর আদর্শ পরিবর্জন পূর্বক ভারতীয় প্রাচীনকাল-প্রবর্তিত অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্য দেশেও একেবারে পঞ্চবিংশতি কোটি মহামুনির উদ্ভব সম্ভবপর নহে। যথাসম্ভব লোক আধ্যাত্মিক হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব লোক বাকি থাকিবে। তাহারা যাহাতে আত্মসম্ভ্রম, উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; যাঁহারা না আধ্যাত্মিক না পার্থিব তাঁহাদের মতো শোচনীয় জীব জগতে আর নাই।

পাশ্চাত্যের পাপাদর্শ অতি সাবধানেই পরিবর্জনীয়। কিন্তু পুণ্যাদর্শও যদি সেখানে পাই, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? মিঃ ওয়েব আইরিশম্যান। আইরিশে ইংরেজে স্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের সম্বন্ধটা যে খুব সুমিষ্ট তাহা নহে। সকলেই জানেন যে সম্বন্ধ তীব্র তিক্তরসমিশ্রিত। এতাদৃশ অবস্থায় মিঃ ওয়েব আইরিশ 'হোমরুলার' হইয়াও, ইংরাজের একটি অতি মহৎ স্বরূপের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই—

'ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বভাবত অধিকতর সাহসীও নয়, সৎ ও শক্তিশালীও নয়। তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও কর্তব্যজ্ঞানের উচ্চতা হইতেই, তাহাদের বিজয়কীর্তি ও কার্য-সফলতা অংশত উদ্ভূত। তাহারা যাহা সংকল্প করে, নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ করে। অন্যান্য লোকের ন্যায়, তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কিংবা রাজ্য-শাসন ব্যাপারেই হউক; যখন তাহারা সাধারণের হিতসাধন সংকল্প করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা কোনো ক্রমেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সে সংকল্প সাধনে বিরত হইবে না; সে কার্য সম্পাদনে কিছুতেই শৈথিল্য করিবে না; ইহা নিশ্চয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। অতএব এই-সকল বিষয়ে ইংরাজ-গুণের আদর্শ আমাদের গ্রহণীয়।'

এ দেশীয়দিগের বিশেষত এ দেশে অধুনা যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত, ও রাজ-প্রদত্ত আংশিক আত্ম-শাসনাধিকার ব্যপদেশে সাধারণ জনসাধারণের কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত তাঁহাদের আপাতত যত কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত শিক্ষা সর্বপ্রধান স্থানীয়। জনসাধারণের কার্যে অক্ষুণ্ণ ও আন্তরিক মনঃসংযোগ, শম এবং অনুরাগ এবং তাহা সম্পাদনকালে আত্ম-স্বার্থের বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত বিরোধী স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সর্বসাধারণের স্বার্থ বিনষ্ট না করা, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটি শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিস্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে গ্রাম্য চৌকিদারি সমিতির পঞ্চায়েতদিগের পর্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে ওই দুই শিক্ষার প্রয়োজন। পরন্তু নগরবাসী ও গ্রাম্য লোকদিগেরও এ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ইহাই স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অস্থিমজ্জা প্রাণ। এই শিক্ষার অভাবে, বলিতে লজ্জার ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, আমরা যে এক বিন্দু আত্মশাসনাধিকার পাইয়াছি অনেকস্থলেই তাহার কেবল অপব্যবহার হইতেছে। ফলত সাধারণের কার্য সম্পাদন সম্বন্ধে এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হইব, এ কথা বলিতে অন্তত আমরা সাহসী নহি। আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই। অতএব এ স্থলে আমরা সেটা না করিয়া, সংগোপনে যদি দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হইবে না। সংবাদপত্রের আস্ফালন ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আবরণ ক্ষণকালের জন্য দূরে রাখিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মশাসনব্যাপারের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলুন দেখি সে বিষয়ে আমাদের উপযুক্ততা কীরূপ জন্মিয়াছে?

কিন্তু, আমরা চিরকালই অনুপযুক্ত থাকিব এমনও কেহ মনে করিবেন না। কোনো কার্যের প্রথমে ও প্রারম্ভে পরিপক্কতা স্বভাবতই সম্ভবে না। কেবল সেই পরিপক্কতার কপট পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম। পক্ষান্তরে, গবর্নমেন্টের অযথা কঠোরতা এবং অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও, উহা মূলত প্রজাতান্ত্রিক প্রণালী। ভারতীয় ইংরাজের অসীম প্রভুত্ব-স্পৃহার অভ্যন্তরেও শাসনপ্রণালীর প্রজাতান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষ্যে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় ডেমক্রেসিকে একেবারে অতিক্রম করিয়া য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না। কোনো-না-কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে সংস্রব রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধারণ মত ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকারকে উহা একেবারেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাই অবশ্য আমাদিগের আশা এবং এ আশা একান্ত বৃথা আশাও নহে। ইংরাজ শাসনের যেরূপ গতি প্রকৃতি তাহাতে এমন দিন অবশ্যই একসময়ে আসিতে পারে, যখন এদেশীয়েরা শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ব্রিটিশ প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের সম্যক বা আংশিক অংশ পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু, তাহার উপযুক্ত ও তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রজানীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্রদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্বে, ব্রিটিশ রাজনীতি, ব্রিটিশ প্রজার স্বত্বাধিকার এদেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চিয়; পরন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও নিষ্ফল। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন বৃথা। আমাদের আশঙ্কা, ক্ষেত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। পলিটিক্স্ এখনও আমাদের মধ্যে একটি পোশাকি জিনিসের বেশি আর কিছুই নয়। উহা এখনও আমাদের রক্ত মাংসে মেদ মজ্জায় মিশে নাই। উহা অদ্যাপি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের আহার্য স্বরূপ হয় নাই। তাহা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দাসত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত ও পুষ্টিকর প্রজাত্ব জন্মিবে না।

আমরা বোধ হয় আমাদের রাজনৈতিক প্রবণতা কী প্রকৃতির তাহা উপরি-উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, সাম্রাজ্যের রাশিচক্র কৌন্সিলগৃহের উচ্চাকাশে কীরূপে আবর্তিত হইতেছে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আবশ্যক।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কিন্তু তৎপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনে নর্টন সাহেবের প্রতি কোনো বিশেষ বক্তৃতার ভার ছিল বলিয়া কোনো কোনো সভ্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরিত্র-দোষজন্য কন্‌গ্রেসের সহিত নর্টনের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন না।

নর্টন যদি সমাজে পতিত হইয়া থাকেন তবে সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে পারে— কিন্তু কন্‌গ্রেসসভায় অকৃত্রিম ভারতহিতৈষী মাত্রেরই অধিকার আছে। হাবড়ার ব্রিজ যদি কোনো মাতাল এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নির্মিত হইত তবে টেম্পারেন্স সভার সভ্যগণ কি সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেন?

ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 'সেসন'ই এ শীতে, সতেজ, সরগরম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক বৈঠক বরং কিছু বিমর্ষ। কটন আইন ও ক্যান্টনমেণ্ট বিলের আলোচনায় এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত; পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে। আমাদের সুপ্রিম কৌন্সিল (বা বড়ো ব্যবস্থাপক সভা) সর্বতোভাবে স্বাধীন অথবা স্টেট সেক্রেটারির সারথ্যে ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের কিঞ্চিৎ অধীন এই প্রশ্ন কটন বা কাপড় সূতার আইন যখন বিল ছিল তখনই অঙ্কুরিত হইয়া ক্যান্টনমেন্ট বিলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় একটা কণ্টকবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষটার অনেকগুলা শাখা-প্রশাখা ও কাঁটা-খোঁচা বাহির হইয়াছে। কটন-অ্যাক্ট সম্বন্ধে সেক্রেটারি অব্ স্টেটের আদেশ বা 'ম্যান্ডেট' অথবা ব্যবস্থাপক সভাপতি 'এলগিন কর্তৃক তাহার উল্লেখ এই আকস্মিক উৎকণ্ঠা উৎপাদন ও বিপদপাতের অব্যবহিত কারণ। 'ম্যান্ডেট' উক্তিটিই যেন বোধ হয়, অনর্থ ঘটাইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ, বিশেষত 'আনঅফিশিয়াল' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেম্বরেরা মহা বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভার বিশাল হিমাচলবৎ গাম্ভীর্যের এক বিন্দু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভার অসীম স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টায় শ্রীমান স্যর গ্রিফিথ ইভান্স এবং মাননীয় মি. প্লেফেয়ার এই দুই রথী অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই বিবেচনায় এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল; কিছুকাল হইতে স্টেট সেক্রেটারি সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন। ইহা, বে-আইনি, বে-নজিরি এবং বিষম বিপত্তিজনক। ইহাতে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বে-ইজ্জত, সে সভার সভাপতি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধির সম্ভ্রমের হানি এবং ব্যবস্থাপকদিগের বিধিব্যবস্থা বিদ্রূপকর হইবে; পরন্তু, তদ্দ্বারা ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধেও ভয়ানক বিভীষিকা উপস্থিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ ডেমক্রেসি আদৌ সাম্রাজ্য শাসনে সমর্থ কি না, সে বিষয়েই (শুনিতেছি) ঘোর সন্দেহ, উপস্থিত হইবে! কেবল সন্দেহ নহে; সে অসমর্থতা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্তই হইবে। The question whether a democracy can govern an Empire will have to be answered in the negative। পরন্তু, এরূপ অত্যাচার হইলে, ব্যবস্থাপক সভায় সুযোগ্য সভ্যই জুটিবে না। সিবিল সার্ভিসেও সম্ভবত সমর্থ লোক মিলা ভার হইবে। কেহই আর সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ছুঁইতে চাহিবে না; সংহিতাকার ও শাসয়িতাভাবে শাসন-রশ্মি শিথিল হইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না; তাহাই বা কে বলিবে। গবর্নমেন্টের প্রতি প্রজাসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, সম্ভ্রম ও শঙ্কা টলিবে; কাজেই শক্তির হ্রাস হইবে; সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল— ধ্বংসই বটে!

একদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট; অপরদিকে ভারত গবর্নমেন্ট; মধ্যস্থলে স্টেট সেক্রেটারি। এই সেক্রেটারিই হইয়াছেন, এ ক্ষেত্রে, যত সর্বনাশের মূল। কিন্তু, এই সেক্রেটারি যথার্থই কি আমাদের সংহিতাকারদিগের স্বাধীনতাপহরণে প্রবৃত্ত? যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনো প্রকারেই তো তাঁহার সেরূপ অসদভিসন্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভারতে রাজ-শক্তি শতসহস্র স্রোতে, শাখা এবং প্রশাখায় প্রবাহিত। সে শক্তির মূল প্রস্রবণ আদি কেন্দ্রস্থলে ব্যক্তিবিশেষ নহেন, বিরাট ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, অন্তত ইহাই আমরা অবগত আছি। বিধিব্যবস্থা ব্যবহারও ইহার বিরোধী নয়। অতএব রাজ-শক্তির আদিকেন্দ্রস্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-কর্তৃক, সে শক্তির সঞ্চালন, সংযম বা সম্প্রসারণ অন্যায় ও অসংগত বলিতে পারি না। স্টেট সেক্রেটারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদেশ, ইচ্ছা ও অবলম্বিত নীতি অনুধাবন করিয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে, প্রধান প্রধান বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সমীপে পরামর্শ প্রেরণ করেন। অন্তত লর্ড এলগিন নিজেই এ কথা বলিয়াছেন; এবং তাঁহার কথা সমূলক নহে, এমন অনুমান করার কিছুমাত্র কারণও নাই। অতএব স্টেট সেক্রেটারির উপর দোষারোপ করা অনর্থক। তিনি পার্লামেন্টেরই শক্তি সঞ্চালন করেন; নিজে কোনো অভিনব নীতি সংগঠন করিয়া পাঠান না; পুরাতন নীতিরও পরিবর্তন করেন না। অতএব অপক্ষপাত বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁহাকে 'বেকসুর' খালাসই দিতে হয়। তিনি তফাত হইলে অবশিষ্ট থাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও আমাদের ব্যাবস্থাপক সভা। সভা কি সত্যসত্যই পার্লামেন্টকেও প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত? স্যর গ্রিফিথ্ ও মি. প্লেফেয়ারের প্রস্তাবে তাহাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পার্লামেন্টকে উল্লঙ্ঘন করার এ অভিলাষ বা আবদার এদেশীয় লোকেরা কখনোই অনুমোদন করিতে পারে না। শাসনশক্তির শত

শত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ হইয়া তাহাদের আর্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রজা। অতএব শাসকই হউন আর ব্যবস্থাপকই হউন, পার্লামেন্টের প্রভাব হইতে পৃথক হইয়া, ভারতশাসন ও ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত করুন, এরূপ প্রস্তাবে এদেশীয়রা কিছুতেই সায় দিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মি. মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত। হইতে পারে, অনেক সময়ে পার্লামেন্ট হইতে অবিচার ও এদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারত গবর্নমেন্টের নিকটে সুবিচারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পার্লামেন্টের উপর, শেষ বিচারের জন্য, নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। পার্লিয়ামেন্টীয় শাসন ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন দুয়ের কোনোটিই অবশ্য সম্যকরূপে নিরাপদ নহে; কেননা সময়ে সময়ে প্রবল স্বার্থ সংঘাতে সমূহ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে এদেশীয়দিগের নিজের শাসনও এখন আকাশকুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব; এরূপ স্থলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন অপেক্ষা পার্লিয়ামেন্টের শাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; যেহেতু পার্লিয়ামেন্টের ও ব্রিটিশ প্রজাসাধারণের ন্যায়পরতা ও মহত্ত্ব সাধারণত অধিকতর বিশ্বসনীয়।

পুলিস রেগুলেশন বিল

এই বিলটি ১৮৬১ সালের ৫ আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি। ইহার ১৫ ধারার লিখিত বিষয়টি সংশোধন সম্বন্ধেই সমস্যা। ওই ধারার পূর্ব মর্মানুসারে নিয়ম ছিল এই যে, কোনো স্থানে বাদ বিসম্বাদ বা যে-কোনো কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তথাকার শান্তিরক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং তাহার নির্বাহার্থে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর একটি কর সংস্থাপিত হইত। কর সংস্থাপিত হইত দোষী ও নির্দোষী নির্বিশেষে; দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপ আইন স্পষ্টত অন্যায়। ইহা কখনোই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না যে দোষীর সহিত নির্দোষীও শাস্তি পাইবে।

নির্দোষীর শাস্তি নিবারণ উপরোক্ত সংশোধনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন করা দুষ্কর। গবর্নমেন্ট যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাতে দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনের ভার জিলার মাজিস্টর ও জজদিগের উপর বিন্যস্ত হয়। জজ বা মাজিস্টর ইহাদের যিনিই হউন স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনে ক্ষমবান হইবেন। সে ক্ষমতা পরিচালন করার দ্বারা দোষী ও নির্দোষী নিরাকরণকল্পে, দস্তুরমতো বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও উকিল-মোক্তারের সোয়াল জবাব গ্রহণান্তে, রায় লিখিত হইবে না— জজ বা মাজিস্টর স্থানীয় অবস্থানুসারে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার যখন হইবে না, তখন অবশ্য তাহার দেওয়ানি আপিলও চলিবে না। তবে বিভাগীয় কমিশনরের উহাতে হাত থাকিবে।

গবর্নমেন্ট পক্ষের যুক্তি এই যে এরূপ স্থলে দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার দ্বারা দোষী নির্দোষী নির্ধারণ করা সুকঠিন; অথচ নির্দোষীরও রক্ষা পাওয়া উচিত। শান্তি রক্ষা করিতে গবর্নমেন্ট স্বতঃ বাধ্য। শান্তিরক্ষার্থে, শান্তিভঙ্গের দণ্ডের জন্য দেওয়ানি বিচার সম্ভবে না। অতএব শাসন ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দোষীদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য জিলার জজ ও মাজিস্টরদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে ইহাই প্রচুর। পূর্বে দোষী ও নির্দোষী দেশসুদ্ধ লোকেরই দণ্ড হইত, এখন অন্তত কতক লোকও তো রক্ষা পাইবে। নির্দোষী মাত্রই পরিত্রাণ না পাউক তাহাদের কতকও তো পাইবে। সংশোধিত আইন সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও উহা মন্দের ভালো। বিশেষত এ আইন দণ্ড দিবার জন্য নয়, দাঙ্গা নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। গবর্নমেন্টের যুক্তি এই।

অপর পক্ষের কথা এই যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থলে যখন দোষী নির্দোষী সকলেরই উপর

পুলিসের ব্যয়ভার স্থাপন করা হয় তখন বস্তুত কাহাকেও বিশেষ করিয়া দোষী করা হয় না। ইহাতে কেবল স্থানীয় লোকের 'পরে শান্তির ট্যাক্স বসানো হয় মাত্র। পরন্তু নূতন নিয়মে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি বিনা বিচারে অপরাধের কলঙ্ক এবং দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপুরুষদের থাকিবে অথচ সে কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোনো উপায় দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বিচার হইবে না অথচ দোষী সাব্যস্ত হইবে।

যদি এ কথা বলা যায় যে, আইনমতে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, অতএব কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সকল সময়েই আইনের দ্বারা বাধ্য করা কর্তব্য নহে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই ছিদ্রকে একবার স্থান দিলে কোথায় ইহার সীমা নির্ণয় হইবে? বিচারকেরা যে মনুষ্যস্বভাবের দুর্বলতাবশত পক্ষপাত করিতে পারেন সে-সকল কথা আমরা দূরে রাখিতেছি— স্থূল কথা এই যে, আবশ্যক বুঝিয়া ট্যাক্স বসাইতে গবর্নমেন্টের অধিকার আছে; কিন্তু বিনা বিচারে দোষী করিতে এবং কোনো ব্যক্তিকে আপন দোষক্ষালনের অধিকার না দিতে গবর্নমেন্টের ন্যায্য অধিকার নাই। ম্যাজিস্ট্রেট যদি স্থানীয় অভিজ্ঞতাবশত সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আয়োজন জন্য চেষ্টা কেন অন্য অপরাধেরও আন্দাজমতো খেয়ালমতো বিচারের ভার তাঁহার উপর দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি

জর্মান অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার বাঙালি পাঠকদিগের নিকট পরিচিতি হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্মন ভাষায় বেদের ধর্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

মনিস্ট নামক আমেরিকান পত্রিকায় সমালোচনাস্থলে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব করে, কিন্তু অধ্যাপক বলেন ইহা তাহাদের দুর্বলতার লক্ষণ। যে-সকল মহা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে য়ুরোপীয় জাতি বলিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছেন— ইরানীদের সহিত বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি ভারতবাসী আর্যগণ সেই-সকল প্রবল দ্বন্দ্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশই শিথিলবল হইয়াছেন। এই ফলশস্যশালী নূতন নিবাসের নিস্তব্ধতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ আদিম অসভ্য জাতির সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্ব ক্রমশই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে তো শীত দেশ হইতে আসিয়া এখানকার আবহাওয়ায় তাঁহাদের অনেকটা নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহার পরে অসমকক্ষ অসভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সহজ সংগ্রামে জয়লাভপূর্বক উর্বরা বসুন্ধরা নির্বাধে ভোগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মধ্যে সেই কঠিন প্রয়াসের সুকঠোর সংঘাত ছিল না, যদ্দ্বারা বাস্তব জগতের গভীরতা ভেদ করিয়া সফলকাম হইয়া চিন্তারাজ্যের ভূমানন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতি অনায়াসেই তাঁহারা বস্তুজগতের উপরিতলে সত্যের সহিত কল্পনা, সুন্দরের সহিত অদ্ভুত, বিবিধ নবতর আকারে জড়িত মিশ্রিত করিয়া বিচিত্র চিত্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

ওল্‌ডেন্‌বর্গের মত উদ্‌ধৃত করিয়া সমালোচক তাঁহার হিন্দু বন্ধুবর্গকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন উপরি-উক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে। তিনি বলেন, যে-সকল প্রাকৃতিক অবস্থাবশত হিন্দুরা অবসর এবং স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন সেই-সকল অবস্থাগতিকেই তাঁহাদের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাপ্রণালী এমন কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী

কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া বড়ো বড়ো রহস্যময় প্রহেলিকার সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে ভালোবাসিয়াছে— একদিকে তাঁহারা ধর্ম এবং দর্শনের উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম ভাবের মঞ্জরী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তাঁহাদের থিওরিগুলি বাস্তবতথ্যের সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, ভারতবর্ষের উন্নতি এক সময় মাঝখানে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তরুণতর পাশ্চাত্য সভ্যতা, বলে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তবে, দৈবাগত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; তাহার প্রকৃত কারণ, বিচারের, বিশেষত আত্মবিচারের অভাব (lack of criticism, and especially of self-criticism)। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই বিচার এবং আত্মবিচারের' প্রবৃত্তি নানা উৎপাত, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব— তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে, বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতবর্ষের নিকট, তাহার প্রাচীন আচার্যদের নিকট, পাশ্চাত্য জাতি অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছে এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষালাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কী বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না— তাহা আর কিছু নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কঠিন যাথাযথ্য (exactness)। এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পরীক্ষাসিদ্ধ অভিজ্ঞতাই সত্যের চরম মানদণ্ড, ধ্যানলব্ধ কল্পনা নহে। (The ultimate criterion of Truth is not apriori speculation, but experience; not subjective thought, but objective reality.)

সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দম্ভে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহংকারে পরিস্ফীত হইয়া ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে-সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহারা মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।

ধর্মপ্রচার

হিন্দু কখনো ধর্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলান্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা। পুরুষানুক্রমে এবং শৈশবকাল হইতেই যে-সকল সংস্কারের মধ্যে বর্ধিত হওয়া যায়, তাহার বাহিরের কথা, এমন-কি, বিরোধী কথা, ধৈর্যের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। ধর্ম সম্বন্ধে আমরা তো আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার বলিয়াই জানি, কিন্তু সংস্কার-বিরোধী কথা আমরা তিলার্ধ পরিমাণও সহ্য করিতে পারি না। আমেরিকা যেরূপ অনুরাগ-সহকারে বিদেশীর মুখ হইতে হিন্দুধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবনীশক্তি আছে যাহার প্রধান লক্ষণ, দান করিবার শক্তি এবং গ্রহণ করিবার শক্তি।

যাহা হউক, আমরা যে আমাদের ধর্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষে নানা মতের সহিত রীতিমতো সংঘর্ষ

প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডনপূর্বক যখন নিজের ধর্মকে সকলের ধর্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্য, তাহা সকল অনুদারতার অধম।

সম্প্রতি ন্যুইয়র্ক নগরের নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ থোবর্ন এবং বীরচাঁদ গন্ধী নামক বোম্বাইবাসী জৈনধর্মাবলম্বী ব্যারিস্টারের মধ্যে 'ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান মিশন' সম্বন্ধে তর্ক হয়— ডাক্তর পল্‌ কেরস্‌ মধ্যস্থ থাকেন। থোবর্ন, মিশনের হিতকারিতা, এবং বীরচাঁদ, তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যস্থ কেরস্‌ সাহেব যাহা বলেন তাহার মধ্যে আমাদের প্রণিধানযোগ্য অনেক কথা আছে।

তিনি বলেন, যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া উঠে। যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম প্রচার করিতে বিরত হওয়াকে অপক্ষপাত বলে না, তাহাতে ঔদাসীন্য, এবং প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রতিযোগিতার আবশ্যক, কারণ, প্রতিযোগিতা উন্নতির প্রধান সহায়। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে কখনোই সত্যের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা রক্ষিত হয় না। তিনি বলেন, অখৃস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃস্টধর্ম আপন সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় পরধর্মের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজধর্মের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে। তাহার একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। স্পেন্স্‌ হার্ডি নামক মিশনারির নাম অনেকে অবগত আছেন। তিনি বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে আছে, বুদ্ধ নিজের ও অন্যের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য বলিয়াছেন তাহা প্রতারণা মাত্র। কারণ, বুদ্ধ বস্তুতই যদি অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বিজ্ঞানে যে-সকল লুপ্তবংশ প্রাচীন জীবজন্তুর বিবরণ আছে, বুদ্ধের পূর্বজন্মের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ থাকিত। পৃথিবীকে গোল না বলিয়া সমতল বলাতে বৌদ্ধ সাধুগণকে হার্ডি সাহেব নিন্দা করিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে-সকল অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে সেগুলি হার্ডিসাহেবের মতে এত অবিশ্বাস্য, যে, তাহা গম্ভীর ভাবে প্রতিবাদের যোগ্যই নহে।

কেরস্‌ সাহেব বলেন, হার্ডি সাহেবের এই-সকল নিন্দাবাদ শুনিবামাত্র মনে উদয় হয় যে, খৃস্টের প্রতিও এ সকল কথার প্রয়োগ হইতে পারে। খৃস্ট বলেন তিনি এব্রাহামের পূর্বেও ছিলেন অথচ ম্যামথ্‌ কিংবা টেরোড্যাক্টিল্‌ জন্তুর কোনোরূপ উল্লেখ করেন নাই। জলের উপর দিয়া বুদ্ধের গমন যদি অসম্ভব হয় তবে খৃস্টের গমনই বা কেন সম্ভব হইবে? পৃথিবীর সমতলতা সম্বন্ধে হার্ডিসাহেবের মৌন থাকাই শ্রেয় ছিল, কারণ খৃস্টানদের হাতে গ্যালিলিয়োর কীরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছে।

অতঃপর কেরস্‌ সাহেব বলিতেছেন, কিছুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম পাশ্চাত্য মনের প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ধর্মকে য়ুরোপে কে আনয়ন করিল? স্পেন্স্‌ হার্ডি প্রভৃতি মিশনারিগণ। তাহারা বৌদ্ধধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে বিনাশ করিতে গিয়া খৃস্টধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে এবং যদিচ বৌদ্ধপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে যায় নাই তথাপি খৃস্টান প্রচারক সেই অভাব পূরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের সাহায্যে খৃস্টধর্মকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

কেরস্‌ সাহেবের এই-সকল উক্তির মধ্যে আমাদের গর্বানুভব করিবার উপযোগী যে অংশ আছে তাহা আমাদের কাহারো চক্ষু এড়াইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া খৃস্টানগণ নিজধর্মের উন্নতি সাধন করিতেছেন ইহা শুনিবামাত্র আমাদের ক্ষুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে, কিন্তু কেরস্‌ সাহেবের উক্তির মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার যে বিষয় আছে তাহা সম্ভবত আমাদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুগণ

ঘরে বসিয়া আপনাদের ধর্ম এবং আপনাদের প্রকৃতিকে যত উদার বলিয়া মনে করে তাহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র হইতে পারে। যতক্ষণ না প্রকৃত জগৎরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ততক্ষণ তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রকৃত সত্য কি, তাঁহাদের সংস্কার মাত্র তাহার প্রমাণ হইবে না। মিথ্যার সহিত যখন হাতে হাতে সংগ্রাম বাধে তখনই সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমরা নিজে জানি না আমাদের ধর্ম কতখানি সত্য; কারণ, সে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে সত্যকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই না; আমরা আপন ধর্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি; আমরা বলি হিন্দুর ধর্ম কেবল হিন্দুরই; অর্থাৎ হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সত্য আছে সে সত্য অন্যত্র সত্য নহে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল হিন্দুর বিশ্বাসের উপরেই তাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে।

হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ধর্মমত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যে ধর্ম বহুকাল অবধি অন্য ধর্মের সহিত সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া কেবল নিজের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া উপধর্ম সৃজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বংশে উত্তরোত্তর নানাজাতীয় বিকার ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মুসলমানধর্মের সংস্রববশত ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুধর্মের মধ্যে অনেক বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও মুসলমান ধর্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃস্টধর্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃস্টধর্মের আলোকে হিন্দুধর্মের মর্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্মের কৃত্রিম সংকীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অসংকোচে সগর্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহর ছাপ পড়ে না— যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১৩০১

ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি

অর্থাৎ ভারত দুঃখ নিবারণ সভা। সভার নাম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই। ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।

সাধারণত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সভাসকল কী কী উদ্দেশ্য এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ সভারও সে-সকল অঙ্গের কোনো ত্রুটি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ, সভার মতে, ভারতবর্ষকে যেমন অনুচিত আইন হইতে রক্ষা করা চাই, তেমনি তাহাকে

অন্যায় শাসন হইতেও পরিত্রাণ করা আবশ্যক।

সভার এই বিশেষত্বটুকু আমাদের কাছে সব চেয়ে ভালো লাগিতেছে। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অনুচিত আইন এবং অন্যায় শাসন যদি কোনো মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়— আইনকর্তারা যদি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, ও শাসনকর্তারা সকলেই অভ্রান্ত ন্যায়পর ও অন্তর্যামী হইয়া উঠেন তবে দেশের অনেক দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিক কিছু পরিবর্তন হয় না। কেবল সুআইন এবং সুশাসনে একটা জাত বাঁধিয়া দিতে পারে না; তাহাতে রাজভক্তি এবং রাজনির্ভর বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভর তাহাতে বাড়ে না। অথচ সেই স্বজাতিবন্ধনই দেশের সমস্ত স্থায়ী মঙ্গলের মূল ভিত্তি।

গবর্নমেন্টকে কোনো প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্বে, স্বজাতি এবং স্বজাতির কর্তব্য কাহাকে বলে এই শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা কেবল বই পড়াইয়া বা বক্তৃতা দিয়া হইতে পারে না, এ শিক্ষা কেবল প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীয় দল অগ্রসর হইতেছে, এমন-কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিতে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাই বন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।

অনেক অন্যায় কেবল অবহেলাবশত ঘটিয়া থাকে। যখন জানা থাকে যে, দুর্বল ব্যক্তির অন্যায় প্রতিকারের কোনো ক্ষমতা নাই এবং অন্যায়কে সে আপন অদৃষ্টের লিখন জ্ঞান করিয়া তেমন সুতীব্রভাবে অনুভব করে না, তখন তাহার প্রতি সুক্ষ্মভাবে ন্যায়াচরণ করিতে তেমন একান্ত সতর্কতা জন্মে না। তখন তাহার হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সুখদুঃখের প্রতি কথঞ্চিৎ অবজ্ঞা জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোক তাহার স্বজাতির বলে বলী, তখন সে নিজেই অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং অন্যেও তাহার প্রতি নির্বিচারে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। কাঁদাকাটি করিয়া পরকে ন্যায়পর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একত্র হইয়া নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সংগত।

রিলিফ সোসাইটি যখন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে তখন স্বজাতির নিকটে স্বজাতির মূল্য অনেক বাড়াইয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কী হইতে পারে? যে অন্যায় নিবারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন সে অন্যায় নিবারণে তাঁহারা সক্ষম না হইতে পারেন কিন্তু সেই নিষ্ফল চেষ্টাতেও তাঁহারা যে ফল লাভ করিবেন, তাহা, কোনো বিশেষ অন্যায় প্রতিকারের অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

অন্যায় আইন রহিত করিয়া ভালো আইন প্রচলিত করা এবং ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস্‌ যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা পরম হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখ্য ফলের অপেক্ষা গৌণ ফল আমাদের নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়— ইহাই আমাদের পরম লাভ— ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং এই কারণেই, রিলিফ্‌ সোসাইটির অন্যান্য সকল কর্তব্য অপেক্ষা পূর্বোক্ত বিশেষ কর্তব্যটি আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়। অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।

উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার

অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষত আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প— এইজন্য যথার্থ নিজের কর্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্তব্যকে আপন সাধ্যসীমার মধ্যে আনিতে হইবে।

বড়ো বড়ো স্বাধীন দেশে প্রায় অধিকাংশ শুভকার্যের ভূমিপত্তন হইয়া আছে। এইজন্য কোনো একটা ফলাও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে সকল প্রকার দেশহিতকর কাজ একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। অতএব বহুদূরে না গিয়া নিকট হইতে কাজ শুরু করাই আবশ্যক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা সহজে কর্মপ্রিয় নহে তাহাদিগকে কর্মে উৎসাহিত করিতে হইলে খুব একটা বৃহৎ সংকল্পের উত্তেজনা সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হয়। ছোটো কাজ হইতে বড়ো কাজে যাওয়া, না, বড়ো কাজ হইতে ছোটো কাজে আসা কোন্‌টা স্বাভাবিক পথ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ছোটো কাজের নদীপ্রবাহ বাহিয়া বড়ো কাজের সমুদ্রে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বড়ো কাজের গুঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছোটো কাজের শাখা-প্রশাখায় উত্তীর্ণ হওয়াই সংগত।

আসল কথাটা এই, দেশে যখন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে সেটার দ্বারা আপন কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়— প্রথমে তাহার সমগ্র বৃহত্ত্বটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়— প্রথমে সেই ভাবটাকে সাধারণত দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়— তাহার পরে তাহার গূঢ় প্রভাব ছোটো বড়ো নানা কাজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সেইজন্য, এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে সে-সকল ভারত-জাগানো গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এখন তাহাকে অনেকে পরিহাসচক্ষে দেখিয়া থাকেন; কারণ, দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে; এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশি। এখন কোনো লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি এখন কী করিতে হইবে বলো দেখি!

যেমন ভাবের সম্বন্ধে তেমনি কাজের সম্বন্ধেও। এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে-সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।

আমাদের প্রথমেই মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর সভাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে কোনো সভা যদি কেবলমাত্র সমস্ত বাংলা দেশের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন তবে সম্ভবত কতকটা বেশি কাজ করিতে পারেন। আমাদের লোকবল, অর্থবল এবং চরিত্রবল যেরূপ, তাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধনোদ্দেশে আমরা কেবল দরখাস্ত করিতে পারি— কিন্তু কেহ কেহ যদি কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই আপন হিতৈষণার উদ্যম বদ্ধ করেন তবে সম্ভবত কতকটা পরিমাণে কাজ করিতে পারেন— এবং ক্রমে সেই উপায়ে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে পারেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন, অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরাজিতেই হইয়া থাকে; তাহার কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাকে কোনো কথা নিবেদন করিতে হইলে অগত্যা ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে, কেবল শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা ছড়ানো হয়। ইংরাজ যে সর্বদাই খোঁটা দিয়া থাকে যে, আমাদের দেশের

পোলিটিকাল আন্দোলন কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের কৃত্রিম আন্দোলন, সেই নিন্দাবাদের কোনো যথার্থ প্রতিকার করা হয় না। পুলিস বিল, চৌকিদারি বিল, প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আমরা বিদেশীভাষায় টাউন্‌হলে প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সে-সকল বিল সংশোধন হইতেও পারে কিন্তু বিল সংশোধন অপেক্ষা দেশ-সংশোধন ঢের বড়ো কাজ। এই-সকল বিলে দেশের যে প্রজা-সাধারণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সেই প্রজাদিগকে বিলগুলির উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলের কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারা কী অধিকার পাইল এবং তাহাদের নিকট হইতে কী অধিকার প্রত্যাহরণ করা হইল ইহা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে উপকার হইবে ইংরাজ রাজসভায় দরবার করিয়া সে পরিমাণ উপকার হইবে না।

কেবল ইহাই নয়— দেশের রোগনিবারণ, শিক্ষাবিস্তার, ধনবৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা, অন্যায়প্রতিকার প্রভৃতি সমস্ত কাজে ঢের বেশি তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্মেন্টকে কর্তব্যশিক্ষা দান করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সমস্ত উদ্যম নিয়োগ না করিয়া নিজেদের অদূরবর্তী কর্তব্যপালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ। পার্লামেন্টের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনচেষ্টাও মন্দ কাজ নহে— কিন্তু দেশের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ন্যায় ফল তাহাতে পাইব না।

হিন্দু ও মুসলমান

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য-দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন। তাঁহাদের মা-মাসিগণ ঠাকুরানীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারি দিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন— সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল্ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুলতান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তিরস্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের, মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্মের এমন কোনো গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোককেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে ধর্মের জন্য অহংকার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কন্‌গ্রেসে নর্টনকে লইয়া যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি সমাজে পণ্ডিত, সে যে অকৃত্রিম হিতৈষণাসত্ত্বেও ভারতহিতব্রতে যোগ দিতে পারিবে না আমরা এরূপ জুলুমের কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। মনে করা যাক হঠাৎ বর্ষায় নদী বাড়িয়া উঠিতেছে, হয়তো এক রাত্রেই জলপ্লাবনে দেশ নষ্ট হইতে পারে; কতকগুলি লোক বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন সময় যদি কোনো পাপী লোক আসিয়াও পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, নৈপুণ্যের সহিত সেই দুষ্কর কার্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়— তবে কি তাহাকে বলিতে হইবে, আমরা সকলে সাধু এবং তুমি পাপী; অতএব তোমার নৈপুণ্য এবং তোমার হিতৈষণাবৃত্তি লইয়া তুমি চলিয়া যাও, তুমি বাঁধ বাঁধিতে পাইবে না? তখন কি ইহা দেখিব না, যাহার যথার্থ হিতেচ্ছা আছে হিতকর্মে তাহার অধিকার আছে— এবং তাহার অন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাকে ভালো কাজ করিতে বাধা দিলে কেবল তাহাকেই বাধা দেওয়া হয় না, সে কাজকেও বাধা দেওয়া হয়? আমরা এই কথা বলি, দুঃসময়ে যে লোক বাঁধ বাধিতে আসিয়াছে, তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে না যাইতে পারি, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না দিতে পারি— কিন্তু তাহাকে বাঁধ বাঁধিতে বাধা দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক সাধু অতি অল্পই আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম সদনুষ্ঠান হইতে কোনো পাপীকে নিরস্ত করিবার অধিকার অসংকোচে লইতে পারেন?

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপমা অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সঞ্জীবনী সেই উপমা প্রয়োগে বিষম বিচলিত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্থূল গোছের একটা রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম সে অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে কিন্তু কাহারো প্রতি গালি প্রয়োগ করি নাই। সঞ্জীবনীর মতো কাগজ, যাঁহাকে বিস্তর প্রচলিত মতের সহিত সর্বদা বিরোধ করিতে হয়, তিনি যে আজও মতের অনৈক্যে ধৈর্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিলেন না ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপার

আমাদের কোনো বন্ধু গত মাসের সাধনায় পলিটিক্স শব্দের ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পলিটিক্স্‌ শব্দের স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না?

বাংলার পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স্‌ আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক আধুনিক পলিটিক্স্‌ ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ আছেই। বোধ করি তাহারই প্রতি লক্ষ করিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

যখন পূর্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাত হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজা শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

পলিটিক্স্‌ জিনিসটা আমরা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছি, অতএব ওই শব্দটা ইংরাজি আকারে ব্যবহার করিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই, তাহাতে উহার ইতিহাসও রক্ষা হয় ভারও রক্ষা হয়। সেইসঙ্গে যদি একটা বাংলা প্রতিশব্দ থাকে তো থাক্‌। রাজনীতি শব্দটি প্রচলিত

হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন শব্দ কালক্রমে অর্থ পরিবর্তন করে এ স্থলেও তাহা খাটিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং অধিকতর সংগত।

সাধনা
চৈত্র ১৩০১

ফেরোজ শা মেটা

মাননীয় ফেরোজ শা মেটা ভারত মন্ত্রীসভায় পুলিস বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্তৃপুরুষদিগের সহ্য হয় নাই। হঠাৎ একটা বজ্রের শব্দ শুনিলে ছেলেরা কাঁদিয়া উঠে— তাহারা মনে করে কে যেন উপর হইতে তাহাদের প্রতি ভারি একটা অন্যায় করিল, যেন তাহাদের কোথায় এক জায়গায় ঘা লাগিয়াছে— শ্রীযুক্ত মেটা ভারতসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে যদিও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই তথাপি হঠাৎ তাহার শব্দে এবং নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে হইল তাঁহাদের সিবিল সর্বিসের সুকোমল পৃষ্ঠে বুঝি কে মুষ্টিপাত করিল অমনি তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটা নূতন আলোক অকস্মাৎ একটা জ্যোতির্ময় কষাঘাতের মতো মন্ত্রীসভার আকাশের গায়ে চমক দিয়া গিয়াছিল— তাই সাহেবরা অকস্মাৎ এতই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করে নাই।

মেটা বলিয়াছিলেন— বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার আপিলের অধিকার না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কর্তৃপুরুষেরা ক্ষাপা হইয়া বলিয়া উঠিলেন— কেন, আমরা কি তবে সকলেই অবিচারী? গম্ভীরভাবে ইহার উত্তর দিতে বসিলে আমাদের কর্তাদের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়— কেবল, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, তবে কোনো অপরাধের জন্য কোনো প্রকার বাঁধা বিচারপ্রণালী থাকে কেন? আমাদের স্বর্গসম্ভব সিবিল সর্বিসের সভ্যগণকেও আইন পালন করিয়া বিচার করিতে হয় এ অপমান তাঁহারা স্বীকার করেন কেন? নিয়ম মাত্রই তো মানুষের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনা, স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি এবং অবাধ হৃদয়বৃত্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ।

তাহার পরে আবার বাজেটের আলোচনাকালেও আমাদের বাংলাদেশের ছোটো বিধাতা ইস্কুলমাস্টারের মতো গলা করিয়া শ্রীযুক্ত মেটাকে বিস্তর উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মেটা সাহেব খুব ভালো ছেলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের আশানুরূপ উচ্চ নম্বর রাখিতে পারিতেছেন না, অতএব তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। কর্তাদের মতে, বাজেটের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মেটা কোনো প্রকার কাজের পরামর্শ দেন নাই কেবল সাধারণভাবে বিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেটা সাহেব বলিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাজস্বসচিব সার্‌ অক্‌লান্ড কলভিনও ওই কথা বলিয়াছেন।

ওয়েস্ট্‌ল্যান্ড সাহেব পাকেপ্রকারে বলেন খরচ বাড়ে নাই, এক্সচেঞ্জের দুর্বিপাকে অধিক টাকা নষ্ট হইতেছে। তিনি বলেন পৌন্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে। এ কৈফিয়তটার মধ্যে কিছু চোখে ধুলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি। ভারতবর্ষে যখন রৌপ্যমুদ্রায় অধিকাংশ খরচ নির্বাহিত হয় তখন পৌন্ডহিসাবে হিসাব করিয়া খরচ কম দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ব্যয়ের ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। অতএব ওয়েস্ট্‌ল্যান্ড সাহেবের এ যুক্তির মধ্যে সরলতা নাই এবং তাহাতে আমাদের কোনো সান্ত্বনাও দেখি না।

আমরা কাজের কথা কী বলিব? আমরা যদি বলি, সাহেব কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি (কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স) দিবার আবশ্যক নাই, তোমরা বলিবে, না দিলে নয়। বর্তমান

এক্সচেঞ্জের হিসাবে ধরিয়াও তোমাদের স্বদেশের সহিত এখানকার বেতনের তুলনা করিয়া দেখো। এখানে বিদেশে থাকিয়া তোমাদের খরচ বেশি হয়? কেন হয়? এমন যদি বুঝিতাম এখানে তোমাদের যেরূপ চাল বিলাতেও তোমাদের সেই চাল তাহা হইলে আমাদের কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। বিলাতের মধ্যবিত্ত অবস্থায় কয়জন লোক বৎসরের মধ্যে কয়দিন শ্যাম্পেন্-ডিনার ভোগ করিয়া থাকে? এ কথা কি সাহেবরা অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহারা বিস্তর অনভ্যস্ত এবং অনাবশ্যক নবাবী করিয়া থাকেন? সে-সমস্ত যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ খাটো করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে কি আমাদের এই-সকল অর্ধ-উপবাসীদের কষ্টসঞ্চিত উদরান্নে হাত দিতে হইত?

গল্পে কথিত আছে, বাবু যখন গোয়ালার বিল হইতে তাহার অর্ধেক পাওনা কাটিয়া দিলেন তখনও সে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল— তাহার প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, এখনও দুধে পৌঁছায় নাই। অর্থাৎ কাটাটা কেবল জলের উপর দিয়াই গিয়াছে। প্রতিকূল এক্সচেঞ্জেও এখনও সাহেবদের হুইস্কি সোডা এবং মুর্গি মটনে আঘাত করে নাই তাহা বড়ো জোর শ্যাম্পেন টোকে, এবং অতিরিক্ত ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে; কিন্তু কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স আমাদের মোটা চাউল এবং বহুজলমিশ্রিত কলাইয়ের ডালে গিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমরা বলিতেছি, তোমাদের ভারত শাসনের যন্ত্রটা অত্যন্ত বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে— যদি অধিকতর পরিমাণে দেশী লোক নিয়োগ কর তাহা হইলে সস্তা হয়। তাহাতে যে কাজ খারাপ হয় এমন কোনো প্রমাণ নাই। তোমরা বলিবে সে কোনো মতেই হইতে পারে না।

তোমাদের কথাটা এই, আমরা সৈন্য বিভাগের বিস্তার করিব, ভারতবর্ষের দুশো-পাঁচশো মাইল দূরে যেখানে যত ভীমরুলের চাক আছে গায়ে পড়িয়া সবগুলাতে খোঁচা মারিয়া বেড়াইব, ইংরাজ কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি দিব, এবং মোটা পদের ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের রক্তরিক্ত দেহে মোটা দাঁত বসাইয়া খাদ্য শোষণ করিব— ইহার অন্যথা হইবে না, এক্ষণে ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কাজের পরামর্শ দাও।

অনেক সময় যথার্থ কাজের পরামর্শ অত্যন্ত সহজ এবং পুরাতন। অজীর্ণ রোগী যত বড়ো ডাক্তারের নিকট উপদেশ লইতে যাক সকলেই বলিবেন, তুমি পথ্যসংযম করো। কিন্তু রোগী যদি বলে 'ওটা কোনো কাজের কথা হইল না— আমি ঘৃতপক্ক অখাদ্য খাইবই, এবং ক্ষুধার অবস্থা যেমনই থাক্ আহারের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিব, তুমি যদি বড়ো ডাক্তার হও আমাকে একটা চিকিৎসার উপায় বলিয়া দাও'— তবে সে রোগীর নিকট খাদ্য পরিবর্তন, বায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্বের সমস্ত মূলনীতিই নিতান্ত বাজে এবং সাধারণ কথা বলিয়াই মনে হইবে।

বিবাহ করিতে উদ্যত কোনো যুবকের প্রতি পাঞ্চ পত্রিকার একটি অত্যন্ত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ ছিল— সেটি এই— 'এমন কাজ করিয়ো না!' অপব্যয় করিতে উদ্যত গবর্মেন্টের প্রতিও এতদপেক্ষা সহজ এবং সংগত উপদেশ হইতে পারে না। ফেরোজ শা মেটা সেই উপদেশটি দিয়াছিলেন— তাহাতেই কর্তারা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন ইহা কোনো কাজের উপদেশ হইল না।

বেয়াদব

কৌন্সিল সভায় একটা নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাতেই রাজপুরুষেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন মন্ত্রণাকার্য যেন যন্ত্রের মতো চলিয়া আসিতেছিল এখন হঠাৎ তাহারই মাঝখানে একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোটো হইতে বড়োকর্তা পর্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মন্ত্রিসভার গম্বুজের মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের মতো এমন একটা সজীব পদার্থকে হঠাৎ আনয়ন করা কেহ প্রত্যাশা করে নাই— কৌন্সিল সভায় এত বড়ো বেয়াদবি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু, হায়, এই অবাধ্য বেয়াদবটিকে আর তো চাপিয়া রাখা যায় না। এ এখন সর্বত্রই প্রবেশ করিতেছে। সভা, সমিতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সমুদ্রপারের পার্লামেন্টপরিষদ, সর্বত্রই ইহার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। অবশেষে সজীব ভারতবর্ষ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গমতম স্থানের দ্বারমোচন করিয়াছে, সে ভারত মন্ত্রিসভায় প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাঁহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের হৃদয় এমন অসম্ভব স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেই ফিরোজ শা মেটার নিকট অল্পকাল হইল আমরা ভারতবাসী প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই উপলক্ষে গবর্মেন্ট এবং প্রজার মধ্যে আর-একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। মন্ত্রিসভায় এক পক্ষে ভারতবর্ষ এবং অন্যপক্ষে গবর্মেন্ট দণ্ডায়মান হইলেন; ইহাতে মাঝে মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হইবেই। সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে জীবন প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই জীবনের যুদ্ধ অনিবার্য।

কিন্তু আমরা দুর্বল পক্ষ। এ সংঘাতে কি আমাদের ভালো হইবে? যাঁহারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্র্যাক্‌টিক্যাল ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনেক সময় নিরাশ হইবেন, অনেক সময় কেবল দলাদলির জিদ্‌ বজায় রাখিতে গিয়া গবর্মেন্ট আমাদের সংগত প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে গায়ের জোর একমাত্র জোর নহে; ক্রমশ আমরাই আবিষ্কার করিতে থাকিব যে যুক্তির বল, ঐক্যের বল, নিষ্ঠার বল, অধ্যবসায়ের বল সামান্য নহে। আমরা নিজে যুঝিয়া চেষ্টা করিয়া যতটুকু ক্ষুদ্র ফল পাই সেও পরের অযাচিত বদান্যতার অপেক্ষা মহত্তর।

আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। সম্ভবত অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন-কি, অনভিজ্ঞতাবশত আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না। অতএব ভারত মন্ত্রিসভায় যে লোক আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন রাজপুরুষেরা তাঁহার উপদেশকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করুন, তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হউক, তথাপি তাঁহাকে আমরা ভারতবাসীরা যে আপনার লোক বলিয়া এক সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিতেছি সেই আনন্দের মূল্য নাই। তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।

এক্ষণে কর্তৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষের নবজাগ্রত হৃদয়টি যদি তাঁহাদের রাজসভায়, আরামশালায়, পাঠ্যপুস্তকে, তাঁহাদের সুখস্বপ্নে, তাঁহাদের সুরচিত সংকল্পের মাঝখানে গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করে তবে তাহার সেই বেয়াদবিটি মাপ করিতে হইবে। হৃদয় জিনিসটাই বেয়াদব— তাঁহাদের নিজের পার্লামেন্টে, সাহিত্যে, সমাজে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যে ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদের অতিমাত্র অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহার একটা কারণ, ভারতবর্ষ বাসকালে হৃদয়ের চর্চা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হইয়া গেছে। অন্য কোনো কারণ আছে কি না জানি না।

কথামালার একটি গল্প

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ওই-সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ওই-সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই-সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ওই-সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল। —'কথামালা', পৃ. ৩৮

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোনো গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন— কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

সাধনা
বৈশাখ ১৩০২

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার ইংরাজ কর্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কীরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোনো দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ল্যুকস্ সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সব্‌ডিবিশনের হর্তাকর্তা। তাঁহার ভৃত্য সেই অভিমানে রেলওয়ে পুলিসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলওয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। পুলিস ইন্সপেক্টর তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহেবের সেবককে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায়, রাত্রি পর্যন্ত নিজের বাড়িতে ধরিয়া রাখে।— আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন— বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ তাহারা আমাদিগকে বড়ো মারে, আমাদের বড়ো লাগে!

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষ্য পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোনো সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না— কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-বোধ নাই তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোনো মর্ত্য গবর্নমেন্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্নমেন্ট কি কখনো প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক, পারেন; মনে করা যাক গবর্নমেন্ট এমন এক আশ্চর্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কী হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল? গবর্মেন্টের সতর্কতা যখনই শিথিল হইবে তখনই তো উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নতপৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে

নহে, চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না— সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মতো আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি!

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন যে, ইংরাজ গবর্মেন্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে শিখাইতেছেন— সম্পাদক মহাশয় এ কথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্মেন্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখাইতেছেন? যখন ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য করিয়া আদর পাইবার জন্য বাড়িতে কাঁদিতে আসে তখন অতিবৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় সেই পরকে গৃহ-কোণ হইতে বাপান্ত করিতে বসার চেয়ে ছেলেটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্— এবং চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেন্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্।

জাতীয় আদর্শ

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি, আহা, আমরা বড়ো দুর্বল— আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না— আমাদিগকে যদি কেহ অপমান করে তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম— অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড— শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতায় লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া আমাদের সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র চলিয়া যায়, আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের অঙ্কুরমাত্র উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে— সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে— তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট বেল্ কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভালো কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল তাহার মতো অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাউীচি কোনো জমিদার বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই-সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পরজাতিকে স্পর্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব দেশহিতৈষিতা

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা

দেবতা— সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় এজন্য আমাদের সম্পাদক সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা, কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব দেবতা— আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি— আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব করিব, এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব, এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব— অহংকার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশহিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর

পাশবতা সকল দেশেই আছে— কেবল তাহা নানাপ্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোনো প্রকার শাসন নাই। সেইজন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নিয়া আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপনকালে য়ুরোপীয়েরা আজ অনিয়ন্ত্রিত বর্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। নাইট্ নামক এক ইংরাজ ভ্রমণকারী অল্পদিন হইল কাশ্মীর ও তাহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিল— সেই ব্যক্তি "Where three empires meet" নামক এক ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্বজাতি সম্বন্ধে ইংরাজের অপরিমেয় অন্ধ অহংকার, এবং দেশীয়দের প্রতি তাহার অত্যুগ্র অশিষ্ট ঔদ্ধত্য পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের অনেক গ্রন্থেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর— তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া গভর্নমেণ্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা

হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভার অর্ডর-বুকে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে একই সময়ে সিবিল সর্বিস্ পরীক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজি -কর্তৃক নিম্নলিখিত মোশনের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ ভারতবাসীর নিকট নিবেদন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রচুর স্বাক্ষরসমেত বহুল আবেদনপত্র শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজির যোগে পার্লামেন্টে প্রেরণ করিলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মোশনের বিজ্ঞাপন

মিস্টার নওরোজি— সিবিল সর্বিস্ (ইন্ডিয়া) (ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে সমকালীন প্রকাশ্য পরীক্ষা)— যে, এই সভার মতে ব্রিটিশ প্রতাপের স্থায়িত্ব এবং ভারতবাসীর রাজভক্তি,

রাজবিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পের বহুল পরিমাণে বিস্তার করিতে হইলে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের অ্যাক্টের প্রতিজ্ঞা সকল, সিপাই বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, দিল্লির দরবারে সম্রাজ্ঞী উপাধিধারণকালীন ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, এবং মহামহিমান্বিতা রাজ্ঞী ও ভারতসম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎবার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসব-ঘোষণাপত্রগুলির পুনঃপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, রাষ্ট্রনীতির অন্যান্য সংস্কার সাধনের মধ্যে, ৩রা জুন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে বর্তমান সভা -কর্তৃক নিম্নলিখিত রেজোল্যুশন গ্রাহ্য হইয়াছিল তাহাকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক :—

যে, এ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিস পদপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র ইংলন্ডে যে প্রকাশ্য পরীক্ষাসকল নির্ধারিত ছিল এক্ষণ হইতে তাহা ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ড উভয়ত্রই সম্পাদিত হইতে থাকিবে— এই-সকল পরীক্ষা উভয় দেশেই সমান প্রকৃতির হইবে এবং যাঁহারা পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা সকলেই যোগ্যতা অনুসারে এক তালিকায় শ্রেণীভুক্ত হইতে থাকিবেন।

মতের আশ্চর্য ঐক্য

পাঠকদের স্মরণ আছে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সভায় 'সাধনা'-সম্পাদক "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে আমাদের বান্ধব শ্রীমান যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে 'অনুমান' করিয়া লইয়াছেন যে, যাহাতে 'গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমেরও সম্ভাবনা হয়' আমাদের পঠিত প্রবন্ধের এমন গোপন উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। আমাদের 'মাতৃভাষাবৎসলতার ঠাঁট' যে 'অলীক' তাহাও তাঁহার সূতীক্ষ্ণ এবং উদার অনুমানশক্তির নিকট ধরা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমান যোগিনীমোহনের প্রতি আমাদের একটিমাত্র বক্তব্য আছে— নানা স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ অন্ধ এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহা 'অলীক' এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি যে কেবল আমাদের প্রতি অন্যায় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; সত্যের প্রতি যে-সকল ভদ্রজনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাঁহারা অন্যকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করে।

মতের ঐক্য আমরা সকলেরই কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না, অতএব শ্রীমান যোগিনীমোহন আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইলে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কোথাও আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেন নাই। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা; তাহা যে ভারতবর্ষের নানা বিভিন্ন জাতির ভাষা হইবে এ কথা আমরা বলি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ অথবা বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা উঠিয়া গিয়া বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হউক এমন কথারও আমরা কুত্রাপি আভাস দিই নাই, অতএব আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে যোগিনীমোহন ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতবিরোধ নাই এবং উক্ত চিন্তাশীল সারগর্ভ রচনা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল না।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। ভাষা শিক্ষা ও বিষয় শিক্ষা উভয়ই ছাত্রদের পক্ষে অত্যাবশ্যক— কিন্তু বিদেশী ভাষা যথাকথঞ্চিৎ

আয়ত্ত হইতে-না-হইতেই সেই ভাষাতেই যদি বিষয় শিক্ষা দিবার উপক্রম করা যায় তবে তাহাতে ভাষা শিক্ষা এবং বিষয়শিক্ষা উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। না বুঝিয়া অনবরত মুখস্থ করিতে যে সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় তাহাই রীতিমতো ভাষাশিক্ষায় প্রয়োগ করিলে উক্ত শিক্ষা অনেক পরিমাণে সম্পূর্ণতা লাভ করে। যাহারা এককালে দুই হাতে দুই লাঠি লইয়া খেলে, তাহারা শিক্ষাকালে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক হাতের অভ্যাস করিয়া পরে দুই হাত মিলাইয়া লয়। সেইরূপ, আমাদের মতে, অন্তত এন্ট্রেন্স পর্যন্ত ভাষা এবং বিষয়কে স্বতন্ত্ররূপে আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়কে একত্র মিলাইয়া লওয়া কর্তব্য। শিক্ষা এবং পরীক্ষা দুই ভাষায় হইলে যাহা ইংরাজিতে শিক্ষা করি তাহা বাংলায় এবং যাহা বাংলায় শিখি তাহা ইংরাজিতে পরখ করিয়া লওয়া যায়— নতুবা মুখস্থ বিদ্যার অন্তরালে যে সুগভীর শূন্যতা থাকিয়া যায় তাহার আবিষ্কার এবং সংশোধন করিবার কোনো উপায় দেখা যায় না।

জাতীয় সাহিত্য

আমরা "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি "ন্যাশনাল" শব্দের স্থলে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমত, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাংলা সাহিত্যে ন্যাশনাল্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। 'সাহিত্য' শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও সাহিত্য শব্দটিকে ইংরাজি 'লিটারেচর' অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে, লিটারেচর শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে : 'মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টি রঘু কুমারসম্ভব মাঘ ভারবি মেঘদূত বিদগ্ধমুখমণ্ডন শান্তিশতক প্রভৃতয়ঃ।' এমন-কি, রামায়ণ-মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এইজন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'বাঙ্‌ময়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে :

লিপেযথাবদ্ গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিবদ্ধ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন্' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে 'নেশন্' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি,—বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল্' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য' শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলর লিট্‌রেচর' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির 'জাতীয়' বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য, যে বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে

নহে, সমস্ত জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০২

ভ্রম স্বীকার

গত জ্যৈষ্ঠমাসের 'সাহিত্য' পত্রে "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ সমালোচনায় উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ লইয়া একটি বিরূপবক্র নোট ছিল। ভ্রমক্রমে উক্ত নোট 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত মনে করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং সবিস্তারে তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু পুনর্বার পাঠ করিয়া জানিলাম যে সেই নোটটুকুও প্রবন্ধলেখক শ্রীমান যোগিনীমোহনের স্বরচিত। এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য আমরা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আষাঢ় মাসের সাহিত্যেও শ্রীমান লেখক পুনশ্চ তর্ক তুলিয়াছেন; তাহা পড়িয়া এইটুকু স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই আলোচনায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছে। কিন্তু আর কিছুই স্পষ্ট বুঝিবার জো নাই।

চিত্রল অধিকার

চিত্রলের লড়াই তো শেষ হইল। এক্ষণে তাহার দখল রাখা লইয়া কাগজের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই বিস্তর ইংরাজ সেনানায়ক এবং ভূতপূর্ব ভারতশাসনকর্তা সমবেত হইয়াছেন। চিত্রলের দখল ত্যাগ করার পক্ষে অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা লড়িতেছেন, কিন্তু কোন্ পক্ষে আমাদের ভারতরথের সারথি জনার্দন আছেন এখনও তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভারতরক্ষার পক্ষে চিত্রল অধিকারের উপযোগিতা যে নাই এবং যদি থাকে তবে অপব্যয়ের তুলনায় তাহা অতি যৎসামান্য এ কথা অনেক প্রামাণ্য সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারা ইহাও বলেন, ইংরাজ-অধিকারে রাস্তাঘাট নির্মাণ হইয়া চিত্রলের স্বাভাবিক দুর্গমতা দূর হইয়া যাইবে সেটা শত্রুর পক্ষে অসুবিধাজনক নহে।

কিন্তু ইঁহারা একটা কথা কেহই বলিতেছেন না। বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ইংরাজের নাই। অনর্থক অনাবশ্যক স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অযথা ঔদ্ধত্যের দ্বারা শান্তির জায়গায় অশান্তি আনয়ন করিবার অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজ জাতির আছে। চিত্রলের পথ সুগম হইল, এখন মাঝে মাঝে এক-এক ইংরাজ শিকারী কাঁধে এক বন্দুক তুলিয়া পার্বত্য ছাগ শিকারে বাহির হইবেন এবং অপরিমেয় দম্ভের দ্বারা দেশবাসীদিগকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিবেন। অতএব, চিত্রলের পথঘাট বাঁধিয়া দিয়া শত্রু-আগমনের পথ সুগম করা হইতেছে বলিয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন হইতে পারে কিন্তু পথ সুগম হইলে ইংরাজের সমাগম বাড়িবে, ইংরাজরাজ্যের এবং পার্বত্য জাতির শান্তির পক্ষে সেও একটা কম আশঙ্কার বিষয় নহে।

ইংরাজের লোকপ্রিয়তা

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইংরাজ এক দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করিয়া থাকেন, যে, তাঁহারা বড়ো লোকপ্রিয়। যেখানে পদার্পণ করেন সেখানকার লোকেই তাঁহাদিগকে মা-বাপ বলিয়া জানে। তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, ইজিপ্টের প্রজাবর্গ তাঁহাদিগকে পরম সুহৃদ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাসপ্রিয়তা, যে, সেই দেশের লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আইনবন্ধনহীন সরাসরি বিচারের ভার নিজের হস্তে লইতে উদ্যত। সেখানকার লোকে তাঁহাদের প্রতি যে-সকল গুরুতর উপদ্রব আরম্ভ করিতেছে তাঁহাদের বিশ্বাস সেখানকার বিচারক তাহার উপযুক্ত শাসন করে না— তাঁহাদের প্রতি সাধারণের এতই প্রবল ভালোবাসা।

কর্তৃপক্ষেরা হয়তো ক্ষাপা হইবেন (কারণ, এখানে তাঁহারা কর্তৃপক্ষ) কিন্তু আমরা যদি ইজিপ্টে তাঁহাদের নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলি যে, ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয় উৎপীড়নের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে না দিলে ইংরাজ জুরির নিকট দেশীয় হতভাগ্যের সুবিচার প্রাপ্তির আশা অত্যল্প তবে সেটা কি অসংগত শুনিতে হয়?

কিন্তু ইংরাজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইজিপ্টে তিনি লোকপ্রিয় পরমসুহৃদ্, এবং ভারতবর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত সুবিচারক।

ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য

নিজেদের জাতিগত দোষগুলির প্রতি ইংরাজদের এমন একটি স্নেহদৃষ্টি আছে যে, এক-এক সময় তাহা দেখিলে আঘাতও লাগে এবং হাসিও পায়। ইংলন্ডের 'স্পেক্টেটর' পরম খৃস্টান কাগজ। কিন্তু সেই কাগজে '*With Wilson in Matabeleland*' নামক গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার মধ্যে একস্থলে লিখিত হইয়াছে : "We have never seen the delight in killing, which is perhaps a normal trait in healthy human male animals, so frankly expressed as in these pages." অর্থাৎ বধস্পৃহা সুস্থপ্রকৃতি পুরুষজাতীয় মানবপ্রাণীর একটা স্বাভাবিক ধর্ম এ কথা সমালোচক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাতে বধস্পৃহার প্রশংসা বুঝাইতেছে না, কিন্তু ওই সুস্থপ্রকৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া এই বধস্পৃহার প্রতি বিশেষ একটু স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পাদক স্বজাতিসুলভ দোষের প্রতি মমতানুভব করিবার কালে এ কথা ভুলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের আদর্শ অনুসারে যিশুখৃস্টের মতো রোগজীর্ণ প্রকৃতির দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। এই স্বজাতিসুলভ দোষগুলির প্রতি ইংরাজের বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে এতগুলি ইংরাজ উপর্যুপরি এতদ্দেশীয়কে হত্যা করিতেছে এবং উপর্যুপরি নিষ্কৃতিও পাইতেছে। এতগুলি ইংরাজকে যদি দেশীয়রা হত্যা করিত তবে তাঁহারা যে পরিমাণে রাগ করিতেন ও প্রতিহিংসা ও প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন দেশীয় হত্যায় তাঁহাদের সে পরিমাণ ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন একজন 'টমি অ্যাটকিন্স' সামান্য রাগ হইলেই কেন একজন দেশীয় কালো লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। তাঁহারা সেটাকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু মনের এক কোণে এই কথা উদয় হয় যে ওটা সুস্থপ্রকৃতি টমি অ্যাটকিন্সের স্বাভাবিক ধর্ম।

ইংরাজের লোকলজ্জা

দেখিলাম, 'টাইম্‌স্‌' পত্রে একজন ইংরাজ লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্রল অধিকার করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ইংরাজের এই অনিশ্চিত আগুপিছু পলিসি লইয়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজসভায় এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা উত্থাপিত হইবে। আমরা দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম যে, ভারতবাসীদের নিকটেও সময়ে সময়ে ইংরাজ লোকলজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলে লজ্জার কোনো কারণ দেখি না। একটা দেশ জয় করিয়া অপরাধীদিগকে শাসন করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া আসিলে ইংরাজের সেই নির্লোভ উদারতা ভারতবর্ষের নিকট প্রশংসার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে।

কিন্তু যথার্থ যদি ইংরাজের তিলমাত্র লোকলজ্জা থাকে তবে গরিব ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকা লইয়া মহারানীর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আতিথ্য করিতে ক্ষান্ত থাকা তাঁহাদের কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট মহারানীর নামে এই হীনতা-কলঙ্ক প্রচার না করিলেই ভালো হয়। গরীবের অর্থে রাজার আতিথ্য রাজোচিত দেখিতে হয় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও উলুখড়ের প্রাণ যায় আবার রাজায় রাজায় বন্ধুত্বের বেলাও উলুখড় বেচারার পরিত্রাণ নাই।

তাহা ছাড়া, স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া, কাবুলের মন পাইবার জন্য নসেরুল্লাকে লইয়া এমন অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে দেশীয় রাজা ও প্রজার নিকটে মহারানীর সম্মান যে কতখানি খর্ব হইতেছে তাহা ইংরাজ অন্ধভাবে বিস্মৃত হইতেছেন। নসেরুল্লাকে যদি মহারানী নিজের অতিথিভাবেই অভ্যর্থনা করিতেন তবে তাহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু এই আতিথ্যকে ভারত-রাজকীয় পলিসির অঙ্গ করিয়া লইয়া ভারত ভাণ্ডার হইতে অর্থ লইবার উপক্রম করাতে ইংরাজের মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যে ইংরাজের ঔদ্ধত্য ও অভিমান জগদ্‌বিখ্যাত, কাজ উদ্ধারের সময় সেই ইংরাজের মেরুদণ্ড কাবুলের পাঠানের নিকটে এমন অনায়াসে অবনত হইতেছে ইহা লইয়া কি হাসিবার লোক কেহই নাই? শুনা যাইতেছে অনেক মুকুটধারী য়ুরোপীয় রাজাও ইংলণ্ডে এরূপ আতিথ্য লাভ করেন নাই। পলিসিও যে খুব পাকা তাহা বলিতে পারি না। পদ্মাতীরে বালুভিত্তির উপর বহুব্যয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করা সংগত নহে, সেখানে অল্প খরচে ক্ষণিক বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়। কাবুলের সহিত বহুব্যয়সাধ্য সখ্য নির্মাণও সেইরূপ অবিবেচনার কাজ। কাবুলের সিংহাসন ইংরাজের বহুমূল্য সখ্যসমেত আজ বাদে কাল ধসিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, অতএব কাবুলের মতো রাজ্যের সহিত স্বল্পব্যয়ে ক্ষণিক সখ্যের আয়োজন রাখাই সংগত। ভারতবর্ষের বহুকষ্টসঞ্চিত রাজভাণ্ডার তাহার পদমূলে উজাড় করিয়া দিলেও কাবুলের সিংহাসন এক বংশে স্থায়ী হইবে না।

প্রাচী ও প্রতীচী

নসেরুল্লার একটি আচরণে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য প্রথার প্রতি সর্বদাই নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এবারে নসেরুল্লা প্রাচ্য সভ্যতার তরফ হইতে পাশ্চাত্য বর্বর প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। রাজপুত্র লেডি টুইড্‌মাউথের নৃত্যোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অভ্যাগত মহিলাদের উত্তরাঙ্গের বিবস্ত্রতা দর্শনে এতই লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন যে, ঘরে প্রবেশ না করিয়া বহিঃকক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নসেরুল্লা লেডি ল্যান্সডাউনের হস্ত ধরিয়া ভোজনাগারে লইয়া যাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু লেডির অনাবৃত হস্ত দেখিয়া তিনি ভদ্রোচিত সংকোচ প্রকাশপূর্বক করগ্রহণ না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাতে মহিলাদের প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচ্য রাজপুত্রের মনে যে সভ্যতার আদর্শ বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপেক্ষা করাও তাঁহার কর্তব্য হইত না।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০২

নূতন সংস্করণ

নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর নূতন জ্ঞান উপার্জন করিয়া, পুরাতনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা হারান নাই বটে, কিন্তু রুচির পরিবর্তন হওয়াতে তাঁহারা উহাকে অধুনাতনের সঞ্চিত মলিন আবরণশুদ্ধ গ্রহণ করিতে বড়োই কুণ্ঠিত।

মনুষ্যজীবনকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কবিত্বময় কল্পনার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে সংসারের দৈনিক বৈষয়িক ভাবনার কালুষ্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য ও আবশ্যকতা বুঝিয়াও, সেগুলিকে তাঁহাদের আধুনিক অর্থশূন্য কবিত্বহীন অসুন্দর আকারে অবলম্বন করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলের একদল নব্য হিন্দু এই সমস্যা মীমাংসার যেরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন তাহা পাঠকদের বিবেচনার নিমিত্ত বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা পুরাতন গঠনের আদিম সৌন্দর্যকে তাহার হীন ও মলিন বেশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে চাহেন। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও উপায় স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রাম-নবমীর দিনে রামকে দেবতারূপে পূজা করায়, দেবাধিদেব পরমেশ্বরের মহিমা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের সাহিত্য-মর্যাদা যুগপৎ খর্ব হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু রাম-নবমীর দিন উৎসবে যোগ না দিয়া প্রচলিত কুসংস্কারে গালি দিয়া তাঁহারা কোনো সান্ত্বনা অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত শুভদিবস উপলক্ষে উৎসবক্ষেত্রে সকলে উপস্থিত হইয়া, ভোজনাদি আমোদপ্রমোদরূপ উৎসবের বাহ্য অঙ্গের পরে, কথকতা কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব-রসাস্বাদন করিবেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদির দ্বারা উহার সাহিত্যনৈপুণ্য ও নীতি-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

শ্রাবণ মাসের দিনবিশেষে ব্রাহ্মণদের পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপবীত গ্রহণ করিবার রীতি আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে, এইরূপ সূত্রগুচ্ছ পরিবর্তন এবং তাহার সহিত মন্ত্র উচ্চারণ ও পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলেও তাঁহারা কোনো প্রকার আমোদ বা তৃপ্তি অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই দিবসকে মহৎ সংকল্প স্থির করিবার ও ব্রত গ্রহণ করিবার কার্যে উৎসর্গ করিতে চাহেন; একত্র মিলিত হইয়া স্মরণ করিতে চাহেন যে গলায় উপবীতধারণ করিয়া নিজেকে সর্বোচ্চ জাতির মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করা কী দারুণ দাম্ভিকতার কাজ; এবং বৎসরের মধ্যে অন্তত এই একবার অনুভব করিতে চাহেন যে, যে পবিত্র উপবীত পূর্ব মহর্ষিরা করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত হইতে গেলে, অতি বিনীতভাবে নিজ হীনতা স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ জন্মের সুমহৎ দায়িত্ব বুঝিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে সত্যের ও মহত্ত্বের প্রতি কায়মনোবাক্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের নব্য হিন্দু সম্প্রদায় এইরূপে প্রত্যেক উৎসব ও পবিত্র দিবসকে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন। উল্লিখিত সমস্যার এইরূপ সুন্দর মীমাংসা আমাদের দেশে

প্রচলিত হইবার উপযুক্ত। আমাদেরও প্রত্যেক শুভকার্যের সহিত যে-সকল সুরুচিবিরুদ্ধ ও অপ্রীতিকর প্রথা জড়িত আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে নব্য হিন্দুরা নব উৎসাহে সেগুলিতে যোগ দিতে পারেন।

জাতিভেদ

'স্টেট্‌সম্যান' পত্রে কিছু দিন ধরিয়া জাতিভেদ ও বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

দেখা গিয়াছে, লেখকদিগের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করিয়াছেন যে, য়ুরোপ প্রভৃতি অন্য সকল সভ্য দেশেই নানা আকারে জাতিভেদ বিরাজ করিতেছে।

সভ্য মনুষ্য যেমন ইঁটকাঠের ঘরে থাকে, তেমনি তাহার সামাজিক ঘর আছে; সেই ঘরগুলির নাম সম্প্রদায়। সামাজিক মনুষ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। সভা, সমিতি, ধর্মসম্প্রদায়, রাজনৈতিক সম্প্রদায়, আচারগত সম্প্রদায়— বৃহৎ সমাজমাত্রেই এমন নানাবিধ বিভাগের সৃষ্টি হয়। যে মূল নিয়মের প্রবর্তনায় মানুষ সমাজবন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই নিয়মেরই প্রভাব সমাজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কার্য করিয়া তাহার মধ্যে স্বভাবতই বিচিত্র শ্রেণীভেদ জন্মাইতে থাকে। সমাজবন্ধনের ন্যায় সম্প্রদায়বন্ধনও মানুষের স্বাভাবিক গৃহ, তাহার আশ্রয়স্থল।

কিন্তু গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে যেমন ছাদ প্রাচীর গাঁথিতে হয়, তেমনি দরজা জান্‌লা বসানোও অত্যাবশ্যক। গৃহ যেমন কতক অংশে বদ্ধ, তেমনি তাহা কতক অংশে মুক্ত। এই জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গৃহ গোরস্থানে পরিণত হয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

সম্প্রদায়-গৃহের মধ্যেও যাতায়াতের দ্বার থাকা চাই; ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে আসিবার পথ থাকিলে তবেই তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় নতুবা তাহা মৃত্যুর আবাসভূমি হইয়া উঠে।

য়ুরোপে বিশেষ গুণ বা কীর্তিদ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোক অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে জন্ম ব্যতীত জাতিবিশেষের মধ্যে অন্য কোনোরূপ প্রবেশোপায় নাই।

প্রতিবাদকারীগণ বলেন, পূর্বে এরূপ ছিল না, এবং দেশের স্বাধীন রাজা থাকিলে এরূপ থাকিত না। কিন্তু এ বৃথা তর্কে আমাদের লাভই বা কী, সান্ত্বনাই বা কোথায়?

বিবাহে পণগ্রহণ

পুরুষ যখন কোনো বিশেষ কন্যাকে বিবাহ করে অবশ্যই তাহার কোনো বিশেষ কারণ থাকে। হয়, তাহাকে ভালোবাসে, নয়, তাহার কুলশীল রূপগুণ অথবা অর্থের আকর্ষণে বদ্ধ হয়। আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স অল্প, এবং তাহার সহিত বিবাহযোগ্য পুরুষের পরিচয় থাকে না সুতরাং বিবাহের পূর্বে ভালোবাসার কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কন্যার কী কী গুণ আছে এবং কালক্রমে কী কী গুণ ফুটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেবল কন্যাকর্তারা এবং অন্তর্যামীই জানেন। রূপ জিনিসটা দুর্লভ এবং বাল্য-সৌন্দর্য যুবকের চিত্তে অনতিক্রমণীয় মোহসঞ্চার করে না। আজকালকার ছেলেদের কাছে কুলগৌরবের বিশেষ কোনো মর্যাদা নাই। তবে একজন বুদ্ধিমান জীব কী দেখিয়া আমৃত্যু কালের জন্য সংসারভার মাথায় তুলিয়া লইবে?

সে কি পঞ্জিকার বিশেষ একটা দিনস্থির করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া যে-কোনো কন্যাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই বিবাহ করিবে? সে কি কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাভার মোচনের জন্যই সংসারে আগমন করিয়াছিল?

মনুর বিধানের ফলে আমাদের দেশে একটি বিবাহযোগ্য পুরুষকে যখন কন্যার পিতা দশজনে আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহাকে কোনো একটা বিশেষ সদ্‌বিবেচনার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্বাচন করিতে হইবে— যদি তাহা না করে তবে সে গর্দভ, এবং দশটি কন্যাদায়িকেরই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র অথবা বাহির হইবার পূর্বেই তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য টানাটানি চলিতে থাকে। তখন তাহার সম্মুখে তরঙ্গসংকুল অকূল সংসার, এবং সেই সংকটসমুদ্রে পার হইবার উপায় অর্থ তরণী। তুমি নিজের স্কন্ধ হইতে একটি ভার লইয়া আর-একটি বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে ওই অকূল সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও; সে সহজেই বলিতে পারে, আগে নৌকার সন্ধান দাও তাহার পরে তোমার বোঝাটি লইয়া আমি এই পারাবারে অবতীর্ণ হইতে পারি নতুবা ওটিকে কাঁধে করিয়া আমি সন্তরণ করিতে পারিব না— আজকালকার দিনে নিজের ভার সংবরণ করাই দুঃসাধ্য।

এই প্রস্তাবের জন্য ছেলেটিকে নিন্দা করা যায় না। অথচ যে সম্বন্ধ চিরজীবনের নিকটতম সম্বন্ধ আরম্ভকালেই সে সম্বন্ধকে ইতর দোকানদারির দ্বারা কলুষিত করিয়া তুলিতে আত্মসম্মানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ধিক্কার অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের মূলেই হয় প্রীতি, নয় স্বার্থ। যেখানে প্রীতিসম্বন্ধের পথ নাই সেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ ব্যতীত কী আশা করিতে পারি!

অতএব, দোষ দিতে হইলে সমাজবিধানকেই দোষ দিতে হয়, যে ব্যক্তি পণ লইয়া বিবাহ করে তাহাকে নহে। একটু সবুর করো, যুবকটিকে নিজের চেষ্টায় ও উপার্জনে স্বাধীন হইতে দাও, তাহার পরে সে যখন নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন যদি টাকার জন্য হাত বাড়াইয়া বসে তবে তাহাকে নির্লজ্জ অভদ্র অর্থলোলুপ অযোগ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে পারো। যতক্ষণ তাহার পক্ষে কোনো বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং তোমার পক্ষে স্বার্থ, ততক্ষণ স্বার্থের বিনিময়েই স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে হইবে ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়মকে কোনো আইন অথবা আবদারের দ্বারা পরাহত করা সম্ভব নহে।

ইংরাজের কাপুরুষতা

আসানসোল স্টেশনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার করা অপরাধে কয়েকজন রেলওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজ অথবা ফিরিঙ্গি কর্মচারী অভিযুক্ত হয়। হাজির আসামীগণ জুরির বিচারে খালাস পাইয়াছে। এ সংবাদ যে-কোনো ভারতবর্ষীয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে সকলেরই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদের ধারণা ছিল, বলিষ্ঠ স্বভাববশত অবলাজাতির প্রতি ইংরাজ পুরুষের একটি বিশেষ স্নেহ আছে। কিন্তু উক্ত নিদারুণ পাশবাচারে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের পক্ষ হইতে যখন তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অপরিসীম বিজাতিবিদ্বেষে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্বগর্বে বীরজাতিরও পৌরুষ নষ্ট করে।

আমাদের প্রভুরা বলিতে পারেন, আইনমতে যাহার বিচার হইয়াছে তাহার উপরে আর কথা কী! ধরিয়া লইলাম সুবিচার করা হইয়াছে, আইন এবং অভিযুক্ত ইংরাজ উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু দেশের ইংরাজ এবং সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে এমন নীরব উদাসীন কেন? এ

ঘটনায় তাঁহাদের মনে তিলমাত্র ঘৃণা রোষের উদ্রেক হয় নাই? বালিকা যদি ইংরাজ ও উপদ্রবকারী যদি দেশীয় হইত তাহা হইলে ভারত জুড়িয়া তাঁহারা যেরূপ তূরী ভেরি পটহ নিনাদ করিয়া ভীষণ রণবাদ্য বাজাইতেন ততটা নাই আশা করিলাম কিন্তু কাহারো মুখে যে একটি শব্দ মাত্র নাই।

দুর্গম চিত্রলের যুদ্ধ জয় লইয়া ইংরাজ দেশে বিদেশে বীরত্বের আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ যে আন্তরিক কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যুদ্ধজয়গৌরবের অপেক্ষা তাহা অনেকগুণে গুরুতর। চিত্রল জয় করিয়া তাঁহারা শত্রুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় অধীন জাতির প্রতি এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আপন রাজ্যতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্বহস্তে পরম শত্রুতার বীজ রোপণ করিয়া রাখিতেছেন।

সাধনা
ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

সারস্বত সমাজ ১

১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২ তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উন্নতিসাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারও কাহারও মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্‌ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম-সকল বাংলায় কীরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে "ভিক্‌টো [রিয়া" বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্ত্যস্থ "ব" সহজেই...হইতে পারে। ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর ... ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃ[ষ্টান্ত] স্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ইংরাজি isthmus শব্দ কেহবা "ডমরু-মধ্য" কেহবা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনোটাই হয়তো সার্থক হয় নাই।— অতএব এই-সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্‌ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন— এই-সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে— যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

স্থির হইল— বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন-চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে [ন]তন সভ্য গৃহীত হইবেন। সভ্যগ্রহণ কার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন।

সভাপতি। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : শ্রাবণ ১২৮৯
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১, ১৯৬৫

সারস্বত সমাজ ২

১২৮৯ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমতো শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন— আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে— এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ-বা যোজক, কেহ- বা ডমরু-মধ্যস্থান কেহ- বা সংকটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সংকট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়— সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্তব্য।

Peninsula বাংলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটোই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক— এবং আর-কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজিতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসি প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই— কখনো এটা হয় কখনো ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেইসঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইন্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তিসুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাংলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাংলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোনো নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা— বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ

করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না— কিন্তু একটা পর্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়তো ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি— তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়— কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্বত আছে। আবার ফরাসিতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্যরক্ষা করিতে হইলে সর্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক-এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়— অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভালো হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন— সারস্বত সমাজের তিন-চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল—

প্রথম— ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক। দ্বিতীয়— তদ্‌বিষয়ে কী করা কর্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়— তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ— যে-সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : অগ্রহায়ণ ১২৯১
মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

বিশেষ বিজ্ঞাপন

ত্রৈমাসিক সাধনা

আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনা ত্রৈমাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বর্তমান ত্রিসংখ্যক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি বর্তমান সাধনা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক অগ্রিম মূল্য তিন টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার একমাস মধ্যে যাঁহারা সাধনার মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগকে নগদ ক্রেতাস্বরূপে গণ্য করা যাইবে। ত্রৈমাসিক সাধনার প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য এক টাকা।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
যোড়াসাঁকো
১৫ ভাদ্র ১৩০২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক
শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্যাধ্যক্ষ

প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন

ঢাকায় বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জনসভার যে অধিবেশন বসিয়াছিল তাহার সভাপতি ছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার উদ্‌বোধনের সারমর্ম নিম্নে বাংলায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মূল বক্তৃতার অসামান্য গাম্ভীর্য নৈপুণ্য ও তেজ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াছি কেবল তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে— আশা করি, পাঠকগণ ইহা হইতে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান রাজনীতির অবস্থা ও আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য, অনুবাদটি কালীচরণবাবুকে দেখাইবার অবকাশ পাই নাই, এজন্য যদি কোনো অনৈক্য অসংগতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—সম্পাদক।

আমাকে অদ্য আপনারা সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, সেজন্য যেমন আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ, তেমনি আপন অযোগ্যতা অনুভব করিয়া সংকুচিত। আমি আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিলাম কিন্তু আমাকে এই ভার প্রদানের জন্য আপনারাই দায়ী তাহা স্মরণ রাখিবেন। এক্ষণে ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ কামনা করি যে, এ সভা যেন প্রজাদের সহায় হয় এবং প্রজাপালকদেরও সাহায্য করে।

ভারতেশ্বরী মহারানীর মহৎজীবনের আরও একবৎসর কাল আমরা সৌভাগ্যস্বরূপে লাভ করিয়াছি।— যে উদার ঘোষণাপত্র তাঁহার রাজত্বের স্থায়ীকীর্তি, প্রার্থনা করি, তিনি বহুদীর্ঘকাল সজীব থাকিয়া তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে অটল ভিত্তির উপর স্থাপনপূর্বক প্রজাদিগকে আনন্দিত এবং আপন রাজবাক্যকে চরিতার্থ করিতে পারেন।

বর্ষে বর্ষে আমরা ইংলন্ডের প্রবীণ মহাপুরুষকে (Grand old man) তাঁহার জন্মোৎসবের আনন্দ-অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছি। রাজনৈতিক আকাশের সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অস্তমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকাকুল পরিবারের অশ্রুর সহিত অশ্রু সম্মিলিত করি, এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সহিত তাঁহার সেই মহাবাণী গ্রথিত করিয়া রাখি যে-বাণী অদ্য বিংশতি বৎসর হইল, তৎকালীন ভারতশাসনকর্তা-কর্তৃক প্রচলিত রাজদ্রোহীরচনা বিলের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে অখণ্ডনীয় বাণী আমরা বিরোধীপক্ষকে পরাভব করিবার জন্য মহাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন—

মহাশয়গণ, যদিও মধ্যে মধ্যে আমরা ভারতরক্ষাকার্যের সহিত ব্রিটিশ স্বার্থকে বিজড়িত করিয়া আমাদের সেই প্রথম ও পরম কর্তব্য হইতে— অর্থাৎ সেখানকার প্রজাবর্গের উন্নতিসাধনে আমাদের একান্ত সহায়তা এবং সুবুদ্ধি পরিচালনা হইতে— বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, তথাপি, একটিমাত্র উপায় আছে যদ্দ্বারা আমরা ভারতশাসনের দুরূহ কার্যকে আশাপ্রদ ও সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি— সে কেবল ভারতবাসীদের হিতের জন্য ভারতশাসনের চেষ্টা। আমরা যে এই ভিত্তির উপরে ভারতশাসনকার্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ইহা অত্যুক্তি নহে এবং ইহাও সত্য যে, ভারতবাসীগণ তাহা জানে ও বিশ্বাস করে। তাহাদের নালিশ করিবার অনেক বিষয় আছে, অন্তত এইরূপ তাহাদের ধারণা। দুঃখের সহিত বলিতেছি বর্তমান প্রেস অ্যাক্ট তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু আমি দেখিয়াছি— বিশেষত এই অ্যাক্টের পোষকস্বরূপে যে-সকল লেখা উদ্‌ধৃত করিয়া পাঠানো হইয়াছে তাহাই পাঠ করিয়া দেখিয়াছি— ভারতবর্ষের এই-সকল নালিশ বিশেষ বিশেষ হেতুগত। আমরা এ দেশে যেমন করি তাহারাও সেইরূপ গবর্মেন্টের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া অভিযোগ করে। যখন এমন কোনো আইন পাস হয় যাহাকে আমরা মন্দ জ্ঞান করি তখন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজার সহিত প্রজাসম্বন্ধ

বিচ্ছিন্ন করি না। সেইরূপ— যদি ভারতবাসীর অন্তঃকরণ আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি— তাহারাও বিশেষ ধারা অথবা বিশেষ আইনের প্রচলন সম্বন্ধেই আপত্তি প্রকাশ করে— কিন্তু ব্রিটিশ শাসন যে ভারতের পক্ষে হিতকারী তাহা অস্বীকার করিবার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যায় না, এবং যখন একটি উদ্‌ধৃত রচনায় দেখিলাম লেখক বলিতেছেন, যে, বর্তমান অবস্থায়— ব্রিটিশ রাজ্যের ধ্বংস নহে— প্রত্যুত তাহার স্থায়িত্বই ভারতবর্ষের সকল আশার আশ্রয়স্থান— তখন আমি বিস্ময় এবং বিস্ময়ের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ভালো, যখন এত দূরই অগ্রসর হইয়াছ, অথচ অনিবার্য অবস্থাবৈষম্যবশত যখন সমস্ত ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত রাজ্যবিধির মূল সূত্রপাত করিতেও যথেষ্ট দ্বিধা উপস্থিত হয়, তখন অন্তত এটুকু অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, যাহা আমরা দান করিব তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করিব না; সুতরাং, আমাদের স্বরাজ্যতন্ত্রে আমরা যে সর্বোচ্চ উপকারগুলি ভোগ করি, অর্থাৎ প্রজাগণ যে-সকল রাজকার্যবিধিতে ঔৎসুক্যবান তাহাকে প্রকাশ্যতা দান করা, এবং অন্যায় ও ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিচার ও আলোচনার উদ্দেশে তাহাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া— সেই অধিকার যখন আমরা ভারতবর্ষকে দান করিয়াছি; তখন বর্তমান ঘটনায় ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টের নিরতিশয় শঠকারিতা ও একান্ত গোপনতা পরম দুঃখের বিষয় হইয়াছে ; বিশেষত যখন এই ত্বরাতিশয্য ও মন্ত্রগুপ্তি কেবলমাত্র কোনো আংশিক সংশোধন ও পরিবর্তন-উদ্দেশে নহে, পরন্তু দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি গুরুতর আইনস্থাপনা উপলক্ষে।—

কনফারেন্সের গত অধিবেশনের পর আমরা আমাদের দেশের প্রবীণা মহানারীর মৃত্যুশোক অনুভব করিয়াছি— সেই কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ী যাঁহার দেশবিশ্রুত সদ্‌গুণ, ভারতবর্ষেরই সর্বসম্মত বিশেষ সদ্‌গুণ, দয়া। তাঁহার সেই দয়ায় প্রাচ্য দেশের মুক্তহস্ত বদান্যতা এবং প্রতীচ্যভাগের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা একত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের এই সভার প্রথম কর্তব্য, বাংলার নূতন শাসনকর্তাকে স্বাগত সম্ভাষণ। তিনি তাঁহার রাজাসনে পদক্ষেপমাত্রেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। প্রজাপালনের জন্য সার জন্ বুড্‌বর্ন যে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে উন্মুখ ইতিমধ্যে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন, গুরুতর সংকটের সময় রাজনীতিকে তিনি প্রজাদের প্রার্থনার অনুকূল করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রগৃহের আসনে বসিয়া তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত এবং তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংক্ষেপের উপায় উদ্‌ভাবনের জন্য মন্ত্রসভার বেসরকারি মন্ত্রীগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপে সার জন বাংলা দেশের ভবিষ্যৎকে আশার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

বৎসরটি দুর্দৈবের বৎসর চলিতেছে। ভূমিকম্পের আন্দোলনের মধ্যে গত কনফারেন্সের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের গাত্র হইতে দৈবনিগ্রহের ক্ষতচিহ্নগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইতেই পরে পরে দুর্ভিক্ষ এবং মারীর আবির্ভাব হইল। বিধাতার বিধানে অশুভ হইতেও শুভ ফল উৎপন্ন হয় গত দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই অন্নাভাবের দিনে বিপন্ন ভারতের প্রতি জগতের সর্বত্র হইতেই করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহৎ জাতির সহিত যে আমাদের এক বন্ধন আছে তাহা তাঁহারা এই উপলক্ষে স্বীকার করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু প্লেগে যেন কতকটা তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে; ইহাতে দুই জাতির হৃদয়বন্ধনে যেন কঠোর আঘাত করিয়াছে। রাজা-প্রজার পরস্পর বুঝাপড়ার অভাব হওয়াই তাহার মূল এবং শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যে অবাধ বার্তাবহনের অসম্পূর্ণতাই তাহার কারণ। জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতাগণ, যে, বার্তা প্রদানে বিরত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু গবর্মেন্ট তাঁহাদিগকে মন্ত্রণায় আহ্বান না করায় সর্বসাধারণেও তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে নাই। বোম্বাইয়ের দুর্বিপাক হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সার জন্ যে রাজনীতির অবতারণা করিয়াছেন

তাহাতে জননায়কদের হস্তেই এই মারীনিবারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের একটি বিশেষ সান্ত্বনার কথা আছে।— ইতিপূর্বে ম্যুনিসিপালিটির প্রতি এক অকারণ অভিযোগ আসিয়াছিল যে প্লেগসম্বন্ধীয় প্রতিকার বিধান তাহার সাধ্য নহে; এক্ষণে দেখা যাইতেছে লোকনায়কগণেরই সেই কাজ, সরকারি কর্মচারীদের দ্বারাই তাহা দুঃসাধ্য। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি, প্লেগনিবারণের জন্য আমরা গবর্মেন্টের অপেক্ষা কম উৎসুক নহি কিন্তু প্রমাণহীন নূতন পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে আমরা কুণ্ঠিত। উপযুক্ত পণ্ডিতদের যাহা বিধান হয় তাহা আমরা বহন করিতে প্রস্তুত আছি, এবং সেই বিধান পালনের ভার আমাদের নিজ হস্তে থাকিলে তাহার অনাবশ্যক কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে।

এক্ষণে আলোচ্য এই যে, প্রাদেশিক জনসভার উদ্দেশ্য কী। কন্‌গ্রেসে এবং কন্‌ফারেন্সে, ভারতজনসভা ও প্রাদেশিক জনসভায় এই প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, একটি সাম্রাজ্য-ব্যাপারঘটিত এবং আর-একটি কেবল প্রাদেশিক। কিন্তু কন্‌গ্রেসে যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কন্‌ফারেন্স তাহাতে বিশেষরূপ সাহায্য না করায় কন্‌গ্রেস ক্রমশ একঘেয়ে হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি এমন বন্দোবস্ত হয় যে, কনগ্রেসের আলোচিত প্রস্তাবগুলির তদন্তভার কনফারেন্সের বিশেষ বিশেষ বিভাগগত সেক্রেটারিদের হস্তে দেওয়া যায় এবং তাঁহারা সংবৎসরকাল সেই-সকল বিষয়ে স্থানীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বেসরকারি একটি শাসন-বিবরণী (administration report) প্রস্তুত করেন ও তাহা কনফারেন্সে গ্রাহ্য হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কনগ্রেসের সেক্রেটারির নিকট পাঠানো হয় এবং তিনি তাহা হইতে একটি সাধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কনগ্রেসে পাঠ করেন তবে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে। রাজ্যচালনার মূলনীতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বুঝিয়াছি কিন্তু দোষের বিষয় এই যে, রাজ্যের সংবাদ আমাদের অল্পই জানা আছে— সেইজন্য আমাদের কথার জোর নাই, এবং অনেক সময় সেই কারণেই বিপক্ষের নিকট আমাদের হার মানিতে হয়। বর্তমান প্রস্তাবে তাহার প্রতিকার সম্ভব।

কনফারেন্সেও যে-সকল বিশেষ বিষয়ের অবতারণা হয় তৎসম্বন্ধে যদি আমরা একবৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করি ও যথোচিত প্রস্তুত হইয়া আসি তাহা হইলে আমাদের এই কনফারেন্স তিন দিবসব্যাপী একটা ইন্দ্রজালের মতো হয় না— সমস্ত বৎসর তাহার কাজ থাকে।

কনফারেন্সের আরও একটি উদ্দেশ্য জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার। যদিও আমরা তাহাদের হিতেচ্ছা করি ও তাহাদের হিতকার্যে প্রবৃত্ত কিন্তু আরও নিকটভাবে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারিলে যথার্থ উপকার হয় না এবং বিপক্ষেও বলিবার পথ পায় যে আমরা সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহি। এই জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য গত কনফারেন্সে বাংলা ভাষায় কার্যনির্বাহের অবতারণা হয়। ইহা ছাড়া, সাধারণে, জলকষ্ট প্রভৃতি, যে-সকল বিষয়ে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট কনফারেন্সে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৎসরের আলোচনায় দুটি বিষয় বিশেষ করিয়া চক্ষে পড়ে; রাজদ্রোহের ধুয়া এবং সর্বপ্রকারে দমন করিবার চেষ্টা।

আমাদের বিশ্বাস, একদল ইংরাজের প্ররোচনায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া কর্তৃপুরুষেরা রাজদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ শাসন প্রচার করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, একপক্ষে আমাদের রাজা আমাদিগকে কতকগুলি স্বাধীন অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত, অপরপক্ষে পারকতা দ্বারা আমাদের দাবিও আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে রাজদ্রোহের অপরাধ আরোপ না করিলে আমাদিগকে প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের বিপক্ষগণ সেই অন্যায় ধুয়া তুলিয়া আমাদের দাবিকে দুর্বল করিবার চেষ্টায় আছেন।

রাজপুরুষগণ কখনো কখনো মৌখিক রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু

রাজদ্রোহও যে অনেক সময় মৌখিক হইতে পারে সে তাঁহারা খেয়াল করেন না। হৃদয়ে আমাদের রাজদ্রোহ নাই, যদি কখনো চিত্তক্ষোভে অনবধানে মুখে বিরুদ্ধ কথা বাহির হয় তাহা কর্ণপাতের যোগ্য নহে।

জগদীশ্বরের রাজ্যই ধরণীশ্বরের রাজত্বের আদর্শ। ঈশ্বর মনুষ্যকে অনেক স্বাধীন অধিকার দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার অসদ্‌ব্যবহার করিয়া পদে পদে দণ্ডনীয় হয় কিন্তু তাই বলিয়া সমূলে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় না। আমাদের নরপতি, বিশ্বপতির এই বিধান স্মরণ রাখিলে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে পারিতেন।

এই তো গেল রাজদ্রোহের ধুয়া। তাহার পরে আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে দমনের জন্য আয়োজন নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে শাসনকর্তাদিগের ক্ষমতা, এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা। ভারত-রাজতন্ত্রে বিচার বিভাগ এবং কর্তৃত্ব বিভাগের অধিকার, ন্যায়াধীশ এবং দণ্ডাধীশের ক্ষমতা অনেক স্থলে একাধারে বর্তমান বলিয়া অনেক অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে— এই দুই ক্ষমতার পৃথক্‌করণের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন চলিতেছে, পাছে সেই যুক্তিযুক্ত আন্দোলন সফল হয় এইজন্যই বুঝিবা তৎপূর্বেই কর্তৃপুরুষের ক্ষমতা অসংগতরূপে বৃদ্ধি করা হইতেছে।

অনেক সময় দণ্ডাধীশ যাহাকে দোষী বলিয়া খাড়া করেন ন্যায়াধীশের বিচারে সে খালাস পায়— ইহাতে দণ্ডবিধানের একটা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু চাণক্যের ন্যায় আমাদের কর্তারা স্থির করিয়াছেন— "তাড়নে বহবো গুণাঃ"— অতএব দমন-তাড়নের শক্তিকে তাঁহারা অপ্রতিহত করিতে চান। এক তো এমন এক ধারা বাহির হইল যাহাতে কোনো বিচারই নাই— তাহার পরে যেখানে বিচার আছে সেখানেও নূতন সংশোধিত দণ্ডবিধি এমন সকল বাধা স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে অভিযুক্তগণ আপন নিরপরাধ প্রমাণের চিরপ্রচলিত অনেকগুলি সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সওয়াল-জবাবের অধিকার হ্রাস করা হইয়াছে; পুলিসের ডায়ারি তদন্ত করিয়া কৃত্রিম প্রমাণ ধরিতে পারিবার যে উপায় ছিল তাহাও রোধ করা হইয়াছে; অবিচারের আশঙ্কায় এক হাকিমের হস্ত হইতে অন্য হাকিমের হস্তে মকদ্দমা চালান করিবার যে অধিকার ছিল তাহাও হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য, বিচারকর্তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা কোনো ত্রুটি পাইয়া যদি এই-সকল বিধি সংশোধনের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলেও বুঝিতাম— কিন্তু তাহা নহে— এ কেবল কর্তৃপুরুষদেরই কৃতকার্য। নূতন বিধি প্রণয়নে হাইকোর্টের এক জজ নিযুক্ত ছিলেন বটে— কিন্তু এই সংশোধনগুলি তাঁহার বিচার-করা-কালীন পরামর্শসম্ভূত নহে। একদিকে আইন কড়া, অন্য দিকে দণ্ডবিধিও যদি সংকীর্ণ হয় তবে অভিযুক্তদিগের পক্ষে বড়োই সংকট। ইহা ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। কারণ তাঁহাদের ন্যায়ের মূলসূত্র এই যে, ৯৯ জন অপরাধী খালাস পাইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু একজনও নিরপরাধ যেন দণ্ড না পায়।

কর্তৃপুরুষদের ক্ষমতাবৃদ্ধির এই চেষ্টা আমাদের প্রাদেশিক শাসনেও লক্ষিত হয়। প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় নূতন আইনে খাস মহল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূক্ত মহলের প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধির ক্ষমতা এক্ষণে একেবারে রেভিন্যু কর্মচারীদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই রেভিন্যু কর্মচারীরা কর্তৃত্ববিভাগের অঙ্গ।

পূর্বে এই রেভিন্যু কর্মচারীদিগকে দেওয়ানীকার্যবিধি অনুসারে চলিতে হইত, এবং তাঁহাদের রায়ের উপর সিভিল কোর্টে আপিল চলিবার বাধা ছিল না। নূতন নিয়ম অনুসারে তাঁহারাই সরাসরি ভাবে হুকুম দিবেন এবং তাহার উপরে আর আপিল চলিবে না। ইহাতে খাজনা বৃদ্ধির পথ সম্পূর্ণ অবাধ হইল। দুঃখের সহিত বলিতেছি আমাদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রীসভায় এই আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন জমিদারসম্প্রদায় তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া কন্‌গ্রেসের প্রতি বিমুখভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কন্‌গ্রেসপক্ষীয়দের অবস্থা এমন যে, আমাদিগকে জমিদার ও রায়ত উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে সামঞ্জস্য সম্ভব

সেখানে কথাই নাই, যেখানে বিরোধ অনিবার্য সেখানে আমরা বিশিষ্টসাধারণের খাতিরে জনসাধারণকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

কলিকাতা ম্যুনিসিপাল বিলেও দমনচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়। এই বিলে কর্তৃপুরুষদিগকে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা আর কোনো প্রকার জবাবদিহির অধীনে নাই। ম্যুনিসিপালিটির অধিকাংশ সভ্যের হস্তে, কেবলমাত্র শ্মশানঘাট, কবরস্থান, নূতন বাজার স্থাপন, লোকসংখ্যা গণনা, টাকা জমা দিবার ব্যাঙ্ক স্থির করা প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের ভার দেওয়া আছে। কথা আছে, মানহানি অপেক্ষা প্রাণহানি ভালো, এ বিল যদি পাস হয় তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অবশিষ্ট অনুগ্রহকণাটুকুও বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়।

এক্ষণে, আমাদের কনফারেন্স সভায় যে-সকল কার্য উপস্থিত হইয়াছে আশা করি আপনারা তাহা দৃঢ়তা ও সংযমের সহিত পরিচালনা করিবেন এবং স্মরণ রাখিবেন রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃত স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

শারদ জ্যোৎস্নায়

ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস

আবার, আবার, শুনা রে আবার,
পীযূষ-ভরা সে প্রেমের গান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

সুমধুর সুরে বাঁধ্‌ রে বীণা,
পঞ্চমে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

মাতিয়ে উঠুক অবশ পরান,
নাচিয়ে উঠুক হৃদয় আজ;
জোছনা-হাসিনী এমন যামিনী—
বিষাদের মাথে পড়ুক বাজ!

'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী,'
প্রতিধ্বনি দিল সকল দিক্‌,
দিগঙ্গনা মেলি, দিল করতালি,
কুহু কুহু করি উঠিল পিক্‌!

ভাবে উজলিল যমুনার জল,
কুমুদের মুখে হাসি না ধরে,
হরষে পাপিয়া, আকাশ ছাপিয়া,
ধরিল সে গীত মধুর স্বরে!

ভ্রমর ভূতলে, ফুল-দলে দলে
গুন্ গুন্ রবে ধরিল তান,
'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী'
দিশি দিশি এই উঠিল গান!

করো করো শশি, সুধা বরিষন!
মিটাও মিটাও চকোর-আশ,
ফুটাও ফুটাও কুমুদের বন,
পরাও জগতে রজত বাস!

'সব-ই অকারণ, বৃথাই জীবন,
জীবন কেবলই যাতনা সার—'
ধিক্ ও কথায়, শুনিতে কে চায়,
কবির কাঁদুনি সহে না আর!

জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী—
এমন শরৎ, এমন শশী,
আবার ভূতলে, যমুনার জলে,
কত ভাঙা চাঁদ পড়েছে খসি!

লহরী লীলায়, নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে যায় তারকাকুল!
লতাপাতাগুলি, নাচে হেলি দুলি,
ঘুম ঘুম আঁখি মেলিল ফুল!

ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে,
চামেলির ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত কী কুহক জানে!

শেফালিকা বেলা, করে কত খেলা,
মৃদুল পবন সহায় তায়,
মৃদুল পরশে, অলস-আবেশে
ঢুলে ঢুলে পড়ে এ ওর গায়!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

এই যে চাঁদিমা বিমান উজলে,
উজলে তো আজি আমারি তরে,
আমারি তো লাগি, হইয়ে সোহাগী,
বহিছে যমুনা পুলক-ভরে!

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হব,
চাহে না পৃথিবী, চাহি না পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি রব।

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙা-চোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

চাহি নে কাহারো আদরের হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়া-হাসিময় মিছে মমতায়,
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর।

কাহারো ছলনে আর নাহি ভুলি
জ্বলিয়া পুড়িয়া হয়েছি খাক্,
তাদের সোহাগ, তাদের বিরাগ
তাদের আদর তাদেরি থাক্।

বাঁধ্ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আপনার মন আপনারি ঠাঁই,
আপনারি ভাবে ভাসুক প্রাণ।

থাক্ থাক্ বীণা, শুনিতে চাহি না,
মরম-বিঁধুনি ও-সব গান,
শোন্ শোন্ শোন্ কোকিল উদিকে,
ধরেছে কেমন মধুর তান।

ক্ষণেক দাঁড়াও যমুনা। যমুনা।
পিউ পিউ ওই পাপিয়া গায়;
আকাশ পাতাল, সে রবে মাতাল,
আকাশ পাতাল অঘোর প্রায়!

গাও গাও, পাখি, আমোদের গান!
মৃদুল পবন, মাতিয়ে বও!
আয় লো যমুনা বহিয়ে উজান!
আজ শশি! তুমি হোথাই রও!

নিশি তুমি! আজ হোয়ো না প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়ো না আজ॥

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি

কোনো মেঘ-বিনির্মুক্তা তারকাসমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগনমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে-সকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবধারা পূর্ণ? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোনো স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নাই? এই-সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে, যে, দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন-সকলের উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই, যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দূরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্যন্ত জাজ্বল্যরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দূরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে, যে অতি দূরের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে করো তুমি সহস্রমাত্রা-শক্তি-সম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌরজগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহমণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত— এক্ষণে, এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ— ১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দূর হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পদার্থ আমাদের কি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? কখনোই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি কি না যদিও বিজ্ঞানশাস্ত্র এ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই তথাপি আনুমানিক প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাসযোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

যে-সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই-সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি : বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য হইতে কম দূরে অবস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতের অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগণের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কীরূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাসযোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর-উপযোগী ব্যবস্থা-সকল পূর্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলি এমন কোনো সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহা দ্বারা সাধারণত জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলই গতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রের ন্যায় চক্র-সকল কেবলই ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য চক্র-সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণিপুঞ্জের সুখ সৌকর্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার মঙ্গল সংকল্পের যত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে করো, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভাব এবং তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে— মনের প্রবৃত্তিসকল সমান রহিয়াছে— সুখ-দুঃখবোধ জাগরূক রহিয়াছে— অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছে— আর হঠাৎ তুমি এই শোভাপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে— স্বচ্ছ নির্মল জলরাশি প্রসারিত রহিয়াছে— প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবনসৌন্দর্যে পূর্ণ রহিয়াছে— পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর

রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতিবিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না— তোমার শরীরের মাংসপেশীর গঠন প্রণালী অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে— তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথাসময়ে পরিবর্তিত হইতেছে— এই-সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত-কাল-মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে— পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন— একই নিয়মে তথায় আলোক-অন্ধকারের পর্যায় উপস্থিত হইতেছে— ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে— শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে— জলভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে— তখন কি ওই-সকল গ্রহগণ সর্বপ্রকারে আমাদেরই মতো জীবপুঞ্জের যে আবাসভূমি এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
পৌষ ১৭৯৬ শক। ১২৮০ বঙ্গাব্দ

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব

বিশৃঙ্খলা অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় এক-একটা যে বিপ্লব বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকল প্রকৃতির কার্য-শৃঙ্খলারই একটি অঙ্গ। বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার অর্থই এই যে, এখন যে অবস্থা আছে ইহা এখনকার সময়ের উপযোগী নহে। ইহা পরিবর্তিত না হইলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। বর্তমানে যখনই বিপ্লব দেখিব, তখনই জানিব যে, ভূতকালের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহা জীর্ণ বা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃ-সংস্কার হইবে। যেখানকার বায়ু লঘু হইয়া যাইবে, সেইখানেই চারি দিক হইতে বায়ুর স্রোত আসিয়া একটি ঝটিকা বাধিবে বটে, কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, বায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের সামাজিক রাজ্যেও সেইরূপ এক-এক সময় ঝঞ্ঝা ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন সকলেই ভয় করেন যে, বুঝি সমাজের সমুদয় শৃঙ্খলা উলটপালট হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই ; তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন, তো দেখিতেন যে, জীর্ণ সমাজের কতক কতক ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার দৃঢ়তর উপাদানে নূতন সমাজ নির্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষের একাধিপত্য অনেকদিন য়ুরোপ-খণ্ডে চলিয়া আসিতেছিল, হয়তো ততদিন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখনই সে সময় অতীত হইয়া গেল, অমনই একটা বিপ্লব বাধিল; দারুণ রক্তপাত, অরাজকতা, অত্যাচার উপস্থিত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইল না। অসভ্য অবস্থায় অসাধারণ পরাক্রমশালী প্রভুর প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তখনকার দুর্দান্ত লোকেরা যুক্তিতে বা সুমিষ্ট ব্যবহারে বশ হইত না, কিন্তু সে অবস্থা চলিয়া গেলে সে নিয়ম খাটিল না। এক কথায় বলিতে গেলে বিপ্লব আপাতত অতিশয় বিকটাকার বোধ হইলেও পরিণামে তাহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হয়। লন্ডনে যখন দারুণ মড়ক হইয়াছিল, তখন যে অগ্নিদাহ হয়, তাহা হইতে যদিও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু মড়কের বীজ দগ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট নিরাকৃত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন যে, নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকে মানে না, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ

চায় না, বিদেশের সর্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য, প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে নিতান্ত বিমুখ, এবং ভালোই হউক আর মন্দই হউক তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে আপনাকে মহাবীর বলিয়া মনে করে, সকলেই মনে করে, আমারই উপর বিধাতা এই অসভ্য বঙ্গদেশের সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমার কথাতেই সকলে চলিবে, আমি কাহারো কথায় চলিব না, এবং যাঁহারা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন বা তথা হইতে নির্গত হন, তাঁহারা দেশের লোকের রুচির, জ্ঞানের, সভ্যতার দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা মনে করেন সকল বিষয়েই আমার অধিকার আছে, এইজন্য তিনি বুঝুন বা না বুঝুন সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের এই নব্য বংশ এখনও বৃদ্ধদের শাসনে আছেন, কিন্তু যখন এই প্রাচীন বংশ লোপ পাইবেক, তখন এই যথেচ্ছাচারী শত শত শিক্ষিত লোক কী গোলযোগ বাধাইবেন কে বলিতে পারে। এই-সকল ভাবিয়া অনেকে ভয় পাইতেও পারেন, কিন্তু আমরা বলি এ বিপ্লব চিরকাল থাকিবে না। নিদ্রোন্মীলিত নয়নে নূতন জ্ঞানের আলোক লাগিয়া বঙ্গবাসীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দিগ্‌বিদিক্-শূন্য হইয়া কী করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যখন এই আলোক তাঁহাদের চক্ষে সহিয়া যাইবে, তখন আবার তাঁহারা চারি দিক স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন এবং দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পারিবারিক সুখের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলাকেই স্বাতন্ত্র্য মনে করেন, যথেচ্ছারিতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন ও স্বদেশকে ঘৃণা করাকেই সার্বভৌমিক ভাব মনে করেন। এ অবস্থা যে চিরকাল থাকিবে আমরা সে ভয় করি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ভয় হয়। এখন এই যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবস্রোত বহিতেছে, ইহাতে যাহা-কিছু সময়ের অনুযোগী তাহা ভাঙিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যাহা উপযোগী তাহাও ভাঙিয়া যাইতে পারে, বা যাহা অনুপযোগী তাহাও নূতন ভাসিয়া আসিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য; সহস্র-সহস্র বৎসরে যাহা গঠিত হয়, তাহা ভাঙিয়া গেলে গড়িতে কত পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সহস্র বৎসরে যাহার ভার বহনে আমরা সমর্থ হইব, এখনই তাহা স্কন্ধে লইলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক-বিপ্লব যে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না, এখনই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের দেশের যুবকেরা যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তখন যাহা-কিছু দেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ছিল ও যাহা-কিছু বিদেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; এমন-কি, বিদেশীয় পানাহার চলিত হওয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশের সভ্যতার একটি মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব অপনীত হইতেছে। এখন দেশীয় কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিতেছে ও বিদেশীয় অনেক আচার-ব্যবহারকে আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোনো লোক বিদেশীয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কিছুদিন আগে কেবল ভাঙ্ ভাঙ্ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সকলে রাখ্ রাখ্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলই ভাঙিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলই রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভালো তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল পথে চলিতেছে।

উন্নতির পথ মধ্যবর্তী, উন্নতির পথ এক-ঝোঁকা নহে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি দুই দিক হইতে কোনো বস্তুর উপর কার্য করিলে তাহা মধ্যপথ আশ্রয় করে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় এই দুই শক্তি আমাদের সমাজের উপর কার্য করাতে সমাজ উন্নতির মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আবার রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় উত্তেজনা করাতে সমাজ দ্বিগুণ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা উন্নতিশীল নাম ধারণ করিতে পারেন

না; যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতিশীল। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আমূল-রক্ষণ-প্রিয় মনে করিতেছেন, আমূল-উন্নতি-প্রিয় সমাজকে অবনতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আমূল-উন্নতি-প্রিয় মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় সমাজকে অবনতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন, আবার রক্ষণ-সংস্কারশীল মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সমাজের দারুণ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কেহই সমাজের উন্নতিপথের কণ্টক নহেন। তবে আমূল-সংস্কার ও আমূল-উন্নতি -প্রিয় উভয়ে ভ্রান্ত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতির সাহায্য করিতেছেন ও রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় প্রকৃত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যখন যুবকেরা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, যখন তাঁহাদের উন্নতির ইচ্ছা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, যখন তাঁহারা উন্নতির কতকগুলি মূল সূত্র শিখিয়াছেন, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রে প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির খাদ্য ও রোগীর পথ্য একই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলন্ডের বোঝা বাংলার স্কন্ধের উপযোগী, তখন তাঁহারা বঙ্গদেশকে একেবারে ইংলন্ড করিতে চান, ভাগীরথীকে টেম্‌স্‌ করিতে চান, বাঙালিকে ফিরাঙ্গি করিতে চান। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হন, তখন ক্রমশ শান্ত ও শীতল হইয়া আসেন ও রক্ষণশীলতার প্রতি একটু একটু করিয়া ঝুঁকিতে থাকেন। আবার তখনকার নব্য বংশ সমাজের আগাগোড়া ভাঙিবার জন্য গদা উদ্যত করেন। এইরূপে রক্ষণশীল ও সংস্কারশীল চিরকালই সমাজে জাগ্রত থাকে, না থাকিলে সমাজের দারুণ অনিষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে উন্নতির মধ্যাহ্নকাল, তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন দর্শন ও নূতন দল নির্মিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম উত্থিত হইয়া সমাজে একটি ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিল। পৌরাণিক ঋষিরা ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন এরূপ বিপ্লব অনিষ্টজনক। অমনি পুরাণে, সংহিতায় ও অন্যান্য নানাপ্রকারে সমাজের হস্তপদ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব না বাধে তাহার নানা উপায় করিয়া রাখিলেন। সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল এবং সমাজ ক্রমশই অবনতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সংস্কারশীলতার অভাবে ও রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়িতেই হিন্দুসমাজ নির্জীব হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশের এই সামাজিক বিপ্লব আমাদের তো শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়; যে উপায়েই হউক, এই যে বহুকাল-ব্যাপী নিরুদ্যমের ঘুম ভাঙিয়াছে এবং শিক্ষিত লোকেরা নবউদ্যমে কার্য করিবার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন ইহা তো মঙ্গলেরই চিহ্ন। যেমন যুদ্ধ-বিপ্লবের অনুষ্ঠানে জাতির শারীরিক বল বর্ধিত হয়, সেইরূপ মানসিক বিপ্লবে মনের বল বাড়িবার কথা। আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমস্ত বাঙালি জাতি নির্জীব হইয়া পড়িত। এখন যেরূপ ভাঙাগড়া ও চারি দিক হইতে উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, অল্প-দিনের মধ্যে এই বাংলার সমাজ নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

বিজন চিন্তা : কল্পনা

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে একখানি পর্ণকুটিরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেননা আমার সংসার নাই— আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই, স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই ; ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-সাগর-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর

উপায় নাই। ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাই— তাহাদের নানাবিধ ভাবভঙ্গি আলোচনা করি— বিদ্বান মূর্খদের দলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মতামত শুনি, মনে মনে হাসি কখনো বা কাঁদি, আবার বাড়ি আসিয়া সেই-সব কথা লিখি। এইরূপে কোনোপ্রকারে সময় কাটাই। আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত আমি কত লোকই দেখিতেছি কিন্তু আমি কেমন আছি, বা আমি কে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার একজনকে দেখিতে পাই না— সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে থাকিয়াও আমার পর্ণকুটিরের বিজনতা কখনোই ভঙ্গ হয় না। আমি আপনি হাসি, আপনি কাঁদি, আপনি ভাবি। মনে করিয়াছিলাম যে সংসারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া এই বিজন কুটিরে মনের সুখে বাস করিব। মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্‌বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ?— অপরিমিত স্বাধীনতাতে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবস্থ হয়। লোকে যেমন ভাষা কথায় বলিয়া থাকে— 'বড়ো হবে তো ছোটো হও' তেমনি স্বাধীনতা সম্বন্ধে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হবে তো পরাধীন হও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজ্যপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে কেনই বা তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইবে? সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মও পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিও এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে। যে লোকে বলিয়াছেন—

'আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে।'

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্বিত আস্ফালন কোনো হৃদয়সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনই ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন— হয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয় কোনো বস্তুবিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের? এই পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মানুষ মাকড়শার মতো আপনা হইতেই উদ্‌গত করিয়া আপনিই তাহাতে বিজড়িত হইতে চাহে না? এই পরাধীনতার বীজ মানবহৃদয়ে নিহিত থাকিলেও মানুষে আপনি কি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে— তাহা বৃক্ষে পরিণত করিতে চাহে না? পরিণামে সেই বৃক্ষে বিষময় ফলই উৎপন্ন হোক আর সুধাময় ফলই উৎপন্ন হোক, সে বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিলপ্রযত্ন হয়? মানবহৃদয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে কখনোই তাহা বোধ হইবে না। কিন্তু কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষে এইরূপ স্ব-নির্মিত তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে? সে কেবল কল্পনার মোহে। মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন বটে যে, কবি প্রণয়ী আর উন্মাদগ্রস্ত ইহারাই কল্পনাপ্রধান, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্যপ্রকৃতি যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবহৃদয়ও সেইপ্রকার কেবল কল্পনা-প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। ম্যাডেগ্যাস্কর দ্বীপের অসভ্য জাতিরা যখন তাহাদের বিকট-দর্শন প্রস্তরময় দেবমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর হৃদয়ে বর প্রার্থনা করে, হিন্দুরা যখন বিজয়া-দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ভগ্নহৃদয় হয়, খৃস্টানেরা যখন কুমারীপুত্র যিশুখৃস্টকে আপনাদের পাপের ভার বহন করিতে প্রার্থনা করে, তখন কি কল্পনার মোহন প্রভাব প্রতীত হয় না? ধনোপার্জন, বিদ্যাশিক্ষা, পুত্রপালন, এ সকলেরই গভীরতম মূল প্রদেশে কল্পনা-শক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ-সকল কার্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্তিত করে, কিন্তু যদি আশানুরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ কল্পনার দ্বারা সুমার্জিত ও সুরঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে আশার উত্তেজনায় কেহই উত্তেজিত হইত না।

কল্পনার মহান প্রভাব এখানেই ক্ষান্ত নহে, শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সুন্দর সামগ্রীকে

সুন্দরতর দেখি এমন নহে, সুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সকল-প্রকার বিঘ্ন ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মরুভূমিতে থাকিয়াও নন্দনকাননের শোভা সন্দর্শন করি এমন নহে, কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা সকল-প্রকার সুন্দর পদার্থ হইতে তাহাদের সুন্দরতম অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ তিলোত্তমা বা প্যাণ্ডোরা সৃজন করিতে পারি।

সত্য বটে যে কল্পনা যেমন সুখের কারণ, আবার কল্পনা তেমনি দুঃখের কারণ, সত্য বটে যে, কল্পনা-প্রভাবে আমরা বৈজয়ন্তধামকেও শ্মশানের চিতা আকারে রূপান্তরিত করিতে পারি, সত্য বটে যে কল্পনা প্রভাবে আমরা মিলটন-বর্ণিত দেবতুল্য মানবমুখেও বায়রন-বর্ণিত পিশাচের প্রতিকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী-অংশভূতা নারীজাতিকেও হ্যামলেটের মতো অসতীত্বরূপ দুর্বলতার নামান্তর মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্পনার দোষ নহে, তাহা আমাদেরই দোষ। কল্পনাকে সংযত করা, শিক্ষিত করা ও বিবেকবুদ্ধির অধীন করা আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কল্পনাই আমাদের কার্যের প্রবর্তক, ভাবনার প্রকৃত উত্তেজক, আশার চিত্রকর, সুখের আত্মা।

কল্পনার তারতম্যে আমাদের সুখেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই যে সমস্ত বিশ্বকাণ্ড আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে অনন্ত শোভার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার রহিয়াছে— ইহার কি কোনো রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, কোনো ভাবই কি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কোনো শোভাই কি উপভোগ করিতে পারিতাম যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু না পরিস্ফুটিত হইত? পৃথিবী তো মৃত্তিকাময়, সমুদ্র তো সলিলময়, সূর্য তো অগ্নিময় মাত্র— তবে কেন পৃথিবীর শোভা সন্দর্শনে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সাগরের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে এবং সূর্যের অভ্যুদয়ে হৃদয়ও এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

কল্পনা বিরহিত হইলে কে আর শেক্‌স্‌পিয়রের মতন বৃক্ষ-পল্লবের অস্ফুট ভাষা বুঝিতে পারিত, প্রবহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, প্রস্তর-খণ্ডে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে পারিত? কল্পনায় সকল দ্রব্যকেই হৃদয়ের উপভোগের মতো করিয়া লওয়া যায়—

The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale,
The common sun, the air, the skies,
To him are sweetest Paradise.

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

কবিতা-পুস্তক

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই হয় জ্ঞান না-হয় আমোদ না-হয় উভয়ের সম্মিশ্র। এখানে আমোদ শব্দটি আমরা অতি প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিতেছি। ডিকুইন্সি বলেন যে উচ্চ অঙ্গের কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই— এ কথা বলিতে গেলে সে-সকল কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়; তিনি বলেন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত বিজনে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্ত ভাবে অবস্থান করে যে প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না— কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই-সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আমরা এই দীন হীন ক্ষুদ্র জীব হইতে যে প্রকৃত পক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়। এ স্থলে সেই-সকল কাব্যগুলিকে আমোদ বা জ্ঞানপ্রদ বলা

অপেক্ষা শক্তিপ্রদ বলা উচিত। কিন্তু ডিকুইন্সির উত্তরে আমরা বলি যে ওই শক্তিপ্রদ গুণটি উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞান ও আমোদের সমষ্টি বলিলে কোনো দোষ হয় না। এ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্ত ভাবে জ্ঞান কিংবা আমোদ কিংবা উভয়ের সমষ্টি। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে অনেক পুস্তকের সমালোচনা সহজ হইয়া পড়ে।— এই সিদ্ধান্তটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভালো লাগিল না— জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোনো স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে, তাহা আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। বিষয়টি অতিশয় উচ্চ ও মহৎ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন— সেই দুঃস্বপ্ন যবন-কর্তৃক ভারত-বিজয়ের আভাস মাত্র, ক্রমে সেই স্বপ্ন প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল— ঘোরির মহম্মদ আসিয়া স্থানেশ্বরে হিন্দুরাজকে পরাভব করিলেন, সংযুক্তা নিরুপায় হইয়া চিতারোহণ করিলেন।— এই বিষয়টির উপর যদি একজন প্রকৃত কবির কল্পনা খেলিতে পাইত, তাহা হইলে ইহাকে সূর্যকিরণসংযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিতে পারিত, কিন্তু বঙ্কিমবাবু যেন পরীক্ষা স্থলে 'সংযুক্তা কে ছিল'— 'স্থানেশ্বরের যুদ্ধে কী হইল' এবং 'সংযুক্তা কী রূপে মরিল'— এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়— যাহাতে আর্য-গৌরবের কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।— অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটির কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে— অসংগত-মেদ-স্ফীত রোগীর ন্যায় ইহার লাবণ্য-শ্রী নাই— জীবনের আভাস মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন— মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া দুঃখে ও ভয়ে নিবেদন করিলেন

'বার বার বুঝি এই বার শেষ!
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়!'

তখন

'শুনি পতিবাণী, যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরানী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

. . .

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি।' ইত্যাদি।

আর্য-মহিষীর সহস্রবার সঘনে 'জয় জয়' করাতে আমাদের শৈশবকালের একটি কথা মনে পড়ে— ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগিয়া পড়িয়া যখন ভয়সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠিতাম, তখন ওইরূপ সঘনে বারংবার 'রাম রাম' উচ্চারণ করিয়া ভীত ধাত্রী প্রেতযোনিকে খেদাইতে চেষ্টা করিতেন। পৃথ্বীরাজের মতো বীরপুরুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া এবং তাঁহার রানী সংযুক্তার পক্ষে সহস্র 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া আশ্বাস প্রদান করা যে কতদূর কল্পনার ব্যভিচার

তাহা আর কী বলিব। সিজরের মৃত্যুর পূর্বআভাসস্বরূপ তাঁহার মহিষী যখন নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, নানা অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিয়া সিজরকে রোমের সাধারণ সভাস্থলে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন তখন সিজর এই বলিয়া উত্তর দিলেন— 'ভীরুরাই প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে শত সহস্রবার মরিয়া থাকে— কিন্তু বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।' সে যা হউক, সংযুক্তা হিন্দুমহিলা হইয়া কেমন করিয়া 'ইন্দ্র' ও 'বাসব' ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? কিন্তু সংযুক্তার এই শিক্ষার দোষ মার্জনীয় হইলেও তাঁর এরূপ স্থলে ঘন ঘন করতালি দেওয়া মার্জনীয় হইতে পারে না— তাঁহার ঘোর করতালি 'দেখিয়া হাসিল ভারতপতি'— তিনি তো স্বচক্ষে রানীর ওরূপ উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া হাসিবেনই— আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছি না— ওরূপ করতালির উপর করতালি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারই সাজে— রাজরানীর তো কথাই নাই— কোনো ভদ্র কুলনারী সহসা ওরূপ করিলে তাঁহাকে লোকে উন্মাদ মনে করিবে না তো আর কী করিবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'আকাঙ্ক্ষা'— অর্থাৎ রাধিকা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে কী কী হইতে অভিলাষ করিতেছেন এবং শ্যামসুন্দর তাহার কী কী উত্তর দিতেছেন তাহার একটা তালিকা। আমাদের মতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-কবিতাতে প্রায়ই বড়ো একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ— এরূপ স্থলে কেমন করিয়া খুব জবাব দিব ইহাই কবির উদ্দেশ্য হয়। প্রাচীন হরু ঠাকুর বা রাম বসু প্রভৃতি প্রকৃত কবিরা প্রশ্ন কবিতায় যতখানি কবিত্ব দেখাইয়াছেন, উত্তর কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। স্বীকার করি যে তাহাদের উত্তরে কতকটা কারিগুরি, বাক্যবিন্যাসের কারিগুরি, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার আভাস মাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবুর 'সুন্দর সুন্দরী' দেখিয়া শুকশারীর পুরাতন কবিতাটি আমাদের মনে পড়িল—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদমতলায় থানা,
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগনা,
নইলে কিসের থানা,
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন?

কিন্তু 'শুক শারীর' কবিতার সহিত 'সুন্দর সুন্দরী'র কবিতার এই প্রভেদ যে— প্রথমটি উত্তর-কাটাকাটির দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মনস্তুষ্টিকর উত্তর-প্রত্যুত্তরের দৃষ্টান্ত। সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে নানা বস্তু হইতে অভিলাষ করিতেছেন, সুন্দরও তাহাই হইতে উত্তরে অভিলাষ করিতেছেন— কিন্তু সুন্দরী, রমণী-প্রকৃতি-সুলভ লজ্জায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সুন্দর সুরসিক পুরুষের মতো কেবল সুন্দরীর অভিলাষের উপর মাত্রা চড়াইতেছেন।

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি লভিতে প্রবেশ॥
আমার প্রাণেশ।

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু আমি চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরন,
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,

ভুলাতাম রাধারূপে অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন?

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার—
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার॥
মোর প্রাণাধার!

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন॥

দুঃখের বিষয় আমরা 'তথাস্তু' বলিতে পারিলাম না।

তৃতীয়, অধঃপতন সংগীতটিতে বঙ্কিম-ভাবের(?) রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে— হাসিতে হাসিতে অধঃপতনে যাইতেছি কুখনো যেন আর কাঁদিতে হইবে না— এ ভাব কী ভয়ানক ভাব! মানুষ মরিতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য-পরিহাস আমোদ-প্রমোদ— আমোদ-প্রমোদ করিবার আর কি স্থান নাই! কবিতাটিতে উত্তম রসিকতা প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু বিষয় নাকি অধঃপতন— নাম শুনিলেই গা কাঁপে— এ স্থানে রসিকতার হাস্যবদন দেখিয়া, অমাবস্যা রজনীতে শ্মশানমধ্যে একজন সুন্দরী রমণীকে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে দেখিয়া— কাহারো যে হাসি পাইবে, সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে তো এরূপ লেখে না; তবে যদি গ্রন্থকার দানব-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিকট হাস্য হাসাইবার মতো— ঘোরতর একটি অধঃপতনের পাথেয় সম্বল হইয়াছে— ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ— 'সাবিত্রী'— এই কবিতাটির স্থানে স্থানে দু-একটি সুন্দর বর্ণনা আছে— যখন যমরাজ শোকাতুরা সাবিত্রীর সম্মুখীন হইতেছে কবি লিখিতেছেন :

'হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সংকটে,
ভয়ংকর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।*
সে ছায়া পশিল কাননে— অমনি,
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবানকে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন— তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সতীত্বের অমোঘ প্রভাবে যমহস্ত হইতেও

* ছায়ার নিকট তারা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল— ইহা কীরূপ সংগত বুঝিতে পারি না। ছায়া কি দিবাকরতুল্য?

পতিব্রতা সতী মৃত স্বামীকে ফিরিয়া লইবেন— না সাবিত্রীও এ দেশীয় শত সহস্র স্ত্রীর মতো যমের নিকটে সহমরণের বর প্রার্থনা করিয়া পতির সঙ্গেই সহমরণে অন্তর্ধান হইলেন। যদি কোনো পুরাণে এরূপ কথা থাকিত তা হইলেও বুঝিতাম যে গ্রন্থকার কী করিবেন— কিন্তু তাহা নয়, বঙ্কিমবাবু স্বেচ্ছামতো পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতম অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে স্বামীর সহিত ইচ্ছাপূর্বক সহমরণে যাওয়া বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ। কিন্তু তাহা মহান সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে;— অসতীর অগ্রগণ্যা ক্রিয়োপেট্রাও আন্টনির মৃত্যুর পর ইচ্ছাপূর্বক জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন— তিনিও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ইরাস্ নামক সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'ত্বরায়— ত্বরায়— রে শান্ত ইরাস্— আর বিলম্ব করিস না— আমি যেন শুনিতে পাইতেছি আমাকে আন্টনি ডাকিতেছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার এই আত্ম-বিসর্জনরূপ মহৎ কার্য দেখিবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছেন।' স্বীকার করি যে এ কথাগুলি শেক্‌সপিয়রের, কিন্তু শেক্‌সপিয়র ইতিহাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া কপোলকল্পিত কতকগুলি প্রলাপ বাক্য কহেন নাই— তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কল্পনা-প্রাচুর্য খুবই দেখাইয়াছেন— বঙ্কিমবাবু বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আণ্টনি ক্রিয়োপেট্রার স্বামী ছিল না— কিন্তু তাহাতে কী এলো গেল— তাহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে সতী স্ত্রী না হইলেও অনুরাগের ঝোঁকে এক জন অসতীও সহমরণে যাইতে পারে; মনে করো— ক্রিয়োপেট্রার শেষ দশায় যখন আন্টনির সহিত প্রণয় হইল— তখন আন্টনির যদি বিবাহই হইত, তাহা হইলেই কি ক্রিয়োপেট্রার পূর্বের বেশ্যাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়াই তাঁহাকে সতী ও পতিব্রতা কহিতাম?— সহমরণে যাওয়াই কি সাবিত্রীর অলৌকিক পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে হইবে?— পুরাণে তাহা বলে না। পুরাণে এই কথাই বলে যে সাবিত্রী আপনার সতীত্ব-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া এই সংকল্প করিলেন যে সতীত্বের অলৌকিক মাহাত্ম্যে যমের হস্ত হইতে পর্যন্ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিব। সেই সংকল্প অনুসারে তিনি একাকিনী চতুর্দশীর ভীষণ নিশীথ-যোগে বিকট অরণ্যে মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন— যমরাজ সাবিত্রীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন— প্রীত হইয়া অবশেষে সত্যবানকে সতী স্ত্রীর আলিঙ্গনে প্রত্যর্পণ করিলেন।— পুরাণের এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর একটি ভাব আছে— এবং সেই ভাবের প্রভাবে সাবিত্রীর গল্পটি ভারতবাসিনীদের হৃদয়ের শিরা এবং উপশিরায় ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে। দুই-তিন সহস্র সতী স্ত্রী মৃত পতির সহিত সহমরণে গিয়াছে— কিন্তু কেহই তাহাদের সহমরণকে সতীত্বের যারপরনাই মাহাত্ম্য লক্ষণ মনে করে না। পুরাণের সহিত বাল্যক্রীড়া করা আমাদের মতে যুক্তি-সংগত নহে।

পঞ্চম— 'আদর'— এ কবিতাটি মন্দ নহে— ইহার প্রথম কথাগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে—

'মরুভূমিমাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে॥

কিন্তু গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন— তিনি আরও বলিতেছেন—

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥

এই কথাগুলি পড়িয়া বাউলদের একটি পুরানো গান আমাদের মনে পড়িল—

'গৌর আমার নাকের নথ, কণ্ঠের কণ্ঠমালা
গৌর আমার কানের দুল, হাতের বাজু বালা
গো-উ-র হ-রি।

ষষ্ঠ— 'বায়ু'— এই কবিতাটি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার শীর্ষে 'বায়ু' শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালি হইতে পারিত। বায়ু বলিতেছে—

'আমিই রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর॥'

'কামিনী সোহাগ' বা 'বালকের বাণী' যে বায়ুরই রূপান্তর তাহা একজন কবি অপেক্ষা একজন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলে ভালো হইত। এইজনাই কবি ক্যাম্প্‌বেল বলিয়াছেন যে 'কঠোর বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া প্রকৃতির মুখ হইতে মোহিনী অবগুণ্ঠন তুলিয়া লয় এবং সকল বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক নিয়মের অধীন করিতে চাহে।'

—আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না— কিন্তু কবির কল্পনা হইতে বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রাখা উচিত। কিন্তু বায়ুর আরও বক্তব্য আছে— সে বলিতেছে—

আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর॥'

এত কথা— আরও বিস্তর-বিস্তর কথা পর্যায়ক্রমে না বলিয়া বায়ু তো এক কথা বলিতে পারিত— 'আমি সংসারের জীবন— সংসারে যাহা-কিছু আছে আমি না থাকিলে কিছুই থাকিত না।' বায়ু অতিশয় বাচাল, তাই আরও বলিতেছে—

'উড়াই খগে গগনে—'

গ্রন্থকার মনে করিলেন যে বায়ুর এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না, অথবা বুঝিতে পারিবে না— তিনি সেইজন্য পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নীচে টীকার ছলে বলিয়াছেন— 'Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, —chap VII. Flight of Birds.' কিন্তু গ্রন্থকার এ স্থলে টীকা না করিয়া বায়ু কেমন করিয়া 'সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী' হইল তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতাম।

সপ্তম— 'আকবর সাহেব খোষ রোজ' এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে— কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। একটি ক্ষত্র-কুলনারী আকবর শার খোষ রোজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি 'খোষরোজের' অশ্লীল ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে সে স্থল হইতে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথ না দেখিতে পাওয়ায় যখন তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন তখন আকবর শা সেইখানে আসিয়া পড়িল এবং রমণীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া রমণীর ধর্মনাশ কামনায় সবলে তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন— তখন রমণী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

'শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি! বাঁচাও জননি!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥'

এত 'ত্রাহি'র আদ্য শ্রাদ্ধ হইলেও পাষণ্ড যখন কিছুই শুনিল না, তখন রূপসী ছুরিকা বাহির করিয়া আকবর শাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সম্রাট আশ্চর্য হইয়া এবং প্রীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। তখন আর্যকুলনারী অসি নামাইলেন—

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই কল্পিত ছবিখানি কতদূর বীভৎসকর! ইহা কি একটি রোষান্বিতা অগ্নিশিখাবৎ ক্ষত্রকুলনারীর প্রতিমা, না লীলাময়ী যবন-বেগমের বিভ্রমবিলাসের মূর্তি?— থাক্— আর আমরা পারি না— 'মন এবং সুখ' ইত্যাদি নানা বিষয়ক কতকগুলি যে কবিতা আছে তাহা সকলই এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং সেগুলির সমালোচনা করা বাহুল্য— 'ললিতা' ও 'মানস' নামক কবিতা দুটি গ্রন্থকার পঞ্চদশ বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন— সুতরাং শৈশবরচনা প্রায় সকলই যেমন হইয়া থাকে, এ দুটিও সেইরূপ।

সমস্ত কবিতাপুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব— বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভালো একজন উপন্যাস-লেখক ভালো কবি হইতে পারেন না। সর্ ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে সর্ ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস-লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্মিত— তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে— অপর জন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন।— স্কটের 'লেডি অফ্ দি লেকে'র সহিত বাইরনের 'জওয়ারে'র তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

আবদারের আইন

ভারত গবর্নমেন্ট সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর গৃহে আসিয়াই এক উৎকট কর সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি অভিনব আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুপ্রিম কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে এবারকার সর্বপ্রথম কার্য সুতা ও কাপড়ের উপর কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলিপি। ইহা প্রবাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল; গবর্নমেন্ট পকেটে করিয়াই ইহা আনিয়াছিলেন; রাজধানীতে পদার্পণ

করিয়াই রাজ্যমধ্যে এই পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি পুরা আইনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইহার— এই কাপড় ও সুতার শুল্ক-আইনের এক অংশে পুরাতনের ও পরিবর্জিতের পুনঃপ্রচার; অপর অংশ সম্পূর্ণ অভিনব, তাহা একটি স্বতন্ত্র ও সাংঘাতিক আইন। শেষোক্ত প্রথমেরই অবশ্যম্ভাবী ফল; উভয়ের একটিও কিন্তু অযাচিত নয়, আকস্মিকও নয়। অনেক সময়ে আকাশ হইতে আইন আসিয়া অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর পড়ে। আইনের আবশ্যকতা লোকের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা করিয়া গবর্নমেন্ট দেশীয় সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির অজ্ঞাতে ও অনভিমতে নূতন নূতন আইন-কানুন করিয়া থাকেন। বলা অনাবশ্যক, ইহা অন্যায়, যথেচ্ছাচার, যারপরনাই দূষণীয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কারণেই হোক, গবর্নমেন্ট আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিতভাবে ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই। প্রত্যুত এ দেশে যাহা ও যাঁহারা সাধারণ অভিমতের অধিনেতা বলিয়া অভিহিত ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার ও তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে ও অস্বাভাবিক আবেদনে গবর্নমেন্ট এই আইন উপস্থিত করিবার অবসর পাইয়াছেন, উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। নহিলে এ আইন সম্ভবত হইত না; সহজে হইবার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। গবর্নমেন্ট এ-দেশীয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এ আইন করিতেন না, তাহা নহে; এ-দেশীয় বস্ত্রশিল্প অচিরাৎ উৎসন্নে যাইবে বা কাপড়-সুতার কল শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া যে গবর্নমেন্ট কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন তাহাও নহে; পরন্তু এ-দেশীয়দিগের পরিধেয়ের জন্যও যে পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া গবর্নমেন্ট এই আইন করিতেন না, এমনও বলি না। এ দেশের লোক অনাহার অর্ধাহারে মরুক আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকুক বা প্রদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর গবর্নমেন্টের অবিচলিত ঔদাসীন্যের এক বিন্দুও উদ্‌বেগ উপস্থিত হইবার আদৌ কারণাভাব। কিন্তু, তথাচ এই আইন হইত না। হইত না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কারণ, সকলেই জানেন, মাঞ্চিস্টারের মহীয়সী শক্তি, লাঙ্কাশায়রের বাণিজ্যস্বার্থ। কিন্তু, শুনিতে পাই, মাঞ্চিস্টার, লাঙ্কাশায়র আমাদের শত্রু। স্বীকারই করি উহারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর স্বার্থ সর্বথা হননীয় শুক্রাদির নীতি অনুসারে ইহাও আসুন, স্বীকার করি। কিন্তু, এই শত্রুদিগের স্বার্থের অনুরোধে এ-দেশীয় গরিব-দুঃখীরা একটু সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত; পরন্তু, সেই স্বার্থেরই অনুরোধে, এ দেশের আধুনিক অনুষ্ঠান কলের কাপড় সুতার উপর এত দিন কোনো শুল্ক সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও অগত্যা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায়, শত্রুর স্বার্থে সাধারণত এ দেশেরই সুবিধা ছিল, সরল ও সত্য কথা বলিতে হইলে, অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্রে সুখও কিছু না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু, তথাচ শত্রু শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে। স্বদেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের শত্রুহনন-স্পৃহাসমূহ বলবতী; তবে সে শক্তির অত্যন্ত অভাব বটে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে শত্রুহননের এক মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কী-জানি-কোনো এক অজ্ঞাত অভিসন্ধি-সূত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বণিকসম্প্রদায় মাঞ্চিস্টারের স্বার্থের বিরুদ্ধে বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া, বারুদবাহকের কার্য করিবার জন্য নেটিব পেট্রিয়টদিগকে ডাকিয়াছিলেন। সাহেবি ডাক; সামান্য নয়, অসুমার সম্ভ্রমেরই কথা। ডাক পড়িবা মাত্র পেট্রিয়টেরা, পূর্বাপর না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বদেশের প্রকৃত, অতি প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত, অস্থিমজ্জাময় শরীরী স্বার্থ আদৌ উপেক্ষা করিয়া, তাহার একটা মরীচিকা-কঙ্কালের কল্পনায়, সাহেবদের পদ-প্রান্তে দলে দলে যাইয়া হাজির হন; বিদেশীয় ও বিলাতি আমদানি বস্ত্র এবং সূত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপনের জন্য, সজোরে ও সমস্বরে হল্লা করিতে আরম্ভ করেন। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের বিলাতি বন্দুকে নেটিব পেট্রিয়টের বাক্য-বারুদ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা বিষম বিসদৃশ রাজনৈতিক আওয়াজ উৎপন্ন ও উৎসারিত করে। তাহারই ফল আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই আইন। ইতর কথায়, ইহাকেই বলে 'আপন নাসিকা কর্তন করিয়া পরের

যাত্রাভঙ্গ'। শত্রুর শুভযাত্রা ভঙ্গ করা সর্বথা কর্তব্য হইতে পারে; কিন্তু, নিজের নাসিকাটিও তো নেহাত নিষ্কর্মা দ্রব্য নহে। নাসিকাটির কি একেবারেই কোনো মূল্য নাই যে, নির্মম হইয়া তাহাকে নির্মূল করিবে? কিন্তু, পরিতাপ এ-দেশীয় পেট্রিয়টেরা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছেন, অথচ পূর্ণমাত্রায় তাহা কাহারো যাত্রাভঙ্গের প্রতিবন্ধক হয় নাই। বিদেশীয় বস্ত্রশিল্পের শুভযাত্রা সম্যক্‌রূপে ভঙ্গ হইবে না; আদৌ এক বিন্দু ভঙ্গ হইবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; কিন্তু স্বদেশীয় সূত্র-শিল্পের ও সুলভ বস্ত্রের নাসিকাটি নিশ্চিন্তপুরে পলায়ন করিয়াছে। নাসিকা-ছেদনজনিত যন্ত্রণায় এখন রোদন করা বৃথা। যাতনার তীব্রতার সঙ্গে এক রত্তি তামাশাও আছে। নাসা না থাকা নিজেই এক তামাশা বটে; কিন্তু, এ ব্যাপারে তদতিরিক্ত আর-একটু তামাশা আছে। নাসিকাটি কোথা হইতে কতখানি স্থান পর্যন্ত কর্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোনো অঙ্গের হানি হইয়াছে কি না, আমাদের পরিচালক ও পেট্রিয়টবৃন্দ, তাহা এখনও নাকে হাত দিয়া দেখেন নাই। সেই সামগ্রীটি 'গিয়াছে গিয়াছে', বলিয়াই কেবল রোদন ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন গেল, কাহার দোষে গেল, কত দূর লইয়া গিয়াছে, নাসিকা পুনঃপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নাই, তবুও তো এ-সকল কথা এখন অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। অনর্থক চিৎকারে ও চাঞ্চল্য প্রকাশেই কি পুরুষার্থ?

গত বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষে লর্ড এলগিনের রাজত্ব আরম্ভ। তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ব্যবস্থাপক বৈঠকে বাজেটের আলোচনা। অর্থের অনটন; অর্থাগমের অন্যতম উপায় উদ্ভাবন— ট্যারিফ ট্যাক্সের পুনঃ সংস্থাপন। ক'মাসেরই বা কথা; সকলেরই ইহা স্মরণ আছে এবং সে স্মৃতি এখনও খুব টাটকা আছে। বিদেশ ও বিলাত হইতে আমদানি বহু দ্রব্যের উপর কর বসিল; কেরোসিন তৈলের ট্যাক্স বাড়িল। পেট্রিয়টগণ পুলকিত হইলেন। ইন্‌কম ট্যাক্স বাড়িল না বলিয়া কেহ, নূতন ট্যাক্স হইল না বলিয়া কেহ, বিলাতি দ্রব্যের স্পর্শে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে ও নরক গমন করিতে হইবে না বলিয়া কেহ, পরন্তু স্বদেশীয় শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগের সুবিধার স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কেহ; নানা জনে নানা অনুমানে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আনন্দের প্রকৃত কোনো কারণ ছিল না; রক্তমাংসময় পৃথিবীর সহিতও উহার সবিশেষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না। দেশের অনিবার্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমেরিকার ইতিবৃত্তেই জ্ঞাতব্য। আনন্দই বটে! সে আনন্দে অস্ত্রনির্ঘোষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও শোণিতস্রোতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু অঙ্গহীন অসাড় জাতির সবই উল্টা। পক্ষাঘাতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই বিকল, কাজেই হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুভবে অক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ সূক্ষ্ম; সংসারের সংবাদ রাখেন তেমনি সবিশেষ; সুতরাং আমদানি-শুল্কে উপরোক্ত আমোদ অনুভূত হইয়াছিল। সে আমোদের যদি একান্তই কোনো কারণ নির্দেশ করিতে হয়— তাহার একটা কারণ হুজুগ; আর-একটা কারণ 'হবি'। বাতিকের অশ্ব আরোহণ করিয়া অহরহ ইন্দ্রলোকে গমনের চেষ্টা। ইহাই 'হবি'। সংসারে হবিওয়ালা লোকের অভাব নাই, হুজুগওয়ালা তো অসংখ্য। সুতরাং সেই জাতীয় লোকের মধ্যেই ওই আমদানি-শুল্কে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নহিলে যাঁহারা সংসারের সবিশেষ সংবাদ রাখেন, বাজারের বৃত্তান্ত বুঝিয়া অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন এবং দেশের অস্থি মজ্জা মেধ, দরিদ্র রায়ত ও কৃষকের সুখ-দুঃখের একটা অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের কেহই এই আমদানি-শুল্কে সন্তুষ্ট হন নাই। উহাতে দেশের অন্তর্ভেদী একটি অসন্তোষই উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোক অদৃষ্টবাদী বল-ও-বাক-শক্তি-বিরহিত. তজ্জন্যই এ অসন্তোষ অস্ফুট ও অব্যক্ত; সংবাদপত্রে উঠে নাই, বাগ্মীর বক্তৃতায় ফুটে নাই, বলে বণিকের পণ্য-পাট লুণ্ঠিত হয় নাই। লোকের বাক্‌শক্তি ও বল থাকিলে ফল অন্যরূপ হইত। এই অন্তর্ভেদী অব্যক্ত অসন্তোষের কারণ অতীব স্পষ্ট। পেট্রিয়টিজমের প্রিয় 'হবি' যাহাই হউক, ইহা পরিষ্কার ও প্রতিদৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, স্বদেশীয় বা বিলাতি বিদেশীয়ও হউক, যে দ্রব্য জনসমাজে অনিবার্যভাবে চলিয়া গিয়াছে, যাহা জীবনধারণোপকরণের

একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ, তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্মান্তিক বাজে; বিশেষত এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটা দ্রব্যই গ্রহণ করুন। প্রথম ধরুন লবণ; লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয়তো মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্তত ৭০ জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ। লবণ-শুল্ক অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সরকার বাহাদুরের একচাটিয়া হওয়ার পূর্বে তাহাদের মধ্যে উহা শস্তা ছিল; তাহাদের অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা পারে না। ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানোর তো কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিলে অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে। ইহা কি খুব একটা সন্তোষের কারণ? স্বদেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতিই প্রশ্নটি করিলাম। কেহ কেহ হয়তো লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কী প্রচণ্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিস রিটার্ন ও ফৌজদারি রিপোর্টেই প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ? পরন্তু ধরুন কেরোসিন তৈল। কেরোসিন তৈল ক্রমে এখন এ দেশের প্রায় আপাদমস্তক প্রচলিত হইয়াছে; কারণ তাহা অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শস্তা। তেলি নিজে সর্বপাদির তৈল প্রস্তুত করে, তথাচ কেরোসিন তৈল কিনিয়া পোড়ায়; কারণ তাহা শস্তা। দরিদ্রের দেশে শস্তা দ্রব্যেরই আদর; শস্তা দ্রব্যেরই আবশ্যক; তা দেশীই হউক আর বিলাতিই হউক; শস্তাতেই লোকের সুখ শান্তি সুবিধা। সুতরাং শস্তাগণ্ডাই গরিব লোকে দেখে; দেশী বিলাতি বুঝে না। ইহা স্বভাবের নিয়ম ও মনুষ্যপ্রকৃতি। তোমার পক্ষপঞ্জরবিহীন ও পুচ্ছহীন পেট্রিয়টিজম দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্তন করিতে যে চাহ সে কেবল পাগলামি। নেহাত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহই নৈসর্গিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই পেট্রিয়ট হও, দেশী দ্রব্য ও স্বদেশীয় শিল্পে যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তবে তাহার উন্নতিকল্পে অগ্রে চেষ্টা করো; প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী দ্রব্যের দুর্মূল্যত্ব ঘুচাও; নহিলে তাহা কখনোই গরিব লোকের ব্যবহার্য হইবে না; যে নিজে তাহা স্বহস্তে তৈয়ার করে, সেও তাহা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যাউক সে কথা। গত মার্চ মাসে ট্যারিফট্যাক্সের পুনরাবির্ভাবে কেরোসিন তৈলের মাশুল বৃদ্ধি হইয়া তাহা পূর্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। মাশুলের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; অত হিসাব করিয়া দেখি নাই। কিন্তু মূল্য বিলক্ষণই বৃদ্ধি হইয়াছে। ওই তৈলের যে টিন ছিল ১৷৷/০ তাহা হইয়াছে এখন ১৸/০, টিন প্রতি অল্পাধিক ।০ বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই যখন ইহা মর্মান্তিক বাজিয়াছে, তখন গরিব ইতর সাধারণের আর কথা কী! যাহারা এক পয়সার তৈল কিনিয়া তিন রাত্রি পোড়াইত, তাহাদের সে তৈলে এখন পুরা দুই রাত্রিও চলে না। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, কেরোসিন তৈলের এই 'পোত'টা কি পরম সন্তোষেরই বিষয় হইয়াছে? এখন কেরোসিন তৈলের দৃষ্টান্ত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করুন; ফল সেই একই হইবে। দেশী তাঁতের কাপড় অপেক্ষা বিলাতি বা বোম্বাই কলের কাপড় শস্তা। সংগতিহীনে শস্তাই পরে। তাঁতি নিজহস্তে তাঁত বুনে; দেশী বস্ত্র তৈয়ার করে; কিন্তু পরে কি? পরে কি শিমলার কালাপেড়ে? না শান্তিপুরের কল্কাপেড়ে? কিংবা ফরাসডাঙার কাশীপেড়ে? সম্পাদক শিরোমণিরা নিজে এ-সব বরং পরিয়া বাহার দিতে পারেন। কিন্তু তন্তুবায় তাহা পারে না। তাহার প্রাণে পেট্রিয়টিজম থাকিলেও হাতে পয়সা নাই। সুতরাং সে স্বহস্তে কল্কাপেড়ে প্রস্তুত করিয়াও পরিয়া থাকে বিলাতি কলের থানফাড়া ধুতি; কাপড় সুতায় শুল্ক বসিল, সে ধুতির উপর চাদর জুটা ভার হইবে। অনেকের ধুতিও জুটিবে না; লঙ্গটিতে লজ্জা নিবারিত যদি হইবার হন তবেই হইবেন; নহিলে লজ্জা

নিজেই লজ্জা পাইয়া পলাইবেন। পরন্তু দেশীয় তাঁতির তাঁতের সম্বল বিলাতি সূতা; ইহাও বারেক স্মরণীয়। বিলাতি সূত্র-শুল্কে দেশী কাপড়ের উন্নতিকল্পনা আকাশকুসুমেরই অন্তর্গত।

বিগত মার্চের ট্যারিফট্যাক্সে অনেকানেক দ্রব্যের উপরেই আমদানিমাশুল বসিয়াছে। কিন্তু এখনও কতক দ্রব্য আছে, যাহাদের উপর হয়তো মাশুল বসে নাই; অথচ মূল্য তাহাদের বাড়িয়াছে। বাজারে যে দ্রব্যই দর কর সবই মহার্ঘ; বানিয়া বলে 'মহাশয় মাশুল বসিয়াছে; কাজেই মহার্ঘ'। ইহা বানিয়ার চাতুরী অথবা ট্যারিফ তহশীলদারদের বাহাদুরি ঠিক বলা যায় না। তবে ট্যারিফের নিয়ম গঠনেও যে গলদ আছে ইহাও নিশ্চয়। আইনের উপস্থিত সংশোধনে সে দোষ দূরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল করদ দ্রব্যের দুর্বোধ্য ও অনির্দিষ্ট শ্রেণী বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। পরন্তু কেবল ইন্ডিয়া গেজেটে ট্যারিফের নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়া তাহা বড়ো বড়ো বন্দরে প্রেরণ করা প্রচুর নহে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর আমদানি মাশুল বসিল তাহা নির্দিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিয়া সর্বসাধারণের বিদিতার্থে বাজারে প্রচার করা উচিত। নহিলে বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই সংকট। এ বিষয়ে যে কেবল বড়ো বড়ো সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ক্ষুদ্র দোকানী পসারী ও দ্রব্যের খরচকারী ক্রেতা মাত্রেই ইহার সহিত জড়িত। অতএব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েস্টল্যান্ড বাহাদুর যে কেবল ইন্ডিয়া গেজেটের উপরেই নির্ভর করিতেছেন,[১] ইহা ঠিক নহে।

গত মার্চ মাসে অনেকানেক আমদানি দ্রব্যের উপরেই মাশুল বসিয়াছিল; বসে নাই কেবল কাপড় ও সূতার উপরে। মাঞ্চিস্টারের মাহাত্ম্যেই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, সম্ভবত মাঞ্চিস্টারের মহিমাতেই, সেক্রেটারি-অব্-স্টেট কাপড় সূতার মাশুল অনুমোদন করেন নাই। নহিলে ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টের তাহাতে সবিশেষ ইচ্ছা না ছিল এমন নহে। স্টেট-সেক্রেটারি মি. ফাউলার সাহেবকে তাঁহার উক্ত অনভিমতের জন্য অনেক নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হইয়াছিল। কাউন্সিলের প্রায় সকল মেম্বরই তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সরকারি সদস্যেরা সাফই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা হুকুমের চাকর সুতরাং কাপড় সূতার কর বসাইতে পারিলেন না। পরন্তু সাহেব সওদাগরেরা সাংঘাতিক রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটা অস্বাভাবিক আন্দোলন উঠাইয়াছিলেন। নেটিব পেট্রিয়টেরা যাইয়া সে আন্দোলনে যেরূপে যোগ দেন অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি। কাপড় সূতার করের অভিলাষে আন্দোলন ভয়ানক ফাঁপিয়া উঠে। দেশীয় স্বদেশহিতৈষী ও সম্পাদকবর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠেন— 'ইহা ইংরাজের একান্ত অন্যায়, অপরিসীম অবিচার, পৈশাচিক অত্যাচার; সূতা ও কাপড়ের কর অবিলম্বে চাই, এখনই চাই; নহিলে দেশ এই দণ্ডেই উৎসন্নে যাইবে।'

আশ্চর্য! আমরা এরূপ আশ্চর্য আন্দোলন ও অভিমত খুব কমই দেখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক, সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র পথানুসারী সংবাদপত্র, এ সম্বন্ধে সকলেরই এক রায়— 'কাপড় সূতার কর না বসিলে ভারতভূমি অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবে।' ঘোরতর কংগ্রেস-বাদী 'বেঙ্গলী' হইতে কংগ্রেসের বিকট বিদ্বেষী 'বঙ্গবাসী' পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর স্বদেশভক্তই, এ ক্ষেত্রে একাসনে উপবিষ্ট! তৈলে জলে দুগ্ধ শর্করাবৎ সংমিশ্রণ! অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ অস্বাভাবিক একাকার আমরা আর কখনো দেখি নাই। এরূপ প্রকাণ্ড প্রমাদও আর কখনো দেখি নাই।

আন্দোলনের তুফান উঠিল। কয়েক মাস ধরিয়া আরজি ও আবেদনের ফুটকড়াই ছুটিল। সহস্র সহস্র স্বাক্ষরপূর্ণ সুদীর্ঘ আবেদন বিলাতে প্রেরিত হইল। স্বাক্ষর গ্রহণের সীমা ছিল না; দিগ্‌বিদিগ্‌বিচার ছিল না; অজ্ঞানে সজ্ঞানে যেমনেই হউক দস্তখত হইলেই হইল। দস্তখত সংগ্রহের জন্য দস্তুরমতো কমিশন কবুল করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোনো পেট্রিয়ট তাঁহার আপিসের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সৎকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

---

১. মি. ওয়েস্টল্যান্ডের ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বক্তৃতা : ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪।

ব্রিটিশ সিংহ আন্দোলন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যই করুন, একান্ত উপেক্ষা করেন না; দৃশ্যত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেও তাহাতে করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া থাকেন; ঈষৎ মাত্রায় আশঙ্কিতও না হইয়া থাকেন এমন নহে। মৌলিক হউক বা মেকিই হউক 'পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক পদার্থমাত্রই অবিকৃত বিলাতি ধাতুতে 'সূচিকাভরণ'স্বরূপ। এ লক্ষণ সাধারণত সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোনো কোনো সময়ে যে তদ্দ্বারা সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাও হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। সেটা 'পাবলিক ওপিনিয়ন' প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের পাপনিবন্ধনই ঘটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ বাহিরের কোলাহলে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন; এ কথা লর্ড এলগিন, সিংহশক্তির সামঞ্জস্য ও তৎকৃত কার্যমাত্রের মাহাত্ম্য বা প্রমাদরাহিত্য প্রতিপাদনার্থে অবশ্যই বলিতে পারেন; আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার দিন ইহা বিশিষ্টভাবে বুঝাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু তাই বলিয়া কথাটা অখণ্ডভাবে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কাপড়ের কর আন্দোলন ব্যতীত আদৌ জন্মিত না; পূর্বাপর ঘটনাতেই ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

ওই কর-সংস্থাপন কামনায় সাহেব সওদাগরদিগের সংগ্রামের সহিত দেশীয় স্বদেশ-হিতৈষীদিগের সংযোগে ভারত গবর্নমেন্ট না হউন ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছিলেন। পার্লামেন্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এবং অচিরাৎ বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর না বসিলে অসন্তোষের উগ্র অনলে ভারতরাজ্য দগ্ধ হইবে, বিলাতে ও ভারতে এই অমূলক অলীক কথাও অপ্রকাশ ছিল না। তৎকালে ওই অসন্তোষ আস্ফালিত করিবার এক হাস্যকর অতি বৃহৎ সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ট্যারিফ আন্দোলনের সময় উত্তরবিহারের আমবাগানে এক আমোদ উপস্থিত হয়। সকলেরই স্মরণ আছে সে আমোদ কী— বৃক্ষে বৃক্ষে কর্দমাক্ত কেশ শোণিত সম্পৃক্ত। কোন্ গ্রাম্য বালকেরা ওই বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিহুতিয়েরা উহাকে বলিয়াছিল 'হনুমানজীউর তিলক'। হনুমানজীউর হউক, আর যাহারই হউক, এই তথাকথিত তিলক একটা রাজনৈতিক তুফান উপস্থিত করিয়াছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা উহাতে একটা অজ্ঞাত আসন্ন ও অতি বিরাট বিভ্রাট কল্পনা করিয়াছিলেন, তিলকাঙ্কে প্রকৃত প্রস্তাবেই সেই ত্রেতাযুগপ্রসিদ্ধ বীরের লঙ্কাদগ্ধকারী মার্তণ্ড মূর্তি সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে অতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার জাতি যাহাতে জুজু দেখেন, তাহাই রাজনীতির অন্তর্গত; অন্যের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাহা রাজনীতির চক্ষে ভীষণ বিভীষিকা; সুতরাং ত্রিহুতের তিলক-চালাচালি সিপাই মিউটিনির সময়ের চাপাটি-চালাচালির অনুরূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কারণের মধ্যে এই তিলকের একটা প্রকাণ্ড কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যে, কাপড় সুতার উপর কর না বসাতেই লোকে অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অচিরাৎ একটা মিউটিনি করিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদিগকে অ্যাভাবাচ্ছাসহ সটান অক্ষয় স্বর্গধামে পাঠাইবে। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আসন্ন। সেই বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ আম্রবৃক্ষে তিলকাকারে অঙ্কিত।।

মোটের উপর অবস্থা হইয়াছিল এই। অতএব উপরোক্ত আন্দোলন অস্বাভাবিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে উত্থিত হইলেও নিষ্ফল হইবে কেন? মাঞ্চিস্টারের স্বার্থ ও স্টেট-সেক্রেটারির সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার করের অঙ্কুর তখনই হইয়াছিল। সে অঙ্কুর এখন

---

১. লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাঞ্চিস্টারের ইষ্ট সিদ্ধির আরোপিত পক্ষপাতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন : It is alleged in certain quarters. . .that in consenting to introduce this Bill in its present form the Government has made a cowardly surrender to a pressure which if not unconscious is at any rate unusual, and oppressive. I wish to take exception to any such statement. ইত্যাদি।

এক বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শুল্ক বসিয়াছে এবং সেইসঙ্গে ও সেই অনুপাতে এ-দেশীয় কলের সুতার উপরেও কর নির্দিষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। স্বাধীন বাণিজ্যের মূল সূত্র এবং ততোধিক, বাণিজ্যপরায়ণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের লাঙ্কেশায়েরি স্বার্থ, উহা অগত্যাই করিতে বাধ্য। বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর বসিলে এ-দেশীয় কলের কাপড় সুতার উপর অবশ্যই কর বসিবে, এ কথা গবর্নমেন্ট তখনই স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আন্দোলনকারীদের কতক লোকে হয়তো তাহা বুঝেন নাই; কতক লোকে তাহা বুঝিয়া সজ্ঞানে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সে করও বহনে সম্মত হইয়াছিলেন। নহিলে পরের যাত্রা- ভঙ্গার্থে আপন নাসিকার সম্পূর্ণ ছেদনকার্য সম্পাদন হইবে কেন? অতএব যাঁহারা বিলাতি আমদানি বস্ত্রের মাশুলের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, অন্তত তাঁহাদের পক্ষে এখন উক্ত কর বসিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করা কেবল অন্যায় ও অসংগত নহে, উন্মাদ রোগের লক্ষণ। বিলাতি আমদানি কাপড়ের উপর কর বসিলে দেশী কাপড়েও কর লাগিবে ইহা সকলেই জানিত; গবর্নমেন্ট নিজে এ কথা বলিয়াছিলেন, স্টেট-সেক্রেটারি সেই শর্তে আমদানি কর মঞ্জুর করিয়াছিলেন; কাউন্সিলগৃহে স্বদেশহিতৈষী পক্ষ সে কর স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।[১] তবে এখন আবার কথা কেন, গবর্নমেন্টকে গালাগালি কেন আর এত গণ্ডগোলই বা কেন? আপন নাসিকা আপনারাই কাটিয়াছ তাহাতে পরের দোষ কী? আবদার করিয়াছিলে আইন হইয়াছে আবার কী?

সাহেব সওদাগরেরা বিলাতি কাপড়ের জন্য কেন অত আন্দোলন করিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাধুতার অন্তরালে আসল অভিপ্রায় যাহা তাহা অত্যল্প পরিমাণে অনুমান করিতে পারিলেও আমরা এ স্থলে বলিতে চাই না। পরন্তু স্বদেশভক্ত সম্প্রদায় সে করের জন্য কেন অত 'উতলা' হইয়াছিলেন তাহাও বুঝা কঠিন। তাঁহাদের অধৈর্যের একটা কারণ আমরা উপরেই নির্দেশ করিয়াছি। তাহা হুজুক 'হবি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতি কাপড়ে মাশুল হইলে, কাপড়ের দেশী কলওয়ালাদিগের সুবিধা হইবে, দেশের শিল্পোন্নতি হইবে এই অনুমানেই স্বদেশহিতৈষীরা আমদানি-করের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কার্যত কোনো কথাই নয়। কেননা আমদানি-কর হইলে 'এক্সাইস' করও হইবে ইহা উভয় পক্ষে অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য মি. ফাজুলভাই বিশরামের ইংরাজি উক্তি আমরা ফুটনোটে উদ্‌ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজে কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারী তথাচ বিলাতি কাপড় সুতার উপর আমদানি করের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কাপড় সুতায় শুল্ক সংস্থাপনে সম্মত হইতেছি।'

পরন্তু আমদানি-করে হস্তনির্মিত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পনা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ বিড়ম্বনাময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টি মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভবে। ক্ষুদ্র লোকের এমনি বৃহৎ কল্পনা করা সাধ্য নহে। তাঁতি রাজা মান্ধাতার আমলের আর্য-তাঁতে বিশুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করে; সে বস্ত্র মাঞ্চিস্টারের ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নহে; অতি উত্তম কথা। পরন্তু সেই বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূতাত্মা আর্যসন্তানদিগের সন্ধ্যাহ্নিক আওড়াইবার অতিরিক্ত সুবিধা হইতে পারে। ইহা আরও উত্তম। কিন্তু এই যে আর্য-তাঁতের বিশুদ্ধ বস্ত্র ইহাতে সূত্র কাহার? সুতা কোথা হইতে আসে সে সংবাদ কি সত্য সত্যই আপনারা

---

১. সুপ্রিম কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফাজুলভাই বিশরাম বলিয়াছিলেন : I, for one, speaking as a mill owner, would be willing to support the levying of an excise duty on cotton goods manufactured in India, assuming of course that such an import can be practically levied without injustice and serious trouble.

কেহ রাখেন না? চিক্কণ চটকদার কালাপেড়ে পরিয়া তাহার উপর অভ্র ইস্তিরির অতি সূক্ষ্ম উড়ানি উড়াইয়া তুমি যে দেশী বস্ত্রের বাহার দেখাও সুতা কিন্তু তাহার বিলাতি। বিলাতি সুতা ব্যতীত, তোমার দেশী বস্ত্রের বাবুগিরি গলিয়া যায়; দেশী তাঁতির তাঁত শিকায় উঠে। বোম্বায়ের কলে জোর ২৪ নম্বরের সূত্র অবধি জন্মে, তাহার অধিক সূক্ষ্ম সূত্র জন্মে না; কিন্তু তোমার বাবুয়ানার উপকরণ ও গৃহিণীর লজ্জানিবারণের (!) জন্য বস্ত্রটা ৮০ নম্বরেরও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত হইলে ভালো হয়; কিন্তু, সে-সব সূত্র বিলাত হইতেই আসিয়া থাকে। দেশী তাঁতি বিলাতি সূত্রের দ্বারাই বস্ত্র বোনে। অতএব বিলাতি সূত্রে শুল্ক বসিয়া দেশীয় বস্ত্রের শিল্পোন্নতি কোন্ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হইবে তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। ট্যারিফ শুল্কে বিলাতি বস্ত্রের মূল্যাধিক্যের অনুপাতে দেশী বস্ত্রের মূল্যও দারুণ বৃদ্ধি হইবে; কেননা বিলাতি সূত্রে দেশী বস্ত্র নির্মিত; সূত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এরূপ স্থলে লোকে বিলাতি কাপড় (তাহার মূল্য আমদানি শুল্কে এখনকার অপেক্ষা বাড়িলেও) ছাড়িয়া তদপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্যের দেশী বস্ত্র কিনিতে চাহিবে কেন? আর পেট্রিয়টিজমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায়? পেট্রিয়টিক স্পিরিটে তো আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না। বলিবে, 'বোম্বাই কলের কাপড় পরিবে। বঙ্গদেশেও কাপড়ের কল হইতেছে।' বঙ্গীয় কলের বস্ত্র আজও বাহির হয় নাই; হইলেও তাহা এবং বোম্বাই কলের বস্ত্র, বিলাতি বস্ত্রের অপেক্ষা এক কাহ্নিও সস্তা হইবে না; বরং এক আনা বেশিই হইবে। কারণ আকাঙ্ক্ষিত আমদানি-করের অনুকম্পায় সে কাপড়ের সূতার উপরেও এক্সাইস শুল্ক বসিয়াছে। এক্সাইস শুল্ক না বসিলেও সম্ভবত তাহা বিলাতি কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। পরন্তু দেশী কলে কাপড় অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মে, আর সে কাপড় এত অধিক মোটা যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা সর্বদা ব্যবহারেরও যোগ্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও সংসারের প্রাতিদৈনিক সম্ভাবনাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি। উদ্ভট 'অঘটনপটিয়স' পেট্রিয়টিজমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে। সে কথায় বড়ো বড়ো বক্তৃতা ও লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ প্রস্তুতই হইতে পারে; সংসারের আর কোনো কার্যই তদ্দ্বারা হয় না; বিশেষত উদরের অন্ন ও অঙ্গের আবরণের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল অপেক্ষাও সুদূর সম্বন্ধ। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে, আমদানিকারীদের অনর্থক আবদারে বস্ত্রাদির উপর আমদানি-কর বসিয়া আমাদের ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র মহার্ঘ হইল, বোম্বাই কলের কাপড়ের মূল্য বাড়িল; পরন্তু দেশী কাপড়ও অগ্নিমূল্য হইল। অতএব এই আমদানি শুল্কে দেশটা রাতারাতি উন্নতির ঊর্ধ্বমার্গে দশ যোজন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, পাপমুখে এ কথা কীরূপে বলিব?

বলিবে আর যত কিছু না হউক মাঞ্চেস্টার বস্ত্রবণিকের তো অনিষ্ট হইল। তা বটে! কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের অনিষ্ট চেষ্টা করা পুরাতন নীতিশাস্ত্রানুসারে অন্যায়; কিন্তু ইষ্ট না থাকা সত্ত্বেও পরের অনিষ্ট করাকে কী বলিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের সবিশেষ অনিষ্টই বা হইবে কেন? তাহার দশ জোড়া কাপড় যেখানে বিক্রয় হইত, সেখানে না-হয় এখন ছয় জোড়া বিক্রয় হইবে; ইহার অধিক তো আর কিছু নয়! কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ও অবিকৃত সেই চারি জোড়া কাপড় যাহারা কিনিয়া এত দিন পরিতে পারিত, তাহারা অতঃপর যে একেবারেই কাপড় পরিতে পারিবে না; এই মাঘের শীতে 'জানু ভানু কৃষাণু' ব্যতীত অনন্যোপায় হইবে, সে অনিষ্ট কাহার? মাঞ্চেস্টারের অথবা তুমি যে দেশের ভক্ত বলিয়া ভড়ং দেখাইয়া থাক, সেই দেশেরই? তৃতীয় প্রশ্ন, প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চেস্টারের অপরাধই বা কী যে, তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছিলে? স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের স্বতঃশিরোধার্য, কিন্তু, তাহার অযথার্থত মহিমা কীর্তন করাকে আমরা তাহার প্রকৃত মর্যাদাটিকে মাটি করাই মনে করি। তুমি বড়ায়ের বোকামি করিয়া আর্যামির যতই অতিরিক্ত আস্পর্ধা কর-না কেন, ইহা সকলেই জানে যে, সে কালের চরকার আমলে দেশের অদরিদ্রদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে দুইখানা বস্ত্র একত্রে ব্যবহার

করিতে পাইত। দরিদ্র শ্রেণীর বস্ত্র-পরিধান-বিলাসের কথা এখানে না বলাই ভালো। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরানীরাও তখন চরকা কাটিতেন। অন্যূন চারিমাস চরকা না ঘুরাইলে একখানা কাপড়ের উপযুক্ত সুতার সংস্থান হইত না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বস্ত্রের সুবিধাটি তখন কেমন ছিল। তোমার সাত গাঁটের বস্ত্র সওদাগরি ও ঢাকাই মসলিন মসলন্দের কথা শুনিবা মাত্রই আমরা মোহিত হইয়া 'মরি মরি' বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু সে 'মরি মরিতে' আসল ঘটনা মারা যাইবে না। তখন সমগ্র দেশমধ্যেই বস্ত্রের অভাব বিলক্ষণই ছিল। মাঞ্চেস্টারের অপরাধ এই যে, সে এ দেশে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিয়াছিল এবং করিতেছে। সুলভ বস্ত্র আনিয়া দেশের ইতর ভদ্র সর্বসাধারণকে বস্ত্র পরাইয়াছে। সে সূক্ষ্ম সূত্র পাঠাইয়া তোমার বাবুগিরি বজায় রাখিয়াছে; বরং বিলক্ষণ বৃদ্ধিই করিয়াছে। পরন্তু, তাহারই জন্য দেশীয় তাঁতির তাঁত আজও চলিয়াছে। মাঞ্চেস্টারের অপরাধ এই। এই অপরাধে এত রাগ? তুমি আরও রাগিয়া বলিবে, 'অপরাধ অবশ্যই অপরিসীম অপরাধ। তাহারই জন্য তো এ-দেশীয় তাঁতিকুল উৎসন্নে গিয়াছে।' এইরূপ উক্তির ধুয়াটা কিছুকাল হইতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিয়াছে বটে; কিন্তু, প্রিয় মহাশয়, আপনার এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন স্বীকার করা যায় না তাহা বুঝাইবার স্থান এখানে নাই; কিছু সবুর করিলে বুঝাইতে পারি। কিন্তু, তাহা স্বীকার করিলেই বা কী? স্বীকারই না-হয় করিলাম মাঞ্চেস্টারের সুলভ বস্ত্রের দৌরাত্ম্যে দেশের তাঁতিদের তাঁতবোনার ব্যাঘাত হইয়াছে; তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে; তাহারা উৎসন্ন হইতেছে। কিন্তু মাঞ্চেস্টারের এই অনিষ্টে, অনিষ্টই যদি ইহা হয়— আমাদের তাঁতিরা কি উৎসন্নের পথ হইতে ফিরিতে পারিবে? আমরা উপরেই দেখাইয়াছি, মহাশয়রা অনর্থক আন্দোলনে যাহা করিলেন, তাহাতে আমাদের তাঁতিদের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই কূলই বরং গেল। তার পর কেবল এক তাঁতিকুলের সুবিধা সচ্ছলতার জন্য, সমগ্র দেশের লোক দুঃখ সহ্য করিবে, সুলভ বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে, সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? অথবা সুযুক্তির কথা? এখন সর্বশেষে আর-একটি প্রশ্ন আছে। এই যে আমদানি মাশুল বসিল, এ মাশুল ফলিতার্থে দিবে কে? দিবে বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা? ক্রেতারই তো এ মাশুল দিতে হইবে। মাঞ্চেস্টার তো এ মাশুল দিবে না মহাশয়; দিতে হইবে যে আমাদেরই। এ কথাটি কি আপনারা একটিবারও ভাবিয়াছিলেন? হায়! ভাবিবার অবসর পান নাই; ভাবা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

অতীব অভাগ্যের বিষয় যে, আবদারকারীরা চিন্তাশীলতার অতি গুরুত্বে বস্ত্রক্রেতা বলিয়া যে একটা জীবও জগতে আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাহাদের অস্তিত্ব আদৌ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা হয়তো মনে করিয়াছিলেন এ মাশুল মাঞ্চেস্টারই দিবে। ভারতবাসীর দিতে হইবে না। কিন্তু স্টেট-সেক্রেটারি আপন কর্তব্য ভুলেন নাই। তিনি যথাসময়েই স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমদানি-কর মাঞ্চেস্টারের স্কন্ধে পড়িবে না; প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িবে তাহা ভারতেরই স্কন্ধে। পরন্তু তাহাতে করিয়া দরিদ্র রায়তের বস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ বিভ্রাটই ঘটিবে।[১] কিন্তু সে কথা শুনে কে? সেক্রেটারির সমীচীন উক্তি তৎপ্রতি পলিসি আরোপেরই কারণ হইয়াছিল। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হইলে সেক্রেটারি-অব-স্টেট এ সম্বন্ধে অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। তবে তিনি সকল দিক রাখিতে গিয়া কোনো দিকই রক্ষা করিতে পারেন নাই; এ কথাও সত্য। তিনি এ-দেশীয় আন্দোলকদিগের সন্তোষার্থে বিলাতি

---

১. I should like to ask who is going to pay the taxes on the goods imported ? The people of India, the consumers of India. . . .Whether import duties are right or wrong, whatever duty you levy on cotton goods must inevitably be paid by the people who wear these cotton goods in India. The tax, would therefore be a tax upon the people of India and not upon the Lancashire manufacture. সেক্রেটারি-অব-স্টেট মি. ফাউলারের বক্তৃতা হইতে উদ্‌ধৃত।

বস্ত্রের আমদানি-কর এবং মাঞ্চেস্টারের মন রাখিবার জন্য এ দেশে এক্সাইস কর বসাইয়াছেন— ফল হইয়াছে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ। পরন্তু বস্ত্রক্রেতা দরিদ্র প্রজা-সাধারণেরও তিনি সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। কারণ কাপড়ের কর তাহাদিগেরই দিতে হইবে।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে যে, গবর্নমেন্টের অর্থের অনটন। বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক বিষম বেশি। ব্যয়ের অঙ্কের সহিত আয়ের অঙ্ক যে রূপেই হউক সমান করিতে হইত। তজ্জন্য গরিব রায়তের শরীরের শিরা কাটিয়া শোণিত বাহির করিতে হইলেও গবর্নমেন্ট ছাড়িতেন না। অতএব ট্যারিফট্যাক্স হইয়া বরং ঠেকাইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই আর-একটা নেহাত সাংঘাতিক শুল্ক সংস্থাপিত হইয়া দেশমধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইত।

আমরা এরূপ যুক্তি আপাদমস্তক অনুমোদন করিতে পারি না। বজেটের দুই দিকে একই অঙ্ক সন্নিবেশের জন্য গবর্নমেন্ট গর্হিত উপায়ে আয়ের অঙ্ক না বাড়াইয়া উচিত উপায়ে ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া আয়ের অঙ্কের অনুপাতে আনিতে পারিতেন। তজ্জন্য আন্দোলন হইতেছিল। সেই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপ্ত ও বলশালী করা উচিত ছিল। ন্যাশনাল কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য বহুকাল আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলন একেবারেই যে নিষ্ফল হইয়াছে ও হইবে এমনও নয়! এ সম্বন্ধে অন্তত একটা কমিশনেরও আদেশ হইয়াছে। সে কমিশনের কার্য আরম্ভ ও শেষ না হওয়া পর্যন্ত গবর্নমেন্টকে এই উৎকট কর বসাইবার অবসর দেওয়া ও অনুরোধ করা প্রজানীতির উচিত হয় নাই। গবর্নমেন্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমদানি ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন। তাহারই প্রাণপণ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল; গবর্নমেন্ট যে দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসাইতে উৎসুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক আন্দোলন দ্বারা তাহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা প্রকৃত প্রজানীতির অনুরূপ কার্য হয় নাই। পরন্তু, এই কাপড়ের কর আর কোনো একটা কুৎসিত কর সংস্থাপন করিলে এবং প্রজাপক্ষ হইতে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে আপত্তি হইলে, সে কর নিশ্চয়ই চিরকাল টিঁকিত না। ফলত আবদার করিয়া একটা এত বড়ো করভার গ্রহণ করা নেহাত নির্বোধের কাজ— নিজের নাসিকা ছেদনের মতোই হইয়াছে। কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষই হউক কর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরোক্ষ হওয়াতে করের প্রচণ্ডতা কিছুই কমে না; তাহাতে করিয়া কেবল তাহার কপটতা ও প্রবঞ্চনাই সূচিত হয়।

এ দেশে ইংরাজের আমলে বস্ত্রকর বহুকালই ছিল না। খৃ. ১৮৫৯ সালে এই কর প্রবর্তিত হয়। আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসে। এবং সেই হিসাবে ওই শুল্ক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চলে। ১৮৬৪ সালের ২৩ আইনে উহা পাঁচ টাকা হইতে শতকরা সাড়ে সাত টাকায় উঠে। ১০/১১ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালের ১৬ আইনে উহা পুনঃ পাঁচ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে এই শুল্ক একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালের ১১ আইনে ট্যারিফ ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছিল এবং অনেকানেক রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলও উঠিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার বারো বৎসর পরে পুনঃ বস্ত্রকর আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র যখন নিষ্কর ছিল তখনই সব লোকে বস্ত্রের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। দেশ এতই দরিদ্র যে, মাঞ্চেস্টারের মহা সুলভ বস্ত্রও সকলে কিনিতে পারে নাই। এই প্রবন্ধের লেখক দেশমধ্যে এমন অনেক পল্লী ও পরগনা দেখিয়াছে যেখানে বারো আনা রকম লোক নির্বস্ত্র। কৃষাণ ও মজুর শ্রেণীর পরিধেয় কেবল অর্ধহস্ত পরিমিত একটি লঙ্গটি মাত্র। 'শতগ্রন্থি বস্ত্র' প্রবাদবাক্য; কিন্তু সহস্রাধিক গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে ললনা-অঙ্গের লজ্জা আবৃত বা অনাবৃত হইতেও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। বস্ত্রের নিষ্কর সময়েও অনেক স্থলে অবস্থা এই; অতএব বস্ত্রের উপর কর বসিয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিৎমাত্র বাড়িলেও ওই অবস্থা কীরূপ হইবে তাহা কেবল অনুভবনীয়। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি দ্রব্য মনুষ্যজীবনে এবং মনুষ্যসমাজে একান্ত অপরিহার্য আবশ্যকীয়; এই দুই সামগ্রী যত সুলভ ও

সুপ্রাপ্য হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা করা রাজনীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই কর্তব্য। মনুষ্য-অস্তিত্বের সর্বপ্রধান উপাদান অন্নবস্ত্রের উপর কোনো কর বসাই উচিত নয়; বিশেষত উহা অতিরিক্ত করের বিষয়ীভূত হওয়া ন্যায়ত ও ধর্মত অন্যায়; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।

এবারকার আইনটি যেরূপ হইল অল্পের মধ্যেই বলা যাইতেছে। বিদেশী ও বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার শতকরা পাঁচ টাকা কর নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সাবেক সি কাসটাম ট্যারিফ আইনেরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র একটি আইন হইয়াছে, তাহার নাম ১৮৯৪ সালের 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। এই আইন আমদানি বস্ত্র শুল্ক আইনেরই অনিবার্য ফল, অগ্রেই বলিয়াছি। কেননা বিদেশী বা বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যারসা করিয়া, গবর্নমেন্ট, স্বাধীন বাণিজ্যের সূত্রানুসারে, এ-দেশীয় কল-শিল্পজাত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয় সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর বসাইতে বাধ্য। সেই কর বসাইবার জন্যই এই 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। বিলাতি বস্ত্রে শুল্ক না বসিলে এ অ্যাক্ট বা আইন নিশ্চয়ই হইত না। এই আইন অনুসারে দেশী কলের সুতার উপর কর বসিল। সুতার শুল্কের অর্থই বস্ত্রের কর; কারণ যে সুতার বস্ত্রে বয়ন হইবে সে সুতারও শুল্ক লাগিবে; সুতরাং বোনা বস্ত্রের উপর কর না বসিয়া অবোনা সুতার উপরেই শুল্ক হইয়াছে। অর্থ একই। করের হার আমদানি-করেরই সমান অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াই হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা এই যে, দেশী কলে হয় মোটা সুতা; বিলাতি কলে জন্মে সরু সুতা। বোম্বে অঞ্চলের কল, বিলাতি কলের সরু সুতার সহিত বড়ো বেশি প্রতিযোগিতা করে না। যে পরিমাণে প্রতিযোগিতা সেই পরিমাণেই কর বা আইন প্রয়োজন। অতএব দেশী কলে যে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ও অত্যল্প সরু সুতা উৎপন্ন হয়; তাহারই উপর কর বসিয়াছে। অর্থাৎ দেশী কলে ২০ নম্বরের সুতার ও তন্নিম্ন শ্রেণীর সুতার কর লাগিবে না; ২১ নম্বর হইতে তদূর্ধ্ব নম্বরের সরু সুতারই শুল্ক লাগিবে। গবর্নমেন্ট যদি কখনো ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইহার পর অতিরিক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিপন্ন হয় যে, এ-দেশীয় কলে ২০ নম্বরের সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত হয় না; তাহা হইলে আইন একটু সংশোধিত করিবেন; ২০ নম্বর ২৪ নম্বরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ২৪ নম্বর পর্যন্ত সুতার শুল্ক লাগিবে না, তদূর্ধ্ব হইলেই তাহা লাগিবে। পরন্তু, এ-দেশীয় কল হইতে যে-সকল সুতা অন্য দেশে রপ্তানি হইবে, তাহার শুল্ক লাগিবে না; দেশমধ্যে যে-সকল সুতা বিক্রয় হইবে এবং দেশমধ্যে বিক্রেয় বস্ত্র যে-সকল সুতায় প্রস্তুত হইবে তাহারই কেবল শুল্ক লাগিবে। দেশের লোকের সুখ-সুবিধার প্রতি ইহা যৎপরোনাস্তি শুভ দৃষ্টি বটে!! 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট' সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সমান বর্তিবে এবং আইন হওয়ার পর হইতেই, আজ কয়েক দিন হইল উহা আমলে আসিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যও বাদ পড়ে নাই। তাহা বিদেশ ও বিলাতের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কল হইতে যে-সকল কাপড় সুতা ব্রিটিশ-ভারতে আসিবে তাহারও শুল্ক চাই। অতএব দেশীয় রাজার রাজ্যে গিয়াও যে কাপড় সুতার কল পাতিয়া আইনের হস্ত এড়াইবে, সে উপায়ও নাই। মাননীয় মি. ওয়েস্টল্যান্ডের এ সম্বন্ধে আমাদের উপকারে উক্তি অতি চমৎকার উপাদেয়। তাহাতে হাস্য করুণ এই উভয়বিধ বিরোধী রসেরই একত্রে উদ্রেক হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে এই আইনের অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছিল। এবং তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক কথাও নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা সমালোচনা করার স্থান নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের পক্ষ হইতে বেসরকারি সদস্যেরা যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত দুর্বল যে, তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য নহি।

কটন ডিউটি আইনে অন্যান্য অনিষ্ট ব্যতীত স্বদেশীয় শিল্প ও শ্রমের বিপুল অনিষ্টসাধন করিবে। এ আইন যতই সাবধানে অনুষ্ঠিত হউক এখন হইতে এ-দেশীয় কাপড় সুতার

কলগুলিকে সরকারি পাহারার প্রচণ্ড দৃষ্টির উপর সর্বদাই থাকিতে হইবে। বিন্দুমাত্রও পদস্খলন হইলে নিস্তার থাকিবে না। কলের কার্য ও সমস্ত কাগজপত্র যদৃচ্ছা সরকারি পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধীন হইবে, হিসাবের একটুকুও এদিক-ওদিক হইলে দ্রব্যের দেয় মাশুলের তিনগুণ মাশুল আদায় হইবে। সরকারি তহবিলে কোনো রকমের তঞ্চকতা-প্রবঞ্চনাদি প্রমাণ হইলে হাজারো টাকা জরিমানা হইবে; পেনালকোড আমলে আসিবে; কলওয়ালাদিগের কারাবাসও হইতে পারিবে। কলের কাপড় সুতার স্বদেশীয় শিল্প তাহার এই শৈশবাবস্থায় আইনের এত অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কলের স্বত্বাধিকারীরা স্বভাবতই মহা উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। আইনে আপত্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন আপত্তি করা অনর্থক। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' আক্ষেপ এই যে, স্বদেশহিতৈষীরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার অবসর দেন নাই। আবদার করিয়াই এই উৎকট আইন করাইয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে—

The finer classes of cotton manufactured in India enter into direct competition with the cotton manufactures imported from England. As it is intended to weight these last with an import duty, it is considered necessary to levy at the same time a contervailing duty upon the competitive classes of Indian manufactures.

অতএব আপত্তি করা এখন বৃথা। এই আইন হওয়ার অঙ্গীকারেই আমদানি-কর বসিয়াছে। আমদানি-কর না উঠিয়া গেলে, এ আইন রদেরও সম্ভাবনা নাই! আমরা এ উভয়কেই সমান আপদজনক বিবেচনা করি। বেঙ্গল কাউন্সিলে ড্রেনেজ কর প্রস্তুত হইয়াছে; অবিলম্বেই আবির্ভূত হইয়া জমিদার ও রায়তের কর-ভারপীড়িত স্কন্ধ পুনঃ প্রপীড়িত করিবে। তাহার পূর্বেই কাপড়ের কর উপস্থিত। দেশে অন্নবস্ত্রের একেই তো এই সচ্ছলতা তাহার উপর আইন-কানুনের এমন সব মেওয়া ফল, পরম রমণীয়ই বটে! তবে আমাদের শত্রুশিবির হইতে বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল আগমনের আশা করা যাইতে পারে। আমদানি মাশুলে মাঞ্চিস্টারের মহাজন ও শক্তিশালী শ্রমজীবীগণ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এ আপত্তি উগ্রভাব ধারণ করিলে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা বড়ো সহজসাধ্য হইবে না; একটা সুযোগ খুঁজিয়া আমদানি-কর উঠাইতেই হইবে। যদি আদৌ কোনো আশা থাকে, ইহাই এখন আশা।

সাধনা
মাঘ ১৩০১

সংযোজন

পৃ ১২৯ ।। ছত্র ১৩-এর পরে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধটির শেষাংশ :

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a-dying!
And why my pretty lad, said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag! if this
Such a pernicеous torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা-দংশন

একদা মদন করিয়া যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুমরতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন
মুদিয়া নয়ন রহিল মদন

*

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
'অয়ি প্রিয়তমে।' কহিল রতিরে
'রতিনাথ, প্রাণ যায় যে অচিরে

*

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কী হবে কী করি প্রাণ যে যায়!'

*

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে,
'ছোটো মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভালো, বলো দেখি দাসীর গোচর
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?'

Flow on thou shining river;
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee etc.

MOORE

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমলকুসুমমালা, দিয়ে করে তার।

ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাংলা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

বাঙালি ভায়ারা করি নিবেদন
জোড় করি বন্দি ও রাঙা চরণ!
যা-কিছু বলিনু ভালোরি কারণ
ভাবি দেখো মনে কোরো না রাগ।
রাগ তো কর না দাসত্ব করিতে
রাগ তো কর না নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ!
এ-সব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগো না দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরও তা হলে!

অবসরসরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু 'বাঙালি ভায়ারা' ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোনো ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি 'কেন ভালোবাসি?'র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও

তাঁহার 'প্রিয়তমা হাসিল'র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

> রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
> রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
> ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
> পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
> সস্বনে নিস্বনে মলয় পবন,
> আহ্রি সুরভি নন্দনরতন
> মন্দারসৌরভ অমৃতরাশি
> মর্মরিছে তরু অটল ভূধর,
> দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি! যখন প্রতিভার 'পিশাচী' 'প্রেতিনী' -ময়ী কবিতার মধ্যে কোনো কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি! একজনকে আমি 'উন্মাদিনী' কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি ; তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে; এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দুঃখসঙ্গিনীতে আর্যসংগীত নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত। এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে, তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ -জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলো! তাহা দমন করিয়া

তুমি বলপূর্বক যেন 'ভারত' 'একতা' 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার করিয়ো না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি— তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে পারিলাম না।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্রন্থিত থাকিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ হইয়া আছে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রানুরাগী গবেষকেরা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত না হইলেও, সেইসব তালিকা আমাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি এবং ইহার গ্রন্থপরিচয় সংকলনের কাজে আমরা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন এবং কানাই সামন্তের বিভিন্ন গবেষণার কাছে ঋণী। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীমতী সাধনা মজুমদার এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস। সেইসব কাজের, এবং আরও কোনো কোনো নূতন সন্ধানের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থপরিচয় সংকলিত হইল। গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল।

কবিতা

কবিতাগুলির সাময়িকপত্রে, কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

কবিতা	প্রথম প্রকাশ
১. অভিলাষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক (১২৮১ বঙ্গাব্দ)
২. 'হোক ভারতের জয়'	বান্ধব, মাঘ ১২৮১
৩. হিন্দুমেলায় উপহার	অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১২৮১। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
৪. প্রকৃতির খেদ : দ্বিতীয় পাঠ	প্রতিবিম্ব, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২
৫. প্রকৃতির খেদ : প্রথম পাঠ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৭৯৭ শক। ১২৮২ বঙ্গাব্দ, জুন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ।
৬. 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর অন্তর্গত। অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫
৭. প্রলাপ ১	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, অগ্রহায়ণ ১২৮২
৮. প্রলাপ ২	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ফাল্গুন ১২৮২
৯. প্রলাপ ৩	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, বৈশাখ ১২৮৩
১০. দিল্লি দরবার	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অন্তর্গত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দ
১১. ভারতী	ভারতী, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৮৪
১২. হিমালয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৪
১৩. আগমনী	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪
১৪. আকুল আহ্বান	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৫. অবসাদ	বালক, চৈত্র ১২৯২
১৬. মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭১
১৭. শারদা	ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৪

১. ৩৯টি স্তবকে রচিত 'অভিলাষ' কবিতাটির শিরোনামের নীচে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' এই সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত আছে। সজনীকান্ত দাস কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা, এইরূপ

অনুমান করিয়া 'তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার বলিয়া স্বীকার' করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সজনীকান্ত দাস -কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ এবং 'রবীন্দ্রনাথ/জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ (প্রকাশ ১৩৬৭)।

২. কালীপ্রসন্ন ঘোষ -সম্পাদিত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধব' মাসিক পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় 'হোক ভারতের জয়' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত। রচনাশেষে '(র)' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল' এই মন্তব্য পাদটীকায় আছে। কবিতাটি রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' শিরোনামে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ পুনর্মুদ্রণ করেন। এই কবিতা হিন্দুমেলার উদ্‌বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন তাহার প্রমাণ *Indian Daily News* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) ও *The Bengalee*-র প্রতিবেদনে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) লক্ষ করা যায়। *The Bengalee* পত্রিকার পরিবেশিত তথ্যানুসারে, কবিতাপাঠের তারিখ ১ ফাল্গুন ১২৮১ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫), কিন্তু *Indian Daily News* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে কবিতাপাঠের তারিখ ৩০ মাঘ ১২৮১ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গান হইতে 'হোক ভারতের জয়' শিরোনামটি যে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন, তাহা উদ্‌ধৃতি-চিহ্নযুক্ত কবিতা-শিরোনাম হইতে অনুমেয়।

৩. দ্বি-ভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত। পত্রিকার পুরাতন ফাইল হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটি উদ্ধার করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-স্বাক্ষরিত সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ইহাই প্রথম কবিতা।

৪. অস্বাক্ষরিত। কবিতা শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত ছিল। পরে অন্য-কোনো পত্রিকায় পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভায়, রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২ (৯ মে ১৮৭৫) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন। উল্লেখনীয়, এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার যে রূপটি আবৃত্তি করিয়া শোনান 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশকালে তাহার অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় টীকা হইতে জানা যায়, '...লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন।... লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে ['বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভা : রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২] আমাদের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশমাত্র মুদ্রিত করিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভায় প্রদান করা হয়। এ জন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে।'

৫. 'বালকের রচিত' এই উল্লেখ শিরোনামের নীচে মুদ্রিত। সজনীকান্ত দাস মুদ্রিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে দেখাইলে তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকার করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সজনীকান্ত শনিবারের চিঠি-র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লিখিয়াছেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা।...' এই কবিতা যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত তাহার আরও প্রমাণ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত 'সাধারণী' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ— 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ" নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন।...' প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পূর্ণ সংবাদটি 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রকাশ, দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২) সংকলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ

শিলাইদহ হইতে লেখা একটি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে এই কবিতা প্রসঙ্গে লেখেন, 'বিদ্বজ্জনের card ও রবির কবিতা পাইয়াছি— কর্ত্তামহাশয় কবিতাটী পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।...'

৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর (প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫) ষষ্ঠ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত গান। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (প্রকাশ ১৩২৬) গ্রন্থ হইতে এই তথ্যটি প্রথম জানা গিয়াছে—

"আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনী'র প্রুফ্ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

৭-৯. স্বাক্ষরিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো কাব্যের মধ্যে 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছকে স্থান দেন নাই। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের "রচনাপ্রকাশ" অধ্যায়ে আলোচ্য পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এমন সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।"

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'অভিলাষ', 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে 'প্রলাপ'গুচ্ছটিকেও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন। 'প্রলাপ' প্রথম সংকলিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী,' তৃতীয় খণ্ডে।

১০. লর্ড লিটনের সময়ে অনুষ্ঠিত (১৮৭৭ খৃস্টাব্দ) দিল্লি দরবার উপলক্ষে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (প্রকাশ ১৮৮২ খৃস্টাব্দ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত-উক্তিরূপে মুদ্রিত। 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রে ৪ মার্চ ১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, "... রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি।... ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি— আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান'।"

যতিনাথ ঘোষ কবিতাটি যথার্থভাবে নিরূপণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে জানান। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (সং মাঘ ১৩৫০) ও সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ / জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থ। উভয় স্থলেই কবিতাটি সংকলিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ'/'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' নামে একটি কবিতা ('লর্ড লিটনের সময়ের কবিতা') হিন্দুমেলায় পাঠ করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, অস্পষ্টভাবে এইটুকু স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কবিতাটির সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।— দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রনাথ', প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ, দিনলিপি। 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২।

১১. অস্বাক্ষরিত। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম কয়েক বৎসরের অস্বাক্ষরিত রবীন্দ্ররচনা তালিকাবদ্ধ করিয়া সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে দিয়া যে অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাটি আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সজনীকান্ত-কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রবন্ধে 'ভারতী' কবিতার নাম তালিকাবদ্ধ হইয়াছে।

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব -অঙ্কিত 'ভারতী' পত্রিকার প্রচ্ছদ-চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

১২. অস্বাক্ষরিত। সজনীকান্ত দাসের পূর্ব-উল্লিখিত তালিকা এবং 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'-ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'মালতীপুঁথি'তে ইহার প্রাথমিক রূপটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত (১৩৯০) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।

১৩. অস্বাক্ষরিত। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধাবলির (প্রকাশ 'প্রবাসী', মাঘ-চৈত্র ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৯) রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্র-রচনা হিসাবে চিহ্নিত। দ্রষ্টব্য. প্রসঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৯২) গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ-সমর্থিত, সজনীকান্ত দাস -কৃত তালিকাতেও রচনাটির নাম পাওয়া যায়।

১৪. 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে ৩৬টি ছত্রে কবিতাটি শেষ হইয়াছে। 'বালক' পত্রিকায়, কবিতাটির মুদ্রিত রূপে দেখা যায় ৭৬টি ছত্রে সমাপ্ত। পাণ্ডুলিপি ও পত্রিকা -ধৃত 'আকুল আহ্বান'-এর মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বিভিন্ন শিরোনামে, নানারূপ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া তিনটি স্বতন্ত্র কবিতায় পরিণত করিয়াছেন। কবিতাগুলি যথাক্রমে, 'আকুল আহ্বান', 'পাষাণী মা', 'মায়ের আশা'। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শিশু' কাব্যে 'আকুল আহ্বান' ও 'মায়ের আশা' সংকলনকালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সম্পাদনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পত্রিকা হইতে গ্রন্থে সংকলনকালে কবিতামধ্যস্থ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ক্রমশ বর্জিত হইয়াছে।

আলোচ্য কবিতা-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, কানাই সামন্ত, "রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ এবং 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়' (প্রকাশ ১৩৯৮) গ্রন্থ।

১৫. 'মালতীপুঁথি'তে শিরোনামহীন অবস্থায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতর পাঠে কবিতাটি পাওয়া যায়। রচনার স্থান কাল রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া রাখিয়াছেন 'Ahmedabad/1878-July 6th / আষাঢ় ২৩শে [১২৮৫] শনিবার।' প্রবোধচন্দ্র সেন 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭২), 'মালতীপুঁথি/পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' প্রবন্ধে রচনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ডে

'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে 'অবসাদ' সংগ্রথিত হইয়াছে।

১৬. শিরোনামহীন এই কবিতাটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -গৃহীত একটি আলোকচিত্র গ্রহণ উপলক্ষে অথবা আলোকচিত্রটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। গগনেন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফি-চর্চার সময়ের হিসাব অনুমান করিয়া কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে, এইরূপ ধরা যাইতে পারে। কবিতায় যে-পাঁচজন বন্ধুর উল্লেখ আছে, তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিশ্চন্দ্র হালদার। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এই সান্ধ্য-মজলিশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িয়া তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই কবিতা-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি আছে, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২ সংখ্যায়।

১৭. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে (১২৫৮-১৩১০) লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সহিত 'শারদা' কবিতাটির সন্ধান পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ রায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (পৃ. ৫৭৭) নিবন্ধের-মধ্যে মুদ্রিত করেন। ১৩০১ হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে কবিতাটি রচিত হয় বলিয়া অনুমান। এই সময়সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরদাসের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো সাময়িক পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য কবিতাটি রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যায়, কিন্তু কোথাও মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, আমাদের জানা নাই। অমরেন্দ্রনাথ রায় বর্তমান প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

রবীন্দ্রবাবুর পত্র :—

> রবীন্দ্রবাবু ঠাকুরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানির মধ্যে তাঁহার হাতের লেখা 'শারদা' শীর্ষক একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটি কোথাও মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না। সময়োপযোগী বোধে আমরা পত্রের সঙ্গে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—
>
> ওঁ
>
> যোড়াসাঁকো
>
> সাদর নমস্কার নিবেদন—
>
> আমি আগামী সোমবার রাত্রে বোলপুর 'শান্তি-নিকেতন' উদ্যানে যাত্রা করিব। ইতিমধ্যে কখন আপনি আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব। ইতি। শনিবার
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালতীপুঁথি-ধৃত কবিতাবলী। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত, এ-তাবৎ প্রাপ্ত, সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি' (অভিজ্ঞান সংখ্যা ২৩১) হইতে ১৩টি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের অধ্যাপিকা মালতী সেন ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে দান করেন। তাঁহার নাম হইতেই পাণ্ডুলিপিটির 'মালতীপুঁথি' নামকরণ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ "মালতীপুঁথি : পাণ্ডুলিপি-পরিচয়" 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ড (১৯৬৫), বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাঁহার যুক্তি অনুসারে পাণ্ডুলিপিভুক্ত রচনাবলী ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃস্টাব্দ কালসীমার মধ্যে রচিত। পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ৮ পৌষ ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কানাই সামন্তর 'মালতীপুঁথি পর্যালোচনা'য় নূতনতর কিছু আলোচনা আছে।

বর্তমান রচনাবলীতে 'মালতীপুঁথি'ভুক্ত যে-সকল কবিতা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সেগুলি গৃহীত হইল। সংকলিত কবিতাবলীর মধ্যে শিরোনামযুক্ত একমাত্র কবিতা 'উপহার-গীতি'। শিরোনামহীন কবিতাগুলির ক্ষেত্রে কবিতার প্রথম ছত্র অথবা প্রথম ছত্রের অংশবিশেষ

শিরোনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে :

১. হা বিধাতা ছেলেবেলা হতেই এমন
২. এসো আজি সখা
৩. পার কি বলিতে কেহ
৪. ছেলেবেলাকার আহা
৫. আমার এ মনোজ্বালা
৬. উপহার-গীতি
৭. পাষাণ হৃদয়ে কেন
৮. ভেবেছি কাহারো সাথে
৯. হা রে বিধি কী দারুণ
১০. ও কথা বোলো না সখি
১১. কী হবে বলো গো সখি
১২. এ হতভাগারে ভালো
১৩. জানি সখা অভাগীরে

—রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

১. হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন। পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন, তবে শিরোনামস্থলে 'প্রথম সর্গ' লিখিত থাকায় অনুমান করা যায়, এটি একটি কাব্য-পরিকল্পনার সূচনা-অংশ। কবিতাটি 'মালতীপুঁথি'র আরম্ভে সংস্কৃত-শিক্ষার নিদর্শনমূলক পৃষ্ঠার পরই লিখিত আছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুমান, 'প্রথম সর্গ' রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত পাণ্ডুলিপি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের 'কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ।'

৬. 'উপহার-গীতি' শিরোনামযুক্ত কবিতাটির রচনাকাল অনুমান করা যাইতে পারে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের শেষ দিকে। এরূপ অনুমানের কারণ, কবিতাটির নীচেই '১লা কার্ত্তিক...' তারিখচিহ্নিত 'কবি-কাহিনী' কাব্যের সূচনা। 'উপহার-গীতি', কবি-কাহিনীর 'উৎসর্গপত্ররূপে কল্পিত হওয়া অবাস্তব মনে হয় না'— কানাই সামন্ত এরূপ অনুমান করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৮, পৌষ ১৩৮৯)। কবিতাটির শেষে লিখিত আছে '*Les Poetes* হইতে/অনুবাদিত—।' এই শিরোনামের পাশে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় 'ভগ্ন [হৃদয়ের] উপরে'। সম্ভবত, ভিক্টর য়্যুগোর *Les Contemplations* কাব্যগ্রন্থের *Les Poetes* কবিতার অনুবাদ এই স্থলে করিবেন, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। 'উপহার-গীতি'র পাশের পৃষ্ঠায় ভিক্টর য়্যুগোর একটি কবিতার অনুবাদ দৃষ্ট হয় : ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া।

সংযোজন

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) ও কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করিয়াছিলেন; সেই কবিতাগুলি এই অংশে সংকলিত হইল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (১৩৮৭) এই কবিতাগুলি মূল কাব্যগ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে সংকলিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীত

১. সন্ধ্যা
২. কেন গান গাই
৩. কেন গান শুনাই
৪. বিষ ও সুধা

প্রভাতসংগীত

৫. স্নেহ-উপহার
৬. শরতে প্রকৃতি

ছবি ও গান

৭. বিরহ

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

৮. সখি রে— পিরীত বুঝবে কে?

৯. হম সখি দারিদ নারী।

কড়ি ও কোমল

১০. শরতের শুকতারা

১১. পত্র (মাগো আমার লক্ষ্মী)

১২. পত্র (বসে বসে লিখলেম চিঠি)

১৩. জন্মতিথির উপহার

১৪. চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল)

১৫. পত্র (দামু বোস আর চামু বোসে)

১. বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যা' শীর্ষক কবিতাটি বর্জন করেন।

২-৩. এই কবিতা দুইটি সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (আশ্বিন ১৩০৩) সংস্করণে বর্জিত হয়।

৪. 'বিষ ও সুধা' 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) বর্জিত। কবিতাটির কিয়দংশের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'তে পাওয়া যায়।
বর্তমান প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সন্ধ্যাসংগীত' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৬৯) দ্রষ্টব্য।

৫. দশম বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উৎসর্গ-কবিতারূপে মুদ্রিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ (চৈত্র ১২৯৮) হইতে কবিতাটি বর্জিত।

৭. 'বিরহ' কবিতাটি পরবর্তী সংস্করণ সমূহের অনেকগুলিতে বর্জিত হয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৬) ও সুলভ প্রথম খণ্ডে গ্রহণ করা হয় নাই। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ছবি ও গান' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৯৫) বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৮. প্রকাশ, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪

৯. প্রকাশ, ভারতী, মাঘ ১২৮৪
—দুইটি কবিতাই পত্রিকাতে 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে মুদ্রিত।
দ্রষ্টব্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৭৬)।

১০. প্রকাশ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বর্জিত।

১১-১২. ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৩. বালক, চৈত্র ১২৯২। 'জন্মতিথির উপহার/(একটি কাঠের বাক্স)' শিরোনামে প্রকাশিত। ইন্দিরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

১৪. প্রকাশ, বালক, ফাল্গুন ১২৯২। ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৫. প্রকাশ, 'সঞ্জীবনী', ১ চৈত্র ১২৯২। ১৩ মার্চ ১৮৮৬। 'প্রাপ্ত' কলমে 'দামু ও চামু। (বাউলের সুর)' শিরোনামে স্বাক্ষরহীনভাবে মুদ্রিত হয়। কবিতাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত, এই অনুমানে বিভিন্ন পত্রিকায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' তৃতীয় খণ্ড (১৩৯৪)।

অনুবাদ-কবিতা

'ভারতী' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪) হইতেই 'সম্পাদকের বৈঠক' নামক একটি বিভাগে বিভিন্ন লেখকের মৌলিক রচনা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। মাঘ ১২৮৪ সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই রচনাগুলি অস্বাক্ষরিত। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে ও গীত-সংকলনে কয়েকটি গৃহীত হইয়াছে। 'মালতী-পুঁথি'তে কয়েকটি অনুবাদের মূল পাওয়া যায়।

ডাকিনী। ম্যাকবেথ। 'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী আশ্বিন ১২৮৭। William Shakespeare (1564-1616)-লিখিত *Macbeth* নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটির সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য প্রথম অংশের অনুবাদ। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত বানানরীতি পত্রিকার অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশানুযায়ী সম্পূর্ণ ম্যাকবেথ নাটকের তর্জমা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের (মাঘ ১২৮১ বঙ্গাব্দ) মধ্যেই সম্ভবত এই অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এই অনুবাদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা শোনাইবার প্রসঙ্গ আছে। অনুবাদের মূল খাতাটি বিনষ্ট হইলেও অংশত 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত আকারে থাকিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাসূত্রে এই অনুবাদের কোনো কোনো অংশ জানিতে পারিয়া সজনীকান্ত দাস 'ভারতী' পত্রিকা হইতে কিয়দংশ তাঁহার সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে (শনিবারের চিঠি, কার্তিক-চৈত্র ১৩৪৬) মুদ্রিত করেন। সজনীকান্ত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাইয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ -প্রদত্ত সূত্র ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ১২৮৭ সালের ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠকে' তাহার সন্ধান পাইলাম।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৪০১) এই অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে।

বিচ্ছেদ। প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্মিময় সিন্ধু-'পরে। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore (1779-1882), *Moore's Irish Melodies* (1846)

প্রথম ছত্র : As slow our ship her foamy track। চারিটি স্তবকযুক্ত এই কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থটি রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'মালতীপুঁথি'তে এই অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে।

বিদায়-চুম্বন। একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns (1759-1796)

শিরোনাম : Parting Song to Clarinda

প্রথম ছত্র : Ae Fond kiss, and then we sever

কষ্টের জীবন। মানুষ কাঁদিয়া হাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

George Gordon Byron (1788-1824)

গ্রন্থ : *Childe Harold's Pilgrimage,* সর্গ XXXII, XXXIII, XXXIV

প্রথম ছত্র : They mourn, but smile, at length ; and, মূল কবিতার শেষাংশের অনুবাদ 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয় নাই। 'মালতীপুঁথি'তে অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে,

সেখানে অতিরিক্ত কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ—

মানুষের নিরাশার
অগ্নিময় আছে কি জীবন।
সে বিষ বাঁচায়ে রাখে
কোনো ক্রমে ভগন হৃদয়,
নিরাশার সে জীবন
কিন্তু সেই ফলের মতন
মৃত সিন্ধুতীরে জন্মে
অভ্যন্তর যার ভস্মময়।

জীবন উৎসর্গ। এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Come, rest in this bosom, my own stricken deer
মালতীপুঁথিতে মূল অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

ললিত-নলিনী। (কৃষকের প্রেমালাপ)। ললিত/হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns.
শিরোনাম : Philly and Willy : A duet
প্রথম ছত্র : He/O Philly, happy be that day

বিদায়। যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
Mrs. Amelia Opie (1769-1853)
প্রথম ছত্র : Go youth, beloved, in distant glades

সংগীত। কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
William Shakespeare, *Merchant of Venice*, Act V Sc I
প্রথম ছত্র : How sweet the moonlight sleeps upon this bank !

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫।
George Gordon Byron, *The Corsair* XIV (1-4)
প্রথম ছত্র : Deep in my soul that tender secret dwells

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Go where Glory waits thee

আবার আবার কেন রে আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
George Gordon Byron, *Hours of Idleness*
প্রথম ছত্র : I would I were a careless child

বৃদ্ধ কবি। মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : ভূপালী রাগিণী। অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of the poem, by Talhaiarn the Welsh poet.

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : বেহাগ রাগিণী।

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পূরবী।

অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of an Irish Song.

বলো গো বালা, আমারি তুমি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পিলু।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*

শিরোনাম : If thou 'lt be mine.

প্রথম ছত্র : If thou 'lt be mine, the treasures of air,

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*

শিরোনাম : Love's young Dream.

প্রথম ছত্র : Oh ! the days are gone, when Beauty bright। মূল কবিতার তৃতীয় স্তবকটির বঙ্গানুবাদ করা হয় নাই।

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Robert Burns

শিরোনাম : Th. Birds of Aberfeldy

প্রথম ছত্র : Bonnie Lassie, will ye go,

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Robert Burns

শিরোনাম : Mary Morison

প্রথম ছত্র : O Mary, at thy window be,

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

William Chappel (1809-1888)

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Lord Cantalupe

পত্রিকায় অনুবাদের শেষাংশ মুদ্রণক্রটির ফলে ৩২২ পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রেমতত্ত্ব। নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

P. B. Shelley (1792-1822)

শিরোনাম : Love's Philosophy

প্রথম ছত্র : The fountains mingle with the river

নলিনী/লীলাময়ী নলিনী। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Alfred Tennyson (1809-1892)

শিরোনাম : Lilian

প্রথম ছত্র : Airy, fairy Lilian

দিনরাত্রি নাহি মানি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

Thomas Moore

শিরোনাম : Ne'er ask the hour

প্রথম ছত্র : Ne'er ask the hour— what is it to us

দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*

প্রথম ছত্র : Lesbia hath a beaming eye,

'মালতীপুঁথি'তে সম্পূর্ণ অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৮

Matthew Arnold (1822-1888)

শিরোনাম : Too Late

প্রথম ছত্র : Each on his own strict line we move,

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি। এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

Robert Buchanan (1841-1901)

শিরোনাম : Antony in Arms

প্রথম ছত্র : So, we are side by side

সুখী প্রাণ। জানো না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে। আলোচনা, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

Robert Buchanan

রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

জীবন মরণ। ওরা যায়, এরা করে বাস। আলোচনা, প্রথম বর্ষ, কার্তিক ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

Victor Hugo (1802-1885)

গ্রন্থ : *Les Contemplations* (1857) Vol 1.

শিরোনাম : Quia/Pulvis/es

প্রথম ছত্র : Ceux-ei partent, ceux-la demeurent.

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল গ্রন্থটির মধ্যে (পৃ. ২২৬) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-কৃত অনুবাদ লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

১৯২৪ খৃস্টাব্দে চীন ভ্রমণকালে প্রদত্ত একটি ভাষণে (At the Scholar's Dinner, Peking, *Talks in China* (1925) গ্রন্থের Autobiographical II অধ্যায়ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ হাইনের অনুবাদচর্চার মধ্য দিয়া জার্মান ভাষা শিক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

'I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language,— which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.'

ইহার পূর্বে ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া হাইনের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের

পরিচয় ঘটিয়াছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথকে Edgar Alfred Bowring -অনূদিত *The Poems of Heine* (1884) গ্রন্থটি উপহার দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মূল জার্মান *Poetische Werke von H. Heine* (1885) গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন। উল্লিখিত দুইটি গ্রন্থই রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত হাইনের সকল মূল কবিতাই দেখা যায়।

Heinrich Heine (1790-1850)-এর মোট নয়টি কবিতার অনুবাদ সাধনা, বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত :

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
প্রথম ছত্র : Mir traümte einst von Wildem Liebesglühn,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* (1817-1821) : Traumbilder No. 1.

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি।
প্রথম ছত্র : Wenn ich in deine Augen sehe,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo* (1822-1823). No. 4.

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু।
প্রথম ছত্র : Anfangs Wollt ich fast verzagen,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* : Lieder, No. 8

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল।
প্রথম ছত্র : Die blauen veilchen der Äeugelein,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 30

গানগুলি মোর বিষে ঢালা।
প্রথম ছত্র : Vergifted sind miene Lieder;—
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 51

তুমি একটি ফুলের মতো মণি।
প্রথম ছত্র : Du bist wie wine Blume,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr* (1823-1824), No. 47

রানী, তোর ঠোঁটদুটি মিঠি।
প্রথম ছত্র : Mädchen mit dem roten Mündchen.
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 50

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে।
প্রথম ছত্র : Wer zum ersien Male liebt,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 63

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা।
প্রথম ছত্র : Den könig Wiswamitra,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 45

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম পানে। 'মালতীপুঁথি'-ধৃত।
George Gordon Byron, *Childe Harold's Pilgrimage* Canto II, Stanza XV

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৬) এই অনুবাদটির নয়টি ছত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ৮ (পৃ. ৩২) মুদ্রণে আরও দুই-একটি ছত্রের উদ্ধার সম্ভব হওয়ায়, বর্তমান রচনাবলীতে পরিবর্তিত পাঠটি গৃহীত হইল।

প্রবন্ধ

সাহিত্য

সাময়িক পত্রিকাতে ও কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নরূপ—

১. ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী।	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩
২. মেঘনাদবধ কাব্য। (মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত)	ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪
৩. স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫
৪. বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৫. পিত্রার্কা ও লরা	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫
৬. গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ	ভারতী, কার্তিক ১২৮৫
৭. নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য [প্রথম প্রস্তাব]	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫
৮. [নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য] দ্বিতীয় প্রস্তাব	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬
৯. চ্যাটার্টন— বালক কবি	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬
১০. বাঙালি কবি নয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭
১১. বাঙালি কবি নয় কেন?	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭
১২. 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রত্যুত্তর)	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯
১৩. কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩
১৪. সাহিত্যের উদ্দেশ্য	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৫. সাহিত্য ও সভ্যতা	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৬. আলস্য ও সাহিত্য	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত রচনা

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)	দেশ, শারদীয়া ১৩৫৩
১৮. সৌন্দর্য	দেশ, শারদীয়া ১৩৫২
১৯. Dialogue/Literature	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২০. সাহিত্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২১. বাংলায় লেখা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯
২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৫. [কাব্য]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৬. একটি পত্র	সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯
২৭. বাংলা লেখক	সাধনা, মাঘ ১২৯৯

২৮. 'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি	সাধনা, চৈত্র ১২৯৯
২৯. রবীন্দ্রবাবুর পত্র	সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০
৩০. সাহিত্যের গৌরব	সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১
৩১. মেয়েলি ব্রত	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
৩২. সাহিত্যের সৌন্দর্য	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

১. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য (প্রথম ভাগ, প্রকাশ ১৭৯৭ শক। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' (প্রথম ভাগ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ) কাব্যত্রয়ের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির ইতিহাস এইভাবে জানাইয়াছেন—

"প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।'

উক্ত বন্ধু সম্ভবত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

২. রচনাশেষে 'ভঃ' চিহ্নিত। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ভারতী' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্তমান রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস— কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।..."

ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' শতবার্ষিক সংস্করণ পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩), এই প্রবন্ধটিতে একস্থলে একটি বাক্য, অপর এক স্থলে একটি বাক্যাংশ যোজনা দেখা যায়। ইহা ছাড়া, অনেকগুলি জায়গায় শব্দ-সংস্কার লক্ষিত হয়। অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ভারতী' হইতে তৎকালে এই পরিমার্জিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনো সূত্রোল্লেখ না থাকায় বর্তমান রচনাবলীতে পত্রিকা-ধৃত পাঠটিই গৃহীত হইল।

পত্রিকা-ধৃত পাঠের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-যে স্থলে পাঠ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নরূপ—

বর্তমান রচনাবলী		ভারতী-ধৃত পাঠ	শতবার্ষিক রচনাবলী-ধৃত পাঠ
পৃষ্ঠা	ছত্র		
১৩২	৩৩	'...দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন।'	পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়।
১৩২	৩৭-৩৯	ইহার পর সংযোজিত বাক্য : বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কি করা যায়, কোনো কোনো....	বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে কিন্তু কোনো কোনো...
১৩৫	১১	বিকাশপূর্বক	উদ্গারপূর্বক
১৩৯	৩২	আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে...	আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে...
১৪০	১২	...যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের...	...যদি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের...
১৫২	১০	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিলেম যে,
১৫৬	১৮	অবলা স্ত্রীলোকদের	অবলা স্ত্রীলোকের
১৫৯	৩২	রামের সম্বন্ধে	রাম সম্বন্ধে
১৫৯	৩৪	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র।	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ মাত্র।
১৬০	১৪	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে।	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংগত করিত—

৩. প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমেদাবাদে থাকার সময় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। মে ১৮৭৮ - শ্রাবণ ১২৮৫। আগস্ট ১৮৭৮) কতকটা নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরাজি সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় ইতিহাসের যে চর্চা করিয়াছিলেন তাহারই অনিবার্য ফল বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে (জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১২৮৫। মে-সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) রচিত। উল্লেখ করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১২৮৫) তারিখে বোম্বাই হইতে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি-চর্চার যে বিবরণ দিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা এখানে সংকলিত হইল, "ইংরাজিতে যে আমি নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয়

হইল। মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেইসঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন-কি, অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।"

আলোচ্য 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধমধ্যে রবীন্দ্রনাথ *Beowulf* মহাকাব্যের সারাংশ এবং কাব্যের কিয়দংশ গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, Cædmon-রচিত *Genesis* ও *Exodus* কাব্যের কোনো কোনো অংশের পদ্যানুবাদও করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুবাদগুলির একটি কবিতা ছাড়া বাকি সকল কবিতার খসড়া 'মালতীপুঁথি'তে দেখা যায়, পরে প্রবন্ধমধ্যে ব্যবহারের সময় রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে পরিমার্জনা করিয়াছেন।

৪. পূর্ববর্তী প্রবন্ধের মতো এই প্রবন্ধের মধ্যেও অনেকগুলি গদ্য ও পদ্যানুবাদ আছে। চীন ভ্রমণকালে (১৯২৪) প্রদত্ত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছিলেন, "When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through a translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me."—*Talks in China*, Autobiographical II (1925)। এরূপ অনুবাদের প্রধান আধার 'মালতীপুঁথি' হইলেও বর্তমান প্রবন্ধ-ধৃত অনুবাদগুলি 'মালতীপুঁথি'তে নাই। অনুমান করা যাইতে পারে, অনুরূপ একাধিক খাতায় এই সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে একমাত্র 'মালতীপুঁথি'ই রক্ষা পাইয়াছে।

৫. পিত্রার্কার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ 'মালতীপুঁথি'তে পাওয়া যায়, 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধমধ্যে অনুবাদগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।

৬. 'বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'— এই প্রবন্ধত্রয় একই ভাবসূত্রে গ্রথিত।

'ভারতী'র কার্তিক ১২৮৫ সংখ্যায় 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনে বসবাস করিতেছিলেন।

পরবর্তীকালে মূল জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথ গেটে-র রচনা পড়িবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ব-উল্লিখিত *Talks in China* গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়, 'Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate.'

৭-৮. 'ভারতী' শ্রাবণ ১২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধের অনুক্রমে এই প্রবন্ধ দুটি রচিত। Hippolyte Taine (1828-1893)-রচিত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস ও অপর কোনো গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে।

৯. ইংল্যান্ডে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন, ধরা যাইতে পারে; যদিও

ইংল্যান্ডের 'বালক-কবি' Thomas Chatterton (1752-1770)-এর জীবনকাহিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সূত্রে পূর্বেই ঘটিয়াছিল। চ্যাটার্টনের পদাঙ্ক অনুসরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার যে সূত্রপাত হইয়াছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের সূত্রে এই তথ্য আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত। এই গ্রন্থের 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন, "ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম।... চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

স্বদেশে চ্যাটার্টনের কবিতা পাঠের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না, তবে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এই অকালমৃত কবির রচনার সহিত তাঁহার যে পরিচয় ঘটে, তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধে চ্যাটার্টন-রচিত তিনটি কাব্যাংশের অনুবাদ।

'ভারতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ' থাকিলেও প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

১০-১১. এই দুটি প্রবন্ধের সম্পাদিত রূপ 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', সমালোচনা (১২৯৪) গ্রন্থভুক্ত, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত দ্বিতীয় খণ্ডে : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ডে সংকলিত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ 'বাঙালি কবি কেন' এবং 'বান্ধব' পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় কতকটা প্রতিবাদ করিয়াই সাহিত্যতত্ত্বমূলক এই দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ Christopher Marlow -রচিত 'The Passionate Shepherd to His Love' শীর্ষক কবিতার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। 'বাঙালি কবি নয় কেন?' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলাসাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ হিসাবে এই দুটি প্রবন্ধকে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। ইহার সূত্রপাত অবশ্যই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী' কাব্যত্রয়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া।

১২. রচনাশেষে 'শ্রীরঃ' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত না হইলেও প্রথম অনুচ্ছেদটির সম্পাদিত রূপ 'সত্যের অংশ' নামে 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এই 'প্রত্যুত্তর', ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৮৯ দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী -রচিত ('শ্রী অঃ' আদ্যক্ষরে) 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রথম প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রস্তাব) শিরোনামে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের বক্তব্যের উত্তর।

১৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সংখ্যায় 'কাব্যি-সমালোচনা' নামে একটি ব্যঙ্গধর্মী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাম অনুচ্চারিত রাখিয়া 'কুয়াসার প্রহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্যে গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা'র যে অভিযোগ আনেন, বস্তুত তাহারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজন অংশে এই প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

১৪-১৬. তিনটি প্রবন্ধই 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধের সূত্রে লিখিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা বির্জিতলাওস্থিত বাসভবনে রক্ষিত একটি বড়ো মাপের খাতায় তাঁহাদের পরিবারস্থ অনেকে বিচিত্রবিষয়ক রচনা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭) গ্রন্থে খাতাটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি... ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।... এরকম দুখানি খাতা পর পর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন এটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।'

এই পাণ্ডুলিপিটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামে পরিচিত। লিপিবদ্ধ রচনাগুলির কালব্যাপ্তি মোটামুটি কার্তিক ১২৯৫ হইতে চৈত্র ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। খাতাটির মুখপাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়া রাখিয়াছেন '... ইহাতে পরিবারের/ অন্তর্ভূক্ত/ সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/ আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্তব্য বিষয়/ ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।...' এই বিধির পূর্বে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কয়েকটি 'নিষেধ' এইরূপ— '১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপান।'

ইতিপূর্বে এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং রচনাগুলি সংকলন করিয়াছেন পুলিনবিহারী সেন, পশুপতি শাসমল ও কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের অন্তর্গত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিষয়ানুক্রমে বিভিন্নস্থলে বিন্যস্ত হইল। সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলি প্রথমে সংকলিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি নিম্নরূপ—

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)। রচনাকাল : ২০ নভেম্বর ১৮৮৮

১৮. সৌন্দর্য। রচনাকাল : ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮

১৯. Dialogue/Literature। রচনাকাল : ১ অক্টোবর ১৮৮৯

সাহিত্যবিষয়ক এই আলোচনায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাদের নামের আদ্যক্ষরটুকু পাওয়া যায়। আলোচনাকারীগণ যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত। এই সংক্ষিপ্ত রচনার পরিমার্জিত রূপ 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ সংখ্যায় 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' নামে প্রকাশিত। রচনাটি অস্বাক্ষরিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১ সংস্করণ) গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

২০. সাহিত্য। রচনাকাল : ২০ অক্টোবর ১৮৮৯

২১. বাংলায় লেখা। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব। প্রকাশ : ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে' শিরোনাম, 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে notes'। রচনাশেষে লিখিত আছে : '১৫ই বোধহয়।' অক্টোবর ১৮৮৯।

২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। রচনাকাল : ২৪ মার্চ ১৮৯০। প্রকাশ : সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত। পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রবন্ধের শেষাংশ বর্জিত। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত, গ্রন্থে বর্জিত পাঠ এখানে গৃহীত হইয়াছে।

২৫. [কাব্য]। রচনাকাল : ১২ জানুয়ারি ১৮৯১, প্রকাশ : সাধনা, চৈত্র ১২৯৮ সংখ্যায় 'কাব্য' শিরোনামে। 'সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ একাদশটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, অনুরূপভাবে 'সাহিত্য' গ্রন্থেও সংকলিত। বর্তমান রচনাবলীতে শুধু বর্জিত অংশগুলি সংকলন করা হইল।

২৬. একটি পত্র। সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে 'সুহৃদ্বরেষু' এই সম্বোধনে লিখিত হইলেও এটি প্রবন্ধের মর্যাদা পাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুরেশচন্দ্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গে পত্রাকারে এই প্রবন্ধ।

২৭. বাংলা লেখক। সাধনা। মাঘ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

২৮-২৯. 'সাধনা' শ্রাবণ ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতা প্রকাশিত হইলে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাহিত্য' ফাল্গুন ১২৯৯ সংখ্যায় 'তর্কবৈচিত্র্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'হিং টিং ছট' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিতর্কের সূত্রে রচিত, এইরূপ মন্তব্য করেন। সামাজিক মতামত বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ইতিপূর্বেই নানা কারণে তিক্ত থাকায় এই কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া তাহা আরও জটিল হইয়া উঠে। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকায় রবীন্দ্রনাথ রচনাটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -কর্তৃক লিখিত, এই অনুমানে তাঁহার নিকট যে প্রতিবাদপত্রটি পাঠান সুরেশচন্দ্র সেটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় না ছাপাইয়া, রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাহার উত্তর দেন। ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়, "তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই।" ফলে, "সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া", চৈত্র ১২৯৯ সংখ্যায় 'সাহিত্য-পাঠকদের প্রতি' শীর্ষক এই রচনাটি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বক্তব্য জানান।

অতঃপর, 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩০০ সংখ্যায়, পুরী হইতে ৬ ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের পাদটীকায় 'সাহিত্য'-সম্পাদকের যে দীর্ঘ মন্তব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে সংকলিত হইল—

"গত বর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্রবাবু কোন বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই! সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়া পাঠানই রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্রবাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেই জন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহারও অনুরোধে এবং সাধনায় অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িকপত্রের লেখক ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্রবাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন, দিতে পারেন।— সাহিত্য-সম্পাদক।"

ইহা ছাড়া, 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' রচনাটির তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে (...আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।), পাদটীকার চিহ্ন দিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও এখানে মুদ্রিত হইল—

"তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের, 'আদর্শ সমালোচনা'র দু'একটি ছত্র মনে পড়ে।'

দ্রষ্টব্য, 'আদর্শ সমালোচনা', 'সাহিত্য', শ্রাবণ ১২৯৯।

৩০. 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিদেশী উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা হইতে প্রবন্ধটির উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধমধ্যে উপন্যাসদুটির উল্লেখ আছে— পোলিশ লেখক Jozef Igancy Kraszewski (1821-1887)-রচিত *The Jew* এবং হাঙ্গেরিয়ান লেখক Mourus Jokai (1825-1904)-রচিত *Eyes like Sea*। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসদুটির ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। প্রথম উপন্যাস প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১২৯ সংখ্যক পত্রে 'নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য' এরূপ মন্তব্য করিলেও প্রবন্ধ রচনার সময় ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বিচার করিয়াছেন।

৩১. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় -রচিত 'মেয়েলি ব্রত' (প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকা। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মী অঘোরনাথকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া বাংলাদেশের ব্রতকথার একটি সংকলন করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি তৎকালে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ৭ কার্তিক ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, কার্সিয়ঙে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া অঘোরনাথের কাছে পাঠাইয়া দেন।

৩২. অস্বাক্ষরিত রচনা। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত, বর্তমান রচনাবলীতে সংকলিত 'Dialogue/ Literature' শীর্ষক আলোচনার পরিমার্জিত রূপ 'সাহিত্যের সৌন্দর্য'। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

সংগীত

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইল :

১. সংগীত ও ভাব — ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

২. সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্বার্ট স্পেন্সরের মত) — ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

এই বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ রচনা 'সংগীতচিন্তা' (বৈশাখ ১৩৭৩) গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডে (পৌষ ১৪০২) : সুলভ ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' এবং ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ দুইটিকে মিলাইয়া এবং সংশোধন পরিবর্ধন পরিবর্জন করিয়া

রবীন্দ্রনাথ যে পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাই সেখানে 'সংগীত ও ভাব' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সংগীতচিন্তা'র নূতন সংস্করণে (১৩৯২) দুইটি প্রবন্ধ আলাদা করিয়া ছাপা হয়। এখানেও দুইটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হইল।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ৯ বৈশাখ ১২৮৮ (বুধবার ২০ এপ্রিল ১৮৮১) তারিখে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের হলে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় পাঠ করেন। তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজের হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া।... প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল।" পত্রিকার পাদটীকায় লেখা হয়, "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাতে বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি-কি সুরবিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ-মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবল মাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে। —সং।" পত্রিকায় শিরোনামের নীচেই মুদ্রিত হয় '(বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)'—ভারতী-তে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামাঙ্কিত রচনা।

শিল্প

শিল্প-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে :

১. [মন্দিরপথবর্তিনী]	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
২. মন্দিরাভিমুখে	প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫

১. গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রে (মহাত্রে, ১৮৭৬-১৯৪৭) বোম্বাইয়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 'টু দি টেম্পল' নামের ৫ ফুট দীর্ঘ প্লাস্টার অব্ প্যারিসের এক নারীমূর্তি প্রস্তুত করেন। ইহার জন্য তিনি বম্বে আর্ট সোসাইটির পদক লাভ করেন (১৮৯৫)। এই মূর্তির সম্মুখ ও পার্শ্বের দুইটি ফোটোগ্রাফ ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার জর্জ বার্ডউডের নিকট পাঠাইয়া ছাত্রটির য়ুরোপে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছিল। স্যার বার্ডউড ফোটোগ্রাফ দুইটি তাঁহার সম্পাদিত *The Journal of Indian Arts and Industries* পত্রিকায় ছাপাইয়া শিল্পীর প্রতিভার প্রশংসা করেন। উক্ত ফোটোগ্রাফ ও মন্তব্য অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গকথা' শিরোনামে বর্তমান রচনাটি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের ভিতরে মূর্তিটিকে 'মন্দিরপথবর্তিনী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে শিরোনামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. 'মন্দিরাভিমুখে'ও একই বিষয় অবলম্বনে লিখিত। তবে প্রবন্ধটি সচিত্র, স্যার বার্ডউডের উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত ফোটোগ্রাফ দুইটি ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া

গেছে'— তাহার ইতিহাসটি এইরূপ : ২৬ নভেম্বর ১৮৯৬ স্যার বার্ডউড-লিখিত 'To the Temple'-শীর্ষক একটি রচনা *Bombay Gazette*-এ প্রকাশিত হয়। ইহার উত্তরে জে. জে. স্কুল অব্ আর্টের তৎকালীন অধ্যক্ষ Edwin Greenwood রচনাটির কোনো-কোনো ত্রুটি দেখাইয়া উক্ত পত্রিকায় ৫ ডিসেম্বর একটি পত্র প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে বার্ডউডের পত্র মুদ্রিত হয় পত্রিকাটির ৭ জানুয়ারি ১৮৯৭-সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের যে তীব্র সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'An Art Critic Astray' নামে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ *Pioneer Mail* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, লেখকের নাম R. F. Chisholm।

ধর্ম/দর্শন

১. সাকার ও নিরাকার উপাসনা	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২
২. নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্‌বোধন)	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক : ১২৯৫
৩. ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩ রচনা : ১২৯৫
৪. চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব	সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯
৫. নব্য লয়তত্ত্ব	সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯
৬. 'সুখ না দুঃখ' / উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
৭. বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
৮. রামমোহন রায়	ভারতী, কার্তিক ১৩০৩

১. ১০ শ্রাবণ ১২৯২ তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : "১১ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।" এইটিই সেই প্রবন্ধ। ইহা ভাদ্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও (পৃ. ৯৪-১০২) সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যাখ্যাত্মক টীকা-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯তম অনুচ্ছেদে 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিলে আমি মারা পড়িব' বাক্যটির টীকায় তিনি লেখেন,

"কাগজের যেমন ও পিট্ বাদে শুদ্ধ কেবল এ-পিট্-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না— সেইরূপ কোন সত্তারই গুণ-বাদে শুদ্ধ কেবল বস্তু-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। শাস্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতেছে যে, চিৎ এবং আনন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক গুণ এবং তাহার আধার-ভূত বস্তু সৎ তিন ধরিয়া "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই এক সত্য আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। সং"

প্রবন্ধটি সেই সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় গোবিন্দলাল দত্ত ইহার একটি সুদীর্ঘ 'প্রতিবাদ' (পৃ. ২৮৭-৯২) প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৩ ও ৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

২. ১ বৈশাখ ১২৯৫ গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ যে প্রারম্ভিক উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্বোধন)' নামে মুদ্রিত হয়। রচনাটিতে লেখকের নাম নাই, ভাষা ও ভাবের বিচারে ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. 'ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)' রচনাটি পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে, রচনার তারিখ ২২ নভেম্বর ১২৮৮ (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

৪. 'সাধনা'-য় রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামক একটি বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে এইরূপই একটি রচনা, আকারের দীর্ঘতার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। সাধনা-র আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় উক্ত বিভাগটির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়'-সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৯৮-সংখ্যা 'সাহিত্য'-তে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সমালোচনা করেন সাধনা-র ফাল্গুন সংখ্যায় (দ্র বর্তমান রচনাবলী, 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' : সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮)। সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহা সাহিত্য ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাহারই উত্তর বর্তমান রচনাটি।

৫. লয়-বিষয়ক চন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় রচনা 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব' সাহিত্য ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে 'নব্য লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পত্রিকাতেই পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে তিনি সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় লেখেন, '...আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।" শেষে লেখেন, "দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।" চন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬. মাঘ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথ 'উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য' শিরোনামে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বর্তমান রচনাটিতে।

৭. 'বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ জার্মান অধ্যাপক ডাঃ পল ডয়সেনের বেদান্তদর্শন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেন, শেষে 'অনুবাদকের প্রশ্ন' শিরোনামে তাঁহার বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

৮. ১২ আশ্বিন ১৩০৩ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) তারিখে মির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত সিটি কলেজে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামমোহন রায়ের ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (১৩৬৬) গ্রন্থে সংকলিত।

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ ও অষ্টাবিংশ খণ্ডে : সুলভ ষষ্ঠ ও ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। এখানে আরও তিনটি রচনা সাময়িক পত্র হইতে সংকলন করা হইল। ইহাদের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ :

১. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
২. ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক	সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
৩. মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা	ভারতী, কার্তিক ১৩০৭

১. 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে মুদ্রিত হয়, সূচীপত্রে 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' নামটি পাওয়া যায়। রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বক্তব্য ও রচনারীতির দিক দিয়া ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা রাজশাহী কলেজের এক অধ্যাপকের লেখা

'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক একটি গ্রন্থের সমালোচনা, দৈর্ঘ্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আলোচনার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে।

২. 'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বিষয়বস্তু ও ভাষাভঙ্গির বিচারে ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. "গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ্ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাঙলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দ্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহারই ইংরেজী অনুবাদ ['Vernacular Education in Bengal'] সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে"— এই মন্তব্য-সহ রবীন্দ্রনাথ উক্ত ভাষণের সমালোচনা করেন 'মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে আষাঢ় ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে কৃষ্ণভাবিনী দাস -লিখিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধ (প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) এবং উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৫-সংখ্যায় রাজেশ্বর গুপ্ত -সম্পাদিত 'অঞ্জলি' মাসিক পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজ

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিষয়ক বহু রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত উক্ত বিষয়ের অগ্রন্থিত রচনাগুলি সংকলিত হইল। ইহাদের সাময়িক পত্রের প্রকাশ-সূচী এইরূপ :

১.	বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
২.	ইংরাজদিগের আদব-কায়দা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫
৩.	নিন্দা-তত্ত্ব	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬
৪.	পারিবারিক দাসত্ব	ভারতী, চৈত্র ১২৮৭
৫.	জুতা-ব্যবস্থা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৬.	চীনে মরণের ব্যবসায়	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৭.	নিমন্ত্রণ-সভা	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৮.	চেঁচিয়ে বলা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯
৯.	জিহ্বা আস্ফালন	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০
১০.	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	ভারতী, ভাদ্র ১২৯০
১১.	সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার	ভারতী, আশ্বিন ১২৯০
১২.	ন্যাশনল ফন্ড	ভারতী, কার্তিক ১২৯০
১৩.	টৌন্‌হলের তামাশা	ভারতী, পৌষ ১২৯০
১৪.	অকাল কুষ্মাণ্ড	ভারতী, চৈত্র ১২৯০
১৫.	হাতে কলমে	ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১
১৬.	একটি পুরাতন কথা	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১
১৭.	কৈফিয়ত	ভারতী, পৌষ ১২৯১
১৮.	[দুর্ভিক্ষ]	তত্ত্বকৌমুদী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৯.	লাঠির উপর লাঠি	বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
২০.	সত্য	বালক, চৈত্র ১২৯২
২১.	আপনি বড়ো	কল্পনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

২২.	হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১৮৮৮
২৩.	স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৪.	আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১৮৮৮
২৫.	সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব	পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, রচনা : ১৮৮৮
২৬.	আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৭.	Chivalry	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৮.	নব্যবঙ্গের আন্দোলন	ভারতী ও বালক, ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

১. 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি ও একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' রচনা দুইটিকে সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬-সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে অন্তর্ভুক্ত করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন, 'রচনা দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় আছে'; কিন্তু তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এই বাক্যটি বাদ দিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহাদের উল্লেখই করেন নাই। পুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' (দেশ, শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯) প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'তে উক্ত রচনাদ্বয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রবন্ধ দুইটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ *Golden Book of Tagore* [1931]-এ 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকেই তাঁহার রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' প্রবন্ধটি অবশ্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বিভাগে সংকলিত হইল।

২. 'ইংরাজদিগের আদব-কায়দা' প্রবন্ধটি প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে আমেদাবাদে অবস্থানের সময়ে লেখা। বিলাতযাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানকার সামাজিক রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে।

৩. 'নিন্দা-তত্ত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় ('য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে'র ভাষায়) লিখিত হইলেও এতৎসম্পর্কে আমি নিঃসংশয় নহি।' কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী'-তে (দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫) প্রবন্ধটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোনো যুক্তি দেখান নাই। তবু কয়েকটি কারণে রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সামান্য একটি বক্তব্যের ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া কথার জাল বুনিয়া বুনিয়া একটি প্রবন্ধ তৈয়ারি করার যে-প্রবণতা তাঁহার পরবর্তীকালের 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম চোর' প্রভৃতি রচনাগুলিতে দেখা যায়, 'নিন্দা-তত্ত্ব'-কে তাহারই পূর্বসূরী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন ও অল্প-কিছু পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ না ঘটাইয়া চলতি ভাষায় গদ্যরচনা প্রায় বিরল এবং যে-দোষ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই সম্পূর্ণ মুক্ত— আলোচ্য রচনাটিতে সেই বিশুদ্ধ চলতি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-বিরূপতার সাক্ষাৎ স্থানে-অস্থানে পাওয়া যায়, বর্তমান রচনাটিতেও তাহা উপস্থিত।

৪. 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছিলেন, 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীর যুবকের পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে বাহির হয়। শেষের দিকে কোনও কোনও উগ্র মতামতের দরুন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখক রবীন্দ্রনাথকে পাদটীকায় কঠিন সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি সম্ভবত জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে মতান্তরের ফল। সদ্য বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরেও সম্পাদকীয় প্রতিবাদ-মন্তব্য যোগ করেন।' ইংলন্ড হইতে লেখা একটি পত্রে [ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ. ৩৯৪-৪১১, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (৯)] রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা ব্যক্ত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে' এবং পত্রটির উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীয় টীকা মুদ্রিত হয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রত্যুত্তর। ইহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

পূর্ব্বকালে চিকিৎসকেরা পুঁথির বচন অভ্রান্ত মনে করিয়া রোগ কেবল নয় রোগের আধার পর্যন্ত— রোগী পর্যন্ত বিনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না, লোকের যখন চক্ষু ফুটিতে লাগিল তখন হাতুড়িয়ার দল ক্রমে ক্রমে পসার করিতে আরম্ভ করিল; অব্যর্থ ঔষধির বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের আপাদমস্তক জুড়িয়া আশ্বাস বাক্যের ঘটায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ নিবারণ করিতে লাগিল, উঁহারা ইঁহাদিগকে হাতুড়িয়া— ইঁহারা উঁহাদিগকে গোবৈদ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু জনসাধারণের রোগ উড়াইয়া দেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ-সংক্রান্ত রোগেরও ওইরূপ দুই দল চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়, এক দল চিকিৎসক পুরাতন রীতিনীতিকে অব্যর্থ ঔষধি মনে করেন আর-এক দল আপনাদের নব নব সিদ্ধান্তকে অব্যর্থ মহৌষধি মনে করেন। ফরাসিস বিদ্রোহে দুই দলেরই বিশিষ্টরূপে বল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার জের চলিতেছে— তাহার সাক্ষী— সম্প্রতি হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া রুশিয়াকে পতিহীন হইতে হইয়াছে। দুই দলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে সর্বমত্যন্ত গর্হিতং। বর্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে আমরা তাহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি।

পারিবারিক দাসত্ব কথাটাই আমাদের কেমন কেমন ঠেকে— তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পারিবারিক বন্ধন কথাটাই আমাদের মনের সমক্ষে বলপূর্বক দণ্ডায়মান হয়— কিন্তু তাহা বলিয়া বলকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। দুই কথাকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই আমরা শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত। দাসত্ব শব্দের ভাবটা কিছু গোলমেলে; ও কথা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে; ভূতপূর্ব আমেরিকার প্রভুদের নিকট কাফ্রীদের আজ্ঞাধীনতাকে যেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায়, সেনাপতির নিকট সৈন্যদিগের আজ্ঞাধীনতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? প্রভুর নিকট একজন কিঙ্করের আজ্ঞাকারিতাকে যেমন দাসত্ব বলিতে পারা যায়— পিতামাতার নিকট পুত্রের আজ্ঞাকারিতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? দাসত্ব কথাটা শুনিলেই মনে হয় যে, তাহার সহিত কাপুরুষত্ব জড়ানো আছে, কিন্তু ছোটো ভাই যদি দাদা যাহা বলে তাহা শুনে তাহা হইলে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়— কিংবা সৈন্য যদি সেনাপতির কথা শুনে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দূরে থাকুক রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে আরও বেশি বীরপুরুষ বলিয়া মনে হয়। লেখকের লেখার ধরন দেখিলে হঠাৎ লোকের যাহা মনে হইতে পারে তাহা লক্ষ করিয়া আমরা উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিলাম— কিন্তু লেখক বোধ হয় রামের নিকট লক্ষ্মণের আজ্ঞাধীনতাকে দাসত্ব বলিয়া দোষ দিতে কখনোই প্রবৃত্ত হইবেন না। কৈকেয়ীর মতন গুরুজনের নিকট রামের দাসত্বকেই লেখক দাসত্ব বলিয়া দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দাসত্ব শব্দটা শুনিবামাত্র কাপুরুষত্বের ভাব সহসা যাহা আমাদের মনে উদয় হয়, সে ভাব দূরে থাকুক তাহার ঠিক বিপরীত ভাবই আমাদের মনকে ভক্তি ও বিস্ময় -রসে

অভিভূত করে; কৈকেয়ীর সমীপে রামের আজ্ঞাকারিতা অসাধারণ বীরপুরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যেরা যে সেনাপতির দাসত্ব করে, পুত্র যে পিতার দাসত্ব করে, সে দাসত্ব মহত্ত্বেরই লক্ষণ; একটি গান আছে 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'— সেনাপতির দাসত্ব করিলে শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না, পিতার দাসত্ব করিলে অজ্ঞাত-কুলশীল যে-সে লোকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; একজন জর্মান বক্তা বলিয়াছেন, Liberty I am thy slave— এ দাসত্ব যেমন, পিতার কাছে দাসত্বও সেইরূপ উচ্চ দরের দাসত্ব। এইরূপ মহত্ত্ব-সূচক দাসত্ব যিনি যত অভ্যাস করেন তিনি তত নীচত্ব-সূচক দাসত্বের হস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন— দুই দাসত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই তো গেল শব্দের মার-প্যাঁচ— এখন আসল কথাটা কী দেখা যাক— লেখকের অভিপ্রায় এই যে, রাম কৈকেয়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না বলিয়া কৈকেয়ীর কি কর্তব্য যে, তিনি রামকে বনে পাঠান? এখন— রামের গুরুজন বলিলে অগ্রে কৌশল্যা সুমিত্রা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকেই মনে পড়ে— কৈকেয়ীকে গুরুজনের ওঁচা বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে দেখা উচিত যে, কৈকেয়ী আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত রামের গুরুজন তাহার জন্য দায়ী নহেন। এমনি— কোথায় কোন্ গুরুজন আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত সকল গুরুজন সে দোষে দোষী হইতে পারে না; কিন্তু লেখক বলেন সাধারণত গুরুজনদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিবারই কথা— না করেন তো সে ছোটোদের পরম সৌভাগ্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এই মূল তত্ত্বটির উপর দাঁড়াইয়া লেখক গুরুজনদিগের প্রতি ঘোরতর কটাক্ষপাত করিতেছেন, তিনি বলেন 'মনুষ্যজাতি স্বভাবত ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষে আমাদের সমবেদনা আর অসহায়ের আমরা কেহ না, এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না, কাজে তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক সংসারের গতিকে এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়, এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। আইন যত বাঁধাবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরে না?'

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, ছোটোদের প্রতি স্নেহও তেমনি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ— বিশেষত ঘরের ছেলেদের প্রতি— আপনার ছেলেদের তো কথাই নাই। দুষ্ট বালকেরা অনেক জায়গায় গুরুজনদিগেরই স্নেহকে সহায় করিয়া গুরুজনদিগেরই প্রতি অবাধ্যতাচরণ করে— তাহারা মনে মনে বলে, 'হদ্দ মারিবেন নয় বকিবেন ফাঁসি তো আর দিবেন না'— গুরুজনদিগের স্নেহ তাঁহাদের প্রভুতাকে ছাপাইয়া উঠে— ইহা বলা বাহুল্য। স্নেহের বাঁধ অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার মাল-মোকদ্দমা স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়— ওইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা হয় তাহা সাধারণত সকল স্থলেই সংলগ্ন হইতে পারে না।

অদ্যাপি এমন কোনো সমাজ-তত্ত্ববিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ যাঁহাকে না মানিতে হইয়াছে যে— সমাজ-তত্ত্বের অতি অল্পই তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। সামাজিক সকল তত্ত্বেরই দুই দিক আছে এবং দুই দিকেই ভালো মন্দ দুই-ই আছে; এক দিকের ভালো এক দেশে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক দেশে শোভা পায়, এক দিকের ভালো এক কালে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক কালে শোভা পায়; এ ভিন্ন সকল দিকের ভালো একই দেশে একই কালে শোভা পাইবে কি সম্ভবই নহে।

ইংলন্ডে প্রভু যে দাসকে আজ্ঞা না করিয়া অনুগ্রহ করিতে বলেন তাহার ভালোর দিকটাই লেখক দেখাইয়াছেন— কিন্তু অতটা কায়দা-কানুন আমাদের দেশের সহজ-শোভন প্রকৃতির সহিত কোনো মতেই মিল খায় না— আমাদের দেশের গৃহস্থেরা চাকরবাকরদের তুই-তোকারি করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দূরে থাকুক স্নেহ-বাৎসল্যেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়— আমাদের

দেশের 'বাপু বাছা' শব্দ Please, thank you প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে বাহির হয়; এবং সাধারণত এইরূপ দেখা যায় যে, ছেলেদের উপর পিতার কটু-কাটব্য করিবার যতটুকু অধিকার তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভৃত্যদের প্রতি কটূক্তি করা আমাদের দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তবে— শহর অঞ্চলের প্রকৃতিকে সাধারণত আমাদের দেশের প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিলে আমরা নিরুত্তর।

ভক্তি এবং অনুরাগ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের সংগত বোধ হয় না। পূজ্যের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি কহে— সমানের প্রতি অনুরাগকেই প্রেম কহে— শাসন-ভয়কে তো আর ভক্তি বলে না। মনুষ্যের স্থায়ী উন্নতি-স্পৃহাও আছে এবং ক্ষণিক আমোদ-স্পৃহাও আছে, উন্নত লোকদিগের প্রতি ভক্তিও স্বাভাবিক, সমানে সমানে প্রেমও স্বাভাবিক। নেপোলিয়নের প্রতি সৈন্যদের কেমন অনুরাগ ছিল— সে অনুরাগ একরূপ, আর বয়স্যে বয়স্যে অনুরাগ একরূপ; প্রথম প্রকারের অনুরাগের নামই ভক্তি, দ্বিতীয় প্রকার অনুরাগের নামই প্রণয়; ভক্তি-প্রকাশ করা যেমন করিয়াই হউক-না-কেন তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কিছু না করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, সেলাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, প্রণাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, যাহাই হউক-না-কেন ভক্তির পাত্রে ভক্তি ভিন্ন নীচু শ্রেণীর অনুরাগ শোভা পায় না; মনে করো ব্যাসদেব আসিয়া তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত শেক্‌হ্যান্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে তোমার কি মনে একটুও কিন্তু হইবে না? একত্রবাসী ঘরের লোকদের মধ্যে কিছু না করিয়াও ভক্তিই বলো, আর প্রণয়ই বলো ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; পুত্রেরা পিতাকে প্রণাম না করিয়াও ভক্তি প্রদর্শন করে, ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গন না করিয়াও সৌহার্দ্য বিস্তার করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক বলিয়া যদি মানা যায় তবে তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে— সে কারণ অন্য কোথাও খাটে না, সে কারণ এই যে, তিনি যেমন দূর হইতে দূরতম তেমনি নিকট হইতে নিকটতম— যেমন বৃহৎ হইতে বৃহৎ তেমনি অণু হইতে অণু; কিন্তু সংসারে যে বড়ো সে বড়ো, যে ছোটো সে ছোটো— বড়ো-ছোটোর মধ্যে এইরূপ প্রাচীরের আড়াল রহিয়াছে; তাহা যদি না থাকে তবে সংসারের বৈচিত্র্য রক্ষা হইতে পারে না।

লেখক বলিয়াছেন, 'এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ— কোনো শাস্ত্রেই লেখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ।' এ কথাটি ঠিক নয়। মনু বলিয়াছেন, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য ন্যায্যংভবতি শাসনং।' গুরু যদি গর্বিত কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য ও বিপথগামী হন তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। এখনও লোকপ্রবাদ আছে যে, 'দোষাবাচ্যা গুরোরপি।'

৫. 'জুতা-ব্যবস্থা' প্রবন্ধটির শিরোনামের নীচে কৌতুক করিয়া মুদ্রিত হয়, '(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত।)' অর্থাৎ আরও দশ বৎসর পরে বাঙালি জাতির কীরূপ অবস্থা হইবে তাহারই কাল্পনিক চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শেষে সম্পাদকীয় পাদটীকায় লিখিত হয়— "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them'" —*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এত দিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরু পাক বলিয়া ঠেকিতেছে না— সং।" মন্তব্যটি *Englishman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 30 April 1881.

Hindoo Patriot 2 May ইহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া লেখে : 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "KICK THEM FIRST AND THEN SPEAK TO THEM." *Age lat, pechoo bat.* It is so throughly gentlemanly to kick a whole nation before speaking to them that none can question its propriety. We congratulate the leading Anglo-Indian paper in Calcutta on having publicly laid down this sound principle of good conduct. Alas! that the churls of the nation should wince under the treatment!' উক্ত মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়।

৬. 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধটির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের মতো না হইলেও ইহা যে রবীন্দ্র-রচনা তাহার অন্যতম প্রমাণ *The Modern Review* [Vol. XXXVII, No. 5, May 1925, pp. 504-07] পত্রিকায় 'The Death Traffic' শিরোনামায় লেখক হিসাবে তাঁহার নাম দিয়া প্রবন্ধটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। বর্তমান প্রবন্ধটির পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে : 'The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. PH. D. Translated from German by David B. Croom, M.A. প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।' দীর্ঘকাল পরেও প্রবন্ধটি যে তাৎপর্য হারায় নাই, তাহা বিবৃত করিয়া অনুবাদটির সূচনায় চার্লস্ ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ লিখিয়াছেন :

> The article which follows was written by the Poet in May, 1881, exactly forty-four years ago, for the Bengali magazine "Bharati". At Geneva, in May, 1923... Mr. John Campbell, the official representative of the Government of India, made the statement to the World Press assembled, that "*from the very beginning, the Government of India had handled the opium question with perfect honesty of purpose; and not even its most ardent opponents, including Mr. Gandhi, had ever made any reproach in that respect.*" Although called upon to withdraw the latter part of this statement, Mr. Campbell has never done so. Mahatma Gandhi has contradicted it in *Young India* : many passages have been quoted also, in contradiction, from the writings of Mr. Dadabhai Naoraji, G. K. Gokhale, Surendranath Banerjea, and others of a quite early date, as well as later expressions of opinion, but still the statement remains as it was uttered. This article, written by the Poet in Bengali when he was twenty years of age and now for the first time translated, is further convincing proof of Mr. Campbell's inaccuracy. In the original Bengali, the article takes the form of an editorial review of Dr. Christlieb's book entitled "The Indo-British Opium Trade."

৭. ১২৮৬ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-তে (দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ষষ্ঠ পত্র) ইংলন্ডের নিমন্ত্রণসভা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টি লইয়া 'নিমন্ত্রণ-সভা' প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উল্লেখ করা দরকার, এই সময়ে পত্রগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

৮. 'চেঁচিয়ে বলা' তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইলেও সম্ভবত

সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত ইহার তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশভঙ্গির কারণে পূর্বোল্লিখিত 'জুতা-ব্যবস্থা' এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত 'জিহ্বা আস্ফালন', 'ন্যাশনল ফন্ড', 'টৌনহলের তামাশা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মতো এই রচনাটিকে তিনি কোনো গ্রন্থভুক্ত করেন নাই।

৯. 'জিহ্বা আস্ফালন' রচনাটি স্বাক্ষরবিহীন। হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের অভিযোগক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ৪ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে মুক্তি লাভ করেন। এই বিচার ও কারাদণ্ড সেই সময়ে বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার মুক্তির দিনে নিমতলার ফ্রি চার্চ কলেজে তাঁহাকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সভায় ও পরে ১৭ জুলাই তারিখের বিরাট জনসভায় তিনি জনসাধারণকে ধৈর্য ও মিতব্যবহার অবলম্বনের উপদেশ দেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত উপলক্ষ।

১০. 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' নামে একটি নূতন বিভাগ ভারতী-র বৈশাখ ১২৯০-সংখ্যা হইতে শুরু হয়। শ্রাবণ-সংখ্যায় এই বিভাগে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় ইহার উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন— 'আদিশূরের সময়ে পাঁচজন কায়স্থের বাংলায় আসিবার কারণ কি'— উত্তর দিয়াছেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল 'জাতীয়তার লক্ষণ কি?' বিভিন্ন দিক দিয়া এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহার রচয়িতার নাম না থাকিলেও বিভাগটি রবীন্দ্রনাথই পরিচালনা করিতেন বলিয়া ইহা তাঁহার রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

১১. ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ১২৯০-সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ভাদ্র-সংখ্যায় 'শ্রীমতী—' তাহার একটি 'প্রতিবাদ' লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীরঃ—' স্বাক্ষরে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কগুলির সারসংক্ষেপ ও বিচার করিয়া 'তৃতীয় পক্ষ' হিসাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

১২. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির পরে ১৭ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে কলিকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণে সোমপ্রকাশ (৮ শ্রাবণ ১২৯০) পত্রিকা লেখে, 'প্রায় ৫।৬ হাজার লোক একত্র মিলিত হইয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব হয়, ইংলণ্ডে ও ভারতে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলনার্থ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবটি সভার অঙ্গীকৃত ও অবধারিত হইয়াছে।' কিছুকাল পূর্বে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইংরাজেরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল। তাহাদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই এই ন্যাশনাল ফান্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনল ফন্ড' প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে প্রস্তাবটির সমালোচনা ও কতকগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

গঠনমূলক এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার এই ফান্ডের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ভারতসভার কাছে প্রেরিত সেই চিঠিটি (১০ বৈশাখ ১৩২৬) এখানে উদ্‌ধৃত হইল :

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য আমরা আয়োজন করিতেছি। শ্রীরামপুর হইতে তাঁত আনানো হইয়াছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে এই কারণে যথোচিতভাবে আমাদের সঙ্কল্পসাধনে বাধা পড়িতেছে। ন্যাশনাল ফন্ড

হইতে তাই আমরা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদনপত্র পাঠাইতেছি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই জায়গাটা তাঁতের কাজের প্রধান আড্ডা ছিল। এখনো অনেক তাঁতী নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করে। এই কারণে এখানে তাঁতের শিক্ষালয় খুলিলে অনেক উপকার হইবে। আর যাই হোক ফন্ডের প্রদত্ত অর্থের কোনোপ্রকার অপব্যয় ঘটিবার আশঙ্কা নাই। আমাদের দাবী অসঙ্গত নহে মনে করিয়া ফন্ড হইতে উপযুক্ত পরিমাণে মাসিক সাহায্য দান সম্বন্ধে আপনি যদি আমাদিগকে আনুকূল্য করেন তবে আপনার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি ১০ই বৈশাখ ১৩২৬।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—দ্রষ্টব্য : বিকাশ প্রধান, "ভারতসভা ও রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি", 'প্রতিক্ষণ', মে ১৯৯৪, পৃ. ৬৪-৬৮। রবীন্দ্রনাথের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত আছে।

১৩. 'টৌনহলের তামাশা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে অনুষ্ঠিত বাংলার ভূম্যধিকারীদের যে সভাকে 'তামাশা' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৭ নভেম্বর ১৮৮৩ তারিখে। এই সভার বিবরণ দিয়া *The Hindoo Patriot* [Nov 19] লেখে :

A grand meeting of the Central Committee of the Landholders of Bengal and Behar was held at the Town Hall on Saturday last at 3-30 p.m. Although, strictly speaking, it was a meeting of the Committee, still it was open to those interested in the land question and to sympathisers, and the attendance was unexpectedly large. There were present about six hundred picked gentlemen, representing the landed property-holders of the country, and the flowers of the native society.

The meeting was a great success. By far the most interesting feature of the meeting was the union of Europeans and Natives. Both went hand in hand in denouncing the confiscatory policy of the Government, the inequitableness of its proceedings, and its utter disregard of honesty and justice in connection with the matter. It remains to be seen what effect will this united protest of Europeans and natives have upon Her Majesty's Government both here and in England.

—প্রতিবেদনের 'union of Europeans and Natives', 'both went hand in hand' প্রভৃতি মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল। কিছুদিন আগে জুরিসডিকশন বিল বা ইলবার্ট বিল লইয়া য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে কটূক্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পঠনীয়।

১৪. 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধটি 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত।' ১৮ নং অক্রূর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে চন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ১১ চৈত্র ১২৯০ (২৩ মার্চ ১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়, এখানে পত্রিকার পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৫. 'হাতে কলমে' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী-সভার অধিবেশনে ৯ ভাদ্র ১২৯১ (২৪ আগস্ট ১৮৮৪) তারিখে পাঠ করেন। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একখণ্ড 'ভারতী'তে নীল পেনসিলে রচনাটির অনেক অংশ বর্জন-চিহ্নিত— সম্ভবত

রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই
প্রবন্ধটিও পূর্বোল্লিখিত 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। এখানেও পত্রিকার পাঠটিই
গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬-১৭. 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটির বিতর্কমূলক অংশগুলি বাদ দিয়া 'সমালোচনা'
(১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এখানে পত্রিকার পাঠটি মুদ্রিত হইল।

শ্রাবণ ১২৯১-তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' ও বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রচার' মাসিকপত্র প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র উভয়
পত্রিকাতেই তাঁহার নব্য হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও অন্যান্য
কয়েকটি পত্রিকায় তাঁহার বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। ফলে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়,
রবীন্দ্রনাথও তাহাতে জড়িত হইয়া পড়েন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি-চাপাটির
পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটি
লিখিয়া কার্তিক ১২৯১-এর কোনো এক তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হলে পাঠ
করেন ও সেটি অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। এই-সব সমালোচনার উত্তরে
বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার-এর অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"' -
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া লেখেন, 'আমার
বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি
নাই। ...তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া
দেখিতেছি।' রবীন্দ্রনাথ ইহারই উত্তরে 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধটি রচনা করেন। উল্লেখ্য,
রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। সম্পূর্ণ রচনাটি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩৮৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে
পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ডে (১৩৮০ বঙ্গাব্দ)
'সমালোচনা' গ্রন্থের বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে 'একটি পুরাতন কথা' ও 'কৈফিয়ৎ'—
রচনাদুইটির প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত।

১৮. '[দুর্ভিক্ষ]।' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বকৌমুদী (১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭ শক) হইতে উদ্ধার করিয়া
প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন, শিরোনামহীন রচনাটি ওই
গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও
বর্ধমান জেলার কিয়দংশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এই কারণে ৩১ চৈত্র আদি
ব্রাহ্মসমাজগৃহে বর্ষশেষ উপাসনার দিনে, 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখা হইয়াছে, 'বীরভূম অঞ্চলে
দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ' দান সংগ্রহের জন্য একটি সভার আয়োজন করা
হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়' গানটি রচনা করেন ও
'দুর্ভিক্ষের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ... একটী সুন্দর প্রবন্ধ' পাঠ করেন।

১৯. বালক-পাঠ্য 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায়
১২টি চিত্র সহযোগে 'ব্যায়াম' নামক প্রবন্ধে ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলে একজন
আমেরিকানের লাঠি লইয়া ব্যায়ামের অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছিলেন।
বর্তমান 'লাঠির উপর লাঠি' রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'বশম্বদ শ্রীঃ-' স্বাক্ষরে (বার্ষিক সূচীতে
তাঁহার নাম আছে) লঘু ভঙ্গিতে উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি বিতর্কের অবতারণা করেন।
এই সংখ্যাতেই 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ সম্পাদিকা তাহার যে উত্তর দেন, আমরা তাহা
নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

সম্পাদকের নিবেদন

'লাঠির পরে লাঠি' লেখক আমারিই লাঠি ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লাঠি খেলার চমৎকার কৌশল,— তাঁহার বাক্য বিন্যাসের ঘটা, তাঁহার রসিকতার ছটা আমাদের মুখ হইতে বারংবার বাহবা বাহির করিয়াছে। আমাদের দেশের দরিদ্র বালকদের অবস্থাদি সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর করিয়া তিনি আমার পরম ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর 'স্কুল পালানে ছেলেরাই কবি হয়' সুকবি হইবার এই সুন্দর সংকেতটি বলিয়া দিয়া তিনি জগৎশুদ্ধ লোককে উপকৃত করিয়াছেন। লেখক আমাদের আধুনিক অবস্থার যে জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন আমি কিংবা আর কেহ যে তাহার কোনো অংশ সংশোধন করিয়া দিতে পারে এমন বোধ হয় না। তবে কি না আমার জ্ঞানস্পৃহাটা বড়োই বলবতী, তাহারি উত্তেজনায় আমি আরও কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে লালায়িত, তাই গুটিকতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কথাগুলিতে যদি আমার অত্যন্ত অসাধারণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় তদ্দৃষ্টে লেখক আমার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে যেন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন এইমাত্র প্রার্থনা। আমাদের দেশীয় লোকদের স্বভাবতই ব্যায়ামে বিরাগ ও ইয়ুরোপীয়দের তাহাতে অনুরাগ এ সম্বন্ধে লেখকেতে আমাতে কখনোই মতভেদ ছিল না। ইয়ুরোপীয়ানদের সহিত সেই প্রভেদ ঘুচাইবার জন্যে, আমাদের যে মদ মাংস খাইতেই হইবে, এমন কোনো কথা আমি কি না কোনোখানেই বলি নাই, অতএব লেখক ওই কথাটার উপরে যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাংস খাওয়া এ দেশীয় লোকের সাধ্যায়ত্ত কি না, ইয়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি যেরূপ ভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন তদ্দ্বারা এই অল্প বয়সে তাঁহার এতাদৃশ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের ব্যায়াম চর্চা কর্তব্য বোধে করিতে হইবে' আমিও তো তাহাই বলিতেছি। 'ছাত্রেরা যে খেলাধূলা আমোদপ্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।' সে কারণটি কী? তাহারা যে 'বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া এরূপ করে না' তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমার তো বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস যে, এই কষ্টগুলি ভোগ করিলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর কতকগুলি কষ্টের হাত এড়াইতে সক্ষম হইবার পক্ষে খুবই সম্ভাবনা আছে। এই বিশ্বাসের জোরেই তাহারা 'বিদেশী চালকড়াই ভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইতে' এবং 'বীজগণিতের কঠিন আঁটি গিলিতে' চেষ্টা পায় ও তাহাতে কৃতকার্যও হয়। বিদ্যা-শেখা-না-শেখার ফলাফল তাহাদের যেরূপ হৃদয়ংগম হইয়াছে এবং ওই বিশ্বাসটি তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে সেইরূপ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন না করিলে শরীর যথোচিতরূপে বর্ধিত হয় না, অসম্পূর্ণ শরীরে মানসিক বৃত্তি সকলের যথোচিত স্ফূর্তি কখনোই হইতে পারে না, শরীর ও মন এ দুইই যথোচিতরূপে বর্ধিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ না থাকিলে এ পৃথিবীতে কোনো কাজই সুসিদ্ধ হয় না, কোনো স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না— এইগুলি যদি তাহাদের হৃদয়ংগম হয় আর, শরীর ও মনের শুভাশুভ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, এই বিশ্বাসটি তাঁহাদের হৃদয়ে সেইরূপ বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যেমন নীরসতা সত্ত্বেও তাঁহারা 'বীজগণিতের আঁটি গেলেন' তেমনি ব্যায়ামে বিরাগ সত্ত্বেও তাহার উপকারিতাবোধে তাঁহারা তাহা করিবেন। যখন কর্তব্যবোধে একটা কাজ করিয়া আসিতেছেন তখন কর্তব্যবোধে আর-একটা কাজ কেনই বা না করিতে পারিবেন, বিশেষত দুই কর্তব্যেরই যখন সমান গুরুত্ব? দুই কর্তব্যই বা কেন বলিতেছি, যখন শরীর সুস্থ না রাখিলে মন সুস্থ রাখা যাইতে পারে না, তখন মনের প্রতি কর্তব্য আর শরীরের প্রতি কর্তব্য দুইই তো একই কর্তব্যের সামিল হইল। ছাত্রদের শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়া মনে হয় যে, শরীর, মনের নিকটসম্বন্ধ

এখনও তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ংগম হয় নাই। কিন্তু লেখক একস্থানে বলিয়াছেন যে 'ছাত্রদের
বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম চর্চায় শরীর সুস্থ হয়' তবে বোধ হয় তাহা জানিয়াও, ছ্যাক্‌ড়া
গাড়ির কর্তারা তাহাদের ঘোড়াকে যেরূপ ভাবে দেখে ছাত্রেরাও তাঁহাদের শরীরটাকে সেই
ভাবে দেখেন— যত কম সেবায় যত অল্পদিনের মধ্যে যত বেশি কাজ দিতে পারে ততই
ভালো। যত শীঘ্র যে-কোনো প্রকারে হউক চোখে-মুখে খানিকটা বিদ্যা গুঁজিয়া পাসটা দিয়া
একটা দশ-কুড়ি টাকার চাকরি জোটাইতে পারিলে হয়। বস্, তাহা হইলেই পার্থিব সুখের
একেবারে চূড়ান্ত সীমা হইল! হইল কি? না পাসটা হইলেই চাকরিটা হইবে এই বিশ্বাসের উপর
নির্ভর করিয়া পাসটা হইবার আগেই হয়তো বালক বিবাহ করিয়া বসিয়া আছেন, হয়তো
তাঁহার দু-একটি ছেলেমেয়েও হইয়াছে। বালকের সেই বড়ো দুঃখের দশ-কুড়ি টাকার চাকরিটি
হস্তগত হইতে-না-হইতেই তাঁহার মস্তকের উপরে সংসারের বোঝা চারি দিক হইতে চাপিয়া
পড়িল। তিনি তখন 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া নিজেও ঝালাপালা হইতে লাগিলেন আর তাঁহার
অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন আত্মীয়-বন্ধুদিগকেও ঝালাপালা করিয়া তুলিলেন। ছ্যাক্‌ড়া
গাড়ির ঘোড়ার শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল কেবলমাত্র সেই ঘোড়াতেই ফলে
আর তাহাতেই শেষ হয়। কিন্তু বালকের শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল পুরুভুজের
ন্যায় বালকের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অসম্পূর্ণরূপে বর্ধিত ও অপক্ক-শরীর
বালকের সন্তান-সন্ততি কখনোই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সন্তানেরা ক্ষীণ কিংবা রুগ্‌ণ শরীর
লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে হয়তো যথাবশ্যক আহারাভাবে তাহাদের শরীরের অবস্থা
মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। এইরূপে মরিয়া বাঁচিয়া কোনোপ্রকারে মানুষ হইতে থাকে।
আবার পাছে বাপের বিপুল কষ্টরাশির কোনো অংশ হইতে সন্তানটি বঞ্চিত হয় এই ভয়েই যেন
বালক যত শীঘ্র হয়, ছেলের লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দেন, তাহাকে ধমকাইয়া, মারিয়া, রাত
জাগাইয়া পাসের জন্য প্রস্তুত করেন। এই অপূর্ণ, রুগ্‌ণ, ভগ্ন শরীর লইয়া পাসটাস দিয়া ছেলে
যদি বা আর কোনো কালে কখনো মাথা তুলিতে সক্ষম হয়, সে সম্ভাবনা যেন সম্পূর্ণরূপে দূর
করিয়া দিবার জন্যেই পাস দিতে-না-দিতেই পিতা পুত্রের গলায় একটি বধূ বাঁধিয়া দেন। বালক
যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন স্বামীর দুঃখে, সন্তানের কষ্টে তাহার তো একদিনের
তরেও চোখের জল শুকায় না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বালকের শরীরের প্রতি
অত্যাচারের ফল শুদ্ধ একজনে বা এক পুরুষে শেষ হয় না, ক্রমিকই বিস্তৃত হইতে ও বৃদ্ধি
পাইতে থাকে। বাঙালি বালকের জীবনের এখন এই তিনটি কাজ হইয়াছে— জন্ম, পাস, মৃত্যু।
জীবনের সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিবার এতই যদি তাড়াতাড়ি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে
গুষ্টিশুদ্ধ দগ্ধে দগ্ধে মরা কেন, জন্মের পরেই মৃত্যুটাকে আনিলেই তো সব ল্যাঠা একেবারে
চুকিয়া যায়— সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত চট করিয়া চিরকালের মতো এড়ানো যায়।

একটা একজামিন পাস্ করিয়া যৎকথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করিতে পারিলেই কি
মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইল? আমরা কি কেবল একজামিন পাস করিতেই জন্মগ্রহণ
করিয়াছি। মনুষ্যজীবনের কি উহা অপেক্ষা উচ্চ আশা, মহৎ উদ্দেশ্য আর কিছুই নাই? সত্য
বটে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু তাহাই বা সুসম্পন্ন হইতেছে কোথায়? আর,
ওই কার্যসিদ্ধির নিমিত্তে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে সে যে আত্মঘাতী উপায়!! ছেলের
অন্নবস্ত্রের উপায় করিতে গিয়া, যে-শরীরকে সে অন্ন পোষণ করিবে, যে-শরীরকে সে বস্ত্র আবৃত
করিবে সেই শরীরকেই যে ক্ষয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ছেলের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে
যে অতি দ্রুতপদে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছ। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি
হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার মাথার ভিতরে বিদ্যা ঠাসিয়া ঠাসিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তির
ভিত্তিভূমিকেই যে একেবারে চাপিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছ। এ যে গোড়া কাটিয়া আগায়
জল ঢালা!!! ইহা দেখিয়া, জানিয়া বুঝিয়া তবুও কি ইহার প্রতিকারের কোনো উপায় অবলম্বন

করিবে না? আমাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া কি মন্দকেই আমাদের অঙ্গের আভরণের মতো করিয়া দেখিব? আমাদের আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্যকে একেবারে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিব, গণ্ডির বাহিরে দৃক্‌পাতও করিতে দিব না? আমরা তো আর উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মাই নি যে, যে-অবস্থায় জন্মিয়াছি সেইখানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেই হইবে।

লেখক ব্যায়ামের উপকারিতা স্বীকার করিয়া তাহার একটি বাধা দেখাইয়াছেন— সময়ের অভাব। সময়াভাবের দুইটি কারণ দিয়াছেন : ১ম, দরিদ্রতা, ২য়, দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা। প্রথম বাধার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহাই প্রথমে বলি, ব্যায়ামের অর্থ— শারীরিক পরিশ্রম। আমরা সচরাচর, যে-পরিশ্রম আমরা শখ করিয়া করি তাহাকে বলি ব্যায়াম। পরিশ্রমের কাজ এই যে, সমস্ত শরীরটা খানিকটা নাড়াচড়া পাওয়াতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেশ ভালোরূপে রক্ত চলাচল হয় এবং সেইজন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথোচিত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। যে 'দরিদ্র বালকদের ভাতে নুন জোটে না' তাহাদের যে দুই বেলা হাঁটিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে হয় এ-বিষয়ে বোধ করি কাহারো কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না, তদ্‌ব্যতীত তাহাদের অনেক সময় বাজারে যাইতে হয় ও নানাবিধ কাজকর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে আনাগোনা করিতে হয়। দরিদ্র বালকদের দায়ে পড়িয়া হয়তো এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাহাদের পক্ষে 'ব্যায়ামের' অপেক্ষা 'বিরামের' উপদেশ অধিক উপযোগী।

২য় বাধা— দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা হেতু সময়াভাব। ৯টা-১০টা বেলায় ছেলেরা স্কুলে যায়, তিন-চারিটার সময় বাড়ি আসে। ইহাতে তাহাদের প্রত্যূষে এক ঘণ্টা কাল ও সন্ধ্যার পূর্বে এক ঘণ্টা কাল ব্যায়ামের আমি তো কোনো বাধা দেখিতে পাই না। সমস্তক্ষণ স্কুলে পড়িয়া শ্রান্ত মস্তিষ্কে, পথের রৌদ্রের তাপে শীর্ণ শরীরে বিকালে বাড়ি আসিয়াই তখনই আবার পড়িতে বসিলে স্বাস্থ্যের তো হানি হয়ই, তদ্‌ব্যতীত শরীর মনের দুর্বলতাপ্রযুক্ত তৎকালে পাঠাভ্যাস অন্য সময় অপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য হইয়া উঠে। স্কুল হইতে আসিবার পর খানিকটা ব্যায়াম দ্বারা শরীর-মন বেশ তাজা হইয়া উঠিলে তখন আবার পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

আমাদের বিদেশী ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করিতে হয় ইহা বড়োই কষ্টকর, এ কষ্ট আমি লেখকের সহিত ঠিক সমানভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কর্মফলস্বরূপ এই কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাই একটা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সেই দুঃখে গা ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক উন্নতির আর সকল প্রকার উপায়ের প্রতি কি আমরা অন্ধ হইয়া থাকিব এবং এইরূপে আরও পাঁচরকম অসুবিধা, আরও পাঁচটা কষ্ট আপনাদের উপর চাপাইব? ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিয়া বলপূর্বক তাহাদের ভাষা এ-দেশে প্রচলিত করিয়াছে, সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া আমরা কি তাহার শোধ তুলিতে উদ্যত হইয়াছি? না ইংরাজদের উপর আড়ি করিয়া শরীর-মন এমন ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে হইবে যে আর কোনোকালে তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়িবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে? জ্বর হইয়াছে বলিয়া কি ঔষধ-পথ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বিকার পর্যন্ত টানিয়া আনিতে হইবে? এই কি উচিত? কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া কেবল যদি খেদ করিয়াই কাল কাটাই, তাহা হইলে এই সমস্ত কষ্টের বোঝা আমাদের সন্তান-সন্ততির মাথায় চাপাইয়া আমরা কি পাপের ভাগী হইব না?

এখন তোমাদের— বালকদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। তোমরা বিদেশীদের জ্ঞানসকল সুন্দররূপে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় রক্তমাংসে পরিণত করো। নানা ভাষা হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া দুঃখিনী মাতৃভাষার অভাবসকল শীঘ্র দূর করো। তাহা হইলে বিদেশীয় ভাষায় বিদ্যা উপার্জনের কষ্ট

আর সহিতে হইবে না। যত দিন পরিবার-পোষণে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ো না। তাহা হইলে দরিদ্রতার দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন নববধূকে ঘরে আনিবার জন্যে মা তোমাকে অনুরোধ করিবেন, তখন তুমি মায়ের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়ো, মা, আমরা এই কয়জনেই অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সারা হইতেছি এখন আবার ঘরে আরও লোক আনিয়া কেন আমাদের দুঃখ-কষ্ট বাড়াইয়া তুলিব, আর কী করিয়াই বা একটি সুকুমারী বালিকাকে আমাদের এই দারুণ দুঃখ-ক্লেশের ভাগী করিব— মা, যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবিকা নির্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে সক্ষম না হই ততদিন তুমি, আমাকে এই অনুরোধটি করিয়ো না। মা পরম স্নেহময়ী, তিনি যখন বুঝিবেন যে, পুত্র এখন বিবাহ করিলে যথার্থই পরিবারস্থ সকলের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে তখন তিনি আর এ-অনুরোধ করিবেন না। তোমাদের হাতে সকলই রহিয়াছে। তোমরা দলবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কোন্ মহৎ কার্য না সুসিদ্ধ হইতে পারে। তোমাদের স্বাস্থ্যের উপরেই দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে— তোমাদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে— তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

তোমাদের এই-সকল কথা বলিবার, তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি— তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

—পত্রিকাটির আষাঢ় সংখ্যায় 'শ্রীকেদার-দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) 'লাঠালাঠি' প্রবন্ধ লিখিয়া বিতর্কের উপসংহার ঘটান।

২০. 'সত্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ ১২৯৩ তারিখ মধ্যাহ্নে সিটি কলেজ গৃহে পাঠ করিয়াছিলেন, যদিও তাহার পূর্বেই ইহা চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'বালক' ও ২৯ চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'সঞ্জীবনী'-তে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা বৈশাখ ১৮০৮ শক-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ১৬ বৈশাখ ও ১ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'-তেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

২১. রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংবলিত 'আপনি বড়ো' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য 'কল্পনা' পত্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রশান্তকুমার পাল ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশ'-এ পুনর্মুদ্রিত করেন, বর্তমান পাঠটি পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছে।
বর্তমান বিভাগের ২২-২৭ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুলিনবিহারী সেন ইহার অন্তর্গত অনেক রচনা ১৩৫২-১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রবীক্ষা ১ (শ্রাবণ ১৩৮৩) সংকলনে কানাই সামন্ত অবশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশ করেন।

২২. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পূর্ববর্তী একটি আলোচনার সূত্র ধরিয়া 'হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাঁধা নিয়মের প্রতি হিন্দুদিগের আনুগত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই রচনাটি ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮ (৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭ ও ১৯ নভেম্বরের দুইটি প্রস্তাবে বক্তব্যের এই অংশ সম্পর্কে তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য'-শীর্ষক বর্তমান সংকলনের ২৪-সংখ্যক রচনায়।

২৩. 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব' রচনাটি ১৯ নভেম্বর ১৮৮৮ (৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে রচিত। এইটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এর ২৬-সংখ্যক প্রস্তাব— ইহা লইয়াই সর্বাধিক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার

শুরু (আশ্বিন ১২৯৪) হইতে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়া 'রাজা ও রানী' (চৈত্র ১২৯৫) নাট্যকাব্য রচনা পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর রবীন্দ্রনাথের মন নারী ও পুরুষের প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল, উল্লিখিত রচনাটি ও বর্তমান বিভাগে সংকলিত ২৫-২৭ সংখ্যক প্রস্তাবে এই বিষয়েরই বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

২৪. 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য' রচনাটি ২০ নভেম্বর ১৮৮৮ (৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। ২২-সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫. 'সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব', রচনা : ২৪ নভেম্বর ১৮৮৮ (১০ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৬. 'আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে প্রেমের অভাব', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৭. 'Chivalry', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'Browning এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই, যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ভালোবাসে তাহা হইলে যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়।' 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রার মধ্যে এই ভাবনার ছায়া লক্ষিত হয়।

২৮. 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' রচনাটি স্বাক্ষরহীন হইলেও বার্ষিক সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার দ্বাদশ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় ভাং সং (ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী) লিখিয়াছেন,

> লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যে— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশে কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র-মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উজ্জ্বল অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।— ভাং সং।

ইতিহাস

এই বিভাগের অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচী নিম্নে সংকলিত হইল—

১.	ঝান্‌সীর রানী	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৪
২.	কাজের লোক কে	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৩.	গুটিকত গল্প	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৪.	আকবর শাহের উদারতা	বালক, আষাঢ় ১২৯২
৫.	ন্যায়ধর্ম	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৬.	বীর গুরু	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৭.	শিখ-স্বাধীনতা	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৮.	ভারতবর্ষের ইতিহাস : হেমলতা দেবী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
৯.	মুর্শিদাবাদ কাহিনী : নিখিলনাথ রায়	ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
১০.	ঐতিহাসিক চিত্র/সূচনা	ঐতিহাসিক চিত্র, জানুয়ারি ১৮৯৯

১. 'ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার 'ভানু' নামের আদ্যক্ষর— সুতরাং ইহার রচয়িতার পরিচয় লইয়া কোনো সংশয় নাই। ইহা ছাড়া এতাবৎ-প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'-তে 'ঝান্সী রাণী' শিরোনামে একটি গদ্যরচনা পাওয়া যায়, যাহার সহিত 'ভারতী'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষার সাদৃশ্য আছে। পাণ্ডুলিপিতে রচনাটির শেষাংশ পাওয়া যায় না। ইংরেজি কোনো ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে এই অসম্পূর্ণ রচনাটি লিখিত। রচনাশেষে লেখকের প্রতিশ্রুতি আছে, তাঁহার সংগৃহীত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবেন— তাহা রক্ষিত হয় নাই।

২, ৬, ৭. এই রচনাগুলি শিখ-ইতিহাস অবলম্বনে বালকদের উপযোগী করিয়া গল্পাকারে লিখিত। Joseph Davey Cunningham -লিখিত *History of the Sikhs from the Origin of the Nation to the Battles of the Sutlej* [1849] গ্রন্থটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

'বীর গুরু' প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবিতা রচনা করেন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নির্লোভতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া ; রি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ তারিখে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি লেখেন ও তাহা 'মানসী' (১২৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে এই কবিতারই একটি পরিবর্তিত রূপ 'কথা' (১৩০৬) কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশ অবলম্বনে তিনি লেখেন 'শেষ শিক্ষা' (রচনা : ৬ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা।

অনুরূপভাবে 'শিখ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধের দুইটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি 'বন্দী বীর' (রচনা : ৩০ কার্তিক ১৩০৬) ও 'প্রার্থনাতীত দান' (রচনা : ২ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা দুইটি রচনা করেন।

৩, ৪, ৫. এই রচনাগুলির বিষয় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সবগুলিই বালকদের উপযোগী করিয়া লিখিত। উল্লেখনীয় যে, 'গুটিকত গল্প'— এর শেষ গল্পটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'মানী' (রচনা : ১ কার্তিক ১৩০৬) কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রষ্টব্য 'কথা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড : সুলভ চতুর্থ খণ্ড।

৮-৯. হেমলতা দেবী -রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও নিখিলনাথ রায় -কৃত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থ দুইটি সম্পর্কে আলোচনা 'গ্রন্থ সমালোচনা' হিসাবে ভারতী-তে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইতিহাস-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান রচনাবলীতে এই বিভাগের অন্তর্গত করা হইল। ইহারা স্বতন্ত্র 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ আরও দুইটি গ্রন্থসমালোচনা

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' 'ভারতী' পত্রিকায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে : সুলভ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০. 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছিল, তাহার 'অনুষ্ঠান পত্র' অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গ কথা' লিখিয়াছিলেন ভাদ্র ১৩০৫-সংখ্যা 'ভারতী'-তে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, ৫ জানুয়ারি ১৮৯৯ (২২ পৌষ ১৩০৫)। এই সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'টি লিখিয়া দেন।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা এই বিভাগে সংকলিত হইল। ইহাদের সাময়িকপত্রের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ—

১. সামুদ্রিক জীব	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫
২. দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯
৩. বৈজ্ঞানিক সংবাদ	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৪. বৈজ্ঞানিক সংবাদ : গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫ বৈজ্ঞানিক সংবাদ : জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানবশরীর	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৬. রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৭. সাময়িক সার সংগ্রহ : উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
৮. সাময়িক সার সংগ্রহ : অভ্যাসজনিত পরিবর্তন	সাধনা আষাঢ় ১৩০০
৯. সাময়িক সার সংগ্রহ : ওলাওঠার বিস্তার, ঈথর	সাধনা ভাদ্র ১৩০০
১০. ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ	সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

১. এই রচনাটি পত্রিকায় 'সামুদ্রিক জীব/প্রথম প্রস্তাব/কীটাণু' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাশেষে 'ভ' স্বাক্ষর দেখিয়া রচয়িতাকে চিনিয়া লওয়া যায়। 'প্রথম প্রস্তাব' এইরূপ উল্লেখ হইতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও লিখিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন— কিন্তু বিলাতযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ার জন্য আর লেখা হয় নাই।

২. 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সদর স্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।' বর্তমান প্রবন্ধটি সম্ভবত এই পাঠচর্চার ফল। তিনি হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন, বর্তমান রচনাটি তাঁহার 'The Use of Anthropomorphism' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা— শতপথ ব্রাহ্মণ, ভাগবত পুরাণ, গ্রীক

পুরাণ, টমাস হেনরি হাক্সলির 'The Genealogy of Animals' প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে উদ্‌ধৃতি দিয়া ইহাতে স্পেনসরের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে স্পেনসরের *Data of Ethics* গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংলন্ড হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়িয়াছিলেন।

৩. 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা হইতে বারোটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলন করিয়া দিয়াছেন। এই পত্রিকায় বিভাগটির পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

৪-৫. 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগটি শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তী পৌষ সংখ্যা ছাড়া এই বিভাগের নাম দিয়া আর কোনো রচনা মুদ্রিত হয় নাই। 'মানবশরীর' রচনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' নামক যে প্রবন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত।

৬, ১০. 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈনা', 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' প্রবন্ধ দুইটি প্রকৃতপক্ষে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগেরই রচনা, আকার দীর্ঘ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭-৯. এই রচনাগুলি 'সাময়িক সার সংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান বিভাগে লওয়া হইয়াছে।

বিবিধ

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি এই বিভাগে সংকলিত হইল। সাময়িক পত্রে ইহাদের প্রকাশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১. সান্ত্বনা	ভারতী, চৈত্র ১২৮৪
২. নিঃস্বার্থ প্রেম	ভারতী, কার্তিক ১২৮৭
৩. যথার্থ দোসর	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৪. গোলাম-চোর	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৫. চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮
৬. দরোয়ান	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮
৭. জীবন ও বর্ণমালা	ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮
৮. রেল গাড়ি	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৮
৯. লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০
১০. গোঁফ এবং ডিম	ভারতী, আষাঢ় ১২৯০
১১. সত্যং শিবং সুন্দরম্	ভারতী, আষাঢ় ১২৯১
১২. ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী	নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১
১৩. পুষ্পাঞ্জলি	ভারতী, বৈশাখ ১২৯২
১৪. বিবিধ প্রসঙ্গ ১	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৫. বিবিধ প্রসঙ্গ ২	ভারতী, ভাদ্র ১২৯২
১৬. বর্ষার চিঠি	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
১৭. বরফ পড়া	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৮. শিউলিফুলের গাছ	বালক, পৌষ ১২৯২
১৯. বানরের শ্রেষ্ঠত্ব	বালক, চৈত্র ১২৯২
২০. কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন	বালক, চৈত্র ১২৯২

২১. সৌন্দর্য ও বল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২২. আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২৩. শরৎকাল	মানসী, আশ্বিন ১৩২০, রচনা : ১২৯৬
২৪. ছেলেবেলাকার শরৎকাল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৪, রচনা : ১২৯৬
২৫. ইন্দুর রহস্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৬
২৬. কাজ ও খেলা	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১২৯৬
২৭. [ঘানির বলদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৮. [জীবনের বুদ্‌বুদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৯. বাগান	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩০. ঠাকুরঘর	সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯
৩১. নিষ্ফল চেষ্টা	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩২. সফলতার দৃষ্টান্ত	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩৩. [লেখক-জন্ম]	পকেট বুক, রচনা : ? ফাল্গুন ১২৯৯
৩৪. সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ	ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

১. 'সান্ত্বনা' রচনাটি 'ভ'-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া ইহাকে চিনিতে সাহায্য করে। এইরূপ হৃদয়ভাব-মূলক রচনা রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আরও দুই-একটি লিখিয়া থাকিতে পারেন— যেমন ভারতী-র ফাল্গুন ১২৮৪-সংখ্যায় মুদ্রিত 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' রচনাটি— কিন্তু ইহার নিম্নে 'বিধবা' স্বাক্ষর থাকাতে রচয়িতার পরিচয় নির্দিষ্ট করা কঠিন।

২. 'নিঃস্বার্থ প্রেম' শীর্ষক চলিত ভাষায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর ঢঙে লেখা পত্র-প্রবন্ধটি কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে। রচনাটির মধ্যে 'ভা-' অর্থাৎ 'ভানু' শব্দটির আদ্যক্ষরের ব্যবহার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

৩-৮. ভারতী-র প্রথম বর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একধরনের আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন— 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম-চোর', 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়', 'দরোয়ান', 'জীবন ও বর্ণমালা', এবং 'রেল গাড়ি' এই শ্রেণীরই রচনা— পরিণত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় তাহা আরও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের তিনি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু অন্তত 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' এবং 'জীবন ও বর্ণমালা' রচনা দুইটিকে তিনি যে গ্রন্থভুক্ত করার কথা ভাবিয়াছিলেন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'ভারতী'-র একটি খণ্ডে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে— কিছু-কিছু অংশ তিনি বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখানে পত্রিকার সম্পূর্ণ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

৯. 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী' রচনাটি 'প্রভাতসংগীত' কাব্য প্রকাশের সহিত সম্পর্কান্বিত। কাব্যটি প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী, ১১ মে ১৮৮৩ (২৯ বৈশাখ ১২৯০) তারিখে।

১০. 'গোঁফ এবং ডিম' লঘুস্বাদের এই রচনাটি 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহ রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া দাবি না করিলেও ভাষা ও অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিস্তার দেখিয়া ইহাকে সহজেই রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়।

১১. 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-জাতীয় রচনা 'সৌন্দর্য ও প্রেম'-এর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'আলোচনা' (১২৯২) গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

১২. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-রচয়িতার কাল্পনিক জীবনকথা। উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ (১ জুলাই ১৮৮৪) উপলক্ষে ইহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দেশীয় ও বিদেশী বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের সন ও তারিখ লইয়া সমকালে যে বিচিত্র গবেষণা প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ড (১৩৮০) এবং শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৩. 'পুষ্পাঞ্জলি' কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের (বৈশাখ ১২৯১) পটভূমিকায় লেখা। ইহা বৈশাখ ১২৯২-সংখ্যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল অন্তত ভাদ্র ১২৯১-এর পূর্ববর্তী, কারণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপির (অভিজ্ঞান সংখ্যা ৮৫) অন্তর্গত 'তোরা বসে গাঁথিস্ মালা' গানটি 'হায়' শিরোনামে 'ভারতী'-র ভাদ্র ১২৯১-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি সম্ভবত একটানা লেখা নয়, ডায়ারির মতো এক-এক দিনে একটি বা দুইটি করিয়া অনুচ্ছেদ, কবিতা বা গান লিখিত হইয়াছে— সবগুলিই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত। রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ডে : সুলভ নবম খণ্ডে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে মুদ্রিত হইয়াছিল, বর্তমান খণ্ডে স্বতন্ত্র রচনার মূল্য দিয়া প্রকাশিত হইল।

১৪-১৫. ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সম্ভবত একই জাতীয় বর্তমান রচনাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

১৬. যৌবনে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) ১৮৮৪ সালে *Phoenix* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব লইয়া করাচি-প্রবাসী হন। 'বর্ষার চিঠি' এই পত্রাকার প্রবন্ধটি তাঁহারই উদ্দেশে রচিত। কৌতুক, বাল্যস্মৃতির রোমন্থন, কবিত্বময় কল্পনার সংমিশ্রণে উপভোগ্য এই রচনাটির স্মৃতিচারণের অংশটি 'জীবনস্মৃতি'-র কোনো কোনো বর্ণনাকে মনে করাইয়া দেয়।

১৭. ১৮৭৮ সালে ইংলন্ডে অবস্থানকালে তুষারপাতের দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চকর প্রথম অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ 'বরফ পড়া' রচনাটিতে বালকদের চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮. 'শিউলিফুলের গাছ' অলস কবিকল্পনায় পূর্ণ একটি গদ্য রচনা।

১৯. 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব' একটি ব্যঙ্গরচনা, তৎকালে একশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী আর্যত্বের মহিমা লইয়া যে অলীক গর্ব প্রকাশ করিতেন তাহাকেই এই রচনায় তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে।

২০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রবীন্দ্রনাথকে কার্যাধ্যক্ষ করিয়া বালক-বালিকাদের জন্য 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাদিকা বলিয়া ঘোষিত হইলেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রকৃত সম্পাদক। এক বৎসর এই কাজ করিয়া তিনি উক্ত দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন' রচনাটি তাহারই কৈফিয়ত।

বর্তমান বিভাগের ২১-৩২ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত বিচিত্র-বিষয়ক রচনাগুলি এখানে সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

২১. 'সৌন্দর্য ও বল', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২২. 'আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৩. 'সপ্তমীপূজা। ১৮৮৯' (১ অক্টোবর : ১৬ আশ্বিন ১২৯৬)-র দিন 'শরৎকাল'-শীর্ষক একটি প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্বস্মৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মূল ভাবনাটি অবলম্বন করিয়া তিনি পঞ্চভূত গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি রচনা করেন (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯)। পরে মূল রচনাটির ঈষৎ সংস্কার করিয়া

তিনি 'মানসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২০-সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

২৪. ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৮৮৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলাকার কথা' নামক দুইটি প্রস্তাব লেখেন। এই রচনা দুইটির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ১০ অক্টোবর (২৫ আশ্বিন ১২৯৬) 'ছেলেবেলাকার শরৎকাল' প্রস্তাবটি রচনা করেন।

২৫. 'ইন্দুর-রহস্য' রচনা : ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ (১ কার্তিক ১২৯৬)। এই রচনাটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'সাধনা'-র ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রবন্ধের শেষাংশে সমীরের উক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্রষ্টব্য 'পঞ্চভূত', রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ প্রথম খণ্ড।

২৬. 'কাজ ও খেলা' এবং 'খেলার কি কোন কার্যকারিতা নাই' নামে দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে ৮ ও ৯ অক্টোবর ১৮৮৯ তারিখে। তাঁহার বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করিয়া 'কাজ ও খেলা' প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ (২ কার্তিক ১২৯৬)।

২৭-২৮. এই দুইটি রচনা ৬ এপ্রিল ১৮৯১ (২৪ চৈত্র ১২৯৭) তারিখে রচিত হয়। রচনার অভ্যন্তর হইতে শব্দগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে।

২৯-৩০. 'বাগান' ও 'ঠাকুরঘর' রচনা দুইটি সম্ভবত পত্রিকার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য লিখিত।

৩১-৩২. 'নিষ্ফল চেষ্টা' ও 'সফলতার দৃষ্টান্ত' হাস্যরসাত্মক এই দুইটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা গল্প ও গদ্যরচনারীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। একই সময়ে লিখিত ও 'সাধনা'-র ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রীতিমত নভেল' গল্পটিও একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছে।

৩৩. 'লেখক-জন্ম' রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে বহুলপরিচিত 'পকেটবুক' বা 'মজুমদারপুঁথি' নামক পাণ্ডুলিপি (রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটোকপির নির্দেশক সংখ্যা ৪২৬) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শিরোনাম সম্পাদকমণ্ডলির দেওয়া। রচনাটিতে তারিখ নাই, আগে-পরে লিখিত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলির বিচারে আনুমানিক রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৯ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এক বৎসরের জন্য 'ভারতী' সম্পাদনা করিয়া এই দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' রচনাটিতে তাঁহার কৈফিয়ত প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা

ইংল্যান্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর (১২৮৬।১৮৮০) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত হন। এই সূত্রেই তিনি পত্রিকা-দপ্তরে সমালোচনার জন্য প্রেরিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন।

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু সম্ভব কাব্য, *The Indian Homœpathic Review*।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, মাঘ ১২৮৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য' ও 'অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য' এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনায় পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' সম্বন্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলেন, এখানে সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গগুলি পুনরালোচিত। এখানে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের ছন্দ সম্পর্কে যে বিচার, তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা লক্ষণীয়।

বর্তমান সংখ্যায় অপর দুটি সমালোচিত গ্রন্থ—

প্রসাদদাস গোস্বামী, 'অভিমন্যু সম্ভব কাব্য', B. L. Bhaduri -সম্পাদিত মাসিক পত্র *The Indian Homœopathic Review*।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক উপন্যাস : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
লক্ষ্মণবর্জন। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ : বিপিনবিহারী ঘোষাল
কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ : শ্রী কায়কোবাদ
সরলা : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রায়শ্চিত্ত : হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
আদর (প্রিয়তমার প্রতি) : কল্পনাকান্ত গুহ
উর্মিলা-কাব্য : দেবেন্দ্রনাথ সেন
নির্ঝরিণী (গীতিকাব্য), প্রথম খণ্ড : দেবেন্দ্রনাথ সেন
রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক : শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮

সমালোচিত এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন -রচিত 'উর্মিলা-কাব্য' ও 'নির্ঝরিণী'র আলোচনাসূত্রেই অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের মধ্যে পত্রালাপের সূচনা হয়। 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'স্মৃতি' রচনায় লিখিয়াছেন, "রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।..."

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত : মহেন্দ্রনাথ রায়
যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন : রাজকৃষ্ণ দত্ত
গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত
শার্ঙ্গধর : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত
যাবনিক পরাক্রম। উপন্যাস : নীলরত্ন রায়চৌধুরী
স্বপন-সঙ্গীত। গীতিকাব্য : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য : রাধানাথ মিত্র

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯

'হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি'র বক্তব্যের সহিত তুলনীয়, ভারতী, চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য।

'ভারতী' ফাল্গুন ১২৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'উর্মিলা-কাব্য', 'নির্ঝরিণী'র সূত্রে উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা যেমন অনুমিত হয়, অনুরূপভাবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'স্বপন-সঙ্গীত' সমালোচনা সূত্রেই, অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
হরবিলাপ : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
কমলে কামিনী বা কুলেশ্বরী : রাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত

কল্পনা-কুসুম : কামিনীসুন্দরী দেবী
কবিতাবলী। প্রথম ভাগ : রামনারায়ণ অগস্তি
কুসুমারিন্দম : ইন্দ্রনারায়ণ পাল
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
তৃণপুঞ্জ : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
শান্তি-কুসুম : বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরসভা : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
কৈলাস-কুসুম, মণিমন্দির, পার্থ প্রসাদন, প্রমীলার পুরী
ষড়ঋতু বর্ণন কাব্য : আশুতোষ ঘোষ
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : ভারতী, চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত : নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রামধনু : সূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত
ঝংকার। গীতিকাব্য : সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
উচ্ছ্বাস : বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০

'সিন্ধু-দূত' প্রণেতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় সমালোচনা করেন; বস্তুত ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থসমালোচনা।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ডের (প্রকাশ ১৩৫৩) : সুলভ একাদশ খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' শিরোনামে, শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়া প্রকাশিত; বর্তমান রচনাবলীতে পূর্ণপাঠ গৃহীত।

সংগীত সংগ্রহ (বাউলের গাঁথা[গাথা]) দ্বিতীয় খণ্ড
স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন : শ্রীমতী গুণময়ী
ভাষাশিক্ষা

সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

সংগীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম।..."

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ড-ভুক্ত 'বাউলের গান' বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক : সুরেশচন্দ্র বসু
দেহাত্মিক তত্ত্ব : ডাক্তার সাহা প্রণীত
প্রাপ্ত গ্রন্থ, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
লীলা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রায় মহাশয় : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন
অপরিচিতের পত্র : জ-রি
প্রকৃতির শিক্ষা

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী : কালীপ্রসন্ন দত্ত

সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯

'রায় মহাশয়' উপন্যাস বিষয়ে সাধনা, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সংখ্যা হইতে 'রায় মহাশয়' উপন্যাসটি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। পৌষ ১২৯৮ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য, বর্তমান রচনাবলীর 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' সংকলন অংশ।

অশোকচরিত : কৃষ্ণবিহারী সেন

পঞ্চামৃত : তারাকুমার কবিরত্ন

সমালোচনা : সাধনা, পৌষ ১২৯৯

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'অশোকচরিত' রচয়িতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ ''কৃষ্ণবিহারী সেন'' 'সাধনা', আষাঢ় ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কঙ্কাবতী

সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের সমালোচনা।

স্বাক্ষরহীন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৬৭) এই রবীন্দ্র-রচনা ভূমিকারূপে সংকলিত।

ভক্তচরিতামৃত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ : কাশীচন্দ্র ঘোষাল

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

ঠগী কাহিনী : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ : সীতানাথ দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ

সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১

এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ইহা উপনিষদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা।

হাসি ও খেলা : যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সাধন সপ্তকম্

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১৩০১

'হাসি ও খেলা' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার -সম্পাদিত 'গল্পসঞ্চয়' সংকলনের পরিচিতিতে রবীন্দ্রনাথ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ অনুরূপ প্রশংসা করেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব : যোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত

মনোরমা : কুমারকৃষ্ণ মিত্র

গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১

'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের ১৯০ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ''...সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দু খানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ— এরকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ

পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।"

নূর জাহান : বিপিনবিহারী ঘোষ
শুভ পরিণয়ে
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১৩০১
রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ : নবীনচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুবাদিত
ফুলের তোড়া : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
নীহার-বিন্দু : নিতাইসুন্দর সরকার
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১৩০২
নির্ঝরিণী : শ্রীমতী মৃণালিনী (ঘোষ/সিংহ)
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম : হারাণচন্দ্র রক্ষিত
গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাব -আয়োজিত 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান' বিষয়ে রচনা-প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক রবীন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে প্রাপ্ত রচনাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া স্বর্ণপদক দান অনুমোদন করিলেও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার সম্পাদিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২ সংখ্যায় এই বিরূপ সমালোচনা করার জন্য কটাক্ষ করেন।

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী : ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য
প্রসঙ্গমালা : হরনাথ বসু
মনোহর পাঠ : হরনাথ বসু
ন্যায়দর্শন : যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহায়তায় কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি-কর্তৃক প্রকাশিত
কাতন্ত্র ব্যাকরণম্ : শ্রীনাথরাম শাস্ত্রী ও হীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী-সম্পাদিত।
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
সাহিত্যচিন্তা : পূর্ণচন্দ্র বসু
বামাসুন্দরী বা আদর্শ নারী : চন্দ্রকান্ত সেন
শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ : শ্যামাচরণ দে
বাসনা : বিনোদিনী দাসী
পুষ্পাঞ্জলি : রসময় লাহা
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
চিন্তালহরী : চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
ভূমিকম্প : বিপিনবিহারী ঘটক
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয় ভাষ্য, সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : গৌরগোবিন্দ রায়
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি এই পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহারই সূত্রে তিনি 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামে একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন, যাহা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন। এই বিভাগে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার উল্লেখনীয় রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি অম্লমধুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় এই বিভাগটির প্রবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকাতেও পরবর্তীকালে এই বিভাগটির অনুবর্তন করিয়াছেন, দেখা যায়।

ভারতী [ও বালক], ১৫শ ভাগ, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

নব্যভারত, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

'সাহিত্য' আশ্বিন ১২৯৮ সংখ্যায় মুদ্রিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় চলে 'সাহিত্য' পৌষ, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় এবং 'সাধনা' মাঘ, ফাল্গুন ১২৯৮ সংখ্যা পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে, আষাঢ় ১৩০৫ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণভাবিনী দেবী রচিত, 'প্রদীপ' পত্রিকায় মুদ্রিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]

সাহিত্য, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১২৯৮

নব্যভারত, পৌষ [১২৯৮]

সাহিত্য, পৌষ [১২৯৮]

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কার্তিক [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য, মাঘ [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

চন্দ্রনাথ বসু -রচিত 'লয়' প্রবন্ধ কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। পরবর্তীকালে 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' শিরোনামে। বর্তমান রচনাবলীর 'ধর্ম/দর্শন' বিভাগে ইহা সংকলিত হইয়াছে।

নব্যভারত, মাঘ [১২৯৮]

সাহিত্য, ফাল্গুন [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১২৯৮

'সাহিত্য' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর ধারাবাহিক 'আহার' প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার পূর্বাপর অন্যান্য রচনার সহিত তুলনীয়।

নব্যভারত, চৈত্র [১২৯৮]

সাহিত্য, চৈত্র [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯

নব্যভারত, বৈশাখ [১২৯৯]
সাহিত্য, বৈশাখ [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৮ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখে এক পত্রে লিখিতেছেন, "নব্যভারত এ পর্য্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।"

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]
সাহিত্য, শ্রাবণ [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা
সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১
প্রদীপ, বৈশাখ [১৩০৫]
উৎসাহ, ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
নব্যভারত, বৈশাখ [১৩০৫]
প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
উৎসাহ, বৈশাখ [১৩০৫]
নির্মাল্য, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
সাহিত্য, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র [১৩০৪]
পূর্ণিমা, শ্রাবণ [১৩০৫]
প্রদীপ, আষাঢ় [১৩০৫]
অঞ্জলি, জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
সাহিত্য, বৈশাখ [১৩০৫]
প্রদীপ, শ্রাবণ [১৩০৫]
অঞ্জলি, আষাঢ় [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫
সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১৩০৫]
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা [চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা]
প্রদীপ, ভাদ্র [১৩০৫]
উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
অঞ্জলি, শ্রাবণ [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা
প্রদীপ, আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

এই বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-র প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১২৯৮ হইতে শুরু করেন, ইহাতে ইংরেজি সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের সারবস্তু মন্তব্য সহযোগে পরিবেশিত হইত— প্রথম দুইটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একাই লিখিয়াছেন, পরবর্তী সংখ্যা হইতে বলেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিভাগটিতে লিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হয় নাই, ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যা হইতে বিভাগটির নাম হয় 'আলোচনা'। বিদেশী পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির সহিত বাঙালি পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ-বৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করিতেন— পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ, নিজের কন্যাদ্বয় মাধুরীলতা ও মীরা দেবী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবী প্রমুখদের দিয়া বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা হইতে সার-সংকলন করাইয়াছেন। 'সাধনা'-র 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি রচনা বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া আমরা সেগুলি 'বিজ্ঞান' বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছি। আরও কয়েকটি রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে মুদ্রিত হইল না। বর্তমান খণ্ডে গৃহীত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচীটি এইরূপ—

১-৪.	মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫-৭.	ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৮-১০.	স্ত্রী-মজুর, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, মাঘ ১২৯৮
১১.	আমেরিকানের রক্তপিপাসা	সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮
১২-১৩.	উন্নতি, সুখ দুঃখ	সাধনা, চৈত্র ১২৯৮
১৪.	সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
১৫.	প্রাচীন শূন্যবাদ	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯
১৬.	পরিবারাশ্রম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
১৭-১৮.	মানুষসৃষ্টি, জিব্রল্টার বর্জন	সাধনা, ভাদ্র ১৩০০
১৯-২২.	পলিটিক্স, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, পুলিস রেগুলেশন বিল, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, ধর্মপ্রচার	সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১
২৩-২৬.	ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি, উদ্দেশ্যসংক্ষেপ ও কর্তব্যবিস্তার, হিন্দু ও মসুলমান, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার	সাধনা, চৈত্র ১৩০১
২৭-২৯.	ফেরোজ শা মেটা, বেয়াদব, কথামালার একটি গল্প	সাধনা, বৈশাখ ১৩০২
৩০-৩৩.	চাবুক-পরিপাক, জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, কুকুরের প্রতি মুগুর	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
৩৪-৩৭.	ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা, মতের আশ্চর্য ঐক্য, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য	সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

৩৮-৪৩. ভ্রম স্বীকার, চিত্রল অধিকার, ইংরাজের লোকপ্রিয়তা, ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য, ইংরাজের লোকলজ্জা, প্রাচ্য ও প্রতীচী — সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২
৪৪-৪৭. নূতন সংস্করণ, জাতিভেদ, বিবাহে পণগ্রহণ, ইংরাজের কাপুরুষতা — সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

১. সারস্বত সমাজ ১	রচনা : শ্রাবণ ১২৮৯
২. সারস্বত সমাজ ২	রচনা : অগ্রহায়ণ ১২৮৯
৩. বিশেষ বিজ্ঞাপন ত্রৈমাসিক সাধনা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০২
৪. প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫

এই রচনাগুলিকে পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও এগুলি মূলত বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ মাত্র।

১-২. 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন এবং বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন" করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সারস্বত সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১ শ্রাবণ ১২৮৯ তারিখে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি কার্যবিবরণী 'মালতীপুঁথি' নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখেন। "১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে" অধিবেশন হয়, তারিখটি ছিল ১ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিবার সময়ে ভ্রমক্রমে "২রা তারিখে" লিখিয়াছেন। এই কার্যবিবরণীটি মালতীপুঁথি-র অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেখান হইতে রচনাটি সংকলিত হইল।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ তারিখে অ্যালবার্ট হলে উক্ত সমাজের যে অধিবেশন বসে, তাহার "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রমোহন [নাথ] ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত" একটি কার্যবিবরণী মন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৩৪) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। সেটি এখানে 'সারস্বত সমাজ ২' শিরোনামে সংকলিত হইল।

৩. এই 'বিশেষ বিজ্ঞাপন'টি 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত উক্ত সংখ্যার কপিগুলিতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না— সম্ভবত মলাট বাদ দিয়া বাঁধাইবার ফলে ইহা বিনষ্ট হইয়াছে। রাজেন্দ্রকুমার মিত্র স্ব-সম্পাদিত 'সচিত্র খামখেয়ালী' পত্রিকার মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায় (১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা) 'খেয়ালখাতা' নিবন্ধে ইহা উদ্‌ধৃত করেন (পৃ. ৪০২)— সেখান হইতে রচনাটি এখানে সংকলিত হইল। উল্লেখ্য, অগ্রহায়ণ ১৩০২ হইতে 'ত্রৈমাসিকপত্ররূপে' সাধনা প্রকাশিত হইবার কথা বিজ্ঞাপিত হইলেও, উহা কার্যকর হয় নাই।

৪. ৩০-৩১ মে ও ১ জুন ১৮৯৮ (১৭-১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) তারিখে পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা নগরীতে রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি যোগদান করেন। ৩০ মে সভাপতি যথারীতি ইংরেজিতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করিয়াছিলেন।" বহু বৎসর পরে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে নাটোর-সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রবর্তনে তাঁহার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন, "পর বৎসরে রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্‌সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল"। এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ 'প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন' রচনায়। বার্ষিক সূচীতে অনুবাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রগুলি অনেক সময়েই রচনার সহিত লেখকের নাম প্রকাশ করিত না। কখনো কখনো মলাটে লেখকের নাম উল্লিখিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি বাঁধাই করিবার সময়ে মলাট ও বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলি বাদ দেওয়ার ফলে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয়টিও লুপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান রচনাবলীর মূল অংশে এইরূপ বিতর্কিত কিছু রচনা অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য তথ্যের বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সেই রচনাগুলি ইতিহাসের সূত্র রক্ষার খাতিরে বর্তমান পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইল। রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচি ও অন্যান্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১.	শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস	ভারতী, কার্তিক ১২৮৪
২.	গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১)
৩.	বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
৪.	বিজন চিন্তা : কল্পনা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪
৫.	কবিতা-পুস্তক	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৬.	আবদারের আইন	সাধনা, মাঘ ১৩০১

সজনীকান্ত দাস তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী তৈয়ারি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'এই তালিকাধৃত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন'। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এই তালিকায় উপরে উল্লিখিত 'শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস', 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' ও 'কবিতা-পুস্তক' রচনা তিনটি আছে।

১. 'শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস' কবিতাটিকে তালিকাভুক্ত করিয়া সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই কবিতাটিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে "ভানু" দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়।'

২. রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্তের তালিকায় প্রথমেই আছে, ' "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রথমাংশ, বেদান্তবাগীশ মহাশয় -কর্তৃক সংশোধিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৩য় ভাগ, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়।' ১২৮০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার সহিত হিমালয়ে গিয়াছিলেন, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করিয়া তিনি পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন, 'প্রক্টরের লিখিত সরল-পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিতেন আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' বিষয়টি তিনি আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে, 'তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা

বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ে থাকার সময়েই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়, এবং আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' অবস্থাতেই বন্ধ হইয়া যায়। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলে তিনি ১৫ অক্টোবর ১৯৩৯ তাঁহাকে লেখেন :

> পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক [আনন্দচন্দ্র] বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না।

সজনীকান্ত এই চিঠি উদ্‌ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার সংশয় ছিল বলিয়াই তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন, 'এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।' দেবেন্দ্রনাথ প্রক্টরের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পুত্রকে জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের লক্ষ্য একান্তভাবেই ভারতীয় জ্যোতিষ।

সেই কারণে কেহ কেহ মনে করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১) সংখ্যায় মুদ্রিত 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক রচনা। 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা থাকিলেও পরবর্তী কোনো সংখ্যায় ইহার কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয় নাই। 'জীবনস্মৃতি' (১৩৬৮)-র তথ্যপঞ্জীতে সংশয়-চিহ্নিত ভাবে প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই-সকল কারণবশত এই প্রবন্ধটিকে পরিশিষ্টে গ্রহণ করা হইল।

৩. 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' সজনীকান্ত দাসের তালিকায় আছে। 'দেশ', রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯-এ 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া পুলিনবিহারী সেন প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহার বক্তব্য ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা ও তাঁহার তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় বক্তব্যের সহিত মেলে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা মনে করেন না। তাছাড়া একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া এই নিবন্ধটিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ উপেক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্য রচনাটিকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৪. 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' প্রবন্ধটির শেষে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'বিধবা' নামে, এই কারণেই আত্মভাবনামূলক এই রচনাটির প্রতি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনার সকল বৈশিষ্ট্যই বর্তমান বলিয়া ইহাকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৫. 'কবিতা-পুস্তক' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত নামীয় কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্ত দাসের তালিকায় রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার যাথার্থ্য

সম্পর্কে সংশয়িত হইবার কারণ আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ ১৮ আগস্ট ১৮৭৮ (৩ ভাদ্র ১২৮৫)। যদি এই তারিখ ঠিক হয়, তবে আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটি প্রেরণ করা ও সেখান হইতে তাঁহার দ্বারা সমালোচিত হইয়া ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে স্কট, বায়রন, শেক্সপিয়র প্রভৃতি বিদেশী কবি এবং রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের রচনার সহিত যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে, এই ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না— ইঁহারই সাহায্য লইয়া তিনি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' গ্রন্থগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার উদ্‌ধৃতির ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থে প্রকাশ অনুযায়ী কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করা হইল :

পৃষ্ঠা। ছত্র	ভারতী	গ্রন্থ
৪৯৩। ৮	[ছত্রটি পত্রিকায় ছিল না]	চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।
৪৯৫। ১২	মরুমাঝে	মরুভূমিমাঝে
৪৯৬। ৩২	ত্রাহি মা দুর্গে	ত্রাহি মে দুর্গে

৬. এই লেখাটির বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন : 'প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।' এতৎসত্ত্বেও কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন যে এটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন। সেই কারণেই লেখাটি পরিশিষ্টের অন্তর্গত হইয়াছে।

স্বীকৃতি

অগ্রন্থিত রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশ্বভারতী একটি সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেন। উপাচার্য শ্রীদিলীপকুমার সিংহ, কর্মসচিব শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় -সহ এই সমিতিতে আছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। সংকলন এবং প্রকাশনের কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন শ্রীদিলীপকুমার হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীআশিসকুমার হাজরা এবং শ্রীঅমিত সেন।

১৪০৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী